নয়নমনোহর চাঁদের হাসিতে নিখিল ভুবনই হাস্যময়। বনের তরু, বাগানের লতা, বাসন্তীফুলে সুসজ্জিত ছিল। এক্ষণে সে চিত্তহারি চাঁদের হাসি, এবং তাহাদিগের অঙ্গাভরণ ফুলের হাসি, যেন প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল; আর তরু লতার সে ললিত-স্নিগ্ধ হসিতচ্ছবি অবনীকে কেমন এক অপরূপ শোভা প্রদান করিল।

যাঁহারা এই অনন্ত জগতের অধীশ্বর ভগবান্ অনন্তদেবকে রসস্বরূপ মধুর এবং ভুবনমোহন সুন্দর বলিয়া হৃদয়ে অনুভব এবং ভাষায় প্রকাশ করিতে প্রয়াসপর হইয়াছিলেন। বুঝিবা সেই যোগ-মগ্ন ঋষি তাপসেরাও চন্দ্রের হাসি মাখা আলোকে ফুলের হাসি দেখিয়া মোহিত হইয়া থাকিবেন। হাসির এমন মনভুলানো মধুর মূর্ত্তি কি মনুষ্যের প্রাণকে, প্রাণ, প্রেম ও প্রেমময় সৌন্দর্য্যের অনাদি প্রস্রবণের দিকে, আকর্ষণ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল?

দেখিলাম, সকল ফুলই, নববসন্তের নূতন সুখ-স্ফুরণে, গগনে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে। অথচ মানুষের মধ্যে একজনের হাসির সহিত আর একজনের হাসির যেমন পার্থক্য, বাসন্তী সুষমার ফুলে-ফুলেও হাসির সেইরূপ রসভাবময় সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। গর্ব্বিত গন্ধরাজ, আজি গৌরবে ফুলিয়া, এবং আপনার সৌরভে আপনিই আমোদিত হইয়া, কতই যেন হাসিতেছে, এবং হাসিয়া হাসিয়া কতই যেন কি কহিতেছে। আর, তাহার অদূরে শ্বেতকান্তি যুঁই, চামেলী ও পারুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল, আপনাদিগের ক্ষুদ্র বক্ষে সুবাসের ভাণ্ডার লইয়া মৃদু হাস্যে শোভা পাইতেছে। গন্ধরাজ যেমন অভিমানে প্রস্ফুটিত; উহারা সকলেই তেমন আপনাদিগের ক্ষুদ্রতা স্মরণে আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। সলজ্জ রজনীগন্ধা ভয়ে ভয়ে পাপড়ি মেলিতেছে; যেন কেহ দেখিতে পাইল বলিয়া যারপরনাই ভীত ভীত। আর, কোমল-প্রাণা কামিনী, একা থাকিতে কুণ্ঠিত বলিয়া, গুচ্ছে গুচ্ছে জড়িত,—গুচ্ছবদ্ধ অবস্থাতেই সুশোভিত। ভক্ত বকুল ভাবে আকুল। সে যেন চাঁদের জ্যোৎস্নায় জগন্ময় সৌন্দর্য্যেরই জ্যোৎস্না দেখিয়া ভাবে বিভোর হইতেছে; এবং আপনার হৃদয়-নিহিত ভাবেরই সুবাস ছড়াইতে ছড়াইতে ঝুর ঝুর করিয়া ভূতলে ঝরিয়া পড়িতেছে। শ্বেতমালতী দলে দলে সজ্জিত; এবং শ্যামল বনের সহস্র নেত্ররূপে বিকসিত; গন্ধ না থাকিলেও সুখ-শোভন। সম্মুখে শাদা প্রাণ ও সুবাসিত টগর, সরল মতি সুজনের ন্যায়, সকলেরই প্রীতিকর। গন্ধহীন কুন্দ, কাননের বিকচ আননে কমনীয় দন্তপংক্তির ন্যায়, বিকসিত। আর, বন-শোভন কোটীশ্বর যেন মধুকরের শ্রুতি-মধুর স্তুতিগুঞ্জনের জন্যই লালায়িত। উহার এক পার্শ্বে নির্গন্ধ ও নীরবস্ফুটিত বাসক বিষাদে পরিম্লান। সুকোমলা সেউতীরা, ঘুমন্ত বালিকাদিগের ন্যায়, ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলনে যত্নবতী। সুগন্ধসমাকুলা সর্ব্বশুক্লা ভূঁইচাঁপা, ক্ষুদ্র তরুর আশ্রয়ে, সর্ব্বশুক্লা

সরস্বতীর ন্যায় কান্তিমতী। সন্ধ্যামালতীরা সততই সন্তাপ-ভয়ে ভীত। উহারা গগনের সুস্নিগ্ধ সান্ধ্য ছায়ায় পীত ও স্নিগ্ধলোহিত প্রভৃতি বিবিধবর্ণে ফুটিয়া রহিয়াছিল; এক্ষণ সকলেই গগনবিলাসী পূর্ণচন্দ্রের প্রমোদ-প্রফুল্ল শীতল জ্যোৎস্নায় যেন শতগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া হাসির বাজার মিলাইল। স্বর্ণকান্তি চম্পক জ্যোৎস্নায় সুবর্ণকান্তিতে সোহাগে ফুলিয়া আত্মবিস্মৃত; আর, শ্বেত ও লোহিত কাঞ্চন সৌরভ-শূন্য হইলেও, আপনার জ্যোৎস্নাশীতল জীবমোহন রূপে বিমোহিত। মনোহারিণী মাধবী শ্যামসুন্দরের শ্যামকান্তিতে অঙ্গ আবরিয়া, এখানে ওখানে লতা গুল্মের আঁধারে আঁধারে ঈষৎ স্ফুটিত। আর, উচ্চতরুর উচ্চ শীর্ষ-শোভি কৃষ্ণচূড়া বসন্ত সমাগমের সুরম্য ও সুরঞ্জিত লোহিত পতাকার ন্যায় পরিশোভিত।

ফলতঃ, সে বাসন্তী পূর্ণিমার বিনোদ-মাধুরীতে, কিবা বনে, কিবা বাগানে, জ্যোৎস্নার এক বিচিত্র খেলা হইতে লাগিল, এবং মানুষের প্রাণ ত দূরের কথা, বনের বিহঙ্গেরাও সে ঔদাস্যময় মাধুরীতে উন্মাদিত হইয়া সময়ে সময়ে কল কল শব্দে জগন্ময়-রূপের স্তুতিগীত গাইতে প্রবৃত্ত হইল। শ্যামল তরুরাজি, স্নিগ্ধশ্যামলা লতাবলি, ঠিক্ যেন তরল সোনায় স্নাত হইয়া, অথবা গায়ে দ্রবীভূত তবক জড়াইয়া, চিরপরিচিত বস্তু হইলেও, কেমন এক অপরিচিত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভা পাইল। চাঁদের জ্যোৎস্না, তরু লতার পাতায় পাতায়, লতার বিতানে এবং ঘনবদ্ধ ও গাঢ়জড়িত লতাগুল্মের ফাঁকে ফাঁকে আঁধারমাখা আলোক অথবা আলোক-মাখা আঁধারের মত প্রতিভাত হইয়া হর্ষ ও বিষাদের মিশ্রিত মূর্ত্তির সামান্য একটুকু প্রতিকৃতি দেখাইল। বসন্তচন্দ্রের সে বিলোল জ্যোৎস্না অবিরাম-বাহিনী তরঙ্গিণীর মৃদুল তরঙ্গমালা লইয়া কিরূপ ভাবের খেলা খেলিতে লাগিল, তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না। পাঠক, তুমি কখনও পদ্মার বিশাল-বক্ষে পূর্ণচন্দ্রের প্রমোদ-লীলা প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে, তোমার ঐ প্রীতি-শীতল প্রসন্ন চক্ষু দু'টি এখনও প্রকৃতির অনন্ত লীলাময় অনন্ত সৌন্দর্য্যের একটা প্রধান ভাগ প্রত্যক্ষ করে নাই। পদ্মা জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর অনতিস্ফুট আলোকে একটা সমুদ্রের মত পরিলক্ষিত হইতেছে। আর উহার প্রখর স্রোত ঠিক যেন জ্যোৎস্নার স্রোতের মত কল-কল কুলু-কুলু ধ্বনিতে বহিয়া যাইতেছে। ঢেউ গুলিও ঠিক যেন জ্যোৎস্নারই ঢেউয়ের মত এক একবার হা হাঃ শব্দে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, আবার আপনাকে আপনি সংবরিয়া লইয়া পিছনে সরিয়া যাইতেছে। হা কি বিচিত্র দৃশ্য! যে একবার তাহা নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কি আর তাহা ভুলিতে পারিয়াছে? আকাশে এক চন্দ্র, পদ্মার জলে অযুত কোটি ফুল্ল চন্দ্র। উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, যে দিকে চাও, সে দিকেই চন্দ্রের লীলা—চন্দ্রের খেলা।

আমি আমার এ পাপ নয়নে একদিন

পদ্মার জলে এইরূপের এই অনুপম চিত্র চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছি। পদ্মার তটে স্থানে স্থানে ছায়াশীতল বৃক্ষসঙ্কুল গ্রাম ও জনপদ আছে। আমি একদিন ঐরূপ একটি গ্রামের প্রান্তে বসিয়া পদ্মার জলে বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখিতেছি, আর সে জ্যোৎস্নার সমুদ্র দেখিতে দেখিতে কেমন একপ্রকার ভয়, বিস্ময় ও বিষাদময় আনন্দে ডুবিয়া যাইতেছি। আমার একদিকে গ্রামের অসংখ্য জ্যোৎস্নাধৌত বৃক্ষ লতা, আর এক দিকে পদ্মার সে জ্যোৎস্নাবিলাসী বিশালবক্ষ, দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, ভক্ত ভাবুকেরা যে রূপ-সাগরের কথা কহিয়া থাকেন, এই কি সেই রূপসাগর? যে রূপ এই নিখিল জগতের সমস্ত বস্তুতেই তিলে তিলে বিতরিত এবং প্রেমের নেত্রে পরিলক্ষিত হইয়া মনুষ্যের প্রাণে কোথাও স্নেহ, কোথাও দয়া, কোথাও শক্তি, কোথাও সহানুভূতি এবং কোথাও প্রীতি, কোথাও বা ভক্তির উদ্বোধন করিতেছে, সেই জগদ্ব্যাপি রূপরাশিই কি দ্রবীভূত হইয়া এখানে সাগরে পরিণত? তবে আমি আর অপেক্ষা করিতেছি কেন? আমি কেন এই রূপের সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আমার এই অনুতাপ-দগ্ধ দেহ প্রাণকে জন্মের মত না শীতল করি? এই যে আমি ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ও লালসা প্রভৃতি দুর্দ্দার বৃত্তির অন্তর্দ্দাহে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছি, আমি কেন একবার এই রূপসাগরের স্বাদু শীতল জ্যোৎস্নাময় জল অঞ্জলি পূরিয়া পান না করি? কেন এই রূপসাগরে স্নান করিয়া না আমার অঙ্গ জুড়াই? প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তেরা যাঁহাকে অনলে, অনিলে এবং জলে স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আজি এই পূর্ণিমার পদ্মা কি তাঁহারই প্রেমময় রূপের সমুদ্র সদৃশ শোভিত হইয়া আমায় আকর্ষণ করিতেছে না?

পদ্মার তটে, নীরব নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে এইরূপ বসিয়া দেখিতে দেখিতে রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। বাসন্তী পূর্ণিমা ভগবৎপিপাসু ভক্তদিগের চিরপ্রার্থিত পুণ্যরাত্র। গ্রামে ভক্তির উৎসবস্বরূপ কীর্ত্তন হইতেছিল। সে দূরশ্রুত কীর্ত্তনের একটি মধুর পদ তখন সহসা আমার কানে পশিয়া প্রাণে যেন মিশিয়া গেল। শুনিলাম,—"জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে সে গৌর হয়েছে।" এই ললিত মধুর কথা কয়টি আমার প্রাণটাকে কিরূপ আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিল, তাহা এ জীবনে কখনও আর ভুলিতে পারিব না। তখন আপনি আপনাকে ক্ষণকালের তরে ভুলিয়া গেলাম। শরীরে রোগ ছিল এবং অন্তরে শোক, দুঃখ ও তপ্ত তাপের মর্ম্মদাহী দাহ ও জ্বালা ছিল, সমস্তই বিস্মৃত হইলাম। তখন কল্পনার চক্ষে ক্ষণকালের তরে ঠিক্ যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলাম,—গঙ্গার তটে, নবদ্বীপের ঘাটে, লক্ষ লোক মৃদঙ্গ মন্দিরার মধুর ধ্বনির সহিত উন্মত্ত ও আত্মহারার মত নাচিয়া নাচিয়া, হরিনাম গাইয়া, দলে দলে চলিয়া যাইতেছে; এবং সেই লক্ষ লোকের মধ্যস্থলে কার জানি কেমন একখানি মোহনমূর্ত্তি,

ঘনীভূত জ্যোৎস্না অথবা স্থির বিজলীর মত বিরাজিত রহিয়া, সকলের প্রাণে আপনার সে রূপের তরঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে। চকোর যেমন, জ্যোৎস্না রাত্রিতে, আকাশে উড়িয়া উড়িয়া, চন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করে, চারি শত বৎসরের কিছু অধিক হইল, এই বঙ্গের বহুকোটি হৃদয় সেই প্রকার সে রূপের জ্যোৎস্না পান করিয়া প্রাণে শীতল হইয়াছিল। সেই অপ্রমিত রূপ ও রূপ-নিহিত অপরূপ চিত্ত ও চরিত্রের প্রভাবে বঙ্গে যে প্রেম ভক্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আজও ক্ষীণ-তোয়া নদীর ন্যায় অল্প অল্প বহিতেছে; এবং সরযূ ও যমুনার জলধারা যেমন গঙ্গার জলে আসিয়া মিশিয়াছে;—সরযূর শোকের ইতিহাস ও যমুনার প্রেমের উচ্ছ্বাসও, প্রেমভক্তির পবিত্র, মধুর বিচিত্র কল্পনায়, নবদ্বীপ-বাহিনী নির্ম্মল গঙ্গার তরঙ্গবিলাসে মিলিয়া মিশিয়া, নবদ্বীপধামকে এক অভিনব মহিমা প্রদান করিয়াছে। চল পাঠক, আমরা সরযূ ও যমুনার তটে তটে, ভারতকীর্ত্তিত পুরাতন তীর্থে তীর্থে, ক্ষণকাল পরিভ্রমণ করিয়া, নূতন বঙ্গের এই নূতন তীর্থ দর্শনে নয়ন জুড়াই, এবং নবদ্বীপের ঘাটে, গঙ্গার তটে উপবিষ্ট হইয়া, জীবনের আশা ও বহুজীবনের সম্মিলনজনিত অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাসের গভীর রহস্য পাঠে যত্নপর হই।

—:*:—

উপক্রম।

আমরা পৃথিবীর যে অংশে বাস করি, পুরাতন শাস্ত্রে তাহার নাম ভারতভূমি, কিংবা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে তিনটি বিখ্যাত নদী আছে। তাহার একটির নাম সরযূ, আর একটির নাম যমুনা, এবং তৃতীয়টির নাম গঙ্গা। এই তিনটি নদীর নামের সহিত তিন যুগের ইতিহাসের কথা,—তিন যুগের তিনটি আশ্চর্য্য ও মধুর কাহিনী গাঁথা রহিয়াছে।

সরযূর তটে, প্রাচীনকালে, অযোধ্যা নামে একটি অতি বড়, অতি বিখ্যাত, অতি সুন্দর নগর ছিল। শ্রীরামচন্দ্র, সেই অযোধ্যা নগরে, দশরথের ঘরে, কৌশল্যার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পৃথিবী যত কাল রাম নাম লইবে,—মনুষ্য যত কাল রাম নাম লইয়া চক্ষের জল ফেলিবে, সরযূর নামও তত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের প্রাণে লেখা থাকিবে। যমুনা ও গঙ্গা শ্রীরামের সময়েও সুপরিচিত ছিল। যখন রাম, কৈকেয়ীর কোপে পড়িয়া, "প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ" ও পতিপরায়ণা সীতারে সঙ্গে লইয়া, পিতার বাক্য-পালন-কামনায়, অযোধ্যা ছাড়িয়া, বাকল পরিয়া, বনে চলিয়া যান, তখন তিনি গঙ্গা ও যমুনা এই উভয় নদীই নৌকায় পার হইয়া গিয়াছিলেন।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দুর প্রাণে পাঠ করিয়াছেন এবং বাল্মীকি ও ব্যাস, অথবা কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা বলিয়া দিতে হইবে না যে, সরযূ শোকের কাহিনী, যমুনা প্রেমের কাহিনী এবং অমল-সলিলা গঙ্গা, উহার সকল স্থলেই, ভক্তির কাহিনী। সরযূ ও যমুনা উভয়ই গঙ্গায় আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অযোধ্যা প্রদেশের সরযূর দীর্ঘ অতি কম। অযোধ্যা প্রদেশের বাহিরে উহার গতি নাই। যমুনা সরযূ অপেক্ষা দীর্ঘে অনেক বড়। যমুনার নাম [illegible]র আর এক নাম কালিন্দী[illegible]ক জানে। য[illegible]মে একটি পর্ব্বত আছে *। যমুনা সেই পর্ব্বতহইতে বাহির হইয়া, নানা দেশ ও নানা স্থানের মধ্য দিয়া, তরল তরঙ্গে বহিয়া বহিয়া, এলাহাবাদের অতি নিকটে, গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। কলিন্দ পর্ব্বতহইতে বাহির হইয়াছে বলিয়াই যমুনার আর এক নাম কালিন্দী। †

যমুনার জল কাল। গঙ্গার জল বৃষ্টির জলের ন্যায় নির্ম্মল। নীল রঙের কাঁচের গ্লাসে জল রাখিলে, সে জল যেমন নীল দেখায়, যমুনার জল প্রায় সেইরূপ নীল। নদী হইতে কলসে কিংবা অন্য কোনরূপ পাত্রে ভরিয়া, উপরে তুলিলে সেরূপ দেখায় না। কিন্তু নদীর দিকে চাহিলে, যমুনার জল সকল সময়েই ঈষৎ নীল-মিশ্রিত কাল বলিয়া বোধ হয়। এলাহাবাদের নিকটে, যে স্থানে যমুনার নীল জল-ধারা গঙ্গার শাদা জলে আসিয়া মিশিয়াছে; সেই স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মনে বড় আনন্দ হয়। তখন মনে লয় যে, যেন একটি শ্যাম-শোভা-সুন্দরী যুবতী তাহার শ্বেতাঙ্গী জ্যেষ্ঠা [illegible] আলিঙ্গন করিয়াছে; এবং দুই ভগিনী, গলায় গলায় মিলিয়া, কল-কল স্বরে কি মধুর গীত গাইতেছে। সে মধুর গীত, পুরাতন স্মৃতির প্রাণস্পর্শী মহিমায়, ভগবানের স্তুতিগীত! আর, যে স্থানে লোকে দিবারাত্রি গঙ্গা-যমুনার সেই সমস্বর-সুখ-সংগীত শুনিতে পায়, তাহার নাম প্রয়াগ। প্রয়াগ হিন্দু-দিগের অতি পবিত্র তীর্থ। প্রাচীন ও পৌরাণিক হিন্দুরা, পাপ-ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, প্রয়াগে যাইয়া মাথা মুড়াইয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন,—

“প্রয়াগে মুড়া’য়ে মাথা,—
মর্ গিয়া পাপী যথা তথা।”

যাঁহাদিগের বয়স কম, তাঁহারা প্রয়াগে যাইয়া, মাথা না মুড়াইলেও, সেখানে যমুনার সেই কাল জল দেখিয়া, এবং গঙ্গাযমুনার কল কল রব কানে শুনিয়া, প্রীতি ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইয়া, কৃতার্থ হন।

* কেদারনাথ কিংবা যমোত্রি এই কলিন্দ পর্ব্বতেরই নামান্তর কি না, পাঠক তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

† কালিন্দী যমুনা ছাড়া, মধ্য ভারতে কালিন্দী নামে আর একটি নদী আছে। কিন্তু যমুনাই পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য নাটকে কালিন্দী নামে সমধিক পরিচিত।

কেহ যদি, প্রয়াগের ঘাটে নৌকায় উঠিয়া, যমুনা উজাইয়া, ক্রমে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাইতে থাকে, তাহা হইলে সে, প্রায় এক মাসে, অনায়াসে, মথুরায় পঁহুচে। মথুরা অতি পুরাতন নগর। উহা কত কালের পুরাতন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু, মথুরা এখনও, নূতন সংস্থাপিত নগরের ন্যায়, যমুনার পশ্চিম পার আলোকময় করিয়া শোভা পাইতেছে। মথুরা হইতে অল্প কিছু পথ হাঁটিয়া গেলেই, বৃন্দাবন। যমুনার যে পারে মথুরা, সেই পারেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের অপর পারে একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম গোকুল অথবা নন্দগ্রাম। গোকুল ও বৃন্দাবন এই উভয় স্থানই শাস্ত্রে ব্রজধাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। *

যমুনার পারে অনেক প্রসিদ্ধ স্থান আছে। যমুনার পারে আগ্‌রা। এই নগরে একটি মুসলমান রাজমহিষীর শিলাময় সমাধিমন্দির আছে। মন্দিরটির নাম তাজমহাল। উহা এমন সুন্দর, এমন মনোহর যে, এখনও পৃথিবীর নানা দেশের লোক উহার শোভা দেখিবার জন্য আগ্‌রায় যাইয়া থাকেন। যমুনার পারে দিল্লী। লোকে বলে দিল্লীর পুরাতন নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, এবং এখানে ইন্দ্রতুল্য পাণ্ডবদিগের প্রথম রাজধানী ছিল। একথা ঠিক কি না, তাহা বলিতে পারি না। † দিল্লী ইদানীং, ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের পুরাতন রাজধানী বলিয়াই পরিচিত। দিল্লীর সৌন্দর্য্য এখনও একবারে বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু, যমুনার নাম লইলে, হিন্দুর প্রাণ যে উথলিয়া উঠে,—যমুনার কাল জল দেখিলে ভাবুক ও প্রেমিক হিন্দুর চক্ষে যে অমনি জল-ধারা বহে, তাহা আগ্‌রা কিংবা দিল্লীর কথা মনে করিয়া নহে। তাহা মথুরা ও বৃন্দাবনের কথা মনে করিয়া। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান এবং বৃন্দাবন তাঁহার প্রেমময় লীলার স্থান। শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুমাত্রেরই প্রাণের পুতুল ও প্রাণারাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শৈশবের সখাদিগকে লইয়া, যমুনার জলে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেন। অনেক প্রেমিক কবি, যমুনার কাল জল দেখিয়া, এখনও এইরূপ মনে ভাবেন যে, যেন উহা কৃষ্ণের সেই কাল রূপের আভা পাইয়া কাল হইয়া রহিয়াছে; এবং উহার জলে এখনও সেই ভুবনমোহন রূপের ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ভারতীয় ভক্তি ধর্ম্মের অনেক কথাই কৃষ্ণকথা। শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সের মধু-

* বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থেও এইরূপই দৃষ্ট হয়।

† আমরা ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষ চক্ষে দেখিয়াছি। যাহারা দেখায় তাহারা ঐ স্থানকে ইন্দর্ পত্ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কতকগুলি অতি পুরাতন বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্ন স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে। এবং দর্শকেরা তাহার কোনটিকে অদ্যাপি যুধিষ্ঠির-ভবন অথবা ভীম-ভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। সম্ভবতঃ ঐ স্থানে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

মাথা লীলা ও খেলার সহিতই প্রচলিত ভক্তি ধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক। সুতরাং এস্থলে মথুরা ও বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত দুই একটি কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

মথুরায় এক রাজা ছিল, তাহার নাম কংস। কংসের মত নিষ্ঠুর ও নৃশংস পৃথিবীতে আর একটি ছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী* সেই দুর্বৃত্ত দুরাত্মা কংসাসুরের কনিষ্ঠা ভগিনী। কংস, তাহার পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে বান্ধিয়া রাখিয়া, তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিল। সে তাহার ভগিনী দেবকীরেও কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কংস এইরূপ দৈব-বাণী শুনিয়াছিল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভে যিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহার হাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে।

কংস, ঘোরতর লোক-পীড়ক হইয়াও, মৃত্যুভয়ে সর্ব্বদা বিহ্বল রহিত, এবং দেবকী কোন সন্তান প্রসব করিলে, সেই দুধের শিশুকে, তখনই মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া নিয়া, পাষাণে আছাড়িয়া, মারিয়া ফেলিত। সে এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবকীর সাতটি শিশুরে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু যিনি, অবশেষে দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া, রূপের ছটায় ও নানাবিধ পূজনীয় গুণে ভুবন ভুলাইয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থলেই পূজা পাইয়াছিলেন, কংস সেই অতুল-কীর্ত্তি আনন্দময় কৃষ্ণের পায়ের একটি নখও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণ, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে, এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তখন রাত্রি অতি গভীর। আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন। চারিদিকে মুষল-ধারায় বৃষ্টি। জীব জন্তু সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। যে সকল অস্ত্রধারী পুরুষ, কংসের শাসনে, কারাগারে, দেবকীর বাসগৃহের দুয়ারে দুয়ারে, পাহারায় ছিল, তাহারাও নিদ্রায় অচেতন। বসুদেব, সেই সুযোগ দেখিয়া, বুকে সাহস বান্ধিয়া, সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া, ঘরের বাহির হইলেন,—এবং জগদীশ্বরের কৃপায়, যমুনা পার হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে, গোপকুলের অধিপতি নন্দঘোষের আলয়ে, তদীয় স্ত্রী যশোদার কোলে রাখিয়া, চলিয়া আসিলেন। এই হইতেই শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে, এবং নবীন বয়সের প্রথম বিকাশ হইতেই বিলাস লীলাময় বৃন্দাবনে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন যেমন বিচিত্র লীলাময়, তাঁহার নামও তেমন অসংখ্য। ঋষিরা দেবাদিদেব বিষ্ণুকে "শ্রীহরি-নারায়ণ-মাধব-মধুসূদন" প্রভৃতি * যে সকল নামে পূজা

* দেবকী ও দৈবকী এই উভয় নামই প্রচলিত।

* বিষ্ণুর কএকটি নাম।
শ্রীহরি-শ্রীশ-শ্রীকান্ত-পদ্মনাভ-জনার্দ্দন,
শ্রীধর-শ্রীহৃষীকেশ-মাধব-মধুসূদন।
মুরারি-কমলাকান্ত-মধুকৈটভনাশন,
মুকুন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ-পদ্মপলাসলোচন।

করেন, শ্রীকৃষ্ণও হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্রই সেই সকল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, মথুরা গোকুল ও বৃন্দাবনের লীলা সম্পর্কেও তাঁহার কতকগুলি নাম আছে। যথা,—তিনি মথুরায় জন্মিয়াছিলেন,—মথুরায় কংসকে বিনাশ করিয়া বহু লোককে সুখী করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার নাম মথুরানাথ কিংবা মথুরামোহন। তিনি যদুকুলে জন্মিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার নাম যদুপতি। বসুদেব তাঁহার পিতা এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বাসুদেব *। ব্রজে নন্দ যশোদা তাঁহার লালন পালন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ব্রজকিশোর, নন্দলাল, ও যশোদাকুমার। তিনি গোকুলে গোপবেশে, গোরু চরাইতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম গোপাল†। তিনি বৃন্দাবনে একটি বটতরুর ছায়ায় বসিয়া, বাঁশী বাজাইতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বংশীধর। তাঁহার মাথায় বড় কমনীয় কেশ-রাশি ছিল, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম কেশব। তিনি মাথায় মোহন চূড়া বাঁধিয়া, গলায় বনমালা পরিয়া, তাঁহার রূপের ছটায় মদনেরও মোহ জন্মাইতেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম বনমালী ও মদনমোহন।

*বাসুদেব নামের আর এক অর্থ বিশ্বের আশ্রয় অথবা বিশ্বময়।

† শ্রীকৃষ্ণের এই গোপাল-গোবিন্দ নাম, কিবা ভক্ত, কিবা ঐতিহাসিক পণ্ডিত, উভয়ের নিকটই সমান গৌরবান্বিত সমান মধুর। যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুশিক্ষিত, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, গোহত্যা এদেশে পূর্ব্বকালে তেমন ভয়ঙ্কর পাতক বলিয়া পরিগণিত ছিল না। গৃহে কোন সম্ভ্রান্ত অতিথি সমাগত হইলে, সাধুহৃদয় ঋষিতাপসেরা তাঁহার সম্মানার্থ সময়ে সময়ে গোহত্যা করিতেন। বাল্মীকি হেন, দয়াধর্ম্মপরায়ণ দেব-পুরুষও সমাগত বশিষ্ঠের সম্মানার্থ তদীয় আশ্রমে গোহত্যার ব্যবস্থা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একথা রামায়ণে না থাকিলেও, মহাকবি ও মহাপণ্ডিত ভবভূতির উত্তর চরিতে বর্ণিত আছে। অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক মহামুনি পাণিনি রীতিমত সূত্র করিয়া গিয়াছেন, "গোঘ্নঃ সম্প্রদানে" অর্থাৎ অতিথির নাম গোঘ্ন কেন না তাঁহার সন্তর্পণের জন্য গোহত্যা আবশ্যক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সময় হইতে গোহত্যা আর ব্রহ্মহত্যা সমান পাতক এবং গাভীর নাম দুগ্ধদা মাতা। বোধ হয়, এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নমস্কার শ্লোকে তৎকাল প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা "গোব্রাহ্মণহিতায়চ" বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। তাঁহার পার্থিব লীলার প্রথম অনুষ্ঠানই যে গোজাতির মঙ্গল জনক, তাহা আরও বহু প্রকারে অনুমিত হইতে পারে। তিনি যেখানে শিশুকালে লালিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম 'গোকুল।' তিনি যে স্থানে শৈশবে খেলা করিতেন, তাহার নাম 'গোবর্দ্ধন।' যাহারা খেলার সঙ্গী, তাহারা গোপ, গোপী অথবা গোপাল। এতগুলি ভাব ও বিষয়ের এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ খুব আশ্চর্য্য বোধ হয় না কি?

কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ যে নামে ভক্ত বৈষ্ণবের প্রাণ-প্রিয়, বৈষ্ণবের জীবন-সর্ব্বস্ব, সে নাম রাধাকান্ত, রাধানাথ, রাধাবল্লভ, রাধামাধব অথবা রাধারমণ। তাঁহার এই রাধাকান্ত প্রভৃতি নামের নিগূঢ় মর্ম্ম না বুঝিলে, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম ও লীলার মর্ম্ম বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ভারতভূমিতে রাধাকান্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন কেন? কিবা ভাব-গ্রাহী, কিবা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণির বৈষ্ণবেরাই, কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিবার সময়ে, জয় রাধে কৃষ্ণ বলিয়া, আগে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈষ্ণব-তত্ত্বের প্রথম প্রচারক বিখ্যাতনামা আচার্য্য গোস্বামীরা গৌরাঙ্গ-দেবের উপদেশ অনুসারে, বহু গ্রন্থে, বহু কথা লিখিয়াছেন। আমি অতি সংক্ষেপে তাঁহা-দিগের কথার অর্থ বুঝাইতে যত্ন পাইব। তাঁহাদিগের কথায় আসিবার পূর্ব্বে, জগ-দীশ্বরের ঐশ্বর্য্যাদি ভাব সম্পর্কে, এ স্থলে অন্য প্রকারের কএকটি কথাও বলিয়া লইতে হইবে। সে সকল কথা ঈশ্বর-পরায়ণ মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ের কথা। সুতরাং, ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক ক্ষণকাল একটুকু সহিষ্ণু হইবেন।

প্রথম, জগদীশ্বরের ব্রহ্মভাব। আমরা যখন বড় বড় গাছ, পাথর, বন ও নদী, অথবা আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র-নিচয়ের প্রতি মনোযোগের সহিত দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদিগের কি মনে লয়? মনে এই কথাই সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হয় যে, যিনি এই নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতে তাঁহার মত বড় আর নাই। পৃথিবীতে সমুদ্রের মত বড় আর কি হইতে পারে? কেহ উহার পার দেখে না, তল পায় না। যে দিকে চাও, সেই দিকেই সেই এক কেমন ধূ ধূ অপার পারাবার। সমুদ্র কখনও সাঁ সাঁ করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, কখনও বড় বড় ঢেউ তুলিয়া, ঢেউর উপর ঢেউ খেলাইয়া, উথলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে। সমুদ্র দেখিলে কাহার মনে না ভয় ও বিস্ময় জন্মে? এই ভয় ও বিস্ময়ের সঙ্গে জগদীশ্বরের প্রতিও একটুকু ভক্তি হয়। তখন মনে লয় যে, জগদীশ্বর সেই সমুদ্র হইতেও না জানি কত বড়। বস্তুতঃ, পৃথিবীতে যত গুলি সমুদ্র আছে, তাহার সকল গুলিরে যদি একত্র মিশাইয়া একটা করিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে সেই একীভূত মহাসমুদ্রও জগদীশ্বরের হাতে এক ফোঁটা জলের সমান হইত না।

এইরূপ আবার পর্ব্বত। পৃথিবীতে এক দুই করিয়া বড় ছোট কত পর্ব্বত আছে। যাঁহাদিগের সময় কিংবা সুযোগ আছে, তাঁহারা পর্ব্বত দেখিবার জন্য, কত আগ্রহের সহিত, হিমালয় কিংবা বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বত-প্রদেশে গমন করেন। অপিচ, পর্ব্বত দেখিয়া তাঁহারা কতই না বিস্মিত হন। তাঁহারা প্রথমে ইহাই মনে করেন যে, জগতে কিছুই পর্ব্বতের মত বড় নহে। কিন্তু তাঁহারা যখন পর্ব্বতের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে, ধীরে ধীরে, পর্ব্বতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহা-

দিগের মনে ইহা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় যে, জগদীশ্বর পর্ব্বত হইতেও বড়। ফলতঃ, এই পৃথিবীতে যত গুলি পর্ব্বত আছে, তাহার সমস্তটিরে যদি, কল্পনার সাহায্যে একস্থানে একটা পিণ্ডের মত করিয়া লওয়া যায়, সেই একীভূত পর্ব্বত-পিণ্ডও জগদী-শ্বরের পাদপদ্মে একটি রেণুর সমান হইতে পারে না। কেন না জগদীশ্বর জগৎ হইতে অনেক বড়। তিনি এত বড় যে, কেহ তাঁহাকে চিত্তে চিন্তা করিতে পারে না। তাঁহার এই ভাবের নাম ব্রহ্ম ভাব; এই মূর্ত্তির নাম বিরাট্ মূর্ত্তি। যত চিন্তা কর, ততই বড়। যেন কত সমুদ্র, কত পর্ব্বত, কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, তাহার বিরাট্ মূর্ত্তিতে শোভা পাইতেছে। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ অথবা বড়। জগদীশ্বরের মত বড় আর নাই। এই নিমিত্ত, তাঁহাকে মনুষ্য পর-ব্রহ্ম জ্ঞানে ভজনা করে।

তিনি যেমন বড়, তেমন শক্তিমান্। কারণ, তিনি বড় হইয়াও নিষ্ক্রিয় কিংবা নিশ্চল নহেন *। এই জগতে কত প্রকারে তাঁহার শক্তির কার্য্য প্রকাশিত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখ। আগুন ধগ ধগ করিয়া জ্বলিতেছে। তৃণ, লতা, কাঠ, পাথর, সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, যাহা কিছু নিকটে পাইতেছে, আগুন তাহা পুড়িয়া ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে। আগুনের জ্বলন্ত জিহ্বা দেখিলে, জীব মাত্রের চিত্তে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে। বড় বড় বাড়ি, ঘর, গ্রাম, নগর, বন, উদ্যান আগুনের জিহ্বায় পড়িয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে ছাই হইয়া যাইতেছে। আগুনের এই ভয়ঙ্কর শক্তি কোথা হইতে হইল? উত্তর, জগদীশ্বরের শক্তিতেই আগুনের শক্তি। কেন না, জগ-দীশ্বর আগুনের মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান না থাকিলে, আগুন তখনই একবারে নিবিয়া যায়। *

মনুষ্য তৃষ্ণার সময়ে জল জল করিয়া কতই আকুল হয়। তখন এক ফোঁটা জল না হইলে সে প্রাণে বাঁচে না। কিন্তু, জল যখন সমুদ্রের তট-ভূমি ডিঙ্গাইয়া, শত সহস্র বজ্রের মত গর্জ্জন করিয়া, বন্যার স্রোতে উপরে উঠে, এবং দেশ, গাঁ, মানুষ, গোরু, সমস্ত ভাসাইয়া নেয়, তখন মনুষ্য জলের শক্তি অনুভব করে। জলের এই ভয়াবহ শক্তিও জগদীশ্বরের। কেন না, জগদীশ্বর যদি শক্তিরূপে জলের মধ্যে † অধিষ্ঠিত না রহেন, তাহা হইলে জল তখনই শুকাইয়া যায় ও লয় পায়।

তিনি বায়ুর শক্তিতেও এইরূপে অধি-ষ্ঠিত। লোকে সর্ব্বদা তাহা বুঝে না, বুঝিলেও, সে কথা সর্ব্বদা মনে ভাবে না।

---

* যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

অর্থাৎ ঈশ্বর সমস্ত ভূতে শক্তিরূপে বর্ত্তমান।

* "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎতপতি সূর্য্যঃ।"

† "যোদেবোগ্নৌ যোপ্সু যো বিশ্বভুবনমা-বিবেশ।"

বসন্তের ঝুর ঝুর মৃদুমধুর বায়ু সেবনের সময় সে কথা কাহারও চিত্তে আইসে না। কিন্তু বায়ু যখন তুফান কিংবা তূর্ণডের * প্রচণ্ডবেগে বাড়ি, ঘর উড়াইয়া নেয়, বড় বড় গাছের মাথা কিংবা ডাল ভাঙ্গে, অথবা শিকড় সমেত গাছ উপাড়িয়া ফেলে, তখন শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই, হা জগদীশ্বর বলিয়া, হাত যোড় করিয়া, ডাকিতে থাকে। তখন মনে লয়, জগদীশ্বরের কি অনন্ত শক্তি! তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন! জগদীশ্বরের মত বড় আর নাই, এ কথা মনে করিলে আমরা তাঁহাকে † পর ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করি। তাঁহার শক্তিতেই জগতের সমস্ত কার্য্য হইতেছে, ইহা মনে করিলে সেইরূপ আবার আমরা তাঁহাকে অনন্তশক্তিময় জগদীশ্বর বলিয়া একটুকু ধারণা করিতে পারি। এই ভাবের নাম তাঁহার ঐশ্বর্য্য। মনুষ্য যখন জগদীশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ‡ চিন্তা করে, তখন তাঁহার ভাবেই মনুষ্যের মন ও প্রাণ ডুবিয়া যায়। এ জগতের কোথায় না তিনি? এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা কোথায়? তিনি যেমন ভাঙ্গিতেছেন, তেমন গড়িতেছেন। তাঁহার ইচ্ছায় নূতন সৃষ্টি পুরাতন হইতেছে; পুরাতন সৃষ্টি, আজি লয় পাইয়া, কাল আবার তাঁহার শক্তিতে অন্য কোন স্থানে নূতন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার এই ঐশ্বর্য্যের ভাব কখনও ভয়ানক, কখনও বিস্ময়াবহ, কখনও বা ভক্তির উদ্দীপক।

ঐশ্বর্য্যের উপরে জগদীশ্বরের আর একটি ভাব আছে, তাহার নাম বাৎসল্য। তিনি এই ভাবে বিশ্বের সমস্ত জীবের পিতা, মাতা, অন্নদাতা, সুখবিধাতা, প্রতিপালনকর্ত্তা। জীব যখন জননীর জঠরে স্থান লয়, তখন জীবন রক্ষা কি কঠিন। কিন্তু, জগদীশ্বরই তখন জননীর ভাবে, তাহাকে আহার যোগাইয়া পালন করেন। আবার, উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেই, তিনি জননীর স্তনযুগল দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া প্রসূত শিশুর প্রাণ রক্ষার উপায় করিয়া দেন। শিশু যখন মা বলিয়া ডাকিতে পারে না, তখনও মায়ের মত তিনিই সতত তাহার কাছে কাছে থাকেন।

জগদীশ্বরের এই দয়া, এই বাৎসল্য জগতের সমস্ত জীবের প্রতিই সমান। পিপীলিকার হাট দেখিয়াছ কি? উহারা শীতকালে কার্য্য করিতে পারিবে না বলিয়া, গ্রীষ্মকালে কত পরিশ্রমের সহিত আহারের বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা দেখিয়াছ

* যে উড্ডীন হইয়া তূর্ণ চলিয়া যায় অথবা অতিতূর্ণ উড়িয়া যায়, অর্থাৎ Tornado.

† "বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্,

‡ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।"

এই কথা গুলি, কাশীর সন্ন্যাসীদিগের সহিত বিচারে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল বলিয়া, কবিরাজগোস্বামী কর্ত্তৃক চরিতামৃত গ্রন্থে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত উদ্ধৃত ও উল্লিখিত হইয়াছে।

কি? পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় পাহাড়ের মত যত জীব জন্তু এই জগতে বাস করিতেছে, সকলেই জগদীশ্বরের পোষ্য। অনন্ত কোটি জীব অহোরাত্র তাঁহার ভাণ্ডার লুটিয়া খাইতেছে। ভাণ্ডার ফুরায় না। কেন না, জগদীশ্বরের শক্তি যেমন অনন্ত, তাঁহার স্নেহ, তাঁহার দয়া, তাঁহার বাৎসল্যও তেমন অনন্ত। তাঁহার এই বাৎসল্য ভাব চিন্তা করিয়াই মনুষ্য তাঁহাকে ভক্তবৎসল, বিপদ্‌ভঞ্জন এবং দীনবন্ধু হরি, অথবা দয়াময় পিতা, প্রাণদাতা, কিংবা করুণাময়ী মাতা * বলিয়া ডাকিয়া থাকে। তিনি তাঁহার ব্রহ্মভাবে কিংবা ঐশ্বর্য্যের ভাবে মনুষ্যের চক্ষে যেমন দূরস্থ, এই বাৎসল্যের ভাবে তেমন আবার যার পর নাই নিকটস্থ।

জগদীশ্বরের চতুর্থ ভাবের নাম সৌন্দর্য্য। এই ভাবে তিনি ভুবন-মোহন। আকাশের চাঁদ, যখন মেঘের আড়ে আধো লুকাইয়া, ধীরে ধীরে ফুটিতে থাকে, তখন আমাদিগের প্রাণ চকোরের মত ঐ চাঁদের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়। লতাটি, যখন ফুলের আভরণে অলঙ্কৃত হইয়া, তরুর গায়ে হেলিয়া পড়ে, আমরা তখন তরুলতার সেই যুগল-শোভা দেখিয়া মোহিত হই। যদি কেহ ভক্তির চক্ষু লইয়া অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে যে, জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের আভা জগতের সকল স্থলেই এইরূপ বিলসিত রহিয়াছে;—এবং উহা কোথাও ফুলের হাসিতে হাসিতেছে, কোথাও বা ফোয়ারার জলের মত উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। আমরা বজ্রের কড় কড় শব্দ শুনিয়া ভয়ে কানে হাত দি। কিন্তু, বজ্রনাদের পূর্ব্বে, আকাশের নীল কলেবর যখন বিদ্যুতের

* জগদীশ্বরকে পিতা ও মাতা জ্ঞানে পূজা করাই শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এবং এই ভাবে জগদীশ্বরকে আরাধনা করা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও অনুমোদিত। ফলতঃ, ভগবানের বাৎসল্য ভাবের কাছে শাক্ত ও বৈষ্ণব এক পথের পথিক। তথাহি ভগবদ্‌গীতায়াম্,—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" অর্থাৎ, আমি জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ।

প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থেও এই তত্ত্বের বিশিষ্ট পোষকতা দৃষ্ট হয়। যথা—

"যা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী,
নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী,
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসামাশ্রয়ো মাধবঃ।"

অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্মস্বরূপা, অথবা ব্রহ্মময়ী, যিনি মূল প্রকৃতি, যিনি ঈশ্বরী, যিনি নারায়ণী বলিয়া বিখ্যাতা, যিনি সনাতনী বিষ্ণুমায়া,—যিনি মহালক্ষ্মীরূপিণী, যিনি বেদমাতা সরস্বতী, যিনি রাধা, যিনি বসুন্ধরা, যিনি গঙ্গা, তাঁহারই নাম মা; এবং যিনি জগতের পিতা, তাঁহার নাম মাধব। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে যিনি মহাশক্তি বলিয়া পূজিত, তিনিও নারায়ণী নামেই সে স্থলে অভিহিত হইয়াছেন।

নয়ন-বিনোদিনী কনক-কান্তিতে উদ্ভাসিত হয়, সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আমাদিগের প্রাণে কেমন লাগে! যাঁহারা ভক্তির সাধনায় একটুকু অগ্রসর, তাঁহারা ছোট ও বড় সমস্ত সুন্দর বস্তুর মধ্যেই জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্য অনুভব করেন, এবং তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, আহা কি সুন্দর, * আহা কি মনোহর বলিয়া, তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়েন। মনুষ্যের হৃদয় যখন জগদীশ্বরের অতুল সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহাকে একটুকু ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখনই ভক্তির সঙ্গে একটু একটু প্রেম জন্মে। ঐরূপ প্রেম-মিশ্রিত ভক্তিরই আর এক নাম প্রেম-ভক্তি।

এই জগন্ময় সৌন্দর্য্যের উপরে ভগবান্ জগদীশ্বরের আর একটি ভাব আছে, তাহার নাম মাধুর্য্য। এই ভাবে তিনি মধুর। যখন বসন্তের সমীরণ, ফুলের মধুতে মধুর হইয়া, মৃদু মৃদু বহিয়া, শরীরে লাগে, তখন আগে শরীর জুড়ায়, তাহার পর হৃদয় শিহরিয়া উঠে। কিন্তু, বসন্ত সমীরণ, যাঁহার মাধুর্য্যের কণা মাত্র বহন করিতেছে, তাঁহার সুখ-শীতল শ্রীচরণের ছায়া স্পর্শ করিতে পাইলেই জীবের তাপিত দেহ ও তাপিত প্রাণ এক সঙ্গে শীতল হয়। কেন না, তিনি মাধুর্য্যের অনন্ত সমুদ্র। বনের পাখী, প্রভাত সময়ে, পূর্ব্বদিকের গগনে, উষার তরল কান্তি দেখিয়া, যখন কল কল স্বরে মধুর গীত গাইতে থাকে, তখন সেই গীতের মাধুরীর মধ্যে তাঁহারই রস-মাধুর্য্য অনুভূত হয়। আবার, মনুষ্য যখন, শরীর ও মনে নিষ্পাপ হইয়া, প্রেমের আনন্দে বিভোর হয়, তখন মনুষ্য-হৃদয়ের সেই নির্ম্মল প্রেমের মধ্যেও তাঁহারই প্রেম-মাধুর্য্য খেলা করে। তাঁহার সৌন্দর্য্য যেমন জগন্ময়, তাঁহার মাধুর্য্যও তেমন জগন্ময়। লতায়, পাতায়, ফুলে, ফলে, শীতল জলে, সুপেয় দুগ্ধে, নর নারীর ভালবাসায়, নর নারীর সঙ্গীতে, মুরলী ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রের মধুর নিঃস্বনে, নদ নদীর কুলু কুলু স্বরে, সর্ব্বত্রই তাঁহার সেই মধুর ভাব, মাধুর্য্যরস। * তাঁহার সৌন্দর্য্য যেমন ভক্তের প্রাণ টানিয়া নেয়, তাঁহার মাধুর্য্য তেমন ভক্তের প্রাণে অমৃত ঢালিয়া দেয়। ভক্ত সেই মাধুর্য্যের স্বাদ পাইয়া, তাঁহাকে প্রাণ হইতেও প্রিয়তর ও যার-পর-নাই প্রীতিকর জ্ঞানে, তাহার দেহ প্রাণ, সুখ দুঃখ, সাধন, ভজন, সমস্তই তাঁহার চরণে আকুলতার সহিত সমর্পণ করে।

প্রাচীন ঋষিরা, জগদীশ্বরের এই রসময়

* "সত্যং শিবং সুন্দরং।" অর্থাৎ তিনি সত্য স্বরূপ, তিনি মঙ্গলময় এবং তিনি সুন্দর।

* "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সংত্বোষধীঃ॥ ৬॥—মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥ ৭॥—মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥" ৮॥ (ঋগ্‌বেদ,)—অর্থাৎ, ভক্তের কাছে বায়ু মধু বহন করে, নদীর জল মধুময় হয়, তরুলতাও মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকে;—ইত্যাদি।

মধুর ভাব অনুভব করিয়া, ভক্তির সরস কণ্ঠে গাইয়াছেন;—

রসো বৈ সঃ *

তিনি রস স্বরূপ। তিনি রস-মাধুরীর প্রস্রবণ। যদি জগতে তাঁহার রস-মাধুরী না থাকিত, তাহা হইলে কে জীবিত থাকিত? কেই বা যত্ন করিয়া প্রাণ ধারণ করিত?

এ সকল কথা, এক জনের কি দুই জনের নহে, প্রায় সকলধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরই গভীর বিশ্বাসের কথা। যিনি অন্তরের সহিত জগদীশ্বরে বিশ্বাস করেন, তিনি অবশ্যই, কোন না কোন সময়ে, তাঁহার বিশ্বময় বিরাট্ মূর্ত্তির নিকট ভয়ে ও বিস্ময়ে মাথা নোয়াইয়া থাকেন,—তিনি অবশ্যই, কোন না কোন সময়ে, তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের দ্বারে, ভিখারীর প্রাণে, করযোড়ে দণ্ডায়মান হন,—তিনি অবশ্যই, কোন না কোন সময়ে, তাঁহার বাৎসল্য ভাবের নিকট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় অসংখ্য বার প্রণাম করিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করেন;—এবং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তিনি হৃদয়বান্ মনুষ্য হন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি, কোন না কোন সময়ে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনন্ত মাধুর্য্যের ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া, পৃথিবীতেই স্বর্গসুখের পূর্ব্বস্বাদলাভে চরিতার্থ রহেন।

* "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ংলব্ধানন্দী ভবতি"।

তিনিই রস। তাঁহার রসময় ভাবের অথবা রসস্বরূপে স্বাদ লাভ করিয়াই জীব আনন্দ যুক্ত হয়।

যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারাও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ন্যায়, এ সকল তত্ত্বের আলোচনায় যত্নপর হইয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাদিগের মতে নিত্য সত্য মঙ্গলময় ভাবে সর্ব্বভূতে সতত প্রবিষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহার নাম বিষ্ণু। এই তত্ত্বই পুরাতন ঋষিদিগের প্রাণের কথা, ইহাই বেদ বেদান্তের সারোদ্ধার, ভুবনবিখ্যাত ভগবদ্গীতার প্রকৃত মর্ম্ম এবং যাঁহারা ভগবানকে সর্ব্বময় শিবশঙ্কর ও সর্ব্ব বস্তুতে সমানরূপে আবিষ্ট বিষ্ণু বলিয়া জানিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহারাও এই তত্ত্বেই দীক্ষিত। তাঁহারা জগদীশ্বরের ব্রহ্মরূপ, বিশ্বময় বিরাট্‌মূর্ত্তি, বিবিধ ঐশ্বর্য্য এবং বাৎসল্যাদি সকল ভাবই স্বীকার করেন, এবং এই সকল ভাবের কাছে ভক্তির সহিত অবনত হইয়া থাকেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের প্রাণের তৃষ্ণা এখানেই নিবৃত্ত হয় না। তাঁহাদিগের মতে জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই প্রেমভক্তির * পরম ধন ও প্রকৃত সাধনার চরম লক্ষ্য;—এবং তাঁহারা এই হেতুই প্রেমভক্তির মধুর অথচ পবিত্র ভাবে সেই সৌন্দর্য্য ও সেই মাধুর্য্যের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ পূজা করিবার জন্য প্রাণের সহিত লালায়িত রহেন।

তাঁহারা এইরূপ উপদেশ করেন যে,

চরিতামৃত-ধৃত গৌরাঙ্গ বাক্য।—

"সাধন-ভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্যম,
পরম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য রস করায় আস্বাদন।"

ভগবান্ জগদীশ্বর অনন্ত শক্তির আশ্রয় হইলেও, তাঁহার তিনটি শক্তি প্রধান, এবং তাঁহার যে সকল ভাবের উল্লেখ হইল, তাহা এই তিন প্রধান শক্তিরই ক্রমবিকাশ অথবা ক্রীড়াবিলাস। যখন এই জগৎ মহাপ্রলয়-কালে জগদীশ্বরে লয় পায়, তখন এই তিন প্রধানা শক্তিও, জগদীশ্বরের অংশরূপে, তাঁহার পূর্ণস্বরূপে বিলীন হইয়া রহেন। যখন জগদীশ্বর জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন আবার এই তিন শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, নিজ নিজ ভাবে, প্রকাশিত হইয়া, বিশ্ববিলাসে তাঁহার সঙ্গিনী হন।

এই তিন প্রধান শক্তির একটির নাম সন্ধিনী, আর একটির নাম সংবিৎ, এবং যিনি শেষ ও সকলের মধ্যে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার নাম আনন্দরূপিণী। *

সন্ধিনী † হইতেই জগৎসংসারের সৃষ্টি ও স্থিতি। জগতে জল বায়ু ও অগ্নি এবং চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি যেখানে যাহা কিছু আছে, সমস্তই সন্ধিনীর শক্তিতে অবস্থান করিতেছে। জগদীশ্বরের বিরাট্ ভাব ও ঐশ্বর্য্যের ভাব ইহাঁ হইতেই প্রকাশিত। যিনি সংবিৎ নামে অভিহিত হন, তাঁহাকে যোগীরা ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি অথবা জ্ঞানশক্তিও বলিয়া থাকেন। এই চিন্ময়ী অথবা চৈতন্যশক্তির আবেশেই জগতে চৈতন্যের সঞ্চার। কীটাণু ও কীটপতঙ্গ-হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাহাতে তাঁহার যত টুকু সঞ্চার, তাহার তত টুকু চৈতন্য, তত টুকু জ্ঞান।

সকলের উপরে আনন্দরূপিণী। যেমন জলস্থলময় স্থূল জড় জগৎ অপেক্ষা চৈতন্যময় জগৎ অনেক সূক্ষ্ম ও অনেক উপরে, সেইরূপ আবার নীরস নিরানন্দ চৈতন্যজগৎ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যময় প্রেমানন্দের জগৎ অনেক অংশে সূক্ষ্মতর ও অনেক বেশী উপরে। আনন্দরূপিণী সেই প্রেমানন্দ-পরিপূর্ণ গোলোক অথবা পরমধামের অধীশ্বরী। তিনিই জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সার-স্বরূপা পরমাশক্তি, এবং তাঁহা-তেই এই উভয় ভাবের পুষ্টি ও বিকাশ। সুতরাং তিনি জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল ভোগ করিয়া সেই সৌন্দর্য্যে পরম সুন্দর এবং সেই মাধুর্য্যে পরম মধুর। যেন তাঁহার লীলাময় ললিত তনু জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমুদ্র ছাঁকিয়া তাহার সূক্ষ্মসার প্রেম-পরমাণুতে বিরচিত, অথবা যেন সেই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তাঁহারই সূক্ষ্ম তনুর স্থূল বহিরাবরণ মাত্র। তাঁহারই আবেশে জগতের কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে আনন্দের

* আনন্দরূপিণী অথবা ভগবানের আনন্দ-শক্তির আর এক নাম হ্লাদিনী। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্ব-সংস্থিতৌ।

† সন্ধিনীর সারতত্ত্ব সৎ, সংবিদের সারতত্ত্ব চৈতন্য, এবং হ্লাদিনীর সারতত্ত্ব আনন্দ। যিনি এই তিন শক্তির নিত্য আশ্রয়, তিনিই "সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"

সঞ্চার,—তাঁহারই অনন্তশক্তির কণিকামাত্র লাভ করিয়া মনুষ্য জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য রসের স্বাদ-গ্রহণে অধিকারী,—এবং তিনি জগদীশ্বরের হৃদয়ে সকল সময়েই আনন্দরূপে বিরাজ করেন বলিয়া জগদীশ্বর পূর্ণানন্দ।

ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত বৈষ্ণবেরই এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ * রূপে ভূভারতে প্রকাশিত হইয়া, প্রেমময় বৃন্দাবনধামে, প্রথম বয়সে, প্রেমের লীলায় জীবে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন, তিনিই সেই ভুবন-মোহন-সুন্দর, পরিপূর্ণ-মাধুর্য্যরসের প্রকট বিগ্রহ। আর, যিনি সেই বৃন্দাবনে, শ্রীরাধা নামে † অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে দেহ প্রাণ ডুবাইয়া দিয়া, জগতে প্রেমভক্তির পরম যোগ ও মহাভাব দেখাইয়া-ছিলেন, তিনিই ভগবানের হৃদয়স্থিত সেই প্রেমানন্দময়ী পরমা শক্তির প্রত্যক্ষ প্রতিমা। ভক্তিমান্ বৈষ্ণবের প্রাণ, শ্রীরাধার নামমাত্র উচ্চারণে, কি কারণে আনন্দের সমুদ্রে ভা-সিতে থাকে, তাহা পাঠক এইক্ষণ বুঝিতে পাইতেছেন। বৈষ্ণবের চক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যেমন পরম-পুরুষের অবতার, শ্রীরাধা তেমনই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-রূপিণী পরমা-প্রকৃতি। অথবা, রাধা আর কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। একজন যেন চন্দ্র, আর একজন যেন সে চন্দ্রের জ্যোৎস্না। একজন যেন ফুল, আর একজন যেন সে ফুলের সৌরভ। তাঁহাদিগের এক হৃদয়, এক মন, এক আত্মা, এক প্রাণ। তবে যে তাঁহারা, পূর্ব্বে গোলোকে, পরে বৃন্দাবনে, পৃথক্ পৃথক্ তনুতে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহা, পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি, কেবল লীলারই অনুরোধে।

অপিতু, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাই শ্রীরাধার প্রেমানন্দময় পবিত্র জীবনের একমাত্র ব্রত। এই আরাধনার ভাব হইতেই তাঁহার নাম রাধা। কেন না, তিনি আরাধনারই প্রতি-মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা বিনা আর কিছুতেই তাঁহার মতি, গতি অথবা প্রাণের স্ফূর্ত্তি নাই। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে, এবং তাঁহার যোগে জগতের সমস্ত জীবকে, অনন্ত প্রেমের আকুলতায় অনন্তকাল হইতে প্রেমময় মুরলীর মোহন নিঃস্বনে প্রাণে আকর্ষণ করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। এই ভাবে, শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের

* "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"
ইতি গৌরাঙ্গদেব-সমাদৃত-ব্রহ্মসংহিতায়াং।
"কৃষ্ণো হ বৈ পরমোদেবঃ ষড়্বিধৈশ্বর্য্য-পূর্ণো ভগবান্।"
ইতি বৈষ্ণবগ্রন্থ-ধৃত-প্রাচীন প্রমাণসংগ্রহে।

† "তস্য শক্তয়স্ত্বনেকধা, * * তাসু হ্লাদিনী বরীয়সী, পরান্তরসম্ভূতা রাধা" ইতিচ। "মহাভাব-স্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী"—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তিবরীয়সী, তৎসারভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা।"
অপিচ, চৈতন্যচরিতামৃতে।—হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব; ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব। মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী; সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।

আছে, তাহা পড়িয়া, পাঠক কোন স্থলে প্রীত, কোন স্থলে প্রমোদিত, এবং কোথাও বা একটুকু বিস্মিত হইবেন; এবং কার্ত্তিকেয় বাবু কিরূপ কর্ম্মকুশল সুকৃতিপুরুষ ছিলেন, তাহা কতকটা বুঝিতে পাইবেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সুখ-সম্মান-সংবর্দ্ধিত আত্মা, পুত্রগণের অকৃত্রিম ভক্তি এবং দেশস্থ হৃদয়িক ব্যক্তিদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে শীতল হইয়া, উচ্চস্বর্গে শান্তিলাভ করুক; এবং তাঁহার সাধুজীবনের স্মরণীয় দৃষ্টান্ত কর্ম্মানুরক্ত বিষয়িদিগের হৃদয়ে স্ফুট অক্ষরে লিখিত রহুক।

৮। "গোপবালা। মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্ম বাহাদুর কৃত চিত্রাবলী সম্বলিত।—শ্রীবিমলচন্দ্র দেববর্ম্ম প্রণীত।" ইহা একখানি অপূর্ব্ব কাব্যপুস্তক। ইহার চিত্রগুলি দর্শনীয়; আর কবিতানিচয়ও, প্রভাত-শিশির-সিক্ত, মৃদুমুকুলিত, ভ্রমর-মুখর যূথিকার মত, একান্ত কমনীয়। ইহাতে ব্রজ-বিলাস-কাব্যের প্রাণরূপিণী প্রেমময়ী রাধাবিনোদিনী, আর তদীয় প্রেম-যজ্ঞের নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী চন্দ্রাবলীর নানারূপ কথা আছে। উভয় নায়িকাই, প্রচলিত পদ্ধতির বহু উর্দ্ধস্থিত উচ্চতর ভাব ও বর্ণের উপাদানে চিত্রিত হইয়াছেন; এবং উভয় চিত্রেই, এই হেতু, নয়নানন্দ নূতনত্ব ও নির্ম্মল কাব্য ফলিয়াছে। কবি যুবজন না প্রবয়স্ক, তাহা জানি না। কিন্তু, তিনি তাঁহার এই প্রথম উদ্যমেই, আশাতীত সার্থকতায়, কবিসমাজে প্রশংসার আসন, এবং বৈষ্ণব কবিসমাজে বরেণ্য পদ পাইতে অধিকারী হইয়াছেন।

আগরতলার রাজবংশ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব। এ বংশের অধুনাতন কুমার ও কুমারীরা, সাহিত্যসেবায়ও, সকলেই হৃদয়ের সহি[ত] অগ্রসর হইয়া, আগরতলার পুরাতন সম্মা[ন]কে নূতন উজ্জ্বলতা দান করিয়াছেন। দুই বৎসর হইল, আমরা তত্রত্য একটি রাজকুমারীর একখানি কবিতাপুস্তক পাঠ করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছি। তার পর, সহৃদয়-সাহিত্যসেবী, শান্ত-গভীর-প্রকৃতি শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত বঙ্গভাষা নামক উপাদেয় মাসিক পত্রে, বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকর্ষসাধন বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ ও পণ্ডিত-জন-সুলভ নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। আজি এ গোপবালা গ্রন্থে একই সঙ্গে, শিল্প ও সাহিত্য উভয়েরই প্রেমাশ্রুসিক্ত বিচিত্র চিত্র দর্শনে প্রকৃতই আমরা মোহিত হইয়াছি। তুলির চিত্রে স্থানে স্থানে এক-আদটু খুঁত আছে; এবং শব্দচিত্রেও সেইরূপ, এখানে সেখানে, সা[মা]ন্য এক-আদটু দোষ চক্ষে পড়িয়াছে। কিন্তু উভয়বিধ আনুবীক্ষণিক দোষ সম্বন্ধেই কবিকালিদাসের সেই পুরাতন কথা আমাদিগের স্মৃতিতে আসিয়াছে,——

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

দেশের সকল সম্পদই, কালে লোপ পায়। কিন্তু সাহিত্যসম্পদ, কালস্রোতের [ক]রাল-তরঙ্গ-ঘাতেও অপ্রতিহত রহিয়া, [দে]শীয়দিগের পুরাতন স্মৃতিকে চিরকাল [উ]জ্জ্বল রাখে। আগরতলার সহিত্যসম্পদ [ক্র]মশঃ এইরূপ উৎকর্ষলাভ করিলে, উহার [রা]জসম্পদও সমধিক উজ্জ্বল হইবে।

৯। "চল্লিশ বৎসর—কাউণ্ট টলষ্টয় [এ]বং নিকোলাস্ কষ্টোমারফ্ বিরচিত ক্ষুদ্র [না]শ উপন্যাস। অনুবাদক শ্রীচণ্ডীচরণ সেন। [মূ]ল্য ৵০ আনা মাত্র।" রুশিয়ার প্রাতঃ[স্ম]রণীয় ধর্ম্মবীর পুণ্যপুঞ্জময় টলষ্টয়ের প্রা[ণে]র কথা আজি পৃথিবীর সকল দেশেই [প্র]তিধ্বনিত হইতেছে। বাঙ্গালায় তাঁহার [কো]ন গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে, এমন আমরা [জা]নি না। বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ সাহিত্যিক,—[প্র]শ্রুত-নামা লেখক বাবু চণ্ডীচরণ সেন, [টল]ষ্টয়ের এই ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি বাঙ্গালা [ভা]ষায় প্রকাশ করিয়া, দেশীয়দিগের কৃত[জ্ঞ]তাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ [স]রল ও সুন্দর; কিন্তু লেখনীর দ্রুতচারিতা হেতু, সকলস্থলে, ভাবার্থে কিংবা শব্দগ্রহনে, আশার অনুরূপ বিশুদ্ধ নহে। যথা,—God immanent, God transcendental—এই বাক্যের অনুবাদে চণ্ডী বাবু লিখিয়াছেন "ঈশ্বর দেদীপ্যমান এবং অজ্ঞেয়।" চণ্ডী বাবু সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি একটুকু নিবিষ্ট মনে প্রণিধান করিলেই, ইহা আপনা হইতে তাঁহার মনে পড়িত যে, immanent শব্দের প্রকৃত অর্থ অন্তর্ভূত অথবা অন্তরস্থ, আর transcendental শব্দের প্রকৃত অর্থ অতী[ন্দ্রি]য়। ইংরেজী ভাষার বাঙ্গালা অনুবাদ বড়ই কঠিন। কিন্তু যেখানে প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দ একটু ভাবিলেই সংকলিত হইতে পারে, সেখানে শব্দপ্রয়োগে মনে একটা উপেক্ষার ভাব পুষিয়া ফল কি? চণ্ডী বাবুর লেখায় এইরূপ উপেক্ষার ভাব আরও দুই এক স্থলে আমাদিগের চক্ষে পড়িয়াছে। যথা—"ঈশ্বর না থাকিলে কে এই পৃথিবী সৃজন করিল?" আমাদিগের বোধ হয়, লোকে, এইরূপ স্থলে, প্রচলিত বাঙ্গালায় "কে সৃষ্টি করিল?" এইরূপ বলিয়া থাকে। আর এক স্থলে দেখিলাম,—"ধনরাশী ইহার ঘরে বর্ষিত হইতেছে।" এ বাঙ্গালাও প্রচলিত বাঙ্গালার রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এই দ্রুতগামিতা ও ভাবাবেগজনিত অসাবধানতা ভিন্ন চণ্ডী বাবুর পুস্তকে আর সকলই স্পৃহণীয় গুণ, এবং পুস্তকখানি উপদেশপূর্ণ ও পাঠ-সুখাবহ।

১০। "শ্রীকৃষ্ণলীলা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। রচয়িত্রী শ্রীমতি রমণী দেবী। কলিকাতা-শ্যামবাজার ১১নং গোপাল বিশ্বা[স]ের লেন হইতে শ্রীনীলম[illegible] প্রকাশিত। মূল্য ১৲ ট[illegible] প্রগাঢ়ভক্তিমতী পবিত্র[illegible] তিনি ভক্তির প্রণোদনায় এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভক্তের নিকট ইহার নিশ্চয়ই আদর হইবে; এবং বঙ্গীয় পুরমহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি অমিয়মধুর কৃষ্ণনামে অনুরাগিণী রহিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদিগেরও প্রীতি জন্মাইবে।

কৃষ্ণলীলা অনেক প্রকার। বেদব্যাসের

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"এ বালকে জানিও কেবল পরানন্দ,
ইহাকে বলিবে লোকে নবদ্বীপচন্দ্র।"

নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ এই পৃথিবীতে কাঁদিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আপনি কাঁদিয়া এবং সঙ্গে শত সহস্র লোককে কাঁদাইয়া প্রেম-ভক্তির সুধাময় ধামে চলিয়াগিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার পার্থিব জীবনের সেই ভক্তির স্রোত এবং প্রেমের তরঙ্গ থামিয়া গিয়াছে কি? তাঁহার নয়নজলের এক ধারায় ভক্তির গঙ্গা এবং আর এক ধারায় প্রেমের যমুনা বহিয়াছিল। সে গঙ্গা এবং সে যমুনা, কোন কালেও, শুকাইয়া যাইবে কি?

শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রুময় বিচিত্র জীবনে তিনটি আপাতবিরুদ্ধ অভাবনীয় ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই তিনের এক ভাবে তিনি সহস্র কাঙ্গালের এক কাঙ্গাল,—কাতর-মূর্ত্তি,—করুণা-প্রার্থী,—অতি দীন ভক্ত। যাহাকে ভক্তিমান্ সাধু বলিয়া মনে করিতেছেন, হৃদয়নিহিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাহারই পায়ে লুঠাইয়া পড়িতেছেন এবং তাহার নিকট—ভক্তি শিক্ষার পথ বিষয়ে উপদেশ চাহিতেছেন। আর এক ভাবে তিনি সিদ্ধ-ভক্তির শিক্ষাগুরু,—নবীন বয়সেও অতি প্রাচীন ঋষি। যেন, ভক্তি বিষয়ের সকল দেশের সকল তত্ত্ব তাঁহার নির্ম্মলচিত্তে নিলীন রহিয়াছে, এবং তাঁহার মধুবর্ষিণী রসনা, গুরু, জ্ঞান-দাতা অথবা অশীতিপরবৃদ্ধ জ্ঞানীকেও ভক্তির সরস মাধুর্য্য বিষয়ে উপদেশ দান করিতে অনায়াসে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তিনি তাঁহার তৃতীয় ভাবে ভক্তের আরাধ্য,—ভক্তবৎসল,—"ভুবন মোহন"। পাঠক, তুমি কখনও সমুদ্র দেখিয়াছ কি? সমুদ্র যখন পূর্ণচন্দ্রের প্রসন্ন জ্যোৎস্না দর্শনে, যেন এক অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে এবং সমুদ্রের সেই প্রবল জোয়ারে চারিদিকের অসংখ্য নদ, নদী এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতস্বিনী একই মুহূর্ত্তে অপ্রমেয় জলভারে পরিপূর্ণ হইয়া কল-কল ধ্বনিতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, তাহা তুমি নয়নে কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি? এই বঙ্গ ভূমির হৃদয়-সমুদ্রের মধ্যে গৌরচন্দ্রের আকস্মিক অভ্যুদয়েও তেমনই উচ্ছ্বাস, তেমনই উদ্বেল আনন্দ এবং তেমনই কল-কল ধ্বনি হইয়াছিল। যাহারা বিশ্বদ্রোহী পাপিষ্ঠ, তাহারাও গৌরচন্দ্রের সেই ভুবন-মোহন ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া যেন কি এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে তাঁহার প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। ভক্তেরা প্রাণের টানে তাঁহার পূজা করিয়াছিল; ভক্তি তাঁহার পাদ-স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল; কবিতা দেশের যেখানে যে কোন

সুন্দর ও সুমধুর শব্দ কানে শুনিয়াছিল; রূপ-মুগ্ধ কামিনীর ন্যায়, কোমল করে সঙ্কলন করিয়া মালা গাঁথিয়া তাঁহার পায়ে দিয়াছিল। সঙ্গীত, একই সঙ্গে শত লক্ষ কণ্ঠে স্ফুরিত হইয়া তাঁহার গুণ গাইয়াছিল। এই জন্যই বলিয়াছি, তিনি তাঁহার তৃতীয় ভাবে ভুবন-মোহন। কিবা দুধের শিশু, কিবা দৃঢ়চিত্ত দার্শনিক যে তাঁহার কাছে গিয়াছে, সেই মোহিত হইয়াছে। এই তিনটি ভাব, একই জীবনে, ধীরে ধীরে কিরূপে বিকসিত হইয়া, একটি অন্যটির সহিত মিশিয়া গেল, এবং সেই মিশ্রিত ভাবের মহাসমুদ্র, কিরূপে ভারতবাসীকে, ভক্তির এক অদৃষ্ট-পূর্ব্ব উন্মাদ-তরঙ্গে ভাসাইয়া দিল, তাহা চিন্তা করিলে, হৃদয় অনেক সময় বিস্ময়ে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু, সে লীলার অনেক রহস্য প্রকৃতই অতি গভীর তত্ত্ব। ভক্তির পবিত্র অথচ স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কোনরূপ আলোক লইয়া সেখানে পৌঁছা যায় না। হায়! সে ভক্তি কোথায় পাইব! সকল কথা কেমনে বুঝিব?—কেমনে বুঝাইব?

যে স্থান এক্ষণ নবদ্বীপ * নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা পুরাতন নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তি একটি গ্রাম্য নগর। এই গ্রাম অথবা এইক্ষণকার এই নবদ্বীপ পূর্ব্বে ফুলিয়া নামে পরিচিত ছিল, এবং তখনকার নবদ্বীপ ইহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেই পুরাতন গঙ্গার প্রবাহ-পরিবর্ত্তে নূতনে ও পুরাতনে এত পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে যে, ওখানকার কোন্ স্থানটি গৌরাঙ্গের

* এখনকার নবদ্বীপ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে, গঙ্গার পূর্ব্বদিকে নদীয়া জেলা ও পশ্চিমে বর্দ্ধমান জেলা; মাত্র নদীয়া গ্রাম ছাড়া,—উহা নদীয়া জেলার অন্তর্গত। এই বেমানাজ দেখিয়া লেঃ গবর্ণর ক্যাম্বেল নদীয়াকে বর্দ্ধমান জেলাভুক্ত করিয়া দেন; তাহাতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। অবশেষে লেঃ গবর্ণর টেম্পলের কৃপায় নদীয়া গ্রাম নদীয়া জেলায় ফিরিয়া আইসে।

এখন খড়িয়া নদী ঠিক নবদ্বীপের সম্মুখে পূর্ব্বপারে গঙ্গায় সংমিলিত হইয়াছে, ঐ সম্মিলনস্থলে স্বরূপগঞ্জ নামক একটি গ্রাম ও গঞ্জ এখন স্থাপিত ও তথায় একটি কুতঘর (Toll office) আছে। স্বরূপগঞ্জ ও তাহার পার্শ্বস্থ সমস্ত স্থান চরভুমি। তথায়ই পূর্ব্বকালের নবদ্বীপ ছিল। স্বরূপগঞ্জের উত্তরে চরভূমি সংলগ্ন বল্লাল সেনের দীঘির পারের খানিক এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই স্থানে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের বাড়ী ছিল।

পূর্ব্বে খড়িয়া বল্লাল দীঘিরও অনেক উত্তরে সংমিলিত ছিল এবং ভাগীরথী তখন যাহা নবদ্বীপের পূর্ব্ব সীমানায় প্রবাহিত, তাহা এখন নবদ্বীপের উত্তর সীমা বেষ্টন করিয়া পশ্চিম সীমা দিয়া প্রবাহিত ছিল, এখনও তাহার খাদের চিহ্ন আছে। তখনকার নবদ্বীপের উত্তর সীমাস্থিত গঙ্গার পর পারে ফুলিয়া গ্রাম। এই ফুলিয়ায় দেবানন্দ পণ্ডিত বা অপরাধভঞ্জনের পাঠ। এখনও প্রতিবৎসর অপরাধভঞ্জনের মহোৎসব হয়; দেবানন্দের ভাগবৎ পাঠ শুনিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত কাঁদিয়া উঠায় দেবানন্দের শিষ্যেরা শ্রীবাসকে বাহির করিয়া দেওয়ার যে অপরাধ হয়, চৈতন্য পরে, দেবানন্দ ভক্ত হইলে, শ্রীবাসের [illegible] ক্ষমা [illegible] অপরাধভঞ্জন করেন। সেই হইতে অপরাধভঞ্জন মহোৎসব।

প্রফুল্ল।

সময় কি নামে পরিচিত ছিল, তাহা এইক্ষণ নিশ্চয়তার সহিত নিরূপণ করা কঠিন।

পুরাতন নবদ্বীপে অনেকগুলি পাদপলতা-বেষ্টিত রমণীয় পল্লী ছিল। তাহারই একটি পল্লীর নাম "মায়াপুর"। মায়াপুর গঙ্গার এত সন্নিহিত ছিল যে, গৃহস্থেরা উহার অনেক স্থলে বসিয়া সর্ব্বদাই গঙ্গার জল চক্ষে দেখিতে পাইত। এবং রাত্রি যখন একটুকু গভীর হইত, তখন প্রায় সকলেই উহার অবিরাম-বাহিনী তরঙ্গমালার তর তর কল কল শব্দ কানে শুনিয়া প্রাণে কেমন এক স্নিগ্ধ শীতল আনন্দ অনুভব করিত। গৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকাব্দে, ২৩শে ফাল্গুন, শনিবার * পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায় নবদ্বীপ নগরে, উল্লিখিত মায়াপুরে, ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন।

গৌরাঙ্গের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতার নাম শচী। নবদ্বীপের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী বেলপুকুরিয়া নামক পল্লীতে একটি অতি প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। জ্যোতিষাদি বহু শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আর তিনি যার পর নাই সরল, সদাশয়, অমায়িক স্বভাব ও প-

* গৌরাঙ্গের জন্মদিন বাঙ্গালা ৮৯২ সনের ২৩শে ফাল্গুন, এবং ১৪৮৬ খৃষ্টীয় অব্দের ৬ই মার্চ্চ। রোমের পোপ প্রসিদ্ধনামা গ্রেগরির প্রবর্ত্তিত পঞ্জীশোধনী গণনায় না ধরিলে উক্ত খৃঃ অব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি। সাধকজীবনী নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গৌরাঙ্গদেব ১৪০৭ শকাব্দের ১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রন্থকার কি প্রণালীর গণনা অথবা কিরূপ পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া এই বার তারিখ নিরূপ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত, প্রভৃতি পুরাতন প্রামাণিক গ্রন্থে "১৪০৭ শকাব্দ.—ফাল্গুন মাস,—পূর্ণিমা তিথি" এই মাত্র উল্লিখিত আছে, বার ও তারিখ নাই। বিক্রমপুরের অন্তর্গত গারুড়-গ্রাম নিবাসী, ঢাকা কালেজের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক জ্যোতিষার্ণব বহুশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন এম্ এ, আমাদের অনুরোধক্রমে, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত শকাব্দ, মাস ও তিথির উপর নির্ভর করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে যে গণনা করিয়াছেন, তদনুসারে ১৪০৭ শকাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২৩শে ফাল্গুন শনিবার। সে দিন নক্ষত্র পূর্ব্বফল্গুনী এবং যোগ ধৃতি। তাঁহার গণনায় ১৯শে ফাল্গুন মঙ্গলবার একাদশী তিথি হয়, কোনক্রমেই শুক্রবার কিংবা পূর্ণিমা হয় না। প্রত্যেক উনিশ বৎসর পরে, তারিখ ও তিথির সমতা হয় বলিয়া যে একটি জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে, তদনুসারে ১২৯১ সনের অর্থাৎ ১৮০৬ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে গণনা করিলে, ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ফাল্গুনের উনবিংশ দিবসে হওয়াই আপাততঃ অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু অতীত প্রত্যেক উনিশ বৎসরের আবর্ত্তনে চন্দ্রস্ফুটে যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে, গণনার বিশুদ্ধির জন্য তাহাও অবশ্যই ধরিয়া লওয়া আবশ্যক। এবং তাহা ধরিয়া লইলে একুশ বার গুণিত উনিশ বৎসরে, অর্থাৎ ১২৯১ সন হইতে অতীত ৩৯৯ বৎসরে তিথি গণনায় ৫ দিন বাড়িয়া আইসা দৃষ্ট হয়। সুতরাং ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিশ্চয়ই ২৩শে তারিখ হয়, এবং সেই ২৩শে ফাল্গুন পূর্ণিমা ছিল বলিয়াই ১৮০৬ শকাব্দের অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৯১ সনের ১৪শে ফাল্গুন পূর্ণিমা গণা হইয়া কৃষ্ণাপঞ্চমী এবং উক্ত সনের ১৯শে ফাল্গুন পূর্ণিমা ঘটে।

রোপকারী লোক ছিলেন বলিয়া, দেশের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিত। অপিচ, সপ্তগ্রাম নামক তদানীন্তন বিখ্যাত স্থানের অতি বিখ্যাত ভূম্যধিকারীরা এবং আরও বহু সমৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশে ইহাও তাঁহার প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তির এক বিশিষ্ট কারণ হইয়াছিল। সৌভাগ্যবতী অথবা অভাগিনী শচী এই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। নীলাম্বর ইঁহাকে বড় বেশী আদর করিতেন।

জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাস শ্রীহট্ট। তিনি গঙ্গাস্নান অথবা অধ্যয়ন উপলক্ষে নবদ্বীপে আগমন করেন, এবং এই শচীর পাণিগ্রহণ করিয়া সেখানেই উপনিবিষ্ট হন। তাঁহার পিতা উপেন্দ্র মিশ্র এক জন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিত এবং পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে সমৃদ্ধ ও প্রধান লোক বলিয়া শ্রীহট্টে সুপরিচিত ছিলেন। এদেশে ইদানীং সংস্কৃত ভাষায় লোকের প্রকৃত অনুরাগ নাই। সুতরাং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগেরও তাদৃশ সম্মান নাই। কিন্তু পূর্ব্বকালে এদেশের পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা একটুকু প্রাধান্য লাভ করিতেন, তাঁহারা দেশস্থ সমৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের অনুগ্রহ ও গুণগ্রাহিতায় প্রচুর পারিতোষিক ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া দশ জনের মধ্যে সম্পন্ন লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। উপেন্দ্র মিশ্র শ্রীহট্টের ভদ্রসমাজে সম্ভবতঃ এইরূপেই মনে মানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাতটি পুত্র ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার এই সাত পুত্রই চরিত্রগুণে সাত ঋষি বলিয়া পূজা পাইয়াছিলেন। পঞ্চম পুত্র জগন্নাথ মিশ্র চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে মিশ্রপুরন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "পুরন্দর" তাঁহার বিদ্যাবত্তার বিশেষ উপাধি, না অন্য কোন রূপ কুলক্রমাগত উপাধি, ইহা জানা যায় না। কিন্তু পুরাতন গ্রন্থকারদিগের লেখায় ইহা বিশিষ্টরূপে জানা যায় যে, জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর নবদ্বীপে সমাগত হইয়া কুলে, শীলে এবং বিনয়নম্রতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণে সকলের কাছেই সম্মানিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ বড় সুরূপ পুরুষ ছিলেন। নবদ্বীপের অনেকেই তাঁহার কমনীয় রূপ দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইত এবং তাঁহার নিরভিমান নির্ম্মল চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্নেহ করিত। জগন্নাথের আর এক প্রধান গুণ ছিল—ভক্তি। শরীরের যেমন শোভা ও সম্পদ্ মস্তক, শরীর-নিহিত আত্মা অথবা মনোবৃত্তিনিচয়ের সেই প্রকার শোভা ও সম্পদ্ ভক্তি। যাহার কিছুতেই ভক্তি নাই এবং ভক্তিজনিত বিশুদ্ধ অনুরাগ নাই, সে অতি শোচনীয়। তাহার জীবন সাহারার দগ্ধ মরুর মত। উহাতে দগ্ধ বালুরাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিপথে পড়ে না। কিন্তু ভক্তি এমন অমূল্য বস্তু হইলেও, সকলে উহাতে সহজে অধিকারী হয় না। উহা মনুষ্যপ্রকৃতির নিত্যস্থায়ি ও স্বাভাবিক বৃত্তি হইলেও, সকলের জীবনে উহা ফুটিবার সুবিধা পায় না। যাঁহারা ঈর্ষ্যা, অভিমান, সুখ-লালসা, স্বার্থপরতা এবং সাংসারিক প্রভুত্ব বাসনার প্রভাব

ও প্রকোপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া প্রায়শঃ উহার আকর্ষণে পড়েন, তাঁহারাও সাধারণতঃ জীবনের শেষ সময়েই ভক্ত অথবা ভক্তিমান্ বলিয়া পরিচিত হন,—ভক্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল হইয়া থাকেন। জগন্নাথ তাঁহার প্রথম বয়সেই ভগবদ্ভক্ত সাধু বলিয়া সুশীল ও সজ্জনের হৃদয়ে পূজার আসন পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বাংশে তাদৃশ একটি সুপাত্র না হইলে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর মত নবদ্বীপবাসী সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত কখনই তাঁহাকে কন্যা দান করিতেন না।

শচীও তাঁহার শৈশব হইতেই বড় বেশী সুন্দরী মেয়ে বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। নীলাম্বরের সম্পর্কে নবদ্বীপের অনেকেই তাঁহাকে জানিত, অনেকেই তাঁহাকে আদর করিত ও ভালবাসিত এবং যে তাঁহাকে এক বার দেখিত, সেই তাঁহার সলজ্জমধুর সুকুমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইত। বালিকার সেই অর্দ্ধস্ফুট সৌন্দর্য্য, বিবাহের পর, তাঁহার সুকোমল সরল চরিত্রের নির্ম্মল মাধুর্য্য ও সুশীলতার সহিত মিশ্রিত হইয়া, যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। শচীর রূপ ও গুণ, শচীর নম্রতা স্নেহশীলতা ও মধুমাখা কথা, নবদ্বীপবাসী বহু লোকের প্রগাঢ় স্নেহ আকর্ষণ করিল। ঘরে আর কেহ অভিভাবক নাই, এই হেতু প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে অনেকেই ভালবাসায় তাঁহার অভিভাবক হইল। সম্প্রদায় জগন্নাথ শচীকে সাক্ষাৎ দেবকন্যা বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিলেন। পতি পত্নী, প্রেমবদ্ধ দেব-দম্পতীর ন্যায়, পরস্পরের প্রতি যার পর নাই অনুরক্ত হইলেন।

কিন্তু, তাঁহাদিগের সুখের স্বপ্ন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শচীর গর্ব্ভে জগন্নাথ মিশ্রের ক্রমে আটটি কন্যা জন্মিল। এই আটটি কন্যাই জনক জননীর স্মৃতির পটে,শোকের এক এক খানি আলেখ্য রাখিয়া, অকালশুষ্ক কুসুমের ন্যায় অকালে বিলয় পাইল।

শচীর দুঃখে নবদ্বীপে অনেকেরই চক্ষে জল আসিল। অমন সুন্দরী শচী,—অমন সুরূপ জগন্নাথ, ইঁহাদিগের অদৃষ্টে কি এই লেখা ছিল, ইহা ভাবিয়া অনেকেই অন্তরে অতি গভীর বেদনা অনুভব করিল। শচী ও জগন্নাথ, আগে শোকের আগুনে জর্জ্জরিত হইয়া, তার পর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ে আশার একটি অপূর্ব্ব কানন ফুটিয়াছিল। সে আশার কানন এক্ষণ শোকের ভয়ঙ্কর শ্মশানে পরিণত হইল। বার্দ্ধক্যের পূর্ব্বেই তাঁহারা বৃদ্ধের মত হইলেন। সংসারের প্রতি তাঁহাদিগের যাহা কিছু অনুরাগ ছিল,তাহার সমস্ত বাঁধনিই ছিঁড়িয়া গেল। তাঁহারা উভয়েই, এই হইতে, পৃথিবীর সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা এক প্রকার ত্যাগ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্মে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন এবং জগদারাধ্য জগদীশ্বরকেই পিতা, মাতা ও সন্তানের মত প্রাণপ্রিয় জ্ঞানে, কায়মনঃপ্রাণে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ফলতঃ, এই দুঃসহ শোকদুঃখের সময়ে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তাই জগন্নাথ ও শচীর অগ্নিদগ্ধ অমলহৃদয়ে প্রবেশপথ পাইত না এবং তদ্গত ভক্তি ভিন্ন

আর কোন সুখই তাঁহারা কামনা করিতেন না। কিন্তু, মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কে কবে আপনার জীবনের গতি আপনি নিয়মিত করিতে পারিয়াছে? মনুষ্যকুলে, কোথায় কে কবে, আপনার অদৃষ্টরেখা আপনি পুছিয়া ফেলিতে কিংবা পরিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছে?

জগন্নাথ ও শচী সংসারের প্রতি যতই বিরক্ত ও বীতস্পৃহ হইয়া থাকুন, সংসারের সহিত তাঁহাদিগের নিয়তিনির্দ্দিষ্ট একটি গূঢ় সম্পর্ক ছিল। সংসারের ঘরে ঘরে লোকে আজি যে তাঁহাদিগের নাম লইতেছে,—তাঁহাদিগের জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত ঘটনার মূল অনুসন্ধানে অতি গভীর মনোযোগের সহিত ব্যাপৃত হইতেছে,—কেহ নাটকে তাঁহাদিগের অভিনয় করিতেছে, কেহ কাব্যে তাঁহাদিগের বিষয় লিখিতেছে, কেহ গীতে তাঁহাদিগের কাহিনী গাইতেছে,—সংসারের অসংখ্য নরনারী আজি যে শচীর ক্ষণিক সুখে হাসিতেছে, শচীর অচিন্তনীয় দুঃখে নয়নজলে ভাসিতেছে, সেই গূঢ়তম কারণ বিধিলিপিতে নির্দ্দিষ্ট ছিল। বিধাতার বিধি-লিপি-নির্দ্দিষ্ট ইচ্ছা ফলিল। জগন্নাথ ও শচীর সন্তান-শোক-জনিত বৈরাগ্য ও শান্তির ইচ্ছা নিষ্ফল হইল। শচী ও জগন্নাথের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র দুইটি স্রোত মানব-জীবনরূপ অনন্ত বিস্তারিত অনন্ত তরঙ্গরাজিপরিশোভিত মহাসমুদ্রের মহাবেগময় উচ্ছ্বাসে গিয়া মিশিল। শচী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন এবং বহুদিনের পর এইবার তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। এই পুত্র গৌরাঙ্গ দেবের অগ্রজ এবং ইহার নাম বিশ্বরূপ।

শচী ও জগন্নাথ বিশ্বরূপকে পাইয়া, সুখাসক্ত না হইলেও, পুনরায় গৃহাসক্ত ও গৃহস্থ হইলেন। তাঁহাদিগের মুখে, বহুদিনের পর, আবার হাসি ফুটিল। তাঁহারা চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিয়া, শিশুর মন যোগাইলেন,—শিশুর মন যোগাইবার জন্যই বাধ্য হইয়া প্রফুল্লমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু, সেই প্রফুল্লতার মধ্যেও, তাঁহাদিগের হৃদয়ের লুক্কায়িত বিষাদ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। এইরূপ বিষাদময় প্রফুল্লতা শুধু মানুষে নহে, তরুলতাতেও অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তরু কি লতার একার্দ্ধ আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, দগ্ধ পত্রসকল ঝরিয়া পড়িয়াছে, অথচ বিধাতার ইচ্ছায় উহার আর এক দিকে অর্দ্ধদগ্ধ কোন একটি শাখায় অকস্মাৎ একটি ফুল ফুটিয়া শ্মশান-কুসুমের অপূর্ব্ব শোভায়, লোকের চক্ষু আকর্ষণ করিতেছে। বিশ্বরূপও,সেই প্রকার পোড়া গাছের ফুলের মত, লোকের চক্ষু আকর্ষণ করিলেন। তিনি যেমনই সুন্দর, তেমনই শান্ত, সুশীল, সুচরিত্র ও অতি নিরীহপ্রকৃতি বালক হইলেন। প্রাচীন কবিদিগের পুরাতন গ্রন্থাবলীতে তাঁহার কুসুমিত জীবনের যেরূপ বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা একবার পাঠ করিলে, তাঁহাকে আর বিস্মৃত হওয়া যায় না। শিশুরা, সাধারণতঃ কীট, পতঙ্গ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবকে, কোন না কোনরূপে, ক্লেশ দিতে সুখানুভব করে। পৃথিবীর সকল শিশুর না হইলেও, অধিকাংশ শিশুরই এইরূপ প্রকৃতি। বিশ্ব-

রূপের প্রকৃতি ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। জীব যদি শৈশবেই যোগী কিংবা ঋষির অচিন্তনীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার জীবন যেমন হওয়া সম্ভব, বিশ্বরূপের বাল্য জীবনও সেইরূপ অপূর্ব্ব শান্ত সৌন্দর্য্য ও প্রশান্ত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া বিকসিত হইল। তিনি কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী কাহাকেও ক্লেশ দিতেন না। কাহাকেও কটু বলা দূরে থাকুক, তিনি প্রায়শঃ মুখ ফুটিয়া কথা কহিতেন না। তিনি একাকী থাকিতেই ভাল বাসিতেন। যেখানে বালকেরা কলহ কিংবা কোলাহল করিত, তিনি সেই স্থান হইতে, সর্ব্বদাই দূরে থাকিতেন, অথচ যাহারা কলহ কি কোলাহল করিত, তাহাদের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা, বিদ্বেষ, কি বিরক্তি দেখাইতেন না। তিনি ছায়ার ন্যায় ঘরে আসিতেন, ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেন। বিদ্যারম্ভের পর, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই, তিনি নানা শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। পুথি পত্রই তাঁহার খেলার বস্তু এবং অধ্যয়নই তাঁহার একমাত্র সুখের সামগ্রী ছিল। ফলতঃ, বিশ্বরূপ অধ্যয়ন ভিন্ন আর কিছু জানিতেন বলিয়া লোকে অনুভব করিত না। কিন্তু, অধ্যয়ন লালসার এরূপ প্রগাঢ়তা সত্ত্বেও বিশ্বরূপ বাল্যকালহইতেই তাঁহার পিতা মাতার দুঃখ বুঝিতেন, এবং পিতা মাতার পরিচর্য্যা ও সুখ শান্তির জন্য নানারূপ যত্ন পাইতেন। বাড়ীতে একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। বিশ্বরূপ সেই বিষ্ণুমন্দিরের পরিচারক। বিষ্ণুমন্দিরের জন্য পুষ্পচয়ন প্রভৃতি যে কোন কার্য্য প্রয়োজন ঘটিত, বিশ্বরূপ পিতা মাতার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া, আগেই তাহা করিয়া রাখিতেন এবং পাছে তাহার দুঃখিনী মাতা তদীয় অতীত জীবনের কোন দুঃখ স্মরণ করিয়া আকুল হন, বিশ্বরূপ এই ভাবনায়, বালক হইয়াও নানা কৌশলে মায়ের মন যোগাইতেন। শচী মনে করিলেন, বিশ্বরূপ তাঁহার অঞ্চলের নিধি। জগন্নাথ মনে করিলেন, বিশ্বরূপ তাঁহার হাতের নড়ি। প্রতিবেশীরা মনে করিল, বিশ্বরূপ কোন যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ। তাহারা বিশ্বরূপকে হৃদয়ের সহিত স্নেহ করিত, অথচ বিশ্বরূপের চক্ষু দুইটিতে কেমন এক ঔদাস্যের ভাব অবলোকন করিয়া, একটুকু ভীত, একটুকু বিস্মিত রহিত।

বিশ্বরূপ যখন দশ বৎসরের বালক, তদীয় জননী শচী তখন পুনরায় অন্তর্বত্নী হইলেন। জগন্নাথ, শচীর পুনরায় সন্তান সম্ভাবনা অনুমান করিয়া, আশায় যেমন উৎফুল্ল, নানারূপ আশঙ্কায়ও তেমনই উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু, প্রাচীন কবিরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, শচী, এই দশম গর্ভসঞ্চারের প্রথম হইতেই এক অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, কেমন এক আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে ও মনে প্রথম বয়সের সেই প্রস্ফুট কান্তি ও অনুরাগ আবার যেন নূতন হইয়া বিলসিত হইল এবং তিনি এই সময়ে নিদ্রাবেশে নিত্য নূতন সুখস্বপ্ন দেখিতে পাইয়া, অশেষ প্রকার অভাবনীয় সৌভাগ্য কল্পনা করিলেন। এইরূপে এক, দুই করিয়া দশটি মাস অতিবাহিত হইয়া গেল; শচীর তখন

পর্য্যন্ত প্রসব হইল না। মিশ্র পুরন্দর জগন্নাথ অবস্থা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হইলেন। ক্রমে আরও দুইটি মাস অতীত হইল। তখন শুধু জগন্নাথ নহেন, শচী ও জগন্নাথের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সকলেই তখন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ইহার পর ত্রয়োদশ মাসের অবসান সময়ে, এক দিবস সন্ধ্যার একটুকু পরে, শচীর প্রসব লক্ষণ উপস্থিত হইল। সে দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা,—চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ হইবে জানিয়া নবদ্বীপের লোক-সমুদ্র উদ্বেল। সমস্ত নবদ্বীপ, হরিনামের আনন্দময় হল-হলায় উন্মাদিত।

"সর্ব্ব নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ,
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন।
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়,
হরি বোল হরি বোল বলি সবে ধায়।"

শুধু ইহাই নহে, কোথাও মৃদঙ্গ বাজিতেছে, কোথাও শঙ্খধ্বনি হইতেছে, অসংখ্য স্ত্রীলোক উলুধ্বনি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, ঠিক এমনই সময়ে, শচীর সূতিকাগৃহে পুনঃ পুনঃ উলুধ্বনি হইল, এবং যাহারা উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় শচীর সূতিকাগৃহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল, তাহারাও হর্ষোচ্ছ্বাসে "হরি" "হরি" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। হরি নামের কাঙ্গাল, হরিসঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের মহাগুরু, প্রেমভক্তির অপার্থিব পুতুল গৌরহরি, লক্ষ কণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনির মধ্যে,—এইরূপে অবতীর্ণ হইলেন এবং যাঁহাদিগের হৃদয় আরাধনায় স্বভাবতঃ অনুরাগী, তাঁহারা লৌকিক ঘটনানিচয়ের এইরূপ অচিন্তনীয় মিশ্রণ এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিপূর্ণতাতে যেন অলৌকিকতারই আভাস প্রত্যক্ষ করিয়া, ভক্তিতে মাথা নোয়াইলেন।

বিজ্ঞান-গায়ত্রী

অথবা

সৌরজগতের স্তুতি গীত।

"সর্ব্বপাপ-বিনাশক,"
সবে যার উপাসক,
জবা কুসুমের প্রায় বর্ণে যার রক্তিমা;
যাহার রূপের ঘটা,
ঊষার আলোক ছটা,
অপরূপ শশী যার—সে রূপের প্রতিমা।

উৎক্ষিপ্ত পিণ্ডেতে যার,
এই সৌর পরিবার,
গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা—সকলের জনম!
যে থাকিয়া কেন্দ্রস্থলে,
সকলে আকর্ষি বলে,
পালন করিছে সদা বিধাতার করম!

কনক-কিরীট-শালী
কি শোভে কিরণমালী
জ্বলদগ্নিপিণ্ড মহাতেজোময় নৃপতি!
আলোক উত্তাপ নিয়া,
সকলে রয়েছে জিয়া,
উহার কিরণ ছাড়া সকলেরি অগতি!

সবিতা সবার পিতা,
সবাকার প্রাণ-দাতা,
এই জ্ঞানে গ্রহগণ রহিয়াছে চাহিয়া;
প্রভায় পতঙ্গ প্রায়,
প্রেম-মুগ্ধ ভক্ত ন্যায়,
ভ্রমিছে অশ্রান্তগতি চারিদিকে ঘিরিয়া!

সৌর পরিবারগণে,
নিয়ে সব একস্থানে,
ভীষণ গোলক যদি হয় কভু গঠিত;
ছয় শত গুণ তার,
এক্কা সূর্য্য চমৎকার,
ভাবিতে যে ইহা হয় কল্পনাও মূর্চ্ছিত!

গায়ত্রীর অতি পূজ্য,
এ হেন বিরাট্ সূর্য্য,
অপর তারার ন্যায় একটি এ আকাশে!
ল'য়ে গ্রহ পরিবার,
(কি খেলা এ বিধাতার)
ছুটিয়াছে ঊর্দ্ধশ্বাসে হর-কুলিশ আবাসে!

হর-কুলিশ পুলয়ায়,
ল'য়ে লক্ষ তারকায়
কোন মহাশক্তি পানে চলিয়াছে ছুটিয়া;
ভাবিতে পারি না আর,
(হরি হে এ কি ব্যাপার,)
চেতনা বিলুপ্ত প্রায় যাই বুঝি মরিয়া!

সূর্য্যের প্রধান ভক্ত,
সে প্রেমের অনুরক্ত,
প্রেমাঞ্জলি দেয় বুধ সন্নিকটে থাকিয়া;
রূপে গুণে মনোহর,
ভেনাচ্ তাহার পর,
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আছে ব্যোম যুড়িয়া!

শুক্র ও বুধেতে নাই,
জীব যোগ্য বাস ঠাঁই,
তরল গোলক তারা জ্যোতির্ব্বিদ বলিছে!
সামান্য বালুকা মাঝে,
যাঁর সৃষ্ট প্রাণী রাজে,
তাঁরি সৃষ্ট দুটা গ্রহ প্রাণ-শূন্য ভ্রমিছে!
পণ্ডিতেরা যা বলুন, মনে ত না মানিছে!

ধন, ধান্য, প্রাণী ভরা,
আমাদের বসুন্ধরা,
ঘুরিছে আপন কক্ষে এক চন্দ্র লইয়া;
শুক্র ও বুধের দেশে,
চন্দ্রমা না কভু হাসে,
বিহনে এ সুধাধারা আছে তারা মরিয়া!

"দিব্য শঙ্খ তুষারাভ,"
অই চন্দ্র অমিতাভ,
পৃথিবীর প্রাণ প্রিয় প্রীতিপ্রদ দেবতা,

চকোর-চকোরীপ্রিয়,
যুবক-যুবতীপ্রিয়,
বালক-বালিকা-প্রিয়—মাথা প্রীতি-মমতা।

"ধরণীগর্ভ-সম্ভূত,
মহাবীর মহোদ্ধত,"
মঙ্গল তাহার পর রক্তরাগ রঞ্জনে;
"ডিমস্," "ফোবস্" নামে,
দু'টি চন্দ্র ডা'ইন বামে,
শশী সম সুধাময় নহে তারা কিরণে!

মঙ্গল গ্রহের পর,
ভ্রমে গ্রহ বহুতর,
নিজ নিজ পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া;
এক যোগে সব তার,
সমতুল্য চন্দ্রমার,
তবু চন্দ্র উপগ্রহ,—সূর্য্য সেবা ছাড়িয়া!

পরে গুরু বৃহস্পতি,
চারিটি চাঁদের পতি,
সূর্য্য ছাড়া বড় তার নাহি সৌর জগতে;
পাইয়া একটি চন্দ্র,
আমাদের মহানন্দ,
হয় না সে সুখাস্বাদ কল্পনা এ মরতে!

কি ভাব হৃদয়ে পশে,
ভাবুকের সেই দেশে,
শ্বেত, পীত, নীল নানা চন্দ্ররূপ হেরিয়া;
দেখিয়া যুবক তায়,
মোহ কি মরিয়া যায়,
শিশু বা কি বলে মায় চাঁদ দিতে ধরিয়া!

তার পরে শনৈশ্চর,
আট চন্দ্র-অধীশ্বর,
উড়িল গণেশ-মাথা যার দৃষ্টি পতনে!
আজো যারে ক'রে ভয়,
পুজে গৃহী সমুদয়,
যাহার দশার ভোগ ভয়াবহ ভুবনে!

নীল ও লোহিত পীত,
নানা বর্ণে সুচিত্রিত,
শনির শরীর খানি দেখে সবে বিস্ময়ে!
চন্দ্রহার শোভে দেহে,
সে দৃশ্যে দেবতা মোহে,
কোটি চন্দ্র গাঁথা তার তিন গাছি বলয়ে!

সে দেশ-নিবাসী যারা,
অমর নিশ্চয় তারা,
অত সুধা পানে কভু জরা মৃত্যু রয় না!
সে দেশের গাছ পালা,
রজত কিরণে আলা,
চকোর চকোরী তথা নিশিতে ঘুমায় না!

নদীতে নদেতে তার,
বহে স্রোত চন্দ্রমার,
বিচিত্র কিরণ স্রোতে হাসে মধু-যামিনী!
প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে,
নিশির শিশির সঙ্গে,
মাখিয়া সুধার ধারা হাসে বেলী কামিনী,
হাসে তরু—হাসে লতা ফল-পুষ্প-শালিনী!

ইউরেনচ্ তার পরে,
চারি চন্দ্রে সেবে যারে,

ঈষৎ সে নীল কান্তি কি সুন্দর দেখিতে!
পরে গ্রহ নেপ্‌চুন্,
পৃথিবীর শত গুণ,
দেখায় বিরাট সূর্য্য ক্ষুদ্র তথা হইতে!

এরা সৌর পরিবার,
হয় নাই আবিষ্কার,
নেপ্‌চুন্ পরে অন্য গ্রহ সৌরজগতে;
একে সীমা গ্রহ ধরি,
যদি গো গণনা করি,
পরিধি সতর কোটি মাইল পাই দেখিতে!!

অঙ্ক পরে অঙ্ক রাখি,
ছাই মাটি আঁকি উকি,
গণনা, ঘুরায়ে মাথা বল বা কি গণিলে?
নির্জ্জনে বসিয়া একা,
কত কি করিয়া লেখা,
কল্পনে, বলিয়া যাও তুমি বা কি দেখিলে?

পরস্পর আকর্ষণে,
ভ্রমে সব গ্রহগণে,
শূন্যে—শূন্যে—মহাশূন্যে কোটি জীব লইয়া!
এক সূত্রে গাঁথা সব;
কি যে মালা অভিনব,
গ্রহ উপগ্রহে,—যেন মণি মুক্তা মিলিয়া!

দেবের বালকগণে,
তুষিবারে সযতনে,
তেজোময় পিণ্ড সব লয়ে কোল দেবতা,
খেলিছেন শূন্যে যেন,
অনুমান হয় হেন,
তারি 'বল' গ্রহগণ, তারি 'বল' সবিতা!!

পর্ব্বত সাগর কত,
যার পৃষ্ঠে শত শত,
সাম্রাজ্য নগর কত নাহি তার গণনা!
"অনন্তা" সে বসুধায়,
বলিলে কি দোষ তায়?
ভাবিতে উৎপত্তি কাল হারে যার কল্পনা!

সূর্য্যের গহ্বর দেশে,
তের লক্ষ অনায়াসে,
এ অনন্তা বসুন্ধরা হ'তে পারে স্থাপিত;
ভাবিতে সে সবিতায়,
হৃদয় মূরছা যায়,
কবিত্ব পাণ্ডিত্য-জ্ঞান হয় সব দূরিত!

সকল সূর্য্যের পূজ্য,
"লুব্ধক" রাজ সূর্য্য,
হেন সূর্য্য হ'তে বড় দু'হাজার গুণেতে;
অনন্তা পৃথিবী তায়,
বালুকা কণার ন্যায়,
দুই শত ষাট কোটি পারে স্থান পাইতে!

"রিগেল," "বেগা" ও "মিরা"
"বিটেল্‌গো" "লুব্ধক" ছাড়া,
আছে আরো ক্ষুদ্র সূর্য্য স্ব স্ব রাজ্যে নৃপতি;
আলোক উত্তাপ দিয়া,
গ্রহ উপগ্রহ নিয়া,
ছুটিয়াছে শূন্যে—শূন্যে;—কার এই নিয়তি?

নগণ্য—নগণ্যতম,
যে ধরায় বাস মম,
সূর্য্য সনে তুলনায় ক্ষুদ্র এক গুটিকা!
শত সৌর রাজ্য কাছে,
তার কি তুলনা আছে?
সে বুঝি হইবে তার এক কণা বালুকা!!

কোটি ভাগ বালুকণা,
আমি তার এক জনা,
বৃথা দর্প অভিমান জ্ঞান বুদ্ধি বলেতে।
পরস্পর দ্বেষা দ্বেষী,
পরস্পর রোষা রোষী,
হায় রে! কণার কণা লয়ে এই জগতে!!

সামান্য মানব আমি,
কে তুমি জগত-স্বামী,
এ অপূর্ব্ব মালা গেঁথে পরিয়াছ গলেতে?
বুঝিতে বালুকা কণা,
যার জ্ঞানে কুলাবে না,
কেমনে ও দেহ তত্ত্ব ভাবিবে সে মনেতে?

বিশ্বরূপ দে'খে যাঁর,
(আমি নর কোন্ ছার,)
নরঋষি পার্থ বীর ভয়ে আঁখি মুদিলা;
কোটি চন্দ্র, কোটি সূর্য্য,
কোটি নর নারী পূজ্য,
কোটি বিশ্ব দেহে যাঁর দেখে গীত গাইলা!—

"অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥"
গীতা ১১শ অঃ, ১৯শ শ্লোক।

শ্রীঃ—

ছায়া দর্শন।

প্রস্তাবনা।

লঙ্কার রাবণ, বিষাদে অবসন্ন হইয়া বিলাপ করিয়া বলিয়াছিল,—

"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।
নর বানরের লীলা বুঝিতে না পারি॥"

রাবণ চিরদিনই হিন্দুদ্বেষী ছিল,—পুরাতন হিন্দু অর্থাৎ আর্য্যজাতির ঋষি-তাপস এবং ধর্ম্ম ও নীতি, সমস্তের প্রতিই তাহার ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল। সুতরাং, সে হিন্দুর ধর্ম্মবীর, —দয়া-ধর্ম্মের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের কর্ম্মনীতির প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। রামচন্দ্র মরিয়াও কেন মরিতেছেন না, এ সুগভীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাহার স্থূল বুদ্ধিতে প্রবেশপথ পায় নাই। যাঁহারা এখনও এই পৃথিবীতে হিন্দু ধর্ম্মের সারোদ্ধার সত্য ও সর্ব্বজন মঙ্গলময়ী হিন্দু সভ্যতায় অন্তরের সহিত বিদ্বেষী তাঁহারাও বহুবিষয়ে ঐ রাবণেরই অবস্থাপন্ন।

হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর সভ্যতা মরিয়াও মরে না, ইহা কহিয়া, তাঁহারা বহুকালহইতে বিলাপ করিয়া আসিতেছেন, এবং বোধ হয় চিরকালই এই ভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন।

হিন্দুজাতি পরলোকগত পিতামাতার স্বর্গ-শান্তিকামনায় শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া থাকে। আমরা যখন অল্পবয়স্ক বালক, তখন ইংরেজী শিক্ষিত যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই মুখে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ সম্পর্কে নানা প্রকার বিদ্রূপাত্মক কথা শুনিতাম, এবং কোন কথারই উত্তর করিতে জানি না বলিয়া, চিত্তে দুঃখিত রহিতাম। যাঁহারা দুটি ছত্র ইংরেজি পড়িয়াছেন, তাঁহারাই ঘৃণার সহিত নাসাগ্রকুঞ্চন এবং আরও পাঁচ প্রকারে ঘৃণা ব্যঞ্জন করিয়া, শ্রাদ্ধতর্পণের উপর গালি বর্ষণ করিতেন; এবং যে মরিয়া যায়, সে কি আবার শ্রাদ্ধের নম নম মন্ত্র শুনিবার জন্য ফিরিয়া আইসে, এই কথা বলিয়া, বিদ্বেষ ও বিরক্তি দেখাইতেন। আমরা অশিক্ষিত বালক। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিতাম; শুনিয়া মরমে মরিয়া থাকিতাম। মনে মনে ভাবিতাম, হায়! তবে কি হিন্দুজাতির সমস্ত সৎকর্ম্মই পাপ ও অধর্ম্ম, এবং হিন্দুনামও কি পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে? এ আজি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কালের কথা। সে কালের লোক দিগের মধ্যে যাঁহারা এক্ষণও কর্ম্মক্ষেত্রে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা সকলেই এ সকল কথায়, অক্ষরে অক্ষরে সাক্ষ্য দান করিতে পারিবেন। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার উপর এইরূপ বিকার ও বিদ্বেষের প্রকোপ সময়ে, যেই ভারতবর্ষে সংবাদ পহুঁচিল যে, ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিত, প্রসিদ্ধনামা অগাষ্ট কোম্‌টি, তাঁহার পরলোকগত প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে, শ্রাদ্ধের অনুরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অমনি এদেশের অসংখ্য শিক্ষিত যুবা, শ্রাদ্ধতর্পণের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য, ব্যগ্র হইলেন; অনেকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিতই পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের যে সকল তত্ত্বের সহিত শ্রাদ্ধতর্পণের অতিঘনিষ্ঠ গূঢ় সম্পর্ক, আমরা এই স্থলে তাহারই দুই একটি কথা সংক্ষেপে কহিব।

আমরা পৃথিবীর সুখ-লালসা ও প্রবৃত্তির দুর্নিবার পিপাসায়, যত কেন আত্মবিস্মৃত না রহি, মৃত্যু-চিন্তা তথাপি আমাদিগের মনের একটা ভাগকে সতত গ্রাস করিয়া রাখে। কারণ, যে ছিল, সে চলিয়া গিয়াছে, ইহাই পৃথিবীর সংবাদ। যে এখনও আছে, সে চলিয়া যাইবে, ইহাই পৃথিবীর আলোচ্য কথা। সম্রাট্ তাঁহার সোনার-সিংহাসনে, সুবর্ণমণ্ডিত, সুচারু-খচিত, চন্দ্রাতপের তলে, রূপের প্রভায়, চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি চলিয়া পড়িয়াছেন, চলিয়া গিয়াছেন। আর, রূপ-গুণ-বর্জ্জিত, গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত, রাজপথের কাঙ্গাল, গাছের তলায় কিংবা পথের ধূলায়, অশ্রু-সিক্ত-নয়নে উপবিষ্ট থাকিয়া, ধনগর্ব্বিত সমৃদ্ধদিগের নিকট হাত পাতিয়া ভিক্ষা করিত। সেও চলিয়া পড়িয়াছে, চলিয়া গিয়াছে। শিশু, তাহার মায়ের কোলে বসিয়া, খেলা করিতেছিল। সেখানেই সে চলিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। যুবা, নবযৌবন-বিলাসিনী নির্ম্মল-স্বভাবা সহধর্ম্মিণীর সহিত, নিভৃত-ভবনে, নিশ্চিন্ত-মনে, প্রণয়ের আলাপ করিতেছিল। হায়! সেও সেখানেই ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। এই কথাই পৃথিবীর কথা। এই সংবাদই পৃথিবীর সংবাদ। ইহা বই আর কথা নাই। ইহা ভিন্ন আর সংবাদ নাই। কেহ যাইতেছে, কেহ যায় যায় অবস্থায় পহুঁচিয়াছে, এবং যে এইমাত্র আসিয়াছে, সেও বা যাইবার পথে অকালে গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এই সকল কথার মধ্যে সার কথা এই, যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? হিন্দু শাস্ত্র, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, সজল-জলদের গম্ভীর স্বরে, জগতের সমস্ত অধিবাসীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছে, জীবাত্মার ধ্বংস নাই,—উহা অবিনাশী পদার্থ। অস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না,—আগুনে উহা পোড়ে না—জলে উহা ভিজে না এবং বায়ু উহাকে শোষণ করিতে পারে না। যথা ভূভারত-পূজ্য ভগবদ্গীতায়—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
গীতা ২য় অঃ ২৩শ শ্লোক।

গীতায় পুনশ্চ উপদিষ্ট হইতেছে, মনুষ্য যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে, যিনি মনুষ্যদেহের দেহী, অর্থাৎ জীবাত্মা, তিনিও দেহপাতের পর (সূক্ষ্মতর) নূতন দেহ ধারণ করিয়া জীবনের কার্য্য করেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
গীতা ২য় অঃ ২২শ শ্লোক।

বাল্মীকি, ব্যাস ও বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিরাও এই মহাসত্যকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। বাল্মীকির আরাধ্য রাম, জানকীর অগ্নিপরীক্ষাসময়ে, সূক্ষ্মশরীরী দশরথের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-বর্ণিত কুরুবীরদিগের মধ্যে অনেকে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর, গঙ্গার তটে, নিজ নিজ শোকাকুলা সহধর্ম্মিণীকে দর্শন দান করিয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিস্ময় ও শান্তি জন্মাইয়াছিলেন। এদেশের অনেকেই আগে এই সকল কথাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশ্রদ্ধেয় কথা জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেন। কারণ, যে কথা বিজ্ঞানে নাই, অধ্যাত্ম জ্ঞানে তৎসম্পর্কে সহস্র সাক্ষ্য থাকিলেও, তাহা অপ্রামাণিক। কিন্তু, সৌভাগ্যবশতঃ আজি ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরাও, শত শত তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া, ভারতীয় ঋষি-তাপসদিগের যোগ-জ্ঞানলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যে সাক্ষ্য দান করিতেছেন। ঋষিরা পরলোকগত পিতা মাতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেন,—

"আকাশস্থ নিরালম্ব,
বায়ুভূত, নিরাশ্রয়,
ইদং নীরং ইদং ক্ষীরম্
স্নাত্বা পীত্বা সুখী ভব।"

এই কথার ভাবার্থ এই যে, তুমি এইক্ষণ আকাশিক দেহ ধারণ করিয়াছ। এই পৃথিবীর কোন বস্তু এইক্ষণ আর তোমার অবলম্ব নহে।

বায়ু যেমন চক্ষের অদৃশ্য, তুমিও আজি সেই প্রকার আমাদিগের অদৃশ্য। তোমার উদ্দেশ্যে আজি এই জল গণ্ডূষ ও গণ্ডুষপূর্ণ দুগ্ধ উৎসর্গ করিতেছি, ইহাতে তোমার পরিতৃপ্তি হউক।

এই যে এখানে আকাশিক দেহের কথা হইতেছে, ইহারই এইক্ষণ বিজ্ঞাননির্দ্দিষ্ট নূতন নাম "ইথিরিয়াল বডি", অর্থাৎ ইথর নামক সূক্ষ্মপদার্থে গঠিত সূক্ষ্ম শরীর; এবং যাঁহারা পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ভাষায় যাঁহারা লোকান্তরিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরলোকে সূক্ষ্মশরীরী রূপে বিদ্যমান রহিয়া, জীবনের কর্ম্ম-ফল-ভোগ এবং জীবনী শক্তির নূতন বিকাশে উন্নতিলাভ করিতেছেন। তাঁহারা বাল্মীকিবর্ণিত দশরথ এবং ব্যাসবর্ণিত দুর্য্যোধন প্রভৃতির ন্যায়, অবস্থাবিশেষে,—এবং বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক নিয়মের ব্যবস্থায়,—আপনার পুত্র কলত্র এবং প্রিয় সুহৃদ্‌বর্গকে পৃথিবীতে দর্শন দান করিতে পারেন কি না, তাহা পাঠক নিম্নলিখিত প্রামাণিক বৃত্তান্তগুলি আলোচনা করিয়া নিজের জন্য নিজে অবধারণ করুন।

প্রথম অধ্যায়।

(১)

লর্ড ক্রহাম, এই নামের সহিত এদেশে অনেকেরই পরিচয় আছে। লর্ড ক্রহাম, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ইংলণ্ডে, জন্মসূত্রে অভিজাত না হইলেও কর্ম্মসূত্রে,—বিদ্যা, বুদ্ধিমান, সম্ভ্রম, চারিত্রবল ও পদমর্য্যাদায়, অতিবড় প্রসিদ্ধ লর্ডরূপে, সম্মানিত ছিলেন। এদেশে যাঁহারা লর্ড ক্রহামের ব্যক্তিগত গৌরব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও প্রকার তাঁহার নাম লইয়া থাকেন। একশ্রেণীর ব্যাগ গ্লাডষ্টোন ব্যবহার করিতেন বলিয়া যেমন উহার নাম গ্লাডষ্টোন ব্যাগ, সেইরূপ লর্ড ক্রহাম ব্যবহার করিতেন বলিয়া এক শ্রেণীর গাড়ীর নাম 'ক্রম' বা 'ক্রহাম'। লর্ড ক্রহামকে না জানিলেও 'ক্রম' বা 'ক্রহাম' গাড়ী প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

লর্ড ক্রহাম প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ব্যবস্থাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান বারিষ্টার, সত্যানুরাগী, দেবতার ন্যায় সত্যবাদী ও উচ্চশ্রেণীর নির্ভীক বড় লোক ছিলেন। তিনি, আমূল অনুসন্ধান না করিয়া, কোন তত্ত্বেই সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। লর্ড ক্রহাম বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়া, নানা কার্য্যে অশেষ যশ উপার্জ্জন ও গভীর মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। ঈদৃশ লোকের পক্ষে পরিণত-বয়সে, অসত্য কথা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা যুবতীর ন্যায়, কল্পিত বিভীষিকা দর্শনে অলীক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া, একে আর কহিয়া উপহাসাস্পদ হওয়াও তেমনি অস্বাভাবিক। লর্ড ক্রহাম, তাঁহার স্বহস্তলিখিত আত্মজীবনীতে ছায়াদর্শনের যে এক অতি বিস্ময়কর অদ্ভুত কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন, ছায়াদর্শন তত্ত্বের একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রামাণিক দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে সর্ব্বাগ্রে উহারই ভাবানুবাদ প্রকটিত হইল।—

লর্ড ক্রহাম লিখিয়াছেন,—"আমার জীবনে, এক সময়, বড়ই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঘটনাটি এতদূর বিস্ময়াবহ যে, আমি উহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ অবিকল লিপিবদ্ধ না করিয়া পারিলাম না। এডিনবরা হাইস্কুল হইতে বহির্গত হইবার পরে, আমি আমার শৈশব সময়ের একান্ত অন্তরঙ্গ সুহৃৎ,—'জির' সহিত একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। সেখানে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কোন বন্দোবস্ত বা ক্লাস ছিল না। কিন্তু আমরা উভয়ে, ভ্রমণ সময়ে, প্রতিনিয়তই, নানাবিধ গভীর তত্ত্বের আলাপ, আলোচনা ও পরস্পর তর্কবিতর্ক করিতাম। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও পরকাল সম্পর্কেও অনেক কথা হইত। মানুষের সঙ্গে, মানুষের মত সূক্ষ্মশরীরীর হাটিয়া বেড়ান, আমাদিগের মধ্যে ঠিক এমন কথা হইত না বটে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত লোককে দেখা দিতে পারে কি না, এরূপ প্রশ্ন তুলিয়া আমরা বহু বাদানুবাদ করিতাম। অবশেষে এই বাদানুবাদ এতদূর গড়াইল যে, আমরা উভয়ে গায়ের রক্ত দিয়া একটা সর্ত্তপত্র লিখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—"যদি মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এবং সেই আত্মা যদি কোন প্রকারে জীবিত ব্যক্তিকে দেখা দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, আমাদিগের মধ্যে যাহার মৃত্যু আগে হইবে, সেই অপরকে দেখা দিয়া পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহার যে সন্দেহ থাকে, তাহা ভঞ্জন করিয়া দিবে।" *

* গায়ের রক্তে যে প্রতিজ্ঞা লিখিত হয়, তাহা অবশ্য পালনীয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ইহা একটা চলিত প্রথা।

কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমরা দুই বন্ধু পৃথক্ হইলাম। 'জি' সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে গমন করিলেন; আমি দেশে রহিলাম। ভারতে প্রস্থানের পর 'জি' কিছুদিন, আমার নিকট চিঠি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু, কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, আমি তাঁহাকে এক বারেই ভুলিয়া গেলাম। এডিনবরাতে তাঁহার আত্মীয়, স্বজন ও পরিবারের তত গতিবিধি বা তেমন কোন কার্য্য প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সম্পর্কেও আমি প্রায়শঃ কোন কথা শুনিতে পাইতাম না। কালক্রমে শৈশবসৌহার্দ্দের সেই স্মৃতিচিহ্নও যেন আমার চিত্তপট-হইতে প্রক্ষালিত হইয়া গেল;—এমন কি, বাল-বন্ধুর অস্তিত্ব পর্য্যন্তও আমার চক্ষে এক প্রকার লোপ পাইল।

"শীতকাল। আমরা সুইডেন ভ্রমণে দুঃসহ হিমানী ভোগ করিয়া আসিয়াছি। এ অবস্থায় উষ্ণজলে অবগাহন যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনি প্রীতিপ্রদ। আমি রুদ্ধদ্বার স্নানাগারে উষ্ণজলে অবগাহন করিতেছি। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি চ্যায়ারের উপরে আমার পরিধেয় বস্ত্রাদি স্থাপিত রহিয়াছে। আমি অবগাহন অন্তে উঠিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়, সহসা সম্মুখের চ্যায়ারে চক্ষু পড়িল, সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—ভারতপ্রবাসী আমার সেই শৈশবসুহৃদ্ 'জি' ঐ

চ্যায়ারে বসিয়া, স্থির, ধীর ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

"অতঃপর, কখন, কি ভাবে, আমি ঐ স্থানের স্থান হইতে উঠিয়া আসিলাম, সে জ্ঞান আমার কিছুমাত্র নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছি; সেই অদ্ভুত ছায়ামূর্ত্তি,—আমার সেই বাল-সুহৃদের প্রতিকৃতির কোন চিহ্ন সেখানে নাই। প্রাণে কেমন একটা আঘাত লাগিল, আমি এবিষয়ে, কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। কিন্তু এই দৃশ্য আমার চিত্তপটে এমন দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিল যে, আমি আর কিছুতেই উহা ভুলিতে সমর্থ হইলাম না। অবিকল কাহিনীটি ও ঘটনার তারিখ ১৯শে ডিসেম্বর, আমার নোটবুকে লিখিয়া রাখিলাম।

"ভাবিলাম,—স্নানাগারে, কোন কারণে হয় ত হঠাৎ আমার নিদ্রাবেশ হইয়াছিল, এবং সেই নিদ্রাবেশেই 'জি"র' মূর্ত্তি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু, আজি সহসা দিবাভাগে, স্নানাগারে বসিয়া, এরূপ স্বপ্ন-দেখিবার কারণ কি? বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, 'জি'র সহিত আমার কোনরূপ পত্রীয় আলাপ পর্য্যন্ত নাই। তাঁহার কথা মনে পড়িতে পারে, এমন কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আমাদিগের সুইডেন ভ্রমণের সময়েও 'জি', ভারতবর্ষ অথবা 'জি' কিংবা তদীয় পরিবার সম্পর্কে কোন দিক দিয়া কোন প্রসঙ্গ বা কথার উত্থাপন হয় নাই। তবে এই বিচিত্র স্বপ্ন কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আমাদিগের যৌবনকালের সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হইল। মনে লইল,—'জি'র অবশ্যই মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং পারলৌকিক জীবনের প্রমাণ প্রদর্শনার্থই, তিনি হয়ত এইরূপে আমাকে দেখা দিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, এই ধারণা আমি কোনপ্রকারেই আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে অপসারণ করিতে পারিলাম না। ঘটনার তারিখ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ ১৯শে ডিসেম্বর।"

লর্ড ব্রুহাম, বহু বৎসর অন্তে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, উল্লিখিত কাহিনীর শেষভাগে নিম্নলিখিত কএক পংক্তি যোগ করিয়া রাখেন।—"আমি এক্ষণ আমার জীবন বৃত্তান্ত হইতে এই আশ্চর্য্য স্বপ্নের কাহিনী নকল করিলাম। এই কথার পরিসমাপ্তির নিমিত্ত এস্থলে ইহা বলা একান্ত আবশ্যক যে, উক্ত স্বপ্ন দর্শনের অল্প কএক দিন পরেই আমি এডিনবরায় ফিরিয়া আসিলাম। এডিনবরায় প্রত্যাবৃত্ত হইবার অল্পকাল পরেই ভারতবর্ষ হইতে 'জি'র মৃত্যুসংবাদ আসিল। চিঠিতে লেখা ছিল, 'জি' ১৯শে ডিসেম্বর তনুত্যাগ করিয়াছেন।"

এই কাহিনী সম্পর্কে প্রথমতঃ এইরূপ তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, ইহা লর্ড ব্রুহামের দিবাস্বপ্ন বা দৃষ্টিভ্রম। কিন্তু তিনি যে বন্ধুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ঘটনার ছয় মাস পূর্ব্বেও কথাপ্রসঙ্গে যাঁহার কথা, মুহূর্ত্তের তরেও মনে চিন্তা করেন নাই, হঠাৎ স্নানাগারে বসিয়া দিবাভাগে তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিলেন। ইহা

কিরূপে সম্ভবপর? দ্বিতীয়তঃ, ইহা যদি প্রকৃতই স্বপ্ন বা চক্ষের একটা অলীক ধান্ধা হয়, তাহাহইলে, 'জি'র মৃত্যুর তারিখ ও এই ঘটনার তারিখ এক হইল কি সূত্রে? পাঠক, চিন্তা করিয়া দেখুন, এই ছায়া-দর্শন প্রকৃত-প্রস্তাবে কি? বস্তুতঃ, লর্ড ব্রুহামের স্বহস্ত-লিখিত ছায়া-দর্শনের এই বিস্ময়কর কাহিনীতে যে কোন দিক দিয়া, কোন রূপ, অসত্য উক্তি বা অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যানের কোনই সম্ভাবনা নাই, লর্ড ব্রুহামের সত্যনিষ্ঠতা, চরিত্রগত উচ্চতা ও বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় যিনি অবগত আছেন, তিনিই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। *

(২)

পূর্ব্বে ও উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, এই দুই মহাসাগরের সন্ধিস্থানে, তরঙ্গমালায় নিত্যসংবর্দ্ধিত হইয়া, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জ বিরাজমান। অষ্ট্রেলিয়া একটি বৃহৎ বৃটিস্ উপনিবেশ। নিউ সাউথ্ ওয়েল্স্ প্রদেশ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। নিউসাউথ্ওয়েল্সের পূর্ব্বপ্রান্ত রেখায়, প্রশান্ত মহাসাগরের তটে, সিড্নি বা পোর্টজ্যাক্সন বন্দর। সিড্নি বা পোর্টজ্যাক্সন, এক্ষণ নিউ সাউথওয়েল্সের একটা প্রসিদ্ধ স্থান। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইহা সামান্য একটা বন্দী উপনিবেশ মাত্র ছিল। সিড্নি বা পোর্ট জ্যাক্সনের অনতিদূরে, 'বোটানীবে' নামে একটি ক্ষুদ্র বন্দর দৃষ্ট হয়। বন্দিগণ পূর্ব্বে, এই স্থলেই প্রেরিত হইত। বোটানীবেতে নানাজাতীয় সুন্দর সুন্দর পুষ্প প্রচুর পরিমাণ জন্মিত; এই হেতুই হয়ত নাম বোটানীবে বা মোহন উদ্ভিদুদ্যান। কিন্তু বন্দী রাখার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক মনে করিয়া, অবশেষে বন্দী উপনিবেশ, বোটানীবে হইতে সিড্নি বা পোর্টজ্যাক্সনে উঠাইয়া আনা হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় তখন, বনের একটা পাখী মারিলে, অথবা ফাঁদ পাতিয়া সামান্য একটা বন্য শশক ধরিলেও, কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ হইত, এবং এইরূপ সামান্য অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগেরও পোর্টজ্যাক্সনই নির্ব্বাসনস্থান ছিল। কারাক্লেশ, সময় সময়, এতদূর কঠোর ও অসহনীয় হইয়া উঠিত যে, বন্দীরা আপনাদিগের মধ্যে, পরস্পর পরামর্শ পূর্ব্বক, একে অন্যের প্রাণবধ করিয়া হত্যা অপরাধে ফাঁসি কাষ্ঠে বিলম্বিত হইবার

* রেভারেণ্ড ফ্রেডারিক জর্জ্জ লি অতি বড় প্রগাঢ় পণ্ডিত ও একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ছায়াদর্শন-তত্ত্ব খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বিষয়। লি মহোদয় এই তত্ত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা বহু প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, তিনি এই তত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হন এবং ছায়া-দর্শনের অসংখ্য-প্রামাণিক কাহিনী সংগ্রহ করিয়া Glimpses of the Supernatural নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লর্ড ব্রুহামের এই কাহিনী উক্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের আরও বহু কাহিনী ক্রমশঃ বান্ধবে প্রকাশ করিব।

পথ করিয়া লইত। এইরূপে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে দুর্ব্বিষহ কারাজীবন শেষ করিয়া ফেলিতে অনেকেই ইচ্ছা পূর্ব্বক অগ্রসর হইত। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায়, এই অবস্থার, এক্ষণ আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

পোর্টজ্যাক্সন যে সময়ে উল্লিখিতরূপ 'বন্দী উপনিবেশ,' সেই সময়ে, উহার সন্নিকটে ফিশার নামে একটি লোকের বাস ছিল। ফিশার একজন বড় যোতদার। বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা ভাল ব্যবহার করিয়া প্রশংসা পাইত, গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ দিগের বাটীতে কাজ কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেন। লোকে ইহাদিগকে 'গবর্ণমেণ্ট মেন' বা সরকারি লোক বলিত। ফিশার গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া জেম্‌স্ নামক একটি 'সরকারি লোক'কে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। জেম্‌স্ যেমন চতুর, তেমনি প্রভুর চিত্তবিনোদনে নিপুণ। সুতরাং, সে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিশারের একান্ত বিশ্বাসভাজন এবং তদীয় কার্য্য পরিচালনায় একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। জেম্‌স্ প্রতিনিয়তই, প্রভুর ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যজাত ও গোমেষাদি পশু লইয়া নিকটবর্ত্তী হাটে গমনাগমন করিত। তাহাকে ফিশারের এতদূর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইতে দেখিয়া প্রতিবেশীরা, সময় সময়, তাহার প্রতি হিংসার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

ফিশার এখন আর একদিনের তরেও হাটে যাতায়াত করেন না। একমাত্র জেম্‌স্‌ই হাটের দিন হাটে যাইয়া হাটের কর্ম্ম করিয়া আইসে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে, "জেম্‌স্ তোমার প্রভু ফিশার কোথায়?" সে উত্তর দেয়, "তিনি ইংলণ্ড যাত্রার উদ্যোগে আছেন।" অতঃপর একদিন জেম্‌স্ প্রচার করিয়া দিল যে, তাহার প্রভু ফিশার সিড্‌নি হইতে জাহাজে উঠিয়া লণ্ডন চলিয়া গিয়াছেন।

জন্‌সন্ ফিশারের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী। জন্‌সন্‌ও একজন যোতদার। জন্‌সন্ ও ফিশারের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা। জন্‌সন্‌ও জেম্‌সের মুখে শুনিলেন, ফিশার লণ্ডন চলিয়া গিয়াছেন। ফিশার জন্‌সন্‌কে না জানাইয়া প্রায়শঃ কোন কার্য্য করিতেন না। অথচ এতদূরের পথে সমুদ্র-যাত্রা করিলেন, বন্ধু জন্‌সন্ তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না, এ বড়ই বিচিত্র ও বিস্ময়কর কথা। ফিশারের এইরূপ আচরণে জন্‌সন্ মনে মনে দুঃখিত ও একান্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি পত্নীর নিকট পুনঃ পুনঃ কহিলেন,—ফিশার তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন, স্বপ্নেও তিনি ইহা ভাবেন নাই।

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ফিশারের কোন সংবাদ আসিল না। কিন্তু, ফিশার তাঁহাকে না জানাইয়া, অষ্ট্রেলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, জন্‌সনের মনে কিছুতেই এই বিশ্বাস স্থান পাইল না। জন্‌সন্ স্থির করিলেন, বন্ধু ফিশার, না জানি কি এক বিচিত্র ভাব বা প্রয়োজনের বশবর্ত্তী হইয়া,

গুপ্তরূপে গা ঢাকা দিয়া আছেন;—তিনি কখনও তাঁহাকে না কহিয়া দেশান্তর গমন করেন নাই।

জন্‌সন্‌ও হাটে যাইতেন। ফিশারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া হাটে যাইবার একটা নির্জ্জন পথ ছিল। জন্‌সন্ চিরদিনই এই জনশূন্য পথে হাটে যাতায়াত করিতে ভালবাসিতেন। একদা জন্‌সন্ হাটের কর্ম্ম সমাধা করিয়া ঐ নির্জ্জন ও নীরব পথে একাকী বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যার রক্তিম রাগ ভেদ করিয়া তখনও অন্ধকার পৃথিবীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই। জন্‌সন্ ফিশারের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। সম্মুখে একটা দরোজা। জন্‌সন্‌কে দরোজা পার হইয়া যাইতে হইবে। জন্‌সন্ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, ঐ দরোজার মধ্যে, তাঁহার বন্ধু ফিশার উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মুখে সে প্রফুল্লতা নাই। মুখখানি বিষাদে মলিন। চক্ষু দুটি কি যেন এক গভীর ছায়ায় আচ্ছন্ন, মুখশ্রীতে দুঃসহ যন্ত্রণার ভাব পরিস্ফুট। প্রথম দর্শনে জন্‌সন্ বিস্মিত হইলেন না। কারণ, তাঁহার পূর্ব্বেই এই ধারণা ছিল যে, ফিশার বিদেশে গমন করেন নাই;—দেশেই আছেন। কি কারণে, গোপনে রহিয়া এই এক রকমের কৌতুক বা রঙ্গ করিতেছেন। যাহা হউক, আজি ধরা পড়িয়াছেন। আর লুকাইবার উপায় নাই। এখনই সকল রহস্য বাহির হইয়া পড়িবে। জন্‌সন্ মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, অতি সন্তর্পণে অথচ দ্রুতপদে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, চক্ষের সম্মুখে পাইয়াও বন্ধুকে ধরিতে পারিলেন না। তিনি যেই নিকটস্থ হইলেন, ফিশারের সেই মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত দেহও অমনি বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া অদৃশ্য বায়ু-জগতে মিশিয়া-গেল। বিস্মিত জন্‌সন্ ক্ষণ কাল, বজ্রাহতের ন্যায়, বিস্ফারিত ও স্পন্দীহন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। বুক্ ধরাস্ ধরাস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবী যেন ঘুরিতে লাগিল। জন্‌সন্ বহু আয়াসে আত্মসংবরণ করিয়া ঐ স্থানে একটু অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু কোথাও, আর সেই মূর্ত্তির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হইলেন না। ভাবিলেন, একি দেখিলাম! একি দিবা স্বপ্ন?—না অপদেবতা?

জন্‌সন্ ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু অস্থির চিত্ত স্থির হইল না। মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি নাই। যদিও সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, তথাপি সুস্থিরভাবে বসিতে বা আহার করিতে পারিলেন না। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। পত্নী পতির ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ এমন আকুল ও অধীর কেন, কি হইয়াছে, খুলিয়া বল।" জন্‌সন্ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আমি হয় উন্মাদ হইতে চলিয়াছি, আর না হয়ত, প্রকৃতই মৃত আত্মার ছায়া-দর্শন করিয়া, প্রাণে একান্ত বিকল ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।" অতঃপর তিনি পত্নীর নিকট উল্লিখিতরূপ ছায়া-দর্শনের কাহিনী, সমস্ত খুলিয়া

কহিলেন। পত্নী পতির অবস্থা দর্শনে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিলেও, ভাব গোপন করিয়া, হাস্যমুখে বলিলেন ;—"ও কিছুই নয়। সারা দিন গুরুতর শ্রম করিয়াছ। ক্লান্ত শরীরে একাকী আসিতেছিলে, হয়ত মনে ফিশারের কথা ভাবিতেছিলে, তাই হঠাৎ চক্ষে কি একটা ধাঁধা দেখিতে পাইয়াছ। একটু ঘুমাও, তবেই প্রকৃতিস্থ হইবে।" জন্‌সন্ তাহাই করিলেন।

এপ্রসঙ্গে আর কোন কথাই হইল না। এক দিন দু দিন করিয়া, ফিরিয়া আবার হাটের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। জন্‌সন্ হাটে গেলেন এবং সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্‌কালে, আবার সেই নির্জ্জন পথে, তেমনি ভাবে, গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। সূর্য্য এখনও অস্তগমন করে নাই। সূর্য্য কিরণ, এখনও সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী ছাড়িয়া, আকাশে এক মাত্র মেঘের অঙ্গে রঙ্গ ফলাইয়াই পরিতৃপ্ত নহে; এখনও উহা উচ্চতরুশিরে সোনার মুকুট পরাইতেছে; অনাবৃত মাঠে, ক্ষীণতম প্রভায়, এখনও পদার্থ নিচয়ের সুদীর্ঘতম ছায়া ফলাইয়া খেলা করিতেছে। জন্‌সন্ ফিশারের ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অদূরে সেই দরোজা। দরোজা আজি জনশূন্য কি?—না ঐত আবার সেই দৃশ্য! ফিশারের সেই মূর্ত্তি, আজিও সেই দরোজায় দণ্ডায়মান! জন্‌সন্ দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিলেন। বুঝিলেন, দৃষ্টিভ্রম নহে। প্রকৃতই ফিশার দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পরিধানে ফিশারের সেই চিরপরিচিত পরিচ্ছদ। বৈকালিক সূর্য্যালোকে সেই দেহের দীর্ঘায়ত ছায়া মাঠে গড়াইয়া পড়িয়াছে। ফিশার জন্‌সনের দিকে চাহিয়া কি বলিবার উপক্রম করিলেন; কিন্তু বলা হইল না। জন্‌সনের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন এবং ক্ষণেকের তরে যেন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। অতঃপর যখন আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন দেখিলেন, ফিশারের সে মূর্ত্তি আর সেখানে নাই। ভীতিবিহ্বল জন্‌সনের মনে বন্ধু ফিশারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হইল।

পরদিন, অতি প্রত্যূষেই জন্‌সন্ তাঁহার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং তাঁহার নিকট এই বিস্ময়কর ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। জন্‌সনের এই বন্ধু তথাকার একজন গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী;—সুশিক্ষিত ও নানাবিষয়ে পরিপক্ক লোক। জন্‌সন্ জেম্‌সের নিকট যাইয়া এবিষয় প্রশ্ন করিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু বন্ধু তাহাতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি কল্য দুপ্রহরে উক্ত দরোজার নিকট উপস্থিত থাকিও, আমিও এদেশীয় খুব পরিপক্ক ডিটেক্‌টিভ্ সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইব। এবং তুমি যে সন্দেহ ও আশঙ্কা করিতেছ, উহার কোন ভিত্তি আছে কি না, তদ্বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিব।"

পরদিন তাহাই হইল। অষ্ট্রেলীয় ডিটেক্‌টিভ্ অদ্ভুত কৌশলে, ঐ দরোজার অদূরবর্ত্তী একটা পুকুরে মৃতদেহ আছে, স্থির করিল। অতঃপর ঐ দিনই সন্ধ্যার সময়, ডিটেকটিভের

প্রদর্শিত স্থান হইতে একটি অর্দ্ধগলিত শব উত্তোলিত হইল। জন্‌সন্ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, উহা তাঁহারই বন্ধু ফিশারের মৃতদেহ। কে তাঁহাকে যারপর নাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়াছে! পুলিস হত্যাকারী সন্দেহে জেম্‌স্‌কে গ্রেপ্তার করিল।

যথাসময়ে জেম্‌সের বিচার হইল। ফিশারের লণ্ডন গমন সম্বন্ধে যে মিথ্যাকথা প্রচার করিয়াছিল, ইহা ছাড়া জেম্‌সের বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ ছিল না। বিচার সময়ে, জেম্‌স্ অপরাধ অস্বীকার করিল। কিন্তু জন্‌সন্ যে অদ্ভুত কাহিনী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে বিচারকের মনে কেমন একটা সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনার্থ একটা চাতুরির আশ্রয় লইলেন। জুরিগণ, আসামী অপরাধী কি নিরপরাধ, ইহা সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত, নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিলে, জজ জেম্‌স্‌কে আদালতের বাহিরে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। ক্ষণেক পরে, একটি কর্ম্মচারীর দ্বারা জেম্‌স্‌কে বলিয়া পাঠান হইল যে, জুরিগণ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। জেম্‌স্ ইহা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তবে আর গোপন করি কেন?—হাঁ, আমিই আমার মুনিব ফিশারকে হত্যা করিয়াছি। তিনি তাঁহার একটা ক্ষেত্রের দরোজায় উপবিষ্ট ছিলেন। এই সময়, আমি তাঁহাকে সাংঘাতিক আঘাতে হত্যা করিয়া মৃত দেহ বহিয়া নিয়া ঐ পুকুরে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম। ইহা যে প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে আমি বস্তুতঃই শান্তিলাভ করিয়াছি। এই কার্য্য করিবার পরে, আমি যে আমার প্রাণের মধ্যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। আজ আমার মনের সেই দুঃসহ ভার লঘু হইল।"

এই স্বীকার উক্তির বলে জেম্‌সের ফাঁসি হইল, এবং ছায়া-দর্শনের এই অদ্ভুত কাহিনী আদালতের নথিভুক্ত হইয়া রহিল।

জন্‌সন্ যখন ফিশারের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তিনি অবশ্যই বন্ধু ফিশারকে ভুলিয়া যান নাই। তখন ফিশারের কথা অনেক সময়ই চিন্তা করিতেন। সুতরাং, তাঁহার পক্ষে হঠাৎ দৃষ্টিভ্রমে ফিশারের কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু একই স্থানে ঐ মূর্ত্তির পুনঃ দর্শন, এবং সেই দর্শনের ফলে, ডিটেক্‌টিভ্ কর্ত্তৃক বিস্ময়কর হত্যা ঘটনার আবিষ্কার, ইহাতে আর দৃষ্টিভ্রম, বা অলীক বিভীষিকার আরোপ করা চলে কিরূপে? বস্তুতঃ এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ বা প্রতিবাদ নাই।*

* এমা হার্ডিঞ্জ ব্রিটেন, ইংলণ্ডের অন্যতর অসামান্যা বিদুষী ললনা। তিনি যেমন সত্যানুরাগিণী তেমনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ডারউইনের বিজ্ঞান-সখী প্রথিতনামা ডক্‌টার ওয়ালেস্ দেবশক্তি-সম্পন্না রমণী জ্ঞানে যাঁহার পূজা করিয়াছেন, টাইম্‌স পত্রিকা যাঁহার বাগ্মিতার প্রশংসা করিতে যইয়া পুরুষের মধ্যেও তাঁহার ন্যায় বক্তা অতি বিরল বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই এমা হার্ডিঞ্জের লেখা হইতে এই কাহিনী সংগৃহীত হইল। এমা হার্ডিঞ্জ, বৎসর দুই হইল, পরলোকগতা হইয়াছেন।

—:*:—

কবি শ্রীহর্ষ।

সংস্কৃত সাহিত্যাদির বহুস্থলে শ্রীহর্ষের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের ইতিহাস, রাজতরঙ্গিণী, রত্নাবলী, নাগানন্দ, হর্ষ-চরিত, প্রবন্ধ-কোষ, নৈষধ চরিত প্রভৃতি বহু সুপ্রথিত গ্রন্থের সহিত শ্রীহর্ষের যশঃপূত নাম বিশেষভাবে জড়িত।

এই বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত শ্রীহর্ষ ভিন্ন কি অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা অভ্রান্তরূপে নিরূপণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কোন্ শ্রীহর্ষ, কোন্ সময়ে, কোন্ বংশে, জন্মগ্রহণপূর্ব্বক, কোন্ দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাদি পরিদৃষ্ট হয় না। শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে কতিপয় কৃত-বিদ্য ব্যক্তি আলোচনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে কোন প্রত্নতত্ত্বের উদ্ঘাটন করিতে হইলে, "ভানুসিংহ জীবনী"র (১) পুনরাবৃত্তি করিতে হয় মাত্র। "মনে করি" "বোধ হয়" "সম্ভবতঃ" প্রভৃতি শব্দ যত দিন ভাষার ভাণ্ডারে সজীব থাকিবে, তত দিন অপ্রবিষ্ট-ইতিহাস-জ্যোতিঃ অতীতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে মহাপুরুষদের জীবনতত্ত্বরত্নরাজি সংগ্রহ করা তত কঠিন ব্যাপার নহে। আমরাও এই পতিতপাবন শব্দাবলীর অনুকম্পায় এবং 'অনুমান খণ্ডের' অখণ্ড জ্ঞানপ্রভাবে সিদ্ধান্ত কুঞ্জবনের সুখ সীমায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

আলোচনায় আমরা যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে রাজতরঙ্গিণীর সিংহাসনারূঢ় শ্রীহর্ষ এবং রত্নাবলী ও নাগানন্দের "শ্রীহর্ষঃ নিপুণঃ কবিঃ" একব্যক্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

ইহার অনুকূলে মম্মথভট্ট প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থকার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। (২)

আমাদের বিবেচনায় কান্যকুব্জেশ্বর শ্রীহর্ষ ও হর্ষচরিতের শ্রীহর্ষ অপৃথক্ ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত নাটকদ্বয়-রচয়িতা এবং হর্ষ চরিতের নায়কও ভিন্ন নহেন। এই নৃপ কবির তত্ত্বানুসন্ধান করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং আমরা এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় বিরত রহিলাম।

(১) নবজীবনে প্রকাশিত।

(২) "কাব্য প্রকাশকার মম্মথভট্ট প্রকাশাদর্শের মহেশ্বর, উদ্যোতের রচয়িতা নাগেশ ভট্ট, প্রকাশতিলক প্রণেতা জয়রাম, প্রকাশপ্রভার বৈদ্যনাথ, প্রভৃতি বলেন, "ধাবকনামা কবি স্বরচিত রত্নাবলী নাটিকা শ্রীহর্ষ রাজার নিকট বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ লাভ করেন"। অনেকে বলেন, ধাবক কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, সুতরাং তাঁহারও কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষের সম সাময়িকতা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উক্ত "নিপুণঃ কবির" আবির্ভাব কাল রাজতরঙ্গিণীর প্রমাণ বলে ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব ও খ্রীঃ ১০০৯ অব্দের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে (১)। নৈষধ চরিতের প্রণেতা শ্রীহর্ষ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার আলোচনাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

জৈন রাজশেখর সূরি বিরচিত প্রবন্ধকোষে এই শ্রীহর্ষ কাহিনী সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। অনেকের নিকটেই প্রবন্ধকোষ অত্যুক্তি দোষ দুষ্ট বলিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত নহে। আমরাও বহু কারণে উহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না।

কবি স্বয়ং যে আত্ম পরিচয় প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই,—

শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জবাসী ব্রাহ্মণ বংশীয় শ্রীহীর পণ্ডিতের ঔরসে মা মল্ল দেবীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন (২)। তিনি নৈষধ চরিত ব্যতীত 'অর্ণবযান', 'নব সাহসাঙ্ক চরিত', 'বিজয়া প্রশস্তি,' 'গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি', 'চিচ্ছন্দ-প্রশস্তি' 'শিবশক্তি সিদ্ধি,' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা উহার বহুগ্রন্থই প্রাপ্ত হইতেছি না। এই সকল গ্রন্থের নাম নৈষধ চরিতের কতিপয় সর্গ শেষে উল্লিখিত হইয়াছে (৩)।

সম্ভবতঃ ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ ইহাঁর আবির্ভাব কাল। ইনি দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্য্য ও রাজা আদিশূরের সমসাময়িক লোক ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য ও ইহাঁর সমকালবর্ত্তিতা শ্রীহর্ষের নিজ উক্তিতেই সপ্রমাণ হয়। কবি নৈষধ কাব্যে স্বপ্রণীত "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" নামক গ্রন্থান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন (৪)।

শঙ্কর-জীবনী পাঠে জানা যায়, নৈমিষ প্রদেশে এক অতি ব্যুৎপন্ন নৈয়ায়িক শিরোমণি বাস করিতেন। দিগ্বিজয়ী শঙ্কর, ন্যায় বাদ বিতণ্ডায় ইহাঁকে পরাভূত করিয়া নিজের বশীভূত করিয়াছিলেন। (৫) এই শঙ্করবিজিত বিবুধকুল বরেণ্য হর্ষমিশ্রই "অবশেষে ন্যায় বাদ খণ্ডন ও বেদান্তবাদ স্থাপন উদ্দেশ্যে সুপ্রসিদ্ধ "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য নামক সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন" (৬)। ইহা দ্বারা স্পষ্টই

(১) এই সম্বন্ধেও বহুমত পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাহুল্য ভয়ে, অধ্যাপক উইল্‌সন প্রভৃতি মহাত্মাগণের অভিমত উপেক্ষিত হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় কৃত কাব্যপ্রকাশের ভূমিকা (১৯।২০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

(২) "শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজি মুকুটালঙ্কার হীরঃ সুতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মা মল্ল দেবী চ যম্"। ইত্যাদি নৈষধ সর্গশেষ।

সম্বন্ধ নির্ণয়ে বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন শ্রীহর্ষের পিতার নাম মেধাতিথি ছিল, শ্রীহীর উহার ডাক নাম অথবা মুকুটালঙ্কার হীরঃ এই উপাধির অপভ্রংশ মাত্র; কিন্তু আমরা ইহার প্রামাণিক কোন তত্ত্ব প্রাপ্ত হইতেছি না।

(৩) নৈষধ চরিতের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১শ, ১৭শ, ২২শ প্রভৃতি সর্গের শেষ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৪) খণ্ডন খণ্ডতেঽপি সহজাৎ ইত্যাদি

(৫) মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করবিজয় ১৩।১ সর্গ। নৈষধ ৬ষ্ঠ সর্গ।

(৬) সাহিত্য পারিষৎ পত্রিকা, ৭ম ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যা, শঙ্কর ও শাক্যমুনি। ১৩পৃঃ।

প্রতীত হয় যে, শঙ্কর-বশীকৃত হর্ষমিশ্র ও নৈষধকার শ্রীহর্ষে একব্যক্তিত্বের কল্পনা অনুমান বিজৃম্ভিত নহে। পূর্ব্বোক্ত হর্ষমিশ্রের ন্যায় কবি শ্রীহর্ষেরও অসাধারণ নৈয়ায়িকতা তদীয় কাব্যের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। সাগর-গমনেচ্ছুর হিমালয় প্রয়াণের ন্যায় কবি স্বীয় কাব্যের বহু স্থলেই রসালঙ্কারাদি সমাবেশের পরিবর্ত্তে ন্যায়শাস্ত্রের কূট মীমাংসার অবতারণা করিয়াছেন।

উভয়ের নামগতও (শ্রীহর্ষ শ্রীযুক্ত হর্ষ এবং শুধু হর্ষ) সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই।

বিশেষতঃ আমাদের দেশে বিভিন্ন লেখক রচিত ন্যায়শাস্ত্রের দুই খানি "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গ্রন্থ নয়নগোচর হইতেছে না। আমরা এক-খানি "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" সংগ্রহ করিয়াছি। উহার চতুর্থ পরিচ্ছেদের উপসংহার ভাগে এবং নৈষধীয় চরিতের দ্বাবিংশ সর্গের শেষ অংশে, কবি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট যে সম্মান-সূচক আসন ও তাম্বুলদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ঠিক এক ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন (১)।

ইহাতে শঙ্কর পরাভূত নৈয়ায়িক হর্ষ-মিশ্রই নৈষধ কবি শ্রীহর্ষ বলিয়া অনুমিত হয় না কি? বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবং প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্গের উজ্জ্বল-তম রত্ন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, রাজা আদিশূরকর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্য-তম "শ্রীহর্ষঃ হর্ষবর্দ্ধনঃ" ও পূর্ব্বোক্ত শ্রীহর্ষ বা হর্ষমিশ্র অপৃথক্ ব্যক্তি (২)

আমাদেরও বিশ্বাস, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পা-দনের জন্য রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ প্রভৃতি যে পাঁচ জন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনয়ন করেন, শ্রীহর্ষ তন্মধ্যে একজন (৩) এবং এই কবি শ্রীহর্ষই নৈষধ চরিতের রচয়িতা।

শঙ্করাচার্য্য ও আদিশূরের সময় নিরূপণ ব্যাপারেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। মহাত্মা শঙ্কর খ্রীঃ ৮০০ শত অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঃ—০

(১) তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্য-কুব্জেশ্বরাৎ, যঃ সাক্ষাৎ কুরুতে সমাধিষু পর-ব্রহ্ম প্রমোদার্ণবম্। যৎ কাব্যং মধুবর্ষিধর্ষিত পরাস্তর্কেষু যৎস্যাক্তয়ঃ; শ্রীহর্ষস্য কবেঃ কৃতিঃ কৃতি মুদে তস্যাভ্যুদীয়াদিয়ম্।

খণ্ডন খণ্ড খাদ্য, ৪র্থ পঃ শেষ শ্লোকা।

"তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভেতে যঃ কান্যকুব্জে-শ্বরাৎ" ইত্যাদি নৈষধ ২২ সর্গ শেষ শ্লোক।

(২) See Babu Rajendra Lal's paper on Mohendra Pal, in the journal of the Asiatic society of Bengal, এবং আর সি দত্ত কৃত ভারতের ইতিহাস ৩৯ পৃষ্ঠা।

(৩) "ভট্টনারায়ণোদক্ষো বেদগর্ভোঽথ ছান্দড়ঃ। অথ শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ"। কুলরাম।

স্বামী না ত কি?

দুই সখীর কথা।

নবন্যাস।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই সই—সরযুবালা আর সুভাষিণী।—দুইই সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, সরল-স্বভাবা এবং সমান-বয়স্কা—যুবতী। দুইই বড় ঘরের মেয়ে। যাঁহারা সমাজে, নিজ নিজ সামাজিকদিগের মধ্যে, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বড় মানুষ বলিয়া পরিচিত, দুইই তাদৃশ অভিভাবকের স্নেহে, সুখ-সম্মানে লালিত-পালিত ও পরিবর্দ্ধিত। তথাপি এই দুইয়ের মধ্যে একটুকু বিচিত্র পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য শিক্ষায়, আর স্বভাব ও সাংসারিক সুখ-দুঃখের বিবিধ পরীক্ষায়।

সরযুর পিতা দীনেন্দ্রনাথ রায় যে কালে কলিকাতা ছোট আদালতের জজ, সেই সময়ে সুভাষিণীর পিতা হরদেব চাটুর্য্যা সিয়ালদহে সিনিয়র ডেপুটী ছিলেন। তাঁহারা শিশুকাল হইতে সহাধ্যায়ী এবং পরস্পরের প্রণয়-বদ্ধ; এবং তাঁহাদিগের সেই চিরজীবনের প্রণয়েই সরযু ও সুভাষিণীর অমন অকৃত্রিম সখ্য ও প্রণয়। তাঁহাদিগের উভয়েরই বাসা ছিল, রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটে—অতিসন্নিহিত দুইটি উৎকৃষ্ট দোতলা বাড়ীতে। বাসা দুইটি পৃথক্ ছিল বটে;—কিন্তু দুইয়েরই পরিবার, প্রায় সতত, এক পরিবারের মত একখানে থাকিতেন, এবং তাঁহারা, সরযু ও সুভাষিণীকে সখ্যস্নেহে একে অন্যের গলায় গাঁথা ও অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিয়া, নিতান্ত প্রীতি অনুভব করিতেন।

সরযুবালা কালে ইংরেজী ও ফরাশি ভাষায় একটুকু বেশী ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। পিতা স্নেকেলে সবজজ। বাড়ীর মেয়েরা, সামান্য একটুকু লেখা পড়া শিখিয়া, চিঠিপত্রখানি লিখিতে পারিলে, তাহাতেই তিনি পরিতৃপ্ত। কিন্তু, সরযুর মে'জ কাকা প্রিয়নাথ রায়, বিলাতে যাইয়া, বারিষ্টার হইয়া আইসেন;—এবং রায় সাহেব অথবা পি রায় নামে কলিকাতায় বিশেষ যশ, প্রতিপত্তি ও অর্থ সম্পত্তি লাভ করেন। সরযু তাঁহারই যত্নে বিশেষ উন্নতি লাভ করিল।

যাঁহারা, এই দেশ হইতে, বিলাতে যাইয়া শি-

* উপন্যাস ও রমন্যাস এই দুইটি শব্দ বাঙ্গালায় এখন বিশেষরূপে প্রচলিত। এই দুইয়ের সঙ্গে, ফরাশি (Nouvelle) নৌভেল অর্থে, নবন্যাস নামটাও চলিয়া যাইতে পারে নাকি? ইতি।

শ্রীজ্ঞানানন্দ শর্ম্মা।

ক্ষিত হন,তাঁহারা স্বভাবতঃই বিলাতী সভ্যতার একটুকু বেশী পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। বিলাতী সভ্যতার কএকটা মন্ত্র তন্ত্র আছে। তাহার একটা প্রধান মন্ত্র স্ত্রীশিক্ষা। বিলাতের অনেক ভদ্র মহিলা, ইদানীং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় সুশিক্ষিত হইয়া,এত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন যে,দেশের রাজাধিরাজ ও রাজপুরুষেরাও তাঁহাদিগের সহিত সসম্ভ্রমে কথা কহিয়া থাকেন। যাঁহারা তেমন শিক্ষিত নহেন, তাঁহারাও এদেশের শত শত এম্ এ, বি এ, অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত। বিলাতে, প্রতি সপ্তাহে, অন্ততঃ একশত উপন্যাস রচিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই এক শত উপন্যাসের আশীখানাই মেয়ে মহলের কারুকার্য্য ; এবং উপন্যাস-সাহিত্যের পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে, কএক বৎসর অবধি, অবলারই বিশেষ লিপি-চাতুর্য্য। ফলতঃ, বিলাতে ভদ্রলোকের ঘরে এখন আর অশিক্ষিত মেয়ের ঠাঁই নাই। যে একবারে অশিক্ষিত, তাহার বিবাহ হওয়া দূরে থাকুক, সে ভদ্রলোককে মুখ দেখাইতেও লজ্জা অনুভব করে, এবং পিতা মাতার কাছে আসিয়া উপবিষ্ট হইতেও লজ্জায় জড় সড় রহে।

বারিষ্টার পি রায়, দেশহিতৈষী ধার্ম্মিক ব্যক্তি। কর্ত্তব্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে একটুকু বেশী উৎসাহী, বেশী অনুরাগী। তিনি, এহেন বিলাতী সভ্যতার মনোমোহিনী মদিরায়, আকণ্ঠপূর্ণ হইয়া, আসিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ একবারে উন্মাদ-মাত্রার কাছে যাইয়া পৌঁহুচিল, এবং তাঁহার প্রত্যাগমন অবধি সরযুবালার বিদ্যাশিক্ষা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। পি রায়ের পুত্র কন্যা ছিল না। তাঁহার উৎসাহ-পূর্ণ, উদ্বেল প্রাণের সমস্ত ভালবাসা সরযুর প্রতি গড়াইয়া পড়িল ; এবং সরযু অতি অল্পকালের মধ্যেই, কলিকাতার আধ' সাহেবী বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অতি বড় উচ্চ-শিক্ষিত অতুল-প্রতিভাময়ী মেয়ে বলিয়া আদর পাইতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সরযু বেথুন স্কুলে পড়িত। সরযু ক্রমে, স্কুল বিভাগ হইতে কলেজ-ক্লাসে উন্নতি লাভ করিয়া, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে অনারের সহিত বি এ পাস করিল। তার পর,—যাহা সাধারণতঃ হয় না—যাহা তেমন খরতর-বুদ্ধিশালী বালকদিগেরও সাহসে কুলায় না,—বালিকা সরযু অনায়াসে তাদৃক্ দুঃসাধ্য ও যশস্য কার্য্য করিয়া বসিল। সে বিজ্ঞান ও ইয়ুরোপীয় দর্শন, এই উভয় শাখায়ই, উত্তরোত্তর দুই বৎসরের দুইটি পরীক্ষায়, অসামান্য যশস্বিতার সহিত এম্ এ পাস করিল ; এবং বাড়ীতে কাকার কাছে, লাটিন ও গ্রীকের অল্প কিছু পড়িয়া, ফরাশি ভাষায় প্রকৃতই একটুকু বিদ্যা ও অধিকার লাভ করিল। সরযু হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিল। পিয়ানোফোর্ট বাজাইতে শিখিল। কিছু কিছু চিত্রবিদ্যাও শিখিল ;—এবং সরযুর বয়স যখন একুশ কি বাইশ,—তখন সে মিস রায় বলিয়া ধন্য নাম উপার্জ্জন করিল।

কিন্তু এইরূপে, দিনে দিনে বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যতই প্রসারিত হইতে লাগিল, সরযুর

স্বভাব-সুন্দর সরল চরিত্র,—দিনে দিনে,—ততই একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তিত হইল। সে পরিবর্ত্ত এত ধীরে,—এতই অলক্ষিত ভাবে—সংঘটিত হইল যে, সরযু আপনিও তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইল না।

সরযু আগে দশজনের একজন ছিল, এখন সে একাই এক জন। সে আগে বাড়ীর ও পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে সমানভাবে মিশামিশি করিয়া চলিত। এখন তাহার ব্যবহারে এমন একটু ধীর-গম্ভীর প্রবীণতার ভাব পরিস্ফুট হইল যে, সমানবয়স্ক মেয়েরাও তাহাকে একটু যেন পর পর ও প্রাচীন গোছের মনে করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া পড়িল। সরযু আগে, প্রতিদিন প্রাতঃকালে, পিতা মাতাকে প্রণাম করিত ; সে প্রণাম এখন সে ভুলিয়া গেল। সরযুর দুইটি ছোট ভাই ছিল। একটির নাম পরেশ, আর একটির নাম সুরেশ। ভাই দুটিও সুবোধ। কিন্তু তাহাদিগের বুদ্ধি, সরযুর বুদ্ধির ন্যায় উজ্জ্বল আভাময়ী নহে। সরযু, শৈশব সময়ে,দণ্ডে দশবার,ভাই দুইটির খবর লইত। ভাই দুইটির যাহা কিছু প্রয়োজন সরযুই পূর্ব্বে তাহার সঙ্কুলন করিত। এখন সেদিকেও একটুকু অবহেলার ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু এ সকল ক্ষুদ্র কথা ছাড়া, আর একটা বৃহৎ কথা আছে। সেই কথায় সরযুর বৃদ্ধ পিতার মনে একটুকু লুক্কায়িত দুঃখ জন্মিল। দুঃখের সঙ্গে চিত্তে একটুকু উদ্বেগ এবং আশঙ্কার ভাবও প্রবেশ করিল। সে কথা সরযুর ধর্ম্ম ও বিবাহ বিষয়ক মত ও বিশ্বাস।

সরযু প্রথম বয়সে, হিন্দুপরিবারে আর পাঁচ মেয়ের মত, প্রগাঢ় ভক্তিমতী বালিকা বলিয়া পরিচিত ছিল। সে ভক্তির সহিত ভগবান্ জগদীশ্বরের নাম লইত ; এবং ভক্তি-প্রসঙ্গে কোন কথা উঠিলে, শ্রদ্ধার সহিত তাহা কান পাতিয়া শুনিত। এখন আর তাহার সে ভাব নাই। এখন সে কথায় কথায়, ইংলণ্ডের হিউম,—হক্‌সিলি,—হারবার্ট স্পেন্সার,—টিন্‌ডেল,—মিল,এবং ফ্রান্সের ভল্‌টেয়ার, রুসো, ডিডিরো,—ডালেম্বেইর * প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের নাম উদ্গিরণ করিয়া, শ্রোতৃবর্গের চমক জন্মায় ; এবং পরিণয়-ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও অমল সৌন্দর্য্য বিষয়ে, সমান বয়স্কাদিগের মধ্যে, সময়ে সময়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

সরযু একবারে নাস্তিক হয় নাই। এই পৃথিবীতে কেহই একবারে নাস্তিক হইতে পারে না। সরযুর পক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। কারণ, অমন শুদ্ধস্নিগ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে প্রকৃত নাস্তিকতা প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু সরযুর মতে আস্তিকতা আর প্রচলিত নাস্তিকতা প্রায় সমান পদার্থ। ঈশ্বর আছেন ত থাকুন। তিনি, এই জগদ্যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া, জগতের প্রত্যেক পরমাণুকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মমালায় জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং,তাঁহার সহিত কিবা জীব,কিবা জগৎ,

* Francois—Marie Arouet de Voltaire.—John James Rousseau.—Denis Diderot.—John le Rond D' Alembert.

এ দুইয়ের এখন আর সম্পর্ক কি? যদি বুদ্ধি থাকে, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে জগদ্যন্ত্রের নিয়ম নিচয় অবগত হইতে যত্নপর হও। নিয়ম পালন করিলেই যথেষ্ট। নিয়মকর্ত্তা বিধাতার কথা লইয়া, অনর্থক চেঁচা চেঁচির প্রয়োজন কি? সরযুর দ্বিতীয় কথা বিবাহ। যদি এ পৃথিবীতে কোন দিন,—কোন দেশে,—মনের মত জন মিলে, আর সেই সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সরল সুজন, মনঃপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, মন যোগাইতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে,—তখন না হয়—বিবাহের কথা লইয়া আলোচনা করা যাইবে। এখন সে বৃথা কথার আলোচনায় ফল কি?

সরযুর এইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের কথা লইয়া আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একটুকু কানাকানি হইত; এবং ইহাতে সরযুর বৃদ্ধ পিতার মনে বড়ই আঘাত লাগিত। তবে, তাঁহার একটা বিশেষ সুখ ছিল। তাঁহার পরম শত্রু এবং সরযুর ভয়ঙ্কর বিদ্বেষীরাও সরযুর সলজ্জ-শিষ্টতা ও সুনির্ম্মল চরিত্র-সম্পর্কে কোন প্রকার মন্দ কথা মুখে আনিতে সাহস পাইত না। সে অংশে সরযু জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় পবিত্র ও উজ্জ্বল ছিল। তাহার সে কঠোর শিষ্টাচার ও প্রীতি-লেশ-শূন্য পবিত্র দৃষ্টি সকলকেই যেন দুটি হাত দূরে রহিতে বাধ্য করিত;—এবং স্বসম্পর্কিত আত্মীয় স্বজন ছাড়া আর সকলের মনেই কেমন একটুকু ভয়ের ভাব জন্মাইত। যে সকল নব্য যুবক, প্রভা-মুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায়, সরযুর রূপ-মুগ্ধ হইয়া, তাহার কাকার বাড়ীতে যাতায়াত করিত, সামাজিকতার অনুরোধে নিতান্ত পীড়াপীড়ি না হইলে সরযু কখনও তাহাদিগের সন্নিহিত হইত না;—এবং যদি কখনও বা, কাকার বিশেষ শাসনে, কাহারও কাছে আসিয়া উপবিষ্ট হইত, তাহা হইলে, তখনও মুখ ফুটিয়া দুটি কথা কহিত না। আগন্তুক যুবজনদিগের মধ্যে যাহারা উদারচিত্ত, তাহারা সরযুর সে শুষ্ক ভাবের ভাল অর্থ করিত। তাহারা বলিত, সরযু জ্ঞানের তৃষ্ণায় আত্মবিস্মৃত, সরযুর দ্বারা ভারত-মাতার মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে। যাহারা তেমন উদার নহে, তাহারা মনে করিত, সরযু বড় ভয়ানক অভিমানিনী,—এই প্রকার অভিমান পুরুষ-চরিত্রেও শোভা পায় না। কিন্তু এ অভিমান রূপের,— না অলোক সাধারণ বিদ্যাবত্তার, সরযুর কাকা পি রায়ও তাহা ভাল করিয়া বুঝিতেন না।

সরযুর কথা অনেক কহিলাম; এখন তাহার শৈশব-সঙ্গিনী প্রিয়সখী সুভাষিণীর দুই একটি কথা কহিব। সুভাষিণীও প্রথম বয়সে সরযুর সঙ্গে সঙ্গে, কএকটি বৎসর, বেথুন স্কুলে ইংরেজী পড়িয়াছিল। কিন্তু সুভাষিণী যখন বার বৎসরের বালিকা, তখনই তাহাকে বউ সাজিয়া, পরের ঘরে গৃহলক্ষ্মী হইতে হইয়াছিল। এজন্য সুভাষিণী, সে সময়ে, ইংরেজীতে তেমন একটা পণ্ডিত হইতে পারে নাই। কিন্তু যদি মেধা ও প্রতিভার পরিমাণ করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে বোধ হয় সকলেই সুভাষিণীকে সরযু অপেক্ষাও একটুকু বেশী সৌভাগ্যবতী বলিয়া আদর করিতে বাধ্য হইতেন। সুভাষিণী একবার যাহা পড়িত, তাহাই তাহার স্মৃতিপটে চিরজীবনের জন্য মুদ্রিত রহিত;—এবং তাহাকে সামান্য একটুকু বুঝাইয়া দিলে, অতি দুর্ব্বোধ কথাও সহজে তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ পাইত। সুভাষিণী, তাহার স্মৃতি ও বুদ্ধির প্রখরতায়, এবং পিতামহের সাহায্যে, লোক-চক্ষুর অগোচরে,—ধীরে ধীরে—যাহা শিক্ষা করিল, তাহাতে তাহাকে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত বলিয়া উচ্চ সম্মানের আসন দেওয়া যায় কি না, বান্ধবের পাঠক ও পাঠিকারা তাহা বিচার করিবেন।

সুভাষিণীর পিতামহ ভবদেব সার্ব্বভৌম বড় বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রথমে কিছু দিন, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকতা করেন; তার পর, কাশীর সংস্কৃত কলেজে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া, একবারে কাশীবাসী হন। কাশীর বড় বড় রাজা, মহারাজ ও রাজপুরুষেরা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান দেখাইতেন; এবং দেশ দেশান্তরের যে সকল বড় পণ্ডিত, বড় মানুষ, তীর্থকামনায় কাশী যাইতেন, তাঁহারাও প্রায় সকলেই সার্ব্বভৌমের নিকট যাতায়াত করিতেন। এই সকল এবং আরও নানাবিধ কারণে, কাশীতে বৃদ্ধ ভবদেবের একটুকু বৈষয়িক প্রতিপত্তি হইল; এবং কাশীবাসী বাঙ্গালিদিগের মধ্যে রীতিমত তাঁহার দোহাই চলিতে লাগিল। তিনি, তাঁহার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বিশেষ অনুরোধে, সুভাষিণীর স্বামীকে কাশীতে একটি কাজ যুটাইয়া দিয়া, নাতিনী ও নাতজামাতা উভয়কেই আপনার কাছে রাখিয়া প্রতিপালন করিলেন; এবং সুভাষিণীর অলৌকিক মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, উহাকে ধীরে ধীরে আপনিই ভারত-ভাণ্ডারের সমস্ত শাস্ত্রে যথারীতি শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

সুভাষিণী যখন পিতামহের নিকট প্রথম পাঠ লইতে আরম্ভ করে, তখন সে ত্রয়োদশ বৎসরের বালিকা। যখন তাহার শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইল, তখন সে প্রস্ফুট-প্রফুল্ল পূর্ণায়তযুবতী। বয়ঃক্রম তখন অন্যূন পঁচিশ। সুভাষিণী এই বার কিংবা তের বৎসরে কত কি পড়িল, কত কি শিখিল এবং কি প্রকার বিদ্যাবতী হইল, তাহা অধীতী পাঠককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি?

আমি সরযুর ইংরেজী ও ফরাশি শিক্ষা প্রসঙ্গে, দায়ে ঠেকিয়া কতকগুলি কট-মট-নামা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছি। আমাকে, এবারও আবার, তেমনই দায়ে ঠেকিয়া, কতকগুলি সংস্কৃত পুঁথি এবং আর্য্য ও অনার্য্য গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে। বান্ধবের সুকুমারমতি পাঠিকারা আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ সহিয়া লইবেন ত? অথবা অপরাধই বা কি? ব্রাহ্মণের ঘরের একটি মেয়ে যদি এত পুস্তক পড়িয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে এখনকার নাটক-নভেল-বিহারিণী কুসুম-বিলাসিনী মেয়েরা বরং সেই পঠিত পুস্তকনিচয়ের নামগুলিই কানে শুনিয়া রাখিলেন। যে দেশে এখনও পণ্ডিত রমা সরস্বতীর মত মেয়ে জীবিতা রহিয়াছেন, সে দেশে স্ত্রীশিক্ষা কি শুধুই স্ত্রৈণ-বিলাসিতার একটা সখের সামগ্রী, অথবা

সোহাগের একটি সুন্দর ফুল বই আর কোন রূপে ফুটবার সুযোগ পাইবে না ?

সুভাষিণী প্রথম পাঁচটি বৎসরে বিদ্যাসাগরের চারিভাগ ব্যাকরণ-কৌমুদী, দুর্গসিংহের বৃত্তি সহিত কলাপ ব্যাকরণ, কালিদাসের রঘু, কুমার, মেঘদূত, মালবিকা, বিক্রমোর্ব্বশী ও শকুন্তলা—শ্রীহর্ষের রত্নাবলী,—ভবভূতির মহাবীর ও উত্তর চরিত,—ভারবি ও মাঘের কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ—এবং আরও অনেকের কাব্য নাটক পরিসমাপ্ত করিল। ইহার পর মনোরমা ও তত্ত্ববোধিনী নামক টীকা ও নানাবিধ টীপ্পনীর সহিত ভট্টোজী দীক্ষিতের দুই ভাগ সিদ্ধান্তকৌমুদী কণ্ঠস্থ করিয়া, বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত এবং প্রায় সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ আপনা আপনি উপন্যাসের মত পড়িয়া ফেলিল। যখন এইরূপে সংস্কৃত ভাষা তাহার কাছে জলের মত তরল ও যার-পর-নাই সুখ-প্রীতিকর হইল ; তখন সে পিতামহের নিকট ঋগ্বেদের কিয়দংশ,—ঋষিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ স্বরূপ উপনিষদ্‌গুলি,—শঙ্কর ও রামানুজের ভাষ্য সহিত বেদান্তসূত্র,—মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধরের টীকা সহিত রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি-দীধিতি এবং ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শাণ্ডিল্যসূত্র পরিসমাপ্ত করিল। এ সকল চির-কীর্ত্তিত গ্রন্থপত্র ছাড়া, বাঙ্গালায় ও হিন্দী ভাষায় যাহা কিছু সুপাঠ্য অথবা সুখ-পাঠ্য আছে, সুভাষিণী তাহারও সমস্তই পড়িয়া ফেলিল। সুভাষিণী, আপনার পরিশ্রমে, আর এক দিকে বড় বেশী বাড়িয়া উঠিল। পাঠকের মনে আছে, সুভাষিণী প্রথম বয়সে অল্প কিছু ইংরেজী শিখিয়াছিল। সে তাহার সেই শৈশব-পঠিত ইংরেজী পুঁথিগুলিরে—একবারের স্থলে পঁচিশ বার—এই প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া, এবং বাঙ্গালা হইতে ইংরেজীতে ও ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় পঠিত পুস্তকের বহুলভাগ পুনঃ পুনঃ অনুবাদ করিয়া, ইংরেজীতেও সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে অতি প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিল,—এবং মোক্ষমূলর, মনিয়র উইলিয়মস্, হোরেস্ উইল্‌সন্ প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ সাহেবেরা ও কে এম্ বনার্জি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং বম্বের ভাণ্ডারকার প্রভৃতি ভারতীয় পণ্ডিতেরা, সংস্কৃত অবলম্বনে ইংরেজীতে যত গ্রন্থ পত্র লিখিয়াছেন, সুভাষিণী সেগুলিকেও ঐরূপ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া, বস্তুতঃই বড় একটা পণ্ডিত হইয়া উঠিল। পিতামহ ভবদেব, দেখিয়া শুনিয়া ও মনে মনে আলোচনা করিয়া, একবারে মোহিত হইলেন। সুভাষিণী-হেন মেয়ে তাঁহার পৌত্রী, এই কথাটা তাঁহার প্রাণটাকে, যেন আনন্দে ও অভিমানে ফুলাইয়া, পাঁচ হাত উপরে তুলিল। তাঁহার কাছে যখনই পাঁচজন ভদ্র লোক যাইয়া উপবিষ্ট হইত, তখনই তিনি সকল কথা পাসরিয়া, শুধু সুভাষিণীর কথা কহিতে ভালবাসিতেন ; আর অতি গদ-গদ-কণ্ঠে ও অশ্রু-সিক্ত নয়নে, সকলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেন,—"ভাই তোমরা আমার কাছে কেহই সুভার প্রশংসা করিও না। মনুষ্য যাহাকে সরস্বতী জ্ঞানে পূজা করে, তিনিই বুঝি বা

আমাকে ছলিবার জন্য, আমার ঘরে এই বালিকার মূর্ত্তিতে বিরাজমানা ! সুভা আমার কি দীর্ঘজীবিনী হইবে ?"

লোকে কথায় বলে যে, ভক্তি আর ভালবাসা পরস্পর-বিরুদ্ধ পদার্থ ; এ দুই এক আধারে ভাল মিশে না। ইহা একটা বৃহৎ ভুল। কবি কালিদাস ইঙ্গিতে একথার উত্তর করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন,—

"গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

তাঁহার কথার এই অর্থ যে, দুধের শিশুও যদি, জ্ঞানে অথবা চরিত্র-গুণে, দেবতুল্য হয়, তাহা হইলে, তাহার কাছেও ভক্তিতে মাথা নোয়াইতে হইবে। কালিদাসের একথা সুভাষিণীর সম্পর্কে কড়ায় ক্রান্তিতে সার্থক হইল। ভবদেব সার্ব্বভৌমের কাশীস্থ বাসভবনে বহু লোক বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে, কিবা বৃদ্ধ, কিবা যুবা, সকলেই সুভার নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইল।

সুভার প্রতি বাড়ীর সকলেরই এইরূপ প্রগাঢ় স্নেহ ও শ্রদ্ধার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এদেশের মেয়েদের মধ্যে, যাঁহারা দুই একখানি উপন্যাসের ছুঁটি ছত্র পড়িতে পারেন, তাঁহারাই অভিমানে মাটিতে পদ-ক্ষেপ করিতে চান না ; এবং গৃহস্থালির 'সাধারণ কাজ' করিতে ভালবাসেন না। সুভাষিণী শিক্ষার পথে যত বেশী উপরে উঠিতে লাগিল, তাহার চিত্ত ও চরিত্র তত বেশী নম্র ও মধুর হইতে আরম্ভ করিল ; এবং পিতামহের গৃহস্থালির সমস্ত কার্য্যই ক্রমে তাহার হাতে গড়াইয়া পড়িল। যাহারা তীর্থদর্শন, অথবা বিষয় কার্য্যের অন্বেষণ উপলক্ষে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সেই বৃহৎ অট্টালিকার মত বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা সকলেই সুভাষিণীকে মনে মনে, দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ মনে করিল, সুভাষিণী বাড়ীর কর্ত্রী ; কেহ মনে করিল, সুভাষিণী বাড়ীর পাচিকা অথবা পরিচারিকা। কারণ, যে রোগে কষ্ট পাইতেছে, সুভাষিণী মায়ের মত, তাহার শিয়রে বসিয়া, তাহার ঔষধ ও পথ্য জল যোগাইতেছে ; অন্নব্যঞ্জন-পরিবেশন অথবা কোন কার্য্যসম্পাদন উপলক্ষে বাড়ীর ছোট বড় সকলেরই খবর লইতেছে,—তাহার সেই স্নেহপ্রফুল্ল হাসিমুখে সম্ভাষণ করিয়া সকলেরই সন্তোষ জন্মাইতেছে। এইরূপ স্নেহ ও দয়ায় কাহার হৃদয় না দ্রব হয় ?

ভবদেবের একটি বিধবা কন্যা ছিলেন। তিনিও পিতার আশ্রয়ে কাশীবাসিনী হইয়া বহুকাল অবধি কাশীতে ছিলেন। ভবদেবের বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, অর্থাৎ সুভাষিণীর পিতামহী সুভাষিণীকে আপনার সেই কন্যাটি হইতেও বেশী ভালবাসিতে লাগিলেন। পিশি মা, তাহাতে দুঃখিত না হইয়া, হৃদয়ে আরও বেশী শীতল হইলেন। পিতামহী কখনও পরিহাস করিয়া বলিতেন,—'সুভা তুই তোর ঠাকুর দাদা হইতেও বড় পণ্ডিত,—বড় সাত্তোম্ হয়েচিস্—তোর এখন কি আর ঘর কন্নায় মন উঠ্‌বে ?" সুভাষিণী, বৃদ্ধার পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া, সোহাগে ফুলিয়া বলিত,—"কেন দিদি মা, ঘর-কন্না কি শুধুই মূর্খের জন্য ? আমি ত দাদার জন্য রোজই পাক

ক'রে থাকি। আমার হাতের ডাল্‌না আর চর্চ্চরি কোন দিনও কি আলুনি বা নুনে পোড়া হয় ?"

কিন্তু সুভাষিণীর একটা বড় দুঃখ। তিনি এত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন, অথচ সে বিদ্যার ভাগী নাই। তাহার হৃদয়ে একটা রাজরাজেশ্বরীর অতুল সম্পদ, অথচ সে সম্পদের সরিক নাই। তাহার স্বামী ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ব্বর মূর্খ না হইলেও, মূর্খপদ-বাচ্য। সে সুভাষিণীকে কএকটি বৎসর হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন করিয়াছিল। যে দেশে জামাই বাবু বলিলেই কেমন একটা জগঝম্প অথবা কিম্ভূত কিমাকার আলস্য-পিণ্ডের কথা মনে পড়ে,সেই দেশে বড় মানুষের ঘরের নাত্‌জামাই! নাত্‌জামাই যদি আপনার হাতে দুটি অন্ন তুলিয়া মুখে দেয়, সে দুষ্কর পরিশ্রম দর্শনেই দিদী-শাশুড়ী প্রভৃতি গৃহিণীদিগের দুই চক্ষে দুঃখের ধারা বহে। তাহার আবার শিক্ষা ও পরীক্ষার অবকাশ কোথায় ? শ্রীমান্ বাবু ললিত মোহনেরও তাহাই হইয়াছিল। ভবদেবের আদরে সকলেই তাহাকে দাদা বাবু বলিত; এবং দাদা বাবুর গলার আওয়াজ পাইলেই, বাড়ীর সকলে, কপি-কণ্ঠ-ভীত বৃদ্ধের মত, এক পাশে সরিয়া পড়িত। দাদা বাবুর মুখে সময়ে সময়ে ইংরেজীর তুফান ছুটিত। কিন্তু সে ইংরেজীর বেহদ্দ দৌড় রেনল্‌ডের উপন্যাসে! আর দাদা বাবুর অন্যবিধ বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের গৌরব প্রদর্শিত হইত, সাজ সজ্জা এবং ঘড়ি ও ছড়ির বিচিত্র বিলাসে।

দাদা বাবু ললিতমোহন, সার্ব্বভৌমের অনুগ্রহে, কাশীতে কণ্ট্রেক্টরের কার্য্য করিয়া, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত; এবং তাহা সুপথে—কুপথে,—দুই হাতে ছড়াইয়া, সমানবয়স্কদিগের মধ্যে বড় বাবু বলিয়া পরিচিত হইতে ভালবাসিত। লোকে যাহাকে দুষ্ট, নষ্ট, দুর্ব্বৃত্ত বলে, ললিতমোহন কোন অংশেও সেরূপ লক্ষণাক্রান্ত ছিল না। তবে, তাহাকে পাকা ইয়ার, অথবা অকালপক্ক ও অন্তঃসারশূন্য কপিত্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অতিসূক্ষ্মদর্শী আলঙ্কারিকেরও রুষ্ট হইবার কারণ থাকিবেক না। কিন্তু এহেন ললিতমোহনও, পতি-প্রাণা ও পণ্ডিত্যাভিমানশূন্যা সুশিক্ষিতা সুভাষিণীর প্রীতি-স্নেহ-পূর্ণ পবিত্র চরিত্রে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল; এবং যে উচ্ছৃঙ্খল যুবা, ভবদেবের বড়াইতে, কাশীতে কাহাকেও ভয় করিত না, সে, কিসের যেন কেমন আকর্ষণে, সুকুমারমতি সুভাষিণীকে ক্রমে ভয় ও ভক্তি করিতে শিখিল।

জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, সৌন্দর্য্য, স্বর-মাধুরী ও স্বার্থশূন্য প্রেম,এই তিনই এ জগতে দেব-দুর্ল্লভ বস্তু; এবং এই তিনেরই কেমন একপ্রকার জগন্মোহিনী শক্তি আছে। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, "পশু পক্ষী, সাপ বাঘ" কেহই সে দেব-শক্তির দিব্য আকর্ষণকে এড়াইতে পারে না। বনের সাপ, বংশীর স্বরে মুগ্ধ হইয়া, কিরূপ বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করে, তাহা অনেকেই চক্ষে দেখিয়াছেন। ললিত মোহন কোন অংশেও, সাপ অথবা বাঘের সদৃশ ছিল না। তাহাকে গালি দিতে হইলে, শিকলি-কাটা টিয়া, অথবা স্বভাব-চঞ্চল চড়ুই

তোকে আমার এই প্রাণটা হ'তেও বেশী ভালবাসি। আমি যদি আমার বুকের একটু রক্ত দিয়ে তোকে সুখী কর্‌তে পারি, সেও আমার সুখ। তাই বল্‌চি, তুই নিদেন আমার দিকে চেয়ে শীগ্গিরই বিবাহ কর্‌বি। করবি্ কি না বল্ ?

সরযু। আমি ত ভাই,তোকে অনেক দিন হয় চিঠি লিখে জানিয়েচি যে, আমি আমার মনের মত জন পেলে, তখনই বিবাহ কর্‌ব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা না ঘটে, সে পর্য্যন্ত এমনই আইবুড়ো রইব। আমি কখনও ভাই,—মাপ করিস্,—কিছু মনে করিস্ নে,—মর্ক্কটের গলায় মালা দোলাইয়ে, তোর মত, মনের আগুনে পুড়ে দগ্ধ হ'ব না।

কথাটা প্রাণে লাগিল। সুভাষিণীর ডব ডবে চক্ষে সহসা এক ফোঁটা জল ঝড়িল। সরযু অমনি, সুভাষিণীকে বুকে আবরিয়া লইয়া, সেই ঝর ঝর অশ্রু বিন্দুটি, মায়ের মত স্নেহে, মুছিয়া ফেলিল। তার পর, বড়ই বেশী আদর করিয়া বলিল, 'কি ভাই দক্ষযজ্ঞের পালা হবে না কি ? তবে তুই আমার এই তাপিত বক্ষঃস্থলটাকেই একটা অগ্নিকুণ্ড মনে ক'রে নে, এবং এই অগ্নিকুণ্ডে, নব্য-সভ্যতার সতীর মত,ঝাঁপ দিয়ে পড়ে যা।

সুভা। ভাই আর শ্লেষ বিদ্রূপ করিস্ নে,—যাতে মনে কষ্ট পাই, সে কথা ভু'লেও মুখে আনিস্ নে। আমি সেই জগদারাধ্যা সতীর পদ-রজঃস্পর্শের যোগ্য না হ'লেও, পতিনিন্দা আমার প্রাণে সয় না। কোন দিনই সয় নাই, আজ আবার নূতন সইবে কি? আর তোকেও বলি, তুই ভাই আমায় ত ভালবাসিস্। আমায় ভালবাসিলে, তাঁকেও ভালবাস্‌বি,—আর—আর যাতে তোর ঐ চাঁদ মুখের কোন কথায় আমি কখনও চিত্তে আঘাত না পাই,—দোহাই ধর্ম্মের—তুই সে বিষয় একটু বেশী দৃষ্টি রাখ্‌বি। তোর বুকের আগুন না নিব্‌লে, তোর মুখের কথা মিষ্টি হবে না।

সরযু। তা রাখ্‌ব। কিন্তু বুকের আগুন কিসে নিবে, বল্‌তে পারিস্ ?

সুভা। নিবে ভালবাসায়,—নিবে,—

সরযু। রাখ্ রাখ্, তুই হয় ত সমাসের মালা গেঁথে বল্‌তে যাচ্চিস্—নিবে, নয়ন-মনোমোহনের নিত্য-নূতন-তরঙ্গময় প্রেম-স্নেহে।

সুভা। যদি তাই বলি, তাতেই বা দোষ কি ?-তোর ক্বারি কাট্‌লেট্ পচে যাবে না ত?

সরযু। দোষ আর বেশী কিছু নয়,—দোষ এই—যা দেশে নাই, সেই দুর্ল্লভ ধন,—সেই অঘট্য ঘটন লইয়া মনের রোষ ও তোষ।

সুভা। ভাই, ভগবান্ অনন্ত দেব, এই অনন্ত সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রময় অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; কেবল সৃষ্টি করেন নাই, তোমা-হেন রমণীরত্নের হৃদয়-রঞ্জন ? এ জগতে কেহই কি তোমার হৃদয়ের ধন হইবার যোগ্য নহে ?

সরযু বলিল, ভাই, সকলেরই কি মনের মত জন এ সংসারে সর্ব্বদা মিলে ? যদি মিলিত, তা হ'লে, মিস্ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, (Miss Florence nightingale) ও মিস্ ফ্লোরেন্স কব্ (Miss Florence Cobbe)

প্রভৃতি দেব-রমণীরা আজও অবিবাহিত রয়েচেন কেন ?

সুভাষিণী বলিল,—ভাই, তুই যাঁদের কথা বল্‌চিস্ তাঁরা সত্যই দেবতা। আমি তাঁদেরে দেবতা-জ্ঞানে উদ্দেশে নমস্কার করি। আমি 'কবের' সমস্ত বই পড়েচি, এবং তাঁর পুস্তক-পাঠের সময়, সত্য সত্যই তাঁকে অপার্থিব দেবতা জ্ঞানে, পুনঃ পুনঃ পূজা করেচি। কিন্তু দেবতা হ'লেও, তাঁরা অর্দ্ধ দেবতা। কেন না, তাঁদের জ্ঞান-তৃষ্ণা অথবা মনোবৃত্তির যেরূপ অনুশীলন ও উন্মেষ হ'য়েছে, হৃদয়বৃত্তির সেরূপ অনুশীলন ও উন্মেষ ঘটে নাই। সীতা ও সাবিত্রীর চরিত্রে, নারী-চরিত্রের সেই যে এক অপরূপ শোভা সমস্ত পৃথিবীকে উন্মাদিত করে রেখেছে, "কব্" ও "নাইটিংগেলে" তা পরিলক্ষিত হয় কি ? যে যা চায় না, সে তা পায় না। তাঁরা চান নেই, তাঁরা পান নেই। তার আবার কথা কি ? তুই চাবি নে কেন লো ? তোর ঐ চক্ষু আর ঐ চাহনি কি শুধুই আকাশের তারা গণনার জন্য ? তোর ঐ—

সুভা এবার আর তাহার বাক্য সমাপন করিতে পারিল না। সরযূ সুভাকে গাঢ় আলিঙ্গনে, বক্ষে জড়াইয়া, একটি চুমা দিল। দুইয়েরই চিত্ত ও চক্ষু তখন, প্রাণভরা ভালবাসার প্রবল উচ্ছ্বাসে, আর্দ্র হইল।

এই প্রকার কথোপকথনের কিছু দিন পরে, সরযূ, তাহার পিতৃদেবের সহিত, কলিকাতা চলিয়া গেল। এখন সরযূর আর সে স্ফূর্ত্তি নাই। তাহার মুখশ্রী, অপ্রফুল্ল না হইয়াও, গম্ভীর। সে বিবাহ করিবে কি না, এই প্রশ্ন তাহার চিত্তকে বড় বেশী আলোড়ন করিতে লাগিল, এবং তাহার মন প্রাণ ও চিত্ত, সমস্তই ধীরে ধীরে, বিবাহের দিকে গড়াইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের সমস্ত আশা, এত দিন শুধুই জ্ঞানের নির্ম্মল পিপাসায় নিরুদ্ধ ছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে, সহসা আর একটা পিপাসা, তর তর বেগে, বহিতে আরম্ভ করিল। সুভাষিণীর ললাট-শোভি সিন্দূর-বিন্দু, এবং হাতের শাঁখার বালা, কে মন কেমন বোধ হইয়া থাকিলেও, তাহার প্রতি সরযূর অতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সরযূ নিজে সংস্কৃত জানিত না। কিন্তু সে সুভাষিণীর অগাধ বিদ্যার ওজন করিতে জানিত। আর, সুভাষিণী যে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, ইহা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিত। সে এই সকল কারণে, কাশীধামে, তাহাদিগের সেই সুখ-স্বপ্নময় শৈশব-স্নেহের আকর্ষণে,—তেমনই অকৃত্রিম প্রণয়ের আনন্দময় বন্ধনে, সুভাষিণীর সঙ্গে পনরটি দিন প্রকৃতই প্রাণে প্রাণে গাঁথা ছিল। কলিকাতা যাইবার সময়, তাহার বোধ হইল, যেন সুভাষিণীর সে সরল ও সুমধুর প্রাণের কতকটা ভাগ, তাহার প্রাণের মধ্যে মিশিয়া, সঙ্গে আসিল। বলা বাহুল্য, ইহার কএকটি মাস পরেই, শিক্ষাভিমানিনী, স্বাধীনতানুরাগিণী ও স্বতন্ত্রজীবনানুসারিণী সরযূবালা, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সত্যপ্রিয় ও উদারচরিত্র মেঃ মনোরঞ্জন ঘোষের সহিত বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইল। বর ও

পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে কিছু দিনের মধ্যেই, সুভাষিণীর প্রীতি-পিঞ্জর-রুদ্ধ পোষা ময়নার মত, মনঃপ্রীতিকর নূতন বুলি শিখিতে আরম্ভ করিল; এবং ললিতমোহনের এ অভাবনীয় পরিবর্ত্ত দর্শনে, বাড়ীর সকলেরই মনে বিস্ময় জন্মিল। ললিতমোহন, ইংরেজী ও বাঙ্গালার কদর্য্য পুঁথিপত্র পরিত্যাগ করিয়া, দুই চারি খানি ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া লইল; এবং সেই গুলিকে বারংবার পাঠ করিয়া, সাহিত্যের উচ্চতর গ্রামে উঠিবার জন্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে যত্ন করিতে লাগিল।

এই সময়ে, একবার শীতের প্রারম্ভে, দীনেন্দ্রনাথ রায় কাশী আসিলেন। দীনেন্দ্রের আদুরে মেয়ে, জ্ঞান-গম্ভীরা সরযূবালাও, সুভাষিণীকে দেখিবার জন্য, কাশীতে আসিল। সরযূ তীর্থভ্রমণে অনুরাগিণী নহে, ইহা পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারেন। কিন্তু পুণ্যক্ষেত্র কাশী, এইক্ষণ সরযূর চক্ষে, প্রণয়ের পবিত্র তীর্থ। কারণ, সেখানে তাহার প্রাণ-সঙ্গিনী সুভাষিণী। যখন কাশীতে, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দ্বিতল অট্টালিকার এক নিভৃত কক্ষে, সরযূ আর সুভাষিণী, নিজ নিজ বয়স ও বিদ্যা বিস্মৃত হইয়া, দুইটি কচি বালিকার মত, আবার গলায় গলায় গ্রথিত অবস্থায়, একত্র উপবেশন করিল, তখন উভয়ের সে উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখিয়া, বাড়ীর সকলেরই কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ বোধ হইল। সকলেই মনে করিল, যেন দুইটি পূর্ণিমার চন্দ্র একস্থানে উদিত হইয়াছে;—অথবা দুইটি অপরূপ গোলাপ-গুচ্ছ একত্র শোভা পাইতেছে। রূপ ও গুণের এক আধারে এরূপ সমাবেশ সর্ব্বত্রই বিরল।

সরযূ পৃথিবীর সকলের কাছেই গম্ভীর, কিন্তু সুভার কাছে শিশুর মত সরল,—শিশুর মত নম্র ও মধুর। ইহার এক অর্থ ভালবাসা, আর এক অর্থ ভক্তি। কারণ, সরযূ সুভাকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসিত; আর সুভাতে কি পদার্থ আছে, তাহা সরযূই সম্যক্ বুঝিত।

সরযূ আর সুভাষিণী, উভয়েই এতক্ষণ, অনিমেষ-নয়নে একে অন্যের রূপ দেখিতেছিল। উভয়েই মনে মনে কহিতেছিল, সই আমার এত রূপসী, ইহা ত আগে জানিতাম না। অথবা, আগে বুঝি কখনও এরূপ তাকাইয়া দেখি নাই। হায়! উভয়েই ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারা আগে একে অন্যের রূপ দেখিত, রূপের উন্মাদ-শূন্য বালিকার প্রাণে;—আর এখন রূপ দেখিতেছে,—যৌবনের পূর্ণোদ্গমে —যুবতীর উচ্ছ্বসিত প্রাণে ও আবেগময় কুটিল-নয়নে। উভয়ের মধ্যে সরযূর মুখেই আগে কথা ফুটিল।

যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন সরযূ, একটু মুচ্‌কে হাসি হাসিয়া, মাথাটি বাঁকাইয়া, মিহি সুরে বলিল,—

প্রাতঃপ্রণাম পণ্ডিতজী,—আপনার টোলে নাকি বড়ই ভাল একটি ছাত্র যুটেচে! ছাত্রের ত কুশল ?

সুভাষিণী, কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রতিভ না হইয়া, একটি রকম সহী সেলামের ভঙ্গি করিয়া, মুসলমানি কায়দায় মুখ খানি দুলাইয়া দুলাইয়া, ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল,—"বন্দেগী মেম্

সাহেব।—মেজাজ সরীফ্—মেজাজ মবারক্—মেজাজ আকরম্—মেজাজ আক্দছ্।

সরযূ। ওমা গিন্নিচি—এযে ফারসী আরম্ভ হ'ল, এই বলিয়া খল খল হাসিতে লাগিল এবং সুভাষিণীর মুখখানি হাতে চাপিয়া ধরিতে যত্ন করিল। কিন্তু পারিল না।

সুভাষিণী নিরস্ত হইবার পাত্রী নহে। তাহার সেই হিন্দী অথবা উর্দ্দু তেমনই বেগে চলিল। সুভাষিণী বলিল—"মেম্ সাহেব, আপ ঘাব্‌রাওঁে কেঁউকে—মুজ্‌ছে বিলায়েতকা দো-চার বাতেঁ ফরমাইয়েহ্।

সরযূ এবার একটু নরম হইয়া, অপেক্ষাকৃত কাতরকণ্ঠে কহিল,—তুই আর আমায় জ্বালাস্‌নে বোন্। ভাল,—তুই আমায় মেম্ সাহেব বল্‌বি কেন লো ?

সুভাষিণী বলিল, এক বার নয়—একশ বার বল্‌ব। তুই যদি আমায় পণ্ডিতজী বল্‌তে পারিস্, তা হ'লে আমি তোকে মেম্ সাহেব ছাড়া আর কি বল্‌ব লো ঢেঁকী।

সরযূ বলিল,—ভাই তুই সত্যি সত্যিই পণ্ডিত হয়েচিস্, আর দেশ শুদ্ধ সকল লোকেই তোকে পণ্ডিত বল্‌চে, একা আমি চুপ করে রইলেই কি তুই খালাস পাবি ? বিশেষ, তোর যেরূপ ছাত্র যুটেচে, তাতে তোকে পণ্ডিত বলাই সঙ্গত নয় কি ?

সুভা। সে অর্থে তুইও ত ভাই মেম্ হয়েচিস্, আর দুই দিন পরে তোরও ত সাহেব যুট্‌বে। তোর মাথায় ফিড়িঙ্গী খোপা, গায়ে বড়-পাড় কালো রঙের রেশমী মোজা, তোকে [illegible] সেই আমার মত সেলাম দেবে।

এখানে পাঠককে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সুভাষিণীর পরণে এক খানা লাল পেড়ে সাধারণ ধূতি, হাতে দুগাছি শাঁখার বালা, এবং নিথর ললাটে এক বিন্দু সিন্দূর ছিল। যখন দুই জনে, এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ-বেশে, কথা আচা আঁচি হইতেছিল, তখন, সরযূবালা সুভাষিণীকে জোর করিয়া আরও সম্মুখে টা নিয়া লইল, এবং তাহার কালো 'কুচ্‌কু'চে কেশরাশিতে একটি ফিরিঙ্গিয়ানা খোপা বাঁধিতে আরম্ভ করিল। এ অত্যাচারে, সুভাষিণী কোন আপত্তি করিল না। বয়স ত মোটে পঁচিশ বছর !

সুভাষিণী কিছু ক্ষণ পরে, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলাইয়া বলিল, ভাই সরযু, তুই যে আজ তক্‌ও অবিবাহিত রয়েচিস্ ; এতে তোর বাপ মার না যত দুঃখ, আমার দুঃখ তাহাতেও বেশী।

সরযূ বলিল, ছি সুভা ! তুইও কি পাগল হয়েচিস্ ? আর এই মাথা মুণ্ড সংস্কৃত শি'খে, তোর বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্ত হারিয়েচিস্। বিবাহ কি নারী-জীবনের এমনই একটা ধর্ম্ম, আর এমনই একটা কর্ম্ম, যে না হইলেই নয় ?

সুভা। ভাই, বিবাহ সত্য সত্যই নারী-জীবনের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম,—অত্যাজ্য কর্ম্ম। যদি আর কারও সঙ্গে কথা হ'ত, আমি তা হ'লে শাস্ত্র ও যুক্তির পাঁচ শ কথা তুল্‌তেম। কিন্তু ভাই, তোর কাছে আর শাস্ত্র কি ? তোর কাছে আমার এই প্রাণটাই পরম শাস্ত্র। তোকে যে সই বলে ডাকি, সইত একটা কথার কথা—একটা সম্ভাষণের শব্দ। কিন্তু আমি

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রণোদনা দ্বারা, কারণের অস্তিত্ব ব্যতীতও, স্বাপিত ব্যক্তির মনে অনুভূতিবিশেষের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। যদি এরূপ কোন ব্যক্তিকে বলা যায়, ভয়ানক তুষারপাত হইতেছে, তবে সে শীতে কাঁপিতে থাকে ; আবার ঘরটা অত্যন্ত গরম বলিলে, বাস্তবিকই তাহার ঘর্ম্ম হইতে থাকে। দেয়ালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি বিলম্বিত রহিয়াছে, এরূপ একটা মিথ্যা কথা বলিলে, সে যথার্থই ঐরূপ ছবি দেখিতে পায়। বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বদ্ধ থাকিলেও, অনেকে তাহাতে হাত দেওয়া মাত্র, শিহরিয়া উঠেন। ক্লোরোফরম্ না করিয়াও, করা হইয়াছে বলিয়া ঘা কাটিয়া দেওয়ায়, একটি স্ত্রীলোক কিছুমাত্র বেদনা অনুভব করিয়াছিল না। এইরূপ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, তরকারিতে কচু আছে বলিয়া উপহাস করিলে, অনেকের সত্যই গলা ধরে ; অন্যকে তেতুঁল খাইতে দেখিলে, স্বয়ং খাইতেছি ভাবিয়া, নিজের জিহ্বায় জল আসে।

স্বাপিত ব্যক্তির মনে কোন অকৃতকার্য্যের ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া অতি সহজ। "তুমি এই পুস্তকখানি পড়িয়াছ," "তুমি অমুকের রুমালখানি চুরি করিয়াছিলে," কোন স্বাপিত ব্যক্তিকে এরূপ বলিলে, তাহার মনে বস্তুতঃ ঐরূপ ধারণা জন্মে, এবং প্রকৃতিস্থ হইলেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, মনে ঐ ধারণা জাগরূক থাকে। আবার তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে বলিলেও, তাহা করান যায়,—অর্থাৎ তাহার মনে একটা সম্পূর্ণ নূতন ও বিপরীত ইচ্ছাশক্তি জন্মাইয়া দেওয়া যায়। একটি স্বাপিত যুবতীকে, সর্ব্বসমক্ষে, জনৈক অপরিচিত পুরুষের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইতে বলায়, সে তদ্রূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ; অপর একজনকে একটা দ্রব্য চুরি করিতে বলিলে, সে কিছুতেই তাহার অপহরণ-স্পৃহা দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। এই প্রকারে স্বাপনতত্ত্ব দ্বারা কেবল যে কার্য্য করান যায়, তাহা নহে,—কোন মানসিক ভাবেরও উদ্রেক সম্ভবপর। কোন স্বাপিত ব্যক্তির মনে কাহারও প্রতি স্নেহ, দ্বেষ, শ্রদ্ধা, ঘৃণা প্রভৃতি ভাবসমূহ অস্বাভাবিকরূপে সঞ্জাত করা যায়। স্বাপনতত্ত্ব দ্বারা সহজাত সংস্কার বা বদ্ধমূল অভ্যাস-সমূহের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করা যায় ;—যেমন মদ্যপেয়ের পানদোষ ত্যাগ, সর্ব্বদা বিমর্ষ ব্যক্তিদিগকে প্রফুল্লচিত্ত করা, অসচ্চরিত্রকে সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠুরকে স্নেহপরায়ণ করা ইত্যাদি।

মনুষ্যের অনুকরণ প্রবৃত্তি এই প্রণোদনাতত্ত্বের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাহা আমরা সর্ব্বদা দেখি বা ভাবি, আমরা, অজ্ঞাতসারে অনেক পরিমাণে, তাহাই হইয়া পড়ি। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, একজনকে খেলিতে বা গান করিতে দেখিলে, আমাদেরও অনেক সময়, তদ্রূপ করিবার ইচ্ছা জন্মে। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে, আমরাও তাহা করি, আবার কেহ যদি সর্ব্বদা অঙ্গুলি নাড়িতে থাকে, তাহা হইলে, আমাদেরও স্বতঃই সেরূপ করিবার প্রবৃত্তি হয়। এমন কি, কাহাকেও আত্মহত্যা বা খুন করিতে দেখিলে বা শু-

নিলে, অনেকের সেরূপ করিতে অভিলাষ জন্মে। এজন্য আমেরিকার মর্ণিং হেরাল্ড নামক সংবাদপত্র কোন লোমহর্ষণ হত্যাবিবরণ প্রকাশ করেন না। দৃঢ়তার সহিত কোন কথা বলিলে, তাহা সহজেই বিশ্বসিত ও অনুকৃত হয়। বক্তা, যদি স্বয়ং সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করেন,তাহা হইলে, সেই বিশ্বাস শ্রোতার মনে সংক্রামিত হইয়া তাহার প্রত্যয় জন্মায়। একজন লোককে পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসব্যঞ্জক স্বরে বোকা বলিলে, তাহার নিজেরও তাদৃশ প্রতীতি হয়। এজন্য যাহাদের 'ব্যক্তিত্ব' খুব প্রবল, তাহারা ভালমন্দ উভয় দিকে, সহজে মানবহৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। জগতে যাঁহারা নেতা বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রভূত-ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট, এবং স্বীয় ক্ষমতায় দৃঢ়বিশ্বাসী। এই সকল গুণের সংক্রামকতা সর্ব্বত্র পরিচিত। সেনাগণের মধ্যে যে পরিচ্ছদসাম্যের (Uniform) বিধান আছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত পরিচ্ছদধারিদিগের শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণ ভবিষ্যতে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত সেনাগণের চিত্তে সংক্রামিত হইবে। যে বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস করা যায়, তাহা সহজে সাধনযোগ্য হয়। বিশ্বাস ব্যতীত কার্য্য হয় না। মনুষ্য জাতির শতকরা ত্রিশ জন স্বাপনীয়, এবং স্বাপিত অবস্থায়, তাহাদের মনে যেরূপ বিশ্বাস দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, চিরজীবন তাহারা তদনুরূপ কার্য্য করিতে থাকে।

শিশুকালে সকলেই স্বাপনীয় থাকে। স্বাপনবিদ্যাদ্বারা সংজ্ঞা বিলোপ করিলে, মন যে রূপ ভাববিহীন থাকে, শিশুচিত্তও তদ্রূপ কিংবা স্বাপিত অবস্থায় যেমন কোন একটি ভাবের প্রাবল্য থাকে, শিশুদিগের মনেও সেইরূপ এক সময়ে, এক একটি ভাব আধিপত্য করে। অতএব স্বাপিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শিশুদিগের সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

প্রণোদনাদ্বারা যেরূপ স্বাপিত ব্যক্তির স্বাভাবিক সংস্কারজ মানসিক গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত কিংবা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ সম্পূর্ণ নূতন কোন প্রবৃত্তি তাহার মনে অঙ্কুরিত করা যায়, শিশুদিগের পক্ষেও সেইরূপ সম্ভবপর। অতএব বংশগত প্রকৃতির যে টুকু ভাল, সে টুকু গ্রহণ ও পরিবর্দ্ধন এবং যাহা মন্দ, তাহা পরিবর্জ্জন করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতে শিশুদিগকে স্বাপিত ব্যক্তির ন্যায় প্রণোদিত করা আবশ্যক। অর্থাৎ শিশুদিগের চিত্তে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া উচিত যে, সৎকার্য্য তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং অসৎকার্য্য করিতে তাহারা অক্ষম। তাহা হইলে, সৎকার্য্য বস্তুতঃ তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া আসিবে। শিশুদিগের ইচ্ছাশক্তি প্রবল করিতে হইলে, তাহাদের ইচ্ছাশক্তি বাস্তবিকই প্রবল, এই ধারণা জন্মাইয়া দিতে হইবে। সদসৎ কার্য্য সম্বন্ধে মানব সম্পূর্ণ স্বাধীন, এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিলে, শিশু নিজকে প্রকৃত পক্ষেই স্বাধীন মনে করিবে, নতুবা নিয়তির দোহাই দিয়া অসৎ কর্ম্ম করিয়াও নিজকে দায়িত্বমুক্ত ভাবিতে শিখিবে। এক কথায়, বংশগত

কন্যা-উভয়েই এ বিবাহে আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিল।

বিবাহের আমোদ উৎসব চুকিয়া গেলে, সরযূর মনে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল। সমস্যা—স্বামী শব্দের অর্থ। যাহার সহিত বিবাহ হইল, তাহাকে কি মনে করিতে হইবে? সে সরযূর কি হইল?—

স্বামী—না—কি?

এক দিকে ফরাশিরাষ্ট্রবিপ্লবের সাত শত সমাজ-বিপ্লাবি নীতি-সূত্র,—ভল্টেয়ার প্রভৃতির ভয়ঙ্কর শ্লেষ ও বিশ্লেষ, এবং মিল প্রভৃতি মহামনস্বী পণ্ডিতদিগের মানব-জনীন-স্বত্ব,—নারীজীবনের স্বাতন্ত্র্য-সমুন্নতি ও স্বাভাবিক স্বাধীনতার মহামোহময়ী বৈজ্ঞানিক কথা, আর একদিকে স্বদেশের শত-সহস্র সুখ-শান্তিময় স্বভাবসুন্দর দাম্পত্যপ্রেমের আদর্শ ও সুগভীর স্নেহশীলা সুভাষিণীর প্রেমময় জীবন। সরযূর মনটা কখনও এ দিকে, কখনও ও দিকে দোলায়িত হইতে লাগিল। মনে ঐ একই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ উত্থিত ও আলোচিত হইতে আরম্ভ করিল। যাহার সহিত চিরজীবনের জন্য গ্রথিত হইলাম, সে আমার কি হইল?—

স্বামী—না—কি?

(ক্রমশঃ)

শিক্ষা ও বংশানুক্রমিকতা। *

মনুষ্যের ইচ্ছা স্বায়ত্ত, না নিয়তির বশীভূত, এই প্রশ্ন, আবহমানকাল হইতে, দার্শনিকগণের চিত্ত আন্দোলিত করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান কালে,দর্শনের ন্যায়, বিজ্ঞানও এই প্রশ্নের মীমাংসায় তৎপর হইয়াছেন। দার্শনিকদিগের সহজাত সংস্কারের স্থলে বৈজ্ঞানিকগণ এক অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার নাম বংশানুক্রমিকতা। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে কোন মানবেরই জাতি, বংশ বা দেশকালগত প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধনের শক্তি নাই। যেরূপ অবস্থায় মনুষ্যের জন্ম হয়, তদ্দ্বারাই তাহার প্রকৃতি নিয়মিত হইয়া থাকে;—কিছুতেই সে তাহা একেবারে অতিক্রম করিতে পারে না। যদি কোন বংশে বিশেষ কোন দোষ থাকে, তাহা হইলে, অধস্তন পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত, তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়, এবং তৎপর ঐ বংশ বিলুপ্ত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া

* বংশানুক্রমিকতা (Heredity), প্রণোদনা (Suggestion), স্বাপনতত্ত্ব (Hypnotism), স্বায়ত্ত ইচ্ছা (Free will), নিয়তি (Necessity), এই কয়টি শব্দের জন্য আমি শ্রদ্ধেয় বান্ধব-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ঋণী। সমুদয় সম্ভবপর প্রতিশব্দের মধ্যে, ঐগুলি উদ্দিষ্ট ইংরেজীভাবসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করে, বহু গবেষণা দ্বারা তিনি ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

ছেন। বর্ত্তমান সময়ের পাশ্চাত্যজগতের সর্ব্বপ্রধান নাটককার ইব্‌সেন্ তাঁহার সমুদয় নাটক এই বংশানুক্রমিকতা-তত্ত্বের উপর গঠিত করিয়াছেন। "আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ" প্রভৃতি সংস্কৃত এবং "বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া" প্রভৃতি হিন্দী শ্লোকেও, এই তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। বাইবেলে আছে,—পিতার দুষ্কৃতির নিমিত্ত পুত্র পৌত্রাদিকেও শাস্তি পাইতে হইবে। সুতরাং বলিতে হইবে, এই তত্ত্বের বীজ, অনেককাল হইতে, মানবহৃদয়ে উপ্ত ছিল।

কিন্তু বংশানুক্রমিকতা ঈদৃশ প্রবল পরাক্রান্ত হইলে, মনুষ্যচিত্তে বদ্ধমূল নৈতিক ধারণাগুলির মূলসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যদি ইচ্ছার স্বাধীনতাই না রহিল, মানবপ্রকৃতি যদি অনেক পরিমাণে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ও অন্যনিয়ন্ত্রিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তবে মানুষের নৈতিক দায়িত্ব কি প্রকারে থাকিতে পারে? —তাহা হইলে, শিক্ষারই বা নৈতিক উপকারিতা কি?

বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে, নৈতিকপ্রকৃতি গঠনে শিক্ষার প্রতি আমরা যতটা গুণারোপ করি, উহা ততদূর গুণবতী কি না, সন্দেহ। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক হেল্‌ভেশিয়স্ বলিয়াছেন, মানুষে মানুষে যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল শিক্ষার গুণে। কিন্তু অধুনা অল্প লোকই শিক্ষাকে—অন্ততঃ সাধারণতঃ যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহাকে—এরূপ উচ্চাসন প্রদানে স্বীকৃত হইবেন। শিক্ষা কি আমাদের নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত করিতে পারে? যে ব্যক্তি, স্বভাবতঃ ক্রো পরবশ, হিংসাপরায়ণ বা কামাসক্ত, শিক্ষা গুণে কি তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ সংশোধি হইতে পারে? দেশের অবস্থা দেখিয়া বো হয়, ইহার উত্তরে 'হাঁ' বলিতে অনেকে দ্বিধা করিবেন। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ম নৈতিক অধোগতির দৃষ্টান্তের অভাব নাই অথচ অশিক্ষিত বঙ্গীয় গ্রাম্য ললনাবর্গের ধিকাংশ, নৈতিক সংযমের জন্য বিখ্যাত। ত কি নৈতিক চরিত্রপরিবর্ত্তনে শিক্ষার কোন ক্ষমতা নাই?

M. Guyan নামক ফরাশি বৈজ্ঞানি লেখক এই প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হই ছেন। তিনি সংক্ষেপতঃ ইহার উত্তরে ব য়াছেন,—"আছে, কিন্তু বাল্যকাল হইতে ক্ষারম্ভ ও আমার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্ব করিলে, অন্যথা নহে।" তাঁহার মতে মানব জীবন যেরূপ বংশানুক্রমিকতা দ্বারা অনে পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেরূপ আর এক তত্ত্বদ্বারাও হইয়া থাকে,—তাহার নাম শা রিক অথবা আধ্যাত্মিক প্রণোদনা (Phy siological or psychological suggestion)। তিনি বলেন, অল্প দিন মাত্র বৈজ্ঞা নিকগণের দৃষ্টি এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট এ নৈতিক চরিত্র গঠনে ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা নুভূত হইয়াছে। স্বাপনতত্ত্ব হইতে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে আমরা তাঁ হার যুক্তি ও দৃষ্টান্তসমূহের আলোচনা করিব।

প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে, তাহার অস্তিত্ব যথাসাধ্য বিস্মৃত হইতে হইবে। নতুবা বংশানুক্রমিকতা, বাস্তবিক যে পরিমাণে, আমাদের নৈতিক জীবনের নিয়ামক, ক্রমে উহা তদপেক্ষা প্রবলতর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিবে। এই কারণে, শিশুদিগকে কেবল মন্দ বলা, বা তাহারা কখন ভাল হইবে না বলিয়া ভয় দেখান, বড়ই অহিতকর। পুনঃ পুনঃ গুরুজনের নিকট, এরূপ কথা শুনিলে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়া যায়, তাহারা নিরাশচিত্তে পাপের পথে গা ঢালিয়া দিতে অভ্যস্ত হয়। অনেক সময়, দেখা গিয়াছে, কোন অপরাধীর গুরুতর দণ্ডবিধান করিলে, সে সংশোধনের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। যতক্ষণ তাহার মনে আত্মবিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ তাহার উন্নতির সম্ভাবনা থাকে, নৈরাশ্য জন্মিলে, সে কিছুতেই ভাল হইতে পারে না। দশবার চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত এক ব্যক্তির করমর্দ্দন করিয়া, জনৈক উকীল, তাহার নৈতিক জীবনে, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়াছিলেন,—ইহাতে অপরাধীর এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সে তখনও মনুষ্যনামের এক বারে অযোগ্য হয় নাই, তখনও তাহার সংশোধনের আশা আছে। এবং এই বিশ্বাস হইতেই, সে আবার মানুষ হইতে পারিয়াছিল। অতএব নৈতিক জীবনের সংশোধনদ্বারা, বংশানুক্রমিকতাকে পরাজিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে, বাল্যকাল হইতে, কেবল উপদেশ নহে, দৃষ্টান্তদ্বারা উচ্চাদর্শ শিক্ষা দিতে হইবে, এবং শিশুদিগকে স্ব স্ব জীবনে তাহা অনুসরণ করিতে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে। কুরুচিপূর্ণ পুস্তক, বাক্য বা ভাব হইতে তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক দূরে রাখিতে হইবে এবং তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

বাল্যকালে, এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, পূর্ণবয়স্ক মানব, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বাভাবিক সংস্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্গে, প্রণোদনা-অর্জ্জিত কতকগুলি সদ্ভাবলাভ করিতে পারে। প্রথমতঃ ওগুলি অস্বাভাবিক থাকে, কিন্তু অনুশীলন দ্বারা, উহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া লওয়া যায়। তখন উহারা এরূপ বলবান্ হয় যে, উহাদের সাহায্যে বংশগত প্রকৃতির পরিশোধন সম্ভবপর হইয়া উঠে। অতএব দেখা গেল, প্রণোদনোদ্রিক্ত সদ্ভাবসমূহকে চর্চ্চা দ্বারা অভ্যাসে পরিণত করিতে পারিলেই কেবল, বংশানুক্রমিকতার কুফল হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এরূপ করিলে, আমাদের স্বোপার্জ্জিত সদ্ভাবরাশি অভ্যাসে পরিণত হইয়া আমাদের পুত্রপৌত্রাদিতে প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তাহাদের বংশানুক্রমিক প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নততর হইয়া উঠিবে। আমরা আমাদের কলুষিত চিত্তে যাহা কর্ত্তব্য বা নির্দ্দোষ বিবেচনা করি, তাহাদের নির্ম্মলতর অন্তঃকরণে তাহাতেই পাপের কালিমা দেখিয়া, তাহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবে, এবং বংশানুক্রমিক সংস্কার এইরূপে পরিশুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে লইয়া যাইবে। আর উপরোক্ত উপায়ে শিক্ষা নিয়মিত না করিলে, আমাদের

নৈতিক চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে না, আমরা বুদ্ধিকৌশল ও জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিলেও, শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তম উদ্দেশ্য নিষ্ফল থাকিয়া যাইবে।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বিএল।

কেন দেখিলাম!

অপরূপ পেখনু রামা,—
কনক-লতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণী-হীন হিম-ধামা।
* * *
সুন্দর বদনে সিন্দূর-বিন্দু
সাঙর চিকুর-ভার।
জনু রবি, শশী সঙ্গহি, উয়ল—
পিছে করি আন্ধিয়ার।

সুন্দরী, সলিল-সিক্ত সূক্ষ্মাম্বরে, সোনার অঙ্গ আবরিয়া ও আর্দ্র কেশ-রাশি পৃষ্ঠে দোলাইয়া, তটিনীর তটে, তরুতলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—এবং তাহার অদূরে, অধিকতর সুন্দর, সোনার পুতুলের মত মনোহর, একটি সুকুমার শিশু, মায়ের চোকের দিকে চাহিয়া, কি যেন মৃদু মৃদু কহিতেছে। আমি কেন ঐ মনোমোহিনী মূর্ত্তি তৃষিত-চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম; এবং দেখিয়া, কেনই বা চিত্তে এই-রূপ উদ্বেল ও অধীর হইলাম। আমার এ প্রাণের পিপাসা কি শুধুই রূপের তৃষা?

রূপ ত এই নিখিল জগতে, সূক্ষ্ম ও স্থূল,—অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এবং দ্রব ও ঘন—সমস্ত বস্তুতে নিত্য নূতন মূর্ত্তিতে বিলসিত হইতেছে। আমার এই তৃষাতুর প্রাণ যদি রূপের তৃষ্ণায়ই আকুল হইয়া থাকিবে তবে এই অনন্তরূপিণী প্রকৃতির অনন্ত লীলার রূপে উহা মুহূর্ত্তের তরেও মোহিত হয় না কেন? সুন্দরীর ঐ কনক-গৌর কান্তি বর্ণ, কাঁচা সোনা অথবা দুধে আলতার মত হৃদয়হারি হইতে পারে; কিন্তু আধো-মুকুলিত গোলাপের আভা কি তাহা হইতেও অধিকতর হৃদয়হারিণী নহে? আমার উত্তরে ও দক্ষিণে,—বনে ও উপবনে, এইরূপ কচি গোলাপ, সরস-বসন্তের মৃদু সমীরে, মৃদু-কম্পিত মুগ্ধ অধরে, কতই ত কি যেন কহিতেছে! কিন্তু আমার এই চক্ষু, কখনও ত গোলাপের সে অস্ফুট রূপ চাহিয়া দেখে না,—গোলাপের সে অস্ফুট কথা কান পাতিয়া শুনে না।

সুন্দরীর প্রীত-প্রফুল্ল মুখ-মাধুরী, আজিকার এই পূর্ণচন্দ্রের প্রাণ-প্রফুল্ল প্রসন্ন মাধুরীর সমান হইবে কি? আমার চক্ষু সুন্দরীর মুখশ্রীতে রূপের উপাসনা করিতেছে; কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের ঐ অপরূপ জগন্মোহন-শ্রীতে কিছুই ত দেখিতে পাইতেছে না! এই পৃথিবীর কত স্থানে, কত চকোর, চন্দ্রের ঐ রূপ-জ্যোৎস্না পান করিবার জন্য, জ্যোস্নী যামিনীর আনন্দময় আকাশে উড়িয়া উড়িয়া, প্রকৃতির স্বভাব-

সুন্দর রূপানুরাগিতা প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু আমার এই প্রাণটা ত, ক্ষণকালের তরেও, উহার অন্ধতামস-বিষাদ-কূপ, অথবা গভীর মোহের অন্ধকার হইতে উন্মুক্ত হইয়া, আজিকার এই জ্যোৎস্নাধবল জগদুজ্জ্বল আকাশ-মণ্ডলে উড়িয়া বেড়াইতেছে না। চকোরের ঐ প্রাণারাধ্য চন্দ্র, প্রায় প্রতিদিনই ত, নিশাগমে আমার নয়নে পড়িতেছে;—যেন আমারই দিকে চাহিয়া,—আমারই নয়নে নয়ন মিশাইয়া, মৃদু মন্দ হাসিতেছে, এবং উহার অতুল রূপের আভা দেখিবার জন্য, ইঙ্গিতে আমায় আমন্ত্রণ করিতেছে। কিন্তু আমার এই দগ্ধ-কঙ্কর-সদৃশ কঠোর প্রাণটা ত একবারও চাঁদের ঐ চিত্তরঞ্জন চটুল-হাসি চাহিয়া দেখিতেছে না,—চন্দ্রের ঐ চকোর-বিলাসি আমন্ত্রণে আকৃষ্ট হইতেছে না।

সুন্দরীর ঐ মন্দ-মারুত-সেবিত মেঘ-মোহন কেশ-রাশি কতই ত সুন্দর বোধ হইয়াছে। যখন সে গৌর-তনু-পরিশোভি দলিতাঞ্জন-সন্নিভ কেশরাশির বিলম্বিত শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম, তখন হৃদয়ে কেমন একটা মধুর-ভয়ঙ্কর মনোমদ ভাবের স্ফুরণ হইল, তাহা তখন বুঝিতে পাইলাম না। কিন্তু এ জগতে, তেমন বিচিত্র শোভা আরও অনেক স্থানে অনেক দেখিয়াছি। আমার এ শুষ্ক হৃদয়,—এক দিনও ত, তাদৃক্ শোভা দর্শনে আর্দ্র হয় নাই। একখানি গাঢ়-ঘন, মিশমিশে-কালো, ছিন্ন মেঘ, আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে অল্প অল্প আবরিয়া, সে চান্দ্রমসী কান্তির উপর চারু-চিক্কণ চিকুর-রাশির মত, বিলসিত হইতেছে, এবং কখনও একদিকে একটুকু সরিয়া পড়িয়া,—কখনও বা সে চন্দ্রমুখের এক পাশে দোলায়িত হইয়া, কবি-ভোগ্য ললিত-চাতুরীর কতই ত কি দেখাইতেছে। এইরূপ দৃশ্য, প্রায়শঃই ত, মানুষের চক্ষে পড়ে। কিন্তু আমার চক্ষু কখনও তাহাতে স্পৃষ্ট হইয়া থাকে কি? ক্ষীণ-সলিলা ও ক্ষীণ-শরীরা স্রোতস্বিনী, মৃদু-মৃদু—কুলু-কুলু, বহিয়া যাইতেছে;—আর, যেন উহার সেই শোক-সন্তপ্ত কান্তির উপর, নিদাঘ সন্ধ্যার এক খানি নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘের ছায়া, কেমন ভাবে আসিয়া, ঝুলিয়া পড়িতেছে। তটে, ধীর-স্থীর স্তব্ধমূর্ত্তি তাপসসমূহের ন্যায়, তরুরাজি। তরুরাজির শ্যামল ছায়াও, মেঘের ছায়ার সহিত মিলিয়া মিশিয়া, কেমন এক অপরূপ শোভা ফলাইতেছে। কিন্তু আমার এই চিত্ত অথবা চক্ষু কখনও সেই শোভা দর্শনে পুলকিত হইয়াছে কি?

এ সকল কথা ভাবিবার সময়ে, আর একটা কথাও আপনা হইতেই মনে আইসে। এই যে সুন্দরীর রূপ দেখিয়া অধীর হইলাম, এবং রূপের পিপাসা অথবা রূপের উপাসনা বিষয়ে, মনে মনে, এত কথার আলোচনা করিলাম, রূপ কি? রূপ কি আমার মনে, না এই বহির্জ্জগৎ দৃশ্যভবনে? রূপ যদি রঙের মত একটা নিত্যসিদ্ধ প্রকৃত বস্তু,—(Objective Reality)—তাহা হইলে, যাহা এক জনের চক্ষে অত সুন্দর দেখায়, আর এক জনের চক্ষে তাহা তেমন সুন্দর দেখায় না কেন? মনুষ্য আপনার প্রাণাধিক-প্রিয়তমার মুখশ্রীতে রূপের যেরূপ লীলা-বিলাস প্রত্যক্ষ করে, পৃথি-

বীর আর কোথাও তাহা দেখিতে পায় না কেন? অথবা কল্য যাহাকে রূপোজ্জ্বলা সুন্দরী মনে করিয়াছি, আজ তাহাকে কাল-ভুজঙ্গীর ন্যায়, বিকট দেখিতেছি কেন? সেই চক্ষু, সেই মুখ, সেই তিল-ফুল-নাসা, সেই তরল চাহনি,—সেই মিশ্রকেশীর কেশ, সেই মন-ভুলানো মুচ্‌কে হাসি, তেমনই—তেমনই—তেমনই রহিয়াছে। অথচ কিছুই আর আমার কাছে তেমন বোধ হইতেছে না কেন? ইহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না যে, রূপ কতকটা মানুষের নয়নে, আর কতকটা তার চির-পরিবর্ত্ত-শীল চল-বিকল মনে?

আমি এক দিন, আপনার ভাবে বিভোর হইয়া, রূপ-রহস্যের এই তত্ত্ব চিন্তা করিতেছি; এবং সেই চিন্তারই তাড়নে, কখনও হর্ষে স্ফুরিত, কখনও বা বিষাদে সন্তাপিত হইতেছি, এমন সময় আমার প্রাণের মধ্যে, অকস্মাৎ আর একটা অপরূপ ভাবের উদয় হইল। মানুষ যেমন হঠাৎ আকাশবাণী শুনিয়া স্তম্ভিত হয়, আমিও সেইরূপ, যেন আমার অন্তরাকাশে,—ঐ প্রকার ভাবাবেশে—কার যেন কেমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী শুনিয়া, আড়ষ্টের মত হইলাম। আমি যেন আমার অন্তঃশ্রুতিতে শুনিতে পাইলাম,——

"অদীক্ষিত, অবোধ, রূপের উপাসনা তোমার জন্য নহে। সোনা যেমন, আগুনে পুড়িয়া পবিত্র না হইলে, অঙ্গাভরণের সামগ্রী হয় না, মানুষের হৃদয়ও সেইরূপ, লালসা, পিপাসা ও পরিতাপের আগুনে, পুড়িয়া পুড়িয়া, পবিত্র না হইলে, রূপের উপাসনার যোগ্য হয় না। এই জন্যই লালসা, এই জন্যই পিপাসা, এবং এই জন্যই—চৈতন্যময়ী প্রকৃতির বিস্ময়াবহ নিয়ম-বিধানে—চিরচঞ্চলা লালসা ও পিপাসার পরিণতি-স্বরূপ পরিতাপ-বহ্নির ভস্মরাশি হইতে পুণ্যপুঞ্জময়ী প্রশান্ত-স্নিগ্ধ, পরার্থা প্রীতির পুনরুজ্জীবন-প্রত্যাশা।"

আরও শুনিলাম,——

"রূপই প্রকৃত উপাস্য। যদিও সকলের পক্ষে, অথবা সর্ব্বপ্রথমেই, উহা সম্ভবপর নয়; তথাপি রূপই উপাসনার চরম আশ্রয়,—এবং এই জন্যই যোগনগ্ন ঋষি-মহর্ষিরা জগন্নিধানও জগজ্জীবন জগদীশ্বরকে রূপের নিধি অথবা জগন্মোহন-সুন্দর বলিয়া ধ্যান করিতেন। ইহার প্রমাণ, তাঁহাদিগের সেই পৃথ্বী-বিশ্রুত মহাবাক্য,——

"সত্যং—শিবং—সুন্দরম্।"

নদীর লহরে লহরে এবং সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, ঐ একই বাক্য, প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—

"সত্যং—শিবং—সুন্দরম্।"

পাদপ-বহুলা বনভূমিতে এবং প্রান্তরে,—পর্ব্বতের উপত্যকায়, ও পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে, ঐ মহাবাক্যই, মহাভাবময় গম্ভীর-ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে,——

"সত্যং—শিবং—সুন্দরম্।"

আর, যাহার কান আছে ও প্রাণ আছে,—যে শুনিতে জানে এবং শুনিয়া প্রাণে অনুভব করিতে সমর্থ হয়, সে কিবা শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দে,—কি বা ঐ অনন্ত আকাশের অনন্ত কোটি সৌর-জগতের সুধাময় সঞ্চার-সংগীতে

ঐ মধুর বাক্যই সতত শুনিতে পাইবে,——

"সত্যং—শিবং—সুন্দরম্।"

আবার—আবার শুনিলাম,——

"তুমি কি প্রকৃত রূপের উপাসনার জন্যই আকুল হইয়াছ? রূপের উপাসনায় পঁহুচিতে হইলে, তাহার প্রথম সোপান সত্য অর্থাৎ নিত্য-শুদ্ধ-পবিত্রতা। দ্বিতীয় সোপান শিব-ভাব, অর্থাৎ সর্ব্বজনে স্নেহশীতলা প্রীতি,—সর্ব্বজনীন-প্রেম-যোগে সকলেরই মঙ্গল বাসনা। আর শেষ সোপান, সুন্দরের উপলব্ধি অথবা সৌন্দর্য্যের অনুপ্রাণনায় স্বার্থবিসর্জ্জন ও আত্মদান। যাহার হৃদয় সত্যের সুনির্ম্মল জ্যোতিতে আলোকিত হয় নাই,—সত্যের সেবা করিয়া, পবিত্রতার অনুরাগী হইতে পারে নাই, রূপ তাহার জন্য অগ্নিশিখার ন্যায় দুঃসহ। রূপের স্মরণ-মনন-সুখানুচিন্তনও, তাহার পক্ষে, যার পর-নাই দুঃখাবহ। আর, যাহার হৃদয়, কি বা সুরূপ, কি বা কুরূপ, সকলের সম্পর্কেই স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য সুগভীর-কল্যাণ-কামনার পরিপোষণদ্বারা সতত শিব-ভাবে বিভোর না রহে, রূপ তাহার জন্য প্রত্যক্ষ বিষ অথবা বিপত্তির পথ। এই জন্যই মানুষের প্রায়, প্রায় সকল স্থলেই, রূপ দেখিয়া, লালসায় যেন জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু আলামুখী লালসারও মানব-জীবনে বিশেষ প্রয়োজন আছে। লালসাও প্রীতির ন্যায় পরিণাম-মঙ্গলা। লালসা, উহার জ্বালাময় অবস্থায়, মনুষ্যকে ভূষের আগুনে পোড়াইয়া পোড়াইয়া, শুদ্ধির পথ লওয়ায়, এবং তাহাকে কর্ণে কর্ণে,—ধীরে ধীরে উপদেশ করে,—সাবধান হও, সতর্ক হও, তুমি এখন পর্য্যন্ত রূপ দেখিবার যোগ্য হও নাই। পতঙ্গ যেমন বহ্নি দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হয়, এবং বহ্নির রূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, পুড়িয়া ভস্ম হয়, তুমি এখনও সেই অবস্থায় রহিয়াছ, এবং তোমার প্রাণ-পতঙ্গ সেই জন্যই রূপ দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। তুমি যখন, সুন্দরীর ঐ সন্নিহিত শিশুটির মত, রূপের তরঙ্গে শুধুই মাতৃস্নেহের অনুরূপ, প্রাণ-শীতল স্নেহের তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করিবে,—যখন রূপ দেখিয়া দাহ-পিপাসায় ক্লিষ্ট না হইয়া, প্রাণে নিরাম-নির্ম্মল পবিত্র প্রীতির অমৃতময় স্পর্শে শীতল হইবে, সেই সময়ে তোমার এই প্রাণ, রূপের উপাসনায় অধিকার পাইবে। তখন সুন্দরীর গৌর-কান্তি, আর চন্দ্রের গৌর-জ্যোৎস্না,—সুন্দরীর সলিল-সিক্ত সূক্ষ্মাম্বর, আর সুন্দর-কুসুমের সুকুমার অঙ্গে শিশিরের আবরণ,—সুন্দরীর নীরদ-শ্যাম কেশ-কলাপ,—আর আকাশের কেশ-শ্যাম নীরদ-মালা, জগতের এই সমস্ত বস্তুই তোমাকে জগন্মনের রূপের দিকে আকর্ষণ করিবে; এবং তোমাকে নিরন্তর কানে কানে কহিবে,—আর নিদ্রালস রহিও না,——

রূপ দেখিয়া নয়ন জুড়াও, রূপ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল কর,—এবং রূপনিধানকে প্রাণের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া চিরজীবনের জন্য চরিতার্থ হও।

কবি শ্রীহর্ষ।

এই সম্বন্ধে "শঙ্কর মন্দারসৌরভ" নামক গ্রন্থপ্রণেতা নীলকণ্ঠ ভট্ট বলেন, "কল্যব্দের তিন হাজার আট শত উননব্বই বৎসর অতীত হইলে, বৈশাখ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে, শিবগুরুপত্নী ভদ্রা কলিকলঙ্কহারী শঙ্করকে প্রসব করেন *।

কল্যব্দ এখন পাঁচ হাজার এক; সুতরাং বলিতে পারা যায়, ১১১২ বৎসর পূর্ব্বে, শঙ্করাচার্য্য ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ১১শত বৎসরের সহিত ৮০০ শত বৎসর যোগ করিলেই, আমরা বর্ত্তমান ১৯০০ শত অব্দ প্রাপ্ত হইতে পারি।

শঙ্করাচার্য্যের ভক্তশিষ্যমণ্ডলীর উক্তি দ্বারাও উক্ত নীলকণ্ঠ ভট্টের নির্দ্দেশ সমর্থিত হইতেছে †।

রাজা আদিশূরও যে এই সময়েই বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন, তাহাতেও কোন সংশয় নাই।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের মতে, ৯৯৯শকে, আদিশূর বঙ্গে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগকে আনিয়াছিলেন ‡। কিন্তু আমাদের নিকট এই কথা প্রমাণপূত বিবেচিত হইল না।

আইন আকবরী গ্রন্থের মতে আদিশূর ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লাল কর্ত্তৃক 'দান সাগর' পুস্তক লিখিত হয় §। সুতরাং ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্য বা শেষভাগে বল্লাল সেনের বর্ত্তমানতা একরূপ স্থিরীকৃত। বল্লাল সেন আদিশূরের দৌহিত্রকুলের অধস্তন ৯ম পুরুষ। প্রতি পুরুষে ২২ বৎসর অন্তর ধরিলে ৮০০ শত খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আদিশূরকে জীবিত দেখিতে পাই। আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত

* প্রসূতে তিষ্য শরদামতিযাতবত্যাং একাদশাধিকশতোনচতুঃসহস্যাং। বৈশাখশুক্ল দশমীদিবসে কুমারং শ্রীশঙ্করং কলিকলঙ্কবিনাশকম্।

তিষ্য অর্থ কলি। শঙ্করমন্দারসৌরভ।

† নিধিনাগেভ বহ্বব্দে বিগতে মাসি মাধবে। শুক্লে তিথৌ দশম্যান্তু শঙ্করার্য্যোদয়ঃ স্মৃতঃ।

‡ নবনবত্যধিক নবশতী শতাব্দে বঙ্গে আদিশূরঃ পঞ্চব্রাহ্মণান্ আনয়ামাস।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্।

§ নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীবল্লালসেন দেবেন। পূর্ণে শশিনবদশমিত শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ। সময় প্রকাশ।

বিপ্রপঞ্চকের পরবর্ত্তী ৯ম হইতে ১৩শ সন্ততিই বল্লালের সভায় কৌলিন্য প্রাপ্ত হয়। ইহাদের বংশগণনায়ও পূর্ব্বোল্লিখিত সময়ই নির্দ্ধারিত হইতেছে না কি?

আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষই যে নৈষধচরিতের রচয়িতা, তাহার আরও বিশিষ্ট প্রমাণ এই, শ্রীহর্ষ বঙ্গদেশে পদার্পণ না করিলে, কখনই "গৌড়োর্ব্বীশকুল প্রশস্তি" 'অর্ণববর্ণনা' প্রভৃতি রচনা করিতে পারিতেন না। বহুদূর কান্যকুব্জে বসিয়া বঙ্গদেশের রাজমণ্ডলীর বর্ণনা একরূপ অসম্ভব নয় কি?

ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত পাঠে জানা যায়, যজ্ঞকারী রাজা আদিশূর দেশীয় বিপ্রদিগকে আচারভ্রষ্ট ও স্বাধ্যায়হীন দেখিয়া, আচারনিষ্ঠ বেদবিৎ ব্রাহ্মণপঞ্চকের আনয়ন-কামনায় কান্যকুব্জের তদানীন্তন রাজা বীরসিংহ দেবকে পত্র লিখেন; এবং বীরসিংহ নৃপতি আদিশূরের প্রার্থনামত শ্রীহর্ষ প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি নৈষধচরিত ও খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে, কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে, তাম্বূলদ্বয় ও আসন প্রাপ্তির কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীহর্ষ যে কান্যকুব্জবাসী ও রাজার অনুগৃহীত ব্যক্তি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং, আদিশূরের প্রার্থনায়, বীরসিংহের অনুজ্ঞায়, পণ্ডিত শ্রীহর্ষের বঙ্গে আগমন সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না কি?

এখন দেখিতেছি, যে মহাকবির প্রতি বহুদূরের কনোজী ব্রাহ্মণ বোধে ঈর্ষ্যাকষায়িত লোচনে কটাক্ষপাত করিতাম, তিনি আমাদের প্রতিবেশী ভরদ্বাজগোত্রীয় * মুখোপাধ্যায় মহাশয়দের আদিপুরুষ হইয়া পড়িলেন †!

এই মহাত্মারই ১৩শ সন্ততি উৎসাহ ও গরুড় মুখোপাধ্যায় প্রথম কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ‡।

অনেকে অনুমান করেন, ইনি পুস্তকাদি রচনার পর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে বঙ্গে আগমন করেন; কিন্তু ইহা

ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমণি।
নিজ তনয়া লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥
তাহার তনয় দেখি রায় স্বর্গপুর।
পুত্র বা কন্যার পুত্র নাহি কিছু দূর॥
অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাহার তনয় হন শূরসেন ধীর॥
যাহার ঔরসে জন্মে বীর সেন রায়।
তাহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
ইত্যাদি। সম্বন্ধনির্ণয়। ২৩৯ পৃঃ।

* ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষঃ হর্ষবর্দ্ধনঃ।
কুলরাম।
ভরদ্বাজেষু বিখ্যাতঃ শ্রীহর্ষোমুনিসত্তমঃ।
কায়স্থ কুলদীপিকা।

† আদৌ মুখটী ডিণ্ডিচ সাহরী রাইকস্তথা।
ভরদ্বাজা ইমে প্রোক্তাঃ শ্রীহর্ষস্য তনূদ্ভবাঃ।
কুলরাম।

‡ "উৎসাহ গরুড়খ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।"
ধ্রুবানন্দ মিশ্র।
"গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি রচনাতাতস্য"
ইত্যাদি ৭ম সর্গের শেষ শ্লোক।

সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য। কারণ "গৌড়োর্ব্বীশ প্রশস্তি' ও 'অর্ণববর্ণন বর্ণনা' নিশ্চয়ই বঙ্গে আগমনের পর ইহাদ্বারা রচিত হয়। এবং উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নাম নৈষধচরিত কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে *। অতএব কবি বঙ্গদেশে আসিয়াই নৈষধীয় চরিতও রচনা করিয়াছেন, এই প্রকার অনুমান করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত নয়।

আমাদের বিশ্বাস, রাজা আদিশূরের তদানীন্তন রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানই এই অতুলনীয় কাব্যের জন্মভূমি।

আদিশূর নৃপতি রামপাল রাজধানীতেই যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং তাঁহার প্রার্থনায় কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণপঞ্চক রামপালে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত †।

যজ্ঞক্রিয়ার পর, তাঁহারা যে তথায়ই বসতি করেন, এই সম্বন্ধেও প্রমাণাদির অভাব নাই।

কথিত আছে, সদারক পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়দেশে রামপালে সমাগত হওয়াতে আদিশূর প্রথমতঃ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বেশভূষাদি দ্বারা আচার হীনতার অনুমানই এই অসাক্ষাতের কারণ। কিন্তু ইহাতে তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ অতিশয় রুষ্ট ও প্রত্যাবর্ত্তনপ্রয়াসী হইয়া আপনাদের শক্তি প্রদর্শন মানসে আশীর্ব্বাদ এক মৃত মল্লতরুতে স্থাপন করেন। মাল্যস্পর্শে ঐ মৃত মল্লবৃক্ষ সহসা মুকুলিত হয়। রাজা ইহা শুনিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং সানুনয় প্রার্থনায় উদারচেতা ক্রুদ্ধ বিপ্রকুলকে সন্তুষ্ট করেন। অদ্যাপি রামপালে ঐ মল্লতরু সজীব অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে §।

বস্তুতঃ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত শ্রীহর্ষ বা হর্ষবর্দ্ধনই যে নৈষধের কবি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। রামপালে সেই যে শ্রীহর্ষ কবি উপস্থিত হইয়া অবস্থিতি এবং তথায় নৈষধকাব্য প্রণয়ন করেন, তাহাও বলা যায়। ইতি

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ।

---

* সন্দৃব্ধার্ণবর্ণস্য নবমস্তস্য ব্যরংসীন্মহা—
কাব্যে চারুণি নৈষধীয় চরিতে সর্গোনি-
সর্গোজ্জ্বলঃ।
(৯ম সর্গ নৈষধ)

† বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্বন্ধনির্ণয়, কার্ত্তিকেয় বাবু লিখিত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

§ দেশবিখ্যাত পণ্ডিত শতাবধান ভট্টাচার্য্যের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য তাঁহার মাধবচম্পূ গ্রন্থে নিজ পূর্ব্বপুরুষদিগের নামোল্লেখ সময়ে, আদিপুরুষ দক্ষের মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং সেই সময়ে, তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে যূপতরু যে পুনর্জীবিত হয়, তাহা প্রোক্ত করেন। বলা বাহুল্য, দক্ষ শ্রীহর্ষের সহাগত অন্যতম ব্যক্তি।

কিশোর গৌরাঙ্গ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—"প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র—
শচীগৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ।
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ,
আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ।
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান্,
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম।"

যদি বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের মত চারিটা বিশাল রাজ্যের চারি-শত-বৎসর-ব্যাপি শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত প্রবাদ-পরম্পরার উপর অণুমাত্রও নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে সকলেরই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, গৌরাঙ্গ প্রকৃতই অলৌকিক রূপরাশি লইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শচীর গৃহ, সেই শিশু-গৌরাঙ্গের রূপের ছটায়, সত্য সত্যই এখন আলোক-ময়,—আনন্দময়। রূপে যেন শচীর ঘর ভরিয়া গেল,—রূপ যেন তরল-লীলাময় জ্যোৎস্নার মত ঢেউ খেলাইতে লাগিল। নব-জাত শিশুর রূপের কথা, লোকের মুখে মুখে, নবদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িল, এবং যে কাছে আসিল, সে-ই রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। তখনকার অর্দ্ধস্ফুট কবিতাও, বোধ হয়, ঐ প্রকার কেমন এক মোহময় আনন্দে অভিভূত হইয়াছিল। নহিলে, গৌর-রূপের বর্ণনায়, উহা অমন মধু-বর্ষিণী হইল কেন? কবিতায় শিশুর সেই অপ্রতিম রূপের কিরূপ বর্ণনা আছে, পাঠক তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।

"এ হেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি,
ইহারে দেখিয়া হিয়া করয়ে কি জানি।
* * * *
নিতি যোল-কলা-পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র,
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ।
আদরে অধরে আধ' মুচুকি হাসিতে,
অমিয় উথলে যেন হিল্লোল সহিতে।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে খটি করে,
ক্ষণে কোলে, ক্ষণে দোলে, হিয়ার উপরে।
অতি দীর্ঘ নয়ন, সুন্দর আধ'হাসি,
অধরে অমিয় যেন ঢালিয়াছে শশী।
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর,
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গড়ল সোসর।
মাড়িল হিঙ্গুল যেন কর পদ তল,
অধর বাঁধুলী আঁখি রাঙা উতপল।
বিজুরি মাজিল গায় রতন ঠাঁই ঠাঁই,
ঝলমল দিব্য তেজ চাহিতে না পাই।"

উল্লিখিত কবিতাটি চৈতন্য-মঙ্গল নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল। চৈতন্য-মঙ্গল-

রচয়িতা, ঠাকুর লোচনানন্দ দাস, গৌর-গুণ-গায়ক কবিদিগের মধ্যে, কবিত্বের কোন কোন সম্পদে, সর্ব্বাগ্রগণ্য। আমরা এ স্থলে পদকল্পতরু হইতে তাঁহার আর একটি কবিতা তুলিয়া দিব।

"হের দেখসিয়া, নয়ন ভরিয়া,
কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে, শচীর মন্দিরে,
চাঁদের উদয় দিনে।
কিয়ে নাথ বাণ কসিত কাঞ্চন,
রূপের নিছনি গোরা।
শচীর উদর জলদে নিকসিল,
স্থির বিজুরি পারা॥
কত বিধুবর বদন উজোর
নিশি দিশি সম শোভে।
নয়ন ভ্রমর শ্রুতি সরোরুহে
ধায় মকরন্দ লোভে॥"

পৃথিবীর সকল দেশেই, কবিরা, শশুর সুধামাখা দৃষ্টি, সারল্যময় হাসি এবং সুখ-সৌন্দর্য্যময় মুখচ্ছবির বর্ণনা করিতে যাইয়া, কবিতায় মাধুর্য্য ফলাইয়াছেন। কিন্তু, পাঠক এইরূপ মধুরাক্ষরা কবিতা খুব বেশী পড়িয়াছেন কি? শ্রীগৌরাঙ্গের রূপের কথার সহিত তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ কথার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই-কবিতাগুলি পড়িলে, সকলের মনেই স্বভাবতঃ এই সংস্কার হইতে পারে যে, তিনি যখন দুধের শিশু, তখনই তাঁহার অলৌকিক রূপে লোকের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগিয়াছিল;—এবং যদিও তিনি কাঙ্গালের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের বড় ছোট ধনী ও নির্ধন-প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার নর-নারীই তাঁহাকে দেখিবার জন্য, সেই কুটীরে আসা হইয়াছিল।

গৌরাঙ্গ যখন ছয় মাসের হইলেন, তখন জগন্নাথ তাঁহার নাম-করণ ও অন্নারম্ভের দিন দেখিলেন। জগন্নাথ দরিদ্র, শ্রীহট্টের বাস ত্যাগ অবধি নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব। তথাপি হৃদয়ে বড় বেশী সাধ। তিনি যে সময় হইতে শোকে জর্জ্জরিত, সেই সময় হইতেই উপার্জ্জনে এক প্রকার বিরত। কিন্তু গৌরাঙ্গের নাম-করণ উৎসবে তথাপি তিনি নানা রূপ ঘটার সহিত আয়োজন করিলেন। নবদ্বীপে নীলাম্বরই তাঁহার অভিভাবক। নীলাম্বর তখন জরাজীর্ণ হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ উছলিল। তিনি আসিয়া কার্য্যের ভার লইলেন। তিনি তাঁহার এই দৌহিত্রটিকে অমানুষ বস্তু বলিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহার এই প্রথম উৎসবে বৃদ্ধ নীলাম্বরের বড়ই প্রীতি জন্মিল। তিনি, প্রীতি ও উৎসাহে অধীর হইয়া, নবদ্বীপের অনেককেই এই কার্য্যে আমন্ত্রণ করিলেন। সে সময়ে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের বহু লোক নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারাও, জগন্নাথ মিশ্রের মত মায়াপুর-পল্লীতেই বাড়ী ঘর বানাইয়া লইয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আসিয়া এই কার্য্যে যোগ দিলেন। নীলাম্বরের কনিষ্ঠ জামাতা, শচীর ভগিনী-পতি নন্দন আচার্য্য ঐ পল্লীতেই বাস করিতেন। তিনি, তাঁহার গৃহিণী এবং আরও

অনেক পুরবালাকে সঙ্গে লইয়া, শচীর পুত্রোৎসবে উপস্থিত হইলেন। কাঙ্গালিনী শচীর ঘরে যেমন তখন লোক ধরে না, হৃদয়েও তেমন আনন্দ ধরে না। শচীর বয়স তখন চল্লিশের কিছু কম। শচী, জগন্নাথ এবং বালক বিশ্বরূপ, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে সুখী করিবার জন্য, নানারূপে যত্ন করিলেন।

এই উৎসবের কথায় আর একটি কথা মনে হইতেছে। ইদানীং ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রীত্যর্থে, প্রতি বৎসরই বহুসহস্র মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। যাহারা অতি দীন-দরিদ্র,—দশ বার মণ তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই যাহাদিগের সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহারাও, গৌরাঙ্গের নামে মহোৎসব করিয়া, দুঃখী কাঙ্গালকে অন্নদান করে। অপিচ, যাঁহারা ভগবানের কৃপায় ভাগ্যবান্, তাঁহারাও, অসংখ্য লোককে অন্নব্যঞ্জন দান করিয়া, মহোৎসবের অনুষ্ঠানে, সেই মহাপুণ্যময় নামের পূজা করেন। যদিও গণনা দ্বারা প্রকৃত কথা অবধারণ করা কঠিন, তথাপি এইরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, উল্লিখিতরূপ মহোৎসবে, এ দেশে, বর্ষে বর্ষে, সাত কোটি বাঙ্গালির মধ্যে, ন্যূনতঃ এক কোটি লোক, গৌরাঙ্গের প্রসাদ-লাভে, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে, এবং সুতরাংই এইরূপ উৎসবে ন্যূনতঃ কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আজি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ অবধি নিকৃষ্টতম চণ্ডাল পর্য্যন্ত, যাঁহার নাম লইয়া, এত উৎসাহ, এত উল্লাস এবং এত আনন্দের সহিত অসংখ্য লোককে অন্ন বিলাইতেছে, তাঁহার শ্রীমুখে প্রথম অন্ন তুলিয়া দেওয়ার সময়, দুঃখিনী শচী, দরিদ্র জগন্নাথ কয়টি লোককে অন্নদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? অথবা শচী ও জগন্নাথের মনে এ সকল কথা কিরূপে উদিত হইবে? তাঁহারা তখন আনন্দে অবশ। তাঁহারা, আপনাদিগের অবস্থানুসারে, তখন মুক্তপ্রাণে, আনন্দ করিলেন ও আনন্দ বিলাইলেন, এবং যে সকল প্রতিবেশিনীরা শিশুটিকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া আত্মহারা হইলেন। রূপের এই মোহ প্রকৃতই মনুষ্যের পক্ষে অনতিক্রমণীয়। চাঁদের জ্যোৎস্নায় যেমন এক অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধতা আছে, রূপের জ্যোৎস্নায়ও তেমন কিছু আছে কি? কবিরা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, এই শিশুটিকে যে আসিয়া কোলে তুলিয়া লইত, সে-ই ঐরূপ কেমন এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা অন্তরে অনুভব করিত, এবং যেন তাহার প্রাণ মন শীতল হইয়া যাইত। এই সকল কথা কি প্রকৃতই নিতান্ত অলীক? অলীক হইলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী-গানায়, এইরূপ সুদীর্ঘ কাল অতীত হওয়ার পরেও, এ সকল কথার আলোচনায়, লোকের তেমন প্রগাঢ় অনুরাগ ও ঔৎসুক্য দৃষ্ট হইতেছে কেন?

পাঠক জানেন যে, জগন্নাথ মিশ্র বড়ই ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পুত্রোৎসবে সর্ব্ব-প্রথমেই বেদ পাঠ, গীতা পাঠ ও ভাগবত-পাঠ করাইলেন। তাহার পর, তাঁহার এই

কনিষ্ঠ পুত্রকে কি নামে অভিহিত করা হইবে, ইহা লইয়া পাঁচ জনের মধ্যে একটুকু আলোচনা করিলেন, এবং সকলে সর্ব্বপ্রকার আলোচনা করিয়া বিশ্বম্ভর নাম অবধারণ করিলেন। এ নাম জগন্নাথের বড় প্রীতিকর হইল। তিনি সম্মুখে যাইয়া, একখানি থালার উপর ধান, খড়ি, সোনা, রূপা এবং আরও পাঁচ প্রকার বস্তু রাখিয়া, বড় আদর করিয়া, ডাকিয়া বলিলেন, বাবা বিশ্বম্ভর, তুমি ইহার কোন একটা বস্তু হাত বাড়াইয়া ধর। ঐ থালার উপর একখানা পুঁথি ছিল। বিশ্বম্ভর তাঁহার কুসুম-কোমল কচি হাতটুকু বাড়াইয়া সেই পুঁথিখানি মাত্র স্পর্শ করিলেন। পুঁথিখানির নাম শ্রীমদ্ভাগবত। উহা ভূভারতে ভক্তিশাস্ত্রের পরম-গ্রন্থ। যিনি স্ফুটিত জীবনে ভগবদ্ভক্তির সমুদ্র ঢালিয়া দিয়া জীব উদ্ধার করিয়াছিলেন, তিনি যদি অস্ফুট শৈশবে সেই ভাগবতখানিই হাতে ধরিয়া থাকেন, তাহা কাকতালীয় হইলেও, যার-পর-নাই বিস্ময়াবহ। যাঁহারা সম্মুখে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন যে, এই শিশু বড়ই পণ্ডিত এবং বড়ই বৈষ্ণব হইবে।

এ দেশে এখনও যেমন ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার নামে একটুকু সাদৃশ্য থাকে, তখনকার লোকেরাও তাদৃক্ সাদৃশ্য রক্ষা বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। সুতরাং, যেখানে জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ, সেখানে কনিষ্ঠের নাম বিশ্বম্ভর, সকলের কাছেই বড় ভাল লাগিল। কিন্তু,এই বিশ্বম্ভর নাম প্রচলিত হইল না। ইহা অদ্যাপি সাধারণ লোকে জানে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবদ্বীপের নর-নারী গৌর-রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। সেই অসামান্য গৌররূপের কথা এখনও সহস্র হৃদয়ে বিস্ময়ের কথা। এই হেতু, গৌর-রূপোজ্জ্বল বিশ্বম্ভর,—গৌরাঙ্গ, গৌরচন্দ্র, গোরাচাঁদ, গৌরমণি, গৌরনিধি, গৌরসুন্দর অথবা শুধু গৌর কি গোরা ইত্যাদি রূপ-বোধক নামেই সাহিত্যে ও সংগীতে সমধিক কীর্ত্তিত। গৌরাঙ্গের আর এক নাম নবদ্বীপচন্দ্র। এ নামও গৌরচন্দ্র নামের ন্যায়, রূপের পরিচায়ক। বৈষ্ণব কবিরা বলেন যে, তাঁহার গৌরহরি নাম শিশুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। যথা চৈতন্য ভাগবতে,—

"এমত শিশুর রীতি কোথাও না শুনি,
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি।
হরিবলি নারীগণ দেয় করতালি,
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী।"

পুনশ্চ গ্রন্থান্তরে—

"বাল্যভাবে ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন,
হরি কৃষ্ণ নাম শুনি সম্বরে রোদন।
অতএব হরি হরি বলে নারীগণ,
দেখিতে আইসে যে বা সর্ব্ব বন্ধু জন।
গৌর-হরি বলি তাঁরে হাসে সব নারী,
অতএব নাম তাঁর হৈল গৌর-হরি।"

কিন্তু শচী, গৌরচন্দ্রের রূপের কথা, অতি গোপনে হৃদয়ে পুষিলেও, কখনও মুখে তাহা ব্যক্ত করিতেন না, এবং যে সকল নামে কোন রূপ গৌরবের গন্ধ প্রকাশ পাইত, তাহা কখনও মুখে আনিতেন না। মায়ের প্রাণ এক অপূর্ব্ব বস্তু। উহা সকল সময়েই

ভয়ে ধুক বুক করে,—বিনা কারণেও অমঙ্গল চিন্তা করিয়া, আকুল রহে। সকলের কাছে যাহা মধুর ন্যায় মিষ্ট, মায়ের প্রাণে তাহা নিম্ব ফলের ন্যায় তিক্ত। সকলে যাহাকে যত বেশী সুন্দর মনে করে, মা তাহাকে তত বেশী কুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে সুখানুভব করেন। বোধ হয়, মাতা শচীও, এই সকল কারণেই, তাঁহার এই অলৌকিক রূপ-নিধান সোনার পুতুলকে নিমাই বলিয়া ডাকিয়া থাকিবেন।

"ডাকিনী শাঁখিনী হ'তে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ভয়ে নাম থুইলা নিমাই।"

শ্রীগৌরাঙ্গ যতকাল নবদ্বীপে ছিলেন, ততকাল আত্মীয় স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদিগের কাছে, নিমাই নামেই তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। কিবা ঘরে, কিবা বাহিরে, সকলেই তাঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিত। কিন্তু, শচীর দুলাল গৌরচন্দ্র আমাদিগের কাছে নিমাই নহেন। আমরা তাঁহাকে সেই সুমধুর বাৎসল্যের ভাবে নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ। আমরা যখন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপরাশি হৃদয়ে ধ্যান করি,—তাঁহার সেই পাপহারিণী পবিত্র মূর্ত্তি, তাপহারিণী তরল দৃষ্টি, এবং পাপিতাপীর প্রাণ-স্পর্শিনী পীযূষ-বর্ষিণী কথা চিন্তাদ্বারা চিত্তে আয়ত্ত করিতে যত্নবান্ হই, তখন তিনি আমাদিগের নিকট প্রকৃতই শত-চন্দ্র-সমুজ্জ্বল গৌরচন্দ্র অথবা শ্রীগৌরাঙ্গ। আমরা এই হেতু, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে, গৌরচন্দ্র অথবা গৌরাঙ্গ বলিয়াই তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিব। গৌরাঙ্গের আর এক নাম চৈতন্য। এ নাম তাঁহার জীবনের কোন্ সময় হইতে কেন প্রচারিত হয়, পাঠক তাহা পরে জানিতে পাইবেন। ভক্তদিগের মধ্যে তাঁহার আর এক নাম মহাপ্রভু। এ নামের ইতিহাসও প্রসঙ্গক্রমে পরে প্রকটিত হইবে।

নির্ম্মল উৎকর্ষ ও নেড়া হরিদাস।*

বহুকাল হয়, কোকিলের কথা কহি নাই, ভ্রমরের কথা কহি নাই; আর কোকিল ও কল-গুঞ্জর-ভ্রমরের পরিচিত শত্রু, কবি-চিত্রিত বিরহিণীর কথা কহি নাই। আজি কথা-প্রসঙ্গে, এ তিনেরই কিছু কিছু কথা কহিব; এবং শিল্প-সাহিত্যের সম্বল-স্বরূপ আরও দুই চারিটি কথা কহিয়া, পাঠকের সহিত ক্ষণকাল কাব্যালাপে কাল-যাপন করিতে যত্নপর হইব।

* "নেড়া হরিদাস।—মডেলভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-চরিত্রামৃত প্রভৃতি উপন্যাস-প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত।"

কাব্যালাপে পুণ্য আছে। পুরাতন কবি কহিয়াছেন,—

'কাব্য-শাস্ত্র-বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।'

অর্থাৎ যাঁহারা ধীমান্ অথবা অধীতী পণ্ডিত, তাঁহাদিগের কাল, কাব্যশাস্ত্রের আলাপেই, অতিবাহিত হইয়া থাকে। বহু কাল হয় বান্ধব, বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের সমালোচনা-সূত্রে, নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া, বঙ্গীয় ধীমান্‌দিগের আদরে পুষ্ট হইয়াছিল। যাঁহারা, নব্য সাহিত্যিকদিগের মধ্যে, ইদানীং ধীমান্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, বৃদ্ধ বান্ধবের সেই পুরাতন-পদ্ধতির দীর্ঘ সমালোচনা,—সেই ধান ভানা উপলক্ষে শিবের গীত—তাঁহাদিগেরও তেমনই ভাল লাগিবে কি? কাহারও-ই ভাল লাগিবে না, এমন শঙ্কা করিবার কারণ নাই। কেন না, এই পৃথিবীতে সকল প্রকার ভোজ্যেরই ভোক্তা আছে,—সকল প্রকার পাঠ্যেরই পাঠক আছে, এবং সকল প্রকার গীতেরই শ্রোতা আছে। যাঁহারা অহোরাত্র, রস-সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া, হাসিয়া খেলাইয়া দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের কাছেও রস-লেশ-শূন্য শিব-সংগীত, কোন না কোন সময়ে, ভাল না লাগে এমন নহে। কিন্তু ভাল লাগুক আর না লাগুক, আমরা কর্ত্তব্য-পালনে যত্ন করিব। আমরা এইক্ষণ, ধীমদ্-ভোগ্য ভাল কিছু সংকলন করিতে না পারিলেও, সমালোচকের পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিতে প্রয়াসপর হইব। ইহার অধিক আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া গেল। সুতরাং, ইহার পর আর, সে কোকিলের কথা উত্থাপন করিতে বিলম্ব করিয়া ফল নাই।

বসন্তের কোকিল, বিরহিণীর চির-বিদ্বি সহকার-তরুর নবোদ্গত-পল্লব-শোভিত শাখা বসিয়া, সুধা-সিক্ত কণ্ঠে কুহুরিতেছে। সকলে উহার অর্থ বোঝে। কারণ, কোকিল-কূজ একটুকু মনোমদ মধু আছে। সে মধু অথ মাধুরীটুকু মনুষ্য মাত্রেরই কানে মিষ্ট লাগে,—প্রাণে যার-পর-নাই মধুর বলিয়া অনুভূ হয়। কিন্তু যখন ঐ বিনোদ-বিলাসী কোকি লের অদূরে, কএকটা বুভুক্ষিত কাক, পাশ রের পাশে বসিয়া, কর্কশ-কণ্ঠে কা-কা-র চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, তখন কেহ তাহার অর্থ বুঝে না,—বুঝিবার জন্য ইচ্ছা করে না। কেন না, সকলেই, কানে ঝাল পালা হইয়া, প্রাণে ক্লিষ্ট হয়। সে অবস্থায় অ বুঝিবার জন্য মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইবে কেন?

এই রূপ আবার, এক দিকে ভ্রমরের গু গুণু গুঞ্জন, আর এক দিকে ভেকের বিকট বিস্বনন;—এক দিন নিদাঘ-সন্ধ্যার মৃদুবাহি সমীর, আর এক দিন প্রাকৃত-সংগ্রাম-মত্ত প্র চণ্ড ঝটিকা;—এক পাশে স্বভাব-সুন্দর, সর মধুর শ্বেত-কান্ত কপোত, আর উহার অনি দূরে, আর এক পাশে, কর্দ্দম-কলুষিত, কঠো পৃষ্ঠ কদর্য্য কমঠ;—এক স্থানে ঈষন্মুকুলি শিশির-সিক্ত, সুরভি গোলাপ, আর এ স্থানে অতি দুর্ন্নিরীক্ষ্য ধূলি-ধূসরিত দুঃসহ-দুর্গ খাক্‌রোল।* মনুষ্য ভ্রমরের গুঞ্জন, মৃ

* খাক্‌রোল একপ্রকার ফুল। মৃ হইতেই ফুলের উদ্গম হয়। উহাতে এক

মন্দ সমীরণ, কপোতের কমনীয় বিলাস, আর গোলাপের সুরভি-সৌন্দর্য্য স্বভাবতঃই ভালবাসে, এবং ভালবাসে বলিয়াই উহাদের তত্ত্ব-রহস্য ভাল করিয়া বুঝে। যাহারা অভিজ্ঞান-শকুন্তল, অথেলো, অথবা রোমিও জুলিয়েতের একটি অক্ষরও কোন দিন চক্ষে দেখে নাই, কিংবা নামও কানে শুনে নাই, তাহারাও আপনা হইতেই, এ সকল সুরম্য-সুরভি সুখ-প্রীতিকর বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন না সকলেই, আত্মার উপাদান-সামগ্রীতে, সর্ব্বাংশে কালিদাস ও শেক্ষপীরের সমকক্ষ। প্রতিভা, প্রবৃত্তি ও মনোবৃত্তির পরিমাণ-তারতম্যে, যাহা কিছু পার্থক্য থাকুক, প্রকার ও প্রকৃতিতে মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং, মহামূর্খ সৌখীন অথবা মহানগরীর মুটে মজুর, মনুষ্য মাত্রই আত্মার অন্তস্তলে—প্রাণের ফল্গু-প্রবাহে—ছোট ছোট কালিদাস ও ছোট ছোট শেক্ষপীর; এবং এক কালিদাস অথবা এক শেক্ষপীরের প্রাণে যাহা ভাল লাগিয়াছে, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও যত্নলব্ধ ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, সকল কালিদাস ও সকল শেক্ষপীরের প্রাণেই তাহা ভাল লাগিবে। কিন্তু ভেকের মকমকি ও ঝটিকার মত্ত ক্রীড়া, কমঠের কুৎসিতমূর্ত্তি, আর ঐ অস্পৃশ্য খাক্‌রোলের বীভৎস ও বমনপ্রযোজক ভয়ানক গন্ধ প্রাণের প্রিয় বস্তু নহে,—শিক্ষাবিকশিত জ্ঞানের সমালোচ্য বস্তু। সুতরাং এ গুলি সেই স্বনাম-ধন্য জ্ঞানোজ্জ্বল কালিদাস ও জ্ঞানোজ্জ্বল শেক্ষপীর—অথবা জ্ঞান-গ্রামের সন্নিহিত সুপণ্ডিত ভিন্ন সর্ব্বসাধারণের নিকট ভাল লাগে না;—এবং ভাল লাগে না বলিয়াই, কেহ এ সকল পদার্থের অর্থপরিগ্রহ করিতে চেষ্টা করে না।

তথাপি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইহাই সারসিদ্ধান্ত যে, এ সংসারে যাহা কিছু সুন্দর,—যাহা কিছু কুৎসিত,—যাহা কিছু সরস-মধুর, অথবা যাহা কিছু কটু-কষায়—যাহা কিছু মনঃপ্রিয়, অথবা যাহা কিছু বিকট-ভয়ঙ্কর, সমস্ত পদার্থেরই একমাত্র প্রয়োজন। সে প্রয়োজন উৎকর্ষের বিকাশ।—(Evolution of Goodness.)—শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত প্রভৃতিরও ঐ এক মাত্র প্রয়োজন,—উৎকর্ষের বিকাশ।—(Evolution of Goodness)

সুতরাং ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যে শিল্প উৎকর্ষ-সৃষ্টি অথবা উৎকর্ষ-পুষ্টির অনুকূল নহে, তাহা কুৎসিত শিল্প, এবং সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। এইরূপ আবার সাহিত্য ও সংগীতের কথা। যে সাহিত্য অথবা যে সংগীত, পূর্ব্বোক্ত-প্রকার উৎকর্ষ-সৃষ্টি অথবা উৎকর্ষ-পুষ্টির অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল, তাহাও কদর্য্য-সাহিত্য ও কদর্য্য শিল্প,—

মাত্র দল বা পত্র থাকে। ঐ দলের বহির্ভাগ কৃষ্ণাভ সবুজ, মধ্যদেশ জোঁকের রক্তের ন্যায় লাল। গঠন ডোঙ্গার মত। মধ্যভাগে পানসি নৌকার মাস্তলের মত, রক্ত বর্ণ একটা দণ্ড থাকে। খাক্‌রোল ফুটিলে, সে দুর্গন্ধে, দেশে কেহ আশেপাশে থাকিতে পারে না। খাক্‌রোল পিশাচের পূজাযোগ্য। আকৃতি আতঙ্কজনক।

এবং সংসারের অন্যান্য কদর্য্য বস্তুর ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য। যদি তাদৃক্ শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতে চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি ও ক্ষণিক তৃপ্তি হয়, তাহা মদিরার স্ফূর্ত্তি ও মদিরার তৃপ্তির ন্যায় প্রতারক। তাহাতে কখনও মনুষ্যের প্রতারিত হওয়া মঙ্গল্য নহে।

"ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োপ্যাসী-
দঙ্গুলীবোরগক্ষতা।"

হাত কিংবা পায়ের আঙ্গুল অবশ্যই মনুষ্যের প্রাণ-প্রিয় বস্তু। কিন্তু যে অঙ্গুলিটি বিষ-সর্পের দংশনে বিকৃত হয়, মনুষ্য সেটিরে তখনই কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের মহাভাষ্যকার, যুগ-প্রবর্ত্তক কবি, যোগ-মগ্ন টেনিসন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির আদর্শ-স্বরূপ উচ্চতম উৎকর্ষকে লক্ষ্য করিয়া, কহিয়াছেন,—

—"One far off Divine event, "
To which the whole creation moves."

অর্থাৎ—

সেই দূর-তর-ভাবী দিব্য পরিণাম,—
সমস্ত বিশ্বের গতি সতত যে দিকে।

এ কথা শুধুই কবি টেনিসনের কথা নহে। যিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, সমস্ত জগতে, সর্ব্ববাদিসম্মত বিজ্ঞান-গুরু বলিয়া পূজা পাইয়াছেন, সেই জ্ঞানবৃদ্ধ হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, আমেরিকার অদ্বিতীয় তাত্ত্বিক ও বিবর্ত্ত-বাদের তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা বিখ্যাতনামা জন ফিস্কে * এবং রক্ষিণ ও মেথিউ আরনল্ড * প্রভৃতি-সমস্ত মহামনস্বী পণ্ডিতবর্গেরই এই সিদ্ধান্ত। ইহাঁরা সকলেই জগৎ উৎকর্ষে বিশ্বাসী। সকলেই উৎকর্ষের উপাসক,—উৎকর্ষের দিকে উন্মুখ। সকলেই এক তান-কণ্ঠে কহিতেছেন যে, মাতা জগন্ময়ী-জগৎপ্রাণভূতা প্রকৃতি, হাতে কুলা লইয়া কালের সেই অচিন্তনীয় ও অনারম্ভ আদি হইতে, এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত কোটি বস্তু নিরন্তর ঝারিয়া, ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিতেছেন; এবং যাহা উৎকর্ষের অনুকূল তাহাইমাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই বিলয়ের মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দিতেছেন। †

এখানে তবে এই এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, উৎকর্ষই যদি সৃষ্টির চরম লক্ষ্য, তাহা হইলে বিকট-বীভৎস অথবা নিকৃষ্ট সৃষ্টির প্রয়োজন কি? সে প্রয়োজনও ঐ উৎকর্ষেরই অনুভূতি। পৃথিবীতে কাক ও ভেকের শব্দ না থাকিলে, মনুষ্য কখনও কোকিল-কণ্ঠের কল-মাধুরী অনুভব করিতে পারিত না। পৃথিবীতে যদি খাক্‌রোল ফুল, অথবা ফুলে ফুলে ভাল মন্দ পার্থক্য না থাকিত, তাহা হইলে কেহই সিরাজি গোলাপের সুরভি শোভা ও সুখদ সুকুমারতা অনুভব করিবার জন্য লালায়িত রহিত না।

সাহিত্য এ অংশে সর্ব্বতোভাবেই প্রকৃতির অনুকারী। সাহিত্যিকেরা বুঝুন আর না

* "Through Nature To God,—by John Fiske.

* "The One Eternal Power which makes for righteousness."

† The Theory of Natural Selection and Survival of the Fittest.

বুঝুন, সাহিত্য, উহার প্রথম-বিকাশের সময় হইতেই, একমাত্র উৎকর্ষ-সৃষ্টির অনুকূল কার্য্য করিয়া, ধীরে ধীরে পুষ্ট হইতেছে;—এবং কবিকল্পিত বিশ্বকর্ম্মা যেমন, তিল তিল করিয়া রূপ-সংকলনের দ্বারা, তিলোত্তমার মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, সাহিত্যও সেইরূপ, তিল তিল করিয়া, সৌন্দর্য্য, সৌরভ ও সুরস-সংকলনের দ্বারা, উৎকর্ষের প্রতিমা গড়িতেছে। এই জন্যই কবিতা, সুনিপুণ গুণিজনের কর-ধৃত বীণার ন্যায়, কখনও মৃদু মৃদু হাসে, কখনও মৃদু মৃদু কাঁদে,—কখনও শত-বজ্র-নির্ঘোষের মত কড় কড় গড়-গড় শব্দ করে,—কখনও কাল-সাপিনীর মত ভয়ঙ্কর গর্জ্জিয়া উঠে। এই নিমিত্তই সাহিত্যের তুলি, কখনও নয়ন-জলে সিক্ত হইয়া, নয়নাভিরাম রাম-সীতার মূর্ত্তি চিত্র করে, কখনও পক্ষস্পর্শে আর্দ্র হইয়া, রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির কদর্য্য মূর্ত্তি আঁকিয়া তুলে।

নেড়া হরিদাস, রাবণ কুম্ভকর্ণের ন্যায়, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নহে; কিন্তু যার-পর-নাই কদর্য্য মূর্ত্তি। বোধ-হয়, রাবণের মামা কালনেমিও অমন কদর্য্য নহে। উহার উপাকলনে ছাগের অংশ, মহিষের অংশ, দাঁড়কাক ও দিগম্বর মর্কটের অংশ, ধূর্ত্ত শৃগাল ও ধর্ম্মধ্বজী বকের অংশ, গর্দ্দভ ও গণ্ডার, কালকূটপূর্ণ কেউটে সাপ, ও কঠোরকণ্ঠ ভেক, রস-চঞ্চল চড়ুই ও রৌদ্র-চণ্ড চীল, পিণ্ডালস পর্ণ-মৃগ (The sloth) ও পূতিগন্ধি জলমার্জ্জার (The skunk)—এ সকলেরই কিছু কিছু অংশ আছে;—আর যিনি এই বীভৎস-ভয়ঙ্কর পৈশাচিক চিত্র আঁকিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার প্রমোদ-বিলাসিনী কল্পনারও, বোধ হয়, কিছু প্রক্ষেপ আছে। চিত্রকর, কদর্য্য চিত্রণের কঠোরক্লেশ ভোগ করিয়া থাকিলেও, সাহিত্য ও সমাজের উপকার করিয়াছেন। কারণ, চিত্রের উদ্দেশ্য, নীচ-নিকৃষ্ট ও মন্দের প্রতি মনুষ্যের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সমুৎপাদন,—এবং সুতরাং,—অথবা প্রকারতঃ—নির্ম্মল উৎকর্ষের দিকে চিত্ত ও চক্ষুর আকর্ষণ। তাঁহার এই মহান্ উদ্দেশ্য, সর্ব্বাংশে না হইলেও, সমধিক-পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।

এই পুস্তক পাঠ-সময়ে, ভল্‌টেয়ারের এক খানি পুস্তকের কথা আমাদের মনে পড়িল। আমরা এখানে ভল্‌টেয়ারের সহিত কাহারও তুলনা করিতেছি না। ভল্‌টেয়ারের এক-খানি পুস্তকের কথা কহিতেছি। ক্ষেত্র-গুণে শস্য-সম্পদ,—কর্ম্ম-গুণে কৃষাণ। ভল্‌টেয়ারের কর্ম্ম ও ক্রীড়াক্ষেত্র, সেই লোক-ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রাক্কালীন, লেলিহান-ফ্রান্স, অথবা প্রধূমিত-বারুদ-গৃহ। আর আমাদিগের জন্ম কর্ম্ম, যৌবন বার্দ্ধক্য, জরা মৃত্যু, জীবনী ও স্মৃতির সমাধিস্থান এই রঙ্গ-লীলাময়ী বঙ্গভূমি। বঙ্গদেশে জয়দেব ফুটিতে পারে,—রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও জগদীশ তর্কালঙ্কার ফুটিতে পারে,—রত্নাবলী নাটকের নায়ক নায়িকা ও রচয়িতা ফুটিতে পারে। কিন্তু, কোন্ দিনও ভল্‌টেয়ার ফোটে নাই, ভল্‌টেয়ার ফুটিবেও না। আমরা তাই, ভল্‌টেয়ারের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা না বলিয়া, তাঁহার এক খানি পুস্তকের কথা মাত্র কহি-

তেছি। ভল্‌টেয়ার, তাঁহার প্রথম বয়সে, কিছু কাল প্রচ্ছন্নবেশে, ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে, ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে, পিউরিটানদিগের বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনি সময়ে সময়ে, পিউরিটান-দিগের গৃজায় যাইয়া, তাহাদিগের ধ্যান, ধারণা, উপাসনা ও প্রচার-পদ্ধতি পর্য্য-বেক্ষণ করিতেন; এবং যাহা কিছু দেখিয়া ও শুনিয়া আসিতেন, বাড়ীতে আসিয়া, তাহাই দৈনিকের ধরণে লিখিয়া রাখিতেন। ভল্‌-টেয়ারের সে দৈনিক বিবৃতি পাঠ-সময়ে হাস্য সংবরণ করা পাষাণ-কঠিন পণ্ডিত-জনেরও অসাধ্য। নেড়া হরিদাসের চরিত্র-বিবৃতিতেও তেমন চিত্র অনেক আছে। কিন্তু, সে সকল চিত্র এক দিকে যেমন হাস্যের উদ্দীপক, আর এক দিকে তেমনই ভয়, ভাবনা, ক্রোধ ও ঘৃণার উত্তেজক। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে।

এই উপন্যাস-কাব্যের নায়ক অথবা মুখ্যপাত্র নেড়া হরিদাস। নেড়া হরিদাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই;—

"নেড়া হরিদাস, দূরদেশস্থ কোন জমী-দারের নায়েব ছিলেন। আজ পনর বৎসর হইল, তাঁহার নামে তহবিল তছরুপাতের এক অভিযোগ হয়। বিচারে তাঁহার নয় মাস কারাদণ্ড হয়। হরিদাস কারামুক্তি লাভ করিয়া বলেন জমীদার এবং মাজিষ্টর দুই জনে ষড়যন্ত্র করিয়া, আমাকে জেলখানায় পাঠাইয়াছিলেন; ফলতঃ আমি নির্দ্দোষ। প্রায় ১৪ বৎসর তিনি স্বগ্রামে বাস করি-তেছেন,—এবং গ্রামে আসিয়া অবধি তিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন। মহোৎসব, নামসঙ্কীর্ত্তন, অষ্টপ্রহরী,—গ্রামের দশক্রোশ মধ্যে হইলে, হরিদাস তাহার অগ্রণী হইতেন। হরিদাসের নৃত্য এবং গানে লোক সকল মোহিত হইত। বিশেষতঃ—তাঁহার সেই অঙ্গভঙ্গিময় নর্ত্তনে মহিলাকুলের মন কাড়িয়া লইত। হরিদাস নিজ বৈঠকখানার পার্শ্বে চাঁদা করিয়া, এক হরিমন্দির করেন। তাঁহার হরিসভায় গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভক্তবৃন্দকে মাসিক চাঁদা দিতে হইত।"

নেড়া হরিদাসের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে, তাহার আকৃতির প্রতিও পাঠকের একবার দৃষ্টি পাত করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের প্রথম পরি-চ্ছেদেই সেই আকৃতির পরিচয় আছে। যথা,—

"ঐ যে,—গলায় তুলসীর মালা, নাকে তিলক, মাথায় টীকি, ঐ যে লোকটী দেখি-তেছেন,—উনি নেড়া হরিদাস। বয়স ৫৩ বৎসর;—মাথার চুল চৌদ্দ আনা উঠিয়া গিয়াছে। নিন্দকগণ, তাই তাঁহাকে নেড়া হরিদাস বলে। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে কেহ ঐ নামে তাঁহাকে ডাকিত না;—বলিত "দে মহাশয়।"

"নেড়া হরিদাসের আকৃতি খর্ব্ব, রঙ্গ মেটে-মেটে, গোঁফ কামানো। তাঁহার মুখে সদাই "রাধা কৃষ্ণ—গৌর গৌর" ধ্বনি, —হাতে এক বৃহৎ হরিনামের ঝুলি। সেই ঝুলি অনেক সময় বুকে ঝুলিত। সেই বক্ষঃস্থিত ঝুলির ভিতর তর্জ্জনী ব্যতিরিক্ত

অঙ্গুলি-কয়টি সন্নিবেশিত করিয়া, তিনি অনেক সময় সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত পাশা খেলার চাল বলিয়া দিতেন। তিনি নিজে পাশা খেলিতেন না—বলিতেন, —পাশা কর্ম্মনাশা,—ঐ খেলায় কুরুবংশ ধ্বংস হয়,—এবং উহা তামসিক খেলা।

"নেড়া হরিদাস প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিতেন। গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন করি-বার সময়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে "রাধাকৃষ্ণ" এবং "গৌর গৌর" এইরূপ ছাবকাটা থাকিত। এই সময় তিনি সুর করিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গালা কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কতকগুলি প্রতিবেশি-মহিলা সে সময় তাঁহাকে দেখিত, আর বলিত—ইনি সাধু পুরুষ। এমন লোকটি এ কালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।"

একটি সরল-হৃদয়, সাধু-চরিত্র, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ, তাঁহার শেষ জীবনের সংস্থানের জন্য, অশেষ ক্লেশে, প্রায় দুই হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়া-ছিলেন। ঐ দুই হাজার টাকাই তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব, অথবা জীবনের সম্বল। কিন্তু তিনি হরিদাসের কোনরূপ অভাবনীয় কূট-কৌশলে আবদ্ধ হইয়া, ঐ টাকা তাহার কাছে 'অতি' গোপনে গচ্ছিত রাখিয়া সস্ত্রীক কাশী-বাসী হইয়াছিলেন। কথা ছিল, হরিদাস মাসে মাসে কাশীতে কিছু কিছু পাঠাইবেন, ব্রাহ্মণ তদ্দ্বারা তাঁহার জীবন যাপন করিবেন।

ব্রাহ্মণ হরিদাসের সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া, কাশীতে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, এবং সেখানে অতি কষ্টে সুষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, হরিদাস দেব-তুল্য সাধু সজ্জন; সুতরাং টাকার কোন ভয় নাই। কিন্তু, এক মাস, দুই মাস করিয়া, ক্রমে তিন চারিটি মাস অতিবাহিত হইয়া গেল;—না আইসে টাকা, না আইসে হরিদাসের পত্র। ব্রাহ্মণ, এক দুই করিয়া, অনেকখানি পত্র লিখিলেন, একখানি পত্রেরও উত্তর নাই। ব্রাহ্মণ, ইহার পর, হরিদাসের কাছে, রেজেষ্টরী করিয়া পত্র লিখিলেন। রেজেষ্টরীর রসিদ পাইলেন; কিন্তু হরিদাসের নিকট হইতে সে রেজেষ্টরী পত্রে-রও কোন উত্তর পাইলেন না।

বাড়ীওয়ালা, ব্রাহ্মণকে বাড়ী হইতে তাড়া-ইয়া দিল। ব্রাহ্মণ কিছুকাল, তাঁহার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে লইয়া, কাশীর ভিন্ন ভিন্ন সত্রে, ভিক্ষার আশ্রয়ে দিনপাত করিলেন; তার পর, একটি মহাজনী নৌকায় পনর টাকার চুক্তি করিয়া, ব্রাহ্মণীকে লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী নৌকায় রহি-লেন, ব্রাহ্মণ ঐ পনরটি টাকার জন্য,—বেশী নহে—শুধু ঐ পনরটি টাকার প্রার্থনায়—অতি দীন-হীন-কাঙ্গালের প্রাণে, হরিদাসের কাছে যাইয়া, ভিক্ষার্থীর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু, তিনি হরিদাসের কাছে যাইয়া, চক্ষে যাহা দেখিলেন, আর কানে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তিনি দু হাজার টাকা গচ্ছিত রাখিয়া ছিলেন, এই-ক্ষণ ভিক্ষা চাহিতেছেন—পনরটি টাকা। —"কাঁপিতে কাঁপিতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিলেন,—"দে মহাশয়! আমি

৺ কাশীধাম হইতে আসিয়াছি,—আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি;—আমার স্ত্রী নৌকায় বসিয়া আছেন;—আমার সেই গচ্ছিত টাকা হইতে পনের টাকা এখন দিন,"—

"সাধু হরিদাস ঢুলু-ঢুলু নেত্রে সতেজে ব্রাহ্মণের প্রতি চাহিয়া, একটু মিঠে-কড়া বাজখাঁই সুরে, যেন অতীব বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—'টাকা কি?"—

"ব্রাহ্মণের দেহ কদলী-পত্রের ন্যায় দুলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ আবার বলিলেন,—'সেই গচ্ছিত টাকা! সেই যে,—দুই তোড়া টাকা,'—

"হরিদাস। টাকা?—টাকা?—সে কি কথা? আমার নিকট টাকা?—কি? এ ব্রাহ্মণ পাগল নাকি? হরি হে! তোমার শ্রীচরণে আমার মতি রেখো হে!"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক্! তিনি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন এবং ক্ষণপরেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নেড়া হরিদাস যখন বুঝিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা-হীন হইয়াছেন, তখন তিনি—"ভক্ত-বৃন্দকে, বলিয়া উঠিলেন,—'চাহিয়া দেখিতেছ কি? শীঘ্র খোল-করতাল আনিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ কর। ব্রাহ্মণকে বেষ্টন করিয়া,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া—নাচিয়া নাচিয়া কেবল সেই দয়াল প্রভু শ্রীহরির নাম গান কর।' আদেশ-মাত্র খোল-করতাল, গায়কদল এবং নর্ত্তকদল আসিয়া পৌঁছিল;—গান আরম্ভ হইল। স্বয়ং হরিদাসও আজ গাইতে ও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তথাচ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সচেতন হইলেন না।"

হরিদাসের দলে অসংখ্য ভক্ত এবং সেই ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই—সাধু ভাষায়—মল্লবীর, সাধারণ ভাষায়—ষণ্ড-গুণ্ডা অথবা শঙ্কাজনক ডনগীর। তাহারাই গায়ক, তাহা-রাই বাদক এবং তাহারাই দলে দলে নর্ত্তক। যখন এই অসংখ্য অসুর-মূর্ত্তি গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া, তাহাদিগের সেই তথাভূত কীর্ত্তনের আনন্দে উন্মত্ত তখন "একজন দর্শক বলি-লেন। দেখিতেছেন না!—ব্রাহ্মণ মৃতপ্রায় হইয়াছেন! উহাঁর চোকে মুখে ও মাথায় একটু জল দিন এবং বাতাস করুন।"

এ দর্শকটি কে? গ্রন্থে তাহার পরিচয় নাই। বোধ হয় তিনি বিদেশী। বিদেশী না হইলে, হরিদাসের কাণ্ড কারখানা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না কেন? বোধ হয়, তিনি আর কখনও এইরূপ ভক্তের নৃত্য ও ও ভক্তির উৎসব (!!!) চক্ষে দেখেন নাই! তাঁহার এতটুকু পরিচয় থাকিলে, বোধ হয়, পাঠকের একটু বেশী ভাল লাগিত। যাহা হউক, সেই দর্শক যখন, সেই হতভাগ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দুঃখে প্রাণে অতিগভীর বেদনা অনুভব করিয়া, একটুকু জল দিন বলিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, তখন—"হরিদাস হাসিয়া বলিলেন—হরি নামের কাছে কি জল? হরিনাম,—সুধারস। হরিনামামৃত-পানে মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইয়া থাকে; ব্রাহ্মণ ত অর্দ্ধমৃত!"

এই অনাহূত দর্শক, বোধ হয় অতি সাদা-সিধা, শান্ত-শিষ্ট ভাল মানুষ গোছের লোক

ছিলেন। 'বোধ হয়,' তিনি তাঁহার দুঃখিনী মায়ের অতি দুঃখ-কষ্টে পালিত যার-পর নাই দরিদ্র পুত্র। 'বোধ হয়,' তিনি সে দিন যখন, তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়, মৃত্তিকায় পদক্ষেপ করেন, তখন তাঁহার বহি-র্যাত্রায় বিশেষ কোনরূপ বাঁধা পড়িয়াছিল। কেন না সে আনন্দময় ভক্তসভায় (?!!) কতকটি 'ভীমাকৃতি,' ভাব-বিভোর ভক্তের আনন্দময় আলিঙ্গনে, সে দিন তাঁহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, মানুষের অদৃষ্টে, এ মহী-মণ্ডলে, সর্ব্বদা তাহা ঘটে না। আমরা সে মুখর মতিভ্রান্ত দুর্ভাগ্য-দর্শকের তদানীন্তন অবস্থার সমস্ত চিত্রটুকুই এখানে তুলিয়া দিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা পারিলাম না। পাঠক মূলগ্রন্থে তাহা পাঠ করিবেন। নহিলে, তিনি হরিদাসকে সম্যক্ চিনিতে পারিবেন না। আর চিত্রকরের বর্ণন-ক্ষমতা অনুভব করিতেও সমর্থ হইবেন না। সে বর্ণনা পাঠ সময়ে পাঠক হাসিবেন, না কাঁদিবেন—না হাতে চাবুক লইয়া, আরক্ত চক্ষে গর্জ্জিয়া উঠিবেন, তাহা আমরা এইক্ষণ বলিতে পারি না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থের মুখ্য পাত্র হরিদাস। গ্রন্থে আর একটি মুখ্য পাত্রী আছেন, তাঁহার নাম বৃন্দা। কিন্তু বৃন্দার সহিত হরিদাসের সম্পর্ক অহি-নকুল-সৌহার্দ্দ অথবা ভেক-ভুজঙ্গ-প্রেম। বৃন্দা বিষয়-সম্পত্তি-শালিনী, প্রখর-বুদ্ধিমতী, রূপসী বিধবা;—বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহবা-সিনী 'বৈষ্ণবী,'—ইদানীং বিরহিণী। এই বৃন্দাই, নেড়া হরিদাসকে পাকে ফেলাইয়া, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গচ্ছিত টাকা উদ্ধার করিয়া দিয়াছিল। একদিন হরিদাস, বৃন্দার বহির্ব্বাটীতে সদলে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইতেছে; আর, "উর্ব্বশী যেমন, অপূর্ব্ব রূপরাশি লইয়া, অর্জ্জুনকে ছলিতে চলিয়া ছিলেন," বৃন্দাও সেইরূপ, ফুলের সাজে ফুল-রাণী সাজিয়া, নেড়া হরি-দাসকে ছলিবার জন্য, ধীরে ধীরে চলি-তেছে। গ্রন্থকার বৃন্দার রূপ-বর্ণনায় পাঠ-ককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"আজ এখন বৃন্দার বয়স কত বলুন দেখি? তাঁহার ৪২ বৎসর বয়স শুনিয়া, তখন ত রাগ করিয়াছিলেন! যদি চক্ষু থাকে, আজ একবার বৃন্দাকে ভাল করিয়া দেখুন। ঐ দেখুন,—গোলাপের আভাযুক্ত বৃন্দার গণ্ডস্থলদ্বয় সেই উজ্জ্বল দীপালোকে কেমন ঝক্-ঝক্ করিতেছে! তাঁহার সেই পদ্ম-পলাশবৎ নয়ন দুইটি আজ যেন অনুরাগ-ভরে কেমন আকর্ণ বিস্তৃত হইয়াছে! আর ঐ দেখুন,— * * * * * *

আর তাঁহার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চামর-বিনিন্দিত কাদম্বিনীতুল্য আলু-লায়িত (?) কেশ কলাপে,—গোলাপ-বক-চম্পক,—যাঁতি-যূথি-মল্লিকা-মালতী প্রভৃতি ফুলমালার শোভন-সম্মিলন,—শ্রীমতী বৃন্দাকে ফুল-দল-বাসিনী ফুলরাণী করিয়া তুলিয়াছে!"

বৃন্দায় আর নেড়া হরিদাসে কত কি হইল,—সেই নয়নহারিণী ও সরস-বিরহিণী

বৃন্দা, কিরূপ অপূর্ব্ব কৌশলে, অথবা অসামান্য মেয়েলি ছলে, নেড়াকে বাঘের বাগুরায় বদ্ধ করিয়া, ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিল—পরিভুক্ত ব্রহ্মরক্ত ও ব্রহ্মমাংস নেড়া হরিদাসের দ্বারাই পুনরুদ্গিরণ করাইল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে, পাঠক একটুকু শ্রম স্বীকার করিবেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাঁহার এই গ্রন্থ-পাঠ-শ্রম নিষ্ফল হইবে না। ঐ উদ্গিরণ-প্রক্রিয়ার পর-পর ঘটনায় প্রকৃতই প্রশংসা-যোগ্য চিত্র-চাতুরী প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্রের শেষ অংশটুকু, অর্থাৎ নাটকের সেই ডিনূমঙ্—(denouement)—সেই রহস্য-প্রকাশ অথবা নাট্যসমাপ্তির অংশটুকু আমাদিগের তেমন ভাল লাগে নাই। সেখানে, আমাদিগের বিবেচনায়, হাস্য ও বীভৎসের পরিবর্ত্তে, ভক্তি ও করুণ-রসের স্ফূর্ত্তি হইলেই ভাল হইত।

আমরা যে এ কথা বলিতেছি, ইহার বিশেষ কারণ আছে। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, এই গ্রন্থের অন্তর্গূঢ়,অস্ফুট উদ্দেশ্য উৎকর্ষের সৃষ্টি,—অথবা অপকর্ষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের উৎপাদন দ্বারা, উৎকর্ষের মাহাত্ম্য-বিকাশ। এ পথ বড় দুরারোহ,—এ কার্য্য বড় দুষ্কর। গ্রন্থকার, সে দুরারোহ পথে, অনেক দূর উপরে উঠিয়াছেন; কিন্তু গম্য স্থানে পঁহুচিতে পারেন নাই;—সেই দুষ্কর কার্য্যে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; কিন্তু বোধ হয়, সম্যক্ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। মনুষ্যের আত্মা, স্নেহ-প্রীতি, দয়া-দাক্ষিণ্য, এবং মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য প্রভৃতি অশেষ-বিধ সুরূপ ও সুরভি ভাব-কুসুমে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত ভাবের মধ্যে ভক্তিই, বৈভবে ও প্রভাবে, সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রীতি, স্নেহ ও দয়া প্রভৃতি মনোবৃত্তি, অথবা মানস-ভাব, মাটির মানুষকে, মাটিতে রাখিয়াই, সৌষ্ঠবে ফুটায় ও সৌরভে প্রফুল্ল করিয়া তুলে। কিন্তু অনন্তোন্মুখী ভক্তি, ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হৃদয়, মন ও প্রাণকে ঐ অনন্ত আকাশের অচিন্তনীয় পর পারে—অনন্তলীলাময় অনন্ত-দেবের শ্রীপাদ-পদ্ম-সান্নিধ্যে লইয়া যায়। মানুষের, এমন ধন আর কি হইতে পারে? মনুষ্য এমন সম্পদ আর এমন শক্তি, আর কোন্ ভাবে অথবা কোন্ বৃত্তির আশ্রয়ে, লাভ করিয়া থাকে? গ্রন্থকার,ভাক্তের তন্ত্ত-প্রদর্শন কামনায়, সেই ভক্তির বিবিধ চিত্রের উপর ভয়ঙ্কর আঘাত করিয়াছেন। তিনি আঘাতে পটু। তিনি সবলে আঘাত করিয়া সৌন্দর্য্যের অনেক বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিয়াছেন;—ভক্তির মাথায় আঘাত করিতে যাইয়া, ভক্তির নিত্যসঙ্গিনী নম্রতা, সরলতা ও দীনতার মূর্ত্তির উপরও আঘাত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু, তিনি যে পরিমাণ ভাঙ্গিয়াছেন, সেই পরিমাণ গড়িয়াছেন কি? যে পরিমাণ নষ্ট করিয়াছেন, সেই পরিমাণ উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন কি? ইহা তাঁহার চিত্তহারিণী চিত্রনিপুণতার উপযুক্ত পরিণতি নহে। তাঁহার নাট্যসমাপ্তির সময়ে, এক মাত্র বৃন্দাই বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত ভক্তির পথ লইয়াছে। বৃন্দা, তাহার

বিচিত্র জীবনের অবসান সময়ে, অনুতাপের আগুনে ভস্মীভূত হইয়া, পূত-চরিত্র পুর-মহিলাদিগের পবিত্র দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার উদ্দেশ্যে, যে সকল কথা কহিয়াছে, তাহা হৃদয়িক কবির লেখনী-যোগ্য। হৃদয়ের কথা হৃদয়ে যাইয়া পঁহুচে—এবং হৃদয়তন্ত্রীর তারে তারে, অতি গভীর ঝঙ্কারে, ঝনৎকৃত হয়। কিন্তু সেই শত-সোহাগের সোহাগিনী, রস-বিলাসিনী বৃন্দা, কি রূপে অথবা কি মন্ত্রে, ত্রিরাত্রের মধ্যে, মীরাবাইর মত মহা-যোগিনী হইল, তাহা উপযুক্ত পরিস্ফুটতার সহিত দেখান হয় নাই। বট আর অশ্বত্থ এক দিনে বিকশিত হয় না। কারণ, ভগবানের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীন। যে মনুষ্য, প্রৌঢ় যৌবনে অথবা পরিণত বয়সে, মীরাবাইর পবিত্র মূর্ত্তিতে পরিণামিত হয়, তাহার প্রথম জীবনেও একটু অনন্যসাধারণ উচ্চভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের বোধ হয়, বিলাসিনী বৃন্দারাণীর পট-প্রদর্শন-সময়ে, প্রথম হইতেই, সেইরূপ দুই চারিটি ভাল ভাব স্ফুটবর্ণে চিত্র করিয়া দেখাইলে, আগা-গোড়া ভাল মিলিত।

আর নেড়া হরিদাস? তাহার প্রতি গ্রন্থকারের তাদৃক্ দয়া হইল না কেন? বৃন্দার মনে যেরূপ অকস্মাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব বৈরাগ্য ও ভক্তির উদ্রেক হইল, হতভাগ্য হরিদাসের মনেও তাদৃক্ একটু পরিবর্ত্ত হইলে দোষ ছিল কি? যে অতি মন্দ, অতি নিকৃষ্ট, ভগবানের এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের বিচিত্র-নিয়ম-কৌশলে, তাহাকেও এক সময়ে, অতি বড় ভাল হইতে হইবে। যে আজি অসুর অথবা পিশাচ, বিশ্ব-বিধাতার বিধান-লীলায়, তাহাকেও এক সময়, অমল-কান্তি-ময় দেবতা হইতে হইবে। কেন না, বিশ্বের গতি ও পরিণতি উৎকর্ষের দিকে। পাঠক, ভণ্ড ও ভাক্ত হরিদাসের বীভৎস চরিত্রে ভক্তির বিড়ম্বিত চিত্র দেখিয়া, প্রাণে অবশ্যই অতিনিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন। যদি পাঠক, গ্রন্থের পরিসমাপ্তির কালে, সেই হরিদাসেরই নয়ন-জলে, ভক্তির আর এক প্রকার মূর্ত্তি চিত্রিত দেখিতেন, তাহা হইলে, সাহিত্য ও সমাজের অধিকতর উপকার হইত না কি?

কবি-সমুচিত-ন্যায়পরতা কাব্য ও উপন্যাসের এক প্রধান ধর্ম্ম। গ্রন্থকার, সে ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষা-বিষয়েও, এক বৃহৎ ত্রুটি করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থে, বৃন্দার সর্ব্বাধ্যক্ষ দেওয়ানজী মহাশয় অন্যতম প্রধান পাত্র। ফলতঃ, বৃন্দা আর হরিদাসের পরই দেওয়ানজী। দেওয়ানজীর দুর্ব্বার লালসার দোষে, দুঃখিনী বৃন্দা দেশ-ত্যাগিনী ও যোগিনী হইতে বাধ্য হইল; অথচ দেওয়ানজীর অদৃষ্ট-পট,আগা গোড়া সকল সময়েই,সুখ-সৌভাগ্য সম্পদ ও সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্বের বিবিধ সুরম্য ছবিতে চিত্রিত রহিল। ইহা বিশ্ব-নাটক-রচয়িতা বিধাতা অথবা বিশ্ব-কবির পরিজ্ঞাত-নিয়মসূত্রের অভিপ্রেত নহে। সুতরাং, যাঁহারা সেই বিধাতারই অনুকরণে, কবির তুলি হাতে লইয়া, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার অথবা কর্ম্ম

ফলের দণ্ডপুরস্কাররূপ বিচার ভার গ্রহণ করেন, উল্লিখিতরূপ অবিচার তাঁহাদিগের প্রীতিকর হওয়া উচিত নহে। দেওয়ানজী এই উপন্যাস-নাট্যে নট-বীর-রূপে এত কাজ করিলেন, অথচ এক বৃন্দা ছাড়া আর কেহই তাঁহাকে চক্ষে দেখিল না। আমাদিগের বোধ হয়, একদিকে বৃন্দার দেওয়ান, আর একদিকে নেড়া হরিদাসের দেওয়ান স্বরূপ প্রধান পারিষদ এই দুইকে একটু বেশী ফুটাইয়া চিত্রিত করিলে, রসের অধিকতর পুষ্টি হইত; এবং পাঠকের চক্ষু, শুধুই বৃন্দা ও নেড়া হরিদাসের ছবির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ক্লিষ্ট না হইয়া, আরও বহু দৃশ্য দেখিতে পাইত।

কিন্তু এ সকল ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও, গ্রন্থখানি, মোটের উপরে, অতি উপাদেয় বস্তু হইয়াছে; —এবং গ্রন্থকার উত্তরোত্তর আরও বিবিধ পট-প্রদর্শনের দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও ও সমাজের উপকার করিবেন, আমাদিগের মনে এইরূপ আশা জন্মিতেছে। তিনি শব্দ-সম্পদে সমৃদ্ধ ও আভিজাত। তিনি যখন যে বিষয়ে বর্ণনা করেন, অথবা যে রস ফলাইতে চাহেন, তখন সেই বিষয় অথবা সেই রসের উপযোগী সরস-সুন্দর অথবা কটু-কদর্য্য শব্দ সকল, তাঁহার লেখনীর মুখে, আপনা হইতে গড়াইয়া পড়ে। তাঁহার গোলাপী আদিরস রস-মধুর বিলাস-কাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা তাঁহার হস্তে ভক্তি, প্রীতি, কারুণ্য অথবা মহত্ত্বের একখানি মনোমোহন ছবি চিত্রিত দর্শন করিলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের নাম লইয়া, বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিব। যাঁহার শক্তি আছে—সম্পদ্ আছে, তিনি, সাহিত্য ও সমাজ উভয়ের নিকটেই সর্ব্বতোভাবে ঋণী।

ছায়া-দর্শন।

ছায়া দর্শনের দুটি কাহিনী পাঠককে উপহার দিয়াছি। দুইটিই বিস্ময়কর অথচ যার-পর-নাই প্রামাণিক। উল্লিখিত দুই কাহিনীর একটি, ইংলণ্ডের অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, লর্ড ব্রুহামের আত্মজীবনের কথা। ঐ ছায়ামূর্ত্তি, তিনি, স্বয়ং, সদ্‌জ্ঞানে, সুস্থ ও সুস্থির মনে, দিবসের প্রখর আলোকে, প্রত্যক্ষ করেন; এবং প্রত্যক্ষ মাত্র বিস্মিত, ও ক্ষণ-কালের তরে, বিমূঢ় হইয়া পড়েন। অবশেষে প্রকৃতিস্থ হইয়া, আপনার দৈনিক জীবনীতে, উহা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। তদীয় পরলোক-প্রাপ্তির পরে, তাঁহার বিধবা পত্নী, লেডী ব্রুহামও ইংলণ্ডের মান্য গণ্য ও বিজ্ঞলোকদিগের মধ্যে, ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে

সাক্ষ্য দান করিয়া, উহার সম্যক্ সমর্থন করিয়া যান। লেডী ব্রুহাম ত কিছুই চক্ষে দেখেন নাই। এমন অবস্থায়, তাঁহার সাক্ষ্যের মূল্য কি?—মূল্য এই যে, তিনি লর্ড ব্রুহামের জীবনসঙ্গিনী,—সুশিক্ষিতা রমণী। ব্রুহামের জীবনের এই বিস্ময়জনক ঘটনা লইয়া, সময়ে সময়েই, তাঁহার সহিত আলাপ ও আলোচনা হইত; এবং তিনি উহার সমস্ত কথা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতেন।

দ্বিতীয় কাহিনী অষ্ট্রেলিয়া-নিবাসী জন্‌সন্ নামক জনৈক বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের জীবনের এক পরিচ্ছেদ। উহা, কঠোর পরীক্ষার পর, পরীক্ষিত-প্রমাণের সহিত, আদালতের নথিভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞ বিচারক, বিচারসময়ে, জন্‌সন কর্ত্তৃক বর্ণিত বিচিত্র বিবরণে লক্ষ্য রাখিয়া, যেরূপ অভিনব উপায়ে প্রকৃত সত্য উদ্ধার এবং অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে।

কিন্তু ছায়া-দর্শনের যে কাহিনী পাঠকের নিকট এইক্ষণ উপহৃত হইতেছে, তাহা পূর্ব্ব কথিত উভয় ঘটনা অপেক্ষাই, অনেক বিষয়ে, অধিকতর বিস্ময়াবহ ও রোমহর্ষণ।

ঘটনা ইংলণ্ডের। পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড ও কমন্‌স্, উভয় সভার কতিপয় সম্ভ্রান্ত সভ্য উহার সহিত বিশেষরূপে সম্পৃক্ত। ঘটনার পরে, ঐ কথা লইয়া, পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে, নানাসূত্রে, নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্টের কোন সভ্য উহাতে এই পরিমাণ বিকল ও বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত, কিবা শয়নে, কিবা ভোজনে, কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি অথবা শান্তি বোধ করিতেন না। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং উচ্চশ্রেণীর বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ঐ প্রসঙ্গে বিবিধ জল্পনা, কল্পনা ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাময়িক-পত্র-সমূহেও উহার নানারূপ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছিল। সে সকল বিবরণীতে, আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথায়, সামান্য কিছু পার্থক্য থাকিলেও, মূল-কথা-প্রসঙ্গে সমস্ত কাহিনীই এক।

লিটেলটন বংশীয় লর্ডগণ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ও পুরাতন ভূম্যধিকারী। লিটেলটন এই নামটি এ দেশেও অপরিচিত নহে। লিটেলটন বংশীয় বর্ত্তমান লর্ড, ইংলণ্ডের স্বর্গগত মন্ত্রী মহামনা গ্লাডষ্টোনের আত্মীয়। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড এই উভয় স্থানেই লিটেলটনের বিস্তৃত ভূম্যধিকার আছে। লিটেলটন বংশীয় যে লর্ড, বর্ণনীয় কাহিনীর মুখ্যপাত্র, তাঁহার নাম টমাস। তিনি সাধারণের নিকট লর্ড টমাস লিটেলটন নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম লর্ড জর্জ্জ লিটেলটন। লর্ড জর্জ্জ লিটেলটনের মৃত্যুর পরে, টমাস লিটেলটন লর্ড উপাধি ও বিশাল ভূম্যধিকারের আধিপত্য লাভ করিয়া, স্বদেশে ও বিদেশে, সমৃদ্ধদিগের মধ্যে, উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের নানাস্থানে, লর্ড লিটেলটনের বহুসংখ্যক প্রাসাদ ছিল। এ-

স্থানে সেই সমস্ত প্রাসাদমালার নাম করা অনাবশ্যক। কিন্তু যে কএকটি প্রাসাদ অথবা বিলাসভবনের সহিত বর্ণনীয় ঘটনার বিশেষ সম্পর্ক, সেগুলির একটুকু পরিচয় দেওয়া অসঙ্গত নহে।

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব-দিকে, পনর মাইল দূরে, এপ্‌সম নামে একটি গ্রাম্য নগর আছে। ঐ নগরে লিটেলটনের এক প্রাসাদ ছিল। উহার নাম পিট্‌প্লেস। এই প্রাসাদ এবং বার্ক্‌লি-স্কোয়ার-স্থিত হিলষ্ট্রীটের বিলাসভবনই টমাস লিটেলটনের প্রিয় নিকেতন ছিল। তিনি, এই দুই স্থানেই, অধিকাংশ সময়, অতিবাহিত করিতেন। কখনও কখনও, সখ করিয়া, আয়র্লণ্ডের গ্রাম্য ভবনে যাইয়াও বাস করিতেন।

লর্ড টমাস লিটেলটন, ওজস্বী বক্তা না হইলেও, লর্ড সভার সুপরিচিত সভ্য ছিলেন। তিনি সভায় যেমন সরস-ভাষী, সখের মজলিসেও সেইরূপ রসালাপ-পটু বলিয়া পাঁচ জনের আদর পাইতেন, এবং ধন-মান-সম্পন্ন ভূস্বামী বলিয়া বহু স্থলেই, কতকগুলি মাক্ষিক-স্বভাব সুহৃজ্জনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার ভোগভাণ্ডার, সকল সময়েই, সুখসমৃদ্ধির বিবিধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ থাকিত। কিন্তু, এই আমোদময় জীবনের অন্তরালে, এক দিকে লালসার দুর্দ্দম-প্রবাহ, আর এক দিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ভিন্ন, অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না।

টমাস লিটেলটন, চিরদিন, অকৃতদার ছিলেন। পৃথিবীতে, অনেকে, আজীবন অকৃতদার থাকিয়াও, চারিত্রগৌরবে মনুষ্যের পূজা পাইয়া গিয়াছেন। লিটেলটন সে পূজা লাভ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের অনেক অভাগিনী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিল। আয়র্লণ্ড-নিবাসিনী এম্‌ফ্লেট নাম্নী এক দুঃখিনী বিধবার তিনটি কন্যা ছিল। ঐ তিন অভাগিনীই, ভয়ে অথবা লোভে, লর্ড টমাস লিটেলটনের নিত্য-সঙ্গিনী হইয়া, মায়ের প্রাণে আগুন জ্বলাইয়াছিল। তিন ভগিনীর একটি আয়র্লণ্ডে থাকিত;—দুইটি লিটেলটনের সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ডের প্রাসাদে প্রাসাদে, পিঞ্জর-রুদ্ধ পোষা ময়নার মত, ঘুরিয়া বেড়াইত। আর, উহাদিগের শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতা, ক্রমে আপনার তিনটি প্রাণ-প্রিয় কন্যাকেই নরকের গ্রাসে ডালি দিয়া, আয়র্লণ্ডের শূন্যকুটীরে, একা পড়িয়া, অহোরাত্র হাহাকার করিত। যাহারা ধন-মদে মত্ত, অথবা পদ-প্রভুত্ব-গৌরবে আত্মবিস্মৃত, অবলা তাহাদিগের কাছে, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থলেই, ক্ষণিক আমোদের উপকরণ বই আর কিছুই নহে। কিন্তু অবলারও ইহকালের পর পরকাল আছে; আর যাহারা অবলাকে উপবনের একটি কুসুম মাত্র মনে করিয়া, আপনাদিগের রসিকতাবৃত আসুরী নিষ্ঠুরতায়, আপনারা আমোদিত রহে, তাহাদেরও পরকাল আছে। আমোদ-বিহ্বল লিটেলটন পরকাল মানিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। একা লিটেলটনের আর কথা কি? পৃথিবীর সম্পদ-মুগ্ধ সুখীদিগের মধ্যে, প্রায় সকলেই, পরকালের নাম শুনিলে, প্রাণে জ্বলিয়া

উঠে, এবং বিজ্ঞান-সাহিত্যের নাম লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশ্রয় লইতে ভালবাসে।

টমাস লিটেলটন, আপনার ভূম্যধিকার পরিদর্শন অথবা অন্য কোন কর্ম্ম উপলক্ষে, আয়র্লণ্ডে গিয়াছিলেন। অল্প দিন হইল, ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর মোটের উপর, সবল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত, এবং হৃদয় সর্ব্বপ্রকার বিলাস-সুখে অনুরক্ত। কিন্তু তিনি, মাসাধিক কাল হইতে, একটা ক্লেশকর রোগে, কষ্ট পাইতেছেন। এই রোগের কষ্ট দুঃসহ হইলেও ক্ষণস্থায়ী।—এক এক সময়, হঠাৎ শ্বাস-রোধ হইয়া আইসে, এবং কিছুকাল, অপরিসীম যন্ত্রণার পর, আপনা হইতেই নিবৃত্তি পায়। তাই, তাঁহার চিত্ত সামান্য একটু বিরক্ত। কিন্তু, এই পীড়া কিংবা বিরক্তি হেতু, তাঁহার দৈনিক কার্য্য কর্ম্ম ও অভ্যস্ত আমোদ-প্রমোদে কোনরূপ বাধা ছিল না।

লর্ড লিটেলটন, লণ্ডন নগরে, বার্ক্‌লি স্কোয়ারে, হিলষ্ট্রীটের প্রাসাদে আছেন। তাঁহার সুখ-সঙ্গিনী কুমারী দুইটিও ঐ প্রাসাদেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের দুঃখানল-দগ্ধা জননী, সুদূর আয়র্লণ্ডে,—শূন্য-কুটীরে, দুঃসহ শোক, দুঃখ, লজ্জা ও অপমানে মুমূর্ষু। তাহার বিশ্বাস ছিল, লর্ড লিটেলটন স্বয়ং, তাহার একটি কন্যাকে, ইয়োরোপীয় প্রথা অনুসারে, গোপনে, পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন; এবং দয়া করিয়া, অপর দুইটির জন্য, ভাল বর যুটাইয়া দিবেন। এখন আর সে বিশ্বাস নাই। সন্তানবৎসলা জননীর সেই স্বাভাবিক স্নেহের আশা এখন দুরাশায় পরিণত হইয়াছে; বৃদ্ধার ভাঙ্গা বুক, আরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা, এ সময়ে, নানা-রোগে কষ্ট পাইতেছিল। সে একদিন, মধ্য-রাত্রে, আপনার প্রাণাধিকা তনয়াদিগকে নাম ধরিয়া ডাকিল; ডাকিয়া ডাকিয়া, ক্লান্ত হইয়া, নয়নজলে ভাসিল। তার পর, নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল; আর জাগিল না। মানুষ, গরীব দুঃখীর ঘরে, নীরবে কাঁদে, নীরবে ছট্‌ফট্ করে, এবং নীরবেই মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়ে। কেহ তাহা দেখিয়াও দেখে না, জানিয়াও জানে না। বৃদ্ধা একাকিনী, মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া, মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়া পড়িল। পৃথিবীতে কেহই তাহার খবর লইল না।

বৃদ্ধা, যে দিন, যে সময়, আয়র্লণ্ডের নির্জ্জন কুটীরে তনুত্যাগ করে, ঠিক সেই দিন, সেই সময়, তাহার সকল যন্ত্রণার মূল, লর্ড লিটেলটন, লণ্ডনের হিলষ্ট্রীটপ্রাসাদে, ঘোর নিদ্রায় বিভোর। সে রমণীয় প্রাসাদের নিত্যনিয়মিত নৈশ ভোজব্যাপার, হাস্যপরিহাসের আমোদ-হিল্লোলে, সুখসন্তোষে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভৃত্যগণ, অনেকক্ষণ হইল, প্রভুর শয়নকক্ষের আলো নিবাইয়া, নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে। লিটেলটন সুকোমল সুখ-শয্যায়, আরামে নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি হঠাৎ ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠিলেন,—যেন শুনিতে পাইলেন, জানালার নিকট পাখীর পাখার শব্দ হইতেছে। যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, তিনি সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—

পাখী নহে, একটি রমণীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। রমণীর শরীরে শ্বেতপরিচ্ছদ। ফস্‌ফরসের আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত। লিটেলটন ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া চিনিলেন,—রমণী তাঁহার বিলাস-সঙ্গিনীদিগের দুঃখিনী জননী। সেই রমণী মূর্ত্তি ক্রোধ-জ্বলিত কঠোর দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। তাঁহার চক্ষু ঐ রমণী-মূর্ত্তির জ্বলন্ত-বহ্নি-খণ্ড সদৃশ ভয়ঙ্কর চক্ষুর সহিত যেন এক সূতায় গাঁথা রহিয়াছে। তাঁহার প্রাণটা ধুক বুক করিতেছে। কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে। শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে। তখন তিনি শুনিলেন, রমণী কেমন এক প্রকার শুষ্ক অথচ গভীর-স্বরে কহিতেছে,—"রে পাপিষ্ঠ, তোর কাল পূর্ণ হইয়াছে; তুই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ।" ভয়চকিত লিটেলটন, যেন স্বপ্নাবেশেই উত্তর করিলেন—'কি?—মৃত্যু? না—না;—এত শীঘ্র নহে! আশা করি, দুমাসের মধ্যেও, সে আশঙ্কার কারণ নাই।" রমণী কহিল,—"দুমাস নহে,—তিন দিবসের মধ্যে।" সেই ঘরে একটা বৃহৎ ঘড়ি ছিল। ধনী লোকদিগের ঘরে ঐরূপ ঘড়ি থাকে। ঘড়িতে তখন বারটা। রমণী মূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি ঘড়ির কাঁটার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া ধীরে কহিল,—"এই দেখ্ ঘড়িতে বারটা বাজিতেছে। ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ্। অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসের রাত্রিতে, যখন ঘড়ির কাঁটা আবার এই স্থানে আসিবে, তখনই তোর সব ফুরাইবে, তখন তোকে লইয়া যাইব।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই, ঘরের সেই উজ্জ্বল আলো নিবিয়া গেল। গৃহ ও গৃহ-স্বামীকে পূর্ব্বাপেক্ষাও গভীরতর অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়া, সে ছায়া মূর্ত্তি কোথায় জানি অদৃশ্য হইল! লিটেলটন বুঝিলেন না, এ কি দেখিলেন। ইহা কি স্বপ্ন—না বাস্তব ঘটনা?—না বিকৃত-বিহ্বল চিত্তের বিভীষিকাময় অমূলক কল্পনা? কিন্তু তিনি এতদূর ভীত ও উদ্বেজিত হইয়া পড়িলেন যে, তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। ভৃত্য, পার্শ্বের কোঠায়, শয়ান ছিল। সে আলোক লইয়া প্রভুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আসিয়া দেখিল, লিটেলটনের সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত,—তিনি যার-পর-নাই অধীর।

রাত্রি প্রভাত হইল। লিটেলটন বাহিরে আসিলেন। কিন্তু আজি তাঁহার হৃদয়ের সে প্রমোদ-তারল্য,—প্রাণের সেই প্রফুল্লতা নাই। অবিরামবাহি রসিকতার স্রোত যেন অকস্মাৎ নিরুদ্ধ হইয়াছে। সে উল্লাস-তরঙ্গও আজি স্তম্ভিত। তিনি বাড়ীর সকলের নিকটই উল্লিখিত নৈশ ঘটনা সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তাঁহার সহচর ও সুহৃদ্‌বর্গ সকলেই একবাক্যে কথাটাকে অলীক স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে যত্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা উড়াইয়া দিলেও, উহা লিটেলটনের চিত্ত হইতে একেবারে উড়িয়া গেল না। তাঁহার মনটা বড় ভার ভার হইল। তিনি আবার আমোদ উল্লাসে যোগদান করিতে

সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণে সম্পূর্ণরূপ প্রবোধ পাইলেন না। কল্য বৃহস্পতিবার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আজ শুক্রবার। শনিবার রাত্রি বারটার কথা, গল্প আমাদের মধ্যেও, এক এক বার তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল; এবং তিনি চকিতের ন্যায়, অলক্ষিতভাবে, অন্তরে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, লর্ড লিটেলটন পরকাল মানিতে চাহিতেন না। কিন্তু,—যদি—যদি একান্তই একটা পরকাল থাকে তাহা হইলে, তাঁহার গতি কি হইবে? এই ভয় ও ভাবনা, তাঁহার মনটাকে সময় সময়, মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন, গায়ের জোরে প্রাণের ধুক্‌ধুকি ভুলিতে চাহিলেন। কিন্তু, পারিলেন না। প্রাণের মধ্যে কে যেন, কিসের প্রভাবে, তাঁহাকে দুই চারিটি কশাঘাত করিয়া, অবাধ্যতার কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইল। লিটেলটন শুক্রবার রাত্রিতে পার্লিয়ামেণ্টে গিয়াছিলেন। যাইবার সময়, নিজ শরীরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—'আমি ত বেশ সুস্থ ও সবল আছি। আমার আসন্ন সময় এত নিকটবর্ত্তী, ইহা কি সম্ভবপর? শনিবার রাত্রি বারটা কাটিয়া গেলেই, সে স্বপ্নদৃষ্ট সয়তানীকে ফাঁকি দিতে পারি।

আজ শনিবার, লর্ড লিটেলটন হিলষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে পিট্‌প্লেসে চলিয়া আসিয়াছেন। আজি লিটেলটনের সমস্ত বন্ধুবর্গ—সুহৃৎ ও ও সহচরগণ পিটপ্লেসে সমবেত। কেবল লিটেলটনের প্রিয়তম স্বজন ও সঙ্গী, কমন্‌স্ সভার মেম্বর, মাইলস্ পিটার এন্‌ড্রুস্ (Miles Peter Andrews) অপরিহার্য্য প্রয়োজনের অনুরোধে, ডার্টফোর্ডে চলিয়া গিয়াছেন। কথা আছে, লর্ড লিটেলটন, রবিবার প্রাতে ডার্টফোর্ডে যাইয়া, প্রিয়সঙ্গী এন্‌ড্রুসের সহিত মিলিত হইবেন। পিট্‌প্লেস্ হইতে ডার্টফোর্ড ত্রিশ মাইল দূর।

পিট্‌প্লেসে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই, লিটেলটন শ্বাসরোধ হেতু, ক্ষণকাল কষ্ট পাইলেন। যথাসময়ে নৈশ ভোজের আয়োজন হইল। লিটেলটন, সুহৃদ্‌দিগের সহিত, মনের স্ফূর্ত্তিতে ভোজন ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। ভোজনের পর, গল্প, আমোদ, ও নানা বিষয়ে আলাপ চলিল। কিন্তু তিনি, এক এক বার, ঘড়ি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাত্রি কতটা হইয়াছে? সুহৃদ্‌বর্গ, পূর্ব্বেই পরামর্শ সহকারে, পিট্‌প্লেসের সমস্তগুলি ঘড়িতে, সময় এক ঘণ্টা বাড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ঘড়িতে যখন সারে দশটা, তখন লর্ড লিটেলটনের ঘড়িতে সারে এগারটা হইল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া লর্ডের মুখখানি একটু মলিন হইল। তিনি আর বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিলেন না। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। অতঃপর, যেই তাঁহার ঘড়ির কাঁটা বারটার ঘর অতিক্রম করিল, তিনি অমনি বালকের মত, কর-তালি-যোগে, আনন্দ প্রকাশ করিয়া, বলিয়া উঠিলেন,—'আ বাঁচিলাম। আপনারা এখন আমার কল্যাণে মদ্যপান করুন। মিথ্যাবাদিনী সয়তানীর ভয়-প্রদর্শন মিথ্যা হইয়াছে। আমি কি নির্ব্বোধ! আমি স্বপ্নের একটা অলীক

ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া কটা দিন কি অশান্তিতেই না কাটাইয়াছি।” তাঁহার ঘড়ির কাঁটা যখন সারে বারটার সন্নিহিত, তিনি তখন বিশ্রামার্থ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এখনও প্রকৃত ঘড়িতে বারটা হয় নাই। সুহৃজ্জনেরা, সেই সময় পর্য্যন্ত, অপেক্ষা করিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। এ দিকে শয়নকক্ষে যাইয়া নৈশ-পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি শয়ন-সময়ের আয়োজন উদ্যোগ করিতে করিতে, লিটেলটনের ঘড়িতে একটা ও প্রকৃত ঘড়িতে বারটা বাজিল। লিটেলটন শয়ন-সময়ে যে ঔষধ খাইতেন, তাহা খাইলেন। তৎপর ভৃত্যকে একটা চামচ লইয়া আসিবার জন্য অনুমতি করিয়া, স্বয়ং বিছানায় উপবেশন করিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া আসিল। কিন্তু, ফিরিয়া আসিয়া, প্রভুকে আর প্রকৃতিস্থ দেখিল না। দেখিল, লিটেলটন মূর্চ্ছাপন্ন। সম্মুখে শঙ্কাসূচক ঘণ্টা (alarm bell) ছিল। বিলাতে প্রায় সর্ব্বত্রই তাহা থাকে। সুতরাং সে ঝন্ ঝন্ করিয়া ঘণ্টা বাজাইল। সুহৃৎ স্বজনেরা দ্রুতবেগে শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, লর্ড লিটেলটনের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার প্রভাহীন নির্জ্জীব শব, ভৃত্যের বাহুবলম্বনে, শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত রহিয়াছে।

লর্ড টমাস লিটেলটন, যে সময়ে পিট্ প্লেসে তনুত্যাগ করেন, সে সময়ে, তাঁহার প্রাণবন্ধু এন্‌ড্রুস্ ‘ডার্টফোর্ডে’ আপন শয়ন কক্ষে, তন্দ্রাগ্রস্ত। তাঁহার একটু অসুস্থতা ছিল। সুনিদ্রা হয় নাই। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রি যখন বারটা, তখন সহসা, কে তাঁহার মশারি ধরিয়া টান দিল। তিনি চমকিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন ও চিনিতে পারিলেন,—তাঁহার সম্মুখে,—অঙ্গে নৈশ-পরিচ্ছদ, শিরে নৈশ-শিরস্ত্রাণ,—লর্ড টমাস লিটেলটন দণ্ডায়মান। শুধু দেখিলেন এমন নহে,—তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। লিটেলটন বলিলেন,—“আমার সব ফুরাইয়া গিয়াছে। স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। আমি এই সংবাদই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি”

পূর্ব্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে, রবিবার প্রাতে না আসিয়া, লিটেলটন, এরূপ অসময়ে, এই ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে এন্‌ড্রুস্ বড় বিরক্ত হইলেন। লিটেলটন তাঁহার সঙ্গে, এরূপ কৌতুক, পূর্ব্বে আরও অনেকবার করিয়াছেন। এন্‌ড্রুস্ সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহাও, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা উপলক্ষে, লিটেলটনের তেমনই একটা কৌতুক মাত্র। এন্‌ড্রুস্ স্বপ্ন-বিশেষের-সত্যতা ও ছায়া-দর্শন-তত্ত্বে ঘোরতর অবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কহিলেন,—‘এমন অসময়ে এসেছ, এখন বল দেখি, কোথায় তোমার শয়নের স্থান করি, কোথায় বসিতে দেই।’ এই বলিয়া, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, সম্মুখস্থিত চেষ্টা লিটেলটনের পানে নিক্ষেপ করিলেন। মূর্ত্তি পার্শ্ববর্ত্তী কোঠায় সরিয়া গেল। এন্‌ড্রুস্ শয্যা ত্যাগ্ করিলেন। শয়নকক্ষের পার্শ্বের কোঠায় তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন। ভৃত্য দিগকে ডাকিলেন। সমস্ত বাড়ীতে অনুসন্ধান করিয়া

দেখিলেন, কোথাও আর লিটেলটনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাড়ীর সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। কোন ভৃত্য কোন খবর রাখে না। লিটেলটন কিরূপে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এন্‌ড্রুস্ ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন। কহিলেন,—‘যেমন মানুষ, তেমন শাস্তি। যেমন অসময়ে রঙ্গ করিতে আসিয়াছেন, তেমন এখন যাইয়া ঘোড়ার আস্তবলে কিংবা বহিঃস্থ হোটেলে শয়ন করুন।’

রাত্রি প্রভাত হইল। লর্ড লিটেলটন আসিলেন না। অবশেষে—অপরাহ্ণে, আরিন্দা সংবাদ লইয়া আসিল। সংবাদ এই যে, লর্ড লিটেলটন, গত রাত্রি ১২টার সময়, পিট্‌প্লেস্ প্রাসাদে, ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র এন্‌ড্রুস্ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় হইতে তিন বৎসরের মধ্যে, তিনি ভালরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই।

এই কাহিনী এন্‌ড্রুস্ স্বয়ং কমন্‌স সভার সহযোগী সভ্য মেঃ প্লুমার এডোয়ার্ড সমীপে বর্ণন করেন। ইহার আদ্যোপান্ত বিবরণ লইয়া বড় বেশী আলোচনা হওয়ায়, সে সময় পিটপ্লেস নামক প্রাসাদে যতগুলি লোক ছিল, লিটেলটনের সুহৃজ্জনেরা তাহাদিগের সকলেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সাক্ষীদিগের মধ্যে লিটেলটনের প্রিয়তম ভৃত্য উইলিয়ম ষ্টাকির নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, লিটেলটন মৃত্যুকালে, তাহারই ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। আর উল্লেখ-যোগ্য দুঃখিনী বিধবা এম্‌ফ্লেটের দুইটি অভাগিনী কন্যার নাম। কারণ, তাহারাও সেই বাড়ীতে ছিল, এবং আগা গোড়া সকল ঘটনাই জানিতে পাইয়াছিল। লিটেলটন এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহা কেহ জানে না। কিন্তু তাঁহার আমোদ-বিহ্বল-জীবনের এই অবসান-কাহিনী—এই আতঙ্ক-জনক কথা অধ্যাত্ম-তত্ত্বের একটি অধ্যায় রূপে, ইতিহাসে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই মনুষ্যকে গম্ভীরস্বরে উপদেশ করিতেছে—ইহলোকের পর পরলোক আছে,—অবিচারের পর বিচার আছে; সুতরাং পরলোকের কথা এক বারে বিস্মৃত হওয়া ভাল নহে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। “দয়ানন্দ হিন্দুর আদর্শ সংস্কারক।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত। দয়ানন্দ-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত”—গ্রন্থকার দয়ানন্দ-সমিতির প্রচারক ও দয়ানন্দের চরিতলেখকরূপে বঙ্গসাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালির নিকট সুপরিচিত। আমরা এখানে সাহিত্যানুরাগী শব্দটিকে ‘বঙ্গ’ এই বিশেষণের দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়াছি। কারণ,

যাঁহারা বাঙ্গালা পড়েন না, তাঁহারা সুশিক্ষিত হইলেও, দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদিগের পরিচয় না থাকিতে পারে। কিন্তু, বঙ্গীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে, যাঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট দেবেন্দ্রনাথের নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দেবেন্দ্রনাথের দয়ানন্দ-চরিত, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়াছে। তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তকও, লোকের উপকারে আসিবে। তিনি সুলেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বাংশে সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার ভাষা, যেমন শুদ্ধ ও সুরুচির পরিচায়ক, তেমনই সরল ও সুন্দর, এবং স্থানে স্থানে সুপ্রযুক্ত নূতন শব্দে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, আমরা এই আদর্শ-সংস্কারক পাঠ করিয়া, লেখকের ভাব-প্রকাশ-ভঙ্গী ও রচনা-নৈপুণ্য দর্শনে যার-পর-নাই প্রীত হইয়াছি ;—এবং এইরূপ গ্রন্থ-পত্র বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত নহে ইহা মনে করিয়া, লজ্জা অনুভব করিয়াছি।

২। 'নবপ্রভা। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনা। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম, এ, বি, এল ও শ্রীহরেন্দ্রলাল রায় বি, এল সম্পাদিত। দ্বিতীয় খণ্ড, ফাল্গুন ১৩০৮, প্রথম সংখ্যা।" যদি কথাটারে, কাব্যের ভাষায় অনুবাদ করিয়া, অলঙ্কারে সাজাইয়া বলিলে ভাল শুনায়, তাহা হইলে বলিব যে, নবপ্রভা এক বছরের বালিকা হইলেও উহার রূপে একটুকু প্রশান্ত প্রভা আছে। বালিকা বাঁচিয়া থাকিলে, কালে দেশের উপকারিণী হইবে। আমরা এই সমালোচ্য সংখ্যায়, যে কয়টি প্রবন্ধ পড়িলাম, তাহার সমস্তই সুপাঠ্য ও সুখ-প্রীতি-কর। প্রথম প্রবন্ধটি যেমন মনোমদ, তেমনই মঙ্গলা-শিক্ষাপ্রদ। নবপ্রভার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। যাঁহারা সেই উদ্দেশ্য বুঝিতে পাইবেন, তাঁহারা লেখকদিগকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিবেন। আমরা, আরও দুই চারি সংখ্যা পড়িয়া, নবপ্রভার সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করিব। এই সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় কএক ছত্তর ইংরেজী উদ্ধৃত আছে। ঐ উদ্ধৃত পংক্তি কয়টির নিম্নে একটুকু বাঙ্গালা অনুবাদ দিলে ভাল হইত। সাহিত্য-সাগর রাজেন্দ্রলাল মিত্র একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, যদি বাঙ্গালা পত্রিকায় ইংরেজী হইতে একটি শব্দও উদ্ধৃত করিতে হয়, তাহা হইলে, সঙ্গে সঙ্গে, সেই শব্দটির অনুরূপ, আর একটি বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ করা আবশ্যক। নতুবা, বাঙ্গালাভাষার পথ খুলিবে না,—উহার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইবে না। নবপ্রভার সম্পাদক ও লেখকগণ উচ্চশিক্ষিত লেখক। আমরা, তাই তাঁহাদিগকে, একটি স্বর্গগত সম্ভ্রান্ত লেখকের অভিমত জানাইতে সাহসী হইলাম।

আমরা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র প্রণীত সহমরণ, অবলাবালা ও উপন্যাসমালা,—শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার মজুমদার প্রণীত রাজর্ষি কুমার এবং আরও বহু গ্রন্থ সমালোচনার জন্য উপহার পাইয়াছি। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয়ের সমালোচনা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আরাধনা-তত্ত্ব।

অথবা।

কৃষ্ণোক্ত কর্ম্মযোগ।

কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ-প্রিয় শিষ্য, পৃথ্বীবিখ্যাত ধনুর্দ্ধর, বীরবর অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং
স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥" *

অর্থাৎ,—

'হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকলেরই হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ;—এবং সূত্রধার যেরূপ কলের পুতুলকে, সূতায় টানিয়া, ক্রীড়ার পথে চালনা করে, তিনিও সকলকে সেইরূপ, প্রকৃতি অথবা স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তির সূত্রে, সতত আকর্ষণ করিয়া, কর্ম্ম-পথে চালাইতেছেন। অতএব তুমি তোমার সমস্ত আত্মার সহিত তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদাৎ পরমা শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। †

পুরুষোত্তম কৃষ্ণের এই কথাগুলি বড়ই পুরাতন। যখন ভক্তির এই গভীর-তত্ত্বময়ী মধুরাক্ষরা কথা, ভারত-ভূমিতে প্রথম উচ্চারিত হয়, তখন পৃথিবী ঘোর অজ্ঞান-তমসে সমাচ্ছন্ন ; এবং যে সকল সুসভ্য ও সমৃদ্ধ জাতি এইক্ষণ পৃথিবীতে শক্তির সিংহাসনে সমাসীন, তাহারা সকলেই তখন পশুজীবনেরও নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। তাই বলিয়াছি, কথা গুলি বড়ই পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও, এই কয়টি কথা, কালের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ;—আর, বৎসরের পর বৎসর, ও শতাব্দীর পর শতাব্দীর ক্রমশৃঙ্খলায়, বহু সহস্র বৎসর পার হইয়া, আজি আমাদিগের মত অকৃতী অধমেরও কাছে আসিয়া পঁহুছিয়াছে ; এবং অদ্যও মনুষ্যের নিকট ঠিক নূতনবৎ পরিশ্রুত হইতেছে। মনে লয়, মনুষ্য যখন নিবিষ্টচিত্তে এই জগতের রহস্য-চিন্তায় উপবিষ্ট হয়, তখন কে যেন তাহার কানে কানে, কল-মোহন-স্বরে কহিতে থাকে,—

"ঈশ্বর তোমার হৃদয়দেশে, সকল সময়েই,

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,—অষ্টাদশ অধ্যায় ; ৬১। ৬২ শ্লোক।

† পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমি এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার একটিরও আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই। গীতার আক্ষরিক অনুবাদ অনেক আছে। নবীনচন্দ্রের প্রাঞ্জল পদ্যানুবাদও প্রায় আক্ষরিক। আমি তাৎপর্য্যার্থ মাত্র সংকলনে যত্নপর হইয়াছি।

হৃদয়ের অধীশ্বররূপে, জাগ্রদবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি তোমার সমস্ত আত্মার সহিত তাঁহার শরণ লও।”

সেই কৌরব নাই, সেই পাণ্ডব নাই,—কুরুপাণ্ডবের সেই হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথাগুলি সজীব সত্য বলিয়া তেমনই শক্তিসম্পন্ন রহিয়াছে। মনে লয়, কথাগুলি বুঝি পর্ব্বতবক্ষে খোদিত হইয়াছিল; তাই আজি পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—

“ঈশ্বরই এই নিখিল জগদ্‌যন্ত্রের নিত্যসিদ্ধ কর্ত্তা ও নিয়ন্তা। তিনি সেই ভাবে, তোমার হৃদয়দেশে, নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাগত হও।”

মনে লয়, গঙ্গা ও যমুনার কুলুকুলুধ্বনি, বিহঙ্গ-নিচয়ের প্রভাতী বন্দনা ও সায়ং-সঙ্গীত ঐ কথাগুলিরই আবৃত্তি করিতেছে; এবং ঊর্দ্ধে আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা, এবং অবনীতে মনুষ্যের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ততৃষ্ণাময়ী হৃদয়বৃত্তি—ঐ কথা কয়টিরেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনুষ্যকে বুঝাইয়া কহিতেছে,—

“ঈশ্বর তোমার প্রাণের প্রাণ ও প্রাণের ঠাকুররূপে, প্রাণের মধ্যেই, বিদ্যমান রহিয়াছেন। তুমি তোমার হৃদয়, মন, প্রাণ ও আত্মার সহিত,—ভক্তি, প্রীতি ও স্নেহ প্রভৃতি সমস্ত ভাবে *—তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া শান্তি লাভ কর।”

এই কৃষ্ণোক্ত ঈশ্বরবাদ, আর বিজ্ঞ-জন-পরিজ্ঞাত নির্গুণ ব্রহ্মবাদ, একই কথা কি? যাঁহারা সামান্য একটুকু চিন্তা-শ্রম স্বীকার করিবেন, তাঁহারাই বুঝিতে পাইবেন যে, আলোকে আর আঁধারে যত প্রভেদ, নির্গুণ ব্রহ্মবাদে, আর কৃষ্ণোপদিষ্ট সগুণ ঈশ্বরবাদে, কোন কোন অংশে, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন কি নাই, সমান কথা। কেন না, জীবের সহিত তাঁহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই। জীব সুখে থাকুক, কিংবা দুঃখে থাকুক,—কর্ম্মগুণে উন্নত হউক, অথবা কর্ম্মদোষে একবারে অধঃপাতে যাউক, তিনি কিছুরই সংবাদ লয়েন না,—যেন কিছুই জানেন না, অথবা কিছুই জানিতে চাহেন না। পক্ষান্তরে, সগুণ ঈশ্বর সকলেরই সাথের সাথী। ঐ যে ফুলটি ফুটিতেছে, ফুটিয়া একটুকু হাসিতেছে, উহাকেও তিনিই ফুটাইতেছেন,—

* এই যে মূলে আছে—“সর্ব্বভাবেন ভারত” ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। এক অর্থ, সমস্ত আত্মার সহিত; আর এক অর্থ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তির সর্ব্বপ্রকার ভাবে। উভয় অর্থই তাৎপর্য্যে এক। কিন্তু আজি ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত সুসভ্য দেশ যাঁহাকে অবতীর্ণ সত্য বলিয়া পূজা করিতেছে, সেই দেব-পুরুষের জিহ্বা হইতে, উল্লিখিত শেষোক্ত প্রকার অর্থ, এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে, প্যালেষ্টিন নামক প্রসিদ্ধ দেশে, ঠিক যেন গীতারই অনুবাদের ন্যায়, উচ্চারিত হইয়াছিল। যথা মার্কের সুসমাচার—দ্বাদশ অধ্যায়,—

“And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength.”

নিই হাসাইতেছেন,—এবং সৌন্দর্য্যে ও রতে হৃদয়হারি করিয়া, মনুষ্যকে উপর দিতেছেন। আর, ঐ যে দুধের শিশু, য়ের কোলে দুলিয়া দুলিয়া, ফুলটি ধরিবার ন্য কচি হাতখানি বাড়াইতেছে, উহার দয়ের মধ্যেও, তিনিই, ধীরে ধীরে, রূপ, রস ও সৌরভের সুখ-পিপাসা ফুটাইয়া, আর এক প্রকারে কার্য্য করিতেছেন। তাই কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,——হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর দূরে নহেন, তিনি সমস্ত পদার্থেরই হৃদ্দেশে অবস্থিত;—তিনি ক্ষণ-মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত নহেন; কারণ তিনিই এই জগদ্‌যন্ত্রের সমস্ত কার্য্যে যন্ত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত। *

কিন্তু কৃষ্ণ এই কথা কয়টি অর্জ্জুনকে কোথায় বলিয়াছিলেন?—কুরুক্ষেত্রে। কোন্ সময়ে বলিয়াছিলেন?—সেই লোক-ভয়ঙ্কর কুরু-পাণ্ডব-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে। আর কি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন? তাহাই এখানে অতি সংক্ষেপে বিবরিয়া কহিব।

বিশাল প্রান্তর। উত্তর—দক্ষিণ—পূর্ব্ব—পশ্চিম, যে দিকে চাও, সেই দিকেই দুর্নিরীক্ষ্য ধূ ধূ দূরতা, যেন কোন দিকেই শেষ নাই,—কোন দিকেই সীমা নাই। প্রান্তরের এক প্রান্তে অভিমান-দৃপ্ত দুর্য্যোধনের অসংখ্য বীর ও ধীরদিগের শঙ্খনাদ ও সিংহনাদে উন্মাদিত সৈনিকবর্গ;—আর এক প্রান্তে পুঞ্জীকৃত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ পাণ্ডবী সেনা। মধ্যস্থলে, রথের উপরে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন। রথে, যোদ্ধার বেশে ও যোদ্ধার আসনে, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন; এবং সারথির আসনে, বিপন্নের পরিত্রাতা ও ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, ভারতারাধ্য ভগবান্ কৃষ্ণ।

অর্জ্জুনের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। হাতের গাণ্ডীব হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছে। শরীর থর থর কাঁপিতেছে। * কিন্তু মহাবীরের সে মোহের অবস্থা,—সে মনঃস্থৈর্য্য-নাশক ও মনঃপ্রাণ-শোষক কম্প, মৃত্যুভয়ে নহে, ধর্ম্মভয়ে।

অর্জ্জুন, তাঁহার শরীর ও মনের ঐরূপ অবস্থায়, শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া, ছল-ছল-নয়নে, করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণ, আমার দ্বারা এ যুদ্ধ হইতেছে না, † আমার মন যেন ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। আমি চারি দিকে নানারূপ অমঙ্গলের লক্ষণ দেখি-

* ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও ইহাই অধুনাতন চরমসিদ্ধান্ত। বিজ্ঞান যাহাকে এতকাল The Unknowable Reality বলিত, তাঁহাকেই এইক্ষণ The Infinite Personality বলিয়া ধ্যান করিতে শিখিতেছে।—হার্বার্ট স্পেন্সরকৃত First Principles.—নূতন সংস্করণ।

* যথা শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রথম অধ্যায়ে,—দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮॥ বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯॥

† ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥ ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ, ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥ কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ, কিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা। যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ৩২॥ ইত্যাদি।

তেছি। আমি এ ভাবে যুদ্ধ করিতে পারিব না। যুদ্ধের চরম ফল জয়লাভ অথবা রাজ্য-সুখ। আমি আত্মীয়স্বজন সকলকেই সংহার করিয়া রাজ্য-সুখ লাভ করিবার জন্য লালায়িত নহি। রাজ্য দিয়া আমার কি কার্য্য দেব? আর, রাজভোগেই বা আমার কি প্রয়োজন? আমি যাহাদিগের জন্য রাজ্য ও রাজভোগের কামনা করি, যুদ্ধে যদি সেই পুত্র পৌত্র, জ্ঞাতি ও সগোত্র, এবং শ্যালক শ্বশুর, মাতুল ও আত্মীয়স্বজন, সকলকেই মৃত্যুর মুখে ডালি দিতে হয়, তাহা হইলে সে রাজ্য ও রাজ-সম্পদে আমার কি হইবে? ঐ দেখ, আমার পিতামহ ভীষ্ম। এই মহাসত্ত্ব মহাপুরুষ কত স্নেহে আমাদিগকে লালনপালন করিয়াছেন। ঐ দেখ, যোদ্ধৃগণের অগ্রনায়ক মহারথ দ্রোণ। উনি আমার গুরুদেব,—পুত্র অশ্বত্থামা হইতেও আমাতে অধিকতর প্রীতিমান্। কত যত্নেই উনি আমাকে অস্ত্রশাস্ত্রে শিক্ষা দিয়াছেন। আমি আজি কোন্ সুখের লোভে পূজার্হ পিতামহ এবং মহানুভাব মহাগুরুর অঙ্গে আঘাত করিয়া নরকে ডুবিব? এইরূপ মহানুভব গুরুজনদিগের নিধন-সাধন * অপেক্ষা ভিক্ষান্নের দ্বারা জীবন যাপনও আমার পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর। জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কপট, ক্রূর ও রাজ্যলোলুপ। উহাদিগের ইচ্ছা হয়, উহারা আমাকে আঘাত করুক। আমি, এই আততায়ীদিগের দ্বারা আহত হইলেও, ফিরিয়া আঘাত করিব না; এবং কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত কর্ম্মের দ্বারা পাপের আশ্রয় লইব না। * পৃথিবীর রাজ্য ত কৃষ্ণ অতি ক্ষুদ্র কথা। যদি ইহাদিগকে বধ করিয়া ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য লাভ হয়, আমি তাহাও অভিলাষ করি না।

কৃষ্ণ-সখা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আপনার প্রাণটা হইতেও বেশী ভালবাসিতেন, এবং পিতা, মাতা ও জ্ঞানদাতা গুরু অপেক্ষাও, অধিকতর গরীয়ান্ জ্ঞানে, হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেন। ভক্তির সঙ্গে একটু ভয়ও মিশ্রিত ছিল। অদ্য ছয় হাজার বৎসরের পৃথ্বীব্যাপি আলোচনার পরও, মনুষ্যজাতি যাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই, অর্জ্জুনও সেই শ্রীকৃষ্ণকে সকল সময়ে সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন না। ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। যাহারা আলোর অত্যধিক সন্নিহিত, তাহাদিগের চক্ষুই, আকস্মিক ধাঁধায়, অধিকতর শঙ্কান্বিত। অর্জ্জুনের চক্ষেও কখনও কখনও ঐ রূপ ধাঁধা লাগিত। তিনি সেই ধীর, স্থির, ও জ্ঞান-গম্ভীর স্নিগ্ধ-শ্যামল মধুর-মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অনেক সময়েই, কেমন

* গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্, শ্রেয়োভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে। হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ২য়ঃ অঃ ৫মঃ॥

* অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে। নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন! পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্॥ স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব! প্রথম অধ্যায়। ৩৫।৩৬।

ন বিচলিত হইয়া যাইতেন। ফলতঃ, তিনি শ্রীকৃষ্ণের চক্ষের দিকে চাহিয়া, প্রায়শঃ কখনও, মুখ ফুটিয়া মনের কথা বুঝাইতে পারিতেন না। তবে আজি সেই শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কোন্ সাহসে, কার কি প্রবর্ত্তনায়, বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ পণ্ডিতের মত, এতগুলি জ্ঞানগর্ভ কথা শুনাইলেন! ইহা ভাল হইল কি? তাই আবার বিনয়-নম্রতার সহিত কহিলেন,—

কৃষ্ণ! আমার চিত্ত বিকল হইয়াছে। * আমি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ববিচার করিতে পারিতেছি না। আমি তোমার শিষ্য, তোমারই শরণাপন্ন। আমার পক্ষে এখন কোন্ কার্য্য শ্রেয়োজনক, তাহা তুমিই নিশ্চয় করিয়া উপদেশ কর। আমায় তুমি শিক্ষা দাও।

এই সময়ে, আবার বুঝি, আপনার দিকে একটুকু দৃষ্টি পড়িল। অর্জ্জুনের চিত্তনিহিত সেই পুরাতন ভাব আবার যেন জাগিয়া উঠিল। তিনি, এই হেতু, যেন কৃষ্ণের দিকে না চাহিয়া, আপনাকে আপনি সম্ভাষণ করিয়া, স্বগতবৎ কহিতে লাগিলেন,—

"চক্ষেত পথ দেখিতেছি না। † বন্ধুবান্ধব সকলকেই যদি বিনাশ করিয়া অবনীমণ্ডলকে অকণ্টক করিলাম, তাহা হইলে সে রাজ্য অথবা স্বর্গের সাম্রাজ্যও আমার অন্তরাত্মার শোকের আগুন নির্ব্বাণ করিতে পারিবে কি?"

কহিতে কহিতে বীর-চূড়ামণি, পুনরায় বিবেকের অভিমানে, উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তখন, যেন এক প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া,—যেন একটুকু গৌরবের ভাবে ফুলিয়া, কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "না কৃষ্ণ! আমি যুদ্ধ করিব না। * যাহাতে আমার আত্মা ক্লিষ্ট হইবে, এমন কার্য্য আমি করিতে পারিব না।"

অর্জ্জুনের কথা এখানেই পরিসমাপ্ত হইল। অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার হৃদয়ের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া, রথের উপর নীরব-নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট হইলেন।—

যাঁহারা পণ্ডিত ও ধর্ম্মাভিমানী, অথবা পৃথিবীর প্রচলিত-পদ্ধতিতে তত্ত্বজ্ঞানী, অর্জ্জুনের উল্লিখিত কথাগুলি তাঁহাদিগের নিকট অবশ্যই বড় বেশী ভাল লাগিবে। তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন, ধন্য অর্জ্জুন, ধন্য অর্জ্জুনের বিষয়বৈরাগ্য ও ধর্ম্মজ্ঞান, ধন্য অর্জ্জুনের ধর্ম্মভীরুতা! অর্জ্জুন ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তথাপি গুরুহত্যা ও জ্ঞাতিহত্যারূপ মহাপাতকের জন্য প্রস্তুত

* কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে, শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ২য়ঃ অঃ ৭ম শ্লোক।

† নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্। অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ২য়ঃ অঃ ৮ম শ্লোক॥

* এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ। ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ২য়ঃ অঃ ৯ম শ্লোক॥

নহেন। অর্জ্জুন, ঋষি-সন্ন্যাসীর ন্যায়, ভিক্ষান্নের দ্বারা, জীবন যাপন করিতে সম্মত, তথাপি শত্রু মিত্র কাহারও শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে সম্মত নহেন। ইহার উপর আবার ধর্ম্মভাব কি হইতে পারে? আর ইহার উপর তত্ত্বজ্ঞানই বা এই পৃথিবীর আর কোথায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে?

কিন্তু, অর্জ্জুনের এই ভক্তিশূন্য ধর্ম্মানুরাগ, ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা-শূন্য কর্ম্ম-বৈরাগ্য ভাঁয়তে ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ম্মযোগের প্রথম * শিক্ষাদাতা যোগেশ্বর কৃষ্ণের চক্ষে ভাল লাগিল না। অর্জ্জুনের কথায় সকলই আছে,—নাই আরাধনা অর্থাৎ সেবার ভাব;—নাই ঈশ্বরের প্রতি তদ্গত নির্ভরের ভাব;—নাই দীন-হীন কাঙ্গালের মত, দয়াময় দীনবন্ধুর শ্রীপাদ-পদ্মে, মনে প্রাণে আত্মসমর্পণের মহাযোগময় মধুরভাব। ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর হইল না।

যাঁহারা, কৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, অর্জ্জুনের সমস্ত কথাই ধর্ম্মাভিমানে পরিপূর্ণ—ধর্ম্মজ্ঞানের অসাধারণ আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত। উহার অন্তস্তলে, ভক্তি অথবা আরাধনার বিষম কণ্টকস্বরূপ, মোহের অহঙ্কার;—এবং বাহিরেও, অহঙ্কারমূলক অনীশ্বর-ধর্ম্মেরই নূতন একটা প্রকার। ইহা জগন্মঙ্গল * কৃষ্ণের নিকট, কিবা অর্জ্জুনের পক্ষে, কিবা জগতের সর্ব্ব-সাধারণ-লোকের পক্ষে, শ্রেয়োজনক বোধ হইল না। কারণ কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ নহে। উহার মূলতত্ত্ব † ঈশ্বরের আরাধনা,—ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, অথবা কায়-মনঃ-প্রাণে ঈশ্বর-সেবায়

কর্ম্মযোগ;—

আর সে কর্ম্ম, অথবা সে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র ও মূল-সূত্র—

জগতের সর্ব্ব-জনীন-মঙ্গলার্থ

শক্তিপ্রয়োগ।

কৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সে কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব শুনিতে পাঠকের ইচ্ছা হইবে কি? (ক্রমশঃ)

* এই কথাটি "ভক্তির জয়" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে কতকটা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ফলতঃ, শ্রীকৃষ্ণ যখন ভক্তিমূলক কর্ম্মযোগ-ধর্ম্মবিষয়ে প্রথম উপদেশ করেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মই পৃথিবীতে প্রচারিত কিংবা প্রস্ফুটিতও হয় নাই।

* বেন্থাম ও জনষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি লোকহিত-পরায়ণ মনস্বী পণ্ডিতেরা যাহা Utilitarianism নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই, কৃষ্ণোক্ত কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে, অধিকতর পবিত্র জগন্মঙ্গল ব্রত। ভারতবাসী ঋষিরা ইহা বুঝিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্তেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিয়া নমস্কার করিতে সকলকেই শিক্ষা দিয়াছিলেন।

† আরাধনা শব্দের প্রচলিত অর্থ সাধনা ও ভজনা। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী এবং মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি ভারত-গুরু পণ্ডিতেরা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মদ্বারা সেবা অর্থেই উহা ব্যবহার করিয়াছেন। "রাধ সেবায়ামিতি চ।"

আর্য্য হিন্দু সমাজের সূচনা।

মনু।

"যৎশঞ্চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তবরুদ্রপ্রণীতিষু।"

ঋগ্বেদ, ১ম, ১১৪ সূ ২ ঋক্।

ভূপৃষ্ঠ যেমন স্তরে স্তরে গঠিত, হিন্দুসমাজও সেইরূপ স্তরে স্তরে গঠিত হইয়াছিল। * ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক স্তরে অনুসন্ধান করিলে, যেমন তৎসমুদায়ের উন্মেষকালের বৈশেষিক উপাদানগত নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর সমূহের পরীক্ষাদ্বারা, প্রত্যেক স্তরের ইতিহাস, কিঞ্চিৎপরিমাণে সঙ্কলিত হইতে পারে। সমাজের প্রত্যেক স্তরেই এক একটি প্রধান পুরুষের অবদানের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। জল বায়ু খাদ্য সামগ্রী, আবাসভূমি ও নিসর্গের সমবেত শক্তি ও প্রভাবের সহিত মানবীয় শক্তির অনুলোম ও বিলোম সম্মিলনে প্রত্যেক সমাজের সংগঠন হইয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতির অপেক্ষা মানবের অন্তর-প্রকৃতির প্রভাব যে দেশে বলবত্তর, তথায় উভয় শক্তির অনুলোম মিলন হয়, বলা যাইতে পারে। ইয়ুরোপের দক্ষিণ দেশসমূহে ইহার নিদর্শন বিরল নহে। কিন্তু যেখানে বাহ্য-প্রকৃতির নিকট অন্তঃপ্রকৃতি শক্তিহীনা, অথবা যেখানে অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগতা, কিংবা অধীনা, সেইখানেই উভয় শক্তি বিলোমভাবে মিলিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ ইহার প্রধানতম দৃষ্টান্ত। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অংশও ইহার উদাহরণ স্বরূপ প্রকটিত হইতে পারে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব ও দর্শন-শাস্ত্রসমূহের আলোচনা করিলে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, আর্য্যহিন্দুসভ্যতার সুবর্ণ-যুগে, কপিল ও কণাদ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বসকল তন্ন তন্নরূপে বিশ্লেষিত করিলেও, বাহ্য প্রকৃতির সেই অবাঙ্মনসোহগোচরা শাশ্বতী শক্তির মহিমা সম্পূর্ণরূপে, করায়ত্ত ও হৃদ্গত করিতে পারেন নাই।

হিন্দুসমাজের ক্রমিক উন্নতি ও পরিপুষ্টির প্রকৃতি অনুসারে, ইহা চারিটি স্তরে বিভক্ত হইতে পারে; যথা,—১ম বৈদিক; ২য় দার্শনিক; ৩য় পৌরাণিক; ৪র্থ ঔপান্তিক। ভগবান্ মনুর সমসাময়িক জলপ্লাবনের পর হইতে, প্রথম স্তরের আরম্ভ এবং ভগবান্ পরশুরামের সময় পর্য্যন্ত ইহার শেষ। এই প্রথম স্তরে, জলপ্লাবনের পর, দুই চারিটি নিরবয়ব সামান্য উপলখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া, কালক্রমে রাশি রাশি সুগঠিত ইষ্টক

* বীরমালার প্রথম অধ্যায়ে জাতিভেদের ক্রমিক উৎকর্ষ ও পুষ্টি সম্বন্ধে, যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে।

প্রস্তরাদি বিবিধ উপকরণ একত্র হইয়াছিল; এবং সেই সকল উপকরণের যথাবিধি বিন্যাস-দ্বারা হিন্দুসমাজের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্তরেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে কৃষিবাণিজ্যাদি লোকবৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও ক্রমোৎকর্ষ; বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি; বিবাহাদি দশবিধ সংস্কারের সূচনা; রাজধর্ম্ম, বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের কল্পনা ও ক্রমোন্নতির আরম্ভ। মনু, পৃথু, সগর, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র,—এই পঞ্চ বীরকে এই স্তরের প্রধান স্থপতি বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অথবা দার্শনিক স্তর, প্রথম স্তরের ক্রমোৎকর্ষ বা পরিণতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে ইহাতে অনেকগুলি নূতন উপকরণ উপচিত হইয়াছিল;—তন্মধ্যে উপনিষদ্ ও পরমগুহ্য ব্রহ্মরহস্যের উদ্ভব ও আবিষ্কার এবং কপিল ও গৌতমের অতিমানুষ গবেষণা,—এই দুইটিই প্রধান উপকরণ এবং ইহাদের অনুরূপ অন্যান্য উপকরণের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষে যে অভিনব পদার্থনিচয়ের উদ্ভব হয়, তৎসমুদায়ই হিন্দুসমাজ বন্ধনের মূলরজ্জু। এই স্তর, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য, অষ্টাবক্র ও শ্বেতকেতু, কপিল ও গৌতম, এই ছয়টি মহাবীরের অলৌকিক অবদানে গৌরবান্বিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় স্তর, যেমন প্রথম স্তরের পরিণতি, তৃতীয় স্তরও সেইরূপ দ্বিতীয় স্তরের পরিণামফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই পরিণামে তাহার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই স্তরেই শিল্পবিজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ, লোকসংখ্যার আত্যন্তিক বিবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা। উৎকট জীবন-সংগ্রাম জন্য ভীষণ লোক-বিপ্লব এবং পরিণামে জাতীয় অধঃপতন; এই কয়টিই প্রধান ঘটনা। দ্বিতীয় স্তর ও তৃতীয় স্তরের সন্ধিস্থান শ্রীরাম; এবং তৃতীয় স্তরের শেষযুগে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরাশর ও ব্যাস, কণাদ ও জৈমিনি, চরক ও সুশ্রুত, ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ,—এই আট জন মহাপুরুষ লইয়াই পৌরাণিক স্তর। ইঁহারাই কালে কালে পৌরাণিক স্তরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং নিদারুণ লোকবিপ্লবে হিন্দুসমাজ ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইলে, ইঁহাদের মধ্যে কোন কোন মহাবীর তাহার ধ্বংসাবশেষ লইয়া সমাজের পুনর্গঠনে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।

ইহার পরই চতুর্থ ও ঔপান্তিক স্তর। এই স্তর প্রাচীন হিন্দুসমাজের ধ্বংসরাশির উপর বিন্যস্ত। ইহাতে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম সমস্তই বিপ্লুত; লোকযাত্রার উপায় সমুদায়ই বিপর্য্যস্ত। আর্য্যের অধঃপতনে অনার্য্যের অভ্যুত্থান; বিভগ্ন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপকরণাদি লইয়া, শাখাধর্ম্ম ও উপধর্ম্মনিচয়ের সৃষ্টি। এই স্তরে অনেকগুলি বীর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে পাণিনি ও কাত্যায়ন, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্ত, শাক্যসিংহ ও নাগার্জ্জুন, শঙ্কর ও চৈতন্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চারিটি স্তরে আর্য্য হিন্দু সমাজ, ক্রমে ক্রমে কিরূপে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, যথাক্রমে তাহাই প্রকটিত হইতেছে।

আর্য্য-হিন্দুগণের আদি পুরুষ।

মনুকে লইয়াই বিরাট্ হিন্দুসমাজের আদি স্তর গঠিত। হিন্দুর সামাজিক জীবনের ইহাই আদিযুগ। এই স্তরের ক্রমোন্নতিকালেই, পরমগুহ্য বেদমন্ত্রসকল ঋষিগণের মানস-নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল। মনুর আবির্ভাব হইতেই এই স্তরের সূচনা। মনুর পূর্ব্বে ভারতে আর্য্যবসতি ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে নানামত প্রকটিত আছে। তৎসমুদায় মতের সমন্বয়সাধন করিলে, মনুকে ভারতীয় আর্য্যগণের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। *

মনুকে, ভারতীয় আর্য্যগণের আদিপুরুষ বলিয়া,স্বীকার করিবার আগে,প্রথমে দেখিতে হইবে, ভারতীয় আর্য্যজাতির আদি বাসস্থান কোথায়? এই বিষয়ে, বহুদিন হইতে, গভীরগবেষণা চলিতেছে। মোক্ষমূলরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, এই বিষয়ের অনুসন্ধানে বিপুল আয়াস স্বীকার ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই মত এই যে, মধ্য এশিয়ার একটি উচ্চ মালভূমিতে (অনেকে বলেন উত্তর-কুরু) শাকসেন, জর্ম্মণ, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের আদিপুরুষগণ ভারতীয় আর্য্যগণের পিতৃপুরুষদিগের সহিত একত্র একস্থানে বাস করিতেন। সেই প্রদেশ নিতান্ত অল্পপরিসর; বহু জাতি বহু কাল একত্র বাস করাতে, প্রজাবৃদ্ধির নিত্য-সংক্ষোভে এবং জীবন-সংগ্রামের বিবর্দ্ধমান কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, শাকসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিসমূহের পিতৃপুরুষগণ সেই আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ করেন। তদনুসারে ভারতীয় আর্য্যগণের ও পারসিকদিগের আদি পুরুষগণও, সেই আদিম কেন্দ্রস্থান হইতে বহির্গত হইয়া, ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। * পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের প্রতিভাপ্রসূত এই প্রবল মত প্রায় সমস্ত সভ্য জগৎকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। যে কএকটি বেদজ্ঞ পণ্ডিত এই মতের মোহিনী মায়ায় এখনও বিমুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র বঙ্গের প্রথিতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের নামোল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। † যে সকল অকাট্য প্রমাণাদিদ্বারা তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐ বলবৎ মত খণ্ডন করিয়াছেন, এই অল্প পরিসরের মধ্যে তাহার আলোচনা অসম্ভব; পরন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্যও নহে।

* "যৎ শঞ্চ যোশ্চ মনুরায়েজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু।" ১।১১৪।২ (ঋগ্বেদ) 'যস্য দ্বারা মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয়ঃ আনজে।" ঋগ্বেদ, ৮।৫২।১ এইরূপ ঋগ্বেদ ১।৮৫।১৬, ২।৩৩।১৩, ১০।১০০।৫, ৮।৩০।৩

* Max Muller's 'A History of Ancient Sanskrit Literature." p p. 12-15. Max Muller's "India—what can it teach us?"

† পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত সামবেদের পরিশিষ্ট দেখ।

ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে ভারতীয় আর্য্যগণের একটি "প্রত্নত্তক" অর্থাৎ পুরাতন বাসস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সেই প্রত্নত্তক এশিয়ামণ্ডলের কোন্ নিভৃত স্থানে ছিল, অদ্যাপি তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হয় নাই। সেই দুরূহ্য মতের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; কেন না, তাহা হইতে সেই প্রাচীনতম আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আর্য্য-হিন্দুগণের সামাজিক অবস্থার প্রথম উন্মেষ যে স্থলে আরব্ধ বলিয়া প্রতীতি হইবে, আমরা সেই স্থল হইতেই অগ্রসর হইব। বলা বাহুল্য, মনু হইতেই আর্য্যহিন্দুসমাজের প্রথমোন্মেষ দেখা যায়। মনুই আমাদিগের আদিপুরুষ, অগ্নির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা ও উপাসক * এবং প্রথম যজ্ঞকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

শত-পথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, মনুর সময়ে ভীষণ জল-প্লাবন হইয়াছিল; তাহাতে একমাত্র মনু ভিন্ন আর সমস্ত প্রাণীই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বিবরণটির সার মর্ম্ম এই স্থানে প্রকটিত হইল। প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত মনুর নিকট জল আনীত হইলে, মনু স্বীয় হস্তস্থিত জলমধ্যে একটি ক্ষুদ্রকায় মৎস্য দেখিতে পাইলেন। মৎস্য তাঁহাকে বলিল "আপাততঃ আপনি আমাকে রক্ষা করুন; তাহার পর শীঘ্র জলপ্লাবন হইবে; তাহাতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব।" মৎস্য মনুকে আরও অনেক কথা বলিল; এবং পরিশেষে তাঁহাকে একখানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিল। তাহার কথানুসারে মনু একখানি নৌকা প্রস্তুত করিলেন। পরে নির্দ্দিষ্ট কালে, প্লাবনারম্ভ হইলে, মৎস্য আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার একটি শৃঙ্গ ছিল। মনু সেই শৃঙ্গে স্বীয় তরণী আবদ্ধ করিলেন এবং সেই অনন্ত জলরাশির উপর দিয়া, উত্তরগিরির (হিমালয়ের) অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

প্লাবনের জলরাশি শুষ্কীভূত হইলে, মনু সেই উত্তরস্থ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, প্রজা উৎপাদনের অভিলাষে অর্চ্চনা, তপস্যা ও পাকযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে ইড়ানামে তাঁহার এক কন্যা উদ্ভূত হয়। সেই কন্যার সহিত তপস্যাদ্বারা তিনি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্রজা মানব নামে অভিহিত। * শতপথব্রাহ্মণের

* নিত্বম গ্ন মনুর্দ ধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।" ঋগ্বেদ, ১।৩৬।১৯; ৮।১০।২; ৯।৯৬। ১১; ১০।৬৩।৭; ১০।৬৯।৩; শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।২।৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৩৪ ও কেহ কেহ অথর্ব্বা ও দধ্যঞ্চ ঋষিকেও অগ্নির প্রথম আবিষ্কর্ত্তা ও আদি যজ্ঞকর্ত্তা বলেন; ঋগ্বেদ ১।৮০।১৬; ৬।১৬।১৬; ১০।২১।৫।

* শতপথব্রাহ্মণ, ১।৮।১

সামবেদেও জলপ্লাবনের বিবরণ আছে। জলপ্লাবন ও মৎস্যের এই উপাখ্যান লইয়াই পৌরাণিক কর্ত্তৃক মৎস্যাবতারের কল্পনা হইয়াছে। মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে মৎস্যাবতারের বিবরণ আছে। জলপ্লাবনের এই আখ্যায়িকা য়িহুদী ও চীনজাতির প্রাচীনগ্রন্থে দেখা যায়। মহাত্মা টড বলেন মনু হইতেই মুসলমানদিগের নু এবং য়িহুদীদিগের নোয়া শব্দ উদ্ভূত। শ্রী যঃ

এই উপাখ্যানের অভ্যন্তরে যে কোন রূপক বা গূঢ় অর্থ প্রচ্ছন্ন থাকুক না কেন, আমি তাহার আলোচনা করিব না। এক্ষণে এই উপাখ্যানের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। (ক্রমশঃ)

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিশোর গৌরাঙ্গ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই।
দুঃখ ভাবে শচী দেবী, স্মরয়ে গোসাঁই।"

শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্য-লীলা বৈষ্ণব কাব্যাদিতে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ বোধ হয় যে, তিনি তাঁহার প্রথম বয়সে, বড়ই চঞ্চল, উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্ত বালক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে, সে চাঞ্চল্য, সে উচ্ছৃঙ্খলতা, সে অশান্ত অস্থিরতা, সকল সময়েই কেমন একপ্রকার স্নেহ-ঢল-ঢল, মধুর-কল-কল উল্লাসের ভাবে পরিপূর্ণ রহিত। বড় নদীর বুকে যেমন, বিনা-বাতাসেও, ঢেউ খেলায়, তাঁহার আমোদবিহ্বল আনন্দময় প্রাণেও, বিনা কারণে, সেইরূপ ঢেউ খেলাইত।

বৃদ্ধেরা অনেক স্থলে শিশুদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করেন,—"বাছা, তুমি একে একশত হইয়া তোমার সংসার পূর্ণ করিও।" এইরূপ 'একে একশত' গোছের লোক, সংখ্যায় অতি বিরল হইলেও, এ সংসারে স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহারা, সৌন্দর্য্যের সকল লক্ষণ অনুসারে, সুন্দর না হইলেও, তাঁহাদিগের মুখচ্ছবিতে কেমন একটুকু অপূর্ব্ব মাধুরী থাকে। মনুষ্য সেই মাধুরীতে ভুলিয়া যায়। মনুষ্য তাঁহাদিগের কাছে আসিয়া, গায়ে ঘেসিয়া, বসিতে ভাল বাসে। তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রখরতা, এবং বিবিধ শক্তির উজ্জলকান্তি, মনুষ্যের চিত্তে কখনও কখনও একটুকু ভয়ের ভাব জন্মাইলেও, সে ভয় স্থায়ী হইয়া রহে না। মনুষ্য, তাঁহাদিগের মাধুর্য্যদর্শনেই, ভয়ের সকল কথা বিস্মৃত হইয়া, আপনার প্রাণটাও যেন তাঁহাদিগের হাতে তুলিয়া দিতে আকুল রহে। যেমন বসন্ত সমাগমে, বনের বৃক্ষ লতা, ফুলের হাসিতে, হাসিয়া উঠে, যেখানে এই শ্রেণীর

আনন্দময় পুরুষদিগের সমাগম হয়, সেখানেও সকলেরই প্রাণ, কেমন এক অলক্ষিত কারণে, আনন্দে সেইরূপ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সুতরাং ইঁহাদিগকে একে একশত বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোনরূপেই অসঙ্গত নহে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শৈশব হইতেই, একে এক সহস্র। তিনি যৌবনে যেমন শত সহস্রের নায়ক, চালক, এবং ভক্তি, প্রীতি ও প্রাণভরা ভালবাসার আশ্রয় হইয়াছিলেন; শিশুকালেও তিনি সেইরূপ বহুশত চক্ষুর আকর্ষক ও বহু হৃদয়ের ক্রীড়ার অবলম্ব ছিলেন। পাঠক গৌর-চরিত্রের এই রহস্যটুকু হৃদয়স্থ করিয়া রাখিবেন। নহিলে, এ কাহিনীর সকল অংশ, তাঁহার নিকট, সুসম্বদ্ধ বোধ হইবে না। ইদানীং লোকে কীর্ত্তনের সময় এইরূপ গাইয়া থাকে,—

"তোরা কে নিবি লুট লু'টে নে,
নিমাই চাঁদের প্রেমের বাজারে।"

গৌরাঙ্গ যে সময় হইতে হাঁটিতে, চলিতে ও দৌড় দিয়া যাতায়াত করিতে সমর্থ, সেই সময় হইতেই, শচীর প্রাঙ্গণ প্রতিবেশী সমস্ত শিশুর প্রমোদ-ভূমি ও প্রেমের বাজার। বিশ্বরূপের কথা পাঠকের মনে থাকিতে পারে। বিশ্বরূপ কিবা শৈশবে, কিবা প্রথম যৌবনে, চির-দিনই একক, চির-দিনই নীরব। গৌরাঙ্গে সমস্তই ইহার বিপরীত। তিনি, প্রথম হইতেই, নূতন জোয়ারের জলের মত,—উদ্বেল, আবেগময়, আনন্দে খল-খল। বিশ্বরূপ, কাঁখে পুঁথি পত্র লইয়া, অধ্যাপকের টোলে একা চলিয়া যাইতেন, টোল হইতে আবার, নীরব-গাম্ভীর্য্যে একাকী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। গৌরাঙ্গ নবদ্বীপের যে পথ দিয়া যখন খেলায় বাহির হইতেন, সেই পথেই তখন আমোদের তুফান তুলিতেন। বিশ্বরূপকে তাঁহার সমানবয়স্ক বালকেরা ভালবাসিত কি না বলিতে পারিব না। তবে, সকলেই ভক্তি করিত। গৌরাঙ্গ-বিশ্বম্ভরকে তাঁহার সমবয়স্ক প্রমোদসঙ্গীরা প্রাণের অধিক ভাল বাসিত। তিনি শত অত্যাচার করিলেও, তাহারা সঙ্গ ছাড়িতে চাহিত না,—তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে পারিত না।

ইদানীং শচীর আঙ্গিনায়, নিত্যই নৃত্যের নূতন উৎসব। গৌরাঙ্গ বহুসংখ্য শিশু যুটাইয়া, সেখানে শিশুর উদ্দাম-বিলাসে, উচ্ছ্বসিত উল্লাসে নৃত্য করেন, এবং পল্লীর প্রায় সমস্ত লোকই, বিশেষতঃ পুরস্ত্রীরা, দুই বেলা আসিয়া, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, সে নৃত্য দর্শনের অভিলাষে, বাটীর পাশে বসিয়া রহেন। প্রসিদ্ধ কবি ঠাকুর-বাসুদেব-ঘোষ, গৌরাঙ্গের শৈশব-নৃত্য বর্ণন করিয়া, বড়ই সুন্দর কএকটি পদ গাঁথিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা এ স্থলে পদকল্পতরু হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

"শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়,
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু,
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে,
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা,
শিশু-রূপ দেখি এই জগ-মন-লোভা।"

পুনশ্চ—

"কিয়ে হাম পেখনু কনক পুতলিয়া,
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া।
চৌদিকে দিগম্বর বালকে বেড়িয়া,
তার মাঝে, গোরা নাচে, হরি হরি বলিয়া।"

চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থেও গৌর-নৃত্যের অতি মনোহর বর্ণনা আছে। যথা,—

"হেন অনুমানি যেন রাত্রি সুপ্রভাতে,
খেলায় শচীর সুত বালক সহিতে।
খেলে আঙ্গিনায়, লুঠে ধূলায় ধূসর,
দেখিয়া জননী বলে বচন কাতর।
সোনার পুতলী তনু বদন সুছাঁদ,
উপমা দিবারে নারি আকাশের চাঁদ।
এহেন সুন্দর গায় ধরণী পড়িয়া,
লোটাইয়া বুল কেন মোর মাথা খাইয়া।
ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন,
পুলকে পূরল অঙ্গ সজল নয়ন।"

যাঁহারা, গৌরচরিত্রের ক্রমবিকাশ-দর্শনের জন্য লালায়িত, তাঁহারা চৈতন্যভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি পাঠ করিয়াও প্রীতি লাভ করিবেন।—

"গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর,
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর।
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র,
দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ।"

একদিন বাহিরের আঙ্গিনায় বহু শিশুর এইরূপ নৃত্য হইতেছে, এমন সময় শচী আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার অঞ্চলের ধন

'চঞ্চল নিমাই' সেখানে নাই। "হা! এই মাত্র নিমাইকে এখানে নাচিতে দেখিয়া গিয়াছি, নিমাই কোথায়?" শচী নিমাই নিমাই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর বাহির হইলেন। নবদ্বীপ তাঁহার পিতৃস্থান। নবদ্বীপের কোথাও তাহার যাতায়াতে লজ্জা ছিল না। তিনি, প্রতিবেশীদিগের বাড়ী বাড়ী, গৌরাঙ্গের তালাস করিতে লাগিলেন।

"সাত পাঁচ নাহি মোর দুই আঁখি তারা,
আঁধলার নড়ি যেন নহে ক্ষণ ছাড়া।
ঘর-সরবস্ব-ধন দেহ আত্মা তনু
না রহে জীবন মোর গোরাচাঁদ বিনু।"

পাঠক জানেন, গৌরাঙ্গ ঐ বয়সেই ভয়ানক অশান্ত। তিনি যখন সুযোগ পাইতেন, তখনই একাকী বাড়ীর বাহির হইয়া, এক দিকে ছুটিয়া যাইতেন। এখনও যেমন, অনেক দুর্দ্দান্ত ছেলে, একাকী বাড়ীর বাহির হইয়া, কোন মুদী কি পসারীর দোকানে যাইয়া, বসিয়া থাকে, অথবা বাড়ীর একটুকু দূরে, পাড়ার অপরিচিত শিশুদিগের সঙ্গে যাইয়া খেলায় যোটে, গৌরাঙ্গও সেইরূপ করিতেন। তিনি শিশুকাল হইতেই নির্ভয়। এই হেতু, তিনি কখনও কখনও, একাকী গঙ্গার ধারে পলাইয়া যাইয়া, খেলা পাতিয়া বসিতেন। শচী যেমন তাঁহার অন্বেষণে পাড়ার গৃহস্থদিগের বাড়ী বাড়ী খুঁজিতে লাগিলেন, ভ্রাতৃবৎসল বিশ্বরূপও সেই রূপ, তাঁহার প্রাণের ভাই নিমাইর জন্য আকুল হইয়া, গঙ্গার দিকে দৌড়িয়া গেলেন।

আত্মীয়দিগের মধ্যে আরও অনেকে, নগরের ইতস্ততঃ, অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে, পাড়ায় একটা হৈ চৈ পড়িল। লোকের মধ্যে এইরূপ একটা জনরব উঠিল যে, শচীর সেই যে বড় সুন্দর ছেলেটি তাহাকে চোরে নিয়াছে। এইরূপ জনরবে, সর্ব্বত্রই যেমন ঘটিয়া থাকে, শচীর প্রাঙ্গণেও, তখন ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। সেখানে মুহূর্ত্ত মধ্যেই লোকে লোকারণ্য হইল। জগন্নাথ বাড়ী ছিলেন না। তিনি বাড়ী আসিয়া, লোকের ভিড় দেখিয়া, এবং গৌরাঙ্গকে চোরে নিয়াছে শুনিতে পাইয়া, উন্মত্তের মত হইলেন। বিশ্বরূপ গঙ্গার ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি, কোন স্থলেই গৌরাঙ্গকে দেখিতে না পাইয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, বাড়ী ফিরিলেন। শচীও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু, তাঁহার তখনকার সেই নিষ্পন্দ-দৃষ্টি এবং নিরাশ-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই প্রতীতি হইল যে, তাঁহার আত্মা শুকাইয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ঠিক. এমনই সময়, একটি অপরিচিত মানুষ, গৌরাঙ্গকে কোলে করিয়া, যেন পথ হারাইয়া,কোথা হইতে হঠাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। গৌরাঙ্গ তাঁহার পিতা, মাতা, ও ভ্রাতাকে সেখানে দেখিয়া, সেই অপরিচিত লোকের কোল হইতে লাঁফ দিয়া মাটিতে পড়িলেন; এবং সকলকে পাইয়া আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। যে লোকটি তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিল, সে প্রাণের ভয়ে, এক-দিকে দৌড়িয়া পালাইল। সুতরাং সকলেই বুঝিল যে, সে চোর। চোরের আর একটি সঙ্গী ছিল। সেও ঐরূপ পালাইয়া গেল। লোকে ধর্ ধর্ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে—সেই হল-হলা গণ্ডগোলে—কে কাহাকে ধরিতে পায়? চোর দুইটি অব্যাহতি পাইল।

জগন্নাথ কাছে ছিলেন। তিনি, হারা-ধন পাওয়ার মত, গৌরাঙ্গকে যাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। তিনি, তাঁহার প্রাণাধিক বিশ্বরূপের কনিষ্ঠকে, নামকরণের গৌরব-রক্ষার্থ, সর্ব্বদাই বিশ্বম্ভর বলিয়া ডাকিতেন। তিনি আনন্দের অশ্রু-বিসর্জ্জনে, কিছুক্ষণে, সুস্থির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

বাবা বিশ্বম্ভর! তুমি তোমার পিতা মাতাকে এইরূপ দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইয়া কোথায় পালাইয়া ছিলে?

গৌরাঙ্গ, শিশুর সোহাগে, পিতার কণ্ঠে দুলিয়া দুলিয়া,বলিতে লাগিলেন,—আমি?—আমি খেলিবার জন্য গঙ্গার ধারে গিয়াছিলাম। সেখানে আমি পথ হারাইয়া নগরে বেড়াইতে ছিলাম। তার পর, ঐ দুটি লোক আমার নিকট আসিল। উহাদেরই একজনে, আমাকে সন্দেশ দেখাইয়া, কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। উহারা আমাকে লইয়া অনেক স্থানে ঘুরিয়াছে; শেষে এই স্থানে রাখিয়া গিয়াছে।

যাহারা এই কাহিনী শুনিল, তাহারা সকলেই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া হরিনাম লইল। কেহ কেহ বলিল ইহা বিষ্ণু-মায়া।

স্বয়ং ভগবান্ এই শিশুকে রক্ষা করিয়াছেন। কোন কোন প্রাচীন লোক, শচীর প্রতি স্নেহের ভাবে, পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, এই প্রকার দুর্ব্বৃত্ত বালককে রক্ষা করা পিতা মাতার অসাধ্য। শচী, শিশুর মস্তকে আশীর্ব্বাদের রক্ষা বাঁধিয়া, ঘরে গিয়া, অবসন্ন দেহে পড়িয়া রহিলেন। লোকের ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে গৌরাঙ্গ, আবার তাঁহার শিশুর হাট মিলাইয়া, খেলার আমোদে সকল কথা ভুলিয়া গেলেন।

শচীর একটি প্রিয় পরিচারক ছিল। তাঁহার নাম ঈশান। ঈশান সম্ভবতঃ নীলাম্বরের বাড়ী হইতেই, শচীর বাড়ীতে আসিয়া, স্থান লইয়া থাকিবেন। তিনি, নামতঃ পরিচারক হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে, শচীর অভিভাবক ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতে এইরূপ তাঁহার পরিচয় আছে,—

"সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে * ঈশান
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান্।"

সাধু-হৃদয় ঈশান ঈশ্বরনিষ্ঠা, উপকার-শীলতা এবং সৌজন্য, সাধুতা ও নম্রতা-প্রভৃতি বহুগুণে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সমাজে পূজনীয় লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-বন্দনা নামক পুস্তকে তাঁহার পবিত্র নাম এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"বন্দিব ঈশান দাসে কর যোড় করি,
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি।"

জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে ঈশানের বড় গৌরব। ঈশান আগে ছিলেন সুস্থির-স্বভাবা শচীর পরিচারক;—তার পর ছিলেন, শান্ত-স্বভাব বিশ্বরূপের পরিরক্ষক। তিনি এখন হইয়াছেন চারুচঞ্চল, উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল গৌর-চন্দ্রের অভিভাবক। গৌরাঙ্গের লালন-পালন ও নিত্য-পরিরক্ষণের সমস্ত ভারই এখন ঈশানের উপর ন্যস্ত। ঈশানের কার্য্য বড় সহজ নহে। কিন্তু, যাহা এই সংসারে সাধারণতঃ অসাধ্য, তাহাও ভালবাসার নিকট সুসাধ্য। গৌরাঙ্গও ঈশানকে বড় ভালবাসিতেন।

"ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই.
ঈশান বিহনে না যান কোন ঠাঁই।
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়,
যে আখুটি করে তা ঈশান সমাধয়।"

ঈশানের এইরূপ সানন্দ-যন্ত্রণার সুখের দিনে, এক দিন, দিবা দুই প্রহরের সময়, একটি প্রশান্ত-মূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যদৃচ্ছাক্রমে, জগন্নাথের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি, তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নবদ্বীপে সেই দিন তাঁহার প্রথম সমাগম। জগন্নাথ মিশ্র, বৃদ্ধের অসাধারণ গাম্ভীর্য্য দর্শনে, একটুকু বিস্মিত হইয়া, তাঁহার নিকট অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাবে প্রণত হইলেন, এবং তাঁহাকে নানা-

* বৈষ্ণব-কবিরা যুগ-গুরু গৌরাঙ্গদেবকে পরিত্রাতা গুরুদেব অথবা পিতাজ্ঞানে পূজা করিতেন; এবং এইজন্য শচীঠাকুরাণীকে আই বলিতেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য ভাগবত নামক গ্রন্থে আই শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

রূপে সম্মান করিয়া আসন দিলেন। বিশ্বরূপ জগন্নাথের অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্রাহ্মণ, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপরাশি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এক দৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

"দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ
মুগ্ধ হইয়া এক দৃষ্টে চাহে ঘন ঘন।
বিপ্র বলে কার পুত্র এই মহাশয়
সকলে বলিল এই মিশ্রের তনয়।
শুনিয়া সন্তোষ বিপ্র কৈল আলিঙ্গন
ধন্য পিতা মাতা যাঁর এ হেন নন্দন।
বিপ্রেরে করিলা বিশ্বরূপ নমস্কার
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার।"

ব্রাহ্মণ, পিতা পুত্রের অভ্যর্থনায় কৃতার্থ হইয়া, ঐস্থানেই আথিত্য গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, তিনি যত বার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহারের উদ্যোগ করিলেন, অধীর গৌরাঙ্গ, তত বারই অগ্রে আসিয়া, সেই অতিথি-ভোগের অগ্রভাগ উদরস্থ করিয়া, দৌড়িয়া গৃহান্তরে গেলেন। জগন্নাথ মিশ্র ক্রোধে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া গৌরাঙ্গকে মারিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। ব্রাহ্মণ অকৃত্রিম বৈষ্ণব, এবং বাল-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত। তিনি গৌরাঙ্গের অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, তিনি যাঁহার অন্বেষণে, দেশে দেশে, পরিভ্রমণ করিতেছেন, বুঝি সেই ব্রজ-বিহারী হরিই এই চঞ্চল বালকের চারুদেহে বিরাজমান। বৈষ্ণব কবিরা, গৌর-জীবনের এ সকল কথা, যে ভাবে কবিতায় গাঁথিয়াছেন, তাহাতে ইতিহাসের সহিত ভক্তিবিহ্বলা কল্পনার আনন্দ-মিশ্রণ কোন অংশেও অসম্ভব নহে। কিন্তু ইতিহাস, এ জগতে কোথায়, কোন্ কালে, কল্পনার সঙ্গ ছাড়িয়া, একা চলিতে পারিয়াছে? আর কৃষ্ণচরিতের যে কাহিনী লইয়া এই বর্ণনা, সে কাহিনীও কোন্ অংশে ঐতিহাসিক, কোন্ অংশে কল্পনাপ্রসূত, তাহা অদ্য অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের আখরের সহিত আখর মিলাইয়া, কে অবধারণ করিতে সমর্থ হইবে?

জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীর অদূরে, জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত নামে, দুইটি শান্তশিষ্ট ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কথিত আছে, পূর্ব্বোল্লিখিত তৈর্থিক ব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহারাও, শচীর এই অশান্ত বালকের রূপ দেখিয়া, তাঁহাকে দেবাধিষ্ঠিত মনে করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা এক দিন একাদশীর উপবাস উপলক্ষে ফল মূলাদি যে সকল দুর্লভ বস্তু দেবতার ভোগের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এই বালকের মুখে তুলিয়া দিয়া, বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। গৌরাঙ্গ, পাড়ায় বেড়াইবার সময়, দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই দুই ব্রাহ্মণের বাড়ী নৈবেদ্যের বড় ঘটা হইয়াছে। তিনি সেই নৈবেদ্যের জন্য ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়া আকুল। তাঁহাকে সুস্থির করিবার জন্য, তাঁহার পিতা মাতা ও প্রতিবেশীরা অশেষ প্রকারে যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। জগন্নাথ মিশ্র যখন কান্নার কারণ

জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন,—

"জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবত আজি অনেক নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছে। যদি তাহা হইতে কিছু আমায় খাইতে দেও, তবে আমি সুস্থির হইব।"

এই অসম্ভব আবদারের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য ভাগবতও, এই সময়ে, দৈবাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়েই পরমবৈষ্ণব,—জগন্নাথের সমবয়স্ক এবং অভিন্ন-হৃদয় সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, শিশুর আবদারে সকলেই হাসিতেছে। কিন্তু তাঁহারা হাসিলেন না। তাঁহাদিগের মনে ভাবান্তর হইল।—

"দুই বিপ্র বলে বড় অদ্ভুত কাহিনী,
শিশুর এমন বুদ্ধি কভু নাহি জানি।
বুঝিলাম এ শিশু পরম রূপবান্,
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান।"

তাঁহারা বাড়ী যাইয়া দুইখানা নৈবেদ্য আনিয়া দিলেন। গৌরাঙ্গ তাহা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন;—এবং তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতায় হাসিয়া ঢলিয়া,—নৈবেদ্য দুখানি হাতে লইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া, সকলকেই প্রফুল্ল করিলেন। প্রখর-প্রতিভান্বিত আদরের ছেলেরা, অনেক স্থলেই, এইরূপ এবং আরও অনেক প্রকার আবদার করিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল আবদার ও আখুটির চিত্র, গৌর-চরিত্রের বিশাল পটে স্থান পাইয়া, স্থান-মহিমায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ভক্তির চিত্তহারিণী তুলিতে চিত্রিত হইয়া, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গৌরাঙ্গ, এইরূপ আবদারের মধ্যে, কখনও কখনও, দুই একটি বিচিত্র কথা কহিতেন। তাঁহার পিতা মাতা সে সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন শচী, তাঁহাকে বাটা ভরিয়া খৈ, সন্দেশ, কলা প্রভৃতি বিবিধ বস্তু খাইতে দিয়া, গৃহকার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, গৌরাঙ্গ সব ফেলাইয়া দিয়া, অল্প অল্প মাটী তুলিয়া, খাইতেছেন। হয়ত, গৌরাঙ্গ যাহা চাহিয়াছেন, তাহা পান নাই, অথবা যাহা পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। এইরূপ কিছু একটুকু ব্যতিক্রম হইলেই, তাঁহার অপরিসীম ক্রোধ হইত; এবং তিনি যখনই ক্রোধে অধীর হইতেন, তখনই ঘরের দ্রব্য সামগ্রী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, এদিকে ওদিকে, ছড়াইয়া ফেলিতেন, অথবা মায়ের উপরে কোনরূপ অত্যাচার করিতেন। এদিন সম্ভবতঃ মনের ক্রোধ মনেই রহিয়াছে। মনে মনে ক্রোধে ফুলিয়া, খৈ সন্দেশ ফেলাইয়া, মাটী খাইতেছেন। শচী দৌড়িয়া গিয়া গৌরাঙ্গের হাত ধরিলেন, এবং তাঁহার মুখের মাটী ফেলাইয়া দিয়া, আদর করিতে লাগিলেন। বালকের সেই ক্ষণিক ক্রোধ, ক্রোধের অন্তস্তলস্থিত গভীর প্রকৃতির গভীর স্নেহে, ডুবিয়া গেল। তিনি মায়ের আদরে মুগ্ধ হইয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—

কেন মা, কি দোষ করিয়াছি? ইহাও মাটী, উহাও মাটী। তোমার এই খৈ সন্দেশ কি মাটী নয়?

শচী, কচি বালকের মুখে, এরূপ কঠোর জ্ঞানের কথা শুনিয়া, গালে হাত দিয়া অবাক্ হইলেন, এবং বলিলেন,—

হারে অবোধ! তোর এখনও হাতে খড়ি হয় নাই, তোরে এসকল কথা কে শিখাইল? থৈ সন্দেশ মাটী হইতেই হয় বটে। কিন্তু, তাই বলিয়া কি মাটী খাইতে আছে? মাটী খাইলে রোগ হয়, থৈ সন্দেশ খাইলে রোগ হয় না।

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—

মা, তুমি আগে কেন বলিয়া দেও নাই! আমি আর কখনও মাটী তুলিয়া মুখে দিব না।

"এক দিন শচী, খই সন্দেশ আনিয়া,
বাটা ভরি দিঞা বলে, 'খাও ত বসিয়া।'
এত বলি গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে;
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে।
দেখি শচী ধাঞা আইল করি 'হায়! হায়!'
মাটি কাড়ি লঞা বলে 'মাটি কেন খায়?'
কাঁদিয়া কহিল শিশু 'কেনে কর রোষ?'
তুমি মাটি খাইতে দিলা; মোর কিবা দোষ?
খই, সন্দেশ, অন্ন, যত মাটির বিকার;
এহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ বিচার?
মাটি দেহ, মাটি ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি;
অবিচারে দেও দোষ; কি বলিতে পারি?
অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে;
'মাটি খাইতে জ্ঞান যোগ কে শিখাল তোরে?
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয়;
মাটি খাইলে রোগ হয়; দেহ যায় ক্ষয়।'

* * *

আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিল তাহারে—
আগে কেন ইহা মাতা না বলিলা মোরে?"

মায়ে পোয়ে মাঝে মাঝেই এইরূপ বিচার বিতর্ক হইত। কিন্তু সে বিচারে, শচী সকল সময় সুবিধা পাইতেন না। কোন কোন দিন, তাঁহার উপর ভালবাসার অত্যাচার এক্টুকু বেশী হইয়া যাইত। গৌরাঙ্গ ঐ বয়সেই শচীর প্রকৃতি সম্যক্ রূপে পরিগ্রহ করিতেন। সুতরাং, শচীর তর্জ্জন গর্জ্জন ও শাসন-বাক্যে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় হইত না। শচী সামান্য একটুকু শাসন করিলেই, তিনি ফুলিয়া, দ্বিগুণ হইয়া, আরও বেশী অত্যাচার করিতেন।

এক দিন, শচীর সহিত গৌরাঙ্গের কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়াছে। কাছে আর কেহ নাই। জগন্নাথ কি বিশ্বরূপ কাছে থাকিলে এরূপ ঝগড়া বড় বাঁধিত না। আজি আর কেহ কাছে নাই, তাহাতেই ঝগড়া একটুকু বেশী হইতেছে। আঙ্গিনার এক ধারে মা, আর এক ধারে পুত্র। শচীর ইচ্ছা, গৌরাঙ্গ তাঁহার কোলে আসিয়া আনন্দ করেন। গৌরাঙ্গের ইচ্ছা, তিনি বাহিরে যাইয়া খেলায় ডোবেন। শচী পাঁচ প্রকারের শাসন বাক্য বলিলেন, তাহাতে কোন ফল হইল না। বালক আত্ম-নির্ভরের ভাবে দৃঢ়। শচী ইহার পর আর সহিতে না পারিয়া, এক গাছি ছড়ি হাতে করিয়া, মারিতে গেলেন। আঙ্গিনার অদূরে, বাড়ীর আবর্জ্জনার অপবিত্র পাগাড় ছিল। গৌরাঙ্গ সেখানে দৌড়াইয়া যাইয়া, হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী তুলিয়া, তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন। তিনি বিলক্ষণরূপে জানিতেন যে, তাঁহার মাতা সেই অশুচি

স্থানে যাইবেন না। সুতরাং, এঁটো হাঁড়ীর উপর আসন করিয়া বসিয়া, তিনি নির্ভয়ে কথা কহিতে লাগিলেন। শচী তাঁহাকে শাসন করিবার নিমিত্ত, যখনই বড় বেশী ক্রোধে দৌড়াইয়া যাইতেন, তখনই তিনি ঐরূপ অশুচি স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইতেন। শচী আর উপায় না পাইয়া, তাঁহাকে, শুচি অশুচির পার্থক্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা কোন দিনও সফল হইত না। কারণ, তিনি গৌরাঙ্গের সহিত তর্কে পারিতেন না। শুচি ও অশুচির কথা-প্রসঙ্গে তর্ক উঠিলেই, গৌরাঙ্গ বলিতেন,—মা, জগদীশ্বর হরিত সকল স্থানেই আছেন। যেখানে তিনি আছেন, সেখানে আবার অশুচি কি? শচী, বালকের কথা শুনিয়া, বিস্ময়ে আবিষ্ট হইতেন। মনে মনে ভাবিতেন, এ ছেলে কি মানুষ?

"এক দিন শচী দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া;
ধরিবারে গেলা; পুত্র গেল পলাইয়া।
উচ্ছিষ্টের গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শচী কহে 'কেন তুমি অশুচি ছুঁইলা?
গঙ্গা স্নান কর যাই, অপবিত্র হৈলা।'
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান;
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল স্নান।"

এইরূপ হাঁড়ীর আসনে আশ্রয় লওয়া গৌরাঙ্গের অভ্যস্ত হইয়া উঠিল দেখিয়া, আজি শচী তর্ক না করিয়া গৌরাঙ্গকে কটু বলিতে লাগিলেন। শচী তাঁহার পুত্রের ব্যবহারে যেন একটুকু মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—

দেখ্ নিমাই, তোর আজিকার ব্যবহার আমার বড়ই অসহ্য হইয়াছে। তোর পিতা এমন মান্য গণ্য পণ্ডিত,—ব্রাহ্মণের মধ্যে পূজ্য ব্রাহ্মণ, এবং কুলীনের মধ্যে বড় কুলীন। তুই এমন লোকের ঘরে জন্মিয়া এইরূপ কুপথগামী হইতেছিস, ইহা আমার সহ্য হয় না। তুই বড়ই অবোধ, তোর মত সোনার পুতুলকে অমন অশুচি স্থানে দেখিলে, আমার বড়ই ঘৃণা হয়।

এই মর্ম্মান্তিক কথাগুলি গৌরাঙ্গেরও সহ্য হইল না। ঐ শুচি অশুচির বিচারে আজি তাঁহার ক্রোধ একটুকু বেশী বাড়িল। সম্মুখে এক খানি ইট ছিল। তিনি তাহাই হাতে তুলিয়া লইয়া, যেন ভয় দেখাইবার জন্য, মায়ের দিকে ছুড়িয়া মারিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেই ইট দৈবাৎ যাইয়া শচীর গায়ে পড়িল। শচী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন,—এবং গৌরাঙ্গও তখন, তাঁহার উদ্বেল হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহশীলতায়, অমনিই দৌড়াইয়া যাইয়া, মাতাকে জড়াইয়া ধরিলেন, ও মা বলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী মেয়েরা গৌরাঙ্গের সকরুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, ছুটিয়া আসিল। কেহ শচীর চোখে মুখে গঙ্গাজল দিল,—কেহ শচীর জন্য ডাব নারিকেল খুঁজিতে লাগিল। গৌরাঙ্গে তখন আর বালকতার কোন ভাব নাই। তিনি মাতাকে বিপন্ন দেখিয়া, মায়ের পদতলে পড়িয়া, লুটাইতেছিলেন। যখন শুনিলেন যে, নারিকেল জলের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, তখন তিনিই, সকলের আগে দৌড়াইয়া যাইয়া, দুটি ডাব নারি-

কেল লইয়া আসিলেন। ক্ষণকাল পরে শচীর সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি, নয়ন উন্মীলন করিয়া, প্রথমেই তাঁহার নয়নের মণি গৌরাঙ্গকে বুকে টানিয়া লইলেন, এবং গৌরাঙ্গও মায়ের গলা ধরিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন। যেখানে, প্রাণে খুব প্রগাঢ় স্নেহের প্রভাব থাকে, সেখানে, হঠাৎ এইরূপ ক্রোধের উদ্রেক, পরিণত বয়সেও, অসম্ভব নহে। কিন্তু এ জগতে, কিবা বড়, কিবা ছোট, সকলেই যেমন স্নেহের মনোমোহিনী দৈবী শক্তির নিকট—বিশেষতঃ মাতৃ-স্নেহের কাছে, পরাভব মানিয়াছে, মাতৃবৎসল গৌরাঙ্গও সেইরূপ মাতৃ-স্নেহের নিকট পরাভব মানিলেন, এবং মায়ের বুকের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়া—মাতাকে সেই সময়ে নয়ন-জলে স্নান করাইয়া, অপূর্ব্ব স্নেহপূর্ণতার পরিচয় দিলেন।

মেঃ ডব্লিউ ব্রেণ্যাণ্ড কৃত হিন্দু জ্যোতিষ।

উদার-চিত্ত ও আত্মোন্নত ডব্লিউ ব্রেণ্যাণ্ড বহুকাল ঢাকা কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল ছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সনের জানুয়ারি মাসে, পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়া বিলাত যান; এবং ২৭ বৎসর পেন্‌সন ভোগ করিয়া, ১৯০০ সনের জানুয়ারি মাসে, পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রেণ্যাণ্ড সাহেব কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না। কিন্তু নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে গণিতশাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি ঢাকা কলেজে থাকা সময়ে, গণিতশাস্ত্রে, এম্ এ, পরীক্ষার পাঠ্য গ্রন্থ সমূহে, ছাত্রদিগকে অনায়াসে শিক্ষাদান করিতে পারিতেন। এমন কি, খ্যাতনামা র‍্যাঙ্গ্‌লার মেঃ সি বি ক্লার্কও ব্রেণ্যাণ্ড সাহেবকে ভাল গণিতজ্ঞ প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিয়া গিয়াছেন। ঢাকায় অদ্যাপি তাঁহার অনেক প্রিয়ছাত্র বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার মন, প্রাণ ও হৃদয়, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্তও যেন, গণিততত্ত্বে ডুবিয়া গণিতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তখন ঢাকার শিক্ষালোক-প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে, উচ্চগণিত আর ব্রেণ্যাণ্ড যেন এক কথা হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি একবার ঢাকায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Right angle বা সমকোণ। বক্তৃতার নামে ক্ষেত্রতত্ত্বের সম্পর্ক থাকিলেও, বক্তৃতার লক্ষ্য ক্ষেত্রতত্ত্বের সঙ্কুচিত-ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি, বক্তৃতায় সমকোণের পর সমকোণের অবতারণা করিয়া, এই বিশ্বসংসারকে সমকোণময় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। ব্রেণ্যাণ্ডের

সমকোণ, পৃথিবী ছাড়িয়া সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি অতিক্রম করিয়াছিল এবং অবশেষে ধ্রুবলোকেরও বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর অনন্তদেবের পাদপদ্মে প্রণত হইয়াছিল। বিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। এখনও ঢাকার অনেক শিক্ষিত বৃদ্ধ ব্রেণ্যাণ্ডের এই বক্তৃতার বিষয় প্রীতির সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন।

তিনি যে সময়ে ভারতবর্ষে ছিলেন, সেই সময়েই, হিন্দু জ্যোতিষের সবিশেষ চর্চ্চা করেন। পেন্‌সন গ্রহণের পর হিন্দু জ্যোতিষ (Hindu Astronomy) নামক বিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, বহুকাল ভারতবর্ষে বাস করা নিবন্ধন, হিন্দুদিগের গণিত সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন পুস্তক আছে, তাঁহার তাহা অধ্যয়ন করিতে আগ্রহ জন্মে। কিন্তু সরকারী কার্য্যের বাধকতা হেতু পঠিত বিষয় সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাঁহার এক প্রবন্ধ রয়েল্ সোসাইটিতে দেখিয়া, পূর্ব্বকার কতিপয় ছাত্র, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে, বিশেষ আগ্রহের সহিত, তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তিনি নিজেও বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দুগণ তাঁহাদিগের সাহিত্য ও গণিত সম্পর্কে ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট যথোচিত প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই। এই হেতু তিনি পূর্ব্বালোচিত বিষয়গুলি পুনঃ সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ হন এবং এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্রেণ্যাণ্ডকৃত এই হিন্দু জ্যোতিষ নামক গ্রন্থের সার মর্ম্ম পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য। স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রেণ্যাণ্ডের ভাব সকল বিশদরূপে প্রকাশ করিতে আশা করা, আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। যাঁহারা মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ত্রুটিতে উপহাস না করিয়া বরং বিষয় অতি জটিল ও দুরবগাহ বিবেচনায় আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিজ্ঞজনের এই উদারতার উপর নির্ভর করিয়াই, আমি এই সাহসিক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলাম।

মূল বিষয় অবতারণা করার পূর্ব্বে, গোলক ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কএকটি কথা বলিয়া লইলে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, এস্থলে সর্ব্বাগ্রে তাহাই বর্ণিত হইল। বলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার বস্তুকে গোলক বলা যায়। গোলকের মধ্যে এমন এক বিন্দু থাকে যে, তাহা হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত যত রেখা টানা যায়, তাহাদের সকলই পরস্পর সমান হয়। এই সকল রেখাকে গোলকের ব্যাসার্দ্ধ ও সেই বিন্দুকে গোলকের কেন্দ্র বলা যায়। কোন সমতল দ্বারা গোলক অবচ্ছিন্ন হইলে, বৃত্ত উৎপন্ন হয়। এরূপ উৎপন্ন বৃত্তের কেন্দ্র ও গোলকের কেন্দ্র এক হইলে, অর্থাৎ অবচ্ছেদক সমতল গোলকের কেন্দ্র দিয়া গেলে, সেই সকল বৃত্তকে বৃহদ্বৃত্ত বলা যায়। কেন্দ্র হইতে কোন বৃহদ্বৃত্তের উপর লম্ব উত্তোলন করিলে, সেই লম্ব যে দুই বিন্দুতে গোলক

স্পর্শ করে, ঐ দুই বিন্দুকে উক্ত বৃহদ্বৃত্তের ধ্রুব বলে।

পৃথিবী যদিও সম্পূর্ণ গোল নহে,—উহার উত্তর দক্ষিণ দিক কিঞ্চিৎ চাপা, তথাপি উহার আয়তনের তুলনায়, উক্ত চাপা এবং পর্ব্বতাদির উচ্ছ্বাস অতি কম বলিয়া, পৃথিবীকে একটি গোলক মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে উহার যে ব্যাস তাহার পরিমাণ প্রায় ৮০০০ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণ দিকে উহার যে ব্যাস তাহা তদপেক্ষা প্রায় ২৬ মাইল কম। পূর্ব্ব পশ্চিম দিকস্থ ব্যাসের মধ্য দিয়া কোন সমতল দ্বারা যদি ভূগোলককে সমদ্বিখণ্ডিত মনে করা যায়, তবে যে বৃহদ্বৃত্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিষুবদ্বৃত্ত বা নিরক্ষবৃত্ত বলে। বিষুবদ্বৃত্তের উপর লম্বভাবাপন্ন রেখা অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ দিকস্থ ব্যাসকে অক্ষদণ্ড বলা যায়। পৃথিবী এই অক্ষদণ্ডের উপর পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতেছে। অক্ষদণ্ড যে দুই বিন্দুতে পৃথিবীর উপরিভাগ স্পর্শ করে, তাহাদিগকে ক্রমে উত্তর ধ্রুব বা সুমেরু এবং দক্ষিণ ধ্রুব বা কুমেরু বলা যায়। সুমেরু ও কুমেরুর মধ্য দিয়া বিষুবদ্বৃত্তের উপর লম্বভাবে যে সকল বৃহদ্বৃত্ত কল্পনা করা যায়, তাহাদিগকে যাম্যোত্তর বৃত্ত বলে।

কোন বিস্তৃত মাঠে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলে, নভোমণ্ডলের দৃশ্য একটি অসীম অর্দ্ধগোলকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহার অপরার্দ্ধ যে নিম্নদিকে অবস্থিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই গোলাকার অসীম নভোমণ্ডলকে ভগোল বলে। মাঠের ভূতল উহার একটি বৃহদ্বৃত্ত, ইহারই নাম দৃশ্যমান ক্ষিতিজ বা চক্রবাল বৃত্ত। দণ্ডায়মান ব্যক্তির মস্তকোপরি নভোমণ্ডলে যে বিন্দু, তাহা উহার ঊর্দ্ধধ্রুব এবং নিম্ন দিকে যে বিন্দু, তাহা উহার অধোধ্রুব। ইহাদিগকে ক্রমে খমধ্য ও অধর বলা যায়।

দর্শনের সময়, যদি পরিষ্কার রাত্রি হয়, তবে দেখা যাইবে যে, উক্ত ভগোলকের উপরি ভাগে থাকিয়া বহু তারকারাজি চক্‌চক্‌ করিতেছে। মনুষ্যের চিত্ত-আকর্ষণ করার জন্যই যেন ভগবান্ এই গোলকটিকে অসংখ্য হীরক-খণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল নক্ষত্র পুঞ্জদ্বারা খচিত করিয়া রাখিয়াছেন। দেখা যায় যে, ইহাদিগের সকলেই পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া বিষুবদ্বৃত্তের সমান্তরাল বৃত্ত-পথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছে। কিন্তু ইহাতে ইহাদিগের অনেকেরই পরস্পর যে আপেক্ষিক অবস্থান আছে, তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। ইহা দেখিয়া আপাততঃ বোধ হয়, পৃথিবীর সহিত আমরা এক স্থানেই অবস্থিত আছি এবং একবারে সমস্ত দেখিতে পারি না বলিয়াই, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর আশ্চর্য্য কৌশলদ্বারা নক্ষত্ররাজির সহিত নভোমণ্ডলকে আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহার কোথায় কি আছে, তাহা আমাদিগকে দেখাইতেছেন।

আমরা দেখিতে পাই যে, নক্ষত্রগণ পূর্ব্বদিকে ক্ষিতিজবৃত্তের উপরে উঠিয়া, ক্রমে বৃত্তাকার পথে, উচ্চগগনে আসে এবং পরে

নিম্নাভিমুখে গমন করিয়া, পশ্চিম দিকে ক্ষিতিজবৃত্তের নীচে যাইয়া অদৃশ্য হয়। প্রত্যেক নক্ষত্রকে, এক দিন উদিত হওয়ার সময় হইতে, ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড পরে, আবার উদিত হইতে দেখা যায়। উক্তরূপে আবর্ত্তিত হইয়াও যে সকল নক্ষত্রের পরস্পর আপেক্ষিক অবস্থানের কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, তাহাদিগকে স্থিরনক্ষত্র বলা যায়।

সূর্য্য।—সূর্য্যকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উহাও ঠিক স্থির নক্ষত্রের ন্যায় পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া বৃত্তাকার পথে উচ্চগগনে উঠিয়া থাকে; এবং পরে নিম্নাভিমুখে গমন করিয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত হয়। সূর্য্য সম্বন্ধে এই পার্থক্য দেখা যায় যে, নক্ষত্রগণের এক উদয় হইতে পরবর্ত্তী উদয় পর্য্যন্ত কাল ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ড, কিন্তু সূর্য্যের পক্ষে উহার পরিমাণ ঠিক ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রায় ৪ মিনিট অধিক। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখার ইচ্ছা হইলে, সহজেই তাহা হইতে পারে। কোন ভারি বস্তু নীচে সংলগ্ন করিয়া দুই খণ্ড সূত্র লম্বভাবে ঝুলাইয়া রাখিবে। সূর্য্য যে সময়ে, সেই সূত্রদ্বয়ের সমরেখাতে আসে, তাহা উপর্য্যুপরি দুই দিন লক্ষ্য করিবে। ইহা করিলে, এই দুই সময়ের অন্তর ২৪ ঘণ্টা পাওয়া যাইবে। নক্ষত্র সম্বন্ধে এইরূপ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা ২৪ ঘণ্টা হইতে প্রায় ৪ মিনিট কম হয়। এরূপ দিন দিন ৪ মিনিট হিসাবে কমিয়া ১৫ দিনে প্রায় এক ঘণ্টার পার্থক্য হইয়া থাকে। এই পার্থক্য ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরে ঠিক ২৪ ঘণ্টার অন্তর হয়।

ইহা আর এক প্রকারেও পরীক্ষা করা যাইতে পারে। সূর্য্যাস্তের সময়ে, পশ্চিম গগনে কএকটি নক্ষত্র দেখিয়া, উহারা সূর্য্যাস্তের কত সময় পরে অস্তমিত হয়, তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। ১৫ দিন পরে আবার সেই সকল নক্ষত্রকে সূর্য্যাস্তের পরে যে সময়ে অস্তমিত হইতে দেখা যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় এক ঘণ্টা কম হইবে। এই ভাবে উক্ত সময় কমিতে কমিতে অবশেষে সূর্য্য ও সেই সকল নক্ষত্র একই সময়ে অস্তমিত হইবে। ইহার ১৫ দিন পরে, সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পূর্ব্বগগনে লক্ষ্য করিলে সেই নক্ষত্রগুলিকে সূর্য্যের পূর্ব্বেই উদিত হইতে দেখা যাইবে।

ইহা দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায় যে, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া, উক্ত তারাগণের নিকটবর্ত্তী হয়; এবং ক্রমে উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সূর্য্যের গতি দুই প্রকার।

১। অন্যান্য নক্ষত্রের ন্যায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে সাধারণ দৈনিক গতি।

২। স্থির নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে, অল্প পরিমাণে বার্ষিক গতি।

সূর্য্যের এই বার্ষিক গতি নিবন্ধন, রাত্রি কালে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নভোমণ্ডলের দৃশ্য সর্ব্বদা একরূপ লক্ষিত হয় না, কিন্তু

একই নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৎসরান্তে পুনঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃশ্য নয়ন-পথে উপস্থিত হইয়া থাকে। যথা, প্রত্যেক মাঘ মাসে, সন্ধ্যার সময়, কৃত্তিকা, রোহিণী, কালপুরুষ, লুব্ধক ও অগস্ত্য গগনমণ্ডল সুশোভিত করে, কিন্তু শ্রাবণ মাসে সন্ধ্যার সময়, উক্ত সকল নক্ষত্রই চক্রকালের নীচে থাকে এবং দেখা যায় না। সেই সময়ে উহার বিপরীত দিকে অবস্থিত চিত্রা, স্বাতী, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি নক্ষত্র আকাশে উদিত থাকে।

বার্ষিক গতি হেতু নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া সূর্য্য যে পথে ভ্রমণ করে, তাহাকে সৌরকক্ষা বা রাশিচক্র বলা যায়। এই রাশিচক্র ভগোলের একটি বৃহদ্বৃত্ত। বিষুবদ্বৃত্তের সহিত উহার অবনতি ২৩ অংশ ২৮ কলা। রাশিচক্র ও বিষুবদ্বৃত্ত যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছিন্ন হয়, উহাদিগকে ক্রান্তিপাত বিন্দু বলা যায়। এই ক্রান্তিপাত বিন্দুদ্বয় প্রতিবৎসর প্রায় ৫০ বিকলা করিয়া রাশিচক্রের উপর পশ্চিম দিকে সরিয়া থাকে। মেষের প্রারম্ভ বিন্দু হইতে এইক্ষণ উহা ২২ অংশেরও অধিক সরিয়াছে; এবং ইহাকেই অয়নাংশ বলা যায়। এই গতিবশতঃই আজ কাল বিষুবৎসংক্রান্তি দিনে দিবা রাত্রি সমান না হইয়া, ৮ই চৈত্র এবং ৮ই আশ্বিন দিবা রাত্রি সমান হইয়া থাকে।

কেন্দ্র হইতে রাশিচক্রের উপর লম্বভাবাপন্ন রেখা যে দুই বিন্দুতে ভগোলস্পর্শ করিয়াছে, উহাদিগকে কদম্বক বলে। উত্তর কদম্বক সুমেরু হইতে এবং দক্ষিণ কদম্বক কুমেরু হইতে ২৩ অংশ ২৮ কলা দূরে অবস্থিত। কদম্বকদ্বয় স্থির বিন্দু, বিষুবদ্ধ্রুব অর্থাৎ সুমেরু ও কুমেরু অতি মন্দ গতিতে বৎসর ৫০ বিকলা করিয়া কদম্বকের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পশ্চিমাভিমুখ আবর্ত্তনের পূর্ণ কাল প্রায় ২৬০০০ বৎসর। এইক্ষণ আমরা যে নক্ষত্রকে ধ্রুবনক্ষত্র বলি এবং যাহার চতুর্দ্দিকে উত্তরদিকস্থ নক্ষত্রদিগকে প্রতি দিন আবর্ত্তিত হইতে দেখি, কএক হাজার বৎসর পরে, আর সেইরূপ থাকিবে না। বর্ত্তমান সময় হইতে ৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে উরগ (Draconis) নামক এবং ১০ হাজার বৎসর পরে, অভিজিৎ (Lyrea) নামক নক্ষত্র পৃথিবীর পক্ষে ধ্রুবনক্ষত্র ছিল এবং হইবে।

২১শে মার্চ্চ এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে যখন সূর্য্য ক্রান্তিপাত বিন্দুতে গমন করে, তখন পৃথিবীর সকল স্থানেই দিবা রাত্রি সমান হয়। উহার প্রথমটিকে সায়ন মহাবিষুবৎ এবং অপরটিকে সায়ন জল-বিষুবৎ বলে। মহাবিষুবৎ হইতে জল-বিষুবৎ পর্য্যন্ত রাশিচক্রের যে অর্দ্ধাংশ তাহা বিষুবদ্বৃত্তের উত্তরে এবং জলবিষুবৎ হইতে মহাবিষুবৎ পর্য্যন্ত উহার যে অর্দ্ধাংশ তাহা বিষুবদ্বৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত। সুতরাং ২১শে মার্চ্চ অর্থাৎ যে দিন দিবা রাত্রি সমান হয়, সেই দিন হইতে, সূর্য্য ক্রমে উত্তর দিকে সরিয়া ২২শে জুন চরম উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হয় এবং সেই দিন পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধবাসিদিগের পক্ষে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও রাত্রিমান সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। দক্ষিণ গোলার্দ্ধবাসিদিগের পক্ষে ইহার বিপরীত,—অর্থাৎ দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা কম ও রাত্রিমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। এই দিন হইতে সূর্য্য দক্ষিণাভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে অগ্রসর হইয়া, ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে জল বিষুবদ্বিন্দুতে উপস্থিত হয়। সেই দিন আবার দিবা রাত্রির মান সর্ব্বত্র সমান হয়। তৎপরে সূর্য্য যতই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উত্তর গোলার্দ্ধবাসিদিগের পক্ষে দিবামানের ক্ষয় এবং রাত্রিমানের বৃদ্ধি ঘটে। ২২শে ডিসেম্বর, যখন সূর্য্য চরম দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত হয়, তখন উহাদিগের পক্ষে রাত্রিমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং দিবামান সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। সেই দিন হইতে সূর্য্য উত্তরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করে এবং ২১শে মার্চ্চ তারিখে পুনঃ মহা বিষুবদ্বিন্দুতে উপস্থিত হয়। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্য যে চরম দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরাভিমুখে গমন আরম্ভ করে, উহাকে উত্তরায়ণ এবং ২২শে জুন তারিখে যে চরম উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন আরম্ভ করে, উহাকে দক্ষিণায়ন বলা যায়। এই অয়ন দ্বয়ের মধ্য দিয়া যে যাম্যোত্তরবৃত্ত, তাহার নাম অয়নান্ত রেখা। এই অয়নান্ত রেখার উপরে মেরুদ্বয় (সুমেরু ও কুমেরু) কদম্বকদ্বয় এবং অয়নদ্বয় অবস্থিত।

চন্দ্র—চন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, চন্দ্রও, স্থির নক্ষত্রদিগের ন্যায়, পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত হয়। এই সাধারণ দৈনিক গতি ভিন্ন সূর্য্যের ন্যায় নক্ষত্রদিগের মধ্য দিয়া চন্দ্রেরও পূর্ব্বাভিমুখে গতি লক্ষিত হয়। চন্দ্রের এই গতি এত দ্রুত যে, চন্দ্র এক দিনে যতদূর পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়, সূর্য্যের ততদূর যাইতে, প্রায় ১৩ দিনের আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে, সূর্য্য এক বৎসরে সমস্ত রাশিচক্রকে একবার পরিভ্রমণ করে। চন্দ্র ২৭ দিন ৮ ঘণ্টাতেই সেইরূপ একবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। চন্দ্র যে পথে ভ্রমণ করে, তাহা সৌর-কক্ষার সহিত এক না হইলেও, উহার নিকটবর্ত্তী। সৌর-কক্ষার সহিত চন্দ্র-কক্ষার অবনতি মাত্র ৫ অংশ। সৌর-কক্ষা ও চন্দ্র-কক্ষা যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছিন্ন হয়, তাহাদিগকে পাত বিন্দু বলে। যে পাত বিন্দু অতিক্রম করিয়া, চন্দ্র রাশি চক্রের উত্তর দিকে যায়, তাহাকে রাহু এবং অপরটিকে অর্থাৎ যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া চন্দ্র রাশি চক্রের দক্ষিণ দিকে যায়, তাহাকে কেতু বলে। ক্রান্তিপাতের ন্যায় রাহু কেতুরও পশ্চিমাভিমুখে গতি লক্ষিত হয়, এবং ১৯ বৎসরে এক এক বার সমস্ত রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সূর্য্য যেমন স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল, চন্দ্রের সেইরূপ স্বকীয় তেজ নাই; কাজেই চন্দ্রের যে অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহার যে পরিমাণ সূর্য্যালোকে আলোকিত, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। এজন্যই অমাবস্যার সময়, চন্দ্র ও সূর্য্য যখন পৃথিবী হইতে এক দিকে এবং চন্দ্র সূর্য্যের নীচে থাকে, তখন চন্দ্রকে আমরা দেখিতে পাই

না। পূর্ণিমার সময়, চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবী হইতে বিপরীত দিকে থাকা নিবন্ধন, চন্দ্রের যে অর্দ্ধেক সূর্য্যালোকে আলোকিত তাহা সম্পূর্ণই পৃথিবীর দিকে থাকে, এবং আমরা পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া থাকি। সুতরাং অমাবস্যা হইতে, চন্দ্রকলাক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, পূর্ণিমার দিন চন্দ্র পূর্ণাবস্থাতে দৃষ্ট হয়, এবং পূর্ণিমা হইতে চন্দ্রকলা ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অমাবস্যার দিন চন্দ্র সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়।

গ্রহ।—স্থির নক্ষত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র ভিন্ন আরও এক প্রকার বস্তু নভোমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহারাও পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ঊর্দ্ধ গগনে উঠে এবং পরে নিম্নাভিমুখে যাইয়া পশ্চিমদিকে অস্তমিত হয়। এই সাধারণ দৈনিক গতি ভিন্ন চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, ইহাদিগেরও স্থির নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া এক প্রকার গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। এই গতি সর্ব্বদা এক রকম দেখা যায় না। অধিকাংশ সময়ই ইহারা, চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়, পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে। কিন্তু, কখন কখন পশ্চিম দিকেও চলিতে দেখা যায়। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইহাদিগকে গ্রহ বলে। প্রাচীনকাল হইতে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটি গ্রহই প্রসিদ্ধ। অধুনা বরুণ ও ইন্দ্র নামক দুইটি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ধূমকেতু ও উল্কা সময় সময় গগনমার্গে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

শ্রীরাজকুমার সেন এম্ এ।

স্বামী না ত কি ?

দুই সখীর কথা।

নবন্যাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযূ ও সুভাষিণীর অনেক কথা, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে, আমিই কহিয়াছি। এখন আমাকে প্রায়শঃ কিছুই কহিতে হইবে না। সরযূ সর্ব্বদাই সুভার কাছে অতি দীর্ঘ পত্র লিখিত। যে অল্প লোককে ভাল বাসে, তাহার ভালবাসা বড় গাঢ়। ভালবাসা আর নদী, এই দুইয়ে এক-টুকু সাদৃশ্য আছে। নদীর পরিসর যত সঙ্কীর্ণ, স্রোত তত গভীর। ভালবাসারও প্রসার-ক্ষেত্র যত অল্পায়ত, আবেগ তত অন্তঃস্পর্শী। সরযূর সমান-বয়স্কাদিগের মধ্যে আর কেহই তাহার ভালবাসার তেমন ভাগী ছিল না। তাই সে সুভাকে অত্যন্ত বেশী ভালবাসিত; এবং তাহার প্রাণের কথা

তাই রমণী-জীবনের সারোৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রধান সম্পদ। সে এই জন্য—তুমি বিশ্বাস করিবে কি—নব্য বঙ্গের প্রচলিত নারীশিক্ষার বড় বিরোধী। আমি যেমন এখনকার ছালুন-চাখা লেখা-পড়া শিক্ষাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সেও সেইরূপ, এই শ্রেণীর নামমাত্র শিক্ষাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। সে বলে যে, নারী-জীবনের প্রকৃত উন্নতির পক্ষে, শিক্ষা ও সভ্যতা-ভব্যতার সর্ব্বপ্রকার শোভাসম্পদ এক দিকে, এবং হৃদয় মন, চাল চলন, ও চরিত্রের পবিত্রতা আর এক দিকে। যে রমণী, শুধু দৃষ্টির পবিত্রতাতেই, পুরুষকে পবিত্রতার উচ্চতর আদর্শে আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে, সে রমণীর বিদ্যাশিক্ষা, তাহার মতে, বিষভক্ষণ,—আর সভ্যতার বহিরাবরণ ঘৃণাজনক বিড়ম্বন! মনো ইহা মুক্তকণ্ঠে বলে, এবং আমাকেও ইহা ভাল করিয়া বুঝাইতে যত্ন করে যে, নারীজাতির তাদৃক্ বিড়ম্বিত শিক্ষার তুলনায়, পশু-জীবনও অধিকতর প্রার্থনীয়। আমি কথাটা স্বীকার করি; কিন্তু স্বীকার করিয়াও সম্পূর্ণ স্বীকার করি না। তাহার সহিত সমস্তটা পথ যাইতে সম্মত হই না। পবিত্রতা আমারও পরম উপাস্য। যদি পবিত্রতার উপাসনা করিতেই না শিখিতাম, তাহা হইলে, এত দিনে, গলায় দড়ী দিয়া মরিয়া যাইতাম। কিন্তু রমণী পবিত্র রহিবে আপনার দিকে চাহিয়া,—আপনার আত্মার উচ্চতর অভিমানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া। পরের দিকে চাহিয়া আবার পবিত্রতা কি? পুরুষ যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়, সে আমাদিগের চিত্ত ও চরিত্র পাঠ করিয়া পবিত্রতা শিক্ষা করিবে। পুরুষ আবার আমাদিগকে পবিত্রতা বিষয়ে উপদেশ দিতে আসিবে কেন?

মনোর ধর্ম্ম-বিষয়ক মত ও বিশ্বাস আমার নিকট কেমন এক প্রকার খিচুড়ির মত বোধ হয়। কিন্তু খিচুড়িটুকু সুস্বাদু। আমি তোমার কাছে আজি সে খিচুড়ির কথা না লিখিয়া, আমার হৃদয়ের সেই বহু দিনের আন্দোলিত নিগূঢ় তত্ত্ব-কথা সম্পর্কে দুইএকটি প্রশ্ন করিব। আমার দিব্য, তুমি আমার পত্র কাহাকেও দেখাইবে না। ললিতকেও না।* কারণ, আমি যে সকল কথা লিখিতে যাইতেছি, তাহা বঙ্গদেশের অর্দ্ধশিক্ষিত নাটু'কে মেয়ে কিংবা নাটু'কে ছেলেদের শ্রোতব্য কথা নহে। তুমি সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সুগভীর চিন্তাশীল, এবং—এবং—এবং—আমার দ্বিতীয় প্রাণ। সুতরাং কথাগুলি তোমাকেই বলিব, এবং তোমার উত্তর শুনিবার জন্য লালায়িত রহিব।

কথাটার কতক ত তুমি জান। কথাটার সারোদ্ধার এই,—ললিত তোমার কি? মনোর সহিত এক্ষণ আমার যে সম্পর্ক হইল, —তাহার সহিত প্রাণের ভালবাসায়, অথবা ভক্তি ও ভালবাসার সহস্র সূত্রে, যে ভাবে, চিরজীবনের তরে, জড়িত-গড়িত হইলাম, তাহাতে, তাহাকে আমার কি মনে করিতে হইবে?—স্বামী?

* এই গোপনীয় পত্রগুলি কিরূপে বৃদ্ধ জ্ঞানানন্দের হস্তগত হইয়াছে, তাহা পাঠককে আমরা জানাইতে ইচ্ছা করি না। সঃ

স্বামী শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? আমি ত ভাই তোমার মত সংস্কৃত জানি না। তোমার কথা দূরে থাকুক, মনোর মতও জানি না। আমি এল্ এ পরীক্ষার জন্য, সামান্য যাহা কিছু পড়িয়াছিলাম, সংস্কৃতে তাহাই আমার পুঁজি; এবং আমি সেই পুঁজিটুকুর সাহায্যে, সমস্ত কথারই অর্থ ও তাৎপর্য্য কতকটা বুঝি। 'স্ব' শব্দের অর্থ কি? তোমার সকল অভিধানেই দেখি এক অর্থ। 'স্ব' শব্দের অর্থ ধন। 'স্ব' শব্দের অর্থ সম্পত্তি। মনোর সহিত আমার বিবাহ হইল বলিয়া, আমি কি বিবাহ-সম্পর্কিত প্রতিজ্ঞা-পাঠের পরক্ষণ হইতেই তাহার সম্পত্তি হইলাম? আমার পিতৃদেব তাহাকে ঘটী বাটী, ঘড়া গাড়ু, ঘড়ি চেন, এবং চেয়ার টেবেল প্রভৃতি বহু বস্তুই ত দান করিয়াছেন! আমিও কি তবে সেই দানসামগ্রীরই আর একটা বস্তু হইতে চলিলাম। ছি! ভাই সুভা, মনুষ্যের পক্ষে, আত্ম-সম্পর্কে, এমন কথা মনন করাও কি মহা-পাতক নহে? আমি কি ঘড়ি, না চেন? —না গোহালের একটা গোরু, অথবা আস্তা-বলের একটা ঘোটকী! মনো তাহার ঘড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, অথবা ইচ্ছা হইলে, বাজারে বিক্রয় করিয়া, দুটি পয়সা সংগ্রহ করিতে পারে। সে কি আমার হাত পা খানিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে, অথবা আমাকে ঘড়ি ও চেইনের মত, একটা বস্তু মাত্র মনে করিয়া, মুহূর্ত্তকালও মনুষ্যকে মুখ দেখাইতে পারে? আমি আবার বলিতেছি, ছি!

বস্তুতঃ, ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা আপনাকে আপনি পরের বস্তু মনে করিয়া, ঘড়ি চেইন ও ঘটী বাটী প্রভৃতি বস্তুর ন্যায়, আত্ম-সত্তা-শূন্য অকর্ম্মণ্য নির্জ্জীব অবস্থায়, জীবন যাপন করে। আর ততোধিক ধিক্কার তাহাদিগকে, যাহারা পরের আত্মাকে পায়ের তলে পেষণ করিয়া, নর-নারীর মনুষ্যোচিত স্বাধীনতাকে একবারে বিনাশ করিয়া ফেলে। ভাই, এ 'স্বামী' শব্দ কোন্ সময়ের সৃষ্টি? এই কদর্য্য শব্দ যে সময়ে ভাষার কণ্ঠে প্রথম গ্রথিত হয়, নারী তখন, অবশ্যই, কতকটা পশু পক্ষীর অবস্থাপন্ন। পিঞ্জরের পায়রা পায়ে ঘুঙুর পরিয়া, পিঞ্জরে থাকিয়া, কুঁম কুঁম করিয়া শব্দ করিত, এবং তুড়ি দিলে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, উড়িয়া উড়িয়া, সেই এক প্রকার পারাবত-নৃত্যের রঙ্গ-প্রদর্শন দ্বারা, প্রতিপালকের পরিতোষ জন্মাইত। শ্মশান-কাষ্ঠ-সদৃশ, শুষ্ক-মূর্ত্তি সাতাত্তু'রে বৃদ্ধ, সাত বৎসরের একটি সোনার লতারে পায়ে বান্ধিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিত; আর সমাজের পাঁচ জনে, ঐ কচি শিশুকে, সেই কঙ্কাল-কঠিন শ্মশান-কাষ্ঠের উপরই স্বামী-জ্ঞানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে শিক্ষা দিত! একটা বুভুক্ষিত বিয়েকরা— একটা হাড্ডিসার হাড়গিলা, এক শ অবলার ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, খাতায় তাহাদিগের নাম লিখিত; আর দেশশুদ্ধ সমস্ত লোক, এহেন গুণের নিধিকে স্বামীজ্ঞানে পূজা করাইবার জন্য, একত্র মিলিয়া চেঁচাইত। এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডের উপর এখন বড় ছোট সকলেরই

অতি গভীর ঘৃণা হইয়াছে বটে। কিন্তু তখনকার সেই স্বামী শব্দের উপর সুশিক্ষিত মাত্রেরই অদ্যাপি তেমন ঘৃণা হইতেছে না কেন? সেই পুরাতন কালের, কালোপযোগি কুৎসিত-ভাব-প্রকাশক, স্বামী শব্দ, এখনকার এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গৌরবের কালেও, তেমনই চলিত রহিবে না কি? ভাল, সুভা, তুমি মিলের Subjection of Woman * আর থিয়োডোর ষ্টান্টনের সংকলিত The Woman Question in Europe † পড়িয়াছ কি? তুমি না পড়িয়াছ কি, তা ত জানি না। সারা দিন উনুনে আগুন যোগাও, আর আত্মায়ও ভোজ্য যোগাও। এই সৃষ্টিছাড়া শক্তি লইয়া তুমিই সংসারে আসিয়াছিলে। তথাপি বলি, যদি এই পুস্তক দুখানি না পড়িয়া থাক, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই একবার পড়িবে।

পৃথিবীর কোন এক মহাত্মা ঐরূপ এক খানি পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,—"Woman, in human society, is either a doll or a drudge।" আমি বাঙ্গালায় এই বাক্যটির ভাল অনুবাদ করিতে পারিব না। তুমি পারিবে। যদি আমায় অনুবাদ করিতে বল, তাহা হইলে বলিব,—নারী এই মানব-সমাজের কোন স্থানে খেলানার পুতুল,—কোন স্থানে কঠোর-শ্রম-ক্ষুণ্ণা পরিচারিকা। এস, আমরা আজ পরিচারিকাদিগের অবস্থা-সম্পর্কেই একটু আলোচনা করি। তুমি অবশ্যই পড়িয়াছ যে, নারী এই পৃথিবীর কোন কোন দেশে এখনও ক্ষেতে কৃষাণের কাজ করে,—বনে যাইয়া কাঠ কাটে, এবং বাড়ীতে হাতে কুড়াল, কোদাল, অথবা ঝাঁটা লইয়া, মুটের কাজ, মজুরের কাজ, অথবা মেথরের কাজও সম্পাদন করিয়া থাকে? কিন্তু ভাই, তুমি ইহা জান কি যে, এই পৃথিবীতে এমনও অনেক স্থান আছে, যেখানে নারী, এ সকল উচ্চতর কার্য্যে অধিকার না পাইয়া, ক্ষেতে ও মাঠে, ঘোড়া ও গোরুর কাজ করিতেও বাধ্য হইয়া থাকে? বাড়ীর গোরুগুলি খাইতে না পাইয়া দুর্ব্বল হইয়াছে। ক্ষেতের কৃষি চলিবে কিসে? চলিবার আর বাধা কি? বাড়ীর মেয়েগুলিরে হালে যুড়িয়া দেও। যদি কোন অভাগী, হালের কাজে, কোন অংশে, অবহেলা করে, পিছন হইতে চাবুক লাগাও, অথবা পাচন-বাড়ীর দ্বারা তাড়না কর। হতভাগিনীদিগের পৃষ্ঠদেশ সে চাবুক অথবা পাচন-বাড়ীর পুনঃ পুনঃ আঘাতে ক্ষত বিক্ষত অথবা রুধির-ধারায় পরিপ্লুত হউক, তাহাতে আসে যায় কি? এবার কিছু বেশী ফসল হওয়া চাই। যদি সেই ফসলের অনুরোধে উহাদিগকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া, সে কাটা মাংস আগুনে পোড়াইয়া, মাটীতে সার দিতে হয়, তাহাও সৎকার্য্য। কেন না তাহাতে সংসারের উন্নতি হইবে, ঘরে দুটি পয়সা বেশী আসিবে। এমন অবস্থায়, দশ

* 'নারীজাতির অধীনতা' বিষয়ে, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ।

† 'ইয়োরোপে নারীজাতির অবস্থা' বিষয়ে সুপরিচিত পুস্তক। এই পুস্তক পৃথ্বীপূজ্যা পণ্ডিতা ফ্রান্সেস কব্ কর্ত্তৃক লিখিত একটি ভূমিকা দ্বারা অলঙ্কৃত।

বিশটা স্ত্রীলোক, পুরুষের প্রভুত্ব-সামর্থ্যে নিগৃহীত ও নিষ্পেষিত হইয়া, পঁচিয়া গলিয়া মরিয়া গেলে,তাহাতে কার কি অনিষ্ট হইবে? হা জগদীশ্বর! তোমার বজ্র কোথায়? তোমার বৈদ্যুতী শক্তি কোথায়? তোমার সমুদ্রের উদ্বেল-তরঙ্গ, সময়ে সময়ে পৃথিবীর অনেক স্থানকে ধোয়াইয়া লইয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর যে সকল স্থান নারী-নিপীড়নে এরূপ নিকৃষ্টতম অবস্থায় পঁহুছিয়াছে, সে সকল স্থানকে একবারে, চিরকালের তরে, গ্রাস করিয়া ফেল না কেন?

ভাই সুভা,—আমার প্রাণাধিকা—আজি তোমার কাছে, আমার প্রাণের আর একটা গভীরতম কথা কহিব। আমাদিগের পরিচিত আত্মীয়ের মধ্যে অনেক মূর্খ আমাকে নাস্তিক মনে করে; আর বলে যে, আমি বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইয়া নাস্তিক হইয়াছি। আমি যখন এ সকল কথা কানে শুনি, তখন আমি সত্যই চিত্তে একটুকু বিচলিত হই। প্রাণে বড় ভয়ঙ্কর আঘাত পাই। তখন আমার ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবী বিদীর্ণ হউক, আমি উহাতে প্রবেশ করিয়া, জন্মের মত বিলুপ্ত হইয়া যাই। ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা বিজ্ঞানের উপর এ কলঙ্ক আরোপণ করে। বিজ্ঞানে নাস্তিকতা! যাহারা বিজ্ঞানের অনুস্বার-বিসর্গ শিক্ষা করিয়াছে, তাহারাও কি এমন কথা মুখে আনিতে পারে? যদি আস্তিকতার নির্ভর-স্থিতির কোন দৃঢ় ভিত্তি—কিংবা দৃঢ় স্থান থাকে, তবে সেই স্থান বিজ্ঞান। কেন না, বিজ্ঞানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আকাশের ঐ অনন্ত কোটি সূর্য্য অবধি মানুষের পদ-তলস্থ ধূলি কণাটি পর্য্যন্ত সমস্তই এক পদার্থ ও নিয়মের একই সূতায় গ্রথিত। আর, যে শক্তি, সেই সূতা অথবা নিয়মের অভ্যন্তরে, প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাহা চৈতন্য-যুক্ত। এই ত ভাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম-সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য কি ঘুণাক্ষরেও নাস্তিকতার অনুকূল? তবে অশিক্ষিত লোকেরা, বিজ্ঞানের নাম শুনিলেই, ভূতগ্রস্তের মত ভয়ে শিহরিয়া উঠে কেন? আমি যত দূর বুঝি, ভয়ের একটুকু কারণ আছে। সে কারণ আর কিছুই নহে। বিজ্ঞান মনুষ্যকে কর্ম্ম করিতে উপদেশ করে। জগদীশ্বর তাহার জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিয়া দিবেন, বিজ্ঞান এরূপ উপদেশ করে না। যদি জগদীশ্বরই জগতের সমস্ত কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির ললাটে এখনও কি এত লাঞ্ছনা ঘটিতে পারিত?

তুমি হয়ত সমাজের ফুলকুমারী ফুলের পুতুলদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিবে যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে অনেকেই ত অনেক স্থানে সুখ-সম্পদের বিলাস-ভবনে ফুলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের আবার দুঃখ কি? হা সুভা, এ কথা কি তোমার যোগ্য উত্তর হইবে,—তোমার মুখে শোভা পাইবে? যাহারা আপনার ইচ্ছায়, আপনার প্রীত্যর্থে, ফুলের মত স্ফুটিত হয়, ফুলের সাজে সজ্জিত হয়, আমি তাহাদিগের সম্মান করিতে পারি। কিন্তু যাহারা, পরের লালসা অথবা পিপাসার

পরিতৃপ্তির জন্য, লক্ষ্ণৌর নবাবের পিঞ্জর-রুদ্ধ ললনাদিগের ন্যায়, মাথায় বড় বড় খোপা বাঁধিয়া এবং কাঁচুলি পরিয়া, প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, সারাদিন নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে, এরূপ বেশ-বিন্যাসিনীদিগকে তোমার সংস্কৃত ভাষায় কি বলে ভাই?

তুমি এখানে জিজ্ঞাসা করিবে, এ সকল আলাত পালাতের সহিত আমার সেই আসল কথার সম্পর্ক কি? সম্পর্ক অতি গুরুতর। স্ত্রীজাতির যত প্রকার দুর্দ্দশা আছে, সকল দুর্দ্দশারই মূল পুরুষের পশু-সমুচিত স্বামিত্ব। সিংহী ভয়ে ভয়ে সিংহের সঙ্গিনী হয়। পাঁচটা সিংহের মধ্যে, যেটা উল্লম্ফনে উৎকট, গর্জ্জনে অধিকতর ভয়ঙ্কর, সিংহী তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। বানরীগুলি, একটা বিকট-ভয়ঙ্কর বানরের দেখা পাইলে, অমনি তাহার অনুগামিনী হয়। সে বানর অনন্ত প্রকারে অত্যাচার করে। তথাপি বানরী, সে অত্যাচার সহিয়াও, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে চলে। মনুষ্যের স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ, সেই পশু-সম্বন্ধেরই আর একটা প্রতিকৃতি নয় কি? তুমি যত কেন তর্ক না কর, কি দিয়া আমার এই কথার প্রতিবাদ করিবে? যদি স্বামী-স্ত্রী-সম্পর্ক প্রকৃতই প্রেমের সম্পর্ক, তাহা হইলে সেখানে আবার ভয়ের ভাব থাকিবে কেন? শাসনের ভাব থাকিবে কেন? এবং কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও একের উপর অন্যের স্বামিত্বের গন্ধ থাকিবে কেন?

আমার এই প্রসঙ্গে আরও সহস্র কথা লিখিবার আছে। আর এক দিন লিখিব। আজি আর একটি কথা না লিখিয়া পারিতেছি না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, স্ত্রীর উপর পুরুষের পাশব স্বামিত্বের দাবী দাওয়া বিষয়ে, আমার যে মত, মনোরও সে মত। মনোর মন-গড়া ধর্ম্মতত্ত্ব কতকটা খিচড়ী হইলেও, সে এ বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের দীক্ষিত ছাত্র, এবং ফরাশি ফূর্‌ইয়ে ও আমেরিক লাজেরাস প্রভৃতির লেখায় নিতান্ত অনুরক্ত। মনো তোমাকে তাহার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন জানাইতেছে। তুমি পার ত কখনও তাহার নিকট দুই এক ছত্র লিখিও। ললিত, তাহার হিজি বিজি ছাই মাটী ছাড়িয়া দিয়া, তোমার কাছে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতেছে, এ সংবাদে মনো বড়ই প্রফুল্ল। সে বলে যে, এই একটি মাত্র ঘটনা—স্ত্রীর নিকট পুরুষের শিক্ষাগ্রহণ,—শুধু ইহাতেই অন্তঃসার-শূন্য স্বামিত্ব-কল্পনার মূল পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ললিতকে তুমি আমার প্রণাম জানাইও। আমি যে দিন তাহাকে সেলাম দিতে পারিব, সে দিন প্রাণে শান্তি পাইব। আমি তাহার বড় বিপদ দেখিতেছি। মনো বলিয়াছে যে, ললিত যদি পুস্তকাদি লইয়া বেশী পরিশ্রম না করে, তাহা হইলে, সে কাশী যাইয়া, তাহাকে জোর করিয়া, কলিকাতায় লইয়া আসিবে। সে, তাহার গুরুজীকে ছাড়িয়া, স্থানান্তর হইতে সম্মত হইবে কি? দিদী মা, পিসীমা, আর ঠাকুর দাদা, সকলকেই আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইও। আর দয়া করিয়া আমার কাছে দীর্ঘ পত্র লিখিও। আমি তোমার এক খানি পত্র

দশ বার পড়ি। তাহাতেও ত আমার তৃপ্তি হয় না,—প্রাণ জুড়ায় না।

আর একটি কথা। আমার দিব্য—তুমি মনোকে কখনও মিষ্টার ঘোষ প্রভৃতি পর-পর ও দূর-দূর ভাবের নামে অভিহিত করিয়া, আমার মর্ম্মদাহন করিও না। তুমি মনোকে মিষ্টার ঘোষ বলিলে, আমি ললিতকে কি বলিব, ভাই ?

তোমার শৈশব-সঙ্গিনী—
চির-প্রীতি-জীবিনী
সরযূ।

ছায়া-দর্শন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অন্তস্তত্ত্ব।

ছায়া-দর্শন যে শাস্ত্র অথবা দর্শন ও বিজ্ঞানের যে শাখার অন্তর্গত, তাহা এইক্ষণ ইয়োরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সমস্ত সুসভ্য দেশে, ইংরেজী ও ফরাশি প্রভৃতি বিবিধ ভাষায়, Psychic Science ও Psychic Philosophy প্রভৃতি বিবিধ গৌরবাত্মক নামে * অভিহিত হইয়াছে। এই নামগুলির সারার্থ সঙ্কলন করিলে, এ তত্ত্বকে, বাঙ্গালায়, অধ্যাত্ম-দর্শন, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান—অথবা আত্মিক-তত্ত্ব প্রভৃতি নামে নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত বোধ হয়।

অনেকে, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব স্থলে, প্রেত-তত্ত্ব শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রেত-তত্ত্ব এই নাম পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও, এইক্ষণ, নানা কারণে পরিহর্ত্তব্য। যাঁহারা, জগদীশ তর্কালঙ্কারের শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা লইয়া, পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা করেন নাই, তাঁহারাও ইহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন যে, শব্দের শক্তি পরিবর্ত্তশীল। শব্দের অর্থ সকল দিন সমান থাকে না। সন্দেশ বলিলে, আগে বুঝাইত শুধুই সংবাদ, তার পর বুঝাইত মধুর সংবাদ। এখন বুঝায়, মোদক, মণ্ডা অথবা বাজারের সন্দেশ। রাগ বলিলে, আগে বুঝাইত প্রাণের ভালবাসা,—অথবা বসন্ত ও ভৈরব প্রভৃতি বিশেষ-প্রকারের প্রাণ-প্রিয় স্বর-লহরী; এখন বুঝায় ক্রোধ। পুরাতন বৈদিক সাহিত্যের কোন কোন শব্দ এইক্ষণ এমনই অশ্রোতব্য কদর্য্য অর্থের প্রতিপাদক হইয়াছে যে, ভদ্রলোকেরা ভুলিয়াও তাহা মুখে আনেন না। প্রেত শব্দের অর্থও যে কালক্রমে,—এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—ঐরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। * প্রেত (প্র+ইত) বলিলে, আগে বুঝাইত প্রকৃষ্টরূপে গত, অর্থাৎ স্বর্গগত সূক্ষ্মশরীরী;—এখন যাহা বুঝায়, তাহা জিহ্বায় আনিতেও সঙ্কুচিত হই। কেন না, পর-লোক-গত পিতৃপুরুষেরা, অথবা সূক্ষ্মশরীরী সুহৃৎস্বজন, মনুষ্য মাত্রেরই ভক্তিভাজন। তাঁহাদিগকে, পুরাতন সংস্কৃত অনুসারে, স্ত্রীত্বাদি-ভেদে, সংস্থিত ও সংস্থিতা, এবং এখনকার অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুসারে, আত্মিক ও আত্মিকা বলিলেই, সর্ব্বাংশে সুসঙ্গত হয় না কি ?

এখানে প্রসঙ্গতঃ, সংস্থিত শব্দের অর্থ লইয়া একটুকু আলোচনা করিলে, পাঠক সম্ভবতঃ চিত্তে প্রীতি লাভ করিবেন। পুরাতন ঋষিরা, পর-লোক-গত পিতৃপুরুষকে, কি অর্থে সংস্থিত বলিতেন ? বলিতেন এই অর্থে যে, যাঁহারা এত কাল, এই পৃথিবীতে, সংসার-সমুদ্রে, একটি নির্ম্মাল্য ফুল অথবা এক গাছি তৃণের মত, সুখ-দুঃখের তরল তরঙ্গে ভাসিতে-ছিলেন, তাঁহারা এইক্ষণ, সেই সমুদ্রের পর-পারে যাইয়া, মাটীতে দাঁড়াইয়াছেন,—দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থিত হইয়াছেন। জ্ঞান-গুরু ঋষিরা, শুধু এই একটি শব্দের মধ্যে, কত অর্থই সম্পূরণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত আপনা হইতেই অবসন্ন হয়। আজি আমরাও সকলেই, আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্রোতে, কখনও শৈবাল, কখনও বা সুখ-শোভন কুসুমের মত, ভাসিয়া যাইতেছি,—কখনও বা উদ্দাম প্রবৃত্তির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। কিন্তু আমরাও, এক সময়ে, অবধারিতই পর-পারে যাইব, এবং সেখানে যাইয়া, দাঁড়াইবার 'স্থান' পাইয়া, সংস্থিত হইব।

সেই স্থান কেমন ? আমরা এখানে যাহাকে স্থান বলি, তাহা স্থূল পদার্থ,—স্থূল পরমাণুতে গঠিত। সেখানকার স্থান, সূক্ষ্মতর পদার্থ—সেই স্থানের দেহ-প্রাণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উপযোগি সূক্ষ্মতর অথবা অধ্যাত্ম পরমাণুতে গঠিত। এই মাত্র প্রভেদ।

এই যে আমার হাতে একটি লৌহপিণ্ড রহিয়াছে, ইহাকে আমি বস্তু বলি। কিন্তু উহা বস্তু না অবস্তু, সে বিষয় আমার সাক্ষী কে ? এক সাক্ষী চক্ষু, আর এক সাক্ষী ত্বক্ অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়। চক্ষে দেখিতেছি কাল বর্ণ ও গোল আকার, আর হস্তের স্পর্শে অনুভব করিতেছি কঠিন। এই দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া, যতটুকু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এই লৌহপিণ্ড সম্পর্কে আমার তা ছাড়া আর কি প্রকৃত বস্তু-জ্ঞান

* The Science of Soul, The Science of Spiritualism অথবা Spiritual Philosophy নাম গুলিও পাঠকের স্মর্ত্তব্য।

* ব্যাসদেব যে সময় মহাভারত রচনা করেন, বোধ হয়, সেই সময় হইতেই প্রেত-মূর্ত্তি ও প্রেত-যোনি প্রভৃতি শব্দ ঘৃণাবাচক হইয়াছে। প্রেতের আকৃতি ভয়ঙ্কর, দেহ দুর্গন্ধময়, এবং জীবন—কর্ম্মফলের অলঙ্ঘনীয় শাসনে—যার পর নাই ক্লেশজনক। মানুষ পৃথিবীতে কিরূপ দুষ্কৃত হইলে, মৃত্যুর পর, প্রেত-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে তাহার বিবৃতি আছে; —"স প্রেতো জায়তে নরঃ" এই বাক্যের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে ঐ প্রেত শব্দ পুনঃ পুনঃই ঘৃণার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হইতে পারে ?* যদি এই পিণ্ডটিরে, তাপ-সহ তপ্ত কটাহের উপরে রাখিয়া, কিছুক্ষণ উপযুক্ত পরিমাণ আগুনের তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, এখন যাহা কাল দেখিতেছি, তাহা আগে জবাকুসুমের ন্যায় লাল হইবে, তার পর ঈষৎ-নীলাভ-শ্বেত ও সর্ব্বশেষে সূর্য্যরশ্মির মত শাদা হইয়া যাইবে। যাহা এতক্ষণ নীরন্ধ্র ঘন ছিল, তাহা, প্রথমতঃ, টব-বগ দ্রব-বহ্নির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অবসানে বাষ্পের আকারে আকাশে যাইয়া মিশিবে। লৌহ-পিণ্ডের এই পরিণতির দ্বারা ইহাই কি প্রত্যক্ষপ্রমাণিত হইতেছে না যে, আমরা যে পদার্থকে যে ভাবে বস্তু মনে করি, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে সে ভাবের বস্তু নহে। উহার বস্তুত্ব কএকটা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য মাত্র। আমরা বাতাসকে চক্ষে দেখি না। কিন্তু, তথাপি উহাকে বস্তু বলিয়া জানি, বস্তু বলিয়া মানি,—এবং বাতাস যখন, বেগ-বিহ্বল শক্তিতে, বট-বৃক্ষের শাখা ও প্রশাখাগুলিরে মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, আমরা তখন উহার বস্তুত্ব চিন্তা করিয়া ভয়ে জড় সড় হই। বাতাসের বস্তুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে?—না, শুধুই স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর। চিনিটুকু যখন দুধে মিশাই, তখন উহার বস্তুত্ব লোপ পায় কি? তখন চিনিটুকু আমরা আর চক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু চক্ষে দেখিতে না পাইলেও আমরা রসনায় উহার স্বাদ পাইয়া থাকি,—এবং শুধু রসনার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই উহাকে বস্তু জ্ঞানে ভালবাসি।

এইরূপ, যাঁহারা পর পারে যাইয়া, অধ্যাত্ম তনু লাভ করিয়াছেন,—যাঁহারা আমাদিগের নিকট এইক্ষণ আত্মিক ও আত্মিকা মাত্র, তাঁহারাও দাঁড়াইবার জন্য বাস্তব স্থান পাইয়াছেন,—এবং এখানে যেমন আমরা, বন উপবন, তরু লতা, জলের ঝরণা অথবা তরঙ্গময় জলস্রোত দেখিয়া পুলকিত হই, তাঁহারাও সেখানে,সেইরূপ, বৃক্ষ-বহুলা-বন-ভূমি, বনান্তশোভি উপবন, বর্ণবিচিত্র তরুলতার বিচিত্র বন্ধন, এবং বিবিধ-মূর্ত্তি স্রোতস্বতীর জলতরঙ্গ দেখিয়া, চিত্তে বিস্মিত রহিতেছেন। আমরা যেমন, আমাদিগের গায়ে হাত দিয়া আপনাকে আপনি বস্তু মনে করি, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদিগের হস্ত-পদ-প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সারবৎ বস্তু মনে করেন ;—এবং আমরা যেমন এখানে আমাদিগের পদ-তল-স্থিত মৃত্তিকাকে সারবতী দৃঢ়ভূমি মনে করি, তাঁহারাও সেইরূপ তাঁহাদিগের পদ-তল-স্থিত মৃত্তিকাকে দৃঢ়-বস্তু ও দৃঢ়-ভূমি মনে করিয়া থাকেন। তবে আমরা সে স্থল, সে জল, সেই সার-বস্তু-নিচয় চক্ষে দেখি না কেন? দেখি না, আমাদিগের পার্থিব চক্ষু,—আমাদিগের এখনকার দর্শনেন্দ্রিয়, সে সকল সূক্ষ্ম পরমাণু-গঠিত অধ্যাত্ম বস্তুর দর্শনলাভের, উপযোগী নহে বলিয়া। জ্ঞানীরা বলেন যে, পর-লোক-গত পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী এবং আত্মীয় স্বজনেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আসিয়া, শোকাকুল পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে চক্ষে দেখিয়া যান, এবং স্বপ্নের আবেশে, অথবা অন্তঃশ্রুতির উপদেশে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। আমরা সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখন তাঁহারা, অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম অনুসারে, পৃথিবীর স্থূল-পরমাণু আকর্ষণ করিয়া, মুহূর্ত্তের তরেও মৃণ্ময় তনু * ধারণ করেন, আমরা তখনই তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিয়া, অথবা কানে তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া, চমৎকৃত হই।

এখন এখানে, সকলের মনে, স্বভাবতঃই সর্ব্ব-প্রথম এই প্রশ্নের উদয় হইবে যে, এ সকল অলৌকিক কথার প্রমাণ কি? প্রমাণ ঋষি যোগীর কথা,—প্রমাণ মহাজন-বাক্য,—প্রমাণ কঠোর-পরীক্ষা-প্রিয় বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মহাসাক্ষ্য। ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যাহা অলৌকিক, তাহা অস্বাভাবিক নহে। এ জগতের কোথাও অপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক ঘটনার সম্ভাবনা নাই। কেন না, যিনি প্রকৃতির প্রাণদেব, তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণমঙ্গল,—পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন নিয়মেরই উল্লঙ্ঘন অথবা অন্যথা-ঘটন সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু অলৌকিক সম্বন্ধে কোন অংশেও এ কথা খাটে না। কারণ, কল্য যাহা অলৌকিক, অর্থাৎ লোকে অপ্রসিদ্ধ ছিল, অদ্য তাহা লৌকিক হইয়াছে,—এবং সমস্ত লোকেই, সে অলৌকিকের তত্ত্ব-রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া, তাহাকে স্বভাব-সিদ্ধ সম্ভবপর ঘটনা জ্ঞানে, আপনার কাজে লাগাইতেছে।

ড্যাগারোটাইপ নামক প্রভাচিত্রের আবিষ্কর্ত্তা, শুদ্ধাত্মা লুই ড্যাগেইর যখন, গৃহ-প্রাচীর-প্রতিফলিত সূর্য্য-প্রভার দিকে তাকাইয়া, চিত্রবিদ্যার মূল-তত্ত্ব চিন্তা করিতেন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীও, তাঁহাকে পাগল মনে করিয়া, নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহার জীবনচরিত সম্প্রতি আমাদিগের সম্মুখে নাই। কিন্তু যত দূর মনে পড়ে, তাহাতে বলিতে পারি যে, লুই ড্যাগেইর, তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পুরস্কারে, কিছু কালের তরে, পাগলের কারাগারে, অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভিক্‌টোরিয়া যখন মায়ের কোলে দুধের শিশু, তখন না ছিল রেলের গাড়ী, না ছিল ধূঁয়ার জাহাজ, এবং না ছিল টেলিগ্রাফ। এ সকল কথাকে তখনকার উন্নতিবিমুখ বৈজ্ঞানিকেরাও, অলৌকিকের কথা বলিয়া, ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যে সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা, পৃথিবীতে টেলিগ্রাম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, নিখিল-জগন্নিয়ন্তার নিয়মাবলীর উপর দৃঢ় নির্ভরের ভাবে, দৃঢ় সঙ্কল্পে, দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কে না

* Sir William Hamilton এবং তদীয় প্রধান শিষ্য Mansel প্রভৃতি সমস্ত প্রধান দার্শনিকেরই এই সিদ্ধান্ত,—এবং বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে।

* এখনকার ইংরেজীতে যাহা Materialization বলিয়া কথিত হয়, তাহাই এস্থলে মৃণ্ময়-তনু-ধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইল। মৃৎ বলিলে শুধুই মাটী বুঝায় না। জড়পরমাণুর ঘনীভূত অবস্থাও বুঝাইয়া থাকে।

প্রথমতঃ পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল? কিন্তু এখন সে উপহাসকারী বিজ্ঞ লোকেরাই বা কোথায়? আর, উল্লিখিতরূপ উন্নতি-প্রবর্ত্তক পাগলেরাই বা কোথায়? বিজ্ঞলোকেরা বলিয়াছিলেন পাগল; আর, ধর্ম্মজ্ঞ ও সাধুশিষ্ট সদাশয় যাজকেরা বলিয়াছিলেন সয়তানের চেলা। মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া আর এক প্রান্তবর্ত্তী আত্মীয়ের কাছে, তাড়িতশক্তির অলৌকিক প্রয়োগে, তারে তারে সংবাদ পাঠাইবে, এরূপ অসম্ভব কার্য্যকে ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মশাস্ত্র কল্পিত সয়তানের * কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন, কিবা মূর্খ, কিবা পণ্ডিত, সকলেই এক দেশে বসিয়া, দেশান্তরবাসী প্রিয়জনের কাছে, তারে সংবাদ পাঠাইতেছে, —পরস্পর তারে তারে কথা কহিতেছে,— এবং অলৌকিক তাড়িত-শক্তির উপর আনন্দ-ফুল্ল আরোহীর ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, আরও অসংখ্য লৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছে।

মূর্খ মনুষ্য সকলই বুঝে, বুঝে না অনন্ত-লীলাময়ী ও অনন্ত-চৈতন্যরূপিণী প্রকৃতির অনন্তপ্রকার শক্তির অনন্ত মহিমা। তাই, যে যতটুকু জানে, তাহার অতিরিক্ত সে জানিতে চাহে না;—যে যতটুকু শিখিয়া রাখিয়াছে, অথবা শুনিয়া শিখিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কথা তাহার প্রাণে সহে না। সুতরাং, যেটুকু যাহার পূর্ব্বপরিজ্ঞাত কথার অতিরিক্ত কথা, সেটুকুই তাহার কাছে অলৌকিক ও অসম্ভব কথা। কিন্তু আমাদিগের ভরসা আছে, যাঁহাদিগের শরীরে সেই জগৎপূজ্য ভারতীয় আর্য্যের বিন্দু মাত্র শোণিত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বিশ্বাসনিষ্ঠা ও ভক্তিপরায়ণ, ধর্ম্মজীবন হিন্দু পাঠক, কখনও অলৌকিকের দোহাই শুনিয়া, আত্মস্খলিত হইবেন না। কারণ, যাহা জগতে অলৌকিক, তাহা চিরকালই হিন্দুর কাছে লৌকিক। অলৌকিককে পরিত্যাগ করিলে, হিন্দুর লৌকিক-জীবন অর্থাৎ পিতৃ-তর্পণাদি প্রাত্যহিক ও পবিত্র অনুষ্ঠান-নিচয়ও একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

লৌকিক ও অলৌকিক ঘটিত আলোচনার পর, প্রমাণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। ছায়াদর্শন নামক প্রবন্ধের প্রস্তাবনায়ই বলিয়াছি যে, বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষি তাপসেরা, পরলোকগত আত্মার দর্শন ও স্পর্শন, এবং তাঁহাদিগের সহিত মনুষ্যের কথোপকথন বিষয়ে, সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, যাঁহারা বাল্মীকি ও ব্যাসের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব বিষয়েও সন্দিহান, তাঁহারা তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন কি? বোধ হয় না। বিশেষতঃ, কিবা বাল্মীকি, কিবা ব্যাস, উভয়েরই লেখার, কতকটা ইতিহাস, কতক উপন্যাস। সে ইতিহাস ও উপন্যাসের অপূর্ব্ব মিশ্রণ, এমনই এক আনন্দময় বস্তু হইয়া,

* প্রচলিত পাদ্রিয়ানা ধর্ম্মের এক দিকে পূর্ণমঙ্গল ঈশ্বর, আর এক দিকে পাপ-মূর্ত্তি সয়তান। এই দুইয়ে নিত্য বিরোধ। Satan অর্থাৎ সয়তান সমস্ত সৎকার্য্যের নিত্য শত্রু।

মানব-জাতিরে মোহিত রাখিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাসটুকু বাছিয়া লইতে কাহারও প্রাণ ও মন অগ্রসর হইবে না। কিন্তু পাষাণ-কঠিন বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য পৃথক্ কথা। বিজ্ঞান কোন কালেও কল্পনার কম-বিচিত্র কারুকার্য্যে পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করে নাই। বিজ্ঞানের আরাধ্য বিগ্রহ সত্য,—আরাধনার প্রণালী প্রত্যক্ষ বস্তু ও প্রত্যক্ষ শক্তির গতি ও পরিণতি বিষয়ে সাধারণ-নিয়ম-নির্দ্ধারণ। সুতরাং, ছায়ামূর্ত্তির বস্তুত্ব ও সত্যতা সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যে সাক্ষ্য দান করিয়াছে, সত্যপ্রিয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রই তাহার কাছে, গভীর ভক্তি ও গভীর শ্রদ্ধার সহিত মাথা নোয়াইতে ভালবাসিবেন।

যাঁহারা বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অনুরাগী, তাঁহারা অবশ্যই, বর্ত্তমান কালের অন্যতম বিজ্ঞান-গুরু, বিখ্যাত-কীর্ত্তি, এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের নাম সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ডক্টর ওয়ালেস * যুগ-তত্ত্ব-প্রবর্ত্তক ডারউইনের সহযোগী ও সমান-পদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক। তিনি, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে, যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আজি-কালিকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে আদৃত রহিয়াছে। ওয়ালেস এখনও জীবিত আছেন, এবং এখনও বিজ্ঞানসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

ডক্টর ওয়ালেস আগে ঘোরতর অস্তিবিমুখ অথবা অজ্ঞমানী † ছিলেন। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু অলৌকিক, তাহাই তিনি উপহাসের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতেন। যাহারা ছায়াদর্শনের কথা বলিত, তাহাদিগকে তিনি আধ-পাগল বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন। যদি কখনও সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞলোকেরা, তাঁহার কাছে, ছায়াদর্শনের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য-দান করিতেন, সে সাক্ষ্যকে তিনি চিরদিনই রুগ্ন-কল্পনা, স্বপ্ন-জল্পনা, অথবা রোগ-গ্রস্ত চক্ষুর দৃষ্টি-বিড়ম্বনা বলিয়া, মনে মনে অবধারণ করিয়া রাখিতেন। কালক্রমে তাঁহার চিত্তে একটুকু কৌতূহল জন্মিল। এত লোকে এত দেখিতেছে, এত কহিতেছে, ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে কি? যদি একান্তই কিছু সত্য থাকে, তাহা হইলে, সে কথার সহিত, মানব-জীবনের পরিণাম এবং ইহকাল ও পরকালের বড়ই ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ওয়ালেস, এইরূপ চিন্তার সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, অতিকঠোর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন;—এবং ক্রমিক বিশ বৎসরের অনুসন্ধানের পর, আপনার হাতে, ছায়ামূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়া ও একখানি ফটোগ্রাফকে আপনারই স্বর্গগত মাতার প্রতিকৃতিরূপে নিঃসংশয় চিনিতে পারিয়া, একবারে বিস্ময়ে আবিষ্ট ও বিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মানব-জাতির নিকট, এই মহাসত্যের সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, বহু গ্রন্থপত্র লিখিয়াছেন, বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। আমরা

* Dr. Alfred Russel Wallace, D.C.L, L. L. D, F. R. S.

† আত্মানম্ অজ্ঞম্ মন্যতে ইতি অজ্ঞমানী। যিনি আপনাকে আপনি, অভিমান অথবা অবিশ্বাসের ভাবে, অজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাকে Agnostic অর্থে অজ্ঞমানী বলা যায় কি না, সুবিজ্ঞ সাহিত্যিকেরা তাহার বিচার করিবেন। আত্মমননে খশ্চেতি পাণিনিঃ ৩।২।৮।

আজি, এস্থলে, তাঁহারই দুই একটি প্রসিদ্ধ বাক্যের অনুবাদ করিয়া, এই প্রস্তাবনার উপসংহার করিব।

ডক্টর ওয়ালেস বলিয়াছেন,—"আমি অনেক অনুসন্ধানের পর, এইক্ষণ যে সিদ্ধান্তে পহুঁছিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের যে সকল কথা লইয়া এত আন্দোলন হইতেছে, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। প্রমাণের উপর এত প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে, আর অধিকতর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। অন্যান্য বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সকল যেরূপ প্রমাণের উপর অবস্থিত রহিয়াছে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ঘটনা সকলও ঠিক সেইরূপ প্রমাণের দ্বারা প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

* * *

আমি যে পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম-তত্ত্বের বিবিধ বৃত্তান্ত পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া নির্ণয় করিতে সমর্থ হই নাই, সে পর্য্যন্ত আমি অতি কঠোর-মতি দার্শনিক ও অবিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত ছিলাম। এখন যেমন হর্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থপত্রে আমার গাঢ় অনুরাগ, তখন সেইরূপ ভল্টেয়ার, ষ্ট্রাউস এবং কার্‌ল্‌ ফক্টের গ্রন্থ পত্রে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। আমি তখন অতি বড় ভয়ানক এবং দৃপ্ত ও দৃঢ়ীভূত জড়বাদী ছিলাম। অধ্যাত্ম-মূর্ত্তি ও অধ্যাত্ম-শক্তির ত কথাই নাই,—এ জগতে, জড় বস্তু ও জড় শক্তি ভিন্ন আর কিছুই যে থাকিতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধি তখন একবারেই পরিগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু যখন অনেক দিন পরীক্ষা করিলাম,—যখন চক্ষে দেখিয়া ও কানে শুনিয়া, বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইলাম,—তখন জানিলাম যে, বৃত্তান্ত বড় বিচিত্র ও কঠিন বস্তু। প্রকৃত বৃত্তান্তের কাছে সকলকেই হারি মানিতে হইবে, আমিও হারি মানিলাম। বৃত্তান্ত আমাকে পরাভব করিল। * আমি এত কাল যাহা অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতাম, আমাকে তত্তাবৎ সমস্তই সত্য বলিয়া মানিতে হইল;—আমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম। আমার এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনুষ্য পৃথিবীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকে যাইয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে, এবং সেখানে, সূক্ষ্মদেহী আত্মিকরূপে অবস্থান করিয়া, আপনার পার্থিব-জীবনের কর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকে। আমার ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পর-লোক-গত আত্মা, অবস্থা-বিশেষে ও অধ্যাত্ম-জগতের বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, সময় সময় আমাদিকে দেখা দিতে পারেন, আমাদিগের সহিত কথা কহিতে পারেন, এবং আমাদিগের মন ও জীবনের উপর কার্য্য করিতে পারেন। আমি ইহাও দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, যাঁহারা সত্যের উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন, এবং সত্যপ্রিয়তার সহিত তত্ত্বের অনুসন্ধান ও বৃত্তান্তের পরীক্ষা করিবেন, তাঁহারা সকলেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এ সকল কথাকে এক সময়ে প্রকৃত সত্য বলিয়া জানিতে পাইবেন।"

এখানে ডক্টর ওয়ালেসের যে উক্তি উদ্ধৃত হইল, তাহা বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে, প্রায় এক শত প্রধান বৈজ্ঞানিক এবং এক সহস্র সুধন্যনামা সুপণ্ডিতের সাক্ষ্যে সমর্থিত হই-

* 'Facts, however, are stubborn things. The facts beat me. They compelled me to accept them as facts long before I could accept the spiritual explanation of them." &c.

শা, আচ্ছা থাক।" কহিতে কহিতে উহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত বলিল—"আবারও বলি, এখনও আমার কথা রাখ, নচেৎ তোমার ভারি অকল্যাণ।" মূর্ত্তি আবার অদৃশ্য হইল। গ্রেহাম তথাপি এ কাহিনী মুখ ফুটিয়া কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু ঐ দিন হইতে কারখানার দিকে যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্গে যেরূপ দুর্গোৎসব, খৃষ্টীয়ানের দেশে সেইরূপ খৃষ্টমাস। ক্রমে খৃষ্টমাসের দিন সন্নিহিত হইয়া আসিল। এই সময়ে গ্রেহাম, এক দিন, সন্ধ্যার অল্প একটু পূর্ব্বে, বাগান বাটীতে হাঁটিয়া বেড়াইতেছেন। সঙ্গে অন্য কেহ নাই। হঠাৎ অদূরে আবার সেই দৃশ্য! গ্রেহামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। গ্রেহাম চাহিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে সেই করাল-মূর্ত্তি সন্ধ্যার রক্তিমরাগে, অধিকতর ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁহার পথ আগুলিয়া রহিয়াছে! আজি উহার চক্ষু, চক্ষু নহে, যেন দুটা জ্বলন্ত অনল খণ্ড ধগ্‌ধগ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। মুখ-ছবি ক্রোধোদ্দীপ্ত, বিকট ও ভয়ঙ্কর। রমণী মর্ম্মভেদি, তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—"এখন, এখন পালাবি কোথায়? আজ আর কিছুতেই তোর আমার হাতে অব্যাহতি নাই।"

দেখিতে দেখিতে রমণীর মূর্ত্তি আরও দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিল। গ্রেহাম আর উহার পানে তাকাইতে পারিলেন না। সে মর্ম্মভেদি স্বরও কানে সহিল না। ভয়ে মন ও প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল। গ্রেহাম অমনি শপথ করিয়া কহিলেন।—"আমি কল্যই তোমার কথা মাজিষ্ট্রেটের নিকট আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিব। তোমার কাছে কর-যোড়ে, কাকুতি করিয়া বলি, তুমি আর এরূপে আমার অনুসরণ করিও না, এমন করিয়া আর আমাকে ভয় দেখাইও না।" মূর্ত্তি আবার অদৃশ্য হইল।

গ্রেহাম কম্পিত-প্রাণে গৃহে ফিরিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভীতিবিহ্বল গ্রেহামের সে রাত্রিও ঘুম হইল না। পর দিন, প্রত্যুষেই গ্রেহাম ঐ স্থানের মাজিষ্ট্রেট সমীপে উপস্থিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার মুখে ছায়ামূর্ত্তির কথিত কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিলেন বটে, বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কথাটারে আগা গোড়াই উপন্যাস বলিয়া বোধ হইল। কার না হয়? মাজিষ্ট্রেটেরও হইল। মাজিষ্ট্রেট উপন্যাসের উপর বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে চিত্তে প্রথমতঃ খুব বেশী সাহস পাইলেন না। কিন্তু, তথাপি তিনি গ্রেহামের অত্যধিক আগ্রহ ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া, অবশেষে একান্ত অনিচ্ছায়, অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলেন। অনুসন্ধানের আরম্ভটা, হেলায় তাচ্ছীল্যে ও অনিচ্ছার ভাবে হইলেও, উহার পরিসমাপ্তি যার-পর-নাই বিস্ময়কর হইয়া পড়িল। কথিত কয়লার গর্ত্তে বস্তুতই একটি স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পাওয়া গেল। শবের মস্তকে প্রকৃতই বড় বড় পাঁচটা অস্ত্রক্ষত। কুঠার, মোজা, ও জুতাও যথা-নির্দ্দিষ্ট-স্থান হইতে উত্থিত হইল! শীতকাল, তুষারপাত হেতু জুতা ও মোজার শোণিত চিহ্ন তখনও অবিকৃত ছিল।

পুলিশ এইরূপে হত্যার সূত্র পাইয়া, ওয়াকার ও মার্ক সার্‌পকে গ্রেপ্তার করিলেন। ডারহামের পরবর্ত্তী সেশনে তাহাদের বিচার হইল। বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হইয়া, ঐ নিষ্ঠুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। উভয়েই চরম দণ্ডে দণ্ডিত হইল। কেহ কেহ বলেন, ছায়ামূর্ত্তি জজ ও জুরিপতিকেও দেখা দিয়া-

ছিল। তাঁহারাও হত্যা সম্বন্ধে ছায়ামূর্ত্তির মুখের কথা শুনিয়াছিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যা ও ছায়াদর্শনের এই ভয়াবহ ও অদ্ভুত কাহিনী, এখনও ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে লোকের মুখে মুখে কথিত হইয়া থাকে। যে জজের কাছে, ওয়াকার ও সার্পের বিচার হয়, সেই জজ স্বয়ং ছায়া-মূর্ত্তির দর্শন লাভের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, সার্জেণ্ট হটনের নিকট এক খানি পত্র লিখেন। সেই পত্র হইতেই এই কাহিনী সঙ্কলিত।

এই কাহিনীকে সর্ব্বাংশে অলৌকিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কেন না, লোকজগতে ইহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু ইহার কোন একটি ঘটনাও অপ্রাকৃত, অতি-প্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক নহে। কেন না, অধ্যাত্ম জগৎও, জড়জগতের ন্যায়, প্রকৃতির অন্তর্গত এবং অধ্যাত্ম-দেহীদিগের দর্শন-দান ও তিরোধান, অথবা মনুষ্যের মনের উপর বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান, সমস্তই প্রাকৃত জগতের নানাবিধ অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের দ্বারা অনুশাসিত। সে সকল নিয়ম এখন পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই জন্যই, কেন এক জনে দেখা দিলেন, সকলে দেখা দিলেন না, অথবা কেন ওপারের সকলেই আসিয়া এ পারের সকলের সহিত কথা কহিলেন না, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সকল সময়ে সহজ নহে। কিন্তু, ডক্টর ওয়ালেস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা যে প্রকার প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় যে, এই "প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান" জড়জগতের নিয়মের ন্যায়, অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্মজগতের কার্য্যপ্রণালী কিংবা নিয়মাবলীও, অতি শীঘ্রই, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে। তবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য জানিতে পাইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকের পরিচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত গভীর-স্বরে বলা যাইতে পারে যে—

পরলোক সত্য ;

এবং পরলোকের বিচার ও কর্ম্মফলের দণ্ড-পুরস্কারও

পরম সত্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "শ্রীমতী।—সংকীর্ত্তন।—শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু কৃত।" কলিকাতা মুদ্রিত। ২। "হরিকথা। শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু কৃত।" ঢাকা আদর্শ প্রেসে মুদ্রিত। প্রথম গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি নিবিড়-কৃষ্ণ-কেশ-কলাপ-মণ্ডিত, ত্রিসূত্র-গ্রথিত রুদ্রাক্ষ-মালা-রঞ্জিত, নবীন-তাপসের নয়নহারিণী প্রতিমূর্ত্তি আছে। শুনিয়াছি, সে তাপস-গ্রন্থকার বহু সহস্র লোকের পূজাস্পদ। আমরা তাঁহার বাঙ্গালার সমালোচনা করিব না। সম্মানার্থ দুই একটি পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিব। এ বাঙ্গালা সর্ব্বাংশে নূতন বটে। টীকায় অনেক শব্দের অর্থ আছে।

১। "তেবন তেজনক কেত দন্দ ভঙ্গ"

২। জৈহ্ব্য জৈহ্ম্য জুহুবাম
এ ঘোষিতা জুর্ণি শ্যাম
মানবা মাহেয় অবসান।"

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর,
দেখি জগন্নাথ অতি আনন্দ অন্তর।"

গৌরাঙ্গ এক্ষণ পাঁচ বৎসরের বালক, এবং বিশ্বরূপ সম্ভবতঃ পোনর বৎসর বয়সের প্রস্ফুট যুবা। বিশ্বরূপ এ বয়সেই এক জন প্রতিভাশালী পণ্ডিত বলিয়া নবদ্বীপের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছেন ; এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও দর্শনাদি সমস্ত শাস্ত্র সমাপন করিয়া, ভক্তি-শাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থ ও যোগতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, যাঁহারা স্বাভাবিক প্রতিভায় 'অসাধারণ,' তাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য-সিদ্ধ। ভারত-বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য, দশ বৎসর বয়সের সময়, স্বভাবের অলৌকিক-স্ফূরণে, যে সকল অপূর্ব্ব কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে, অনেকে পঞ্চাশ বৎসর বসিয়া পরিশ্রম করিলেও, তেমন একটি কবিতা লিখিতে পারিতেন কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়। সুতরাং বিশ্বরূপের এই বয়সেই এরূপ অনন্যসাধারণ-পাণ্ডিত্য, বিস্ময়াবহ হইলেও, সংশয়ের বিষয় নহে।

জগন্নাথ মিশ্র স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশ্বরূপ যে অত বড় পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহা তিনি বিশিষ্টরূপে বুঝিতেন ; এবং পুত্রের সম্পর্কে পাঁচ জনের সম্মুখে কিছুই না বলিয়া, শচীর কাছে গোপনে হৃদয়ের আনন্দ ঢালিতেন,—কখনও কখনও, প্রণয়ের আনন্দময় কলহে, একটুকু বড়াইও করিতেন। অবোধিনী শচী সর্ব্বাংশেই মাতৃস্নেহের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের অত কথা বুঝিতেন না। তিনি এই মাত্র বুঝিতেন যে, বিশ্বরূপের ন্যায় সুশীল ও স্নেহময় বালক নবদ্বীপে নাই। বিশ্বরূপ মায়ের দুঃখ বুঝে,—মায়ের অতি সামান্য সুখের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকার করিতে ভালবাসে, শুধু ইহাই শচী প্রতিক্ষণে অনুভব করিতেন।

গৌরাঙ্গের বাল্যজীবনে, বাহিরে কোন দিক্ দিয়াই, বিশ্বরূপের সেই শান্ত ভাবের ছায়া পড়িল না। তাঁহার রূপ যেমন উছলিয়া উছলিয়া পড়িত, তাঁহার স্নেহ-মমতা,—তাঁহার ক্ষণিক ক্রোধ, ক্ষণিক আখুটির ক্রোধ-স্ফুরিত ভালবাসা, এবং তাঁহার সেই শিশু-হৃদয়ের উল্লাসও যেন তেমনই উছলিয়া উছলিয়া পড়িত। তিনি এই খেলিতেছেন ঘরের মধ্যে, এই বাহিরের প্রাঙ্গণে,—এই গঙ্গার ধারে, এই আবার কোন প্রতিবেশীর অন্তঃ-

পুরে। তিনি কখনও সোহাগ করিয়া কাহারও কোলে ঝাঁপ দিয়া উঠিতেছেন, কখনও বা অতি সামান্য কারণে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ধরিয়া মারিতেছেন। পাড়ার বালকেরা সকল সময়েই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি, মায়ের কাছে, কিংবা প্রতিবেশীদিগের বাড়ীতে, যখনই খাওয়ার কোন জিনিষ পাইতেন, তখনই আপনি তাহার সামান্য কিছু ভাগ লইয়া, তাঁহার খেলার সাথীদিগকে অবশিষ্ট সমস্ত টুকু আদর করিয়া বিলাইয়া দিতেন; এবং মায়াপুর পল্লীর সর্ব্বত্রই, কিবা প্রভাতে, কিবা সায়ংকালে, সঙ্গের সেই শিশু-সেনা লইয়া, সকলকেই ভালবাসার অত্যাচারে, অস্থির রাখিতেন। কিন্তু গৌরাঙ্গে সেই সময়ই দুইটি অতি সুন্দর ভাব পরিলক্ষিত হইত। তিনি যাহাদিগের উপর যত বেশী উৎপীড়ন করিতেন, তাহারা তাঁহাকে তত বেশী ভালবাসিত, এবং আপনার জন বলিয়া মনে করিত; আর, বিশ্বরূপ কাছে আসিলেই, তাঁহার সেই উচ্ছল চাঞ্চল্য, যেন মন্ত্রমোহে, তন্মুহূর্ত্তেই একবারে দমিয়া কিংবা থামিয়া যাইত।

"পিতা মাতা কাহারেও না করয়ে ভয়,
বিশ্বরূপ অগ্রজে দেখিলে নম্র হয়।
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্,
আজন্ম-বিরক্ত সর্ব্বগুণের নিধান।
সর্ব্বশাস্ত্রে সকলে বাখানে বিষ্ণুভক্তি,
খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারু শক্তি।
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে,
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বলে না শুনে।
অনুজের দেখি অতি বিলক্ষণ রীত,
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত।
এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল,
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল গোপাল।
যত অমানুষ কর্ম্ম নিরবধি করে,
এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশু শরীরে।
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়,
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব সকর্ম্ম করয়।"

প্রশান্ত বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গকে পৃথিবীর বস্তু বলিয়া মনে করিতেন না, অথচ তাঁহার সেই চির-চঞ্চল টল-টল প্রাণের উপর অসামান্য প্রভুত্বের সহিত কার্য্য করিতে পারিতেন। এ শক্তির অর্থ কি? এই প্রকার শক্তিকে এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা Magnetic Influence অর্থাৎ প্রাণজ চৌম্বক অথবা হৃদয়-শক্তির মোহনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু কার প্রাণ, কার কাছে, কি জন্য, প্রভুত্বের শাসনে সুখী হইয়া, পরাধীনতার শৃঙ্খলে জড়িত হইতে ভালবাসে, বোধ হয় তাহা এখনও বিজ্ঞানের অনধিগম্য রহিয়াছে। শচীর প্রাণে শুধুই ভালবাসা ছিল, ভালবাসার শাসনী কিংবা মোহনী ছিল না।

শচী তাঁহার আদু'রে নিমাইর উল্লিখিত রূপ অত্যাচারও মনে মনে ভালবাসিতেন; অথচ, সেই একপ্রকার মেয়েলী ছলনায়, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী এবং অন্যান্য প্রতিবেশিনীদিগের কাছে, মাঝে মাঝেই, বিনাইয়া, বিনাইয়া, বালকের ঔদ্ধত্যের কথা কহিয়া, বিলাপ করিতেন।

শাদা প্রাণ জগন্নাথ এ সকল কথার ধার

ধারিতেন না। তিনি গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য-দর্শনে চিত্তে কখন দুঃখিত হইতেন, কখনও বা আশায় ফুলিয়া উঠিতেন। তিনি ইহা খাটি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার এ বালক অসামান্য শক্তিশালী, এবং ইহার বুদ্ধির প্রতিভা বিশ্বরূপের প্রতিভা হইতেও অধিকতর প্রখর। সুতরাং,তিনি কখনও আদরে গলিয়া, গৌরাঙ্গকে সোনার মাদুলীর মত, গলায় গাঁথিতেন, কখনও ক্রোধে কর্ত্তব্য ভুলিয়া, হাতে এক গাছি বেত কি সাট লইয়া, গৌরাঙ্গের পিছে পিছে দৌড়িতেন। তিনি বিদ্যারম্ভের উপযুক্ত কাল দেখিয়া, শুভদিনে ও শুভক্ষণে গৌরাঙ্গের হাতে খড়ি দিলেন; এবং সেই হইতে, অন্য বহুকার্য্যে উপেক্ষা করিয়া, গৌরাঙ্গের শিশু-সমুচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমধিক মনোযোগী হইলেন।

গৌরাঙ্গের বিদ্যারম্ভ হইল বটে। কিন্তু, তাঁহার সেই উল্লাসময় চাঞ্চল্যের স্রোতে, তখন পর্য্যন্ত, ভাঁটার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল না। তিনি, জগন্নাথ ও জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপের সস্নেহ শাসনে, প্রাতে কিছুক্ষণ বসিয়া কালি কলম লইয়া, পরিশ্রম করিতেন; এবং যেই জগন্নাথ, জীবিকার প্রয়োজনে, স্থানান্তরে যাইতেন, অমনি সমস্ত অঙ্গে কালি মাখিয়া, সঙ্গের বালকদিগকে যুটাইয়া লইয়া, আনন্দময় কোলাহলের সহিত, ঠিক একটা তুফানের মত, গঙ্গায় যাইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন;—অথবা গঙ্গাজলে ক্ষণকাল ডুবিয়া রহিয়া, শেষে একটি পূর্ণবিকশিত স্বর্ণকমলের মত, গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভাসিয়া বেড়াইতেন।

নবদ্বীপের প্রান্তবাহিনী গঙ্গা তখন এক রমণীয় দৃশ্য ছিল। গঙ্গার এক পারে কুলিয়া ও বিদ্যানগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম, আর এক পারে, সেই সময়ের শত-সৌভাগ্য-সমুজ্জ্বল নবদ্বীপ। মধ্যে হংস-বক-সারস-খঞ্জন প্রভৃতি বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র বিহঙ্গসেবিত, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চড়া ভূমি। নদী, চড়া ভূমির ব্যবচ্ছেদে, খুব বড় হইয়াও, অনেক স্থলে ছোট, এবং সুতরাং স্ত্রীলোক ও বালকদিগের সুখ-সেব্য। নদীর পার দিয়া, তিন চারি মাইল পথ যুড়িয়া, সুবিস্তৃত রাজ-পথ। পথের দুই ধারে, সারি দিয়া, বকুল, কদম্ব, কাঁটাল, আম, ও নিম প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষের পংক্তি,—মাঝে মাঝে, বালক-সমাজে বৃদ্ধের ন্যায়, বট অশ্বত্থ পাকুল প্রভৃতি বড় বড় ছায়াতরু;—আর স্থানে স্থানে, গঙ্গায় নামিবার জন্য, নানারূপ সুগম ও মনোরম ঘাট। সর্ব্বত্রই কিবা প্রাতে—কিবা মধ্যাহ্নে, এবং কিবা সায়ন্তন সময়ে, লোকের ভিড়। কেহ স্নান করিতে নামিতেছে;—কেহ স্নান করিয়া, গঙ্গার স্তব পাঠ করিতে করিতে, আর্দ্রবস্ত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতেছে;—কোন ঘাটে কুলকামিনীরা, লজ্জায় জড় সড় হইয়া, অবগাহন করিতেছেন;—কোন ঘাটে, নবদ্বীপের বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দ, স্নানের সময়েও, শাস্ত্রের কথা তুলিয়া, বিবাদে মত্ত হইতেছেন। যে সকল ঘাটে কুলস্ত্রীরা স্নান ও আহ্নিকে ব্যাপৃত, তাহার অদূরে, কচি মেয়েরা, ঘাটের ফুল ফল ও পাতা কুড়াইয়া, কৃত্রিম নৈবেদ্য সাজাইয়া, পূজার অভিনয়ে খেলা করিতেছে; এবং কোন কোন ঘাটে, কেহ

কোনরূপ মানস করিয়া, তালপত্রের ছত্রের নীচে বসিয়া, গীতা কি চণ্ডী পাঠে, চারিদিকের কোলাহল ভুলিয়া রহিতেছে। নবদ্বীপের গঙ্গা সেই সময়ে প্রকৃতই একটি দর্শনীয় স্থান ছিল।

আজিকার এ বঙ্গে, নদীর ঘাটে, নানা স্থলেই অন্তঃসার-শূন্য কৃত্রিম সভ্যতার নানাবিধ বিলাস-সম্পদ প্রদর্শিত হয় বটে। কিন্তু পুরাতন বঙ্গের সেই প্রদীপ্ত-পাবক-সদৃশ পণ্ডিতবর্গ, নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে, যেরূপ দেবজন-স্পৃহণীয় স্বর্গীয় শোভায় সমুজ্জলিত রহিতেন, তাহা এক্ষণ বঙ্গের কোথাও আর পরিলক্ষিত হয় কি? কাশী, কাঞ্চী ও মথুরা প্রভৃতি কোন দূর স্থানের বিদ্যার্থী ব্যক্তি, সেই সময়ে, নৌকা পথে, নবদ্বীপের সন্নিহিত হইলে, বাঙ্গালির প্রকৃত জাতীয় সম্পদ প্রত্যক্ষ করিয়া চিত্তে যেরূপ চমকিত হইতেন, আজি এ বঙ্গের কোথাও তাহা সম্ভবপর হয় কি? হায়, বঙ্গের সে সুখ-সৌভাগ্য ও জ্ঞান-গৌরবের দিন আবার কখনও লোকের নয়ন-গোচর হইবে কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মায়াপুর-পল্লী গঙ্গার বড়ই সন্নিহিত ছিল। যেখানে শচীর কুটীর, সেখান হইতে গঙ্গার তট, সম্ভবতঃ চারি পাঁচ মিনিটের পথ। গৌরাঙ্গের বয়স যখন পাঁচ ছয় বৎসর, সেই সময় হইতে, তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার শেষ পর্য্যন্ত, গঙ্গার তট-ভূমি, দিবসের কোন না কোন সময়ে, প্রতিদিনই তাঁহার লীলাভূমি, এবং প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গা, তাঁহার প্রমোদ-বিলাসের সুখ-সরসী। তিনি, পাঠশালার বাঁধনী হইতে বাহির হইয়া, এক দৌড়েই গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং সেখানে, কখনও জলে ভাসিয়া, কখনও লোকের গায়ে জল ছিটাইয়া, নানারূপে আমোদ করিতেন। তাঁহাকে বাড়ীতে না পাওয়া গেলে, শচী কি জগন্নাথ, তৎক্ষণাৎই ছড়ি হাতে করিয়া, গঙ্গার তটে খুঁজিতে আসিতেন; এবং গৌরাঙ্গ অনেক দিনই জনক-জননীকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আর এক ঘাট ও আর এক পথ দিয়া, বাড়ী যাইয়া, নিতান্ত শিষ্ট-শান্ত ও সুধীর বালকের মত ঘরে বসিয়া রহিতেন। তাঁহার পিতা মাতা, বালকের ঐরূপ চতুরতা দেখিয়া, হাসিয়া অধীর হইতেন।

শচী ও জগন্নাথের কাছে এখন হইতে গৌরাঙ্গের নামে নিত্য নূতন নালিশ উপস্থিত হইত। পাড়ার ছোট ছোট বালিকারা, গঙ্গার ঘাট হইতে বাড়ীতে ফিরিবার সময়, প্রায়ই শচীর নিকট, গৌরাঙ্গের নামে, কোন না কোন অভিযোগ করিয়া যাইত; এবং শচী তাঁহাদিগকে কোলে কাঁকে তুলিয়া, মিষ্ট বস্তুর উপহারে, অথবা মিঠা কথার উপচারে, সান্ত্বনা দানে বিদায় করিতেন। কেহ বলিত,—পিসী মা তোমার নিমাই বড় দুরন্ত। সে আজি, আমার খোপাটি খুলিয়া ফেলিয়া, খোপার মধ্যে ওকড়ার বিচি ভরিয়া দিয়াছে। কেহ বলিত,—আমি যত ফুল ফল কুড়াইয়া নৈবেদ্যের আয়োজন করিয়াছিলাম, নিমাই তাহার সবই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কেহ বলিত,—ঠাকুরাণি! তোমার নিমাই বড়

বেশী চঞ্চল। সে আমাদের পাড়ার এক জনের গায়ে বালু দিয়াছে, এবং আমার মুখের মধ্যে জলের 'কুল্লোল' দিয়া আমাকে পুনরায় স্নান করাইয়াছে। কেহ আবার বালিকা বয়সের সেই এক প্রকার লজ্জায়, মাথা হেঁট ও মুখ ভার করিয়া, এবং একটুকু ক্রোধ দেখাইয়া, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলিত, আমি তোমার নিমাইর সহিত আর কথা কহিব না। সে আমায় বে করিতে চাহিয়াছে।

যথা চৈতন্যভাগবতে,—

"ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল,
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল।
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে,
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে।
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বোল,
কেহ বলে মোর মুখে দিলেক কুল্লোল।
ওকড়ার বিচি দেয় কেশের ভিতরে,
কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে।"

শচী, এই সকল অভিযোগ শুনিয়া, তাঁহার অধরের অস্ফুট হাসি চাপিয়া রাখিতেন, এবং নিমাইর নাম লইয়া, খানিক কাল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, বালিকাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। কখনও বলিতেন,—মা, আমি কল্য হইতে নিমাইকে বাঁধিয়া রাখিব। কখনও বলিতেন, তোমরা নিমাইকে কিছু মাত্র ভয় করিও না। মিশ্র ঠাকুর কল্য ঘাটে যাইয়া নিমাইকে ভালরূপ শিক্ষা দিবেন।

কিন্তু, শচীর এ সকল ধমক চমকে কিছুই হইত না। গৌরাঙ্গ প্রতি দিনই স্নানের ভাণ করিয়া প্রহরেক কাল গঙ্গার ঘাটে থাকিতেন, এবং কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু, সকলের সহিতই নির্ভয়ে আমোদ করিতেন। যে সকল বালিকারা তাঁহার নামে নালিশ করিত, তিনি তাহাদিগের কাছে ভ্রূকুটি করিয়া বলিতেন,—তোমাদিগের অতি বৃদ্ধ বরের সহিত বিবাহ হইবে, এবং তোমরা চিরকাল সতীনের জ্বালায় কষ্ট পাইবে। যে সকল বালিকা তাঁহার নামে নালিশ করিত না, অথচ কোন না কোনরূপ শিশু-বিলাসি সুখ-কৌশলে, তাঁহার মন যোগাইত, তিনি ঐ বয়সেই তাহাদিগের নিকট যাইয়া, বৃদ্ধের মত গম্ভীরভাবে, দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন, তোমরা বড় ভাল। তোমরা মনের মত সুন্দর বর পাইবে, এবং তোমরা প্রত্যেকে সাত পুত্রের মাতা হইয়া, ধনে জনে ও নানারূপ সুখসৌভাগ্যে, চিরকাল আনন্দে রহিবে। বালিকাদিগের মধ্যে অনেকে আবার তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিতে ভালবাসিত, এবং মিশ্র ঠাকুরকে ঘাটে আসিতে দেখিলে, আগেই তাহা, নয়ন বাঁকাইয়া, ইঙ্গিতে তাঁহাকে জানাইয়া দিত। "নিমাই পালাও, ঐ আসিতেছে"—যেই এই প্রকার কোন একটি মৃদু কথা, কোন বালিকার মুকুলিত অধরে, মুচ্‌কে হাসির সহিত স্ফুরিত হইত, অমনি গৌরাঙ্গ ও তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গিদিগের দ্রুত পলায়নে সেখানে একটা নূতন রকম খেলার অভিনয় হইয়া যাইত। জগন্নাথ মিশ্রের প্রায় প্রতিদিনই পরাভব ঘটিত। যাহারা অভিযোগিনী, তাহারাই আবার প্রহরিণী ও পরিরক্ষিণী। তিনি

এ নাটকে আর কোন্ পথ লইবেন, এবং কি করিতে যাইয়া কি করিবেন ?

গঙ্গার ঘাট হইতে বৃদ্ধেরাও কোন কোন দিন শচী কি জগন্নাথের কাছে আসিয়া দুঃখ জানাইতেন।

"কেহ বলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান,
ভাল মতে না পারি করিতে গঙ্গা স্নান।
স্নান করি উঠিলেই বালু দেয় অঙ্গে,
যতেক চপল শিশু সব তার সঙ্গে।
কেহ বলে মোর শিবলিঙ্গ করে চুরী,
কেহ বলে মোর ল'য়ে পলায় উত্তরী।
কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া,
ডুব দিয়া ল'য়ে যায় চরণে ধরিয়া।
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হ'তে,
দেহ বা ইহার ভাল থাকিবে কেমতে।"

বৃদ্ধদিগের এই শেষ কথাটুকু একটুকু স্নেহের পরিচায়ক। এইরূপ কথা পিতা মাতার মুখেই সাধারণতঃ শোভা পাইয়া থাকে। কিন্তু নবদ্বীপের অনেকেই তখন, গৌরাঙ্গের নামে, সময়ে সময়ে অভিযোগ করিতেন, অথচ স্নেহের মধুর আকর্ষণে, গৌরাঙ্গের জন্য খাবার জিনিষ কিংবা ফুলের মালা প্রভৃতি চিত্তহারি বস্তু মনে করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইতেন। গৌরাঙ্গ ছোট সময়েই সন্তরণে বড় বেশী পটু হইয়াছিলেন। তিনি গঙ্গার জলে, সন্তরণের নানারূপ সুখ-শোভন ভঙ্গিতে ভাসমান * রহিতেন, এবং নবদ্বীপের নর-নারীকে, যেন বুঝিয়া সুঝিয়া, —অথবা না বুঝিলেও, যেন কার কি প্রকার প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া, তাঁহার প্রাণের

কিন্তু, বোধ:হয়, নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গালায় এই শব্দটির প্রয়োগ কোন অংশেও ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ অপপ্রয়োগ নহে। "ভাস দীপ্তৌ, ইচ্ছায়াঞ্চ" অকর্ম্মক ও আত্মনেপদী। সুতরাং ভাস্‌ধাতু শানচ্ প্রত্যয়যোগে সর্ব্বদাই ভাস-মান পদে পরিণত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন গোলযোগ নাই। গোলযোগ অর্থ লইয়া। বৈয়াকরণেরা বলিবেন যে, দীপ্ত্যর্থক ভাস ধাতুকে এই নূতন অর্থে আকর্ষণ করিবে কি প্রকারে ? প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রধান সংস্কৃত-প্রফেসর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ভাসমান শব্দের প্রয়োগে উল্লিখিত রূপ আপত্তি করিয়া থা-কেন। কিন্তু কাত্যায়ন ও বররুচি প্রভৃতি টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা "ধাতুনামনে-কার্থত্বাৎ" বলিয়া যে পরিসর পথ খুলিয়া দিয়াছেন, তাহাতে জলে ভাসা অর্থটিও ঐ দীপ্তি ও ইচ্ছার্থের অন্তর্গত অথবা সন্নিহিত হইতে পারে না কি ? 'রাম নয়ন-জলে ভাসিতেছেন'—'দেশ জলে ভাসিয়া যাই-তেছে'—'আমি কি ভেসে এসেছি' ইত্যাদি বাক্যে ভাস ধাতুর প্রয়োগ যখন এক প্রকার অপরিহার্য্য এবং বিশিষ্ট অর্থপ্রতিপাদক, তখন 'ভাসমান' পদও, আমাদিগের বিবে-চনায়, ব্যাকরণতঃ শুদ্ধ ও ভাষার শক্তিবর্দ্ধক।

* 'ভাসমান' এই শব্দটি সুবিজ্ঞ বৈয়া-করণদিগের একটু কানে বাধিতে পারে।

দিকে আকর্ষণ করিতে ভালবাসিতেন। তাঁ-হার যদি ঘাটে যাইতে কোন দিন বিলম্ব ঘটিত, তাহা হইলে বালিকারা তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং বৃদ্ধেরাও যেন কিছু একটা অভাব মনে করিত। ইহা অবশ্যই কতক তাঁহার মনোমোহন রূপের মহিমা, এবং কতক তাঁহার মনভুলান, হাসি, মধুমাখা চাহনি এবং সুমধুর কথার মহিমা।

বালিকাদিগের প্রসঙ্গে এখানে একটির নাম একটুকু বিশেষরূপে উল্লেখ করিব। নবদ্বীপে বল্লভাচার্য্য নামে একটি সহৃদয় বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার একটি বড় সুন্দরী বালিকা ছিল। তাঁহার নাম লক্ষ্মী। লক্ষ্মীও, পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে, গঙ্গার ঘাটে যাইতেন। কিন্তু তিনি, গৌরা-ঙ্গের চাঞ্চল্যজনিত অত্যাচারে, কোনরূপ বিরক্ত না হইয়া, বরং একটুকু বেশী প্রীতি দেখাইতেন। তিনি, সময়ে সময়ে, আর পাঁচ জনকে ডেঙ্গাইয়া, গৌরাঙ্গের সেই খেলার আমোদে একটুকু বেশী মিশিতেন। পাঠক, এই ননীর পুতুল বালিকাটিকে ভুলিবেন না। ইঁহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

গৌরাঙ্গ কেবল গঙ্গার ঘাটেই আমোদে ভাসিতেন, এমন নহে। নবদ্বীপের নগর-পথেও লোকে অনেক সময় তাঁহার দেখা পাইত; এবং অনেকে, শুধু তাহার খেলা দেখিবার জন্যই, সেই সকল পথে বেড়া-ইতে যাইত। তাঁহার শিশু-সেনা ক্ষণকালও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িত না। মনুষ্য-জগতে, কুত্রচিৎ কখনও, বাল-চরিত্রেই এইরূপ মোহিনী শক্তির বিকাশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। গৌরাঙ্গে এ শক্তি একটুকু অতিরিক্ত অথবা অলৌকিক মাত্রায় প্রবল ছিল। তিনি একবার যাহাকে গলায় ধরিয়া, বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করিতেন, সে-ই চির জীবনের তরে তাঁহার হইয়া রহিত; আর তাঁহার কাছ ছাড়িতে পারিত না। তিনি তাঁহার এইরূপ প্রীতি-মুগ্ধ বালকদিগকে লইয়া নগরের পথে খেলা করিতেন, এবং নানারূপ অভিনয় দেখাইয়া নর-নারী মাত্রে-রই হৃদয়ে আনন্দ জন্মাইতেন।

একদিন মধ্যাহ্ন-স্নানের কিছু পূর্ব্বে, গৌরাঙ্গ এরূপ খেলা পাতিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত নামক একটি সুপ-ণ্ডিত অথচ অভিমানী যুবা, সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। মুরারির পূর্ব্ব-নিবাস শ্রীহট্ট। তিনি তখন, আরও অনেকের ন্যায়, নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট। মুরারি শ্রীহট্টবাসী আর আর সকলের সঙ্গে মায়াপুরে বসতি করি-তেন; এবং আমাদিগের সদাশয় মিশ্র ঠাকু-রকে অভিভাবক বলিয়া মানিতেন। মুরারির বয়স তখন বিশ কি পঁচিশ। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিবিধ শাস্ত্রে অসাধারণ পা-ণ্ডিত্য লাভ করিয়া সমস্ত নবদ্বীপেই সুপরি-চিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে দামোদর পণ্ডিতের নিকট বলি-য়াছেন,—

"নূতন বয়স মোর বিদ্যার গৌরব,
সর্ব্ব নবদ্বীপময় আমার সৌরভ।

আপনাকে করি আমি জ্ঞানী অভিমানী।
বিশিষ্ট পড়িয়া, ভক্তি আদৌ নাহি মানি।”

মুরারি পথ দিয়া যাইতেছেন, এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাহাদিগের কাছে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া, শাস্ত্রের কথা কহিতেছেন। গৌরাঙ্গও সে দিন সেই পথেই খেলিতে ছিলেন। মুরারি অনন্যমনস্কতা হেতু, গৌরাঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, অমনিই তাঁহার সঙ্গ লইলেন, এবং মুরারি যেরূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া, তাঁহার বয়স্যদিগকে শাস্ত্রের রহস্য বুঝাইতেছেন, গৌরাঙ্গও ঠিক তেমনই অঙ্গভঙ্গী করিয়া, দুই চারিটি বালক লইয়া, তেমনই ভাবে তাঁহার পিছে পিছে যাইতে লাগিলেন। মুরারি, কিছুক্ষণ পরে, পিছের দিকে চাহিয়া, বালকের সেই অভিনয় দেখিতে পাইলেন, এবং পথের বালকেরা গৌরাঙ্গের ইঙ্গিত ক্রমে, নানাবিধ ভঙ্গীতে, তাঁহাকে উপহাস করিতেছে জানিয়া, তখন মনে বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু, বলা বাহুল্য, মুরারির এই ক্রোধ অধিকক্ষণ রহিল না। মনুষ্যের ক্রোধ গৌরাঙ্গের অমায়িক মাধুর্য্যের কাছে জল হইয়া যাইত। মুরারি তখন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন বটে; কিন্তু অপরাহ্ণে গৌরাঙ্গকে শচীর কোলে দেখিয়া, স্নেহে আবার গলিয়া গিয়াছিলেন। এই মুরারি বঙ্গীয় বৈষ্ণব ইতিহাসে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। মুরারি গুপ্তের করচা নামে একখানি পুস্তক ছিল। তাহা বৈষ্ণব কবিদিগের গ্রন্থপত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। তিনি পরিণত-বয়সে গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে শেষে এই বিশ্বাস অতি দৃঢ় হইয়াছিল যে, গৌরাঙ্গ যে তাঁহাকে বাল্যাবস্থায় ঐ রূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের অভিমান দূর করিবার জন্য।

বৈষ্ণব-কবিরা গৌরাঙ্গের বাল্য-জীবনের এইরূপ আরও বহুবিধ চারু-চিত্রময়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এ সকল ক্ষুদ্র কথার সহিত বঙ্গীয় ভক্তিবিপ্লবের বিরাট চিত্রের বিশেষ সম্পর্ক কি? যাঁহারা সামান্য একটুকু চিন্তা করিবেন, তাঁহারাই প্রত্যুত্তর বলিবেন, সম্পর্ক ক্রম-বিকাশের কমনীয় মহিমা অথবা মনোমোহিনী মাধুরী-প্রদর্শন। সাগর-সঙ্গতা-ভাগীরথীর শোভা ও শক্তি কিংবা প্রকৃতি ও গতির অর্থ বুঝিতে হইলে, একবার প্রাকৃত-জটা-জূট-মণ্ডিত হিমাদ্রি-শিখরে হর-জটায় যাইয়া উৎস-নিঃসৃত নবোদ্গত জলরাশির উন্মাদনৃত্য ও উল্লাস-দর্শন উপযুক্ত হয় না কি? যাঁহারা গৌর-চরিত্রের গভীর-রহস্য-বিষয়ে এতটুকু চিন্তা করিতেও ইচ্ছুক নহেন, তাঁহারাও আপনা হইতেই দেখিতে পাইবেন যে,—গৌরাঙ্গ একদিকে যেমন চঞ্চল, আর এক দিকে স্নেহ-মমতার টল-টল-পূর্ণতায় তেমনই মধুর—তেমনই কোমল। অপিচ, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি এত বেশী তীক্ষ্ণ যে, তাঁহার পিতা মাতা ও প্রতিবেশীরা, তাঁহার সম্বন্ধে, তখন হইতেই, যার-পর-নাই আশান্বিত,—কখনও বা অল্প একটুকু আশঙ্কিত। ভ্রাতৃবৎসল বিশ্বরূপও গৌরাঙ্গের অমায়ী বুদ্ধি এবং উদ্দাম আনন্দ-লীলা নিরীক্ষণ করিয়া, মনে এক এক সময়ে, একটুকু ভাবাবিষ্ট হইতেন, এবং এইরূপ বালক, কালে কেমন হইয়া উঠিবে, তাহা চিন্তা করিতেন। কিন্তু, গৌরাঙ্গের চোখের দিকে চাহিলেই সকলের সকল চিন্তা দূর হইয়া যাইত। তাঁহার চক্ষু দুটিতে এমনই একটুকু চারু-প্রফুল্ল স্নিগ্ধ-মাধুরী ছিল যে, যে তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিত, তাহারই প্রাণটা যেন শীতল হইত,—তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে যেন একটা আনন্দের প্রস্রবণ উথলিয়া উঠিত।

সলিল-শয্যায়। *

“I'll play the swan;
And die in music”—Othello.

ঘুমায়েছে দুপুরের আলো
নিভৃতে সে তটিনীর গায়;
অবসাদে, নির্জ্জন প্রান্তরে,
বনচ্ছবি নিস্তব্ধে ঘুমায়।

স্নিগ্ধ মেঘে ছেয়েছে আকাশ,
বারিধারা ঝরে অবিরত;
ধারাগুলি, চিত্রিত আকাশে,
ম্লানপাংশু ছায়া রেখা মত!

দিগন্তেতে ধূসর আঁধার—
আর্ত্তবায়ু কাঁদিয়া বেড়ায়!
কল্লোলিনী আতট উচ্ছ্বাসে,
অন্তরের বেদনা জানায়।

পার্শ্বে তার, দীর্ঘ শর-বীথি,
আকম্পিত তরঙ্গ-হিল্লোলে;
জীর্ণ-পত্রা, আভরণ-হীনা,
ম্লানকান্তি, বনলতা দোলে!

তীরে শুধু ধুতূরার বন,
কণ্টকিত মরুলতা মাঝে;
নিশিদিন ঝাউ-তরু এক,
শর শর দীর্ঘশ্বাস ত্যজে।

বায়ু শুধু দূর হ'তে আনে
কাননের বিশীর্ণ পল্লব;
কানে শুধু নিকটেতে বাজে
হুতাশের মর্ম্মভেদী রব।

ধূ ধূ করে শুষ্ক মাঠ তটে,
আঁকাবাঁকা জল করে খেলা—
রাজহংস অন্তিম-শয়নে
দূরে ভাসে মধ্যাহ্নের বেলা!

* টেনিসনের ছায়ামাত্র অবলম্বনে রচিত।

আর্দ্র তার অবসন্ন পাখা;
আঁখি দুটি নিমীলিত প্রায়;
জীবনের শেষ দিন তার --
বিদায়ের গীত তাই গায়।

চেয়েছিল আধ, দৃষ্টে বুঝি,
মেঘস্নিগ্ধ আকাশের পানে,—
প্রসারিত স্তব্ধ বারিরাশি—
—কি স্মরিয়া, কেহ নাহি জানে!

প্রতিধ্বনি দূর গ্রাম হ'তে
শ্রবণে কি পশেছিল তার—
জীবনের অশ্রান্ত সংগ্রাম,
জীর্ণ-তন্ত্রী ধ্বনি অনিবার?

স্মরেছিল আর একদিন,
ভেবেছিল বুঝি অন্য কথা —
ফুল্ল কোন শান্ত সরোবর,
বলাকার শ্রেণী ভ্রমে যথা?

বিকসিত নলিনীর শোভা,
আলো করি স্নিগ্ধ জলরাশি,
বনশ্যাম, নিরজন তট,
শুভ্র এক হংসী আসে ভাসি!

—আর আজি দূর প্রবাসেতে,
কোন এক অবিদিত দেশে,
পূর্ব্বকথা স্মরি শেষ দিনে,
[illegible]খতের গান মনে আসে।

নিস্তব্ধ সে মেঘমন্দ্র-কূলে,
বর্ষ-ক্ষুব্ধ তটিনী উপরে,—
বন-ভরা লতাকুল মাঝে,
সে সঙ্গীত প্রতিধ্বনি করে!

মর্ম্মভেদী গান তার যেন,
বেদনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
কভু দূরে, সমীপেতে কভু,
বায়ু সনে আসিল ভাসিয়া।

অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের মাঝে,
স্বর তার পরুষ গম্ভীর—
ধীর কণ্ঠে উঠিল জাগিয়া,
বিস্ময়েতে পূরিল সমীর।

যেন কোন বিজয়ী সেনানী
মহোৎসবে এল পুর দ্বারে,
উল্লাসের কম্বুধ্বনি সহ,
জয়-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন তরে!

সে উন্মদ, ভীতিকর ধ্বনি
তীর বন পূরিল প্লাবিয়া
বনলতা, ধুতূরার ফুল,
শর-গাছ, ফেলিল ছাইয়া।

অজ্ঞাত সে আনন্দের স্বর
পশিলেক দিগন্ত আকাশ,
মরণের অমর সঙ্গীত—
জীবনের অনন্ত বিকাশ!

উত্তরপাড়া
বৈশাখ ১৩০৯ } শ্রীনীহার রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দু-জ্যোতিষ।

প্রথম অধ্যায়।

আর্য্যজাতির প্রাগৈতিহাসিক জ্যোতিষ।

আফ্রিকা ও এসিয়া মাইনরের পূর্ব্ব, প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম, ৩০ হইতে ৪৫ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তী, দৈর্ঘ্যে ৪০০০ মাইল এবং প্রস্থে ৯০০ মাইল বিস্তৃত এসিয়া মহাদেশের যে ভূভাগ দৃষ্ট হয়, তাহা পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বর। ইহার মধ্যে বহু মরুভূমি, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ ও সমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে, ইহার কোন কোন স্থানে, কৃষিজীবিগণ বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অপর এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট ঘর বাড়ী ছিল না। তাঁহারা, ভিন্ন ভিন্ন দলে, পশুপালসহ বিচরণ করিতেন এবং যে স্থানের উৎপাদিকা শক্তি ভাল দেখিতেন, সেই স্থানে তাঁবু ফেলিয়া কিছু কাল বাস করিতেন। এই পশুচারণানুজীবি ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে, কেহ কেহ পশ্চিমাভিমুখে, কেহ কেহ দক্ষিণাভিমুখে, এবং কেহ কেহ পূর্ব্বাভিমুখে, দেশান্তর গমন পূর্ব্বক তথাকার অধিবাসিদিগকে পরাস্ত করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

সার উইলিয়ম জোন্স্ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতায়, এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে, যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে বলেন যে, পারস্য হিন্দু, রোমান্, গ্রীক, গথ ও প্রাচীন মিসরীয়েরা সকলে একই ভাষাতে কথা বলিতেন, এবং একই ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

ইহার পর, বহু পণ্ডিত পৃথিবীর নানাস্থানের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহার প্রভৃতির পরস্পর তুলনা করিয়া, এই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সংস্কৃত, জেণ্ড্ ও সমস্ত ইউরোপীয় ভাষা, এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং বর্ত্তমান সময়ে, এ সকল ভাষার মধ্যে, যে পার্থক্য উপলব্ধ হয়, তাহা কেবল বিভিন্ন জাতির পরস্পর সংমিশ্রণের অবশ্যম্ভাবি ফল। সুতরাং, অধ্যাপক মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দুজাতীয়েরা সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেও, তাঁহারা সকলের শেষে মধ্যদেশীয় আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই সংস্কৃত ভাষাতে গণ, ব্যাকরণ, শব্দ ও উপাখ্যান সম্বন্ধে যত মৌলিকতা দেখা যায়, আর কোন ভাষাতে তত দেখা যায় না। *

আর্য্যজাতীয়েরা পর্য্যটন করিতে করিতে,

* হিন্দুরা স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে যান নাই এবং বিভিন্ন জাতির সহিত তত মিশেন নাই মনে করিলেও, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

যে কেবল দক্ষিণাভিমুখে ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখে ইয়ুরোপ খণ্ডে এবং পূর্ব্বাভিমুখে চীন দেশে গমন করিয়া তথায় বিস্তৃত রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। চীন সাম্রাজ্য বা স্বর্গীয় রাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে হুহল্‌দি বলেন,—চীন সাম্রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণ মত এই যে, নোয়ার সন্তানগণ এসিয়ার পূর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইয়া, জলপ্লাবনের ২০০ বৎসর পরে, চীন দেশে উপস্থিত হন। জলপ্লাবন খৃষ্টীয়াব্দের ৩২৫৮ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। হুহল্‌দির মতে হ্যা বংশীয় চীন সম্রাট যুখৃষ্টীয়াব্দের ২২০৭ বৎসর পূর্ব্বে, রাজ্যভার গ্রহণ করেন। চীন দেশীয় ইতিবৃত্তে বর্ণিত সূর্য্যগ্রহণ খৃষ্টীয়াব্দের ২১৫৫ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে গণনা করিলেও ঠিক সেই সময়ে এক সূর্য্যগ্রহণ পাওয়া যায়। সুতরাং, উহার বহু পূর্ব্ব হইতে,যে চীন দেশে লোকের বসতি হইয়াছিল, এবং প্রথম সম্রাটের রাজত্ব কাল যে, খৃষ্টীয়াব্দের ২৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ছিল, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।

হিন্দুজ্যোতিষে বিজয়াদি ষষ্টি সম্বৎসরাত্মক বার্হস্পত্য বর্ষগণনার নিয়ম প্রচলিত। এই ষষ্টি সম্বৎসরাত্মক বর্ষ গণনার নিয়ম ক্যাল্‌ডীয় চীনদিগের মধ্যেও প্রচলিত থাকা দেখা যায়। চীন দেশে এইক্ষণ পর্য্যন্তও ইহার ব্যবহার আছে। কেহ কেহ বলেন, এই নিয়ম খৃষ্টাব্দের ২৭৫৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সময়ে পর্য্যটক জাতীয়েরা সকলেই একত্র বাস করিতেন।

উক্ত খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব ২৭৫৭ সনে, যখন দেশান্তরগামিদিগের এক শাখা পূর্ব্বদিকে চীনাভিমুখে যাত্রা করে, তখন উরগ (Draconis) নামক তারা উত্তর ধ্রুবের নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহা একটি তৃতীয় শ্রেণীর তারা।* উহাকে সেই সময়ে ৩০ হইতে ৪০ অংশ উচ্চগগনে আর্য্যগণ ধ্রুব নক্ষত্ররূপে অবলোকন করিতেন। প্রতি রাত্রিতে যখন তাঁহারা পশু চরাইতেন, তখন সকলেই দেখিতে পাইতেন যে, উরগ মণ্ডলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগণ উক্ত ধ্রুবতারাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। যাঁহারা চীন দেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে,চীনদেশীয়গণ উরগ (dragon) মূর্ত্তির কিরূপ সম্মান করেন। তাঁহাদিগের রাজচিহ্নই উরগ মূর্ত্তি, দেবমন্দিরে, গৃহে ও বস্ত্রাদিতে উরগ মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয়াব্দের ২৮০০ বৎসর পূর্ব্বে, উক্ত উরগ তারা উত্তর ধ্রুব হইতে মাত্র ১০ কলা দূরবর্ত্তী অয়নান্ত রেখার উপরে ছিল। সেই সময়ে চীনদেশীয়দিগের ধর্ম্ম হিন্দুদিগের বৈদিকধর্ম্মের অনুরূপ ছিল, সুতরাং অয়ন এবং বিষুবৎ সংক্রান্তিতে তাঁহারা ভগবানের পূজাদি করিতেন। তাঁহারা স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে চারিটি পর্ব্বতের উপর মন্দির

* সপ্তর্ষি মণ্ডলের শেষ তারা ও বর্ত্তমান ধ্রুব তারার সংযোজক যে রেখা, তাহার নিকটে প্রায় মধ্যস্থানে ইহার অবস্থিতি।

প্রস্তুত করিয়া,তাহাতে এক অদ্বিতীয় বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার চিহ্নস্বরূপ ঠায়েন্ বা স্বর্গের পূজোপহার ও বলি প্রদান করিতেন। মহাবিষুবে পূর্ব্বদিকে, দক্ষিণায়নে দক্ষিণ দিকে, জলবিষুবে পশ্চিম দিকে এবং উত্তরায়ণে উত্তর দিকে বলি প্রদান করা হইত। হিন্দুদিগের মনু সংহিতাতেও সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি উক্ত চারি সংক্রান্তিতে নক্ষত্রগণের পূজাকরার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অত্যুচ্চের এই পূজার সহিত হিব্রু বাইবলের লিখিত পর্য্যটক এব্রাহিমের প্রার্থনা ও বলি প্রদানের কতক সাদৃশ্য আছে।

ইহাতে দেখা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক সময়ে, যাঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে এক মূল জাতির অন্তর্গত ছিলেন, এই বিষয়ের প্রমাণ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। যথা—

১। এক অদ্বিতীয় বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতার নিকট প্রার্থনা ও বলি প্রদান রূপ একই ধর্ম্মে বিশ্বাস।

২। তাঁহাদিগের মধ্যে একরূপ বারের প্রচলন এবং ঐ সকল বারের উপর রবি, চন্দ্র, ও মঙ্গলাদি পাঁচ গ্রহের আধিপত্য অনুসারে ক্রমে উহাদিগের নামকরণ।

৩। তাঁহারা সকলেই রাশিচক্রকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া,উহার এক এক ভাগকে রাশি বলিতেন, এবং এক এক রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান অনুসারে, দ্বাদশ মাসে বৎসর গণনা করিতেন।

এসিয়া খণ্ডের এই পর্য্যটক জাতীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাঁহারা আবার রাশিচক্রকে ২৮ নক্ষত্র পুঞ্জে ভাগ করিয়াছিলেন। নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে চন্দ্র প্রতিদিন উহার এক এক ভাগ অতিক্রম করিয়া থাকে। এই জন্যই উহাদিগকে চান্দ্রগৃহ বলা যায়। এইরূপে রাশিচক্রকে ২৮ চান্দ্রগৃহে বিভক্ত করার প্রথা-জাতি সকলের পক্ষে সাধারণ হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উহাদিগের নাম স্বতন্ত্র। হিন্দু জ্যোতিষে উহাদিগকে নক্ষত্র বলে। চীন দেশে উহাদিগের নাম সিউ এবং মধ্য এসিয়াতে মঞ্জিল বা প্রাসাদ অর্থাৎ চন্দ্রের গৃহ বা স্থান। রাশিচক্রের এরূপ ভাগ পশ্চিম দেশে প্রচলিত নাই। মিসর দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ ভাগের উল্লেখ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে পাওয়া গেলেও, উহার কোনরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। গ্রীস দেশীয় জ্যোতিষে উহার উল্লেখই নাই। জোতিঃশাস্ত্র যখন ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছিল, তখন হিন্দুগণ রাশিচক্রের উক্ত নাক্ষত্রিক ভাগ ব্যবহার করিয়াই অন্যান্য প্রাচীন জাতির উপর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই চান্দ্র-প্রণালীর ভাগ সর্ব্বদা ব্যবহার করাতেই পাশ্চাত্য নব্যপ্রণালী হইতে হিন্দুজ্যোতিষের প্রভেদ ঘটিয়াছে।

ভগোলের রচনা প্রথম কোন্ জাতি করিয়াছে, তাহা নিয়া বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে তর্ক চলিতেছে। ইহা নিশ্চিত যে, গ্রীকদিগের কল্পিত দেবোপা-

খ্যানসহ গ্রীস্ দেশীয়দিগের নিকট হইতে ভগোলের ব্যবহার পাশ্চাত্য জ্যোতিষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইতিহাসের প্রবর্ত্তনা হইতেই দেখা যায় যে, দ্বাদশ রাশির আকারসহ রাশিচক্রের ব্যবহার প্রায় একইরূপে গ্রীক, মিসরীয়, ক্যাল্‌ডীয়, পারস্য, হিন্দু ও চীনদিগের মধ্যে প্রচলিত। ইহা দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, আর্য্যজাতীয়েরা তাঁহাদিগের মধ্য এসিয়াস্থিত পূর্ব্ব নিবাস পরিত্যাগ করার পূর্ব্বেই, ভগোল ও রাশিচক্রের ব্যবহারে তাঁহাদিগের সাধারণ স্বত্ব ছিল।

পশুচারণানুজীবিগণ যখন পশুপালের প্রহরীস্বরূপ রাত্রিতে জাগিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহাদিগের পক্ষে ভ্রাম্যমাণ ভ চক্রের পরিদর্শন বিশেষ সুবিধাকর ছিল। তাঁহারা প্রতিরাত্রিতেই দেখিতেন যে, একই তারাগণ পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া, গগন-মার্গে সিধা পথে পশ্চিমাভিমুখে গমন করে এবং পশ্চিম দিকে যাইয়া অস্তমিত হয়। দীর্ঘকাল অবলোকন করিয়া দেখা গেল, উহার প্রত্যেক তারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সকালে সকালে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে। এক দিন যে তারাটিকে ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়, অস্তমিত হইতে দেখা যায়, কতক দিন পর, উহা সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই, অস্তমিত হইয়া থাকে। আবার এক দিন যে তারাটিকে সন্ধ্যার সময় উদিত হইতে দেখা যায়, কএক দিন পরে, সন্ধ্যার সময়, উহাকে গগন-মার্গে কিছু উপরে দেখা গিয়া থাকে। বাল্যকাল হইতে নক্ষত্রগণকে এই ভাবে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহার স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়ায় যে, উহার কতকগুলি তারাকে একত্র লক্ষ্য করিয়া, কোন সুপরিচিত পার্থিব বস্তুর আকারের সহিত, উহার আকৃতি গত একটা সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় এবং এই ভাবেই এক এক নক্ষত্র মণ্ডলের সীমা নির্দ্দেশ ও পার্থিব বস্তুর নামানুসারে উহার নামকরণ করা হইয়াছে।

মেষ, বৃষ, ছাগ ও ছাগ শাবক (নরমিথুন) নদী ও হ্রদের কর্কট, পশুঘাতক সিংহ, শস্যসংগ্রহকারিণী কন্যা, তুলাযন্ত্র (যে স্থানে সূর্য্য আসিলে দিবা রাত্রি সমান হয়) বিষযুক্ত বৃশ্চিক, পশুপালকে সিংহ হইতে রক্ষা করার জন্য ধনুর্দ্ধারী পুরুষ, পশু পালের নিকট জল বহন করার জন্য কুম্ভধারী পুরুষ এবং মৎস্য এই সকলই পশুচারণানুজীবী পর্য্যটক জাতীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বদা দর্শনীয় বস্তু। রাশিদিগের নাম হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সৌর-কক্ষাকে দ্বাদশ রাশিতে ভাগ করিয়া উহাদিগের নাম করণ, প্রাগৈতিহাসিক সময়ে, মধ্য এসিয়ার পর্য্যটক জাতীয়দিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে।

পশুপালের প্রহরীরূপে পশুচারণানুজীবিদিগকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। অথচ উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ভিন্ন, সময় নিরূপণ করার জন্য, কোনরূপ যন্ত্র ছিল না। সর্ব্বদা নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের এরূপ অভ্যাস হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান সময়ে ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যেমন সহজে সময় নিরূপণ করা যায়, তাঁহারাও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের উদয়, অস্ত এবং নভোমণ্ডলে অবস্থান অবলোকন করিয়া তেমনি সহজে, সময় নিরূপণ করিতে পারিতেন। * সূর্য্যোদয় দ্বারা সৌর-দিনের আরম্ভ হয়। সূর্য্যের সহিত সময় সময়, যে যে নক্ষত্র উদিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিয়া বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়, চিহ্নিত করা যাইত এবং উহাকে কোন পার্থিব ঘটনার সহিত মিলাইয়া রাখা হইত। যেমন নীল নদের জলপ্লাবনের সময়, লুব্ধক নামক উজ্জ্বলতম তারা সূর্য্যের সহিত একত্র উদিত হয়। কোন বালকের জন্ম সময়ে, সূর্য্যের সহিত যে তারার উদয় হয়, অথবা রাশিচক্রের যে অংশ চক্রবালবৃত্তের উপরে থাকে, তদ্দ্বারা বালকের জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত এবং তাহা হইতে কালক্রমে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের শুভাশুভ ফল গণনা করা হইত। অধিকন্তু পূর্ব্বদেশীয় কথকেরা তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সকল লোক বীরত্ব প্রকাশ কিম্বা অন্য বিধরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নক্ষত্ররূপে নভোমণ্ডলে স্থান দান করিতেন। ইহার কারণ বোধ হয় যে, রাত্রি জাগরণ কালে, উপাখ্যান বলিতে বলিতে দৃষ্টান্তের সহিত বলিলে, তাহাতে যেরূপ মনোরঞ্জন হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে সেইরূপ মনোরঞ্জন করা অসম্ভব।

সম্ভবতঃ এই ভাবেই, প্রাচীন কালে, ৪৮ নক্ষত্রমণ্ডলের নামকরণ হইয়াছিল। অধিকন্তু সূর্য্যের সহিত বিশেষ বিশেষ তারার উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করিয়া মনুষ্য জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা মিলাইয়া রাখা হইত। পরবর্ত্তী কালে, ইহা হইতেই বহু কুসংস্কারের সৃষ্টি। অনেক স্থলে ইহাই গ্রীকদিগের কাব্যোল্লিখিত উপাখ্যানের মূলসূত্র।

রাত্রির শেষাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগণের জ্যোতিঃ কমিয়া আসিতেছে এবং উহারা ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতেন যে, সূর্য্যোদয় নিকটবর্ত্তী। সূর্য্য উদিত হইলে, তাঁবুর যষ্টি বা দণ্ড নিচয়ের সুদীর্ঘ ছায়া পশ্চিম দিকে থাকিত এবং সূর্য্য যেমন ক্রমে উপরের দিকে উঠিত, তেমন উক্ত ছায়ার দৈর্ঘ্য ও দিক ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিত; এবং মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুদ্রতম আকারে উত্তর দিকে বিক্ষিপ্ত রহিত। ইহা তাঁহারা দেখিতেন। এবং এই ছায়ার আকার যখন ক্ষুদ্রতম ও ঠিক উত্তর দিকে বিক্ষিপ্ত, তখনই তাঁহারা বুঝিতেন যে, উহা মধ্যাহ্ন কাল। তৎপরে আবার ছায়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদিকে সরে এবং সূর্য্যাস্তের সময়, উহা দীর্ঘতম আকারে পূর্ব্বদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে। এই ঘটনা হইতেই, প্রথম সূর্য্য ঘড়ীর সৃষ্টি। হিন্দুদিগের সূর্য্য-সিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে বর্ণিত শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ এবং জেসুট্ পাদরীদিগের বর্ণিত চীন দেশীয় মান-মন্দিরে স্থিত সূর্য্য ঘড়ী, এই প্রণালীতেই নির্ম্মিত। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজকুমার সেন এম্ এ।

* বর্ত্তমান সময়েও, গ্রাম্য লোকদিগের মধ্যে, অনেকে রাত্রিযোগে নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঠিক সময় বলিয়া দিতে পারেন।

নন্দন-কুসুম।

স্ফুরিত অধরে
জানাতে বাসনা
করিছ যতন কত,
ফোট'ফোট'মুখে
ফুটে নাক'ভাষা
কি কথা হৃদয়ে এত!
অর্থহীন ভাষা,
নাহি বুঝি ভাব,
শুধু আধ'মধুস্বর
পশিয়া শ্রবণে
অমিয়ের ধারা
ঢালিতেছে নিরন্তর।
জানি না ও মুখ
ফুটিয়া যখন
দেখাবে হৃদয় তুমি,
স্বরগের সুধা
ভরা তব হৃদে
কি শোভা হেরিব আমি!
কি হাসি হাসিতে
শিখেছ রে শিশু
ভুলাতে হৃদয় মোর—
ভুলিয়া জগত
তোমার হাসিতে
হৃদয় হয়েছে ভোর!

কিশলয় সম
কোমল অধর
ফুলের সৌরভ-ময়,
চাঁদের সুষমা
মাখা তব হাসি
হাসিতে মলয় বয়।
বিকচ-কুসুম—
কপোলে তোমার
সোহাগের হাসি মাখা,
প্রীতি-পুণ্য শান্তি
রয়েছে বিকাশি
মরতের দুঃখ ঢাকা।
কি দিয়া গঠিত
ও কোমল বপু—
বুঝি রে নবনী লয়ে,
ছাঁকিয়া চন্দ্রিকা
মেঘের আঁচলে
সরস প্রসূন দিয়ে!
কণ্টক-বিহীন
মৃণালের মত
সুকোমল ভুজ-লতা,
ভুলাতে আমায়,
মৃদু সঞ্চালিত
করিতে শিখিছ কোথা?

মধুর নয়নে,
সরল দিঠিতে
চাহিছ সবার পানে;
হেরি তব আঁখি
সুধার লহরী
বহিছে আমার প্রাণে।
চিনিছ কি তুমি
তোমার সকল
স্নেহ মমতার জন?
বুঝেছ কি তুমি
কত যতনের,
কত হৃদয়ের ধন?
—তোমার হাসিতে
হাসে কত হৃদি
তোমার প্রীতিতে সুখ—
দেখিছ কি কত
অনিমেষ আঁখি
চেয়ে থাকে তব মুখ?
তুমিও কি সবে
স্নেহ প্রীতি সনে
রাখিবে হৃদয় ভ'রে;
ভকতি-কুসুমে
গাঁথিতেছ মালা
চরণে দিবার তরে?
এস, প্রিয় বৎস,
তুষরে আমায়,
তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সোনা মুখ খানি
অনিমেষ নেত্রে
এ চির জীবন দেখি!

উত্তর পাড়া, জ্যৈষ্ঠ।
১৩০৯ বাঙ্গালা
} ঠাকু'মা। *

* আমরা, বান্ধবের অবতরণিকায়, যাঁহাদিগকে বঙ্গের বধূকবি বলিয়া সম্মান করিয়াছি, স্বভাব-পূজ্যা—'ঠাকু'মা' তাঁহাদিগেরই এক জন। তিনি, অকালে ঠাকু'মা হইয়া থাকিলেও, কন্যার ন্যায় আমাদিগের স্নেহাস্পদা, মাতার ন্যায় পূজনীয়া। আমরা ভগবৎপাদপদ্মে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁহার নয়ন-মনোহর নন্দন-কুসুমের মালা গাঁথিয়া গলায় পরুন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের কুমুদ-কহ্লারময় কাব্যোদ্যানে, কবিতার নীহার-স্নিগ্ধ শান্ত-প্রতিভায়, শত-বর্ষ-কাল সুখ-সম্মানে সংবর্দ্ধিত রহুন। তাঁহার পবিত্র প্রাণের প্রাণ-শীতল স্নেহ-রাশি এই আশীর্ব্বাদী কবিতাটির অক্ষরে অক্ষরে উছলিয়া পড়িতেছে। কবিতার কোন কোন লহর পাঠের সময় আপনা হইতেই মনে লয় যে, শ্রীগৌর-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে।

বান্ধব—সম্পাদক।

স্বামী না ত কি ?

দুই সখীর কথা।

নবন্যাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠক যদি সরযূবালার পত্র খানি পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার মনে, সুভাষিণীর প্রত্যুত্তর-পাঠের জন্য সামান্য একটুকু ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু আমার বোধ হয়, সুভাষিণীর পত্র-পাঠের পূর্ব্বে, তাহার চিত্ত ও চরিত্রের গঠন-পাঠে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলেরই অধিকতর প্রীতি হইতে পারে। মানুষের মত ও বিশ্বাস, অথবা হৃদয় ও মন, কবি-কল্পিত আকাশ-কুসুমের মত, আকস্মিক বস্তু নহে। উহারা, বৃক্ষ ও লতার মত, ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত ও ধীরে ধীরে প্রবর্দ্ধিত হয়; এবং লতা ও বৃক্ষ অথবা মনুষ্য-দেহের বিকাশের উপর চারিদিকের বায়ু-মণ্ডল (Atmosphere) যেমন নিরন্তর ক্রিয়া করে, মানুষের মত ও বিশ্বাস এবং হৃদয়-মনের গঠনের উপরও চারিদিকের ভাব-মণ্ডল (Moral Atmosphere) সেইরূপ নিরন্তর ক্রিয়া করিয়া থাকে। সরযূ ফুটিয়াছে ইয়োরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্ররূপিণী কলিকাতায়,—সুভাষিণী ফুটিয়াছে ভারতীয় শিক্ষা-সম্পদের ভুবন-বিখ্যাত-মহাতীর্থ কাশীধামে। সরযূ যাঁহাদিগের দ্বারা সতত বেষ্টিত রহে, তাঁহাদিগের কেহ বারিষ্টার, কেহ কেহ প্রফেসার, এবং প্রায় সকলেই বিলাত-ফেরত, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সামাজিক-মঙ্গল-প্রিয় সমুন্নতচিত্ত বাঙ্গালি সাহেব। সুভাষিণী যাঁহাদিগের ছায়ায় জীবন যাপন করে, তাঁহাদিগের অধিকাংশই, স্নাত-পূত ও নামাবলী-মণ্ডিত, নিত্য-তৃপ্ত, নম্রস্বভাব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সরযূর হৃদয় ও মনের আরাধ্য ভাব আত্ম-শক্তি ও আত্মোন্নতি, সুভাষিণীর মূলমন্ত্র পরার্থা-প্রীতি ও পরমার্থ-ভক্তি। এই দুই প্রকার (Environment) * অর্থাৎ আবরণ-পরিধির কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, --কোন্‌টি কোন্ অংশে মানব-সমাজের

* Environment এই শব্দটি বিজ্ঞান-গুরু হর্বার্ট্ স্পেন্‌সর এবং অধুনাতন বৈজ্ঞানিকদিগের বড় প্রিয়। ইহার অর্থ বাঙ্গালায় আবরণ-পরিধি, আবরণী অবস্থা, প্রাবরণী, পরিবেষ্টনী অথবা প্রাবর-পরিধি প্রভৃতি বহুশব্দে পরিব্যক্ত হইতে পারে। কোন্‌টি অধিকতর সঙ্গত, সাহিত্যিকেরা তাহার বিচার করিবেন।

উপকারক কিংবা অপকারক, সে বিচারের ভার আমার নহে। কিন্তু আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, কাশীবাসিনী সুভাষিণীকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে, ক্ষণকালের তরে, কল্পনার চক্ষে, বিশ্বেশ্বরের কাশী দর্শন বিফল হইবে না।

"শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
ঊর্দ্ধদেশে সৌধ-শ্রেণী,
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিল-কূলে সরীসৃপ-বিধানে।
* * *
প্রাণিময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত !
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে
পথে, মাঠে, স্থলে, জলে,
কত বেশে নারী নর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।" *

কাশীবাস কাহারও পক্ষে ক্রূরতা ও দুষ্কৃতির কারাবাস হইতে পারে; কিন্তু উহা অনেকের পক্ষেই সর্ব্বাংশে পার্থিব স্বর্গবিলাস। যে সকল নিষ্ঠুর-চিত্ত দাম্ভিক ব্যক্তি, কোনরূপেই নিঃস্বার্থ-নির্ম্মলা প্রীতি ও পরার্থ-পরায়ণা নম্রতার পথ লইতে প্রস্তুত না হইয়া, নিজ নিজ দগ্ধহৃদয়ের দুঃখ-স্তূপকে, দানে, ধ্যানে ও যশস্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ঢাকিয়া রাখিবার জন্য কাশীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে; অথবা অতৃপ্ত-লালসার অন্তর্দ্দাহি আবেশে, গৈরিক, গুঞ্জাভরণ এবং আরও নানাপ্রকার নয়ন-মোহন নূতন-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়া, কাশীতে যাইয়া, তপস্বীর বেশে লুক্কায়িত রহে, কাশী তাহাদিগের জন্য কর্ম্ম-ফলের গরল রাশি ভিন্ন আর কি হইবে? পক্ষান্তরে, যে সকল সরল, সুশীল, সদাশয় সজ্জন, শ্রান্ত জীবনের অবসান সময়ে, তপঃ-শীতল স্নিগ্ধ-শান্তির অভিলাষে, কাশীবাসী হন,—কাশীতে যাইয়া ভক্তসেবা অথবা সাধু-সঙ্গ করেন, এই পৃথিবীর আর কোন্ স্থান তাঁহাদিগের কাছে, কাশীর সমান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে?

* বঙ্গের অমরকবি হেমচন্দ্র-কৃত কাশী-বর্ণনা।

মাঘের শীত। শীত-যামিনীর শেষ যাম। আকাশের তারা এখনও নিবু নিবু জ্বলিতেছে,—দুই একটি নিবিয়া যাইতেছে,—দুই একটি নিবু নিবু জ্বলিয়া, মনুষ্যকে কি যেন নয়নে নয়নে কহিতে চাহিতেছে। কবি ও ভাবুকের সেই চির-পরিচিত চারু চন্দ্র, হৈম-গগনের পশ্চিম প্রান্তে, যেন ক্লান্ত হৃদয়ে, হেলিয়া পড়িয়াছে। ঊষার অস্ফুট অরুণ-কান্তি শুধু আশায়ই প্রতিফলিত হইতেছে, কিন্তু এখনও আকাশে উকি ঝুকি দিতেছে না। পৃথিবীর মনুষ্য, এমন সময়ে, পৃথিবীর আর কোন স্থানে, শয্যা-সুখ পরিত্যাগ করিয়া, ঘরের বাহির হয় কি? কিন্তু যাও তুমি কাশীতে, দেখিবে প্রকৃতির এইরূপ প্রশান্ত-সুপ্তি-সময়েও কাশীর ঘাটে ঘাটে,—সেই ভারত-কীর্ত্তিত ভাগীরথীর তটে তটে, হর-হর বিশ্বেশ্বর ও জয়-জয়-জগদীশ্বর প্রভৃতি পাপ-তাপ-হারি পুণ্যময় শব্দ সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে;—এবং শত শত পুণ্যাত্মা, অঞ্জলি-পূর্ণ গঙ্গাজলে, ফোঁটা ফোঁটা নয়ন-জল

মিশাইয়া, তাহাই হৃদয়ের অটল বিশ্বাসে, প্রাণ-নিহিত ভক্তির উদ্বেল উচ্ছ্বাসে, বিশ্বেশ্বরের চরণারবিন্দ-মননে ঢালিয়া দিতেছে, অথবা সেই জলে পর-লোক-গত পিতা মাতার তর্পণ করিয়া, আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিতেছে।

সন্ধ্যাকাল সুসভ্য সমাজের সকল স্থলেই বিলাস-লীলার বসন্তকাল। যাহারা দশ জনের কাছে সুখ-সমৃদ্ধ অথবা রস-বিদগ্ধ বলিয়া পরিচিত, সায়ংকালেই তাহারা বেশ-ভূষার বিচিত্র ঘটায়, আপনাদিগের অন্তঃস্থ ভাব ও বহিঃস্থ প্রভাব প্রদর্শন করিবার জন্য অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠে। তখন অনেকেরই বুকের মধ্যে লালসার বাড়বাগ্নি, মুখশ্রীতে অভিমানের প্রদীপ্তচ্ছটা, এবং অঙ্গ-ভঙ্গীতে আসুর-দর্পের অশেষ-বিধ আড়ম্বর। কিন্তু যাও তুমি কাশীতে, দেখিবে মনুষ্য সেখানে তখন, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য, দেব-স্বভাবাপন্ন, ও দেব-কৃপা-লাভের জন্য, ভক্তি-প্রীতি, বিবেক-বৈরাগ্য, দৈন্য করুণা ও আরও নানা-রূপ দিব্য ভাবে হৃদয়ে আতট-পূর্ণ। তখন কাশী, অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য, অমরাবতীর পার্থিব-প্রতিকৃতি, এবং কাশীবাসীর হৃদয় ও মনে স্বর্গীয় সুখেরই সুধাময় অনুসৃতি। তখন সেখানে সহস্র সহস্র দীপ-মালায় বিশ্বনাথ ও ব্রহ্মময়ীর আরতি হইতেছে;—শত-সহস্র শঙ্খ ঘণ্টা, ভেরী তুরী, কাঁসর-বাঁশরীর মনোমদ মিশ্রিত-শব্দ, সেই আরতির সংবাদ ঘোষণা করিয়া, মোহ-মুগ্ধ মনুষ্যের প্রাণকে জগৎ-পিতা ও জগন্মাতার করুণার দিকে টানিয়া লইতেছে;—শত শত স্থানে সজল-জলদের গম্ভীর-নিঃস্বনে বেদ-ধ্বনি,—শত শত স্থানে ভক্তির উদ্দীপক পুরাণ-পাঠ, শত সহস্র কণ্ঠে স্তোত্র ও প্রার্থনা। পৃথিবীর আর কোন্ স্থানে, ভক্তির এইরূপ আনন্দময় উৎসব, আরাধনার এইরূপ অপরূপ দৃশ্য, মনুষ্যের নয়ন ও মনকে একই সঙ্গে এমনই মোহিত করিয়া থাকে?

যদি কোন পথিক, ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে, সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ কাশীতে যাইয়া প্রথম প্রবিষ্ট হন, তাহা হইলে, উল্লিখিতরূপ আরতি ও আরাধনার ঘটা দর্শনে, তাঁহার মনে অবশ্যই এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, হায় চিরকাল যে স্বর্গের কথা শুনিয়া আসিয়াছি, এই বুঝি সত্য সত্যই সেই স্বর্গ-স্থান;—আর এই যে বাজনা বাজিতেছে, জয়-জয়-কার হইতেছে, ও উচ্ছলিত হৃদয়ের আনন্দ-লহরী উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে, ইহা বুঝি সত্য সত্যই জগদারাধ্য বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা অথবা জগন্ময় প্রকৃতি-পুরুষের প্রেম-সম্মিলন-মহোৎসবের অঙ্গীয় অনুষ্ঠান।

কাশীতে এক ভাবে যেমন সতত ভক্তির উৎসব, আর এক ভাবে সেইরূপ ভক্তিমুগ্ধ জ্ঞানের উৎসব, এবং সঙ্গে সঙ্গে, সত্রে সত্রে, সর্ব্বদাই অন্নদানের উদার উৎসব। যাঁহারা সঙ্গীত, সৌন্দর্য্য ও সুখ-প্রীতিকর শিল্প-চাতুর্য্যে অনুরাগী, গোপালের মন্দির প্রভৃতি স্থান তাঁহাদিগের প্রাণেও নিরন্তর ভোজা যোগাইতেছে;—এবং একই মন্দিরে, মণি-মুক্তার কারুকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, পৃথিবীর যেখানে যাহা সুন্দর, তাহার যত্নকৃত সংগ্রহ-চাতুর্য্য সকলেরই মনে বিস্ময় জন্মাইতেছে। এ হেন কাশীধামে আমাদিগের পূজাস্পদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বহুলোকা অট্টালিকায় আজি, তাজ-বতাজের মধুর সুরে, নহবত বাজিতেছে কেন?

পাঠক ইহা পরিজ্ঞাত আছেন যে, ভবদেব সার্ব্বভৌম অনেক দিন হইতেই কাশীতে এক জন বড় লোকের মধ্যে পরিগণিত। কেহ ধনে বড়, অথচ বন্য জন্তুর ন্যায় মূর্খ। কেহ জ্ঞানে বড়, অথচ নির্দ্ধন। কেহ, ধনে মানে ও জ্ঞানে গুণে বঞ্চিত হইয়াও, চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতায় যার-পর-নাই বড়। ভবদেব কোনও শ্রেণির বড় মানুষের মধ্যে, সর্ব্বপ্রথম আসন পাইবার যোগ্য না হইলেও, সকল শ্রেণির প্রধান লোকেরাই তাঁহাকে আপনাদিগের এক জন বলিয়া আদর করিতেন। তাঁহাকে যেমন সম্মান করিতেন কাশীবাসী সমৃদ্ধেরা, তেমন সম্মান করিতেন উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত ও রাজপুরুষেরা। উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট এবং রাজ-প্রতিনিধি বড় লাট, যখনই কাশী যাইতেন, তখনই ভবদেবের সহিত তাঁহাদিগের আলাপ হইত। তাঁহারা ভবদেবকে একটি বহুদর্শী, বহু-জন-পালক, সত্য-প্রিয়, সাধুচরিত্র ও দেশের মুখোজ্জ্বল * পণ্ডিত বলিয়া বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন; এবং ঐ প্রদেশের উন্নতি-কল্পে যখন যে কোন গুরুতর কথার আন্দোলন হইত, তাঁহারা তৎসম্পর্কে সর্ব্বদাই ভবদেবের মত-জিজ্ঞাসু হইতেন। সম্প্রতি, তাঁহাদিগেরই শুভদৃষ্টিতে, ভবদেবের অদৃষ্ট সহসা বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভবদেব একই সময়ে মহামহোপাধ্যায় ও সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধি লাভ করিয়া কাশীবাসী সমস্ত ব্যক্তিরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তবে, ভবদেবের বড় সৌভাগ্য, কাশীতে কাহারও তাঁহার উপর ঈর্ষ্যা ছিল না। তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সৌজন্য, সদাশয়তা, এবং নম্রতা ও মধুর-ভাষিতা তাঁহার পদ-গৌরব ও প্রাধান্যকে এত বেশী আবরিয়া রাখিত যে, সকলেই তাঁহাকে ভালমানুষ জ্ঞানে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত;—এবং তিনি নানাসূত্রে, নানা-বিধ কৌশলে, লোকের উপকার করিতেন বলিয়া, ওখানে ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্তি করিত। তাই, ভবদেবের সম্মান-বৃদ্ধিতে কাশীবাসী সকলেরই বিশেষ উৎসাহ, বিশেষ আনন্দ।

মহামহোপাধ্যায় ও সি, আই, ই, প্রভৃতি উপাধি দিল্লীর সেই চিরপ্রসিদ্ধ লাড্ডুর মত দেশে এখন আর তেমন বিকায় না। এখন না বিকাইলেও, তখন বিকাইত। কেন না, স্বামী বলিলে যেমন গীতার ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী, অথবা জপ-তপ-পরায়ণ

* মুখোজ্জ্বলকারী এই পদটি একান্ত অশুদ্ধ। অথচ শুধু মুখোজ্জ্বল বলিলেই সে অর্থ সম্যক্ প্রকাশিত হয়। উজ্জ্বল শব্দ বিশেষণ। বিশেষণের পর,—কারী, হারী প্রভৃতি কৃদন্ত পদের প্রয়োগ হইতে পারে না। মুখ-উজ্জ্বল-কারী বলিলে, মুখ-সুন্দর-কারী, গৃহ-সুন্দর-কারী প্রভৃতি পদেও আপত্তির স্থল থাকে না।

জিতেন্দ্রিয় সাধুদিগের কথা, মহামহোপাধ্যায় বলিলেও সেইরূপ কালিদাসের টীকাকার মল্লিনাথ প্রভৃতি মহাপণ্ডিতদিগের কথাই আগে লোকের মনে আসিত। ভবদেব যখন প্রথম মহামহোপাধ্যায় হন, তখন লোকে তাঁহাকে কিছুকাল মল্লিনাথের ন্যায় সম্মানিত মনে করিয়াছিল।

কিন্তু ভবদেবের বাড়ীর আজিকার এই আমোদ ও উৎসব, এবং নহবতের বাজনা তাঁহার আত্মযত্নে ও আত্মসম্মাননায় নহে। তাঁহার উন্নত ও পর-সুখানুরত উদার প্রাণে কোন দিনও তাদৃক্ ক্ষুদ্রতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত না। তিনি বাড়ীতে আজি উৎসব করিতেছেন পরের উৎসাহে ও পরের উদ্যোগে,—এবং তাহাও—তদীয় পরম-স্নেহাস্পদা প্রীতির প্রতিকৃতি সুভাষাণীর আকস্মিক ও আশাতীত সম্মাননায়। সুভাষিণীর সে সুখ-সৌভাগ্যের কাহিনীটুকু পাঠকের নিশ্চয়ই প্রীতিকর হইবে।

বৃদ্ধ ভবদেব যে সময়ে রাজপুরুষদিগের কৃপালাভ করেন, তাহার কিছুকাল পরেই রামনগরের রাজনিকেতনে মহাভারত-পাঠ-সমাপন ও অন্নাচল-দান উপলক্ষে দেশ-দেশান্তরের পণ্ডিতদিগের আমন্ত্রণ ও অতিবৃহৎ একটি পণ্ডিত-সভার অধিবেশন হয়। সে সভায় এক দিকে যেমন পঞ্জাব ও কাশ্মীর, মথুরা ও মিথিলা-মহারাষ্ট্র,এবং দাক্ষিণ্যাত্যের পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন ; আর এক দিকে সেইরূপ, নবদ্বীপ ও পূর্ব্বস্থলী, ত্রিবেণী ও ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ, ইদিলপুর ও চন্দ্রপ্রতাপ, এবং মহেশ্বরদী ও পট্টজোর প্রভৃতি সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-স্থানের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পণ্ডিতেরা সভা শোভন করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ভবদেব, এই সভায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া, সুভাষিণীর রচিত সরোজ-শতক নামক একখানি শতাধিক-শ্লোকপূর্ণ অভিনব সংস্কৃত কাব্য পাঠ করেন।

কাব্যের বিষয় সরস্বতীর মাহাত্ম্যবর্ণনা। স্বভাব-মূর্খ কালিদাস, সরস্বতীকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, মায়ের কৃপায়, মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাকবি রূপে চক্ষু মেলিয়াছেন ;—এবং কুণ্ডের তটে, শ্বেত-সরোজ-সমাসীনা সর্ব্বশুক্লা সরস্বতীকে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, অষ্টোত্তর-শত-শ্লোকে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। কালিদাস কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার নয়নে কৃতজ্ঞতার গলিত-ধারা, হৃদয় ভক্তি ও বিস্ময়ে বিভোর। তিনি কার যেন কিরূপ প্রভাবে পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া, কুণ্ডের জল হইতে এক একটি করিয়া পদ্ম তুলিতেছেন; এবং এক একটি করিয়া কবিতা পড়িয়া, সেই পদ্ম মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে উপহার দিতেছেন। কবিতায় কুণ্ডের বর্ণনা,—ভাব-বিহ্বল কালিদাসের বর্ণনা, এবং কুণ্ড-সন্নিহিত বন, উপবন, বন-বিটপীর কণ্ঠ-লগ্ন লতা, বন-বিহঙ্গীর গীত ও বন-শোভিনী সরস্বতীর বর্ণনা।

কবিতাগুলি বুঝি বড়ই হৃদয়হারিণী হইয়াছিল। কবিতা শুনিয়া সভাসীন পণ্ডিতবর্গ যেমন প্রীত, তেমনই চমৎকৃত হইয়াছিলেন; এবং সকলে, একবাক্যে, আনন্দের আকস্মিক উত্তেজনায়, সেই দিবসই, পার্চ্চমেণ্টে লিখিত ও বহু-পণ্ডিত-স্বাক্ষরিত উপাধি-পত্রে, সুভাষিণীকে সরস্বতী উপাধি দান করিয়া হৃদয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়দিগেরই সমধিক-উৎসাহ। কারণ, বাঙ্গালির মেয়ে আর কখনও এমন অসামান্য-সম্মান-লাভে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হয় নাই।

রামনগরের রাজবাড়ী চিরকালই রাজ-সমুচিত দান, পণ্ডিতের সম্মান এবং সর্ব্ব-প্রকার সৎকার্য্যের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভবদেব রামনগরের দ্বার-পণ্ডিত না হইয়াও রাজ্যেশ্বরের বিশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন, এবং তাঁহারই পরিচয়ে, সুভাষিণীরও সেখানে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা ছিল। কথাটা যখন রামনগরের অন্তঃপুরে পঁহুছিল, তখন রমণী-মহলে একটা আনন্দের কল-কল কোলাহল উঠিল। প্রাসাদ-ললনাদিগের মধ্যে সকলেই পুর-ললনার এই প্রকার পাণ্ডিত্যের সংবাদে শতমুখে প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা সুভাষিণীকে একটু বেশী জানিতেন ও ভালবাসিতেন, তাঁহারা একগুণে পাঁচগুণ, এক কথায় পাঁচ কথা বাড়াইয়া বলিলেন। কিন্তু পুণ্যবতী ও পণ্ডিত-পালিনী রাজমহিষী, শুধু প্রশংসাদানেই পরিতৃপ্ত না রহিয়া, সুভাষিণীকে সমুচিত পুরস্কার-দানের জন্য সংকল্প করিলেন।

তিনি, সুভাষিণীকে অঙ্গে অঙ্গে আভরণ পরাইয়া, সরস্বতীর বেশে সাজাইবার জন্য, কএকখানি বহুমূল্য হীরকাভরণ ও স্বকণ্ঠ-মুক্ত এক ছড়া সাতলহর মুক্তার মালা পৃথক্ করিয়া রাখিলেন ; এবং উপাধি-দানের সঙ্গে তাঁহার এই উপহার-দানও যেন বিশেষ সম্মাননার সহিত সম্পন্ন হয়, মহারাজের অনুমোদন-সহকারে, তাহার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আজি তাঁহারই আদেশে ও তাঁহারই ব্যয়ে, তাঁহারই প্রেরিত সুদক্ষ কর্ম্ম-সচিবগণের সহায়তায়, ভবদেবের বাড়ীতে সারস্বত উৎসব ও পণ্ডিতদিগের অভ্যর্থনা ; এবং তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে দেবার্চ্চনা ও নহবতের নানাবিধ বাজনা। যে দেখিতেছে, সেই বলিতেছে, কাশীধামে এমন উৎসব কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই। বুঝি লক্ষ্মী সদ্‌গুণে মোহিত হইয়া সরস্বতীর পূজায় উন্মাদিনী হইয়াছেন ;—অথবা রাজশক্তি, প্রতিভাকে বক্ষে জড়াইয়া, আপনার প্রাণ জুড়াইতেছেন। নিমন্ত্রিতেরা আসিতেছেন, নিমন্ত্রিতেরা আদরে ও উপচারে তৃপ্তি লাভ করিয়া, চলিয়া যাইতেছেন। সমাগত পণ্ডিতেরা একটা বৃহৎ দালানে বসিয়া, শাস্ত্র-কথার সহিত স্তুতি-কথা মিশাইয়া, সেই এক প্রকার সুশিক্ষিত হট্টগোলের হল-হলা তুলিয়াছেন ; এবং কাশীর মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও, সেখানে উপবিষ্ট রহিয়া, পুরাতন ভারতের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে, বহুবিধ ভাল কথার আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু সকলের মুখেই আজি ঐ এক কথা নানা প্রসঙ্গে উচ্চারিত হইতেছে,—ধন্য সুভাষিণী, ধন্য ভবদেব, ধন্য সুভাষিণীর জনক-জননী।

মহামহোপাধ্যায় ভবদেব সার্ব্বভৌম আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনায়, এবং সভাধিবিষ্ট পণ্ডিতদিগের সহিত শিষ্টাচারের আলাপে সমস্ত দিন বড় পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি, শরীরে কতকটা সুস্থ ও সুপটু হইলেও, বয়সে এইক্ষণ নিতান্ত বৃদ্ধ। যখন বেলা শেষ হইয়া আসিল, তখন তিনি অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহার প্রাণাধিকা সুভাষিণীর কাছে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি এখন আর সুভাষিণীকে সুভা বলিয়া ডাকেন না। যাহাকে দণ্ডে দশবার সুভা বলিয়া আদর করিতেন, এখন তাহাকে সরস্বতী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেই তাঁহার বড় সুখ। তিনি সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্বে, সুখোৎফুল্ল-হৃদয়ে, সুভাষিণীর ঘরে যাইতেছেন, এমন সময়ে অন্তঃপুরের পথে, গৃহিণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এমন অসময়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছ"?

ভবদেব বলিলেন—"সরস্বতীকে একবার দেখে আস্‌ব"।

গৃহিণী বলিলেন—"তুমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি সরস্বতী সরস্বতী ক'রে একবারে পাগল হ'য়েছ। চিরজীবনই ত সরস্বতীর সেবা কর্‌লে। তাতে সাধ মিটে নাই ব'লে, এখন আবার একটা গড়ান' সরস্বতী গলায় গেঁথেছ। তবে ওকে আর বাড়ীর ভিতর রেখে কাজ কি? ওকে রাজবাড়ীর সে গহনাগুলি আর কিছু পাতা লতা দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে বৈঠকখানায়ই রেখে দাও না কেন"?

ভবদেব বলিলেন,—"কি, ঈর্ষ্যা হচ্ছে না কি? তবে তুমিও কেন দিন কতক একটু পরিশ্রম ক'রে একটা উপাধি লও না"?

গৃহিণী বলিলেন,—"আঃ কপাল, আমার আবার সুভার উপরও ঈর্ষ্যা। আমার ঈর্ষ্যা নয়, তোমারই অন্ধতা। সুভা আমার এখনত আর কচি মেয়ে নয়। ও কি সারা দিন শুধু তোমার কাছে ব'সে শাস্ত্র কথারই আলাপ কর্‌বে, না আর কারুরও খবর লবে? ওর প্রাণে কি আর কোন সাধ নেই? ওকে কি তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ দেখ্‌তে চায় না"?

ভবদেবের তখন যেন চক্ষু ফুটিল। তিনি একটুকু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কৌশলে বোঝাবার দরকার কি? আমায় একটুকু খু'লে-বল্‌লেই ত যথেষ্ট হয়।"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমরা হলেম অশিক্ষিত মূর্খ, আমরা কি কোন কথা খুলে খেলে বল্‌তে জানি? তুমি আপনি হয়েছ মহামহোপাধ্যায়, আর কি না—ছি ছি আই আই,—তোমার নাতিনী হয়েছে সরস্বতী। আমরা ত সেকেলে নাতিনী-ঘাতিনী বুড়ী। আমাদিগের কথায় কি কোন অর্থ থাকে?"

ভবদেব বলিলেন—"বটে, আদা গুকিয়েছে, ঝালটুকু যায় নাই। তা যাক্, বারণ ক'রেছ, ভালই ক'রেছ। আমি এখন সন্ধ্যা করি গে। আমার আহারের সময় যেন তোমার সরস্বতী সতীনের সঙ্গে একবার দেখা হয়।

এখনকার সুশিক্ষিত যুবার এরূপ ভ্রম

হইতে পারে যে, ভবদেবের বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বুঝি, সত্য সত্যই সুভাষিণীর উপাধিলাভে, বৌ ঝি লইয়া এত বাড়াবাড়ি দর্শনে, মনে একটু বিরক্ত হইয়াছেন। তাহা নহে। সুভাষিণীর পিতামহী সুভাষিণীকে বড় বেশী ভালবাসিতেন। তবে, তিনি স্বামীর সহিত ঐ যে এক প্রকার আলাপ করিলেন, ইহাই তখনকার প্রচলিত প্রণয়ালাপ। প্রাচীনারা প্রায় সর্ব্বদাই পৌত্রী কিংবা দৌহিত্রীর প্রতি কৃত্রিম সাপত্ন্য ঈর্ষ্যা এবং সেই উপলক্ষে স্বামীর প্রতি কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া সুখানুভব করিতেন। বলা বাহুল্য যে, ভবদেব তাঁহার স্নেহশীলা ও প্রফুল্ল-হৃদয়া ব্রাহ্মণীর সে প্রণয়-কোপে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন, এবং আপনার সায়ন্তন ক্রিয়ার জন্য বাহিরে ফিরিয়া আসিলেন।

ভবদেবের সহিত সুভাষিণীর সাক্ষাৎ হইল না বটে; কিন্তু আজিকার এই আনন্দ উৎসবের মধ্যেও, পাঠকের সহিত নিশ্চয়ই একবার সেই সারস্বত-প্রতিভাময়ী, পূত-স্বভাবা, পতিপ্রাণা সুন্দরীর সাক্ষাৎকার আবশ্যক।

কাশীর দশাশ্বমেধ নামক প্রসিদ্ধ ঘাট সমস্ত বঙ্গে সুপরিচিত। কাশী-বিলাসিনী সৌধ-কিরীটিনী সুরধুনীর তীরে, সেই ঘাটের অনতিদূরে, ভবদেবের দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার পশ্চিম-দক্ষিণ-প্রান্তে, দুই তিনটি ঘর লইয়া, সুভাষিণীর নিভৃত প্রকোষ্ঠ। আমরা উহারই একটি গঙ্গা-শীকর-সিক্ত শীতল-বায়ু-সেবিত পরিসর ঘরে পাঠককে লইয়া উপস্থিত হইব।

ঘরের সাজসজ্জা অনেক প্রকার। কোন প্রকারের সাজসজ্জা আগন্তুককে যেন আদর করিয়া ডাকিয়া আনে; কোন প্রকারের সাজসজ্জা আবার আগন্তুককে দূরে রহ বলিয়া ইঙ্গিত করে। সাজসজ্জার ঠমক, স্থান বিশেষে, আগন্তুককে মুহূর্ত্তের তরে চমকিত করিলেও, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে একটুকু ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেয়; কোন স্থানে, কেহ না বলিয়া দিলেও, হৃদয় গৃহস্বামীর প্রতি ভক্তি ও প্রীতিতে অবনত হইয়া পড়ে।

পাঠক এক্ষণে যে স্থানে উপস্থিত হইতেছেন, সেখানে সোনা রূপার কোন সামগ্রী নাই; শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত, শ্যাম-ধূসর প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের মারবেল টেবেল নাই, মেহগেনি কাঠের চেয়ার নাই, সোফা নাই, কৌচ নাই, সুখ-সেব্য আরম্-চেয়ার নাই, মেজেতে কার্পেট নাই। কিন্তু তথাপি, ঘরে প্রবিষ্ট হইলে, হৃদয় কেন জানি বড়ই পুলকিত হইয়া উঠে। ঘরের চারিদিকে, দেয়ালের গায়ে গায়ে, নানা প্রকারের বুক্-শেল্‌ফ, এবং প্রত্যেক শেল্‌ফ অথবা গ্রন্থাধানে দেশ-দেশান্তরের অসংখ্য গ্রন্থ। তালপাতার পুঁথি, তুলটের পুঁথি, মলাটের পুঁথি, আর ইউরোপ ও আমেরিকার জেলদ-বাঁধা ঝল-মল-দৃশ্য গ্রন্থ-মালা, ও স্তূপীকৃত সন্দর্ভ-পত্র-সমূহ চারিদিকে এমনই বিচিত্র শোভায় সজ্জিত রহিয়াছে যে, গৃহে দৃষ্টি মাত্রই, চিত্ত আপনা হইতে যেন একটুকু উচ্চতার দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

সেল্‌ফ গুলির উপরে উপরে রামায়ণ,

মহাভারত ও ভাগবত-প্রভৃতি পুরাণ-বর্ণিত বিবিধ কাহিনীর চিত্রপট। একখানি চিত্রে, অশোক-বন-বাসিনী, অমল-চরিতা, ভুবন-মোহিনী সীতা। সীতা, রাবণের অশোক-বনে, শত রাক্ষসীর মধ্য-স্থানে, স্বর্ণোজ্জলা বহ্নি-শিখার ন্যায়, একাকিনী বসিয়া আছেন,—দুর্বৃত্ত রাবণ অদূরে দণ্ডায়মান রহিয়া, চক্ষু বাঁকাইয়া, যেন সেই ক্রূর-ভয়ঙ্কর ক্ষুধাতুর চক্ষে, তাঁহাকে তিল তিল গ্রাস করিতেছে। কিন্তু, সীতার সেই শান্ত মূর্ত্তি হইতেও, এমনই এক আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় দৈবী আভা উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে যে, কিবা রাবণ, কিবা চেড়ীবৃন্দ, কেহই সেই তেজকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছে না। আর একখানি চিত্রে চির-কীর্ত্তিতা সাবিত্রী। গহন কানন, গভীর অন্ধকার। অন্ধকারের ঘনীভূত বিগ্রহ-নিবহের ন্যায় ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষমালা। বৃক্ষনিচয়ের আঁড়ালে আঁড়ালে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-প্রভৃতি বন্য জন্তু। মধ্য-স্থলে—তৃণপত্রের আসনে, নব-যৌবন-শোভমানা অথচ সপ্ততি-বর্ষীয়া বৃদ্ধার ন্যায় ধীর-গম্ভীরা, সর্ব্ব-জন-পূজ্যা সাবিত্রী। সরল-মতি সত্যবান্, সাবিত্রীর উরুর উপর মাথা রাখিয়া, অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন; সম্মুখে স্বয়ং কৃতান্ত, সত্যবানের সূক্ষ্ম-শরীরকে বান্ধিয়া লইবার জন্য, হাত বাড়াইতেছেন। কিন্তু সাবিত্রীর ভ্রূক্ষেপও নাই। তিনি সুখ-শয্যাসীন সাধ্বীর ন্যায় সত্যবানের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতেছেন, এবং মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া,—বিশ্বাসের অটল-নির্ভরে, অন্তরে কেমন এক অপার্থিব অভয়-ভাবের আনন্দ অনুভব করিতেছেন। সত্যবান্ যে এখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, মুহূর্ত্তের তরেও সে কথা চিন্তা করিতে চাহিতেছেন না। তৃতীয় চিত্রে, রূপসী ও প্রেম-রাশি নৈষধ-মহিষী। বিদর্ভের সন্নিহিত বনভূমি। বনের মধ্যে জগত-পূজিতা, বিদর্ভ-দুহিতা, পতি-প্রাণা দময়ন্তী, আজি সোনার পল্যঙ্ক ছাড়িয়া পর্ণশয্যায়। সমস্ত বনভূমি দময়ন্তীর রূপে যেন উজ্জ্বল হইয়া আছে। বনের বিহগ বিহগী এবং তরুলতাও যেন সে রূপ দেখিবার জন্য তাকাইয়া রহিয়াছে। দময়ন্তী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। সত্যবান্ নিদ্রা যাইতেছেন সাধ্বীর উরুর উপর মাথা রাখিয়া, দময়ন্তী নিদ্রা যাইতেছেন তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব রাজ্য-ভ্রষ্ট নলের পদ-প্রান্তে মাথা লুটাইয়া। কিন্তু নিদ্রার মধ্যেও প্রেমময়ীর সে প্রেমপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ের ক্রিয়া হইতেছে। তাঁহার একখানি হাত নলের একখানি হাতকে ধরিয়া রাখিয়াছে। পাছে শাপ-গ্রস্ত নল, শনির কুহকে প্রতারিত হইয়া, তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া যান, এই ভয়ে, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলের একাংশ নলের কটিতে বেষ্টিত রহিয়াছে।

গ্রন্থাধান গুলির উপরে উপরে, এইরূপ ভাব-ভক্তি-প্রকাশক কত আলেখ্যই যে কত ভাবে কত কি কহিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘরের মধ্যস্থলে একখানি শাদা ধপ্‌ধ'পে শয্যাস্তরণমণ্ডিত তক্তপোষ; তক্তপোষের উপরে, বুকে একটি বালিশ রাখিয়া, চম্পক-দাম-গৌরী, চারু-স্নিগ্ধ-নয়না, সুন্দরী

সুভাষিণী। সুভাষিণীকেও, বহু আলেখ্যের মধ্যে, আর এক খানি সুচিত্রিত আলেখ্যের মত দেখা যাইতেছে। সুভাষিণী বড়ই মনঃসন্নিবেশের সহিত কি জানি পড়িতেছে, আর হাতে পেন্‌সিল লইয়া, পঠিত পুস্তকের পাতায় পাতায়, মারজিনে নোট করিতেছে। তাহার পশ্চাদ্দিকে, একটি যুবক, বহুক্ষণ হইতে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া, যেন নিস্পন্দনেত্রে তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে।

যেই সে দিকে দৃষ্টি পড়িল, সুভাষিণী অমনি শয্যা হইতে শশব্যস্ত উঠিয়া, যার-পর-নাই প্রীতিপূর্ণ আদরে, যুবককে শয্যায় আনিয়া বসাইল; এবং আপনি কাছে বসিয়া, একটুকু মিঠা অনুযোগের ভাষায়, মিঠা কণ্ঠে বলিল, "ছি এমনই ক'রে কি আঁধারে দাঁড়ায়ে রইতে হয় ?"

যুবক বলিল, "আমি তোমার রূপ দেখ্‌তে ছিলেম।

সুভাষিণী বলিল,—"আর রূপের কথা ব'লো না। এখন বুড়ো হতে চ'লেছি,—ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক, বুড়োর দলে মিশেছি; এখন আর রূপের কথা ভাল লাগে না। রূপের কথায় রমণী মাত্রই হৃদয়ে একটুকু লজ্জা অনুভব করে।"

যুবক বলিল, "আমি মুর্খ—পশু, আমি তোমার রূপ ছাড়া আর কিসের ধার ধারি? আমার মুখে তোমার বুদ্ধি,—প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের কথা শোভা পাবে কেন?"

সুভাষিণী, যুবকের হাত দুখানি আপনার হাতের মধ্যে সবলে টানিয়া লইয়া, যেন সোহাগে গলিয়া বলিল, "তুমি যদি এমন মর্ম্মান্তিক কথা আবার কখনও মুখে আন, তা হ'লে আমি আমার এই চুলগুলি কাঁচি দিয়ে কে'টে গঙ্গার জলে ভাসায়ে দেব।

যুবক একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"সুভাষিণী, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চ না। তোমার পিতামহের এই অট্টালিকায়, আজি দুই শত পণ্ডিত এবং দুই সহস্র ভদ্রলোক নানারূপে সমাদৃত হয়েছেন। সকলেই তোমার কথা কয়েছেন, তোমার মহামহোপাধ্যায় পিতামহের কথা কয়েছেন, কেহ কেহ তোমার পিতৃদেবের প্রসঙ্গেও দুই একটি কথা কয়েছেন। কিন্তু এই যে এত লোক তোমাদের নাম লয়ে এত কথা কয়েছেন, কেউ কি ভু'লেও আমার নামটা উচ্চারণ করেছেন। আমার দিকে যখনই যাঁর দৃষ্টি পড়েছে, তখনই সেই দৃষ্টি যেন, একটি বিষাক্ত শলার ন্যায়, আমার বুকের এপিঠ ওপিঠ পার হয়ে গেছে। তুমি সকলই বোঝ,—সুভাষিণী, সকলই তুমি ভালরূপ বোঝ, বোঝ না কেবল আমার দুঃখ।

সুভাষিণীর চক্ষে দুই চারি ফোঁটা জল ঝরিল। সুভাষিণী, যুবকের হস্ত দ্বারাই সেই দরিত-জল-ধারা মুছিয়া ফেলিয়া, রমণী-কণ্ঠের জগন্মোহন মাধুরীর সহিত ধীরে ধীরে বলিল,—

"প্রাণাধিক, তুমি আমার প্রাণে আর কষ্ট দিও না। তোমার শৈশব ও প্রথম-শিক্ষার সময় বিফলে গিয়েছে। অনেকেরই যায়, তোমারও গিয়েছে। কিন্তু সম্মুখে অনন্ত কাল।

যাঁহাকে বিশ্বেশ্বর ব'লে দিবানিশি ডাকি, তাঁহারই আর এক নাম অনন্তদেব। তিনি আমাদের প্রাণের মধ্যে অনন্ত আশা রোপণ করেছেন। তিনি যদি সত্য বস্তু হন, তা হ'লে, তাঁহারই কৃপায় সে আশা অবশ্য—অবশ্য—অবশ্যই—পরিপূর্ণ হবে। ঈশ্বরকে যদি বিশ্বাস কর, তা হলে তাঁহাকে পূর্ণমঙ্গল ও সন্তানবৎসল জ্ঞানে ভালবাসিও। তিনি মানুষের প্রাণে আশা দিয়ে নিরাশ করেন না,—পিপাসা দিয়ে প্রাণটাকে পোড়া'য়ে পোড়া'য়ে দগ্ধ কর্‌তে ভালবাসেন না। তোমায় আর এক কথা বলি। তুমি আমাকে ত তোমার ব'লে জান? আমি ত দেহ প্রাণে, জীবনে ও মরণে, সম্পূর্ণরূপে তোমারই বস্তু। তা হ'লে তুমি আর এমন ভাব মনে পুষ্‌বে কেন? আমার যা আছে, তা তোমার। তা আজ যদি তোমার আয়ত্ত না হয়, এক দিন না এক দিন অবশ্যই হবে। তোমাকে বেদান্তের তত্ত্বও ত বুঝিয়েছি। আমি আর তুমি এক। যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে হৃদয়ে এই একত্ব—এই অভিন্ন-তন্ময়তা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত না হয়, দাম্পত্য-জীবন, সে পর্য্যন্ত, জীবনের বিড়ম্বনা মাত্র।

পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, সুভাষিণী যে যুবককে এত সম্মান ও এত আদর করিতেছে, সে ই সুভাষিণীর স্বামী ললিতমোহন শর্ম্মা। পাঠক এত দিন ললিতের কথা কানে শুনিয়াছেন, তাহাকে চক্ষে দেখেন নাই। ললিত রূপে প্রকৃতই রমণী-মোহন। কিন্তু ইদানীং ললিতের নিত্য-জীবনও একটুকু সম্মানের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। ললিতের অনুতাপ ও অধ্যয়নশ্রম সকলেরই মন আকর্ষণ করিয়াছে। অনুতাপের অর্থ কি? অনুতাপ আর বিষাদ এক কথা নহে। বিষাদে নৈরাশ্য, অনুতাপে উৎসাহ, উদ্যম,—আত্মোৎকর্ষ-সাধনের জন্য অটল অধ্যবসায়। অনুতাপের প্রকৃত অর্থ মনুষ্যের প্রকৃতি-নিহিত পশুভাবের সহিত দেব-ভাবের সংগ্রাম। যখন দেব-বৃত্তিগুলি প্রকৃতির অধস্তর-নিহিত পশু-বৃত্তিগুলিকে পদ-তলে ফেলাইয়া আপনাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, তখনই মানুষ কিছু দিন অনুতাপে দগ্ধ হয়। ললিতও কিছুদিন অনুতাপের আগুনে ভাজা ভাজা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে পথ লইয়াছে, তাহার প্রাণে আশা ফুটিয়াছে। আশার সঙ্গে অল্প অল্প শান্তি আসিয়াছে। সুতরাং এখনকার ললিত, আর প্রথম বয়সের ললিত, এক জন নহে। এই যে লোকে পুনর্জন্মের কথা কহে, সজ্জনের পক্ষে প্রতিদিনের প্রবহন-শীল কর্ম্ম-জীবনই পুনর্জন্ম। ললিতেরও পুনর্জন্ম হইয়াছে। সে তাহার জীবনসঙ্গিনী সুভাষিণীকে দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, তাহারই হাতে জীবন ও প্রাণ সঁপিয়া দিয়াছে। যে রূপের উপাসনায় ধরা পড়িয়াছিল, সে এখন হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ও সমুজ্জ্বল প্রতিভার উপাসনা করিতে শিখিয়াছে। ললিতকে সুভাষিণী অন্তরের সহিত ভক্তি করে। এইরূপ অনুতাপ-পরিবর্ত্তিত অধ্যবসায়শীল যুবাকে আমরাও একটুকু ভক্তি করিতে যত্ন করিব।

ললিত সুভাষিণীর প্রণয়াদরে প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "আজি তোমাকে সারা দিন মুহূর্ত্তের তরেও দেখ্‌তে পাই নি।

সুভাষিণী বলিল, "তা বটেই ত; আমিও সে কষ্ট অনুভব ক'রেছি। করি কি?"

ললিত, আদরের উদ্বেলতা সময়ে, সুভাষিণীকে ষিণী বলিয়া ডাকিত। পিতামহ ডাকেন সুভা বলিয়া। এই জন্য, রগড় করিবার উদ্দেশ্যে, নামের ভাগাভাগি করিয়া, ললিত ডাকিত ষিণী বলিয়া।

ললিত বলিল, "ষিণী, তুমি কি পণ্ডিতদিগের ব্যবহারে তুষ্ট হ'য়েছ?

সুভাষিণী বলিল, "কেন? পণ্ডিতেরা কি করেছেন?"

ললিত। "কর্‌বে আর কি? ওদের খোসামুদে প্রবৃত্তিটা বড়ই জঘন্য। এতে মনে বড় বেশী ঘৃণা বোধ হয়। যারা অর্থের লোভে অথবা সামান্য লাভের জন্য মানুষকে খোসামুদি কর্‌তে পারে, তাদের কি আর অসাধ্য কর্ম্ম আছে? ওরা দাদা মহাশয়কে কত কি ব'লে ব্যাখ্যান ক'রেছে, তা শুনেছ কি? এক জন এমনই ধৃষ্ট, সে অম্লান-মুখে ব'লে ফেল্‌লে, আমি বিশ্বেশ্বর-দর্শনের জন্য কাঁশী আসি নাই। কাঁশী এসেছি ভঁবদেব দর্শনের জন্য। ছ্যা"

সুভা। "দেখ ললিত, তুমি পণ্ডিতদের নিন্দা ক'রো না। সেই যে ঋষিতাপসের বেদ-বেদান্ত,—ব্যাস-বাল্মীকির অমূল্য ভাণ্ডার, এবং কালিদাস ও ভবভূতির ভুবন-দুর্ল্লভ সংস্কৃত, তা এঁদেরই যত্নে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে রক্ষিত রয়েছে। এঁরা ভিক্ষা ক'রে যা সংগ্রহ করেন, তা-ই ভিক্ষু ও বুভুক্ষু ছাত্রদেরে বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। বিদ্যা-দানের সঙ্গে অন্ন-দান এই পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি? এখন বল, অপরাধ আমাদের, না ওঁদের? যাঁরা সমাজে ধনে মানে সমৃদ্ধ, তাঁরা যদি শাস্ত্র-ব্যবসায়িদিগকে বিনা স্তুতিতে সুখ-সমৃদ্ধিতে পালন করেন, তা হ'লে কি মনুষ্য কখনও সখ ক'রে অমন নীচ বৃত্তি ও নিকৃষ্ট পথ আশ্রয় করে?

ললিত। "তবে কি দাদা মহাশয়ও স্তুতিপ্রিয়?"

সুভা। "ছি! দাদা মহাশয়ের কথা ছেড়ে দেও। পণ্ডিতদের কথায় তাঁর কথা মুখেও এ'নো না। ওতে পাতক হয়। তিনি আমার পরমারাধ্য পিতামহ, আর তা হতেও অধিকতর আরাধ্য গুরুদেব। আমিও ত বঙ্গদেশের আর পাঁচ মেয়ের মত, শুধু এক খানি নাটক নভেল লয়েই দিন কাট্টাতেম্, আর হাতে পায়ে আল্‌তা মেখে, মাথায় একটা বিড়ার মত খোপা বেঁধে, সেই এক রকম একটা পুতুল সেজে, বে'ড়িয়ে বেড়াতেম্। আমার যা কিছু মনুষ্যত্ব হয়েছে, সমস্তই দাদা মহাশয়ের কৃপায়,—তাঁরই অপার স্নেহে ও অপার যত্নে। সুতরাং তাঁর কোন কথা লয়ে মুখে আলোচনা দূরে থাক্, মনেও তেমন কোন ভাব আস্‌তে দেব না। তাই বল্‌ছি, তাঁর কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু, যাঁরা বঙ্গদেশে বড় ব'লে বিখ্যাত, যদি তাঁদের কথা বল, তা হ'লে আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি, দোষ পণ্ডিতদের নয়, দোষ আমাদেরই কপালের—দোষ

রহস্য নামক তাঁহার ধাতুপাঠ খানিও সর্ব্বজন-বিদিত। এই গ্রন্থের উপসংহারে কবি স্বয়ংই লিখিয়াছেন,—কবিত্বপূর্ণ রসিকতা-পূর্ণ মনোহর কবি-রহস্য সমাপ্ত হইল। সন্ধাভিধান-রচয়িতা হলায়ুধ ইহা রচনা করিলেন। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যতীর্থ।

ছায়া-দর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

উপক্রম।

"All Evolution is an awakening to Higher realization."

* * * *

"Discovery, Desire and Development are the successive steps of Progress." Newcomb.

"সম্মুখে অনন্ত কাল,—অনন্ত উন্নতি;
ইহাই অদৃষ্ট-রেখা, বিধাতার কর-লেখা,
সুখ-দুঃখ-পরীক্ষিত মঙ্গল্য-নিয়তি;—
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-রথে, অনন্ত কর্ম্মের পথে,
বিশ্বময় জীবনের নিয়মিত গতি;—
নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে, আনন্দে বা অশ্রুজলে,
বিকাশ-বৈচিত্র্য-ধর্ম্মে ক্রম-পরিণতি;—
শেষ-চিত্র সৌন্দর্য্যের অনন্ত মূরতি।"

ত্রয়োদশ বৎসরের তরল-নয়না বালিকা, দৈবজ্ঞের হাতের উপর আপনার কচি হাত খানি তুলিয়া দিয়া, একবার আশায় মৃদু মৃদু হাসিতেছে; আবার—বুঝি দৈবজ্ঞের মুখ খানি একটুকু ভার দেখিয়া—ভয়ে ধুক বুক করিতেছে; এবং মাঝে মাঝে, মায়ের চক্ষের দিকে সলজ্জ চক্ষে তাকাইয়া, যেন চোখে চোখে কি কহিতে চাহিতেছে। তাহার ঐ ঈষন্মুকুলিত প্রাণের অর্দ্ধ-সঞ্জাত আশা কি পূর্ণ হইবে? বালিকা কি মনের মত বর পাইয়া,—সে যেরূপ সুশীল সুন্দর সুমধুর-ভাষী বরের কথা দিদীমার কাছে শুনিয়াছে, সেইরূপ সোনার চাঁদ বরের কণ্ঠমালা হইয়া,—কোন দিন আনন্দে ভাসিবে? সবে তের বছর

বয়স। এ বয়সে তাহার-কতই বা বুদ্ধি হইতে পারে? কিন্তু বালিকা বুঝুক আর না বুঝুক, তাহার আত্মার অন্তস্তলে ঋষিদিগের উপদিষ্ট অদৃষ্টবাদ। যে অদৃষ্টবাদ, কৃষ্ণোক্ত মহাবাক্যের অর্থানুবাদে, ঈশ্বরকে জগতের সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বময় সজীব-সত্য, এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কার্য্যের সতত-ক্রিয়ান্বিত সাক্ষাৎ নিয়ন্তা বলিয়া উপদেশ করে, বালিকার হৃদয় সেই অদৃষ্টবাদের অস্ফুটভাবে পরিপূর্ণ।

এইরূপ আবার তিরাশী বৎসরের বিষয়-চিন্তা-মগ্ন বিরস-কঠোর বৃদ্ধ। আর বেশী দিন বাকী নাই; তথাপি তাঁহার মন ঐ বিষয়ের কথা ছাড়া আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। তিনি, চিরজীবন, বহু লোকের হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়া, বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিষয়-বিত্ত—সেই তিল-তিল-সঞ্চিত শত-তাল-পরিমিত সম্পত্তি, উচ্ছৃঙ্খলচারী আত্মজবর্গের উদ্দাম ভোগ-বাসনার ভীষণ ঝটিকায়, ভস্মস্তূপের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। তিনি, দৈবজ্ঞকে হাত না দেখাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদের নিকট কোষ্ঠী-পত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এত দিন আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মানিতেন; এখন বুঝিয়াছেন. যে, কর্ত্তার উপরও কর্ত্তা আছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা, তাঁহার কর্ম্ম-ফলের স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ, কপালে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিবার আর পথ না পাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে তিনি কোষ্ঠী দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারও আত্মার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে ঐ ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্টবাদ, ইয়ুরোপ প্রদেশেও, বহুকাল হইতে, বহুসহস্র জ্ঞান-বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তির বিশ্বাসের বস্তু। গ্রীক-গুরু সক্রেতিস অদৃষ্ট মানিতেন। রোমক-বীর সিজর অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন; এবং অধুনাতন পৃথিবীর অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, অদৃষ্টলিপির অখণ্ডনীয়তার উপর নির্ভর করিয়াই, কিবা যোদ্ধ্‌বেষ্টিত রণক্ষেত্রে, কিবা জিহ্বা-যুদ্ধ-কল-কলায়িত জাতীয়-প্রতিনিধি-সভায় অটল ও অক্ষুব্ধ দণ্ডায়মান রহিতেন।

ফলতঃ, অদৃষ্টবাদ বড় বিষম সমস্যা,—জ্ঞানজগতের অতি বড় গভীর রহস্য। এক দিকে মনুষ্যের স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছাতন্ত্র গতি; আর এক দিকে অদৃষ্টের অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধি, এবং অনন্ত উন্নতিমূলক মঙ্গল্য নিয়তি। এই দুইয়ের দার্শনিক সামঞ্জস্য কিরূপ কঠিন কথা, তাহা চিন্তাক্ষম ব্যক্তিকে বিবরিয়া বলা অনাবশ্যক। মনুষ্য কখন কি করিবে, এবং তাহার কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি ফল তাহাকে কোথায় নিয়া পঁহুচাইবে, তাহা যদি অনাদি কাল হইতে আগা গোড়া শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম-সম্পর্কিত স্বাধীনতা ও কর্ম্মসূত্রিত দায়িতার আর অর্থ কি? কিন্তু এই স্বাধীনতা ও দায়িতা সত্ত্বেও অদৃষ্ট অথবা নিয়তির আধিপত্য একবারে অস্বীকার করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য। মনুষ্য, অনেক সময়, যাইতে চায় উত্তরে; কিন্তু সে, কেমন এক প্রকার অচিন্তিত ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া যায় দক্ষিণে। হার্ব্বার্ট

জ্ঞানে ভক্তি করি। আমি কি কখনও আমার জীবনে ওর ভালবাসার ঋণ পরিশোধ কর্‌তে পারব ?'

ললিত।—"তোমার সইর চিত্ত ও চরিত্র যে স্বর্গের বস্তু, তাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই। সে ত সত্য সত্যই তোমার দ্বিতীয় প্রাণ। কিন্তু আমি কখনও, তার মুখের দিকে চেয়ে, মুখ ফুটে দুটি কথা বল্‌তে সাহস পাই নেই। তার চোখে মুখে কেমন এক দেবতার জ্যোতিঃ, দেখ্‌লেই চিত্তে ভক্তি জন্মে। যেন মা কিংবা ভগ্নিনীর কাছে ব'সেছি, মনে এমনই একটা ভাব আপনা হ'তে ফুট্‌তে থাকে। রমণী-প্রকৃতি যখন এইরূপ উন্নত ও পবিত্র হবে, তখন আর পৃথিবীর এ দশা থাক্‌বে না। হউক না মেন একটুকু অভিমানিনী, কিন্তু ধন্য মেয়ে বটে।"

সুভা। "দেখ ললিত, আমিও যদি ওর মত পণ্ডিত হতেম, তা হ'লে আমারও ওর মত একটু অভিমান হতো। অভিমান না হোক, অন্ততঃ মনে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকৃত।"

ললিত। "আর রগড় করো না, ঝিণী। একি সত্যই তোমার মনের কথা, না আমার কাছে সইয়ের বড়াই হচ্ছে।

সুভা। "বড়াইর কথা নয়—ললিত, সত্যই আমার মনের কথা। আমার সই আমা হ'তে হাতে বিঘতে বড়। তা তুমিও বোঝ না, দেশের লোকেও বোঝে না। আমার বিদ্যার প্রধান একটা ভাগই নিম্নশ্রেণীর টোলের বিদ্যা। ঐ যে কথায় বলে,—

তোতা পাখী, কোথা রাখি,
কথা শিখি, কথা লিখি।—

কতকগুলি কবিতা আমার কণ্ঠস্থ আছে, আর ইংরেজী কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাসের নানা কথা আমার কণ্ঠে সরে। কিন্তু সইর বিদ্যা তা নয়। যদি সভায় বলতে হয়, তা হ'লে বল্‌ব,—আমার সইর বিদ্যা দে প্রকার সফরী-লীলা হ'তে অনেক উন্নত। উহা সমুদ্রের মত গভীর, পর্ব্বতের মত উচ্চ। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই, যাতে সরযূর অধিকার জন্মে নি। কিবা রসায়নের নিগূঢ় রহস্য, কিবা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের জগন্মোহিনী কথা, কিবা তরুলতার তরলতত্ত্ব, কিবা তড়িল্লতার গভীর অর্থ আমার সইর প্রাণে সমস্তই মালার মত গাঁথা রয়েছে।"

ললিত। "তবে তুমিও কেন বিজ্ঞানের আলোচনা কর না।"

সুভা। "তা কর্‌ব, নিশ্চয়ই কর্‌ব। আমি এক্ষণ ইউরোপের পুরাতন ও নব্য দর্শন, এবং তত্ত্ববিদ্যা ল'য়ে একটুকু বেশী পরিশ্রম কচ্ছি। আমার এইগুলি হয়ে গেলেই, আমি আবার শিশুর মত নূতন উৎসাহে, বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগে প্রবেশ কত্তে একবার প্রাণপণ করে দেখ্‌ব।"

ললিত। "তোমার এই অধ্যয়ন-পিপাসা আমাকেও যেন এক এক সময়ে মাতাল ক'রে তোলে। আমি আমার কণ্ট্রাক্টারের কাজ ছেড়ে দিয়েছি; আমিও আমার দেহ প্রাণটা অধ্যয়নেই উৎসর্গ কর্‌ব।"

সুভা। "সত্যই কি কণ্ট্রাক্টারের কাজ ছেড়ে দিয়েছ ?"

ললিত। "হাঁ, একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। তুমি যখন গহনা পর না, সোনা রূপা ছোঁও না, তখন আর আমার সারা দিন মুটে মুজুরের সঙ্গে মজুরী করে কাজ কি ?"

সুভা। "তা ছেড়েছ, বেশ করেছ। এস, এখন দুজনেই ঈশ্বরের নাম লয়ে এক সঙ্গে জ্ঞানের অপার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি, দেখি ওতে কি আছে। তুমি আমার সইর পত্র প'ড়ে কি সিদ্ধান্ত করেছ ?"

ললিত। "সিদ্ধান্ত করেছি—তোমার সই যা লিখেছে সব সত্য। এই যে স্বামী—স্বামী—স্বামী বলে একটা গৌরব, এ সেই পুরাতন পশাচারেরই একটুকু ভস্মাবশেষ। আমিও যখন একটা বনের বাঁদর ছিলেম, তখন আমাকেও আমি তোমা হেন দেব-রমণীর মালিক ও মনিব মনে কর্‌তেম। এখন সে কথা স্মরণ হলেও চিত্ত ঘৃণায় জর্জ্জরিত হয়।"

সুভা। "তা আমি ত দেখ্‌ছি, তোমরা সকলেই এক পথের পথিক। সরযূর যে মত, তার আদুরে স্বামী মনোরঞ্জনেরও সেই মত। তুমিও ঐ মতেই মোহিত হয়েছ। মনোরঞ্জন কি অমন রূপের ডালিকে বশ কর্‌বার জন্য মত দিয়েছে, না নিজে বু'ঝে সু'ঝে, ভেবে চিন্তে, একটা গভীর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, তা ধর্ম্ম জানেন। (একটু হাসিয়া) তুমিও যে খুব বেশী চিন্তা ক'রেছ, এমন ত আমার বোধ হয় না।

ললিত। "তবে তোমার মত কি ?"

সুভা। "আমার মত যা, তা কতকটা মনেই গাঁথা আছে। কিন্তু সেই অস্ফুট মতকে আগে আপনার মনে পরিস্ফুট ক'রে তোলা,—তার পর ভাষায় ব্যক্ত করা,—বড়ই সহজ কথা কি ? এক দিকে ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান,—বিশেষতঃ আজি-কালিকার দুরন্ত সমাজ-বিজ্ঞান,—আর এক দিকে পুরাতন ভারতের শত-সৌন্দর্য্যময়ী আর্য্যসভ্যতার শান্তি-স্থান। এ দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কর্‌বার যোগ্য লোক কি আমি? তোমাকে পূর্ব্বেই ত বলেছি—সরযূ আমা হ'তে অনেক উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষিত ও চিন্তা-শক্তি-সমন্বিত। সে যা লিখেছে, তা পড়্‌বার সময়ে পাষাণেও আগুন জ্বলে। অবলা কি পশু, না পিশাচ যে, মনুষ্য তাকে চিরদিনই অতি নিকৃষ্ট বস্তু জ্ঞানে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ কর্‌বে ? পক্ষান্তরে, পতিভক্তিই দাম্পত্য প্রেমের প্রাণ। যা পৃথিবীতে, শত সহস্র বৎসরে, এত দুঃখে, এত কষ্টে ফুটেছে, যদি নব্য-সভ্যতার উন্মাদ-স্রোতে তা একেবারে ভেসে যায়, তবে মনুষ্যের আর থাকে কি ? ঐ দেখ আমাদিগের দেয়ালের উপর সীতার আলেখ্য। আজি আকাশে একাদশীর চাঁদ কত লোকেরই ত প্রাণ মন শীতল কচ্ছে। কিন্তু ললিত,—আমার প্রাণাধিক,—আমি তোমায় বলি, ঐ একমাত্র সীতার চিত্র, সমগ্র পৃথিবীর না হউক, ভারত-ললনার চরিত্র-বিকাশের পথে যেরূপ সহায়তা করেছে, আকাশের চাঁদও তাহা করে নাই। যদি আকাশের ঐ চাঁদ চিরদিনের তরে আঁধারে ডুবে যায়, মনুষ্য

তা সহ্য কর্‌তে পারবে। কিন্তু পৃথিবী যদি চিরদিনের তরে সীতার চিত্রে,—সীতার চরিত্রে বঞ্চিত হয়, তা হ'লে মনুষ্য-সমাজের অন্তস্তল হ'তে এমন একটা গভীর হৃদয়ভেদি দীর্ঘ নিঃশ্বাস উত্থিত হবে, যে সে নিঃশ্বাসে স্বর্গবাসী দেবতার প্রাণও ক্ষণ-কালের তরে কম্পিত হ'তে পারে।"

ললিত। "বিণী, তুমিই দেবতা। তুমি যখন হৃদয়ে একটু উত্তেজিত হ'য়ে কথা কইতে থাক, তখন আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্তই যেন তোমার তখনকার সে ভাব-সমুদ্রে ডু'বে যায়। তা যাক্, তুমি কি লিখ্‌বে তা আমায় বল।"

সুভাষিণী। "আমি কি তোমায় না দেখিয়ে পত্র পাঠাব? সরযূ ত আমার পর নয় যে, তার সঙ্গে আমার পত্রের লড়াই হবে। সে তার প্রাণ-প্রিয় বিশ্বস্ত জনের কাছে প্রাণের কথা লিখেছে; আমিও আমার প্রাণের কথা প্রাণ খুলে লিখ্‌ব। সে মিল আর ষ্টান্‌টনের দুখানি পরিচিত গ্রন্থের কথা লিখেছে। আমি তা ত পড়েইছি। কিন্তু তা ছাড়া হাভ্‌লক্, হিবার নিয়ুটন প্রভৃতি অনেকের গ্রন্থপত্র মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন ক'রেছি। এ প্রসঙ্গে এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন লাইব্রেরীতেও বোধ হয় দুই তিন শত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কোম্‌টি প্রভৃতি পৃথিবীর সমস্ত বড় পণ্ডিতই এ কথার আলোচনা করেছেন, এবং বহু চিন্তা ও আলোচনার পর আপনার মত গ্রন্থবদ্ধ ক'রে গেছেন। প্রশ্ন কঠিন, সমস্যা অতি গুরুতর। আমি কএকটি দিন এ বিষয়ে একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা কর্‌ব, এবং তার পর, যদি আমার মনের কথা শব্দে গাঁথ্‌তে পারি, তা হ'লে সরযূকে লিখে জানাব। তুমি অত উতলা হচ্ছ কেন?"

দুইয়ে যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন সুভাষিণীর দিদীমা, একটুকু হাসির গন্ধার বাহির হইতে, সুভাকে ডাকিলেন। ললিত তাঁহার সাড়া পাইয়াই দ্রুত-পদে সরিয়া পড়িল। সুভাষিণী ঘরের বাহির হইয়া, সহসা নিদ্রোত্থিত, শিষ্ট শান্ত মেয়েটির মত, দিদিমার সঙ্গে চলিল। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্বস্মৃতি।

নিখিল জীবনালোক পবন তাড়নে,
মিলিল অনন্ত রত্ন * অনন্তের সনে।
সেই দেব নিরাকার † এক প্রাণ বসুধার
নিশ্চল,—জীবন-পথ নিরুদ্ধ অর্গলে,
দিবালোক অবসান, সুপ্তদেহ লুপ্তপ্রাণ
পূতধারা শতমুখী জাহ্নবীর জলে।
স্নেহ-চক্ষে নিরমল, এক ধারা স্নেহজল
মিশিল বারেক অই বীচি-মালা সনে,

* আত্মা। † পবন।

সৃষ্টি স্থিতি চরাচর, সুবিশাল নীলাম্বর
ঘুরিল বারেক মাত্র কোমল নয়নে।

স্বর্গীয় বিমল প্রভা, যেন ক্ষীণা ক্ষণ-প্রভা
নিমিষে উঠিল দূর প্রদোষ অম্বরে,
স্নেহ মায়া ভালবাসা, জগতের সুখ-আশা
ফুরাইল, সে হৃদয়ে চিরদিন তরে।

অস্তমুখ দিনকর, স্বর্ণবর্ণ দিগন্তর,
আবরিল কালমেঘে মানস আমার,
নিদাঘ বায়ু হিল্লোলে, বহি মহামায়া * কোলে
ঢালিল সন্তপ্ত দেহে অনলের ধার।

হইল বিধাতা বক্র, অভাগার ভাগ্য-চক্র
বিপরীত আবর্ত্তনে ঘুরিল সঘনে,
সুখ-আশা হ'ল হত, ক্ষীণ জীবনের পথ
হইল কণ্টকপূর্ণ হতাশ জীবনে।

কার পানে চাব আর, কে বুঝিবে দুঃখ ভার,
কে শুনিবে অভাগার দুঃখের বারতা?
কাঁদিবে কাহার প্রাণ, দেখি মম মুখ ম্লান,
কে বুঝিবে না জিজ্ঞাসি মরমের কথা।

হৃদয় বাড়বানলে, কে নিভাবে অশ্রু-জলে
কে জুড়াবে দগ্ধপ্রাণ সুধার সিঞ্চনে?
মঙ্গল কামনা করি, কে পূজিবে সুরেশ্বরী
শ্বেত রক্ত শত দলে পবিত্র জীবনে।

যৌবনের প্রথমেতে, অভিনয় এই মতে
এক চিত্র হ'ল শেষ,—সুখ-অবসান!

* গঙ্গা।

উদিল বিকট ছবি, বিষময় কালরবি
কালের করাল তেজে দহিল পরাণ।

* * *

যাও দেব দেবাকার, স্নেহ কোলে অন্নদার
ভুলে যাও পূর্ব্বকথা,—অতীত-জীবন;
নশ্বর সংসারে আর, আসিও না পুনর্ব্বার,
ভ্রমিও না পান্থাবাসে অতিথি মতন।

নাহি তথা হিংসাদ্বেষ, রোগ শোক দুঃখ ক্লেশ
হীনতা বা দরিদ্রতা—ব্যসন বন্ধন;
সংসার বিচিত্র জালে, পড়ে না ক কোন কালে
লোভ মোহ মায়াযুক্ত তথা জীবগণ।

অনন্ত-আকাশ মাঝে, অনন্ত ভানু বিরাজে
ভাসে না রাহুর ছায়া সে সূর্য্য মণ্ডলে,
জীবনে মরণ-দুখ নাই, তথা চন্দ্র মুখ
আবরে না কোন দিন জলদের জালে।

পূর্ব্ব দুষ্কৃতির ফল, নাহি তথা অশ্রুজল,
নাহিক করুণ কণ্ঠ,—কাতর রোদন,
কৃতান্তের বিভীষণ, হুহুঙ্কার গরজন
সে অম্বরে প্রতিধ্বনি করে না কখন।

নাহি বহে ঝঞ্ঝাবাত, না হয় অশনি পাত,
প্রলয়ের বৈশ্বানর না জ্বলে গগনে,
তামসীর অন্ধকার, এক অঙ্গ একাকার
সে দেশের জীবগণ দেখে না নয়নে।

বিমল কিরণ রাশি, দশ দিকে যায় ভাসি,
প্রেমের সঙ্গীত সহ প্রীতির উচ্ছ্বাস?
নাহি ভূত ভবিষ্যৎ, জগত পরে জগৎ
এক ক্ষেত্রে একমত জীবের নিবাস।

নাহি তথা তৃষ্ণা ক্ষুধা, প্রস্রবণে ঝরে সুধা,
চিরশান্ত বিন্দুমাত্র বারেক পিইয়া,
নাহি স্বপ্ন তন্দ্রাবেশ, নিদ্রাহীন সেই দেশ
প্রকৃতি শান্তির কোলে রয়েছে ঘুমিয়া।

মৃদুল মন্থর গতি, পূর্ণ-অঙ্গী ভাগীরথী
বহমানা চিরদিন পীযূষ ধারায়,
মন্দার-সৌরভ সহ, সদা বহে গন্ধ-বহ
উল্লসিতা দিগঙ্গনা মাতোয়ারা প্রায়।

কত প্রিয় দরশন, শ্যামল পাদপগণ
দাঁড়াইয়ে স্থিরমূর্ত্তি ব্রততী বিতানে,
নয়নের প্রিয়তম, ফুল্ল পারিজাতোপম
ফুটে তথা কত ফুল যেখানে সেখানে।

শান্তি চন্দ্রাতপ-তলে, মহানন্দে কুতূহলে
নিবসে সকলে ডুবি প্রেমের সাগরে;
এক চিন্তা এক ধ্যান, এক বুদ্ধি এক জ্ঞান
এক গতি এক লক্ষ্য একের উপরে।

পদ্মপর্ণে রচি স্থান, গাও সদা প্রেম-গান
উঠিবে অম্বর বাদ্য গভীর-নিস্বনে,
মায়ের সোহাগ কোলে, সুখে থাক সুখী ছেলে
লভ জ্যোতির্ম্ময় রূপ উজ্জ্বল জীবন।

সংসার তরঙ্গ-নীরে, ভেসে যাব ধীরে ধীরে,
কোথায় আশ্রয় পাব কোথা পাব বল,
এক মাত্র আছে সার, ভরসা মনে আমার
মায়ের করুণা আর, তব পুণ্য ফল।

ঢাকা,—শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত।

তার পর—তার পর।

পৃথিবীর সকল ভাষায়ই কতকগুলি শিশুতোষিণী শব্দলহরী, অথবা শিশুদিগের নিদ্রা-সমুৎপাদিনী সুললিত কথা আছে। যাঁহারা, মানবীয় হৃদয়-রহস্যের মহাগুরু, ও কবিতার কল্প-তরু সেক্ষপীয়রের লেখায় সুপ্রবিষ্ট, তাঁহারা বিশিষ্টরূপে জানেন যে, যে ঐন্দ্রজালিক লেখনী ব্রুটাশ ও এণ্টনীর বহ্নিবর্ষিণী বক্তৃতা রচনা করিয়াছে, তাহা শিশুর ন্যায় তরল-হৃদয়া তরুণীদিগের জন্য—

লাল্লা, লাল্লা, লাল্লাবী—
লাল্লা, লাল্লা, লাল্লাবী—

প্রভৃতি তরল শব্দের লহরী গাথিতে লজ্জিত হয় নাই।

আমাদের এ দেশেও ঐরূপ শিশু-সুখা সরস গাথার অভাব নাই। শিশুর ঘুম না আসিলে, পিসী মাসী, মাতা, অথবা প্রৌঢ়া পিতামহী, শিশুর নয়ন-পল্লবের উপর নিজ নিজ করপল্লব রাখিয়া, কোমল-কণ্ঠে গাইতে থাকেন,—

খুকুমণি পাখিটি মোর
কোন্ গাছেতে উড়ে,
খুকু ব'লে, ডাক দিলে,
উ'ড়ে এসে পড়ে।

কেহ আবার খুকুমণির গাথা না গাইয়া, নিদ্রাবতী মাসীকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যথা,—

নিদ্রাবতী মাসী তুমি
মোদের বাড়ী এ'স,
খাট নাই পালঙ্ নাই,
খুকুর চক্ষু পে'তে ব'স।

ছানা দেব ননী দেব
দেব মিঠে কথা;
ঘুম ঘুমালী হবে তুমি,
গেয়ে খুকুর গাথা।

যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি বিষয়ে আলোচনা করেন, বোধ হয় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, বাঙ্গালির অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে, বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে, অনেকেই ইদানীং বৃদ্ধ খুকুমণি। শুধু খুকুমণির গাথা অথবা ঘুম-ঘুমালীর সুকুমার কথায় এখন আর তাঁহাদিগের নিদ্রা আইসে না। যেন তাঁহাদিগের নিদ্রা-জননের জন্যই, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনন্ত-কৌশল-বিলাসিনী আনন্দময়ী কথার নানাবিধ আড়ম্বর,—এবং সকল কথা সম্পর্কেই, তাঁহাদিগের মুখে সর্ব্বদা ঐ এক প্রশ্ন—তার পর?—তার পর?

মেয়েরা যেমন, সন্ধ্যার পরে, বৃদ্ধা মাতামহী কিংবা পিতামহীকে বিকচ-কমল-মালার ন্যায় বেষ্টন করিয়া, 'প্রস্তাব' শুনিবার জন্য পিপাসু-প্রাণে উপবিষ্ট হয়, এবং প্রতিক্ষণেই পুনঃ পুনঃ ঐ এক—তার পর,—তার পর—প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজ নিজ হৃদয়ের ঔৎসুক্য দেখায়;—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মনে প্রথমতঃই এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় যে, দেশের অধিকাংশ পাঠকই বুঝি, বালক কিংবা বালিকা সাজিয়া, লেখকদিগকে সেইরূপ বেষ্টিয়া বসিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা ঐ এক—তার পর, তার পর, তার পর—প্রশ্ন করিয়া, নিজ নিজ সাহিত্য-রস-পিপাসার আকুলতা দেখাইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশের পাঠক ও লেখক সকলেই যদি ঐ তার পর, তার পর লইয়া ব্যস্ত কিংবা ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে এ দীন-দুর্ব্বল, অশ্রুসম্বল দেশে কখনও কি জাতীয়-শক্তির আশানুরূপ বিকাশ, অথবা জাতীয়-সাহিত্যের প্রাণ-বল-বৃদ্ধি ও উপযুক্ত-রূপ পুষ্টি হইবে?

ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স অথবা জার্ম্মেণির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রয়োজন নাই। ঐ যে আমাদিগের বাড়ীর ধারে অসভ্য জাপান, আজি সুসভ্য ও শক্তি-সম্পন্ন বীরের ন্যায়, কর্ম্ম-বীরের উচ্ছ্রিত আসনে উপবিষ্ট হইয়াছে, উহার প্রতিই দৃষ্টি কর। বিগত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে জাপানে কিরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে,—কৃষি, বাণিজ্য, অর্থবিদ্যা, ইতিহাস এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে, সাহিত্যের কোন্ বিভাগে কত গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে, এবং এই বঙ্গদেশেই বা সাহিত্য কি সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আলোচনা কর।

এক জন জ্ঞান-বৃদ্ধ, শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বহু দিন হয় আমাকে বলিয়াছিলেন যে,

পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের শত্রু ছিল কবিতা, আর এই নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের শত্রুরূপে দাঁড়াইয়াছে কথা। বৃদ্ধের এই বাক্যটি আমার নিকট অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং অর্থ-বিদ্যা ও যন্ত্র-বিদ্যা, সংস্কৃত সাহিত্যে ঠাঁই পায় নাই কেন? ঠাঁই পায় নাই কবিতার জ্বালায়, আর কবিতার কণ্ঠ-লগ্ন কান্ত-সহচর ছন্দের ঠমকে। ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দেও। যে দেশে শারীর-তত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর-বিদ্যার অতি কঠোর তত্ত্ব-নিচয়ও কবিতায় লিখিত, কবিতায় ব্যাখ্যাত, এবং সালঙ্কারা কবিতার ন্যায়, রসৌৎসুক্যের সহিত, পঠিত পাঠিত ও আলোচিত হইয়াছে, সে দেশে কি, আকাশের তারা খসিয়া পড়িলেও, বিজ্ঞান ফুটিতে পারে?

একবার আমার একটি অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ্, কর্ণের পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। আমি আমার সুহৃদের পার্শ্বে উপবিষ্ট। এক জন বড় কবিরাজ চিকিৎসার্থ আহূত হইলেন। সুহৃদ্বরের কষ্টে ক্লিষ্ট হইয়া কবিরাজ মহাশয়কে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—মহাশয় এখন কি উপায় হইবে? কবিরাজ তৎক্ষণাৎ চরক কিংবা সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত একটি শ্রুতি-মধুর শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ বৃদ্ধ ও পণ্ডিত। তিনি বার্দ্ধক্যের গভীর-কণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন,—

অর্কস্য পত্রং পরিণাম-পীতং,
আজ্যেন লিপ্তং হব্যাশতপ্তং,
সম্পীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং,
নিহন্তি শূলং শত-বেদনঞ্চ। *

কবিতাটি যখন প্রথম শুনিলাম, তখন মনে লইল, কবিরাজ বুঝি মাঘ কিংবা ভারবির কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর মনোযোগ করিয়া বুঝিলাম, আয়ুর্ব্বেদেরই কথা বটে।

আর এক দিন, এ দেশের কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্র-পল্লীতে, একটি বিশেষ সম্ভ্রান্ত, বহু-লোক-পালক, বহু-পূজ্য বৃদ্ধ মহাত্মার রোগের কথা শুনিয়া, দেখিবার জন্য দৌড়িয়া গেলাম। যাইয়া দেখি, বাড়ীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে, চারি পাঁচ খানা সুসজ্জিত পাল্কী ঘেরিয়া ত্রিশ চল্লিশটি বেহারা তামাকু ও বাঙ্গালা চুরুট খাইতেছে, আর নানা প্রসঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া এক বিষম হট্টগোল তুলিয়াছে। ভাবিলাম, এ কি? বাড়ীর ভিতরে যাইয়া দেখি, রোগ-ক্লিষ্ট বৃদ্ধ, অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছেন; কিন্তু যে সকল বিশ্রুত-নাম কবীন্দ্র, কবিভূষণ ও কবি-শেখর মহাশয়ের পাল্কী বেহারার সাহায্যে ওখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা ছাত্র-বৃন্দ, দর্শক-বৃন্দ, এবং বাড়ীর কর্ত্তৃ-বৃন্দ ও কর্ম্মচারি-বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া রোগের উপযোগি ঔষধ ও পথ্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। রোগীর তখনও অল্প অল্প জ্বর আছে। ঐরূপ জ্বরসত্ত্বেও কেহ

* আমি শ্রুতিধর নহি। কিন্তু শ্লোকটি সেই হইতেই স্মরণ আছে। স্মরণায়ত পাঠ সর্ব্বাংশে শুদ্ধ ও সমীচীন না হইতে পারে।

দেওয়া যায় কি না, ইহা লইয়াই প্রথমে উঠিল।

কবীন্দ্র বলিলেন,—

"জ্বরিতোহিতমশ্নীয়াৎ"

অর্থাৎ যে জ্বরিত,—জ্বরযুক্ত—তাহাকে হিত পথ্য দিতে হইবে।

সেখানে এক জন ছিলেন, তাঁর উপাধি কবীন্দ্র-চূড়ামণি। কবিত্ব-শক্তির এই উচ্চ-উপাধিতে মনে হইতে পারে, যে বুঝি চিকিৎসা শাস্ত্রেও তিনি সর্ব্বপ্রধান। তিনি, এক টুকু অগ্রসর হইয়া, হাত নাড়িয়া বলিলেন—"ওহে, ওখানে ঐ হিত শব্দই অহিত-বোধক। হিতের পূর্ব্বে একটি অকার ছিল, তাহা ছন্দের অনুরোধে, সন্ধি-সূত্রের বিধান অনুসারে লোপ পাইয়াছে। অতএব বাক্য করিতে হইবে,—জ্বরিতঃ অহিতমপ্যশ্নীয়াৎ —অর্থাৎ যে জ্বর-যুক্ত, তাহার যদি হিত-বস্তুতে রুচি না জন্মে, তাহা হইলে, তাহাকে অহিত বস্তু দেওয়াও দূষ্য নহে"। এই 'হিত' ও 'অহিত' লইয়া বহুক্ষণ বাদার্থের বিচার হইল। প্রথমাদি-ব্যুৎপত্তি-বাদের প্রসঙ্গ উঠিল। ভট্টি ও ভারবির বহু শ্লোক, কবিরাজ মহাশয়দিগের নয়নাবর্ত্তন ও ভ্রূনর্ত্তনের সহিত, ক্ষণকাল সকলের শ্রুতিমণ্ডলে নৃত্য করিল। আমি নীরবে বসিয়া, কান পাতিয়া, কবিতাগুলি গুনিতে লাগিলাম।

রোগীকে কিরূপ জল খাইতে দেওয়া যাইবে, কথা প্রসঙ্গে সেই কথাও উঠিল। শীতল গঙ্গা জল দেওয়া যায় কি না, ইহাও আলোচনার বিষয় হইল। কেন না রোগী বৃদ্ধ। এবার সেই কবীন্দ্র চূড়ামণি সকলের আগে কবিতা পাঠ করিলেন।—

"নাদেয়ং নাদেয়ং
শরদি বসন্তে চ নাদেয়ং"

এ কবিতা নৈষধের, না আয়ুর্ব্বেদের, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিব না। কবিতার অর্থ লইয়া একটুকু বেশী বিবাদ বাধিল। কবীন্দ্র-চূড়ামণি বলিলেন,—

"নাদেয়ং—নদ-সম্ভূতং জলং ন অদেয়ং। অর্থাৎ, নদ-নদীর যে জল,—যে জল এখানে 'নাদেয়' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অদেয় নহে।"

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-রূপ কাব্যের কথায়, শরৎ-কাল ও বসন্তকাল সম্পর্কে অবশ্যই অনেক কথা উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা উঠিল না। উঠিল ধর্ম্মশাস্ত্রের এক গুরুতর প্রশ্ন। গঙ্গা কি নদী? ত্রিলোক-পাবনী ও ত্রিতাপ-হারিণী গঙ্গার জল কি নদীর জল? যদি গঙ্গার জল নদীর জল না হয়, তাহা হইলে ঐ 'নাদেয়' শব্দ গঙ্গাজলে খাটে কৈ? যখন আয়ুর্ব্বেদীয় কবিতার সহিত স্মৃতিশাস্ত্রীয় কবিতার আকস্মিক সংঘর্ষে,—গঙ্গা ন তোয়ং —ইত্যাদি পুরাতন কথার নূতন আলোচনায়, একটা তুফান বহিল, তখন উদ্বেল মসূর-সূপের উপর তৈলক্ষেপের ন্যায়, আর এক দিক্ হইতে একটা অচিন্তিত শক্তির সঞ্চার-হেতু, সে তুফান একবারে থামিয়া গেল।

ওখানে বাড়ীর বৃদ্ধ দেওয়ান্‌জি অদূরে উপবিষ্ট ছিলেন। দেওয়ান্‌জির অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নবাব সরকারে উকিল ছিলেন।

দেওয়ান্‌জি সেই কারণে অদ্যাপি উকিল মহাশয় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। দেওয়ান্‌জি তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় বিচক্ষণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার একটি বোস্তা সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। সেই বোস্তার মধ্যে এক খানা বিদ্যাসুন্দর, এক খানা গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী, এক খানা দণ্ডবিধির আইন, এবং এক খানা দাশুরায়ের পাঁচালী থাকিত। তিনি যখন, অবকাশ পাইতেন, তখনই চোখে চসমা দিয়া, ঐ বোস্তার কোন এক খানি পুস্তক খুলিয়া পাঠ করিতেন। দেশের লোকে দেখিয়া শুনিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা বিজ্ঞলোক মনে করিত। আর, তিনি সকলের সকল কথায়ই নিজে অতি সরল প্রাণে দুটি কথা কহিতে ভালবাসিতেন বলিয়া, লোকে উপযাচক হইয়াও তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিত। আজি কেহ উপযাচক হইল না! তথাপি দেওয়ান্‌জি আপনা হইতে বলিলেন,—

"কবিরাজ মহাশয়েরা, একটি কথা শুনুন। আপনারা বিজ্ঞলোক। আপনারা রোগীর পথ্য ও পানের এ সকল সামান্য কথা লইয়া এত পুরাতন কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন কেন? এ বিষয়ে দাশুরায়ের পাঁচালীতেই ত চূড়ান্ত মীমাংসা আছে।"

দাশুরায়ের পাঁচালী হইতে সে মীমাংসার পক্ষে কি কবিতা পঠিত হইয়াছিল, তাহা আমার মনে নাই। প্রকৃত কিছু পঠিত হইয়াছিল কি না, তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারিব না। কেন না অনেক দিনের কথা। তবে, ইহা আমার বিশেষরূপে স্মরণ আছে যে, কাব্যশাস্ত্র-পারাবারীণ পণ্ডিতম্মন্য কবিরাজ মহাশয়েরা, তাঁহাদিগের ব্যাকরণ-বাদার্থ-বিক্রয়িণী শাস্ত্রকথা ও ছন্দোময়ী সংস্কৃত কবিতার উপর, শেষ কালে দাশুরায়ের দোহাই শুনিয়া, যেন কেমন এক প্রকার লজ্জায় একবারে থতমত হইয়া গেলেন। তাঁহারা উকিল মহাশয়কে জানিতেন না। অথচ উকিল মহাশয়ের মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহাকে নিতান্ত অমায়িক লোক মনে করিয়াছিলেন। উকিল মহাশয়ের সে শ্লেষশূন্য সরল উপদেশের অমায়িকতাই, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে, তাৎকালিক বাক্যালাপের উপর কেমন একটা ঘৃণা অথবা লজ্জা জন্মাইল। তাঁহারা প্রত্যেকে আপনাকে আপনি কাব্য-সাহিত্যের এক একটি চলন্ত সমুদ্র বলিয়া জানিতেন। কোথায় সে সমুদ্র-সমূহের সহসোত্থিত উত্তাল তরঙ্গমালা; আর কোথায় তাহারই সঙ্গে, নিরক্ষর মূর্খের মুখে, নিরক্ষর দাশরথির ছড়া পাঁচালী! উদাত্ত আর উপহসিতব্য (The Sublime & the Ridiculous) যেন অকস্মাৎ একে অন্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। যদি জ্ঞানাভিমানীর মনে ইহাতেও ঘৃণা কিংবা লজ্জা না হয়, তাহা হইলে আর কিসে হইবে? কিন্তু, আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় সে ঘৃণা ও আত্মগ্লানি সহসা একটা অসম্ভাবিত ও আমোদময় হাসির হিল্লোলে ভাসিয়া গেল। ঐ বৈঠকের এক পার্শ্বে বাড়ীর বৃদ্ধ কর্ত্তার একটি পঞ্চম বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী পৌত্রী

ম্রিয়মানা ছিল। সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ঢোঁক গিলিতেছিল। তাহার ধারণা ছিল যে, এখানে এক জনে 'প্রস্তাব' কহিতেছেন, এবং সকলে তাহাই শুনিতেছেন, আর তাহারই উপর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রশ্ন করিতেছেন। যখন উকিল মহাশয়ের কথায় কবীন্দ্রবর্গ কতকটা অপ্রস্তুতের মত হইলেন, তখন বালিকা ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—উকিল দাদা তার পর?

বালিকার প্রশ্নে সকলেই হাসিয়া অধীর হইলেন। কিন্তু আমার মনটা, কেন জানি, ধীরে ধীরে, একটা বিষাদময় গাম্ভীর্য্যের ভাবে যাইয়া ডুবিল। সেই মধুর-কণ্ঠ-সমুচ্চারিত "তার পর" আমার প্রাণের মধ্যে, একই সময়ে, বাঙ্গালির জাতীয়-প্রকৃতি ও কাব্য-ইতিহাসের গতি বিষয়ে, পাঁচ শত প্রশ্ন তুলিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, হায়! কবিতা আর কথা এখানে আসিয়া গঙ্গা ও যমুনার মত এক স্থানে মিশিয়াছে। এই বালিকার প্রাণের মত একটা তরল প্রাণই, সম্প্রসারিত অথবা শত-সহস্র-প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া, বঙ্গে একটা তরল-বিহ্বল জাতীয়-প্রাণ অথবা জাতীয় হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছে। এ জাতি আগে পাগল হইয়াছিল কবিতা লইয়া, এখন পাগল হইয়াছে কথা লইয়া। আগে চাখিয়াছিল রস, এখন চাখিতেছে কষ। ইহার শিরায় ও পেশীতে এবং অস্থিমজ্জায় শক্তি-সঞ্চার হইবে কিসে?

তবে কি আমি এখানে, আজি রস-প্রসবিনী কবিতা অথবা রমণীয় চিত্র-প্রদর্শিনী কথার নিন্দা করিয়া, পাতকগ্রস্ত হইতেছি? তাহা নহে—তাহা নহে;—এক শত বার বলিব,—তাহা নহে। যাঁহারা কবিতায়, স্বাদু শীতল সুনির্ম্মল রসের সৃষ্টি করিয়া, অথবা সুমার্জ্জিত কথার সুতায় মহত্ত্ব, মাধুর্য্য এবং পরার্থা প্রীতি ও পবিত্রতার মালা গাঁথিয়া, মনুষ্যজাতির মনোমোহনের সঙ্গে মঙ্গল-সাধন করিতেছেন, এমন মনুষ্য কে আছে যে, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে? আমি এখানে যাঁহাদিগের কথা কহিতেছি, তাঁহারা অবশ্যই সুক্ষম ও সুরসিক। কিন্তু, বোধ হয়, একটুকু উদ্দেশ্যভ্রষ্ট। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় যাহাই হউক, অনুষ্ঠান ঐ—তার পর। সুপেয় সরবত সময়-বিশেষে একান্ত সুখ-প্রীতিকর হইলেও উহা মনুষ্যের সামর্থ্য-বর্দ্ধক ও জীবন-রক্ষক ভোজ্য নহে। একটা জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে হইলে, শুধু সরবতের পেয়ালায় কাজ চলিবে না। স্বাস্থ্যের অনুকূল এবং শক্তি-সম্পদের উপযোগি সুখাদ্য অন্নব্যঞ্জনেরও আবশ্যকতা আছে।——

শ্রীমৎ কল্যাণ-ভট্ট-শর্ম্মণঃ।

ছায়া-দর্শন।

তৃতীয় অধ্যায়।

উপক্রম।

"রূপে ও সৌরভে যেন বনের যূথিকা।"

ফুলের মধ্যে বন্য যূঁই; আর ফুল্লপ্রায়া যুবতীর মধ্যে, সমাজের বহিশ্চারিণী, সুখ-সম্পদ-শূন্যা বন-বাসিনী সুন্দরী।

অতি ক্ষুদ্র যূঁই ফুল, আপনার ক্ষুদ্র তনুতে, রূপ ও সৌরভের সলজ্জ মাধুরীটুকু লইয়া, জন-শূন্য অরণ্যে, অথবা গ্রাম ও নগরের উপকণ্ঠে, অযত্ন-সম্ভূত উদ্যানে, যেন লোক-লোচনের অগোচরে, আপনাতে আপনি প্রস্ফুটিত হয়;—ফুটিয়া,—উহার সেই যূথিকা-যোগ্য জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া,—যূথিকার রূপ ও সৌরভের সহিত অনন্ত-রাগ-মিশ্রিত জগদ্‌-গাথার সমতান-লয়-সম্পর্ক-বদ্ধ সরস-মধুর সঙ্গীতটি গাইয়া, কালের পূর্ণতায়, আপনা হইতে আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়ে। ইহাই যূঁই ফুলটির স্বাভাবিক পরিণতি। সূর্য্য-কিরণ-চুম্বিত, সূর্য্য-কিরণ-সমুন্মীলিত, প্রভাত-শিশির-সিক্ত প্রফুল্ল শতদল, অথবা সায়ন্তনী শোভার রাজরাণী, শত চক্ষুর সুখ-বিলাসিনী সিরাজী গোলাপের কাছে যূঁই ফুলটিরে ফুল বলিয়াও বোধ না হইতে পারে। কিন্তু ঐ শতদল ও সিরাজী গোলাপও যেমন ফুল, যূঁইটিও তেমনই ফুল;—ফুলের রাজ্যে সমান,—ফুলের বিকাশ ও বিলাস, এবং বিলুপ্তি ও শেষ পরিণতি বিষয়ে একই নিয়তির অধীন।

উদ্ভিদ-জগতে যেমন যূঁই ফুলটি,—প্রাণ-জগতে,—অসংখ্য-প্রাণ-সূত্রিত সোপান-পরম্পরার বহু উর্দ্ধে,—গ্রাম ও জন-পদের অদূর-বর্ত্তী বন্যভূমিতে, অতি দুঃখী কাঙ্গালের ঘরে, সেইরূপ অর্দ্ধস্ফুট সুন্দরী যুবতী। কেহ দেখে না, কেহ জানে না, কেহ ভুলিয়াও কোন সংবাদ লয় না। কিন্তু সে আরণ্য-অ... সাচ্ছাদিতা ঈষন্মুকুলিতা যুবতী, রূপে ও সৌরভে, আপনাতে আপনি প্রস্ফুটিত হয়;—ফুটিয়া—উহার সেই দীন-জন-যোগ্য দীন-ভোগ্য জীবন উদ্‌যাপন করিয়া, জগন্ময় মহা-সঙ্গীতের সহিত আপনার জীবন-সঙ্গীত, মিলিত-স্বরে অথচ অজ্ঞাতসারে গাইয়া, কালের পূর্ণতায় ঢলিয়া পড়ে। ইহাই দুঃখিনী যুবতীর দুঃখ-পূত মুগ্ধ-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও শত-হৃদয়ের প্রীতিস্নেহ ও প্রণয়ানুরাগে সংবর্দ্ধিত, স্বর্ণাভরণ-মণ্ডিত প্রাসাদ-সুন্দরীদিগের কাছে,—ঐ নিরক্ষরা, নিরাভরণা, অনাঘ্রাত-সভ্যজীবন

ঐ সুন্দরীকে রমণী বলিয়াও বোধ না হইতে পারে। কিন্তু রোমের লুক্রিসিয়া, * ও ফ্রান্সের লা ভালিয়ার † যেমন রমণী, ঐ ছিন্নাম্বরা কাঙ্গালিনীও তেমনই রমণী,—রমণীর রূপরাজ্যে সমান,—রমণীর বিকাশ ও বিলাস, এবং ক্ষণিক বিলুপ্তি ও চরম-পরিণতি বিষয়ে একই নিয়তির অধীন।

ঐ যূঁইটি যদি, অকালে বৃন্তছিন্ন হইয়া, ব্যাধ কিংবা বন্য জন্তুর পাদ-পেষণে নিষ্পেষিত হয়, তাহা হইলে, উহার জীবনের গতি জগন্ময়ী প্রকৃতির ধীর-পদ-বিক্ষেপ-সূচিত মঙ্গল্য গতির সহিত মিলিল না। জগতে একটি অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। আর ঐ বন্য যুবতীও যদি, বনেচর ব্যাঘ্র-ভল্লুকের মত নিষ্ঠুর পুরুষের পাশব লালসায় নিপীড়িত হইয়া, অকালে কালের স্রোতে ঢলিয়া পড়ে, তাহা হইলে, উহার জীবনের গতিও সর্ব্বমঙ্গলা জগন্ময়ীর নিত্য-নিয়মিত গতির সহিত মিলিল না। এবার, শুধু অবিহিত অনুষ্ঠান নহে,—জগতে একটা মহা পাতকের অনুষ্ঠান হইল; এবং সে মহা-পাতক, মহা-প্রতিশোধ-জনক প্রতিবিধানের জন্য, প্রকৃতির দ্বারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল।

যূঁই ফুলটি আকৃতিতে যত কেন ক্ষুদ্র হউক না, এই অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতির সহিত উহার অতি ঘনিষ্ঠ ও গূঢ় সম্বন্ধ আছে। যূঁই, উহার ঐ বৃন্তচ্যুত অথবা বৃন্তছিন্ন অবস্থায়, রৌদ্রে শুকাইয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, বায়ুর মৃদুল-দোলনে দোলায়িত হইয়া, আপনার উপাদান পরমাণুগুলিরে পুনরায় প্রকৃতির ভাণ্ডারে বুঝাইয়া দিবে;—এবং যিনি প্রকৃতির প্রাণ-দেবতা, তাঁহার প্রেমময় মঙ্গল-নিয়মের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে, জগতে আর কোন স্থানে, আর কোন মূর্ত্তিতে বিকশিত হইয়া, নূতন জীবনের নূতন ব্রত আরম্ভ করিবে। এ কথা এখন আর কবি-কল্পনা নহে। ইহাই অধুনাতন বৈজ্ঞানিক-জ্ঞানের শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত।

যূথিকানুরূপিণী দুঃখিনী যুবতীও, বাহু-বল-দৃপ্ত ও বহিঃ-সম্পদ-মত্ত মনুষ্য-সমাজে যত কেন উপেক্ষার বস্তু হউক না, উহার সহিত প্রকৃতির অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং অধিকতর গূঢ়-গভীর স্নেহ-সম্বন্ধ। কেন না, উহা অনন্ত ধামের অধিকারী, চৈতন্যময় জীব। সুতরাং উহাও সেই প্রেমময়ের বিধান-লীলায় উৎকৃষ্টতর গতি প্রাপ্ত হইয়া, আর এক স্থানে, আর একভাবে বিকশিত হইবে,—এবং উহার সেই অভিনব জীবন, উহাকে অধিকতর শক্তি ও সম্পদ দান করিয়া, তাঁহার সান্নিধ্যের দিকে, আর একটি সোপান উর্দ্ধে লইয়া যাইবে।

আজি আমরা পাঠকবর্গকে একটি মর্ম্ম-দলিত মানব-যূথিকার দুঃখের কাহিনী উপহার দি-

---

* লুক্রিসিয়া রোমীয় ইতিহাসের সতী লক্ষ্মী সম্ভ্রান্ত ললনা। শেক্ষপীরের লেখনীও তাঁহাকে সম্মান করিয়াছে।

† লা ভালিয়ার চতুর্দ্দশ লুইর প্রথম নায়িকা,—দেব-স্বভাবা রমণী, দেব-কন্যার ন্যায় রূপ-মোহিনী।

লাম। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্বদর্শিনী ও বিশ্ব-রক্ষিণী স্নেহ-দৃষ্টি আলোকে ও অন্ধকারে,—নগরে ও কান্তারে, এবং প্রাসাদে ও পর্ণকুটীরে, সর্ব্বত্র সমান। যে যেখানে, জীবের সুখ-শান্তি ও উন্নতি-কামনায়, যাহা কিছু ভাল করিতেছে, তাহা প্রকৃতির প্রেম-সূত্রে গ্রথিত হইয়া পুরস্কারের প্রীতিপ্রদ কুসুম-মালায় পরিণত হইতেছে। সে মালা এক দিন তাহার কণ্ঠে শোভা পাইবে। তাহার তাপিত প্রাণ মালার প্রাণ-শীতল পীযূষ-স্পর্শে কৃতার্থ হইবে। আর, যে যেখানে, জীবের অসুখ অশান্তি ও অবনতির দিকে, যাহা কিছু মন্দ করিতেছে, তাহাও প্রকৃতির স্মৃতিসূত্রে গ্রথিত হইয়া, পরিশোধ ও পরিশোধনের বজ্র ও বহ্নিরূপে পরিণত হইতেছে। সে বজ্র এক দিন তাহার বুকে পড়িবে;—সে বহ্নি, স্বর্ণশোধক পার্থিব বহ্নির ন্যায়, এক সময়ে তাহাকে পোড়াইয়া পোড়াইয়া, দেবতার ন্যায় পবিত্র করিয়া লইবে।

আত্মিক কাহিনী।

জামেকা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। জামেকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপমালার কণ্ঠবিচ্যুত ও দূর-বিক্ষিপ্ত মধ্যমণির ন্যায়, কারিব সাগরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব্বে স্পেনের অধিকারে ছিল। শেষে, রত্নাকর-তরঙ্গ-বিলাসী রত্ন-ভোগী বৃটিশরাজ ইহাকে আপনার অঙ্গাভরণ করিয়া লইয়াছেন। কিউবা-দ্বীপের নাম সকলেই শুনিয়াছেন। কিউবা উপলক্ষে, সে দিন আমেরিক-যুক্ত-রাজ্যের সহিত স্পেনের যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহাও, বোধ হয়, বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া যায় নাই। এই কিউবা ও হেইতি প্রভৃতি দ্বীপ, উত্তর দিকে, জামেকাকে অতলান্ত বা আটলান্টিক মহা-সাগরের উত্তাল তরঙ্গরাজি হইতে রক্ষা করিতেছে। পূর্ব্ব দিকে, মেক্‌সিকো সাগরের ঊর্ম্মিমালা, প্রণালী-পথে উঁকি দিয়া, প্রতিনিয়ত জামেকার সংবাদ লইতেছে। পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের অনন্ত বিস্তার ধূ ধূ দূরে যাইয়া, চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রখচিত প্রকৃতির নীলাম্বরকে সসম্ভ্রমে চুম্বন করিতেছে। দক্ষিণে কারিব-সাগরের পর পারে পানামা-যোজক। পানামার ক্ষীণ-তনু, দুই পার্শ্বে, দুই অতল সমুদ্রের উন্মত্ত আস্ফালন নিত্য সহিয়া লইয়া, আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ, অর্থাৎ সাম্য ও স্বাধীনতা এবং দাসত্ব ও প্রভুত্বের দুই বিরাট্ রঙ্গ-ভূমিকে, শত প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, যেন কোন মন্ত্র বলে, একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। জামেকা, দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, যেন সেই তত্ত্বেরই রহস্যচিন্তা করিতেছে।

ইংলণ্ডের দুই তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাউন্টি বা শায়র একত্র করিলে যত টুকু হয়, জামেকা, আয়তনে, তাহা অপেক্ষা বড় নহে। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে; প্রস্থ উত্তর-দক্ষিণে। ইহার, প্রায় ঠিক মধ্য দিয়া, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘ পর্ব্বতশ্রেণী। এই বিস্তৃত পর্ব্বত-মালার নাম 'ব্লুমাউন্‌টেন্' বা নীলগিরি। নীলগিরির শ্যামশিখর স্থানে স্থানে অভ্রভেদী ও তুষারমণ্ডিত। জামেকা, পর্ব্ব-

র এই পাষাণময় কটিবন্ধ কমরে বেষ্টিয়া, রঙ্গায়িত সাগর-বক্ষে প্রফুল্লমুখে বিরাজ-ন। ইহার এক দিকে কুসুম-গুচ্ছ-সজ্জিত তাকুঞ্জ, আর এক দিকে, ফলভরাবনত রুরাজি; এক দিকে বিবিধ বিহঙ্গের কল-জন, আর এক দিকে পর্ব্বতবাহিনী শত োতস্বিনীর উচ্ছ্বসিত আনন্দধারা। জামে-কে দ্বীপ বলিলেও হয়; প্রকৃতির সাগর-বিলাসিনী বিহার-ভূমি বলিলেও চলে।

নীলগিরির উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় দিক্ য়া, প্রায় একশত কুড়িটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বাহিত। কিন্তু এই সকল নদী এমন অল্প-রিসরা ও বেগবতী যে,একমাত্র ব্লাক রিভার কৃষ্ণা নদী ভিন্ন অন্য কোনটিতেই নৌকা চলিতে পারে না।

জামেকার জল-বায়ু বড়ই সুখ-স্ফূর্ত্তি-জনক ও স্বাস্থ্যকর। এ দেশের পক্ষে যেমন দ্বার-জিলিং, যুক্তরাজ্যের পক্ষে তেমন জামেকা। যুক্তরাজ্যে কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে, সে জামেকায় যাইয়া, জামেকার স্বাস্থ্যপ্রদ সাগর-সমীরে অচিরেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে। জামেকায় উত্তাপ দিবাভাগে অতি বেশী হইলে, ৯০ ডিগ্রিতে উত্থিত হয়,এবং রাত্রিতে ৭০ ডিগ্রিতে নামিয়া পড়ে। জামেকায় বর্ষা এক বৎসরে দুইবার;—একবার বসন্তে, আর একবার গ্রীষ্মে। জামেকার নৈসর্গিক উপদ্রব প্রধানতঃ দুই;—এক ভূমিকম্প, আর বিদ্যুজ্জ্বলসিত, বজ্রবিঘোষিত ভয়ঙ্কর তূর্ণড (Tornado)। ভূমিকম্প অবশ্যই নিত্য-কার ঘটনা নহে। কিন্তু তূর্ণড, বসন্তে কি গ্রীষ্মে, কখন, কি ভাবে, কোথায় কি সূত্রে, প্রলয় নিনাদে গর্জ্জিয়া আসিবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। জামেকার রাজধানী কিংষ্টন। ফেলমাউথ প্রভৃতি উহার নগর।

জামেকার প্রধান অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগার। কিন্তু ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদিগের সংস্রবে এখানে আরও দুটি নূতন জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। একটির নাম 'মুলাটো'। আর একটির নাম 'কোয়াদ্রুণ'। শ্বেতাঙ্গ পিতা, নিগারী মাতা, অথবা শ্বেতাঙ্গী মাতা, নিগার পিতার সংযোগে উৎপন্ন সন্তানের নাম 'মুলাটো।' শ্বেতাঙ্গ পিতা, মুলাটো মাতা, অথবা মুলাটো পিতা, শ্বেতাঙ্গী মাতার সন্তান 'কোয়াদ্রুণ।' কোয়াদ্রুণেরা শারীর-সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

জামেকার এক পাদপ-বহুল পল্লীগ্রামে ডন্‌কানের বাস-গৃহ। ডন্‌কান কোয়াদ্রুণ যুবতী। ডন্‌কান বড় সুন্দরী। তাহার পিতা মাতা জীবিত ছিল কি না;—এবং সে পিতা মাতার অভাবে, কোন পিতৃতুল্য আত্মীয়ের আশ্রয়ে, কি ভাবে জীবন-যাপন করিত, তৎসম্পর্কে কোনরূপ লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় না। এ সংসারে, লোকে সুখ-সমৃদ্ধিশালিনী পণ্যবিলাসিনীরও ইতিহাস লিখিতে পারিয়াছে,—কিন্তু কোন দিনও পর্ণ-গৃহ-নিবাসিনী পূত-স্বভাবা কাঙ্গালিনীর জীবন-কাহিনী লিখিতে ভাল বাসে নাই। তবে, এই পর্য্যন্ত জানা যায়, ডন্‌কানের বিবাহ হইয়াছিল না। যৌবনের প্রথম স্ফুরণে তাহার রূপরাশি তাহাকে একটি প্রস্ফুট কুসুমের কান্তি প্রদান

করিয়া থাকিলেও, তাহার চিত্তে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছিল না। সে আপনাকে বালিকা বলিয়া জানিত, বালিকার শুদ্ধ ও সরল প্রাণে সকলকেই সমান ভালবাসিত—এবং বালিকার অমায়িক স্বাধীনতায় এখানে সেখানে বেড়িয়া বেড়াইত।

এক দিন প্রতিবেশীরা দেখিতে পাইল, ডন্‌কান তাহার গৃহে নাই। শূন্য কুটীর সে সুন্দরী কাঙ্গালিনীর অভাবে অন্ধকার। সে বন্য যূথিকার প্রফুল্ল জ্যোতিতে আর সে স্থান আলোকিত নহে। যাহারা ঐ রূপসী বালিকারে প্রাণের অকৃত্রিম অনুরাগে স্নেহ করিত, সম্ভবতঃ তাহাদেরই কেহ, সর্ব্বাগ্রে, ডন্‌কান কোথায় গেল, একবার খুঁজিয়া দেখা আবশ্যক মনে করিল। কিছু কাল পরে, পুলিশে খবর পহুঁছিল যে, বড় রাস্তার অদূরে একটা নির্জ্জন স্থানে ডন্‌কানের মৃতদেহ বিদলিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পুলিশ অমনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। শব যথা স্থানে আনীত ও পরীক্ষিত হইল।

কলিকাতায় করোনারের আফিস আছে। কোন হত্যা ব্যাপার সংঘটিত হইলে, করোনার, ডাক্তার ও জুরি সহযোগে, শব-পরীক্ষা দ্বারা, হত্যার প্রকার ও প্রণালী অবধারণ করেন। জামেকাতেও এইরূপ করোনারের বিচার-প্রথা প্রচলিত আছে। ডন্‌কানের শব পরীক্ষা করিয়া, করোনার ও ডাক্তার সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোন বলবান্ ব্যক্তি বল-প্রয়োগে বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এবং সেই পাশব অত্যাচারের অসহ্য ক্লেশে উহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কোন্ নিষ্ঠুর নর-পিশাচ, জামেকার ঐ বনশোভিনী যূথিকা-টিরে এমন করিয়া পাদ-দলিত করিল? কে সে দুর্ব্বৃত্ত? কোথায় সেই রাক্ষসের অবস্থান? ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তর্জ্জিয়া উঠিয়া পুলিশ, এই অনুসন্ধানে সমগ্র জামেকাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। কিন্তু কোন দিক্ দিয়া হত্যার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল, আসামী ধরা পড়িল না। গবর্ণমেণ্ট বৃহৎ পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। তথাপি কিছুই হইল না।

ইতি মধ্যে, পেণ্ড্রিল ও চিতি নামে দুই বলিষ্ঠ নিগার যুবক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে, কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইল। এক জনের দণ্ড হইল এক স্থানে, অন্য জনের দণ্ড হইল আর এক স্থানে। এক জনের এক অপরাধে। অন্য জনের আর এক অপরাধে। এক জন প্রেরিত হইল কিংষ্টনের সংশোধিনী কারায়। আর একজন প্রেরিত হইল, দ্বীপের উত্তরাংশে, ফেলমাউথের জেলে। এই দুই স্থানের দূরত্ব আশী মাইল। চিতিও জানে না পেণ্ড্রিল দণ্ডিত হইয়াছে;—পেণ্ড্রিলও জানে না চিতি জেলে গিয়াছে।

দণ্ড দীর্ঘব্যাপী নহে। এক দিন, দুই দিন করিয়া, দিন যাইতেছে, আর তাহাদিগের দণ্ডের ভার লঘু হইয়া আসিতেছে। এই ভাবে আর কএকটি দিন কাটিয়া গেলেই তাহারা কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া নিজ নিজ বাসস্থানে যাইতে পারে। তাহারা যখন আশায় এইরূপ উল্লসিত, তখন এক দিন

রাত্রি কালে, এক জন কিংষ্টনের সংশোধিনী কারায়, অন্যজন ফেলমাউথের কারাগারে,—পরস্পর আশী মাইল দূরে—এক সঙ্গে, প্রায় একই সময়ে, নিদ্রিত অবস্থায়, চীৎকার করিয়া উঠিল। পেণ্ড্রিলের চীৎকারে যে কথা, চিতির চীৎকারেও প্রায় সেই কথা। দুজনে, দুই স্থানে, যেন কার কিরূপ ছায়া-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, কাহাকে যেন প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিয়া, একই ভাবে কাকুতি মিনতির সহিত কহিতে লাগিল,—"তুমি,—তুমি,—ডন্‌কান্ তুমি! পায়ে ধরি—পায়ে ধরি,—এখনই এখান হইতে সরিয়া যাও। ডন্‌কান আমি তোমার কাছে অপরাধী। তুমি দেবতা হইয়াছ,—ক্ষমা কর,—পায়ে ধরি—ক্ষমা কর। ওকি—ওকি,—ঐ আগুনের হাত,—ঐ আগুনের হাতে আমাকে ধরিও না।"

এক দিন নহে, দুদিন নহে,—কিছু কাল ব্যাপিয়া ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে, প্রায় একই সময়ে, একই ভাবে, প্রায় একই রকমের উক্তিতে, দুই স্থানের দুই কারাগারে, পেণ্ড্রিল ও চিতি নামক দুটি বন্দী নিদ্রিত অবস্থায় ডন্‌কানকে সম্ভাষণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগের ঐরূপ ছায়া-দর্শন ও আর্ত্তনাদের কথা ক্রমে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। প্রথমে কারারক্ষীরাই ইহা শুনিতে পাইল। কথা ক্রমে ঊর্দ্ধতর কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণে পহুঁছিল। কর্ত্তৃপক্ষ উভয় স্থানের রিপোর্ট মিলাইয়া যার-পর-নাই বিস্মিত ও একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তবে কি ডন্‌কানের হত্যার সহিত এই ঘটনার কোন সম্পর্ক আছে? সকলের মনেই এই সন্দেহ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। পেণ্ড্রিল ও চিতিকে লইয়া ডন্‌কানের হত্যা বিষয়ে পুনরায় বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

এক দিকে প্রতিরাত্রিতে নিদ্রাবেশে উৎকট বিভীষিকা দর্শন, অন্য দিকে পুলিশ ও কর্ত্তৃপক্ষের প্রশ্নপীড়ন। পেণ্ড্রিল ও চিতি উভয়েই অবশেষে অপরাধ স্বীকার করিল। তাহারা, কোথায়, কি ভাবে, কিরূপ দুঃসহ পাশবিক অত্যাচারে, বালিকা ডন্‌কানের ধর্ম্মনাশ ও সেই সূত্রে প্রাণ-নাশ করিয়াছে, সমস্ত বিবরণ খুলিয়া কহিল। অবশেষে বিচারে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হইয়া কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

এই অভিনব, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কাহিনীটির প্রামাণিকতার জন্য "এনাটমী অব্ স্লিপ" (Anatomy of Sleep) অর্থাৎ নিদ্রার বিশ্লেষ-তত্ত্ব নামক গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডোয়ার্ড বিন্‌স্ এম্ ডি মানব-জগতের নিকট দায়ী। ডক্টার বিন্‌সের জামেকাতে অবস্থান সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। স্থানীয় গভর্ণর স্যার চার্লস মেটকাফ তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। তিনি সেই গভর্ণরের সাহায্যে স্বয়ং ইহার আমূল অনুসন্ধান করিয়া এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এবং রবার্ট ডেল ওয়েন প্রভৃতি বহুমানাস্পদ পণ্ডিতেরা তাঁহারই সাক্ষ্য ও সম্মানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার সবিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন।

এইক্ষণ প্রশ্ন এই যে, এই ঘটনার অর্থ

কি ?—ইহা কি কল্পনা-সম্ভূত অলীক স্বপ্ন মাত্র ?—না, ছায়া-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত পর-লোক-গত আত্মার পার্থিব ক্রিয়া ? স্বপ্ন হইলে, পরস্পর আশী মাইল দূরে,দুই ব্যক্তির অন্তরে, একই সময়ে, একই ভাবে, একই স্বপ্নের এই প্রকার প্রাত্যহিক আবেশ কিরূপে সম্ভবপর হয় ? কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, ইহা অপরাধ-ক্লিষ্ট বিবেকের আত্মপীড়ন। বিবেকের বিষ-দংশন কোন অংশেও অস্বা-ভাবিক নহে। কিন্তু দুই অপরাধী, দুই স্থানে থাকিয়া, একই প্রকার মূর্ত্তি-দর্শনে ভয় পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিবে কেন ? আর তাহারা, ডন্‌কানের মূর্ত্তি-দর্শন-সম্পর্কে মিথ্যা কথা কহিয়া, আপনাদিগের মাথার উপর রাজ-দণ্ডের অমন কঠোর বজ্রই বা ডাকিয়া আনিবে কোন্ স্বার্থে ? প্রকৃত-কথা-অন্যরূপ। পৃথিবীর প্রমোদ-লীলা-মুগ্ধ, জড়-পিঞ্জর-রুদ্ধ অভিমানী মনুষ্য সেইটিই বুঝিতে চাহে না,—বুঝিলেও সহজে বিশ্বাস করিতে ভালবাসে না। কিন্তু যিনি একটু ভাবিয়া দেখিবেন, তাঁহারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, হতভাগ্য ওয়াকারের অধিকতর হতভাগিনী গৃহ-সঙ্গিনী গ্রেহামকে দেখা দিয়াছিল যে উদ্দেশ্যে,—দুঃখিনী ডন্‌কান তাহার দুঃখ-দুর্গতির কারণস্বরূপ কারাবাসী যুবকদ্বয়কেও দেখা দিয়াছে সেই উদ্দেশ্যে। উভয়েরই প্রাণের মধ্যে প্রতিহিংসার ভয়ঙ্কর বহ্নি-শিখা। ইহা আত্মার আশানুরূপ উন্নতির বিঘ্নবিশেষ। বন-যূথিকা ডন্‌কান এই বিদ্ব-জ্বালা হইতে মুক্তি পাইলেই, দেব-ভোগ্য নন্দন-বনে,পুনরায় দেব-যূথিকার ন্যায় ফুটিতে পাইবে। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাহারা এখানে এড়াইলেও, সেখানে যাইয়া, অনু-তাপের আগুনে শোধিত হইবে। এই পরি-শোধ ও পরিশোধন-ব্যবস্থার অন্যথা নাই।

আর্য্য-হিন্দুসমাজের সূচনা।

মনু ও জলপ্লাবন।

মনু ও তাঁহার সমসাময়িক প্রলয়ঙ্কর জল-প্লাবন সম্বন্ধে, এই প্রবন্ধের প্রথম পর্য্যায়ে, শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে অল্প বিস্তর আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে সেই বৈদিক উপা-খ্যানের বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক।

১। মনু ভারতেরই কোন স্থানে পূর্ব্বে বাস করিতেন। কারণ, ভারতবর্ষ তিন দিকে সাগরদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সেই সাগরেরই জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া ভারতকে গ্রাস করে। মনু তাহা হইতে আত্মরক্ষা করি-বার নিমিত্ত নৌকারোহণে উত্তরগিরি অর্থাৎ হিমালয়ের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। *

* ইনি বৈবস্বত মনু। শতপথ ব্রাহ্মণে ইনি রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ;—"মনু-

২। মনুর পূর্ব্বে ভারতে লোক ছিল। তাহারা ছিল, একমাত্র মনু ভিন্ন, তাহারা সকলেই জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিল। সু-তরাং, প্লাবনের পর একমাত্র মনুই অবশিষ্ট ছিলেন। *

৩। মনুর নৌকা হিমাচলেরই একটি শৃঙ্গে সংলগ্ন হয়। মনু সেই পর্ব্বতপ্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্থানেই জলমধ্য হইতে উত্থিতা কন্যা ইলার সহযোগে তপস্যাদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন।

মনুর সৃষ্ট সেই প্রজাবর্গ যে আর্য্য-হিন্দুগণের আদি পুরুষ, তাহা শতপথ ব্রাহ্মণের এই উপাখ্যানে স্পষ্টরূপে বর্ণিত না থাকিলেও, অন্যত্র তাহার উল্লেখ দেখা যায়। উক্ত ব্রাহ্মণগ্রন্থের স্থানে স্থানে মনুর যজ্ঞানুষ্ঠান ও অগ্ন্যাধান প্রভৃতির বহুল উল্লেখ দেখা যায়;—তাঁহার যজ্ঞে কিলাত ও আকুলি নামক দুই জন অসুর যাজকের পাপ-প্রবৃত্তি ও পরাভব এবং তাঁহার নিজের শ্রীবৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু তাঁহার পুত্রগণের সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণই দেখা যায় না। শতপথ ছাড়িয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা পাঠ করিলে, মনুর এবং তাঁহার কোন কোন পুত্রের একটু বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দুই গ্রন্থে মনুপুত্রগণের মধ্যে দায়বিভাগের অল্প বিস্তর বিবরণ আছে। তাহাতে দেখা যায়,মনুর অন্য-তম পুত্র নাভানেদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাতে তদীয় ভ্রাতৃ-গণ তাঁহাকে পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিতেছিল। এই নাভানেদিষ্ট † মহা-ভারতের আদিপর্ব্বে নাভাগারিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তথায় লিখিত আছে, মনু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের আদিপুরুষ। তাঁহার দশ পুত্র ;—বেণ, ধৃষ্ণু, নরিষ্যন্ত, নাভাগ,

বিশেষ বৈচিত্র্য।

বৈবস্বতো রাজা ইত্যাহ। তস্য মনুষ্যা বিশাঃ।" মহাভারত, মৎস্যপুরাণ,অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতেও ইনি বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হইয়াছেন। বামনপুরাণে মনুকেই ভরত এবং তাঁহার রাজ্যকেই ভারতবর্ষ বলা হইয়াছে।

"ভরণাত্তু প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।"
নিরুক্ত বচনাচ্চৈব বর্ষং তৎ ভারতস্মৃতম্।

* ভারতের কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে মনু রাজত্ব করিতেন, শতপথ ব্রাহ্মণে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মহাভারতে আছে—

"চৌরিণী তীরমাগম্য মৎস্যো বচনমব্রবীৎ

মৎস্যপুরাণে মলয় পর্ব্বতের একস্থানে, অগ্নিপুরাণ ও ভাগবতে কৃতমালা নদী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে মহাভারতে ও পুরাণ সমূহে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। মহাভারতে আছে, তিনি সপ্তর্ষি সমভিব্যাহারে সকল শস্যাদির বীজ লইয়া নৌকারোহণ করিয়া-ছিলেন।

† এই নাভানেদিষ্ট একটি প্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। ঋগ্বেদ ১০ম। ৫।১,২ ইঁহার রচিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।১৪ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।১।৯।৪ দ্রষ্টব্য।

ইক্ষ্বাকু, করূষ, শর্য্যাতি, ইলা (বশ্যা), পুষধ্র ও নাভাগারিষ্ট। কথিত আছে মনুর আরও পঞ্চাশৎ পুত্র ছিল; কিন্তু আত্ম-কলহে তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছিল।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মনুর ঐ সকল পুত্রগণের যে বিশেষ বিবরণ প্রকটিত আছে, তাহা পাঠ করিলে তদানীন্তন আর্য্য হিন্দুসমাজের অনেক গূঢ় বৃত্তান্ত জানা যায়। হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে, মনুপুত্র পুষধ্র গুরুর গোবধ জন্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * করূষ হইতে মহাবল পরাক্রান্ত, ধর্ম্মবৎসল কারূষ নামক ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হইয়াছিল। † তাহারা উত্তরাপথের রক্ষণার্থ নিযুক্ত ছিল। নেদিষ্ট পুত্র নাভাগ কর্ম্মবশতঃ বৈশ্যত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে, নাভাগ বৈশ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে বৈশ্য হইয়াছিল। ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টক ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হয়। ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ কালে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

কর্ম্মবশে উন্নতি ও অবনতি।

আর্য্যহিন্দুর উপনিবেশ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বৈবস্বত মনুর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাঁহার সমসাময়িক জলপ্লাবনাদি যে সকল বিবরণ প্রকটিত হইল, তৎসমুদয়দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহার আবির্ভাব কালে, আর্য্যহিন্দুসমাজের প্রাথমিক স্তরের গঠনারম্ভ মাত্র হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের সেই আদিম অবস্থায়, —বৈদিক ভারতের সেই সদ্যঃপ্রসূত শৈশবকালে, যে মুষ্টিমেয় আর্য্য-সন্তান লইয়া মনু হিন্দুসমাজের সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন,—আর্য্যহিন্দুর জাতীয় জীবনের প্রথম উৎস উৎসারিত করিলেন, তাহার বিষয় ভাবিতে গেলে, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। না জানি কি অসীম ঐশীশক্তি দ্বারাই তিনি প্রণোদিত হইয়াছিলেন; না জানি কি অতিমানুষ ভূয়োদর্শন, শৈশবদোলায় বলধী হিন্দুসমাজের সেই প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা তার হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছিল;—আজি সহস্র সহস্র বৎসর দূরে থাকিয়া, বর্ত্তমান জীর্ণ শীর্ণ, ভগ্ন, বিপ্লুত, বিপর্য্যস্ত হিন্দুসমাজের ধ্বংসরাশির উপর দণ্ডায়মান হইয়া,—হৃদয়ের বল, মস্তিষ্কের তেজ, পেশীর স্থিতিস্থাপকতা প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া মুহ্যমান মনেও আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। যে ভিত্তির উপর এই সুবিশাল বিরাট অট্টালিকা গঠিত হইয়াছিল, তাহার বজ্রসারময়ী দৃঢ়তা কথঞ্চিৎ অনুভূত হইতেছে।

প্রথম স্তরের গঠনারম্ভ।

প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের জলরাশি বিশোষিত হইলে, ধরিত্রী পচন ও বিয়োজন জনিত পঙ্কিল মালিন্য পরিহার করিয়া শ্যামল সৌকুমার্য্য ধারণ করিতেছিল। ঊর্দ্ধে নীল নভোমণ্ডলের নবীন ঔদার্য্য,—মধ্যে অনন্ত তুষারকিরীটী হিমাচলের অমল প্রসন্নতা;—তন্নিম্নে তোয়নিধির প্রাসোদ্যুক্ত অধিত্যকা প্রদেশ সমূহের সংমিশ্রিত শ্যামনীলিমা;—সর্ব্বত্রই নবীন জীবনের অতি প্রবল অনিবার্য্য উচ্ছ্বাস। মনু সেই নূতন জগতে অভিনব জীবনীশক্তি প্রোক্ষিত করিবার নিমিত্ত নবীন উৎসাহে অবতীর্ণ হইলেন। আজি তাঁহাকে সমস্তই নূতন করিয়া সংগঠিত করিতে হইবে। যে বিশ্বরূপিনী প্রতিভা বিশ্বের আদি কবির মনোমন্দিরে সমুদিত হইয়া সৃষ্টির নূতন-প্রক্রিয়া উন্মেষিত করিয়াছিল, ভগবান্ মনুর মানসকন্দরে তাহা আবির্ভূত হইল। সেই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির বিমল বলবৎ আলোকে উৎসাহিত হইয়া প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি ক্রমে ইহা বিশদ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

জলপ্লাবনের পর।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির অবস্থার উপর মানবের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সেই অবস্থা চতুর্ব্বিধ,—জল বায়ু, খাদ্যসামগ্রী, আবাস ভূমি ও নিসর্গ। এই অবস্থা চতুষ্টয় স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও মূলে অভিন্ন। কারণ, এই গুলি পরস্পরের পরস্পরের ব্যষ্টি ও সমষ্টির পরিণাম ফল মাত্র। ফল কথা আবাস ভূমিই মূলাধার;—আবাসভূমিরই প্রকৃতি অনুসারে মানবের চেষ্টা চৈতন্য নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে। মনু যেরূপ আবাসভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাব অনুসারে তাঁহাকে উপযুক্ত উপায়াদি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেই আবাস-ভূমি কিরূপ, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে।

আবাস ভূমি ও সমাজ।

ভারতের প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থেই উত্তর দিকের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের মতে উত্তর দিক অতীব পবিত্র; তাহা সকল মঙ্গলের নিলয় এবং বাক্যের প্রসূতি। * বৈদিক কালে ভারতীয় আর্য্যগণ উত্তর দিকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইতেন এবং কৃতবিদ্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, লোকে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁহাদের উপদেশ লইতেন। এই জন্য উপনিষৎ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে উত্তর কুরু † উত্তর মদ্র, উত্তর কোশল, উত্তর পাঞ্চাল প্রভৃতি প্রদেশের এত প্রশংসা দেখা যায়। এই সকল রাজ্যের মধ্যে উত্তর কুরু পরম পবিত্র ও প্রাচীনতম। ইহার সর্ব্বাংশ যেন

উত্তর কুরু, উত্তর মদ্র প্রভৃতি।

* বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

† বিষ্ণুপুরাণ ৪।১।১৩; শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২।

* কৌষীতকী ব্রাহ্মণে আছে—"পথ্যা স্বস্তিরুদীচী; দিশং প্রাজানাদ্ বাগ্‌বৈ পথ্যা স্বস্তিস্তস্মাদ্ উদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ এবয়ান্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্যবা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষাহি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।"

† তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরবঃ উত্তর মদ্রাঃ ইতি বৈ রাজ্যায় এব তেঽভিষিচ্যন্তে।" ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, মহাভারত আদিপর্ব্ব, সভাপর্ব্ব, অনুশাসনপর্ব্ব, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

কি অনির্ব্বচনীয় মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন। প্রাচীনকালে লোকে ইহাকে মায়াপুরী বলিয়া জ্ঞান করিত। অধুনা অনেকের ধারণা এই যে,এই উত্তর কুরুতেই বিশ্বের বরেণ্য আদিম আর্য্যগণ বাস করিতেন; এবং সেই স্থান হইতেই তাঁহারা দলে দলে ইয়ুরোপ ও এসিয়ার নানাস্থানে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আজকালি অনেকে এই মতের পোষকতা করিতে প্রস্তুত নহেন। ফল কথা ভারতীয় আর্য্যদিগের পিতৃপুরুষগণ যে উত্তর কুরু, অথবা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন উত্তর ভূভাগ হইতে বহির্গত হইয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ভাষাগত সামান্য সামান্য সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া সহসা এরূপ গুরুতর বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। * বরং ভারতবর্ষই যে আর্য্য হিন্দুদিগের আদিম আবাসভূমি এবং এই দেশ হইতেই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তৎপক্ষে হিন্দুগ্রন্থ সমুদয় হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রকটিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনার তাহা উদ্দেশ্য নহে। সে যাহাহউক, বৈবস্বত মনু সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, হিমগিরি প্রদেশের সন্নিকটে, ভারতের কোন উত্তর প্রদেশেই সেই মহানুভব পরমপূজ্য প্রজাপতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই স্থানটি কোথায় এবং তাহার নাম কি, অধুনা তাহা নির্ণীত হইতে পারে না।

প্রত্ন ওকঃ" কোথায়?

সেই নির্জ্জন গিরিগহনে—নিসর্গের সেই শান্ত-গম্ভীর ঔদার্য্যনিলয়ে ভারতীয় আর্য্যগণের সেই আদি পিতা মহাত্মা মনু কিপ্রকার উপনিবেশ সংস্থাপিত করিলেন; সেই প্রকারে সেই আদিম উপনিবেশ প্রজাদ্বারা কিরূপ শোভিত হইল,সেই সকল প্রজার কীদৃশী প্রকৃতি এবং সংখ্যা কত, ইত্যাদি নিগূঢ় বৃত্তান্ত নিচয় জানিবার কোন উপায়ই নাই;—এখন তাহা জানিবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

* A. A. Macdonell's "Vedic Mythology" P. 30. See also Sasi Chander Dutt's "India—Past and present" P-P 2—6.

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "আভাস। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্ম-প্রণীত, আগরতলা, স্বাধীন ত্রিপুরা, ১০১২ ত্রিপুরাব্দে মুদ্রিত।"—গ্রন্থকার নবীন যুবা। তিনি, বঙ্গদেশের ইতিহাস-কীর্ত্তিত উচ্চ রাজবংশে জন্মিয়াও, বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুরাগী, এবং সাংসারিক সুখ-সম্পদের বিলাস-নিকেতনে সংবর্দ্ধিত হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত; ইহা দেশের সৌভাগ্য।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"বিদ্যা ও বয়সে প্রবীণ নহি, গ্রন্থ-প্রণয়ন-চেষ্টা আমার পক্ষে সর্ব্বথা অবৈধ ও বিদ্রূপার্হ হইবে জানিয়াও এই দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি; বাঙ্গালা ভাষায় অকৃত্রিম অনুরাগই ইহার একমাত্র কারণ। * * * এই গ্রন্থ-প্রণয়ন আমার প্রথম উদ্যম। ইহা প্রমাদপূর্ণ হওয়া স্বতঃই সম্ভবপর। ভ্রমাদি উদ্‌ঘাটিত হইলে, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধিত হইবে।"

উপরি-লিখিত কথা কয়টি সহৃদয় ও সুরুচি-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। বিনয় মনুষ্যমাত্রেরই আভরণ। যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করেন, বিনয় তাঁহাদিগের অমূল্য বৈভব। সরস্বতীর 'বর পুত্র' পৃথ্বী-বিশ্রুত মহাকবিও যখন, মনুষ্যের কাছে দাঁড়াইয়া, বিনয়ের ভাষায় কথা কহিয়াছেন, তখন 'অন্য পরে কা কথা?' মাতৃভাষায় অকৃত্রিম অনুরাগ, এক অর্থে, বিনয় অপেক্ষাও উচ্চতর বৃত্তি। কুমার সুরেন্দ্র সে উচ্চতারও পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যখন আপনার লেখায় ভ্রম-প্রমাদের শঙ্কা করিয়া, সংশোধনের জন্য যত্নপর, তখন বুঝা যাইতেছে,কালে তাঁহার দ্বারা সাহিত্যের উন্নতি হইবে। এইরূপ শঙ্কা ও সাবধানতাই সাহিত্যিক উন্নতির সুপরিচিত সোপান। সকলের লেখায়ই ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যিনি, আপনার সেই "অভ্রান্ত" ভ্রম-প্রমাদে অনুরাগ-বদ্ধ অথবা অন্ধ না হইয়া, মাতৃভাষার নির্ম্মল উৎকর্ষে অনুরাগী, সাহিত্যিকের মধ্যে তিনিই উচ্চ শ্রেণির লোক।

'আভাস' আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে আত্ম-মর্য্যাদা, একাগ্রতা, ইচ্ছা ও শিক্ষা প্রভৃতি সাতটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির ভাব একান্ত উপাদেয়,—কোন কোন স্থলে বিশেষ প্রশংসা-যোগ্য;—ভাষা সকল স্থলে আশার অনুরূপ সরল ও রীতিসঙ্গত নহে।

শিক্ষা নামক প্রবন্ধে এক স্থলে লিখিত আছে,—"শিক্ষিত-সমাজও অপ্রশস্ততার স্পর্শ-দোষ-বিরহিত নহে। কর্কশ-পেশী নিরক্ষর কৃষক ক্ষেত্রের প্রথম-জাত ফল ভূস্বামীকে প্রদান করে। ভূস্বামী অসার বাক্যদ্বারাও তাহাকে চরিতার্থ করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।" আমরা প্রবন্ধের এই অংশটুকু পড়িবার সময়, লেখকের উদার হৃদয়কে, অন্তরের সহিত পূজা করিয়াছি। আমাদিগের দৃঢ় ভরসা আছে, এই পংক্তি কয়টির গভীর অর্থ সদাশয় মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণে যাইয়া স্পৃষ্ট হইবে। পরের সুখ-দুঃখের সহিত প্রাণের সহানুভূতি,—পরের মধ্যে যাহারা কাঙ্গাল, ক্লিষ্ট, অথবা কঠোর শ্রম-পীড়িত, তাহাদিগের প্রতি প্রাণের স্বাভাবিক টানই মনুষ্যত্বের উন্নত গ্রাম। যিনি সে গ্রামে না পঁহুচিয়া, শুধুই আপনার রূপোজ্জ্বল মুখখানি, অথবা 'আপ্‌নিটি আর কৌপ্‌নীটি' লইয়া সুখ-সন্তৃপ্ত, তিনি সোনার খাটে শয়ান রহিলেও মনুষ্য বলিয়া পূজার্হ নহেন। লেখক তাঁহার প্রথম বয়সেই হৃদয়ে এইরূপ উদার ও উচ্চ ভাব পোষণ করিতে পারিয়াছেন, এবং সেই ভাবকে ওজস্বিনী ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন; ইহা বিশেষ গৌরবের কথা।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, লেখা সকল স্থলে আশার অনুরূপ সরল ও রীতি-সঙ্গত নহে। ইহার একটুকু নিদর্শন দিব। চরিত্র নামক প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে,—"আদর্শের তারতম্যানুযায়ী চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষতা। (১) 'উৎকর্ষতাপকর্ষতা' এইরূপ দুরুচ্চার সন্ধি সর্ব্বতোভাবে দূষ্য, এবং

অর্থবোধের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। (২) 'উৎকর্ষ' ও 'অপকর্ষ' এই দুটি শব্দই বিশেষ্য। বিশেষ্য শব্দের পর ত্ব ও তা প্রত্যয়ের প্রয়োগ নিতান্ত অবিহিত। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অথবা মহত্ত্ব প্রভৃতি শব্দ যেমন সৌন্দর্য্যতা, মাধুর্য্যতা অথবা মহত্বতা প্রভৃতি রূপে পরিণত হইতে পারে না, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ প্রভৃতি শব্দও সেই প্রকার উৎকর্ষতা, অপকর্ষতা অথবা ঔৎকর্ষ প্রভৃতি রূপে পরিণত হয় না। যদি ঐ শব্দ কয়টিরে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া, বাক্য-বিন্যাস করা, গ্রন্থকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—আদর্শের তারতম্য অনুসারে চরিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ। গ্রন্থকার মাতৃ-ভাষা-ভক্ত, উন্নত-চিত্ত ও উদ্যমশীল লেখক বলিয়াই আমরা তাঁহাকে ভাষার উৎকর্ষ বিষয়ে একটুকু দিক্-প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। এ সকল অবৈধ আধুনিক প্রথার পরিশোধন হইলে, 'আভাস' উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে অনেক শিক্ষাপ্রদ সদুপদেশ আছে, এবং উপদেশের সমস্ত কথায়ই প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি লেখকের প্রাণের অনুরাগ পরিস্ফুট রহিয়াছে।

২। "গান। প্রথম উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারিলাল সরকার প্রণীত।"—বিহারী বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য-কাননে একটি সুচারু-বিকশিত সুফল বিটপী। তাঁহার গদ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বাড়াইয়াছে। তাঁহার শকুন্তলা-রহস্য শুধু গৌরব বাড়ায় নাই, ভাষার একটুকু অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে। তাঁহার এই অভিনব গ্রন্থ,—এই 'গান'—সেই উপার্জ্জিত কীর্ত্তির অপচায়ক হইবে না। এই পৃথিবীতে সকল জাতির উদ্বেল হৃদয়ই, আগে গাইয়াছে গান, তার পর লিখিয়াছে কবিতা। যাঁহারা সমাজে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই আগে গাঁথিয়াছেন গীতের একাবলী, তার পর গাঁথিয়াছেন কবিতার বহুসূত্রিত কুসুম-হার। সুতরাং গানের সহিত কবিতার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বাবু বিহারিলালের 'গান' উচ্চ অঙ্গের কবিতা না হইলেও, ইহার অনেক গীতই উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা। এখানে একটি গীতের দুই চারিটি পংক্তি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

বেহাগ—খাম্বাজ—ঠুংরী।

এ শুভ্র নিশীথে আজি স্মিত-চন্দ্র-করে,—
কে কোথায় বাজায় বাঁশী কি মোহন স্বরে!

* * *

রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠে ছন্দের ঝঙ্কার,
স্তরে স্তরে ফুটে নিখাদ-গান্ধার,
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছুটে রাস-রস-ধার,
তালে তালে কত সুধা ঝরে।

বিহারী বাবুর এই 'গানে' এইরূপ সুখ-পাঠ্য ও সুমধুর গীত অনেক আছে।

আমরা এই সমালোচনের ঠিক এই পর্য্যন্ত লিখার সময়ে, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের এক-নিবন্ধ-গ্রথিত 'নব-প্রভা' আমাদিগের হস্তগত হইল। 'নবপ্রভায়'ও 'গানের' সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই সমালোচনা পাঠ করিলাম। বলা বাহুল্য, পাঠ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এই যে পূর্ব্বে শুনিয়াছি,—"বার রজপুতের, তের চুলা"—অর্থাৎ যেখানে বারটি রজপুত, সেখানেই পাকের জন্য তেরটি চুল্লী, বাঙ্গালা-সাহিত্যের অদৃষ্টেও কি শেষটায় তাহাই ঘটিবে? বাঙ্গালা-সাহিত্যের সংকীর্ণ-ক্ষেত্রে, লেখকও আমরা, পাঠকও আমরা। আমরা যদি একে অন্যকে উপযুক্তরূপ সম্মান করিতে শিক্ষা না করি, তাহা হইলে অন্যে আমাদিগকে অথবা আমাদিগের সাহিত্য-সেবা-রূপ উচ্চব্রতকে

সম্মান করিবে কেন? তার পর সমালোচনা? সমালোচনার অর্থ শ্লেষ কিংবা বিদ্রূপ-বর্ষণ নহে। সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার লেখায় যেটুকু সুন্দর, তাহার প্রদর্শন-দ্বারা লেখকের সামর্থ্য-বিকাশে সাহায্য-বিধান;—আর সে লেখার মধ্যে বিশেষ কিছু কুৎসিত থাকিলে, তাহার পরিহার ও জাতীয় সাহিত্যের মঙ্গলার্থ, প্রীতিশ্রদ্ধার প্ররোচক ভাষায় উপদেশ-দান। বিহারী বাবুর 'গানে' তেমন কুৎসিত কিছু আছে কি?

নবপ্রভার সমালোচনা সম্পাদকের নহে। কিন্তু সম্পাদক স্বয়ং এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন যে, 'এই সমালোচনায় দেশের একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের স্বাধীন মত লিখিত হইয়াছে।" প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অবশ্যই পূজাস্পদ ব্যক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এই 'স্বাধীন মত' বিচার-সঙ্গত এবং সহৃদয়-সাহিত্যিকের উপযুক্ত হইয়াছে কি না, ইহা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি, বিহারিলালের দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া, শ্লেষের ভাষায় বলিয়াছেন যে, ইহার ছন্দোবন্ধ কোন অংশেই মিষ্ট হয় নাই। পংক্তি দুটি এই,—"হে সিদ্ধপুরুষ গণেশ, তুমি জ্ঞান-গৌরবাশ্রয়, আমি অজ্ঞান, হীন হে, রচনায় দুরাশয়।"

গীতি-কবিতার ছন্দ, অনেক সময়ই, হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে, স্বরের উপযুক্ত উচ্চারণের উপর নির্ভর করে; এবং তাহা অন্যে না জানিলেও, সমালোচক বিশিষ্ট রূপে জানেন। আমরা এখানে তাঁহার জানা কথাই আবার জানাইব; এবং দুইটি পরিচিত গীতি-কবিতার দুই তিনটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহাকেই ছন্দের বিচার করিতে বলিব।

(১) এক প্রথমজ্যোতি, অতিশুভ্র পরম-ব্রহ্ম,—
প্রভু, সর্ব্বলোকসেতু, পরমেশ্বর!

(২) পরব্রহ্ম সত্য সনাতন অনাদি
জগতগুরু পূরণ হরে হরে।

বিহারী বাবুর পংক্তি দুটিতে, দূরাশ অর্থাৎ দূরে রহিয়াছে আশা যার, এই অর্থে, অথবা অন্য কোন অর্থে, দুরাশয় শব্দটি আমাদিগের নিকট ভাল লাগে নাই। কিন্তু ছন্দে কোথায় কি দোষ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিলাম না।

সমালোচকের মতে, বিহারী বাবুর দ্বিতীয় দোষ, গান-রচনায় অনুরোধ-পরতন্ত্রতা। 'অনুরোধে গান রচনা হয় না' এ কথা সত্য কি? বিহারী বাবু যাঁহাদিগের পদ-রজঃস্পর্শ করিতে পারিলেও কৃতার্থ হন, এ-হেন মহাকবিরা শুধু অনুরোধে নহে, কিন্তু আদেশক্রমেও গীত রচনা করিয়াছেন; এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা, সে সকল গীতকে মানবজাতির স্থায়ি-সাহিত্যে, সম্মানের আসন দিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং টেনিসনের কত গীতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহা অন্যে না জানিলেও, সমালোচক বিশিষ্ট রূপে জানেন, সন্দেহ নাই।

বিহারী বাবুর তৃতীয় দোষ বিনয় ও সৌজন্য। যদি শ্লেষের ভাষা, বিনয় ও সৌজন্যের পবিত্র তনুকেও স্পর্শ করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে সংসারে কেহই কখনও সুনীতির আশ্রয় লইতে ভালবাসিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্থলে কালিদাস ও তাঁহার সমালোচকের ভাষা অনায়াসে কল্পিত হইতে পারে।

কালিদাস কহিতেছেন,—"মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী"। সমালোচক কহিতেছেন,—"তবে জানিয়া শুনিয়া এ ক্ষেত্রে আসিয়াছ কেন? কালিদাস কহিতেছেন—"গমিস্যামুপহাস্যতাম্"। সমালোচক কহিতেছেন,—"তা অত করিয়া না বলিলেও আমরা বুঝি।" কালিদাস হঁটিবার লোক নহেন। তিনি পুনরায়,

ধীরে ধীরে, ভীত-ভীত কণ্ঠে, বলিতেছেন ;—
"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

সমালোচক এবার একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিতেছেন,—"তবে বাড়ী হইতে বড় একটি আঁকুষী লইয়া এস।"

কালিদাসের এই হৃদয়-মনোহারি বিনয়ের সহিত তুলনা করিলে, ভবভূতি ও মিল্টনের সেই চিরপরিচিত দুর্ব্বিনীত ভাষা কেমন বোধ হইবে? ভবভূতি কহিতেছেন,—

"উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমান-ধর্ম্মা"—

আর মিল্টন, যেন আরও একটু বেশী ফুলিয়া, অধিকতর গর্ব্বের সহিত কহিতেছেন,—

গাইব সে গীত, গায় নাই কেহ যাহা,—
গদ্যে কিংবা পদ্যে কভু। (ভাবানুবাদ)

আমরা নিঃসম্বল বাঙ্গালি লেখক। ভিক্ষার ঝুলিই আমাদিগের প্রধান সম্বল, এবং শিক্ষার পথে সকলেই আমরা নূতন পথিক। আমাদিগের মুখে, দম্ভ ও দর্পের গর্ব্বিত ভাষা অপেক্ষা, বিনয়ের অমিয়-ভাষাই অধিকতর শোভা পায় না কি? দোষ সকলেরই আছে। বঙ্গীয় গদ্যলেখকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ ও শিবনাথ প্রভৃতির ভাষা, এবং পদ্যলেখকদিগের মধ্যে হেম, নবীন, রবি ও মধুসূদনের লেখাও দোষশূন্য, নহে। কিন্তু কিবা সে সকল সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবিদিগের অনিচ্ছাকৃত দোষ, কিবা এখনকার নব্যলেখকদিগের অনবধানতার দোষ,—লেখার কোনরূপ দোষ লইয়াই, শতপ্রকার নজীর ও নিদর্শন সত্ত্বেও, শ্লেষ কিংবা পরিহাস করা, আমাদিগের নিকট ভাল বোধ হয় না। আমরা এখানে একটি উদার, ওজস্বল, অর্থগম্ভীর উপাদেয় বক্তৃতা হইতে একটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিব;—এবং এই একটি মাত্রপংক্তিতে, বক্তার অজ্ঞাতসারে, কয়টি বিচিত্র দোষ, গুণরাশির মধ্যে, গোপনে যাইয়া ঠাঁই লইয়াছে, তাহা পাঠককে দেখাইব। সুপণ্ডিত বক্তা সমালোচনায় বলিতেছেন,—"তাঁহার উপন্যাসে স্কটের মধুরতা, আখ্যান-বস্তুর কৌতূহলোদ্দীপকতা আছে। তাঁহার রহস্যে ডিকেন্সের সুমার্জ্জিত ব্যঙ্গরসের আভা আছে।"

এখানে 'আখ্যান-বস্তু' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই আমরা বুঝিতে পারি নাই। 'স্কটের মধুরতা' এবং 'আখ্যান বস্তুর কৌতূহলোদ্দীপকতা' বলিলে 'আখ্যান-বস্তুকে' আপাততঃ কোন একখানা গ্রন্থের নাম বলিয়াই মনে লয় না কি? দ্বিতীয় কথা 'রহস্যে ব্যঙ্গ-রসের আভা।' রহস্য শব্দের অর্থ রসিকতা নহে। উহার অর্থ Mistery অর্থাৎ মর্ম্ম-তত্ত্ব। 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্' এই পুরাতন বাক্যকে, অনেকে ভ্রম-বশতঃ 'অরসিকেষু রহস্য-নিবেদনম্' পাঠ করিয়া এই বিপদ ঘটাইয়াছেন। যদি 'রহস্য' শব্দকে, একান্তই 'রসিকতা' অর্থে টানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, 'সুমার্জ্জিত ব্যঙ্গ-রসের আভা' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যায় কি? এক রসের স্বাদ আর এক রসে যাইয়া মিশিতে পারে। কিন্তু রসে আভা থাকে না,—রস কিংবা রসের সে কষ্ট-কল্পিত আভা কখনও মার্জ্জিত হইতে পারে না, এবং এক রসের আভাও অন্য রসে যাইয়া আপতিত হয় না। এইরূপ ক্ষুদ্র দোষ সত্ত্বেও, বক্তৃতাটি অতি উচ্চ শ্রেণীর বস্তু।

বিহারী বাবুর গানেও বহু দোষ আছে। কিন্তু আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, সে সকল দোষ সত্ত্বেও 'গান' মোটের উপর উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া আদর পাইবার যোগ্য।

সাহিত্য-সেবা।

অর্থাৎ

সাহিত্যব্রত,—সাহিত্যবিলাস ও সাহিত্যব্যবসায়।

সাহিত্য-সেবা কাহারও পক্ষে জীবনের মহাব্রত; কাহারও পক্ষে,—জীবনের আর পাঁচ প্রকার সুখের মধ্যে একটা বিশেষ সুখ অথবা বিলাস-লীলা; এবং কাহারও জন্য উহা জীবিকা-লাভের উপায়স্বরূপ বিশেষ একটি ব্যবসায়। কিন্তু কিবা ব্রত-ধর্ম্মের উচ্চভাবে উচ্চ অঙ্গের অনুষ্ঠান, কিবা সুখ-লালসার বিলাস-বিনোদন, কিবা ব্যবসায়ীর স্বার্থ-গন্ধি জীবন, সাহিত্যসেবা সকল অবস্থায়ই মনুষ্যের পক্ষে যার-পর-নাই সম্মান-জনক। উহার একটুকু বিশেষ গুরুত্ব ও দায়িতা আছে। মনুষ্য-জীবনের আর কোনরূপ ব্রত-ধর্ম্ম, বিলাস-লীলা অথবা উপজীব্য ব্যবসায়ে, সেই প্রকার গুরুত্ব ও দায়িতা আছে কি না, তাহা সংশয়ের বিষয়।

প্রথম ব্রত-ধর্ম্মের কথা। সাহিত্য যাঁহাদিগের জীবনের মহাব্রত,—যাঁহারা নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল, প্রেম-ঢল-ঢল পবিত্র হৃদয়ে সাহিত্যের সেবা দ্বারা মানবজাতির মঙ্গলসাধন করিয়াছেন,—মনুষ্যকে জীবনের উচ্চতর আদর্শ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পট দেখাইয়া জীবনের জটিল বর্ত্মে উপরের দিকে টানিয়া তুলিয়াছেন,—ফলতঃ যাঁহারা করে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আজি মানবজাতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায়, অথবা মহত্ত্ব ও মাধুরী এবং প্রীতি ও পরার্থা নীতির ভিন্ন ভিন্ন পটলে, এতটুকু বেশী শিক্ষিত, এতটুকু বেশী উন্নত, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহারাই ব্রত-ধর্ম্মা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। মনুষ্য তাঁহাদিগকে চিনুক আর না চিনুক, তাঁহারাই মানব-হৃদয়ের স্বভাব-সিদ্ধ গুরু,—মানব-সমাজের সুখ-দুঃখ-বিধাতা, এবং মনুষ্যজাতির প্রকৃত পরিচালক ও প্রাণস্থ কর্ত্তা।

এই শ্রেণীর মহাপুরুষদিগের মধ্যে, ফরাশি দেশের ফেনেলোঁ, ইটালী দেশের সাভানারোলা এবং আমেরিকার চ্যানিঙ্ * প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য হইলেও, বাল্মীকি ও ব্যাস

* সাভানারোলা ফেনেলোঁর পূর্ব্ববর্ত্তী। উলিয়ম এলারি চ্যানিঙ্ এমার্সনের গুরু। এই তিনই প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী, এবং সমাজে ও সাহিত্যে দেবতুল্য পুরুষ বলিয়া সমানপূজিত। মঁসিয়ু রেণাঁ এবং অন্যান্য মহাপণ্ডিতেরা ইঁহাদিগের সম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ফেনেলোঁর টেলিমেকস নামক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হইতে কএকটি মাত্র অধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ বাবুর যত্নে বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। অবশিষ্ট অধ্যায়গুলি ঐরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া গ্রন্থবদ্ধ হইলে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইবে।

সর্ব্বাগ্রে ও সমস্ত পৃথিবীতে বিশেষ প্রকারে পূজাস্পদ। হোমর, ভার্জ্জিল, এবং রুসো ও ভল্টেয়ার প্রভৃতি সকলেরই সাহিত্য-সেবার সহিত জীবিকার কোন না কোনরূপ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বাল্মীকি ও ব্যাস একবারে নিষ্কাম। বাল্মীকীয় সাহিত্যের আগাগোড়া একমাত্র উদ্দেশ্য—আদর্শ-চরিত্রের চিত্র-প্রদর্শন। আর, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যে বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারও একমাত্র উদ্দেশ্য—কর্ম্মজগতে ধর্ম্মের জয়-খ্যাপন।

নারদ যখন তমসার তটে অবস্থিত তপোরত বাল্মীকিকে কাব্য-রচনার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন বাল্মীকি, তাঁহার মত উন্নত-পুরুষ-সমুচিত অতিমাত্র বিনয়-নম্রতার সহিত উত্তর করিলেন,—এই পৃথিবীতে এমন চরিত্রবান্ ও সর্ব্বভূত-হিত-পরায়ণ কে আছেন যে, কাব্যে তাঁহার চারু চিত্র প্রদর্শন করিয়া, লেখনীর সম্মান এবং মনুষ্য-জাতির উপকার করিতে পারি? *

"চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ।
সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ॥"

বাল্মীকির এই প্রশ্ন ভারতবর্ষের পুণ্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ। পৃথিবীর আর কোন জাতিই সাহিত্যের এই প্রকার উচ্চ আদর্শ ও উচ্চ উদ্দেশ্য কল্পনা করে নাই। কিন্তু সংসারে বাল্মীকি আর ব্যাস সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করে না। বাল্মীকি ও ব্যাসের সহিত, এক পংক্তিতে না হইলেও এক প্রকোষ্ঠে অথবা তাঁহাদের পদ-প্রান্তে উপবেশন করিতে পারেন, সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অবশ্যই এমন সুকৃতী অনেক আছেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের সংখ্যাও বেশী নহে।

বাল্মীকি ও ব্যাসের সমশ্রেণিস্থ সাহিত্য-সেবীদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, সাহিত্য-বিলাসের কথাই আগে উপস্থিত হয়। কারণ, আজি যাহা সাহিত্য নামে সংসারে পূজা পাইতেছে, তাহার প্রধান এক ভাগই সাহিত্যিক সুখ-লালসা অথবা বিলাস-লীলার ফল; এবং রোমের সিজর ও সিসিরো হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডের শেলী ও বায়রণ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সাহিত্য-স্রষ্টাই প্রধানতঃ সাহিত্য-বিলাসী। কিন্তু সাহিত্য-বিলাস ও সাহিত্য-ব্যবসায়, সংজ্ঞায় ও লক্ষণে একে অন্য হইতে পৃথক্ রহিলেও, সে পার্থক্য পৃথিবীর অধুনাতন ইতিহাসে খুব বেশী রক্ষা পায় নাই। ইহার নিদর্শন-স্থলে সহস্র লোকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু পাঠক যদি ক্ষণকালের তরেও বায়রণের জীবনচরিত আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, যাহা এক সময়ে জীবনের স্বার্থ-সম্পর্ক-শূন্য বিলাস-লীলা মাত্র রহিয়া মনুষ্যের প্রণয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাই আর এক সময়ে, অতি সহজে, জীবিকার একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ স্বার্থসম্পৃক্ত ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে। বায়রণ এক দিকে যেমন প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, আর এক দিকে তেমনই অভিমানের উৎকট বিগ্রহস্বরূপ

* ইহা বলা অনাবশ্যক যে, একথা বাল্মীকীয় উক্তির ভাবানুবাদ মাত্র।

ছিলেন। তিনি, তাঁহার প্রথম বয়সে, প্রতিভার সৃষ্টি ও প্রেমময়ীর পীযূষ-মধুরা দ্রব-দৃষ্টি এই দুইকেই, এক শ্রেণীর পদার্থ, সুতরাং অবিক্রেয় বস্তু, বলিয়া মনে করিতেন;—এবং যাহারা সাহিত্য-সেবা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, তিনি তাহাদিগকে মনে মনে, অতি গোপনে, ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এই বায়রণই, কালক্রমে, জীবিকার প্রয়োজনে, সাহিত্যিক-কীর্ত্তি-রূপা কামধেনুকে কি ভাবে দোহন করিয়াছেন, সে বিষয়ে শিক্ষিত পাঠকের নিকট দীর্ঘ কাহিনী লইয়া উপস্থিত হওয়া অনাবশ্যক।

যাঁহারা আমাদিগের এই বঙ্গদেশে ইদানীং সাহিত্যের উচ্চ আসনে উপবিষ্ট, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকেই এই শ্রেণীর লোক। তাঁহারাও, বায়রণের ন্যায়, আগে বিলাসীর প্রাণ লইয়াই সাহিত্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। বিলাস-প্রবণ বিষয়ী, যেমন সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর, সায়ংকালে, কিছু কাল, সেতার ও এস্‌রাজ, অথবা তবল ও পাখোয়াজ প্রভৃতি সখের সামগ্রী লইয়া সময় যাপন করেন, তাঁহারাও সেই প্রকার, কর্ম্ম-জীবনের অবকাশ-সময়ে, কাব্য অথবা সন্দর্ভ-রচনার আমোদে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন; তার পর, নিজ নিজ প্রতিভা কিংবা প্রশংসাযোগ্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, জীবনের পূর্ণ-বিকশিত প্রৌঢ় অবস্থায়, ব্যবসায়ীর ভাবে,—ব্যবসায়ীর উদ্যম ও উৎসাহের সহিতই সাহিত্যের সেবায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

তবে কি সাহিত্য-সম্পর্কে ব্যবসায়ীর ভাব কোন অংশেও নিন্দনীয়? ব্যবসায় * শব্দটার উপর সাধারণ লোকের বড় বেশী শ্রদ্ধা নাই। যদিও মনুষ্য মাত্রই, কোন না কোন অংশে, কতকটা ব্যবসায়ী; তথাপি ব্যবসায় এই শব্দটা, মনুষ্যসমাজে—অন্ততঃ ভারতবর্ষে—বড় বেশী শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে না। যাহারা জীবন ও জীবনী বৃত্তির জগন্মঙ্গল্য বৈধ ব্যবহার ও জগদ্‌দ্রোহি অবৈধ অপব্যবহারের পার্থক্য-বিচারে অক্ষম, ব্যবসায়-সম্পর্কিত কার্য্যের উপর, তাহারাই একটুকু বেশী বিরক্ত। কেন না, যে কার্য্যে অনুষ্ঠাতার সুখ হয়, সমৃদ্ধি হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে যশ ও মান এবং যশস্বীদিগের † মধ্যে উচ্চ পদ ও উচ্চ প্রতিষ্ঠা হয়, সে কার্য্য যদি সুশীতল গঙ্গাজলের ন্যায় শান্তিপ্রদ, তুলসী-চন্দনের ন্যায় তাপহারি এবং দয়া-ধর্ম্মের ন্যায় প্রাণ-শীতল পদার্থরূপে মনুষ্যের প্রাণ ও মন আকর্ষণ করে, উল্লিখিত রূপ বিচার-বিমুখ

* ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি শব্দ পুরাতন সংস্কৃতে ব্যবহৃত হইত এক অর্থে, এখন ব্যবহৃত হয় আর এক অর্থে। অব্যবসায়ী শব্দটি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কঠোর-তিরস্কার-বোধক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† যশস্বীদিগের এই ষষ্ঠ্যন্ত পদে দীর্ঘ ঈকারের ব্যবহার অনেকের চক্ষে দুষ্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু, তাহা হইলে,—অর্থাৎ বিভক্তি-যোগ-হেতু দীর্ঘ ঈকারের লোপ-ব্যবস্থা সঙ্গত বোধ করিলে, যশস্বীরা ও যশস্বীর প্রভৃতি পদেও দীর্ঘ ঈকারের আর স্থান থাকে না। তাহা ভাল হইবে কি?

ব্যক্তিরা তাদৃশ কার্য্যকেও খুব শ্রেষ্ঠকল্পের কার্য্য জ্ঞানে শ্রদ্ধার আসন দিতে চায় না।

কিন্তু, সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, পৃথিবীর অন্যান্য ব্যবসায় এবং সাহিত্য-ব্যবসায় এক কথা নহে। কেহ পাটের ব্যবসায় করিয়া প্রাসাদ গড়িতেছেন; কেহ সোনা-রূপা-বিক্রয় অথবা সুদ ও সুরকীর ব্যবসায় করিয়া, আপনার বাস্তভূমিকে সুবর্ণ অট্টালিকায় সাজাইতেছেন; কেহ বা, মাঞ্চেষ্টরের মহিমময় বণিক মহাশয়দিগের মত, কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া,—মনুষ্যসমাজে, সম্রাটের বৈভবে, উপবিষ্ট হইতেছেন। সে সকল ব্যবসায়ে, ব্যবসায়ীর হৃদয়, মন ও প্রাণের সঙ্গে মনুষ্যজাতির হৃদয়, মন ও প্রাণের কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কি? ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকে, চরিত্রের মহত্ত্বে ও উদারতায় দেবতুল্য ভক্তি-ভাজন। তাঁহাদিগের দর্শন-লাভেও মনুষ্যের উপকার হয়, মনুষ্যের দেহ ও মন পবিত্র হয়। কিন্তু তাঁহারা সাধু, সরল ও সজ্জন অথবা যার-পর-নাই অসাধু, অসরল ও লোক-পীড়ক দুর্জ্জন হউন, তাহাতে, বিশেষ কারণ না ঘটিলে, ব্যবসায়ের অথবা বিশ্বজনীন শান্তি ও মানসিক উন্নতির কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে কি?

পক্ষান্তরে, সাহিত্যব্যবসায়ী যদি সাধুতা, সদাশয়তা এবং সজ্জনসেব্য সুনির্ম্মল প্রেমিকতা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, কোন অংশেও বিপথগামী হন, তাহা হইলে শুধু তাঁহার ব্যবসায়ই বাস্তব-বিচারে অধঃপাতে যাইবে, এমন নহে; তাঁহার ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজের সুখ ও শান্তি এবং প্রকৃত উন্নতিও, তদীয় শক্তির মাত্রানুসারে, অধঃপাতের দিকে অনেক দূর গড়াইয়া পড়িবে। পৃথিবীর অন্যান্য ব্যবসায়ের মূলধন অর্থ, অর্থকরী বুদ্ধি ও শ্রমশীলতা; আর কার্য্যক্ষেত্র কতকটুকু সীমাবচ্ছিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থান। সাহিত্য-ব্যবসায়ের মূলধন—হৃদয়, মন, প্রাণ এবং প্রাণনিহিত প্রতিভা; আর কার্য্যক্ষেত্র সমস্ত মানবজাতির সমবেত-হৃদয় অথবা সম্মিলিত মনঃস্বরূপ বিশাল সাম্রাজ্য। যাঁহারা অন্যান্য ব্যবসায়ে মহাজন বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা মনুষ্যের মধ্যে, মনুষ্যত্বের গণনায়, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্য হইতে পারেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাঁহাদিগের কাহারও নাম কেলারম্যান অথবা কিটীঙ্, কাহারও নাম কিন্নুরাম পরামাণিক। পক্ষান্তরে, যেমন বৃক্ষসমূহের মধ্যে বট, অশ্বত্থ, পারুল ও দেবদারু প্রভৃতি মহাবৃক্ষ, সেইরূপ যাঁহারা সাহিত্যসমাজে মহাজন বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও সকলেই, মনুষ্যদিগের মধ্যে, মনুষ্যত্বের গণনায়, মহাপুরুষ অথবা বড় মানুষ। তাঁহাদিগের কাহারও নাম ভবভূতি অথবা ভল্টেয়ার, কাহারও নাম আনন্দতীর্থ অথবা ওয়াল্টার স্কট। সুতরাং দৃষ্ট হইবে যে, শেক্ষপীর হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন পর্য্যন্ত কবি, অথবা ডারউইন ও ডিকেন্স, মিল ও মোক্ষমূলর এবং এমার্সন ও ইলিয়ট প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বড় সাহিত্যিকই যখন সাহিত্য লইয়া ব্যবসায়ের দ্বারা জীবনযাপন করিয়াছেন, তখন এ

ব্যবসায়, কোন অংশেও পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবসায়ের সহিত এক শ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অর্থলিপ্সা অথবা যশঃস্পৃহার উন্মাদিনী মদিরায় আত্মবিস্মৃত, অথবা পাইকার ও ফইড়ার চটুল চতুরতায় অন্ধ-প্রতারিত হইয়া, সাহিত্য-ব্যবসায়কেও সোনা রূপার ব্যবসায়ে পরিণত করেন, এবং ক্ষণিক লাভ অথবা ক্ষণস্থায়ি-যশোধ্বনির জন্য সারস্বতী শক্তির প্রতিকৃতি-রূপিণী সাহিত্য-প্রতিমার সুবিমল অঙ্গে কলঙ্কের কর্দ্দম ঢালিয়া দিয়া আপনি বিদূষক সাজিতে ভালবাসেন, তাহা হইলে নিশ্চয় মনে করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার জগৎপূজ্য পবিত্র ব্যবসায়ের প্রকৃত গুরুত্ব অণুমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যিনি যে ভাবে সাহিত্যের আরাধনা কিংবা অনুশীলন করুন, সাহিত্যসেবার একটুকু বিশেষ গুরুত্ব ও দায়িতা আছে। এখানে এইক্ষণ সেই গুরুত্ব ও দায়িতা সম্বন্ধেই একটিমাত্র কথা কহিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কেন না, সে কথার সহিত সাহিত্যব্রত, সাহিত্যবিলাস ও সাহিত্যব্যবসায় এই তিনেরই সমান সম্বন্ধ।

এই যে ঊনবিংশ শতাব্দী, অল্প দিন হইল, জলে জল-বুদ্‌বুদের ন্যায়, কালের অপার ও অতল জলধিতে বিলয় পাইয়াছে, উহা মনুষ্যজাতিকে, কত বিষয়ে, কত কি শিক্ষা দিয়াছে, পাঠক তাহার আলোচনা করেন কি? আজিকার এই রেলের গাড়ী, তারের খবর, তারে তারে প্রাণের কথা, বিনা তারে প্রেমের আলাপ, গ্রামে ও নগরে তাড়িত আলো, এ সমস্তই ঊনবিংশ শতাব্দীর অদৃষ্টপূর্ব্ব দান। কিন্তু এই অসংখ্য দানের উপর উহার আর একটি অমূল্য দান আছে। সেই দান একটি মহাসত্য—একটি মহামন্ত্র;—এবং যদিও কাঙ্গাল হইতে কোটীশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত মনুষ্যের সহিতই সে সত্য ও সে মন্ত্রের অচ্ছেদ্য কর্ম্ম-সম্পর্ক, তথাপি সাহিত্যিকের মধ্যে প্রত্যেকেরই সেই মহাসত্যে ও মহামন্ত্রে, বিশেষরূপে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের পুরাতন ঋষিরা, তাঁহাদিগের অনন্য-সাধারণ অধ্যাত্ম-জ্ঞান অথবা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে, সেই মন্ত্রের সান্নিধ্যে পহুঁচিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঋষিপ্রতিম পণ্ডিতেরা, সেই মন্ত্রকে, বিজ্ঞানের প্রখর আলোকে পরীক্ষা করিয়া, অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, এবং মনুষ্যকে গভীর কণ্ঠে উপদেশ করিয়াছেন,—সাবধান হও, সতর্ক হও, কেহই মনে কোনরূপ মন্দ চিন্তা ও হৃদয়ে কোনরূপ মন্দ ভাব পোষণ করিও না;—এবং সেই মন্দ চিন্তা ও মন্দ ভাবকে, রৌদ্রতপ্ত রেণুরাশির মত, জগতে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় ছড়াইয়া দিয়া, মনুষ্যজাতির উন্নতি ও মঙ্গলের পথে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, কাঁটা দিও না। কারণ,—

"Thought is a Thing"—

অর্থাৎ চিন্তা এক প্রকার বস্তু;—যাহা সাধারণতঃ বস্তু বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইতে অধিকতর সূক্ষ্ম, অধিকতর সারবৎ; কিন্তু

প্রকৃত বস্তু। চিন্তা আর ভাব প্রায় এক পদার্থ অথবা পরস্পর-জড়িত অভিন্ন-জাতীয় পদার্থ। সুতরাং, মনের চিন্তা ও হৃদয়ের ভাব, চক্ষের অদৃশ্য এবং চর্ম্মস্পর্শের অনধিগম্য হইলেও, উভয়ই সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা অথবা জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির ন্যায় শক্তিসম্পন্ন বস্তু। তবে এইমাত্র প্রভেদ, সোনা, রূপা, তামা, কাঁসা, অথবা জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড় বস্তু অল্প স্থান ও অল্প কাল ব্যাপিয়া ক্রিয়া করে। মনের চিন্তা ও হৃদয়ের ভাব এই উভয়েরই ক্রিয়া, স্থানে অনন্তব্যাপিনী ও কালে অনন্তস্থায়িনী। মনুষ্য যদি তাহার সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়া একটি লোষ্ট্র-ক্ষেপ করে, সে লোষ্ট্র শত হস্ত দূরে যাইয়াই ভূতলে পতিত হইবে। কিন্তু, মনুষ্য যদি সামান্য একটুকু ঐচ্ছিক * শক্তির সহিত মনে কোন একটি চিন্তা অথবা হৃদয়ে কোন একটি ভাব পোষণ করে, সে চিন্তা ও সে ভাব, বিদ্যুৎ হইতেও অধিকতর বেগে নদনদী, পর্ব্বত-প্রান্তর ও সমুদ্র পার হইয়া, শতসহস্র যোজন দূরে যাইয়া, কার্য্য ফলাইবে। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, অযুত-কোটি যুগান্তের পর, কোন এক সময়ে নিবিয়া যাইতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের মনঃ-পুষ্ট চিন্তা ও হৃদয়-পুষ্ট ভাব কালের কোন ব্যবচ্ছেদেও বিলুপ্ত হইবে না। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এবং যুগান্তর ও মন্বন্তরের পর শতসহস্র যুগান্তর ও মন্বন্তর পার হইয়া যাইবে। কিন্তু চিন্তার বৈদ্যুতী প্রভা এবং ভাবের অন্তঃপ্রবাহি স্রোত, তেমনই সজীব, ও তেমনই সচল * রহিয়া, জগতে তেমনই সামর্থ্যের সহিত কার্য্য করিতে রহিবে।

উপরি লিখিত কথাটি সাহিত্যসেবাকে কোথায় নিয়া পহুঁচাইতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রই অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। কারণ, মনে যাহা চিন্তা এবং হৃদয়ে যাহা ভাব, তাহারই বহিঃপ্রকট বর্ণময়ী মূর্ত্তির নাম সাহিত্য। স্কট ও বায়রণ উভয়ই চলিয়া গিয়াছেন,—উভয়ই এইক্ষণ অধ্যাত্ম-জগতের অনন্তধামে যাইয়া নিজ নিজ জীবনের কর্ম্ম-ফল ভোগ অথবা কর্ম্মজন্য উন্নতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু স্কটের চিন্তাপ্রসূত রেবেকা আর বায়রণের চিন্তা-চিত্রিত জুলিয়া, সারবৎ সত্য বস্তুর ন্যায় সমাজে বিদ্যমান রহিয়া, শত শত হৃদয়ের উপর নিরন্তর কার্য্য করিয়া বেড়াইতেছে, এবং আর শত সহস্র বৎসর পরেও এই ভাবে, এই শক্তিতে, শত শত হৃদয়ের উপর কার্য্য করিয়া বেড়াইবে। পুরাতন গ্রীকের সেই পৃথ্বী-বিশ্রুত অস্ত্র-ঋনা নিবৃত্ত হইয়াছে বটে। কিন্তু গ্রীকজাতির জ্বলন্ত প্রতিভা, গ্রীক সাহিত্যরূপ নক্ষত্রে

* যাহা ইদানীং Modern Thought বিষয়ক গ্রন্থপত্রে Will Power নামে বর্ণিত হয়, তাহাই এই স্থলে ঐচ্ছিক শক্তি বলিয়া অভিহিত হইল।

* জীব, চেতন ও চল প্রভৃতি শব্দ কখনও কর্ত্তৃবোধক, কখনও ভাববোধক। যখন ভাববোধক, তখনই বহুব্রীহি-সমাসের বিধান অনুসারে সজীব, সচেতন ও সচল প্রভৃতি পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

গত হইয়া, নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধ-ধামে ভা পাইতেছে, এবং মনুষ্যজাতির হৃদয় ও কে নানারূপে আলোকিত করিয়া কখনও রে টানিতেছে, কখনও নীচের দিকে অল্প নোয়াইতেছে। রোমের সে বীর নাই, বীর-নাদ নাই, সেই পুরাতন বীর-কীর্ত্তির -স্তম্ভগুলিও সেইরূপ উজ্জ্বল বর্ণে বিরাজ- ন নাই। কিন্তু রোমক সাহিত্য, অদ্যাপি মনই ভাবে, মানব-সমাজের প্রধান একটা গ অধিকার করিয়া আছে, এবং মনুষ্য যে সিতেছে, কাঁদিতেছে, এবং হৃদয়ে কখনও ধু, কখনও বা অসাধু ভাব পুষিতেছে, ামীয় সাহিত্য সতত তাহার মধ্যে এক ধান কারণ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ল্মীকির সেই প্রশান্ত-স্নিগ্ধ প্রীতিশীতল র্থিব মূর্ত্তি, এখন আর মনুষ্যের চক্ষে প্রতি- ত হয় না। কিন্তু আকাশের ঐ অনন্ত ক্ষত্ররাজীও যদি একটি একটি করিয়া খসিয়া ড়ে, তথাপি বাল্মীকীয় সাহিত্যের জগদুজ্জ্বল ক্ষত্র-মালা তেমনই জ্যোতিতে জগতে আ- াক দান করিবে, এবং যে দেশে এগুলি থম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেই দেশকে ব-দুর্ল্লভ দেশ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হিবে। বস্তুতঃ, সাহিত্যের শক্তি ও সামর্থ্য ামাদিগের মত শফর-স্বভাব সাধারণ লোকের ক্ষে চিন্তার অতীত। দেশের রাজা প্রজা, নী নির্দ্ধন, রাজনীতি বণিগ্‌বৃত্তি, আমোদ ৎসব, দান ধ্যান, সুখ শান্তি, দীক্ষা শিক্ষা, র্ম্ম কর্ম্ম, সমাজ, সভ্যতা, সমুন্নতি ও অবনতি মস্তই সাহিত্যশক্তির অধীন। সাহিত্যের প্রভাবে রাজ্যের পতন হয়, রাজ্যের উত্থান হয়,—ফরাশি সাম্রাজ্যের মত পর্ব্বতপ্রতিম প্রাসাদ শতবজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং লোকে দেখিতে না দেখিতে ঝঞ্ঝাবাত-বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মত উড়িয়া যায়। সাহিত্যের প্রভাবে কখনও দেশে রক্তগঙ্গা, সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যার ন্যায়, ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া যায়; কখনও প্রেমভক্তির অমৃতমন্দাকিনী, তর-তর বেগে প্রবাহিত হইয়া, পাষাণেও কুসুম-রাশি প্রস্ফুটিত করায়। সুতরাং সাহিত্যিক মাত্রেরই সর্ব্বদা নিজ নিজ হৃদয়ে তিনটি প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত পরিপোষণ করা কর্ত্তব্য।

১। তাঁহার দ্বারা মানব-জাতির কোনরূপ মহান্ উপকার হউক আর না হউক, তিনি যেন কখনও কোনরূপ কুৎসিত চিন্তা, কদর্য্য ভাব অথবা পর-পীড়নী প্রদাহি কথা লেখনীর মুখে উদ্‌গিরণ করিয়া, মনুষ্যজাতির অথবা মনুষ্যবিশেষের অসুখ, অশান্তি, কষ্ট দুঃখ, বিপত্তি অথবা অধোগতির কারণ না হন।

২। তিনি যে সাহিত্যের সেবা করিয়া সুখ, সম্মান, ঐহিক উন্নতি অথবা পারত্রিক শান্তির প্রত্যাশা করিতেছেন, সে সাহিত্য যেন কোন অংশেও তাঁহার দ্বারা লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, লজ্জার বিষয়ীভূত অথবা মনুষ্য-সমাজে ধিক্কৃত না হয়।

৩। সাহিত্যে যখন সকল ভাবেই তাঁহার নিত্য অনুষ্ঠান—'দান,' তখন প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে শেক্ষপীরের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও, তিনি যেন কখনও

আদান, উপার্জ্জন-সংস্থান এবং আপনার ব্রত অথবা ব্যবসায়ের উপযোগি সামগ্রী-সঞ্চয়ের মঙ্গল্য-বিধান বিষয়ে উপেক্ষা না করেন।

আমাদিগের এ দেশে বাঙ্গালা-সাহিত্য নামে একটি বিচিত্র বস্তু ফুটিতেছে। ইহার অতীত ও বর্ত্তমান, ইংরেজী ও ফরাশির মত না হইলেও, নিন্দনীয় নহে,—ভবিষ্যৎ বড়ই আশাপ্রদ। কারণ, বাঙ্গালা ভাষা দেবকন্যা। যে সংস্কৃত-ভাষা আজি সমগ্র পৃথিবীতে, দেব-ভাষা বলিয়া, সম্মানের সিংহাসন পাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষা তাহারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ দুহিতা; আর বাঙ্গালিও, পরম্পরীণ সম্পর্কে, সেই পৃথ্বীপূজ্য বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস এবং পৌরব ও যাদব প্রভৃতিরই পরবর্ত্তী ভারতীয় আর্য্য। এই বঙ্গদেশেই এক সময়ে রঘুনাথ, রঘুনন্দন অভয়ানন্দ ও কালীশঙ্কর * প্রভৃতির পরমোজ্জ্বল প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছিল। যদি বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীরা, আপনাদিগের দায়িত্ব-বিষয়ে চিন্তা করিয়া, জাতীয়-সাহিত্য-গঠন-রূপ যশোগৌরবের কার্য্যে, একে অন্যের সুহৃৎ ও সহায় রূপে কার্য্য করেন, তাহা হইলে এই বঙ্গে এখনও কি না হইতে পারে, সে কথা কে কহিবে? কে এত বড় একটা মনঃশক্তি-সম্পন্ন মেধাবী জাতির সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সীমা রেখা নির্দ্দেশ করিবে?

* বেদান্তদর্শনের সহিত শঙ্করাচার্য্যের যে সম্পর্ক, অধুনাতন ন্যায়শাস্ত্রের সহিত রঘুনাথ শিরোমণির সেই সম্পর্ক। বেদান্তদর্শনের সূত্রকার বেদব্যাস, ভাষ্যকার শঙ্কর; ন্যায়দর্শনের সূত্রকার গৌতম, বৃত্তিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়, আর ব্যাখ্যাকর্ত্তা নবদ্বীপের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র নব্য ন্যায়ের প্রকৃত স্রষ্টা রঘুনাথ শিরোমণি। রঘুনাথের সেই গ্রন্থই চিন্তামণি-দীধীতি নামে আজি সমস্ত বঙ্গে,—সমস্ত ভারতবর্ষে, পঠিত পাঠিত এবং আলোচিত হইয়া থাকে। রঘুনাথের সদৃশ প্রতিভাশালী পণ্ডিত পৃথিবীতে অল্পই জন্মিয়াছেন। ইউরোপের কোন কোন পণ্ডিত রঘুনাথকে এমানুয়েল ক্যাণ্ট এবং উলিয়ম হামিল্টন অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণির প্রতিভান্বিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবিসমাজে যে আসনে কালিদাস, মনস্বিসমাজে সেই আসনে রঘুনাথ। রঘুনাথ বঙ্গে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, আজি এই বঙ্গভূমি ন্যায়দর্শনের জন্মভূমি বলিয়া ভারতে পূজা পাইতেছে। রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক। তাঁহার পিতৃস্থান পূর্ব্ববঙ্গ,—শিক্ষাস্থান নবদ্বীপ। রঘুনাথ এইক্ষণ নবদ্বীপের পণ্ডিত বলিয়াই সর্ব্বত্র সম্মানিত। রঘুনন্দনের প্রচলিত নাম স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য। তিনিও নবদ্বীপের পণ্ডিত এবং রঘুনাথের মত গৌরাঙ্গের সমকালবর্ত্তী। অভয়ানন্দ ও কালীশঙ্কর বিক্রমপুর সমাজের দুইটি বিখ্যাত রত্ন। অভয়ানন্দ বুদ্ধির প্রখরতায় পণ্ডিতদিগকে একবারে চমৎকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রচলিত নাম হইয়াছিল অভয়ানন্দ চমৎকার। কালীশঙ্কর এখনও কীর্ত্তির প্রভাবে সজীব রহিয়াছেন। তিনি ন্যায়ের কূট-রহস্য বিষয়ে যে সকল জ্ঞান-গর্ভ পত্রী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি কালীশঙ্করী পাতি নামে প্রধান নৈয়ায়িকদিগের দ্বারা পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে।

রাণা কুম্ভ।

যে সকল বীরপুরুষের শৌর্য্য এবং আত্মোৎসর্গের কাহিনী মিবার-রাজ্যের ইতিহাসে মহাকাব্যের সরসতা সঞ্চার করিয়াছে, তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণ, সংগ্রামসিংহ এবং প্রতাপসিংহ এই তিন জনই অগ্রগণ্য। মহারাণা কুম্ভকর্ণ মিবারের ইতিবৃত্তে যুগান্তর উপস্থিত করেন এবং মালব ও গুজরাটের মুসলমান নৃপতিগণের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া মিবারকে আর্য্যাবর্ত্তের মহাশক্তি রাজ্যনিচয়ের সমকক্ষ করিয়া তুলেন। কুম্ভের পৌত্র রাজপুতকুলচূড়া সংগ্রামসিংহ অসাধারণ নীতিকৌশলে মধ্য ভারতের হিন্দু ভূস্বামী এবং রাজন্যবর্গকে যুক্তসাম্রাজ্যের দৃঢ়বন্ধনে সুসম্বদ্ধ করিয়া হিন্দু প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্‌পদলাভের জন্য মোগল পাদসাহ বাবরের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হন। সংগ্রামসিংহের পৌত্র স্বদেশ-প্রেমিক প্রতাপসিংহ সগর্ব্বে মোগল পাদসাহের প্রাধান্যের প্রস্তাববাহী দূতকে প্রত্যাখ্যান করেন, এবং পার্ব্বত্য অরণ্যে আশ্রয় লইয়া অসাধারণ দৃঢ়তা এবং অলোকসামান্য সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বগ্রাসী সম্রাট্ সেনার করালকবল হইতে স্বাধীনতাধন রক্ষা করিয়া যান। আমরা "বান্ধবের" পাঠক পাঠিকাগণকে কুম্ভকর্ণের সামরিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপহার দিব।

মহামনা এবং মহাকর্ম্মা ঐতিহাসিক টডের প্রসাদে কুম্ভের কীর্ত্তিকলাপ পাঠক সমাজে অবিদিত নাই। টড্ সুপ্রসিদ্ধ "রাজস্থানের" মিবার বিবরণের অষ্টম অধ্যায়ে রাণা কুম্ভের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। কুম্ভের জীবনের প্রধান ঘটনা, মালব এবং গুজরাটের মুসলমান নৃপতিগণের সহিত সংগ্রাম। সেই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামেই কুম্ভের মহত্ত্বের পূর্ণবিকাশ; এবং রাজপুত সেনার দুর্জ্জয় পরাক্রমের ও মিবারের প্রজাসাধারণের অপরিসীম সহিষ্ণুতার জাজ্বল্যমান পরিচয়। টড্ এই যুদ্ধ ব্যাপারের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। মালব এবং গুজরাটের মুসলমান রাজগণের ইতিহাসে উহার তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মালব এবং গুজরাটের খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর সমসাময়িক কোন ইতিহাস এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ঐরূপ গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত প্রামাণিক পারস্য ইতিহাস গ্রন্থের অভাব নাই। আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণীর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, আকবর সাহেব বক্সী নিজামুদ্দীন আহম্মদ প্রণীত "তাবাকাত্-ই-আকবরী" হইতে প্রধানতঃ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। * কুম্ভের অভ্যুদয়ের কিঞ্চিন্ন্যূন

* "তাবাকাত্-ই-আকবরী"; লক্ষ্ণৌ নেওয়ালকিশোর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। লিথোগ্রাফ সংস্করণ।

সার্দ্ধশতাব্দীর পরে, ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে "তাবাকাত্-ই-আকবরী" গ্রন্থের রচনা পরিসমাপ্ত হয়। সুপ্রসিদ্ধ "তারিখ্-ই-ফিরিস্তা" এই "তাবাকাতের"ই অবলম্বনে, "তাবাকাতেরই" বিষয় বিন্যাস ভঙ্গীর অনুসরণে বিরচিত। নিজামুদ্দীনের "তাবাকাতে", রচনার বিশেষ কোন কারিগরি, অথবা বর্ণনার তেমন সজীবতা নাই। গ্রন্থকার মহোদয় আকবর সাহের সভাসদ্ হইলেও মুসলমানগণের সম্পর্কে একেবারে পক্ষপাতশূন্য নহেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে রচনাগত অসাবধানতার এবং বর্ণনাগত বিরোধের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। তথাপি মোটের উপর "তাবাকাত্-ই-আকবরীর" প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই; এবং গ্রন্থকারের ভ্রম প্রমাদের সংশোধনও দুষ্কর নহে।

১

১৪৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কুম্ভের রাজত্বকালের কোনও সাল নিঃসংশয়রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। চিতোরগড়ের একখানি শিলালিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, কুম্ভের পিতা রাণা মোকল ১৪২৮-২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও চিতোরের সিংহাসনারূঢ় ছিলেন।* সুতরাং কুম্ভ ১৪২৯ এবং ১৪৩৫ এই উভয় সীমার মধ্যে, কোন সময়ে, সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে কুম্ভের প্রধান শত্রু মামুদ খিল্‌জিও বলপূর্ব্বক মালবের সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনলাভ করিয়া কুম্ভ রাজ্যের সম্পদ এবং সামর্থ্যের উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতের যে সকল নৃপতি সুদৃঢ় দুর্গ এবং মনোরম প্রাসাদ ও স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন, কুম্ভ তাঁহাদের একজন অগ্রণী। কথিত আছে কুম্ভের আদেশে দ্বাত্রিংশৎ নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এই সকল দুর্গ মধ্যে কমলমীর* সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ এবং ইতিহাস-বিশ্রুত।

কুম্ভ অধিককাল মিবারের আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে চিত্তনিবিষ্ট রাখিতে পারিলেন না। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে মালবেশ্বর মামুদ মিবার আক্রমণ করিলেন। সারঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিয়া, একদল সুসজ্জিত সেনাসহ মামুদ দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মিবার রাজ্যে আপতিত হইলেন। সম্মুখ যুদ্ধে মালবপতির বিশাল বাহিনী নির্জিত করিতে পারেন, এরূপ সেনাবল কুম্ভের ছিল না। তাঁহার রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন,—দুর্গশ্রেণী। তিনি সুতরাং মামুদের গতিরোধ করিতে যত্ন না করিয়া, দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। মামুদ স্বচ্ছন্দে গ্রাম নগর লুণ্ঠন এবং দেবমন্দিরনিচয় ধ্বংস করিতে করিতে, ধীরে ধীরে, কমলমীর দুর্গ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

* "এপিগ্রাফিয় ইণ্ডিকা" ২য় ভলিউম, ৪১০ পৃ, এবং ৯নং নোট। টডের মতে কুম্ভ ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন।

* কমলমীর "কুম্ভলমেরু" নামের অপভ্রংশ।

কমলমীর দুর্গ আরাবল্লী শৈলশ্রেণীর একটি সু-উচ্চ গিরিপৃষ্ঠে অবস্থিত। দুর্জ্জেয় এবং দুর্গম বলিয়া তৎকালে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দেব অথবা দেবসিংহ নামক রাণার জনৈক সেনানী দুর্গ-রক্ষিগণের অধিনেতা ছিলেন। মামুদ যাইয়া কমলমীর দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গরক্ষীরা ঘোরপরাক্রমে অবরোধকারিগণের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন। দুর্গজয়ে বিফলমনোরথ হইয়া, মামুদ দুর্গের বহির্ভাগস্থ প্রাচীর পরিখা বেষ্টিত একটি দেবমন্দির অধিকারে মনোনিবেশ করিলেন।

মন্দিরটি অভিনব এবং আহার্য্য সামগ্রী ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল। এই সকল আহার্য্য এবং যুদ্ধ সামগ্রী সম্ভবতঃ দুর্গরক্ষিদের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরে নীত হইবার পূর্ব্বেই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়। মামুদ মন্দির অবরোধ করিলেন। মালব-সেনার দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া দুর্গে গমনাগমন অসাধ্য হইয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় মন্দির-প্রহরিগণ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত মন্দির রক্ষা করিল। অবশেষে, ক্রমে যখন ইহাদের সংখ্যা একেবারে হ্রাস হইয়া আসিল, তখন আর ইহারা মুসলমানগণের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে পারিল না। মন্দির মালবেশ্বরের হস্তগত হইল। এখনও যে কয়টি প্রহরী জীবিত ছিল, তাহারা যে পর্য্যন্ত না নিহত অথবা ধৃত হইল, ততক্ষণ যুদ্ধ করিল। জয়োল্লাসমত্ত মামুদ মন্দিরের দ্রব্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন, এবং মন্দির ও প্রাচীর ভস্মীভূত করিবার পরিপাটী ব্যবস্থা করিলেন। তৎপরে দেবমূর্ত্তি এবং দেববিগ্রহাদির সৎকার আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এবং বিগ্রহগুলিকে ওজনের প্রস্তররূপে ব্যবহার করিবার জন্য মাংসবিক্রেতাদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। নিজামুদ্দীন বলেন প্রধান মূর্ত্তিটির আকার নাকি ছাগের মত ছিল।* মামুদ সেই মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া চূণ প্রস্তুত করাইলেন, এবং সেই চূণ রাজপুত বন্দিগণকে তাম্বুলের সহিত চিবাইবার জন্য প্রদান করিলেন। এবার প্রতিমাদলনে আমাদের মামুদের কাছে গজনীর মামুদকেও হার মানিতে হইল। মন্দির ধ্বংস করিয়া মামুদ পুনরায় কমলমীর অধিকারে যত্ন করিলেন না। রাণার শক্তির মূলে আঘাত করিবার জন্য চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মিবারের সমভূমির মধ্যভাগে, যেন সমতল ক্ষেত্রের প্রহরীরূপে, একটি পর্ব্বত দণ্ডায়মান। পাদদেশে পর্ব্বতের পরিধি প্রায় ১২ মাইল। এই পর্ব্বতের শিরোদেশে চিরপ্রসিদ্ধ চিতোরগড়। পর্ব্বতের পাদপ্রান্তে চিতোরগড়ে আরোহণের পথ পরিরক্ষণার্থ একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। মামুদ এই দুর্গের সম্মুখীন হইবা মাত্র দুর্গরক্ষীরা তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কমলমীরের মন্দিরের প্রহরিগণের ন্যায় যতক্ষণ না ইহারা সদলবলে নিহত অথবা ধৃত হইল, ততক্ষণ মালব-সেনা অগ্রসর হইতে পারিল না।

* "বছুরত্-ই-গোস্পন্দ তরাশিদা-বুদ।"

পথের কণ্টক বিদূরিত করিয়া মামুদ সসৈন্য পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, এবং চিতোর অবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময়, গুপ্তচরগণ আসিয়া সংবাদ দিল, সেই দিবসই কুম্ভ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া,নিকটবর্ত্তী কোনও গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে থাকিয়া মালবসেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মামুদ, অমনই রাণাকে আক্রমণ করিবার জন্য, নানা দিকে দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কুম্ভও অন্তরালে থাকিয়া স্বয়ং মামুদকে আক্রমণের সুযোগ দেখিতে ছিলেন। মালব-সেনা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিয়া, সুলতানের অনুচরগণের উপর আপতিত হইলেন। কিন্তু মামুদকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। মালবেশ্বরকে বিপন্ন দেখিয়া ক্ষিপ্রগতি সমগ্র মালব-সেনা আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠবল হইল। রাণা বিফলমনোরথ হইয়া চিতোরের প্রাচীরাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। অগণিত মালব-সেনা তাঁহার দুর্গ প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিতে পারিল না। এই ক্ষুদ্র ঘটনায় আমরা কুম্ভের অসামান্য সেনাচালন-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

কুম্ভ দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। মামুদের সেনাদল চিতোরগড় পরিবেষ্টন করিল। সমগ্র মিবার রাজ্য এখন মামুদের কৃপাধীন। প্রতিদিন দলে দলে মালবসেনা যাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমভূমিস্থিত গ্রামনিচয় এবং শস্যক্ষেত্র লুণ্ঠন ও দলন করিতে লাগিল। সুলতানের আদেশে মালব হইতে আর এক দল সৈন্য আসিয়া মিবারের সীমান্তবর্ত্তী মান্দিসর প্রদেশ অধিকার করিল। কুম্ভ দুর্গ মধ্যে যেন নিশ্চেষ্ট। ক্রমে বর্ষা ঋতু আসিয়া উপনীত হইল। এখন মালবসেনার পক্ষে প্রাচীরের নিম্নে অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অগত্যা মামুদ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি উপত্যকায় যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। বর্ষা এবং শরতে পরস্পরের এত নিকটে থাকিয়া উভয় সেনা কি ভাবে কালযাপন করিল, সে বিষয়ে নিজামুদ্দীন একেবারে নীরব।

১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, আমরা চিতোরগড়ের বহির্ভাগে শিবিরে পুনরায় কুম্ভের সাক্ষাৎ লাভ করি। সেইখান হইতে একদিন রজনীযোগে তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহী এবং ষট্‌সহস্র পদাতি লইয়া মামুদের শিবির আক্রমণ করিলেন। সদাসতর্ক মামুদ এইরূপ বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং রাণা ব্যর্থমনোরথ হইয়া শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লাভের মধ্যে এই নৈশযুদ্ধে বহুসংখ্যক অনুচর হারাইয়া আসিলেন। আর এক দিন রজনীতে কুম্ভের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মামুদ রাজপুত শিবির আক্রমণ করিলেন। নৈশ অন্ধকারে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দুর্ভাগ্য ক্রমে রাণা স্বয়ং আহত হইয়া দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। "বহুসংখ্যক রাজপুত তরবারির ভক্ষ্য হইল। প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য হস্তগত হইল।" এইবার পুনরায় মামুদ চিতোরগড় অবরোধ করিবেন। কিন্তু মামুদ জয়লাভ করিয়া যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহার

ারণ নির্ণয় করা আমাদের অসাধ্য। নিজামুদ্দীন লিখিয়াছেন, "মামুদ জয়লাভের জন্য রমেশ্বরকে যথাবিধি ধন্যবাদ প্রদান করিলেন; এবং দুর্গবিজয় বর্ষান্তরের জন্য স্থগিত াখিয়া, স্বীয় রাজধানী সাদিয়াবাদ (মণ্ডু) ত্যাবৃত্ত হইলেন।" এইরূপে সুলতান ামুদের প্রথম অভিযানের উপসংহার হইল। সুলতান মান্দিসর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, অথবা কিয়ৎকাল পরে রাণা ঐ প্রদেশটি পুনরপি অধিকার করিয়া লইলেন।

২

ইহার পর পূর্ণ তিনটি বৎসর, মিবারেশ্বর মিবারসহ শান্তিসুখভাগী হইতে পাইলেন। কর্ম্মবীর কুম্ভ এই অবকাশ বৃথা ক্ষেপণ করিলেন না। মিবারের সেনাদল বর্দ্ধিত হইল। এবার আর রাণা নিশ্চেষ্টভাবে দুর্গ মধ্যে নিরুদ্ধ থাকিবেন না। এবার পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া অবরোধকারীকে নির্জ্জিত করিতে পারিবেন। ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মামুদ দ্বিতীয়বার মিবার আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। এযাত্রা মণ্ডলগড় লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন।

মণ্ডলগড় মিবারের পূর্ব্ব সীমাস্থ শৈলশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। বনস নদ মণ্ডলগড়ের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। মামুদ রন্তম্ভর হইতে রওয়াণা হইয়া অবিশ্রামগতি বনসের তীরে উপনীত হইলেন। রাণা দুর্গের বহির্ভাগে থাকিয়া মালবসেনার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; মামুদের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী সেনাদল নয়নপথে পতিত হইবামাত্র দুর্গে প্রবেশ করিলেন। নিজামুদ্দীন লিখিয়াছেন, "যখন রাণাকুম্ভ সুলতানের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না, তখন দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন।" আমাদের মনে হয়, তখন বেলা শেষ হইয়া আসিতেছিল, এবং কুম্ভও ভালরূপে শত্রু পক্ষের বলাবল না বুঝিয়া সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না; তাই তিনি সে দিন কার জন্য পশ্চাৎপদ হইলেন। তার পর নিজামুদ্দীন লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিবস রাজপুতগণ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অসাধারণ পরাক্রম প্রদর্শন করিল।".

আমাদের গ্রন্থকার যখন রাজপুত-মুসলমানে কোন যুদ্ধের উল্লেখ করেন, তখন রাজপুত পক্ষের পরাজয় অথবা রাজপুত সেনার নিধনের কথা বলিতে বিস্মৃত হয়েন না। কিন্তু মণ্ডলগড়ে দুই দিবসব্যাপী যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই লিখেন নাই। উপসংহারে লিখিয়াছেন, "অবশেষে রাণা আনুগত্যের পথ অবলম্বন করিয়া 'পেস্‌কস্' * প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। সুলতান খিল্‌জিও তখন স্বীয় হিত চিন্তা করিয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দান করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন।" † মুসলমান ঐতিহাসিকের অস্ফুট ভাষার জীবন্ত ভাষ্যরূপে চিতোরের সুমহান্ জয়স্তম্ভ দণ্ডায়মান। হিন্দুর নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যের এই

* উপঢৌকন অথবা কর।

† 'বনাবর সলাহ্-ই-ওয়াক্‌ত্"—সেই সময়ের হিতের নিমিত্ত।

অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্তকাল রাজপুত সেনার জয়লাভের সাক্ষ্য দান করিবে। *

মণ্ডলগড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর দশ বৎসরের মধ্যে, মামুদ মিবারে কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত করিলেন না। এবং রাণাও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনের জন্য সুদীর্ঘ অবকাশ পাইলেন। কিন্তু এই শান্তি, প্রবল ঝটিকার প্রাক্‌কালীন প্রকৃতির শান্তনিস্পন্দভাবের ন্যায়, ভাবী উপপ্লবের বিজ্ঞাপক। দশ বর্ষব্যাপী শান্তির পরে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইল, তাহাতে এক সময়ে মিবার রাজ্য ভস্মীভূত এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। রাণা স্বয়ং এই উপপ্লবের সূচনা করেন ; এবং শিল্পক্ষেত্রে জয়স্তম্ভের ন্যায়, ইহার করালগ্রাস হইতে রাজ্যোদ্ধার কার্য্যই তাঁহাকে ইতিহাসে উচ্চ আসনলাভের অধিকারী করিয়াছে।

৩

খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যভারতের দুই প্রধান রাজশক্তি, মালবে এবং গুজরাটে। মধ্যভারতের অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যনিচয়ের কেহ বা ইহাদের অন্যতরের অধীন, কেহ বা ইহাদের ঔদাসীন্যরূপ কৃপাভাগী হইয়া স্বাধীন। এই দুইয়ের মধ্যে আবার মালব মামুদের শাসনাধীন থাকিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এখন দিল্লীর সৈয়দ অথবা লোদী, জৌনপুরের সার্কি কিংবা দাক্ষিণাত্যের বাহমণি, ইঁহারা কেহই মালবের খিল্‌জির সমকক্ষ নহেন। এই সময়ে মালবের প্রতাপ-সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে আরূঢ়, তখন একজন ক্ষুদ্র রাজপুত নৃপতি বারংবার মালবেশ্বরের সমগ্র শক্তির সংঘাত সহ্য করিয়া আত্মপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইলেন, এ দৃশ্য অবশ্যই প্রতিবেশিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বস্তুতঃ তদবধি মিবার মধ্যভারতের প্রধান রাজশক্তি মধ্যে গণনীয় হইয়া উঠিল। †

(ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ।

* কুম্ভের "জয়স্তম্ভ" মণ্ডলগড় আক্রমণের দুই বৎসর পরে সমাপ্ত হয়। বিশ্বকোষ, ১২শ খণ্ড, ১২২ পৃঃ।

† এ দেশে এখন যেমন ইংরেজীশিক্ষার প্রচলন, ষাইট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে, দেশীয় ভদ্রসমাজে ফারসী শিক্ষারও সেইরূপ প্রচলন ছিল। আদালতের আরজী ও বর্ণনাপত্র, সাক্ষীর জবানবন্দী, হাকিমের রায়, এবং পুলীশের তদারকী রিপোর্টও তখন ফারসীতে লিখিত, পঠিত ও আলোচিত হইত ; এবং যে সকল ভদ্রলোক ফারসী ভাষায় অনভিজ্ঞ, অন্তঃপুরের মেয়েরাও তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত অথবা অনক্ষর মূর্খ জ্ঞানে ঘৃণা করিত। দেশের ভদ্রলোক মাত্রই, এই হেতু, ফারসী শিখিতেন বটে,—ফারসীতে পত্র লিখিতেন, ফারসীতে একে অন্যের সহিত আলাপ করিতেন, এবং "লায়লা মজনুর কেচ্ছা" অথবা ঐরূপ কোন উপন্যাসের কথা লইয়া পাঁচ ইয়ারের মধ্যে প্রণয়-রসিকতার ঢেউ তুলিতেন ; কিন্তু কেহই প্রায়শঃ কখনও পারস্য-ভাষায়-লিখিত ইতিহাস গ্রন্থনিচয়ের একটি ছত্তর লইয়াও কোনরূপ আলোচনা করিতেন না। ইদানীং, বাঙ্গালা-সাহিত্যিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ, ফারসী শিক্ষা করিয়া, এ দেশের ইতিহাসের উপর একটা অভিনব আলোক প্রদানের জন্য যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও পরিশ্রমে, ভারতীয়-পুরাবৃত্তের অনেক পরিচ্ছেদ ধীরে ধীরে কিরূপ পরিশোধিত হইতেছে, তৎপ্রতি বিজ্ঞ পাঠকমাত্রেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রার্থনীয়। (বান্ধব-সম্পাদক)

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"ঊষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গা স্নান,
অদ্বৈত-সভায় আসি হন উপস্থান।"

আমরা প্রমোদ-চাপল্য-মুগ্ধ গৌরাঙ্গকে ক্ষণকালের তরে আমাদিগের প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, এই অধ্যায়ে, বিশ্বরূপকে আর একটুকু বেশী করিয়া বুঝিতে যত্নপর হইব ; এবং বিশ্বরূপের উপলক্ষে আরও একটি নূতন লোকের সহিত পাঠকের পরিচয় করাইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্বরূপ তাঁহার পোনর বৎসর বয়সের সময়েই ভক্তিশাস্ত্র ও যোগ-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে অবধি ভক্তির পথে পথিক, সেই হইতেই তাঁহার হৃদয় বঙ্গে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রথম-প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্যের দিকে একটু বেশী অনুরক্ত। তিনি ঊষাকালে গঙ্গা-স্নান করিয়া অদ্বৈতের কাছে চলিয়া যাইতেন ; এবং অদ্বৈত-সভায় উপস্থিত থাকিয়া, ঠিক একটি বিয়োগ-দুঃখকাতর বিবেকী তাপসের ন্যায়, ভক্তির নিগূঢ় সাধনাবিষয়ে নানা শাস্ত্র লইয়া নিমগ্ন থাকিতেন।

গৌরাঙ্গের ইতিহাসে আমরা অদ্বৈত ও অদ্বৈত-সভার নাম এই প্রথম শুনিলাম। অদ্বৈত কে ?—আর অদ্বৈত-সভাই বা কি ? অদ্বৈতের সহিত গৌর-লীলার বিশেষ সম্বন্ধ কিসে ? শচী ও জগন্নাথের জীবন-সর্ব্বস্ব বিশ্বরূপ কি কারণে অদ্বৈতের প্রীতিতে এত বেশী আকৃষ্ট ? এ সকল কথার আনুপূর্ব্বিক আলোচনা না করিলে, এই ইতিহাস অনেক স্থলেই অর্থশূন্য বোধ হইতে পারে। সুতরাং, এখানে সর্ব্বাগ্রেই অদ্বৈত ও অদ্বৈত-সভার একটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, পদ-চারণ-পথে, বার কি তের মাইল দূরে, শান্তিপুর। শান্তিপুরও বঙ্গদেশে একটি সুপরিচিত স্থান। এই স্থান, বহুকাল হইতেই, কিঞ্চিদংশে গ্রামের মত, কিঞ্চিদংশে নগরের মত। গৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, তাহার পোনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে, কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্য নামক একজন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শান্তিপুর নগরে বড় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের আবির্ভাব সময়ে কমলাক্ষের *

* "ওহে প্রভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল। তুয়া লাগি ধরাধাম এ দাস আইল।"
অদ্বৈত-প্রকাশ নামক একখানি অভিনব-প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে এই দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহার দ্বারাই জানা যায় যে, অদ্বৈত গৌরাঙ্গ হইতে বয়সে ৫২ বৎসর বড়।

বয়স বায়ান্ন কি তিপ্পান্ন। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ কি ছয়ত্রিশ। তিনি বয়সে জগন্নাথ মিশ্র হইতে দুই তিন বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায়, কমলাক্ষেরও পূর্ব্ব-নিবাস, পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত, কমলানুগৃহীত, শ্রীহট্ট প্রদেশ। পুণ্যকীর্ত্তি ও প্রিয়দর্শন শ্রীহট্ট, এক সময়ে, বঙ্গের মুখোজ্জ্বল স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল; এবং এখনও উহা,—গৌরাঙ্গ ও অদ্বৈতের ইতিহাস-সম্পর্কে বৈষ্ণবের,—আর প্রকৃতির প্রশান্ত-মধুর শোভা-সম্পর্কে,—কবি ও বৈজ্ঞানিকের, আরাধ্য তীর্থ। শ্রীহট্টের অনতিদূরে এবং শ্রীহট্টেরই অধিকারে, লাউর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। কমলাক্ষ যে কালে প্রকট হন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে, লাউরের অধীশ্বর ছিলেন রাজা দিব্য সিংহ, আর রাজধানী ছিল নবগ্রাম নামক একটি রমণীয় গ্রামীণ নগর। কমলাক্ষ সেই নবগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম লাভাদেবী।* কমলাক্ষ তাঁহার পিতা মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। কুবের পণ্ডিত, তীর্থকামনায়, কখনও কখনও, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহিত, শান্তিপুরে যাইয়া বাস করিতেন, এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া, পুনরায় নবগ্রামে ফিরিয়া যাইতেন। কমলাক্ষ সম্ভবতঃ শান্তিপুরেই জননীর জঠরস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের কিছু দিন পরেই, কুবের পণ্ডিত, শ্রীহট্টের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; এবং গঙ্গাবাসের অভিলাষে, শান্তিপুরেই বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া গৃহস্থালী করিতে আরম্ভ করিলেন।

কুবের পণ্ডিতের কিছু বেশী ধন সম্পত্তি ছিল। তাঁহার শান্তিপুরের বাসভবন তদানীন্তন বৈষ্ণব-গ্রন্থে অট্টালিকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অট্টালিকা, অপরূপ প্রাসাদ না হইলেও, অবশ্যই সুখ-বাস-যোগ্য ইষ্টকালয় ছিল। কমলাক্ষ, এই হেতু, তাঁহার শৈশব হইতেই, শান্তিপুরের সুখ-সামগ্রীর মধ্যে সুখ-সম্ভোগে সংবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু, নিয়তি অথবা প্রকৃতির গতিকে অতিক্রম করা কাহারও ক্ষমতায়ত্ত নহে। কমলাক্ষ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যা-রসে বিভোর,—জ্ঞানের অতৃপ্ত-পিপাসায় আকুল। তিনি যে অবধি বুঝিয়া শুঝিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ, সেই অবধিই অহোরাত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট। শান্তিপুরে সকলেই তাঁহাকে জানিতে পাইল। তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি যৌবনের প্রথম-স্ফূর্ত্তি-সময়েই এক জন সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন। তাঁহার পিতা কুবের পণ্ডিত ও মাতা লাভাদেবী, বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক-বিধানে, ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই ইহার কিছু দিন পরে, মানবলীলা সংবরণ করিলেন। কমলাক্ষ তখন উদীর্ণ ও উদ্দাম যুবা, এবং সংসারে একা। শাসক নাই, অভিভাবক নাই; অথচ সুখ-সামগ্রীরও অভাব নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে, এ অবস্থায়, অনায়াসেই তখন সাংসারিক ভোগ-বিলাসে একবারে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন। ভোগ-লালসা জীবমাত্রেরই জীবনের প্রবর্ত্তনী। মনুষ্য-জীবনও প্রধানতঃ উহা দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে; এবং ভোগ্য বস্তু কাছে না রহিলেও, মনুষ্য বুভুক্ষু ভুজঙ্গের ন্যায়, সাধারণতঃ উহারই অন্বেষণে আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। কমলাক্ষের ঘুরিয়া বেড়াইবারও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, নবোদ্গত যৌবন, নয়নাভিরাম রূপ, নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব ও পিতৃ-সঞ্চিত অর্থসম্পত্তির প্রসাদাৎ সকল প্রকার ভোগ্যই নিরন্তর তাঁহার সন্নিহিত ছিল। কিন্তু তাঁহার মতিগতি শৈশবাবধিই অন্যরূপ। তিনি, তাঁহার স্বাধীন-জীবনের ঐ সুপ্রভাত-সময়ে, সকল কার্য্যের অগ্রে, জনক-জননীর সদ্গতির জন্য, গয়ায় যাওয়াই প্রধান কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন; এবং তাঁহার সংসারের ভার একজন সুযোগ্য প্রতিবেশীর হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া, ইষ্টনাম লইতে লইতে, একাকী বাড়ীর বাহির হইলেন। শান্তিপুরের অনেকেই বিস্মিত হইল। অনেকের মনে যুবার প্রতি প্রকৃতই একটুকু ভক্তি জন্মিল। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ দুঃখ অনুভব করিল। শান্তিপুরবাসী কোন ব্যক্তিই, সাত আট বৎসরের মধ্যে, কমলাক্ষের আর কোন সংবাদ পাইল না।

* ভক্তিরত্নাকর-প্রভৃতি পুরাতন-গ্রন্থ অনুসারে অদ্বৈতের মাতৃদেবীর নাম নাভা। নব্য গ্রন্থকারেরা নাভা স্থলে লাভা লিখিতেছেন। ইহার কোন্‌টি প্রকৃত নাম কে নিশ্চয় করিবে?

কমলাক্ষ আগে গয়ায় যাইয়া পিতৃকার্য্য করিলেন;—তার পর, ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর প্রদেশের নানা তীর্থে, ও নানা আশ্রমে, জ্ঞান ও ভক্ত-জ্ঞানীর অন্বেষণে, আকুল-প্রাণে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তখনকার তীর্থ-ভ্রমণ, শরীর ও মনের সামর্থ্য, এবং মাহাত্ম্য ও মনস্বিতার প্রত্যক্ষ-নিদর্শন। যাঁহারা দশ জনের মধ্যে কোন না কোন অংশে অসাধারণ, তাঁহারাই তখনকার দিনে ভারতীয় তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইতেন। আত্মস্থির কমলাক্ষ, তাঁহার প্রথম বয়স হইতেই, সর্ব্বাংশে অলোক-সাধারণ ও উন্নত-চরিত্র। তিনি, তাঁহার জীবন ও যৌবনের, সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, কএকটি বৎসর, প্রাণের কি এক পিপাসায়, তীর্থে তীর্থে, কার যেন পদচিহ্নের অন্বেষণে, পরিভ্রমণ করিতে রহিলেন; এবং সেই অশ্রান্ত ভ্রমণের মধ্যেও, স্থানে স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন মঠে, জ্ঞান ও ভক্তি-প্রসঙ্গে নানাবিধ নূতন ও নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া, অল্পদিনের মধ্যেই, সর্ব্বাংশে বড় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়স যখন সম্ভবতঃ ত্রিশের সন্নিহিত, তখন তাঁহার স্বদেশ-বৎসল প্রাণটা শান্তিপুরের জন্য আবার বড় আকুল হইল। শান্তিপুরের সৌহার্দ্দ-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ের উপর বড় বেশী কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন; এবং সেখানে কিছু কাল, আপনার শূন্য-গৃহে, শূন্য-হৃদয়ে, স্বর্গ-গত পিতা মাতার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, বুকের আগুন নিবাইতে যত্ন করিলেন।

শান্তিপুরের সকলেই আসিয়া গৃহ-প্রত্যাগত পণ্ডিত কমলাক্ষকে ঘেরিয়া বসিল। কমলাক্ষ, দেশদেশান্তরের নানাবিধ কাহিনী শুনাইয়া, সাধারণতঃ সকলেরই প্রীতি জন্মাইলেন ;—যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহাদিগকে তত্ত্ব জ্ঞান, যোগ-ভক্তি এবং ভক্ত ও যোগীদিগের সাধনভজনা বিষয়ে বহুবিধ আলাপে চমকিত করিলেন। * কমলাক্ষ সে সময়ে একটুকু বেশী মাত্রায় জ্ঞানাভিমানী। কিন্তু, তাঁহার জ্ঞানের পিপাসা নিতান্ত প্রবল হইলেও, নিঃসার-তুষবৎ নীরস-জ্ঞানে কোন দিনই তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও সেই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়কে যুড়িয়া বসিয়াছিল। সুতরাং, তাঁহার হৃদয়ে, এই দু'য়ে, মাঝে মাঝেই বড় বিরোধ ঘটিত। তিনি ভারত ভ্রমণ করিয়া ইহাই বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে, যিনি ব্রজধামে, কৃষ্ণনামে, প্রকাশিত হইয়া, জীবনের বিবিধ-লীলায়, জীবের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিলেন, তিনি নিত্য সত্য পূর্ণব্রহ্মের পার্থিব অবতার ; এবং সেই কৃষ্ণ, সেই করুণাময় দীনবন্ধু, সেই কাঙ্গালের ধন বাসুদেব, গীতায় জগদ্বিখ্যাত অর্জ্জুনকে, ও তদনন্তর ভাগবত-পুরাণের উদ্ধবকে, ভক্তিযোগের যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই জীবের পরম ধর্ম্ম,—তাহার অনুষ্ঠানেই জীবাত্মার চরম উদ্ধার।

সাতটি সমৃদ্ধ গ্রাম লইয়া সুবিখ্যাত সপ্তগ্রাম,এবং তাহারই একটি গ্রামের নাম নারায়ণপুর। নারায়ণপুরে নৃসিংহ ভাদুড়ি নামে একজন সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র ছিলেন। তাঁহার দুইটি বিবাহযোগ্যা বালিকা ছিল। জ্যেষ্ঠার নাম সীতা, কনিষ্ঠার নাম শ্রী। সীতা ও শ্রী দুইই পরমা সুন্দরী এবং প্রায় সমান-বয়স্কা হেতু পরস্পর-প্রণয়-সহচরী। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবাহ হইতেছে না। নৃসিংহ, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বড় পাইতেছেন না বলিয়া, কন্যা দান করিতে পারিতেছেন না। কমলাক্ষ যখন তীর্থভ্রমণের পর দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন নারায়ণপুর-নিবাসী নৃসিংহের কাছেও তাঁহার অশেষ যশের কথা পঁহুছিল। নৃসিংহ শান্তিপুরে যাইয়া কমলাক্ষের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় করিলেন, এবং কমলাক্ষের নয়ন-মনোহর আকৃতি দেখিয়া যার-পর-নাই প্রীত ও মোহিত হইলেন। কমলাক্ষ যেমন সমুজ্জ্বল-মূর্ত্তি সুরূপ যুবা, তেমনই সুপণ্ডিত, সুশীল, সুমধুর-ভাষী এবং সম্পদশালী কুলীন। কন্যার পিতা বরে আর কি কামনা করিতে পারে? বলা বাহুল্য, কুলশীল-সম্পন্ন নৃসিংহ, এই সকল কারণে, কমলাক্ষকে একান্ত বরণীয় পাত্র মনে করিয়া, তাঁহার দুইটি কন্যাই এক সঙ্গে তাঁহাকে দান করিলেন ; এবং পণ্ডিত কমলাক্ষও, গৃহবাসী

* কমলাক্ষ পণ্ডিতের জীবন ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ে পুরাতন ও নূতন গ্রন্থপত্রে বিশেষ ঐক্য নাই। থাকিবার বিষয়ও নহে। আমি সেই বিভিন্ন বৃত্তান্তের মধ্যে যে টুকু ভাল এবং পূর্ব্বাপর-কথার সহিত সুসঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহারই সার মাত্র এখানে সংকলন করিয়াছি। লেখক।

ইয়া, উৎসাহের সহিত টোল খুলিলেন। তাঁহার নিকট চারি দিক্ হইতে বহু ছাত্রের সমাগম হইতে লাগিল। তিনি রীতিমত অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যথা ভক্তি-রত্নাকরে,—

শ্রীঅদ্বৈত-গুণমণি, সকল রসের খনি
নাভা-গর্ভে জনম লভিলা ;
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলসিয়া রঙ্গে,
কিছু দিনে শান্তিপুর আইলা।
পিতা মাতা অদর্শনে, গিয়া তীর্থ-পর্য্যটনে,
আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে,
হৈয়া শ্রী-সীতার পতি, কত তপ করি নিতি,
আনিলেন কৃষ্ণ-হলধরে।

নৃসিংহের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীঠাকুরাণী, এখানে ছেলের অনুরোধে, জ্যেষ্ঠার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু, অন্যান্য পুস্তকের লেখা অনুসারে, সীতাই জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ঘরের প্রধানা গৃহিণী। সীতা আর শ্রী, সপত্নী হইলেও, চিরজীবনই একে অন্যের গলায় গলায় গাঁথা ছিলেন, এবং তাদৃক্ তেজঃপুঞ্জ স্বামীর প্রেম ও ধর্ম্মের সঙ্গিনী হইতে পারিয়াছিলেন।

কমলাক্ষ শর্ম্মার দার-পরিগ্রহের কএক বৎসর পরে, শান্তিপুর গ্রামে, অকস্মাৎ এক দিন একটা আনন্দের ঢেউ উঠিল। শীতের শেষ ভাগে, মাঝে মাঝে লোকে, বসন্ত-সমীরের আকস্মিক ও অচিরস্থায়ী সুখ-সমাগমে, পুলকিত হয়। শান্তিপুরের অধিবাসীরাও, এক দিন অকস্মাৎ, সেইরূপ সুখ-সমীর-হিল্লোলবৎ, আনন্দের হিল্লোল অনুভব করিয়া, প্রাণে একটু শীতল হইল। শান্তিপুর গ্রাম, একটি প্রকৃত ভক্তপুরুষের পদ-ধূলি-স্পর্শে, কেমন এক প্রকার কৃতার্থতা লাভ করিল। প্রকৃত মণি—স্পর্শে শীতল। প্রকৃত প্রেমিক-ভক্ত—দর্শনেও আনন্দপ্রদ। তাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, আত্ম-পর-বিচার নাই, হৃদয়ে কোনরূপ জ্বালা নাই। যেমন দেবতার দর্শন জীবের পক্ষে নিষ্ফল হয় না, ঐরূপ প্রেমিক-ভক্তের দর্শন-লাভও কোন কালেই কাহারও পক্ষে একবারে নিষ্ফল হইতে পারে না। কোন শ্রেণির মনুষ্যই, তাঁহাদিগের কাছে যাইয়া, একবারে রিক্ত-হৃদয়ে ফিরিয়া আইসে না। কেহই, ঐরূপ প্রসন্নমূর্ত্তি সাধুদিগের প্রাণ-শীতলা পীযূষ-দৃষ্টির সন্নিহিত হইয়া, প্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ না করিয়া যায় না। আমরা অদ্য যে প্রাতঃস্মরণীয় ও পূজাস্পদ ব্যক্তির কথা লিখিতেছি, তিনিও ঐ শ্রেণির ভক্তপুরুষ,—ভক্তির অমৃত-স্পর্শে সতত আনন্দে বিভোর। পাঠক কখনও বিখ্যাত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরীর নাম শুনিয়াছেন কি? সেই মাধবেন্দ্রই, এক দিন 'দৈবযোগে', শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং শান্তিপুরের অতিপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত, অমল-স্বভাব কমলাক্ষের ঘরে ভিক্ষার আমন্ত্রণ * গ্রহণ করিলেন।

* বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষান্নের দ্বারা দেহ-রক্ষা করেন, ইহাই তাঁহাদিগের ব্যবহার-ধর্ম্ম। সুতরাং, তাঁহারা কোন ভক্তের গৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে, সে আমন্ত্রণও ভিক্ষার আমন্ত্রণ বলিয়াই বর্ণিত হইয়া থাকে।

মহাত্মা মাধবেন্দ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তখন সুপরিচিত। লোকে তাঁহাকে ভক্তি-শাস্ত্রের অদ্বিতীয় গুরু বলিয়া পূজা করিত; এবং তিনি যখন, কৃষ্ণপ্রেমের উদ্বেলতায়, নয়নজলে ভাসিয়া, ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দান করিতেন, তখন যে তাঁহার কাছে থাকিত, সেই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িত। এই ঋষিকল্প সাধু, যেন কৃষ্ণবিরহে উন্মত্তের ন্যায়, দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; এবং তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেন, সেই স্থানেই ভক্তির এক একটি পুষ্পিত পাদপ রোপণ করিতেন।

চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা কবিরাজ-গোস্বামী এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে বঙ্গের প্রেম-ভক্তি-রূপ অভিনব কল্পতরুর মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"জয় শ্রীমাধব পুরী কৃষ্ণ-প্রেম-পূর,
ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর।"

কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী চরিতাখ্যায়ক ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময়-কলেবর,
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।
কৃষ্ণরস বিনা আর নাহিক আহার,
মাধবেন্দ্র পুরী দেহে কৃষ্ণের বিকার।

* * * *

ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার
শ্রীগৌরাঙ্গ কহিয়াছেন বার বার।" *

এই দুই প্রসিদ্ধনামা প্রামাণিক লেখক, মাধবেন্দ্রকে, কি ভাবে, কি অর্থে, গৌরলীলাময় ভক্তিকল্পতরুর 'প্রথম অঙ্কুর' অথবা ভক্তি রসের 'আদি সূত্রধার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই কথা, আপাততঃ একটুকু নীরস প্রতীয়মান হইলেও, এই ইতিহাসে অত্যাজ্য।

ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবেরা বহুকাল হইতেই বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি সংস্কার আছে যে, সম্প্রদায়ের আশ্রয়-গ্রহণই সিদ্ধি-লাভের প্রথম সোপান; এবং যাঁহারা কোন প্রকার সম্প্রদায়ের ছায়া না লইয়া স্বতন্ত্রভাবে সাধনা করেন, তাঁহাদিগের সমস্ত সাধনা ভস্মে আহুতি প্রদান। এই মতাবলম্বীরা উল্লিখিতরূপ মত ও বিশ্বাসের পোষকতায়, পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। যথা,—

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রা স্তে নিষ্ফলা মতাঃ,
অতঃকলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।"

ইহার অর্থ এই,—সম্প্রদায়-সম্পর্ক-বিহীন মন্ত্র সকল নিষ্ফল, অর্থাৎ সে সকল মন্ত্র জপ করিলে, তাহাতে কোন ফল হয় না; অতএব কলিতে চারি জন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক প্রাদুর্ভূত হইবেন।

এই চারি সম্প্রদায়ের নাম শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক। ইহা সকলেই জানেন যে, সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক। কিন্তু, সেই অসংখ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে পদ্মপুরাণোক্ত চারিটি সম্প্রদায়ই ইদানীং বিশেষ পরিচিত, এবং এখনকার বৈষ্ণবেরা ইহারই কোন না কোন শাখা কিংবা উপশাখার আশ্রিত। যথা, পদ্মপুরাণে,—

"শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥

অর্থাৎ,—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক এই চারিজন ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণব, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে অবতীর্ণ হইবেন।

উল্লিখিত শ্লোকে, শ্রী শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা, রুদ্র শব্দের অর্থ মহাদেব এবং সনক শব্দের অর্থ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। কিন্তু, লক্ষ্মী, ব্রহ্মা অথবা মহাদেব, কিরূপে পৃথিবীতে আসিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিবেন? এই নিমিত্ত পুনরায় উক্ত হইয়াছে,—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঞ্চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"*

অর্থাৎ,—লক্ষ্মী রামানুজকে, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, মহাদেব বিষ্ণুস্বামীকে, এবং সনকাদি চতুঃসন নিম্বাদিত্যকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের অভিলাষে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং, শ্রী সম্প্রদায়ের প্রচলিত নাম রামানুজ সম্প্রদায়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের প্রচলিত নাম মধ্বচারিসম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায়ের প্রচলিত নাম বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়, এবং সনক-সম্প্রদায়ের প্রচলিত নাম নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়।

এখানে রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যেরই একটুকু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিষ্ণুস্বামী কিংবা নিম্বাদিত্যের সহিত এই ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

আমাদিগের পাঠকের মধ্যে অনেকেই অবশ্য রামানুজ-দর্শনের নাম শুনিয়াছেন। এই রামানুজ-স্বামীই রামানুজ-দর্শনের রচয়িতা, এবং শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় বেদান্ত-দর্শনের আর এক প্রসিদ্ধ ভাষ্যকর্ত্তা। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য, এবং জগতে আমরা আর যাহা কিছু দেখিতেছি, তত্তাবৎ সমস্তই মায়ার ধাঁধা অথবা অসত্য। রামানুজ, শঙ্করাচার্য্যের মত অত বড় লোক না হইলেও, ভারতবর্ষের একটি অতি বড় বিখ্যাত লোক। ইদানীং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, এবং তিনি শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত-প্রতিবাদী বলিয়া জগতে একজন উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক রূপে সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে পদার্থ তিন প্রকার;—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর, এবং এই তিনই সত্য পদার্থ।* যাহাকে লোকে জীব অথবা জীবাত্মা বলে, তাহার সাধারণ নাম চিৎ;—জড় বস্তুর নাম অচিৎ, এবং যিনি,

* চৈতন্য ভাগবত, আদি খণ্ড—৮ম অধ্যায়।

* শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রিত শ্রীমদ্বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রণীত-প্রমেয়-রত্নাবলী-ধৃত-পদ্মপুরাণ-বচনম্। এই বলদেব একজন বড় পণ্ডিত। ইনি ব্যাস-প্রণীত বেদান্ত-সূত্রের অতি বিশদ ভাষ্য করিয়াছেন, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অতি সুচারু ব্যাখ্যা রচনা করিয়া আপনার শক্তি ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

* রামানুজের এই সিদ্ধান্ত ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ষোড়শ ও সপ্তদশ শ্লোকের দ্বারা অতি সুন্দররূপে সমর্থিত দৃষ্ট হয়।

চিৎ ও অচিৎ হইতে অভিন্ন হইয়াও, ভিন্ন, তিনিই জগতের নিয়ামক জগদীশ্বর হরি।

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, রামানুজ-সম্প্রদায়ের এই মত, অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধ হইলেও, সম্পূর্ণরূপে বিরুদ্ধ নহে। কেন না ইহাতে মায়াবাদের গন্ধ না থাকিলেও, জগদীশ্বরের সহিত জীব ও জড় জগতের সম্পূর্ণ অভেদ নাই।

মধ্বাচার্য্য ভক্তির পথে আর একটুকু বেশী অগ্রসর। তিনি মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি জগতের নিয়ামক জগদীশ্বর হরিকে, জীব ও জড় বস্তু হইতে "ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন" বলেন না। তাঁহার মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সকল সময়ে ও সকল অবস্থায়ই পরস্পর ভিন্ন। * তিনি নির্ব্বাণ মুক্তিরও নিতান্ত বিরুদ্ধবাদী। তিনি এইরূপ উপদেশ করেন যে, জীব যখন পাপের মোহময় আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন সে প্রেমানন্দময় বৈকুণ্ঠধামে ভগবানের পাদ-পদ্ম-সান্নিধ্যে, অনন্ত কালের জন্য স্থান প্রাপ্ত হয়, এবং সে তখন তাঁহার আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি-দর্শনের অধিকার পাইয়া, তাঁহার দাস্যলাভে চরিতার্থ রহে। এইরূপ "অবাঙ্মনসো গোচর" অতীন্দ্রিয় আনন্দে অধিকার লাভের মুখ্য উপায় কি?—উপায়,ভগবানে সর্ব্বত্যাগিনী ভক্তি।

রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য উভয়েই এক দেশের লোক। উভয়েই ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ড, বর্ত্তমান মান্দ্রাজ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা এক সময়ের লোক নহেন। মধ্বাচার্য্য ১১২১ শকে অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের ২৮৬ বৎসর পূর্ব্বে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজ ঠিক কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিন্তু এই তক বুঝা যায় যে, মধ্বাচার্য্য যখন বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাহার অল্প কিছু পূর্ব্বেই বৃদ্ধ রামানুজ তদীয় বিদ্যাবুদ্ধি এবং ধর্ম্মপরায়ণতার যশঃ প্রতিভায় ভারত-বিখ্যাত হইয়া, স্বর্গ লাভ করেন।

মধ্বাচার্য্য মধুস্বামী অথবা মধুমুনি বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি রামানুজের মত-খণ্ডনের জন্য, পূর্ণপ্রজ্ঞ নামক অভিনব দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আর এক নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ। বৈষ্ণবগ্রন্থে তিনি আনন্দতীর্থ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। যথা,—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণিং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥"

ইহার এই অর্থ, আনন্দতীর্থ নামক যতি জয়যুক্ত হউন। তিনি সুখের ধাম। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সংসার-সমুদ্রের তরণি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কিন্তু, আনন্দতীর্থ প্রভৃতি নাম অপেক্ষা মধ্বাচার্য্য* নামই ভারতবর্ষে বেশী পরিজ্ঞাত। আমাদিগের আজিকার অতিথি, পণ্ডিতাগ্রণ্য মাধবেন্দ্র পুরী, শিষ্যানুশিষ্যক্রমে এই মধ্বাচার্য্যেরই মত-প্রচারক, অথবা, মধ্বাচারিসম্প্রদায়ের তদানীন্তন সর্ব্বাধ্যক্ষ, এবং গুরু ও সর্ব্বময় পরিচালক। মধ্বাচার্য্য শ্রীগোপাল নামক উপনিষৎ অবলম্বন করিয়া উপদেশ করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণএব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎ,—তং রসেৎ,—তং ভজেৎ,—তং যজেৎ।"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পরম দেব, অতএব তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, প্রেমভক্তির সাধনার দ্বারা তাঁহারই মাধুর্য্যের রসাস্বাদন করিবে,—তাঁহারই ভজনা করিবে এবং তাঁহারই আরাধনা করিবে।

মাধবেন্দ্র ভক্তির ভাবে বিহ্বল হইয়া এই প্রকার কথাই স্থানে স্থানে প্রচার করিতেছেন, এবং যাহাকে জীব-হৃদয়-চালনে যোগ্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহার উপরই মধ্বস্বামি-প্রবর্ত্তিত উল্লিখিতরূপ মধুর ভক্তির ধর্ম্মপ্রচারের ভার ন্যস্ত করিতেছেন।

মাধবেন্দ্রের বড় বড় শিষ্য অনেক। এখানে কএকটির নাম উল্লেখ করিব। তিনি ত্রিহুতে একজন বড় শিষ্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম পরমানন্দপুরী। ঐ সময়ে মাধবেন্দ্রের আরও কএকটি প্রিয় ও পরিচিত শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম,—ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দপুরী। মাধবেন্দ্র যখন শান্তিপুরে সমাগত, তখন বঙ্গদেশে তাঁহার দুইটি প্রধান শিষ্য বিদ্যমান। তাঁহাদিগের একজনের নাম ঈশ্বরপুরী, আর একজনের নাম কেশবভারতী। ঈশ্বরপুরী জাতিতে কায়স্থ,এবং তাঁহার আদি নিবাস কুমারহট্ট অথবা হালিসহর। শ্যামাসঙ্গীতের অতুল কবি, রাতুল-শ্যামাপদ-ভক্ত, রামপ্রসাদ পরে এই কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্রের শিষ্যবর্গ সর্ব্বত্রই উচ্চ সম্মান পাইতেন। কিন্তু, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই পাণ্ডিত্যে ও চরিত্রের মাহাত্ম্যে ঈশ্বরপুরীর সমকক্ষ ছিলেন না। কেশব ভারতীও ঈশ্বরপুরীর সমান-শ্রেণিস্থ বলিয়া পরিচিত নহেন। তিনি, মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, নবদ্বীপের ত্রিশ মাইল দূরে, গঙ্গার তীরে, কাঁটোয়া নগরে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং সেখানে থাকিয়াই

---

* তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ।
ইতি মধ্বাচার্য্যধৃত মহোপনিষৎ।
পুনশ্চ,
এক নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ।
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥
অপিচ,
স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু র্নির্দ্দোষোঽশেষ সদ্গুণঃ।
ইতি তত্ত্ববিবেকঃ।

* রাস্তার একটি সাধারণ বৈষ্ণবকেও যদি আদর করিয়া জিজ্ঞাসা কর, বাছা তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের আশ্রিত গো, সে অমনিই বলিবে,"আমি মাঝবাড়ী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব।" এই মাঝবাড়ী নামের অর্থ আগে বুঝিতাম না। তার পর, বিজ্ঞ বৈষ্ণবদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, যিনি সুশিক্ষিতের নিকট মধ্বাচারী, তিনিই দীন-হীন ভিক্ষু বৈষ্ণবদিগের নিকট এইক্ষণ মাঝবাড়ী নামে পরিচিত।

চির-জীবন ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারে রত ছিলেন। মাধবেন্দ্রের উল্লিখিত শিষ্যেরা সকলেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্তই তাঁহারা 'পুরী' 'ভারতী' ও 'তীর্থ' প্রভৃতি সন্ন্যাসবোধক উপাধি পাইয়াছিলেন। ঈশ্বর পুরী এবং কেশব ভারতীও সন্ন্যাসী। পাঠক এই দুই সদাশয় সাধুর নাম যত্নের সহিত মনে রাখিবেন। কেন না, ইহাঁদিগের উভয়েরই সহিত তাঁহার পুনঃ পুনঃ সাক্ষাতের সম্ভাবনা আছে।

শান্তিপুরের কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যও মাধবেন্দ্রের শিষ্য হইলেন। মাধবেন্দ্র যেন কমলাক্ষকেই খুঁজিতেছিলেন।* যখন উভয়ের সাক্ষাৎ হইল, তখন দৃষ্টিমাত্রই উভয়ে উভয়কে আপনার জন বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। যথা অদ্বৈত প্রকাশে,—

"পুরীর দর্শনে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গলে বস্ত্র বান্ধি তাঁরে দণ্ডবৎ কৈলা।
পুরী তারে আলিঙ্গিয়া কুশল পুঁছিলা।
প্রভু কহে মদন গোপাল দয়া কৈলা ?"

কমলাক্ষের জ্ঞানোজ্জ্বল গভীর দৃষ্টি মাধবেন্দ্রের মনে প্রীতি জন্মাইল; মাধবেন্দ্রের মনস্বিতা ও মধুর-রস-বিহ্বলা মনঃপ্লাবিনী ভক্তি কমলাক্ষকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। গুরুশিষ্যে ক্ষণকালের মধ্যেই প্রাণের পরিচয় হইয়া গেল। যাঁহারা এক রসের রসিক, এক পথের পথিক, অথবা চিন্তা ও ভাবসম্পর্কে এক গ্রামের লোক, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বএই এইরূপ পরিচয় হয়। কমলাক্ষ তখন দুই দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহধর্ম্মে ডুবিয়াছেন। সুতরাং সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার সাহস হইল না। তাঁহার গুরুদেবও নানা কারণে তাহা ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু, তিনি মাধবেন্দ্রের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া, তাঁহার দেহ, প্রাণ, মন, সমস্তই মাধবেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিলেন। মাধবেন্দ্রও তদীয় নূতন শিষ্যের নবীন উৎসাহ এবং নবোদ্গত আশা, উদ্যম ও অধ্যবসায় দেখিয়া মনে বড়ই আশান্বিত হইয়া বিদায় লইলেন। গুরু তাঁহার এই অভিনব শিষ্যকে সর্ব্বাংশেই উপযুক্ত পাত্র বলিয়া ঠাউরাইয়া লইলেন; শিষ্য তাদৃশ মহাজন-গুরুর হৃদয়ের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলেন। দুই ই দুইয়ের নিকট বাঁধা রহিলেন। বঙ্গে এইরূপে 'ভক্তি-কল্পতরুর' অঙ্কুর-রোপণ হইল। অদ্বৈত অঙ্কুরে জল সেচন করিতে লাগিলেন।

আমরা এতক্ষণ পাঠকের নিকট কমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যের কথা কহিতেছিলাম। এই কমলাক্ষ নাম এক্ষণ অতীত স্মৃতির অতল-জলে ডুবিয়া গেল, এবং যিনি কমলাক্ষ নামে শান্তিপুরে ঐরূপ সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি মন্ত্রগ্রহণের পরক্ষণ হইতেই অদ্বৈত আচার্য্য † নামে ইতিহাসের আর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

* কমলাক্ষ যখন তীর্থভ্রমণে রত, তখনই মাধবেন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল; এবং তখন হইতেই তাঁহার উপর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু, সে পরিচয় এবং এখনকার পরিচয় এক কথা নহে।

†। এই অদ্বৈতাচার্য্য নামের অর্থ একটুকু নিগূঢ়। অকারের অর্থ বিষ্ণু। যিনি

"দেখ মোর অদ্বৈত গুণের নিধি।
না জানি এ কত সাধে সুধা দিয়া
এ দেহ গঠল বিধি।
কনক-কেতকী কুম-কুম জিনি।
সুচারু রূপের ছটা।
গর গর গোরা প্রেমে অতিশয়
শোভায় পুলক-ঘটা। (ভক্তি-রত্নাকর)

শান্তিপুরে অদ্বৈতের এক পুরাতন টোল ছিল। আনন্দবিহ্বল, অথচ জ্ঞানোজ্জ্বল, অদ্বৈত গোস্বামী, মধ্বস্বামীর * মত-প্রচার এবং ভক্তি ধর্ম্মের তত্ত্ব-বিস্তারের জন্য, বুঝি গুরুদেব * মাধবেন্দ্রেরই ইঙ্গিতক্রমে, বঙ্গের বিদ্যা-স্থান নবদ্বীপেও আর এক বৃহৎ টোল খুলিলেন। তিনি তাঁহার পিতৃ-সঞ্চিত সম্পত্তিতে তখনও সমৃদ্ধ। সুতরাং দুই স্থানে দুইটি বাড়ী ও দুইটি বড় টোল রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে কোন অংশেও ক্লেশকর হইল না। অদ্বৈতের টোল নবদ্বীপে অচিরেই জাঁকিয়া উঠিল। এই মৃদঙ্গ-মধুর-কল-গীতি-নিনাদিত * নূতন টোলের কথা লইয়া চারিদিকে নানা প্রকার আলোচনা চলিল। অনেকেই এই টোলে গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের গীতি-সংবলিত ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য, অদ্বৈতের শিষ্য হইল; অনেকে শিষ্য না হইয়াও তাঁহার আকর্ষণে পড়িল।

যাঁহারা, এই সময়ে, নবদ্বীপে, অদ্বৈতাচার্য্যের প্রধান সঙ্গী বলিয়া পরিচিত হইলেন, এবং অদ্বৈতের টোলে একত্র মিলিয়া ভাগবতাদি-শাস্ত্র-শ্রবণ ও নাম-কীর্ত্তনের নির্ম্মল আনন্দে জীবনের তরী ভাসাইলেন, তাঁহাদিগেরই সমষ্টির নাম অদ্বৈত-সভা। অদ্বৈত-সভার এক সভ্যের নাম শ্রীবাস পণ্ডিত। শ্রীবাসের সহধর্ম্মিণী স্নেহশীলা মালিনী দেবী শচীর শৈশব-সহচরী। সরলতা ও মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি-রূপিণী শচীর সঙ্গে সঙ্গে মালিনীও

বিষ্ণুর সহিত বিশ্ব-সংসারের দ্বৈতভাব বুঝাইবার জন্য আচার্য্য হইলেন, তাঁহার নাম অদ্বৈতাচার্য্য। এ অর্থ, সাম্প্রদায়িক ভাবে একান্ত সুন্দর হইলেও, কৌশলময়।

* মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের প্রথম অধ্যক্ষ আদি প্রবর্ত্তক মধ্বস্বামী। প্রমেয়রত্নাবলীর মতে মধ্বাচার্য্যেরই আর এক নাম আনন্দতীর্থ। কিন্তু সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ-রচয়িতা ইহা স্বীকার করেন না। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের মতে আনন্দতীর্থ আর এক ব্যক্তি, এবং তিনিও ব্যাস-সঙ্কলিত-বেদান্ত-সূত্রের আর এক ভাষ্যকর্ত্তা। উক্ত সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ মধ্বস্বামীর মুখ্য শিষ্য পদ্মনাভ। পদ্মনাভের পর নৃহরি। নৃহরির পর মাধব। মাধবের পর অক্ষোভ্য। অক্ষোভ্যের পর জয়তীর্থ। জয়তীর্থের পর জ্ঞানসিন্ধু। জ্ঞানসিন্ধুর পর দয়ানিধি। দয়ানিধির পর রাজেন্দ্র। রাজেন্দ্রের পর জয়ধর্ম্ম। জয়ধর্ম্মের পর পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমের পর ব্রহ্মণ্য। ব্রহ্মণ্যের পর ব্যাসতীর্থ। ব্যাসতীর্থের পর লক্ষ্মীপতি। লক্ষ্মীপতির পর পঞ্চদশতম গুরু মাধবেন্দ্রপুরী। কবি কর্ণপুরও এই কথাই সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

* "প্রয়োজকণিজন্তত্বাৎ সকর্ম্মকত্বম্"

বঙ্গীয় সংগীত-সাহিত্যের এক প্রান্তে একটু আদরের আসন পাইয়াছেন। শচী তাঁহাকে সই বলিয়া ডাকিতেন এবং প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগের উভয়ের এই প্রগাঢ় সৌহার্দ্দ জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত সমান ছিল। শচীর গৃহে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে কোন কার্য্য উপস্থিত হইত, শ্রীবাস ও মালিনী তাহাতেই আসিয়া অধ্যক্ষতা করিতেন।

শ্রীবাস পণ্ডিতের জন্মস্থান ঈশ্বরপুরীর বাসস্থানের নিকট কুমারহট্ট। কিন্তু নবদ্বীপে, গঙ্গার তটে, তাঁহার এক খানি প্রাচীর-বেষ্টিত পুষ্প-বৃক্ষ-পরিশোভিত, পাকা বাড়ী ছিল। শ্রীবাস তাঁহার নবদ্বীপের বাড়ীতেই বৎসরের অধিক ভাগ অতিবাহিত করিতেন; এবং অদ্বৈত-সঙ্গী ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিয়া মিশিয়া, মনের আনন্দে, কৃষ্ণ নাম লইতেন। নবদ্বীপস্থ তদানীন্তন ভক্তগণের মধ্যে শ্রীবাসের বড় নাম ছিল। সে নাম বঙ্গীয় ভক্তিধর্ম্মের ইতিহাসে এখনও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এবং লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতেছে। শ্রীবাস পণ্ডিত নিতান্ত সদয়-স্বভাব ও সাধু-প্রকৃতি লোক ছিলেন। সুতরাং যাঁহারা সাধুচরিত্র ভক্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে, তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি-লাভ স্বভাব-সিদ্ধ। যথা মহাজনী কবিতায়,—

"জয় মালিনী-পতি, সদয়-হৃদয় অতি
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার।
গৌর-ভকত জয় পরম দয়াময়
শিরে ধরি চরণ সবার।" (পদকল্পতরু)

কিন্তু শ্রীবাস, এই প্রকার উদার ভক্ত হইয়াও, অদ্বৈত-সভার বাহিরে আশার অনুরূপ আদর পাইতেন না। মূর্খ যেমন মুহূর্ত্তের তরেও মনস্বিজনের সঙ্গসুখ ভোগ করিতে পারে না, যাহারা হৃদয়শূন্য সংসারী, তাহারাও, সেইরূপ, হৃদয়বান্ প্রেমিক কিংবা ভক্তের পূজা করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের শক্তিতে তাহা কুলায় না। সে সময়ে, নবদ্বীপে দেবানন্দ নামে এক জন পণ্ডিত ছিলেন। এক দিন তাঁহার টোলে ভাগবত-পাঠ হইতেছে, এমন সময়, শ্রীবাস সেখানে যাইয়া উপস্থিত। দেবানন্দের ছাত্রেরা জ্ঞানলিপ্সু ও জ্ঞানাভিমানী। ভাগবতের কোন্ শ্লোকে কত প্রকার অর্থ-সঙ্কলন হইতে পারে, ইহা লইয়াই তাহারা ব্যাপৃত। ভাব-বিহ্বল শ্রীবাস ভক্তি-পিপাসু। তিনি কৃষ্ণকথা শুনিয়া, কিছুক্ষণ পরেই, ভাবে আবিষ্ট হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার তথাবিধ গদ্গদ অবস্থা সেখানে শাস্ত্রার্থব্যাখ্যার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া উঠিল বলিয়া, ছাত্রেরা কএক জনে উঠিয়া, তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে রাখিয়া গেল, এবং সকলে পুনরায় দেবানন্দের টোলে বসিয়া ভাগবত শুনিতে লাগিল। ভক্তদিগের মধ্যে যাঁহারা, তর্ক-পরীক্ষিত প্রখর জ্ঞানে কিংবা তেজস্বিতা প্রভৃতি প্রদীপ্ত গুণে, খুব বড় নহেন, তাঁহাদিগের, অনেক সময়ই, এইরূপ বিপদ-বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে; এবং এই জন্যই তাঁহারা, উপযুক্ত আশ্রয়-পুরুষের ছায়ায় থাকিয়া, জীবন যাপন করিতে ভালবাসেন। শ্রীবাসের মত

অনেক ভক্তেরই সে সময়ের এক মাত্র আশ্রয় অদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীবাস অদ্বৈতের সভাতেই প্রায় সমস্ত দিন উপবিষ্ট রহিতেন, এবং কখনও সেখানে, কখনও আপনার বাড়ীতে, কএক জন ভক্ত যুটাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে নাম গান করিতেন।

শ্রীবাসের আর তিন সহোদর ছিল। তাঁহাদিগের নাম শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। তাঁহারাও শ্রীবাসের সহিত অদ্বৈতের ভক্ত সভায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। অদ্বৈত-সভার আর এক সদস্যের নাম চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন। ইনি শচীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং শচীর দুলাল বিশ্বরূপ ও গৌরচন্দ্র উভয়কেই অকৃত্রিম স্নেহের গুণে প্রাণে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। আচার্য্যরত্ন, উচ্চ শ্রেণির পাণ্ডিত্যে অলঙ্কৃত না হইলেও, অমায়িক ভক্ত বলিয়া ভক্তদিগের সম্মানিত ছিলেন। অদ্বৈত-সংস্থাপিত ভক্তি-সভার আর একটি সুপরিচিত সভ্যের নাম মুরারি গুপ্ত। শ্রীহট্টবাসী বিদ্যা-সুখ-বিলাসী ভক্ত মুরারির সহিত পাঠকের কতক পরিচয় হইয়াছে, কালে আরও বেশী পরিচয় হইবে। চৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে, শ্রীবাস, শ্রীরাম ও চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন এবং মুরারি প্রভৃতি সমস্ত ভক্তেরই পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট প্রদেশ।—

"শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত,
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত।
ভব-রোগ-বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর,
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।"

ইহাঁরা সকলেই যে অদ্বৈতের প্রতি এত অনুগত, শ্রীহট্টের পুরাতন সম্পর্কও তাহার অন্যতম কারণ বটে। কিন্তু, শ্রীমান্ পণ্ডিত ও বনমালী আচার্য্য প্রভৃতি যাঁহারা পূর্ব্বাপরই নবদ্বীপবাসী, তাঁহাদিগেরও অনেকেই আসিয়া অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। পাঠক তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ পরে জানিতে পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ যাওয়ার জন্য গঙ্গার তটে তটে অতি সুন্দর পথ ছিল। অদ্বৈত কখনও কখনও শান্তিপুর যাইতেন; কিন্তু অধিকাংশ সময়ই, তাঁহার নবদ্বীপের বাড়ীতে সপরিবার বাস করিতেন। তিনি প্রাতে ও অপরাহ্ণে এইরূপ সহৃদয় ভক্তমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া,—যেন তাঁহার ডগমগ প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া, ভক্তির প্রকৃত তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মগ্ন রহিতেন; এবং যাঁহারা তাঁহার মধুর-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর উপদেশ শুনিতেন, তাঁহারাও সকলেই, ভক্তির উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইয়া, ধারায় অশ্রু মোচন করিতেন।

ভক্তি-জীবন বিশ্বরূপও তখন এই কারণেই অদ্বৈতের সহচর। বিশ্বরূপ বালক হইয়াও বৃদ্ধ। নবদ্বীপের আর কোন স্থানে তখন তাঁহার প্রাণ জুড়াইত না। বাদার্থের বিচার কিংবা ন্যায়াদিশাস্ত্রের নীরস যুক্তিবাদ তাঁহার মনের উপর কার্য্য করিতে সমর্থ হইত না। তিনি সেই নবীন-বয়সেই পরম বৈষ্ণব এবং বিষ্ণুভক্তিতে তদ্গতচিত্ত। তিনি যেখানে ভক্তির কথা শুনিতে পাইতেন না, এবং ভক্তির কোন অনুষ্ঠান দেখিতেন না,

সে স্থান তাঁহার নিকট শ্মশানের ন্যায় শুষ্ক প্রতীয়মান হইত। তাঁহার বিষাদ-মলিন মুখ খানিতে প্রায়শঃ কোন কথা ফুটিত না। কিন্তু তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রেম-ভক্তির একটি পবিত্র প্রস্রবণ সততই যেন উদ্বেল রহিত। বৃদ্ধ অদ্বৈতের প্রগাঢ় ভক্তির ভাব তাঁহার প্রাণটা কাড়িয়া লইল; এবং অদ্বৈতের প্রাণটাও, সেই ভাব-বৃদ্ধ বালকের প্রাণ-নিহিত অমৃত-স্পর্শে যেন একটুকু শীতল হইল। বিশ্বরূপের প্রতি অদ্বৈতের হৃদয় ও মন এত বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, অদ্বৈত যখন আহ্নিক পূজায় উপবিষ্ট রহিতেন, তখনও বিশ্বরূপকে দেখিতে পাইলেই, একবার তাঁহাকে বুকে টানিয়া আলিঙ্গন করিতেন।

"পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে,
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে।"

অদ্বৈত-সভার ভক্তবৃন্দও, বালকের চরিত্রে, ভক্তির তাদৃশ অনন্যসাধারণ বিকাশ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা তদানীন্তন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মলিন মুখ দেখিয়া হৃদয়ে বিষণ্ণ ছিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ যেরূপ বিচিত্র ভক্তিমত্তার সহিত কৃষ্ণতত্ত্বের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, এবং সেই তাৎপর্য্য বিবৃতির সমর্থনের জন্য শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ করিতেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহারাও শান্তিপুর-কীর্ত্তি অদ্বৈতের ন্যায় আনন্দে বিহ্বল হইতেন।

"সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানয়ে কৃষ্ণভক্তি সার,
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করয়ে হুঙ্কার।"

* * * *

"কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ।"

ভক্তসমাজের হৃদয়ের বিষাদ দূর হইল বটে, কিন্তু শচী ও জগন্নাথের জন্য এক দুঃসহ বিষাদের সমুদ্র সৃষ্ট হইতে চলিল। ভক্তেরা মনে করিতে লাগিলেন যে, বিশ্বরূপ বৈষ্ণব সমাজকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া শত শাখায় বিস্তারিত করিবেন। সুতরাং তাঁহারা আশায় উৎফুল্ল হইলেন। পক্ষান্তরে, জগন্নাথ ও শচীও, বিশ্বরূপের মনের প্রকৃত অবস্থা কিছুই অনুভব করিতে না পাইয়া, কল্পনার কুহকে একে আর বুঝিলেন। বিশ্বরূপ চিরকালই শান্ত। তিনি ক্রমে অধিকতর শান্ত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহারাও, আশার ছলনায়, মনে মনে সুখ-সম্পদের সোনার অট্টালিকা গড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মনে লইল যে, এই প্রকার সুরূপ সুশীল, সুপণ্ডিত এবং স্নেহানুগত পুত্রকে এই বয়সেই বিবাহের সুখ-সূত্রে বদ্ধ করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য। ইহাই নয়নের সার্থকতা,—ইহাই সাংসারিক জীবনের শেষ সাফল্য।

☞ আমরা এই প্রবন্ধে, পুরাতন পুস্তকের পূর্ব্বপ্রচলিত পাঠ এবং আমাদিগের পূর্ব্বতন সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া, পূজ্যাস্পদ ঈশ্বর-পুরী মহাশয়কে কায়স্থ বলিয়াছি। যদি অন্যরূপ প্রমাণ পাই, তাহা হইলে অবশ্যই গ্রন্থপ্রকাশ সময়ে, ভ্রম শোধন করিব। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায়, গৌরচরিত্রের বঙ্গবিপ্লাবি বিরাট ইতিহাসে, এই জাতিপ্রশ্ন অতিক্ষুদ্র কথা।

সমীরণ।

গো নিশি দিন কারে খুঁজিছ ?
র বিরহ সন্তাপ, দিবস যামিনী
মরমে মরমে বহিছ !
ঊষার আলোকে, সুনীল গগনে,
শ্যাম কুঞ্জ-ছায়া, বন, উপবনে,
তৃষিত নয়নে, কাতর পরাণে,
কার মুখ চাহি চলিছ ;
ার অতীত সোহাগ,—পুষ্প-পরাগ
যতনে হৃদয়ে মাখিছ !
জ্যোৎস্না মণ্ডিতা শরৎ যামিনী,
পূর্ণ-যৌবনা দুকূল-প্লাবিনী,
উল্লাসে বিভলা, তটিনী উজলা,
কুসুম-কুন্তলা শ্যামাঙ্গী ধরণী,
কার মুখ চেয়ে ভ্রমিছ,
ার অব্যক্ত মধুর, প্রণয়ের সুর,
অতৃপ্ত শ্রবণে শুনিছ।
ওগো বরষে বরষ দিন চলি যায়,
এ অনল কিগো নিভে না,
বহিবে না কিগো শান্তির ঝরণা,
জুড়াইতে এই যাতনা !
আঁধারের পর হাসে যে যামিনী,
হিম অবসানে সাজে যে ধরণী,
নবীন বরষে, নবীন হরষে,
ধায় কুলু কুলু মুক্ত তরঙ্গিণী
অতুল সৌন্দর্য্যে শোভনা,

ওগো এ তীব্র বেদন, অনল দহন,
যুগান্তেও কিগো যাবে না ?
সেই মানসী প্রতিমা সুখ-স্বপ্ন পারা,
ঢালিত যে প্রাণে অমৃতের ধারা,
সোহাঁগ সরল, শ্বেত-শতদল,
অতীত প্রণয়-পিপাসা-মদিরা,
ভুলিতে কভু কি পার না ;
ভুলিবে না কিগো সে লুপ্ত গরিমা,
সে সৌন্দর্য্য রাশি লাবণ্য পূর্ণিমা,
নবীন সোহাগে, নব অনুরাগে,
পুষ্পিত প্রণয়ে নব মধুরিমা,
তার দিবস যামিনী ভাবনা,
ওগো জগত যুড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
গেল না কি সেই বেদনা !
ওগো নাহি অবসাদ, নাহি কি বিরাম,
মুক্ত সদাগতি, ধাও অবিরাম,
অস্থির চঞ্চল, চিত্ত চপল,
ক্ষণতরে কভু না চাহ বিশ্রাম,
এত কি গভীর সাধনা,
কত না আদরে, সাধে কত জন
মুখ তুলে কেন চাহ না ?
বসন্ত-প্রভাতে প্রভাত-নলিনী,
শরতে প্রফুল্লা কৌমুদী-যামিনী,
হেমন্তে ঊষার, মুকুতা-তুষার,
ভরা শ্রাবণের মুক্ত তরঙ্গিণী,
করে কত মত সাধনা,

ওগো কাহার সৌন্দর্য্য মুগধ-নয়ন
দেখিয়াও ইহা দেখে না!
ওগো যুগ যুগান্তর স্মৃতি-পটে যার
মানসী প্রতিমা আঁকিছ,
যার অতীত প্রণয় জ্যোৎস্না-আলোকে
আঁধার জীবনে চলিছ,
সে অমৃতময়ী হৃদয়-বাসিনী,
আঁধার জীবনে পূর্ণিমা রজনী,
নিথর আকাশে পূর্ণ বিকাশে
হাসে অচপলা স্থির কাদম্বিনী,
তার তরে কেন ভাবিছ?
ফুল-আভরণা লতার উল্লাসে,
বসন্তে তরুর মুকুল-উচ্ছ্বাসে,
বিহগের গানে, প্রভাত-স্বপনে,
যুবতীর স্থির লাবণ্য বিকাশে,
অহরহ যারে দেখিছ,
সায়াহ্ন-গগনে পুরবী রাগিণী-
সম তার কণ্ঠ শুনিছ;
ওগো তবে কেন আর পাগল পরাণে
অতৃপ্ত নয়নে, অতৃপ্ত ধেয়ানে,
যুগযুগান্তর জনমে জনমে,
নিশাতে, দিবসে সদা আন মনে,
এত করি কারে খুঁজিছ?
কার, বিরহ-সন্তাপ দিবস, যামিনী,
মরমে মরমে বহিছ!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

হলায়ুধ।

'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' কবিরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা পণ্ডিত-কুল-রত্ন হলায়ুধ চট্ট এবং গীতগোবিন্দ রচয়িতা কেন্দুবিল্ব নিবাসী (১) জয়দেব গোস্বামী সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। এই উভয় কৃতী পুরুষই বঙ্গবাসীর গৌরব-স্থল। ইহাঁদের পর গ্রন্থরচনায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরূপ গোস্বামী, ভরত মল্লিক প্রভৃতি কতিপয় ভাগ্যধরমাত্র কীর্ত্তির বিমল কিরণচ্ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

হলায়ুধের অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়। রচনাচাতুর্য্য ব্যতীত, তাঁহার অনন্য-সাধারণ বৈষয়িক কার্য্যকুশলতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিতশিরোমণি কৈশোরাবস্থায় রাজা লক্ষ্ম-

(১) "বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেবিদং প্রবলেন।
কেন্দুবিল্ব সমুদ্র-সম্ভব রোহিণী রমণেন!"
গীত-গোবিন্দ ৩য় সর্গ।
"পদ্মাবতী-হৃদীশ্বরো জয়দেবো মহাকবিঃ।
কাঞ্জিবংশাবতংসৈকঃ কেন্দুবিল্বে রসোদ্বহঃ।'
সারাবলী।

ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় কাঞ্জিলাল বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। পদ্মাবতী ইহাঁর স্ত্রীর নাম। ইহাঁর জীবনকাহিনী ঘটনাবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

নের সভা-পণ্ডিত-পদে এবং যৌবনে প্রার্থ-য় সচিব-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরিশেষে লোকসামান্য বুদ্ধি-প্রভাবে দুর্ল্লভ "ধর্ম্মাধি-রণিকের পদে উন্নীত হইতে সক্ষম হইয়া-লেন (২)। অনেকে অনুমান করেন, নি নৃপতি লক্ষ্মণ সেনের বিখ্যাত "পঞ্চরত্নী" ভার অন্যতম সদস্য ছিলেন (৩)।

প্রথিতযশাঃ হলায়ুধ, কোন্ সময়ে, জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, কোন্ দেশ অলঙ্কৃত করিয়া-ছিলেন, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ, কিম্বা খ্রীঃ ১১০০ শত অব্দের প্রথমভাগে ইনি পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিলেন। "কবি শ্রীহর্ষ" প্রবন্ধে আমরা বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের সময় নির্ণয়কালে বলিয়াছি, লক্ষ্মণ সেনের পিতা কৌলীন্য-মর্য্যাদা-প্রবর্ত্তক বল্লাল সেন "আইন আকবরী" গ্রন্থের মতে ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে "দানসাগর" পুস্তক প্রণয়ন করেন (৪)।

সম্ভবতঃ ইহার অল্পকাল পরেই, লক্ষ্মণ

(২) "বাল্যে খ্যাপিত-রাজ-পণ্ডিতপদঃ
শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল চ্ছাত্রোৎসিক্ত মহামহ
স্তুপদং দত্ত্বা নবে যৌবনে। যস্মৈ যৌবন
শেষ যুগ্ম মখিলক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ শ্রীমান্
লক্ষ্মণ সেন—দেবনৃপতি র্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ।"
ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

(৩) "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্যচ।"
সঙ্গীতসার, ৩পৃঃ।

এই শ্লোকস্থ কবিরাজ শব্দে হলায়ুধই অভিহিত হইয়াছেন। হলায়ুধের ন্যায় একজন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত বিদ্যমান থাকিয়াও 'পঞ্চরত্নী' সমিতির সভ্য ছিলেন না, একথা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। 'কবিরাজ' হলায়ুধের ডাক নাম বলিয়া আমাদের ধারণা। রূপসনাতনের কারিকাতে লক্ষ্মণ-সভার ছয় জন পণ্ডিতের নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—

"হলায়ুধ গোবর্দ্ধন ধোয়ী উমাপতি।
শরণ জয়দেব লক্ষ্মণ সভাপতি।"
পদাবলী।

কিন্তু কবি জয়দেব স্বপ্রণীত 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে 'পঞ্চরত্ন' সভার সদস্য সমসাময়িক গোবর্দ্ধন প্রভৃতি পণ্ডিত চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ সময়ে ধোয়ী কবির কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু হলায়ুধ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে 'কবিরাজ' ধোয়ীর নামান্তর বলিয়াও প্রতীত হয়। "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ শুদ্ধিংগিরাং। জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে। শৃঙ্গারোত্তর সংপ্রমেয় বচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন-স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।
গীতগোবিন্দ।

(৪) এই সম্বন্ধে 'তরফাৎনসরি' গ্রন্থাদি প্রণেতা হাজ উদ্দীন প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ভিন্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের নিকট তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না।

সেন পিতৃ পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণ-মন্ত্রী হলায়ুধ বল্লাল সেনের কৌলীন্যদায়িনী সভায় কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হওয়াতে, খ্রীষ্টীয় ১০০০ শতাব্দীর মধ্য কিংবা শেষভাগে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই, অনুমিত হয়। হলায়ুধের আবির্ভাব-কাল নির্দ্ধারণের ন্যায়, বংশ গোত্রাদি নিরূপণ ব্যাপারেও বহু মতভেদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই মহাপুরুষ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ কবির বংশধর বলিয়াই অনেকের নিকট পরিচিত। 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে' এক হলায়ুধের নাম দেখিতে পাওয়া যায় (৫) কিন্তু উক্ত গ্রন্থবর্ণিত হলায়ুধ এবং ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বকার হলায়ুধ যে পৃথক ব্যক্তি, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ক্ষিতীশ বংশাবলীর হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ মাত্র। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বপ্রণেতা ভট্টনারায়ণের অন্ততঃ অধস্তন ৯ম. কি ১০ম পুরুষ স্থানীয় না হইলে, কোনরূপেই বল্লালের সভায় কৌলীন্য মর্য্যাদা ও লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। আমরা "কবি শ্রীহর্ষ" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, রাজা আদিশূর ৮০০ শত খ্রীষ্টাব্দে ধরণীতলে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার দৌহিত্রকুলের ৯ম পুরুষ বল্লাল সেন ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্গের রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। ইহাও প্রমাণ পরিশূন্য নহে যে, আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষ কবির ১৩শ সন্তান উৎসাহ মুখোপাধ্যায় ও ভট্ট-নারায়ণের ৯ম। ১০ম পুরুষ মহেশ্বর, মকরন্দ প্রভৃতি বল্লালের নিকট প্রথম কুল-রত্ন প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতোক্ত ভট্ট কবির তৃতীয় পুরুষ হলায়ুধ যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি?

ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বকার মন্ত্রী হলায়ুধের তত্ত্বানুসন্ধানকালে, আমরা ৺ রামহরি তর্ক বাচস্পতি ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন কুলজীকারগণের নিকট বহু জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। ইহাঁদের কথা বিশ্বাস-যোগ্য বিবেচিত হইলে, হলায়ুধকে কাশ্যপ-গোত্রীয় চট্টবংশ-সম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

কাণ্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের ছাপান্ন সন্তান রাজদত্ত গ্রামের নামানুসারে "গ্রামীণ" বা গাঁই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এই ছাপান্ন গাঁইর মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, মুখটি, ঘোষাল প্রভৃতি আট গাঁই কৌলীন্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত আট গাঁইর যে ঊনিশটি ভাগ্যধর (৬) সদাচারসম্পন্ন বলিয়া বল্লালী সভায় প্রথম কুল-রত্নের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তনকালে প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ একবাক্যে হলায়ুধকে চট্টবংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৭)

---

(৫) কার্ত্তিকেয় বাবুর 'ক্ষিতীশ বংশাবলী' চরিত। ৭৬ পৃঃ।

(৬) 'বন্দ্যশ্চট্টোঽথ মুখটিঃ ঘোষালশ্চ ততঃপরঃ।
পূতিতুণ্ডিশ্চ গাঙ্গুলিঃ কাঞ্জি কুন্দল চাষ্টমঃ।'
কুলরাম।

(৭) 'বহুরূপঃ সূচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।

কুলপঞ্জিকা প্রণেতৃগণের উক্ত নির্দ্দেশ ব্যতীত, প্রমাণান্তর দ্বারাও হলায়ুধের চট্টবংশে উৎপত্তি এবং কাশ্যপগোত্রীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে।

লক্ষ্মণ সেনের সভায়, কে কোন্ গোত্রীয় ও কোন্ বেদী বলিয়া কোন্ কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, মাধব সেন তাহা নিরূপণ করেন। এই সম্বন্ধে মহেশের কুলপঞ্জিকা হইতে ধ্রুবানন্দ-মত-ব্যাখ্যা নুনোপঞ্চাননের গোষ্ঠী কথা স্থিত যে কারিকা, "সম্বন্ধ নির্ণয়" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও হলায়ুধ কাশ্যপগোত্রীয়রূপেই স্থিরীকৃত (৮) চট্ট ধনবিজয়বংশের খ্যাতিখ্যাপক যে কারিকা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহাতেও হলায়ুধ নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৯)। এই সকল প্রমাণ বলে হলায়ুধ চট্টবংশাবতংসরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছেন।

বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ
কুলরাম।

"চট্টবংশের কুলীন পঞ্চ মহাশয়।
রূপসূচ-অর (অরবিন্দ) হল (হলায়ুধ)
বঙ্গনাম কয়।" মেলমালা।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রভৃতি কুলজিকারগণের উক্তিও ঠিক এইরূপই দৃষ্টিগোচর হয়।

(৮) 'যজ্ঞে কাশ্যপীয় অধ্বর্য্যু সূচ বহুরূপ।
হোতৃত্বে বাঙ্গাল স্পর্শে স্রক্ স্রব যূপ।
উদ্গাতা অরবিন্দ হল (হলায়ুধ) হন্ ব্রহ্মা।
সকলি চতুর্ব্বেদী যে যাহে কৃতকর্ম্মা।"
সম্বন্ধ নির্ণয় পরিশিষ্ট ৩৬৮ পৃঃ।

(৯) হলায়ুধঃ কবিস্তল্যো ধীতো মধুধনোহরিঃ।
শূলপাণিশ্চ সারঙ্গঃ হলোমুখভবাঃ সমাঃ॥
মেলমালা।

এইরূপ বিশ্বাস-যোগ্য-প্রমাণাদি সত্ত্বেও হলায়ুধের ন্যায় এক জন দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিতের সম্বন্ধে কেন এইরূপ বহু পরস্পর-বিরোধী মত-ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, হলায়ুধ বংশ-হীন বলিয়াই, সন্তান-পরম্পরা-পরিজ্ঞেয় বংশ গোত্রাদি, দেশীয় জনসাধারণ অভ্রান্তরূপে পরিজ্ঞাত নহে। নিঃসন্তান হলায়ুধের (১০) সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমুদায় জীবনবৃত্ত বিলোপ-সাগরের অতলজলে নিমজ্জিত হইয়াছে, এইরূপই আমাদের ধারণা। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, একজন বহুশাস্ত্রবিৎ দেশখ্যাত ক্ষণজন্মা গ্রন্থকারের বহুকাল বিলুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় জীবন-কাহিনী বিবৃত করিতে গিয়া, অনেকেই ভ্রান্তিপূর্ণ পথে বিচরণ করিয়াছেন।

হলায়ুধ-রচিত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক। তৎপ্রণীত অভিধান খানিও সর্ব্বত্র প্রমাণরূপেই পরিগৃহীত। (১১) কবিত্বপূর্ণ কবি-

(১০) হলায়ুধের নির্ব্বংশত্ব সম্বন্ধে মেলমালাকার এইরূপ বলিয়াছেন,—

"হলায়ুধে কেহ পৌত্র প্রপৌত্র যে কয়।
কিন্তু তার বংশধ্বংস জানিহ নিশ্চয়।"
মেলমালা।

(১১) প্রসিদ্ধ টীকাকার মথুরেশ ভট্টাচার্য্য হলায়ুধ-কৃত অভিধান খানির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

রহস্য নামক তাঁহার ধাতুপাঠ খানিও সর্ব্বজন-বিদিত। এই গ্রন্থের উপসংহারে কবি স্বয়ংই লিখিয়াছেন,—কবিত্বপূর্ণ রসিকতা-পূর্ণ মনোহর কবি-রহস্য সমাপ্ত হইল। সন্ধাভিধান-রচয়িতা হলায়ুধ ইহা রচনা করিলেন। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত, কাব্যতীর্থ।

ছায়া-দর্শন।

চতুর্থ অধ্যায়।

উপক্রম।

"All Evolution is an awakening to Higher realization."

* * * *

"Discovery, Desire and Development are the successive steps of Progress." Newcomb.

"সম্মুখে অনন্ত কাল,—অনন্ত উন্নতি;
ইহাই অদৃষ্ট-রেখা, বিধাতার কর-লেখা,
সুখ-দুঃখ-পরীক্ষিত মঙ্গল্য-নিয়তি;—
অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-রথে, অনন্ত কর্ম্মের পথে,
বিশ্বময় জীবনের নিয়মিত গতি;—
নিজ নিজ কর্ম্ম-ফলে, আনন্দে বা অশ্রুজলে,
বিকাশ-বৈচিত্র্য-ধর্ম্মে ক্রম-পরিণতি;—
শেষ-চিত্র সৌন্দর্য্যের অনন্ত মূরতি।"

ত্রয়োদশ বৎসরের তরল-নয়না বালিকা, দৈবজ্ঞের হাতের উপর আপনার কচি হাত খানি তুলিয়া দিয়া, একবার আশায় মৃদু মৃদু হাসিতেছে; আবার—বুঝি দৈবজ্ঞের মুখ খানি একটুকু ভার দেখিয়া—ভয়ে ধুক বুক করিতেছে; এবং মাঝে মাঝে, মায়ের চক্ষের দিকে সলজ্জ চক্ষে তাকাইয়া, যেন চোখে চোখে কি কহিতে চাহিতেছে। তাহার ঐ ঈষন্মুকুলিত প্রাণের অর্দ্ধ-সঞ্জাত আশা কি পূর্ণ হইবে? বালিকা কি মনের মত বর পাইয়া,—সে যেরূপ সুশীল সুন্দর সুমধুর-ভাষী বরের কথা দিদীমার কাছে শুনিয়াছে, সেইরূপ সোনার চাঁদ বরের কণ্ঠমালা হইয়া,—কোন দিন আনন্দে ভাসিবে? সবে তের বছর

বয়স। এ বয়সে তাহার-কতই বা বুদ্ধি হইতে পারে? কিন্তু বালিকা বুঝুক আর না বুঝুক, তাহার আত্মার অন্তস্তলে ঋষিদিগের উপদিষ্ট অদৃষ্টবাদ। যে অদৃষ্টবাদ, কৃষ্ণোক্ত মহাবাক্যের অর্থানুবাদে, ঈশ্বরকে জগতের সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বময় সজীব-সত্য, এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কার্য্যের সতত-ক্রিয়ান্বিত সাক্ষাৎ নিয়ন্তা বলিয়া উপদেশ করে, বালিকার হৃদয় সেই অদৃষ্টবাদের অস্ফুটভাবে পরিপূর্ণ।

এইরূপ আবার তিরাশী বৎসরের বিষয়-চিন্তা-মগ্ন বিরস-কঠোর বৃদ্ধ। আর বেশী দিন বাকী নাই; তথাপি তাঁহার মন ঐ বিষয়ের কথা ছাড়া আর কিছুতেই আকৃষ্ট হয় না। তিনি, চিরজীবন, বহু লোকের হৃদয়-রক্ত শোষণ করিয়া, বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার সেই বিষয়-বিত্ত—সেই তিল-তিল-সঞ্চিত শত-তাল-পরিমিত সম্পত্তি, উচ্ছৃঙ্খলচারী আত্মজবর্গের উদ্দাম ভোগ-বাসনার ভীষণ ঝটিকায়, ভস্মস্তূপের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে। তিনি, দৈবজ্ঞকে হাত না দেখাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদের নিকট কোষ্ঠী-পত্র লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি এত দিন আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া মানিতেন; এখন বুঝিয়াছেন. যে, কর্ত্তার উপরও কর্ত্তা আছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর কর্ত্তা, তাঁহার কর্ম্ম-ফলের স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ, কপালে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা বুঝিবার আর পথ না পাইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে তিনি কোষ্ঠী দেখাইতেছেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারও আত্মার অন্তঃপ্রকোষ্ঠে ঐ ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদ।

অদৃষ্টবাদ, ইয়ুরোপ প্রদেশেও, বহুকাল হইতে, বহুসহস্র জ্ঞান-বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্যক্তির বিশ্বাসের বস্তু। গ্রীক-গুরু সক্রেতিস অদৃষ্ট মানিতেন। রোমক-বীর সিজর অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন; এবং অধুনাতন পৃথিবীর অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর, বীরচূড়ামণি বোনাপার্টি, অদৃষ্টলিপির অখণ্ডনীয়তার উপর নির্ভর করিয়াই, কিবা যোদ্ধ্‌বেষ্টিত রণক্ষেত্রে, কিবা জিহ্বা-যুদ্ধ-কল-কলায়িত জাতীয়-প্রতিনিধি-সভায় অটল ও অক্ষুব্ধ দণ্ডায়মান রহিতেন।

ফলতঃ, অদৃষ্টবাদ বড় বিষম সমস্যা,—জ্ঞানজগতের অতি বড় গভীর রহস্য। এক দিকে মনুষ্যের স্বাধীনতা অথবা স্বেচ্ছাতন্ত্র গতি; আর এক দিকে অদৃষ্টের অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধি, এবং অনন্ত উন্নতিমূলক মঙ্গল্য নিয়তি। এই দুইয়ের দার্শনিক সামঞ্জস্য কিরূপ কঠিন কথা, তাহা চিন্তাক্ষম ব্যক্তিকে বিবরিয়া বলা অনাবশ্যক। মনুষ্য কখন কি করিবে, এবং তাহার কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি ফল তাহাকে কোথায় নিয়া পঁহুচাইবে, তাহা যদি অনাদি কাল হইতে আগা গোড়া শৃঙ্খলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম-সম্পর্কিত স্বাধীনতা ও কর্ম্মসূত্রিত দায়িতার আর অর্থ কি? কিন্তু এই স্বাধীনতা ও দায়িতা সত্ত্বেও অদৃষ্ট অথবা নিয়তির আধিপত্য একবারে অস্বীকার করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য। মনুষ্য, অনেক সময়, যাইতে চায় উত্তরে; কিন্তু সে, কেমন এক প্রকার অচিন্তিত ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া, বাধ্য হইয়া যায় দক্ষিণে। হার্ব্বার্ট

স্পেন্সার ও ফিস্কে প্রভৃতি বিজ্ঞান-দৃঢ় দার্শনিকেরা ভারতীয় ঋষির অদৃষ্টবাদ, অথবা বোনাপার্টির (Destiny) নিয়তি-তত্ত্বে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহারা যুগ-যুগান্তর-প্রবর্ত্তিত (Evolution) ক্রম-বিকাশ ও (Environment) অর্থাৎ আবরণিক অবস্থার শাসনী-শক্তিকে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত অদৃষ্ট-লেখার বড় বেশী পার্থক্য নাই।

যাঁহারা, দেহান্তর-প্রাপ্ত হইয়া, দেবধামের অধিকারী হইয়াছেন; অথবা এখনও কর্ম্ম-ফল-পরীক্ষার অধীন রহিয়া, মাঝে মাঝে পৃথ্বীবাসী সুহৃৎ স্বজনকে, প্রতিশ্রুতির অনুরোধে, কিংবা প্রীতি ও প্রয়োজনের অনুশাসনে, দর্শন-দানে বিস্ময়ে ডুবাইতেছেন, তাঁহারাও কতকটা অদৃষ্টবাদী;—'পরিণামে পূর্ণ মঙ্গল' এই মহাসত্যের উপাসক হইয়াও, অদৃষ্টে বিশ্বাসী। যদি পৃথিবীর মনুষ্যই মনুষ্যের ভাবি-জীবন-সম্পর্কিত শুভাশুভ ঘটনার কথা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে, যাঁহারা পর-পারে যাইয়া, জীবনের গতিবিধি বিষয়ে, অপেক্ষাকৃত গূঢ় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যে সে বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আমরা আজি পাঠকের নিকট একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ অধ্যাত্ম কাহিনী উপস্থিত করিতেছি। পাঠক, এই প্রকৃত-ঘটনা-মূলক পারিবারিক ইতিবৃত্তের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, দেখিতে পাইবেন যে, আমরা যাহা চক্ষে দেখিতেছি না, অন্যেরা তাহা দেখেন;—আমরা যাহা কর্ণে শুনিতেছি না, অন্যেরা, অদৃশ্যরূপে কাছে কাছে থাকিয়া, সতত তাহা শুনেন;—এবং আমরা আত্ম-সম্পর্কে কোন ক্রমেই যাহা জানিতে পাইতেছি না, অন্যেরা সূক্ষ্মতর দৃষ্টির সাহায্যে সর্ব্বদা তাহা জানিতে পান। পাঠকের ইহাও প্রতীতি হইবে যে, আমাদিগের পার্থিব জীবনের পূর্ব্বাপর সমস্ত ইতিহাস ঊর্দ্ধ জগতে পটের ন্যায় চিত্রিত রহিয়াছে;—সে পটে, জীবনের কর্ম্মানুসারে, যখনই নূতন রেখা পড়িতেছে, তখনই তাহা আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া, আত্মীয়জনের হৃদয়ে আনন্দ অথবা অবসাদ জন্মাইতেছে; অথচ আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া, কিংবা জানিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন না করিয়া, কখনও অভিমানের স্ফুরণে, মশক ও পিপীলিকের অনুকরণে, পরের প্রাণে দংশন করিতেছি; কখনও বা লোভ ও লালসার অধীন হইয়া, পরের স্বত্ব কাড়িয়া লইতেছি,—অথবা আপনার অমূল্য প্রাণটি পাশব-পিপাসার দুর্ব্বার-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, কিছু কালের তরে, যেন একবারে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছি। মনুষ্যের হৃদয় মনুষ্য মাত্রকেই সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কত কাল—আর কত কাল, ইচ্ছা করিয়া এইরূপ অন্ধ রহিবে?

আত্মিক-কাহিনী।

ইংলণ্ডের পশ্চিম-প্রান্ত-শোভি আইরিশ সাগরের পর-পারে, মন্দাকিনীমেখলা অমরাবতীর ন্যায়, সাগরাম্বরা আয়র্লণ্ড-ভূমি। আয়র্লণ্ডের কোন সমৃদ্ধ গৃহে, একটি সুকুমারমতি বালক ও কুসুম-কলিকা-সদৃশী সুন্দরী বালিকা, একই পিতা মাতার প্রযত্ন-রক্ষিত ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায়, গলায় গলায় গাঁথা ছিল। বালক ও বালিকা এক পিতা মাতার সন্তান নহে। কিন্তু, উভয়েই পিতৃহীন, এবং উভয়েই, অতি শৈশব হইতে, বৃন্তচ্যুত-মুকুলের মত নিরবলম্ব। উভয়েরই আবার অভিভাবক ও পরিরক্ষক এক ব্যক্তি। অভিভাবক প্রৌঢ়বয়স্ক,—স্নেহশীলতা ও মধুরতা প্রভৃতি পুণ্যগুণে শিশু-জনের একান্ত প্রিয়। বালক বালিকার শিশুবুদ্ধি অভিভাবককেই পিতা বলিয়া বুঝিত, এবং আপনাদিগকেও পরস্পর ভ্রাতা ও ভগিনী বলিয়াই মনে করিত। শিশু দুটির বিশ্রাম ও ভোজন একত্র,—বিশ্রব্ধ ভ্রমণ, এবং শৈশবের শিক্ষা ও দীক্ষা—ক্রীড়া ও কৌতুক একই সঙ্গে ও একই মন্ত্রে। এই দুই শিশু কালে ইংলণ্ডীয়-সমাজে লর্ড টাইরণ এবং লেডী বেরেস্‌ফোর্ড নামে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। আমরাও, এই প্রবন্ধে, এই দুই নামেই, তাঁহাদিগের কথা লিখিব। লর্ড টাইরণ এবং লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জীবনের আরম্ভ অভিভাবকের নিতান্ত আশাপ্রদ হইল।

অভিভাবক, নিতান্ত সুশীল ও সজ্জন হইয়াও, ধর্ম্মবিষয়ে বড় সন্দিহান ছিলেন। তিনি নামমাত্র ঈশ্বর মানিতেন; কিন্তু প্রার্থনার আবশ্যকতা ও পরলোক মানিতেন না। শিশু দুটিও, অভিভাবক ও শিক্ষকের ধর্ম্ম-ভাব, মাতৃ স্তন্যের ন্যায় পান করিয়া, প্রথম বয়সেই পরকাল-তত্ত্বে একপ্রকার সন্দিহান হইয়া উঠিল। কিন্তু, তাহাদিগের এই শিক্ষা দীর্ঘস্থায়িনী হইল না। তাহাদিগের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তাহাদিগের সেই পিতৃস্থানীয় অভিভাবক ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। যাঁহারা অতঃপর, তাহাদিগের অভিভাবক স্বরূপ হইলেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত স্বতন্ত্র। তাঁহারা পরকালে বিশ্বাসবান্ প্রার্থনা-ধর্ম্মে রীতিমত দীক্ষিত। বালক বালিকা এখন নূতন অভিভাবকদিগের মুখে, ধর্ম্ম-বিষয়ে, নূতন তত্ত্বের নূতন কথা শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহাদিগের পুরাতন বিশ্বাস কতকটা টলিল বটে, কিন্তু সে শৈশব-সংস্কার সমূলে উন্মূলিত হইল না। তাহাদের চিত্ত-ক্ষেত্রে, একটা প্রবল সন্দেহের ভাব, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের নিরন্তর বিরোধে, একবারে বদ্ধমূল হইয়া রহিল।

কতিপয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। বালক আর এখন অভিভাবকের মুখ-প্রেক্ষী শিশু নহে,—লর্ড টাইরণ রূপে সংসারে প্রবিষ্ট ও সমাজে প্রতিপন্ন। বালিকাও আর বালিকা নহে,—সার্ মার্টিন বেরেস্‌ফোর্ডের প্রিয়তমা পত্নী,—লেডী বেরেস্‌ফোর্ড। জীবনে পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন-সূত্র-জড়িত সেই শৈশব-সৌহার্দ্দে কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখনও লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড একে অন্যকে ভ্রাতা ও ভগিনীর চক্ষে দর্শন করেন, এবং প্রকৃতই অন্তরের সহিত ভালবাসেন। লর্ড টাইরণ

স্বভাবে উদার, আকারে প্রিয়দর্শন, এবং সৌহার্দ্দের ধর্ম্মে পর্ব্বতের মত অটল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড রূপবতী, বুদ্ধিমতী, বড়ই উদার-প্রকৃতি, এবং প্রীতি ও স্নেহের প্রফুল্ল-ব্রততী। যে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত, সে-ই তাঁহার স্নেহ-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত,—তিনিও তাঁহার সতত ঢল-ঢল ভালবাসা লইয়া সর্ব্বদাই সন্নিহিত প্রিয়-জনের প্রাণ শীতল করিতেন। তিনি যেন কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিলেই আনন্দে উৎফুল্ল রহিতেন। তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মানু-রাগিণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস, শৈশবের শিক্ষা-দোষে, সংশয়-দোলায় দোলা-য়িত থাকিয়া, সময়ে সময়ে, তাঁহার চিত্তে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত করিত।

দুই পরিবারে প্রগাঢ় প্রণয়। পরস্পর সা-ক্ষাৎকার ও সময়ে সময়ে একত্র অবস্থানাদি প্রীতিকর অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত চলিতেছে। কিন্তু এখনও লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌-ফোর্ড ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে, একদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, নানা কথা হইতে-ছিল। কথাপ্রসঙ্গে পরকালের কথা উঠিল। তাঁহারা উভয়ে, কিছু কাল বাদানুবাদ করিয়া, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রে যাঁহার মৃত্যু হইবে, যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, তিনি অন্যকে অবশ্যই দেখা দিবেন; এবং পরলোক, জগদীশ্বর, এবং কোন্ ধর্ম্ম সত্য ও প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরানুমোদিত, তাহা বলিয়া যাইবেন।" ইউরোপ প্রভৃতি দেশে প্রণয়ের এই এক প্রথা। অনেকেই এইরূপে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এদেশে, কেহই কখনও এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া, আবশ্যক মনে করেন না।

লর্ড টাইরণ বিবাহ করিয়াছেন। তাঁহার একটি কন্যা মাত্র জন্মিয়াছে। লেডী বেরেস্‌-ফোর্ডও দুটি কন্যার মা হইয়াছেন। লর্ড টাইরণ ও লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, আপন আপন গৃহে, সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন। কিছু দিন হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই। লর্ড টাইরণ, কোথায়,—কেমন আছেন, সার্ মার্টিন ও লেডী বেরেস্‌-ফোর্ড তাহাও সম্যক্ অবগত নহেন।

গভীর রাত্রি। লর্ড ও লেডী বেরেস্‌-ফোর্ড, আপন গৃহে, খুব বড় একটা সুসজ্জিত খট্টায়, শয়ান রহিয়াছেন। উভয়েই নিদ্রাগত। গৃহে মৃদু মৃদু আলো জ্বলিতেছে। কোন দিকে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই। হঠাৎ লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন;—চাহিয়া দেখিলেন, লর্ড টাইরণ, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট।—প্রথম বিস্ময়,—লর্ড টাইরণ, অমন সময়ে, ওখানে কিরূপে আসিলেন। তার পর সলজ্জ বিরক্তি,—কেনই বা তিনি, আজ এমন অশিষ্টের ন্যায়, পতি-শয্যায় শয়ানা সুন্দরী যুবতীর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত। এ কি সত্যই লর্ড টাই-রণ? লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিলেন। কিন্তু সে চীৎকারে, সার্ মার্টিনের ঘুম ভাঙ্গিল না। চীৎকার যেন কণ্ঠেই নিরুদ্ধ রহিল। লেডী

বেরেস্‌ফোর্ড, ইহার পর একটু সাহসে ভর করিয়া, লর্ড টাইরণের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি ভাই! লর্ড টাইরণ, তুমি এ সময়ে, এমন অসঙ্গত রূপে, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ পথে, কেমন করিয়া এখানে আসিলে?'

লর্ড টাইরণ কহিলেন,—"সব ভুলিয়াছ? তোমার কি সেই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞার কথাও মনে নাই? গত মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ চারিটার সময়, আমার তনুত্যাগ হইয়াছে। ঈশ্বরাণুপ্রাণিত দেবপুরুষ, আমাকে, আমার প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম-পালনার্থ, তোমার নিকট উপস্থিত হইতে, অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।—যাহা মনে ভাবিয়া রাখিয়াছ, প্রকৃত কথা তাহা নহে;—পরলোক সত্য, পাপ-পুণ্যের কর্ম্মফল অনি-বার্য্য। যাহা করিতেছ, যাহা বলিতেছ, যাহা ভাবিতেছ, সমস্তই পরলোকে কর্ম্মপটে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া রহিতেছে। আরও বলি ঈশ্বর সত্য।—এক অনন্ত প্রেমময় পূর্ণমঙ্গল,—ন্যায়-বিধাতা পরমপুরুষ ইহকাল ও পরকাল আবরিয়া রহিয়াছেন। অটল বিশ্বাস ও অবি-চল ভক্তির সহিত সেই জগদীশ্বরে আত্ম-সমর্পণই আমাদিগের পরিত্রাণের এক মাত্র পথ।" ইহা কহিয়া, লর্ড টাইরণ ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। তার পর আবার কহিতে লাগিলেন,—"আমি ইহাও তোমাকে জানা-ইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, তুমি সত্বরই পুত্র-বতী হইবে; এবং সেই পুত্র কালে আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে। কিন্তু ভীত হইও না,—অধীর হইও না,—তোমার বৈধব্য অনিবার্য্য। পুত্র জন্মিবার অল্পকাল পরেই, সার্ মার্টিন পরলোকগত হইবেন। তাহার কিছু কাল পরে, তুমি দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে। এই দ্বিতীয় পতির দুর্ব্যবহারে তোমার জীবন নিতান্তই দুর্ব্বহ ও একান্ত দুঃখময় হইয়া উঠিবে। এই দ্বিতীয় পতি হইতে তোমার আগে দুইটি কন্যা ও অব-শেষে একটি পুত্র জন্মিবে। পুত্র জন্মিলে, এক মাসের মধ্যে, ঠিক সাত চল্লিশ বৎসর বয়সের আরম্ভে, তোমার মৃত্যু হইবে। কিছুতেই ইহার অন্যথা নাই।"

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এই কঠোর ভবিষ্যদ্-বাণী শুনিয়া ভয়ে একবারে আড়ষ্ট হইলেন। তিনি, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, ধীরে ধীরে, অতি কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—'আমি, এই ভবিতব্য—এই ভয়াবহ নিয়তির কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি না কি?'

ছায়া-মূর্ত্তি কহিলেন,—'অবশ্যই পার।—কেন না পারিবে? তুমি স্বাধীনা,—স্বকর্ম্ম-ফল-ভাগিনী আত্মিকা। * তুমিও, জগদীশ্ব-রের প্রিয়তম সন্তান,—সেই অনন্ত-শক্তির একটি অস্ফুট কলিকা;—অনন্তধামের যা-ত্রিণী,—অনন্ত-মঙ্গলের অধিকারিণী। সুতরাং তোমার ভবিতব্য সকল সময়েই কিয়দংশে তোমার হস্তে। তুমি, দৃঢ় সংকল্পে অধিরূঢ়

* আত্মা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাই। কিন্তু আত্মা আর স্বার্থে প্রযুক্ত ইক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন আত্মিক শব্দ একার্থবোধক। সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গে আত্মিকা বলা যাইতে পারে।

হইয়া, কায়-মনঃ-প্রাণে যত্ন করিলে, অবশ্যই নিয়তির পরিবর্ত্ত ঘটাইতে পার। কিন্তু সে যত্ন বড় কঠিন কর্ম্ম। দ্বিতীয় বার পতি-গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে, তোমার অদৃষ্টের গতি অন্যরূপ হইবে। কিন্তু হায়, তুমি জান না, তোমার প্রাণে ভোগ ও ভালবাসার তৃষ্ণা এবং প্রীতি-সুখ-লালসা কিরূপ প্রবল;—জান না, তোমার প্রবৃত্তি-নিচয় কিরূপ শক্তিমান্ ও দুর্দ্দম। বিশেষতঃ, তুমি জীবনে আর কখনও এমন কঠোর পরীক্ষার অধীন হও নাই। দেবপুরুষ আমায় ইহার অতিরিক্ত আর কিছু জানিতে দেন নাই, এবং বলিতেও অনুমতি প্রদান করেন নাই। কিন্তু একটি কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, তুমি যদি ইহার পরও মনে ধর্ম্ম-বিষয়ে অবিশ্বাসের ভাব পোষণ কর, তাহা হইলে, পরকালে দুর্গতির সীমা থাকিবে না। তাই সাবধান, সাবধান, সাবধান। জগন্মঙ্গল অনন্তদেবে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনে অগ্রসর হও। মানবজীবন মরীচিকা অথবা মনঃকল্পিত স্বপ্ন নহে।"

লেডী বেরেস্ফোর্ড বলিলেন,—'ভাল একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—পরলোকে যাইয়া তুমি কি সুখী হইয়াছ?' ছায়া-মূর্ত্তি উত্তর করিলেন,—'একটুকু সুখে না থাকিলে, আমি কখনও তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিতাম না।'

লেডী বেরেস্ফোর্ড বলিলেন,—'তবে বুঝিলাম তুমি ওখানে বেশ সুখে আছ।' ছায়া-মূর্ত্তি এবার আর উত্তর করিলেন না। তাঁহার অধর-প্রান্তে ঈষৎ একটু হাসির রেখা-পাত হইল। অবিশ্বাস, সংশয় ও কূট-তর্কের কুশিক্ষায় লেডী বেরেস্ফোর্ডের হৃদয় তম-সাচ্ছন্ন। তিনি এই বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও, ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পুনরপি কহিলেন,—

'তোমার এই দর্শন-দান যে প্রকৃত ঘটনা,—আমারই মনের একটা অলীক স্বপ্ন-কল্পনা নহে, নিশি প্রভাতে, আমি ইহা কিরূপে বুঝিব?

ছায়া-মূর্ত্তি কহিলেন,—'কেন?—কল্যই ত আমার মৃত্যু সংবাদ পাইবে।'

লেডী বেরেস্ফোর্ড বলিলেন,—'আমার তখন সম্ভবতঃ মনে লইবে,—এখন যাহা দেখি-লাম ও শুনিলাম, এ সমস্তই স্বপ্ন; এবং সেই স্বপ্ন দৈবাৎ সত্য হইয়াছে। না,—ইহাতে হইবে না,—আমি অন্য প্রমাণ চাই।'

ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—'আচ্ছা বেশ কথা। তবে চাহিয়া দেখ।'

ইহা বলিতে বলিতে ছায়া-মূর্ত্তি তাঁহার বাহু প্রসারিয়া সেই দৃঢ়-কাষ্ঠ-ফলক-বিলম্বিত মশারিটার একটা ভাগ হুকের মধ্যে আট-কাইয়া রাখিলেন। ঐ হুকটা এত ঊর্দ্ধে অবস্থিত যে, অন্য বস্তুর সাহায্য ভিন্ন, মানু-ষের পক্ষে এ কার্য্য একবারে অসম্ভব।

লেডী বেরেস্ফোর্ড বলিলেন,—'ইহাও যথেষ্ট নহে। জাগ্রদবস্থায়, আমরা কখনও যাহা পারি না, সময়ে সময়ে, নিদ্রিত অবস্থায় তাহা অনায়াসে সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। হয় ত, মশারির এই অবস্থা দেখিয়া আমি

...ন করিব, ইহা আমারই নিদ্রিত অবস্থার ...নুষ্ঠিত অজ্ঞাত অন্ধ-শক্তির কর্ম্ম।'

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন —'এই ত এখানে তো-...র পকেট-বুক্, আর পেন্সিল রহিয়াছে। ...মি এই পকেট-বুকে আমার নাম লিখিয়া ...খিতেছি। তুমি আমার হস্তাক্ষর বিশিষ্ট-...পে চিন। প্রভাতে ইহা দেখিলেই বুঝিতে ...ইবে, আমার এই সাক্ষাৎকার স্বপ্ন নহে,—...মি প্রকৃতপ্রস্তাবেই সম্মুখে আসিয়া তো-...কে দেখা দিয়াছি।'

আগন্তুক, ইহা কহিয়াই, পকেট-বহিতে ...জের নাম লিখিয়া, উহা রাখিয়া দিলেন।

চির-সংশয়াকুলা লেডী বেরেস্ফোর্ড ইহা-...তেও পরিতৃপ্ত নহেন। অবিশ্বাসই, শিশুকাল ...হইতে, তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক ভাব। যাহা ...চক্ষে দেখিতেন, তাহাতেও বিশ্বাস করিতে ...চাহিতেন না। তিনি কহিলেন,—'না, ইহা-...তেও আমার সন্দেহ দূর হইতেছে না। ...ইহাও, তোমার হস্তাক্ষরের অনুকরণে, আ-...মারই স্বপ্নাবস্থার লেখা বলিয়া, মনে সংশয় ...থাকিয়া যাইবে।'

ছায়ামূর্ত্তি এবার একটুকু বিরক্ত হইয়া ...বলিলেন,—'হা বিশ্বাস-শূন্য সংশয়িনি! আমি ...দেখিতেছি, কিছুতেই তোমার বিশ্বাস নাই। ...তোমায় এখনই স্পর্শ করিতে পারিতাম। ...কিন্তু পর-লোক-গত আত্মার স্পর্শ, অধ্যাত্ম-...জীবনের যে অবস্থায়, পার্থিব জড়-শরীরের ...পক্ষে, সুখ-প্রীতিকর হয়, আমি এখন পর্য্যন্ত ...সে অবস্থায় পঁহুচি নাই। আমার এক্ষণকার ...স্পর্শে তোমার যে অনিষ্ট হইবে,—ইহ জী-বনে কিছুতেই আর সে অনিষ্টের প্রতি-বিধান হইতে পারিবে না;—সে চিহ্ন উঠিয়া যাইবে না।'

লেডী বেরেস্ফোর্ড বলিলেন,—'চির-স্থায়ি একটা চিহ্ন পড়িবে বই ত নয়?—তা পড়ুক; সে সামান্য খুঁতে আমার কি হইবে?'

ছায়ামূর্ত্তি বলিলেন,—'বটে, তোমার মত অসম-সাহসিকার পক্ষে, এ উক্তি সম্ভবপর। আচ্ছা, তবে হাত বাড়াইয়া দাও।'

লেডী বেরেস্ফোর্ড, কেমন একপ্রকার মূর্খ অথবা মোহমুগ্ধ নির্ব্বোধের মত, ঔৎ-সুক্যের সহিত হাত বাড়াইয়া দিলেন। ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার কর-গ্রন্থি নিজ অঙ্গুলি দ্বারা বেষ্টিয়া ধরিলেন। রমণীর শরীর সে স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল। তিনি উহা তুষার-সিক্ত মারবল অথবা বরফ-বলয়ের ন্যায় দুঃসহ শীতল অনুভব করিলেন। ধৃত স্থানের পেশী-গুলি তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া আসিল, স্নায়ু-গুলি অমনই শুকাইয়া উঠিল। ছায়ামূর্ত্তি কহিলেন,—'যত কাল বাঁচিয়া থাক, এই চিহ্ন কাহাকেও দেখিতে দিও না। ইহা দেখান নিতান্তই বিধিবিরুদ্ধ, কখনও বা বিপজ্জ-নক।' ইহা কহিয়াই ছায়ামূর্ত্তি নীরব হই-লেন। লেডী বেরেস্ফোর্ড ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, লর্ড টাইরণ কিংবা সেই ছায়ামূর্ত্তি আর সেখানে নাই।

যাঁহারা আত্মিক-তত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহারা উপদেশ করেন যে, পর-লোক-গত সকল আত্মার স্পর্শই জীবিত মনুষ্যের পক্ষে ক্লেশা-

বহ নহে। যে সকল আত্মা, দয়াধর্ম্মের আনন্দময় মহিমায়, দেব-ভাবাপন্ন, তাঁহাদিগের স্পর্শ সকল অবস্থায়ই সানন্দ ও সুখ-শীতল। কিন্তু যাঁহারা, পর-লোক-বাসী হইয়াও, পার্থিব-লালসা ও পাপ-জ্বালা হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের স্পর্শ পৃথিবীর জীবের পক্ষে অসহনীয় ও আংশিক অনিষ্টকর।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যত ক্ষণ ছায়া-মূর্ত্তির সহিত বাক্যালাপে ব্যাপৃত ছিলেন, তত ক্ষণ তাঁহার মন, ভয় ও ভাবনা সত্ত্বেও, কেমন একপ্রকার পরবশ, অথবা বিবশ ও জড়ীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি তাই কতকটা প্রশান্ত ও প্রকৃতিস্থ ছিলেন। কিন্তু যে-ই ছায়া-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, অমনই কোথা হইতে কেমন একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক আসিয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন সমস্ত ঘর, বাড়ী ও খট্টা প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি সার্ মার্টিনকে জাগাইতে যত্ন করিলেন। কিন্তু পারিলেন না;—তাঁহার মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি এইরূপে, ভয়ে ও বিস্ময়ে, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত অসহ্য কষ্ট পাইলেন। কিছু কালের পর, তাঁহার প্রাণে, লর্ড টাইরণের জন্য, শোকের সঞ্চার হইল। নয়ন-যুগলে, অল্পে অল্পে, গলিত ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল;—এবং এই অশ্রু-প্রবাহেই যেন ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ের অস্ফুট শোক ও অধীরতা ভাসিয়া গেল। শোকার্ত্ত প্রাণ নয়ন-জলে শীতল হইল। তিনি ইহার পর, কোন্ সময় জানেন না, ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। সার্ মার্টিন শয্যা ত্যাগ করিলেন। মশারির প্রতি তাঁহার চক্ষু পড়িল না। তিনি নিত্য-নিয়মিত রীতিতে নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড তখনও নিদ্রাগত। কিছু ক্ষণ পরে, তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথমেই মশারির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পাছে, মশারির সেই অবস্থা-দর্শনে, বাড়ীর লোকের মনে, কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, তিনি, এই হেতু, দ্রুতগতি শয্যা ত্যাগ করিয়া, কার্পিস পরিষ্কারের সুদীর্ঘ ঝারণিটি লইয়া আসিলেন, এবং উহার সাহায্যে মশারির ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত অংশ উপর হইতে কষ্টে নামাইলেন। অবশেষে কর-গ্রন্থির সেই চির-স্মরণীয় চিহ্নের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল। তিনি সেই তুষার-স্পর্শ-সঙ্কুচিত কৃষ্ণ-রেখা-লাঞ্ছিত চিহ্নিত স্থানে, তাড়াতাড়ি, কাল ফিতা জড়াইয়া, স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাত্রির উদ্বেগ ও উপদ্রবের নানাবিধ লক্ষণ তখনও তাঁহার মুখচ্ছবিতে স্পষ্ট প্রতিফলিত ছিল। পতি, চির-প্রফুল্লমুখী ও প্রেমশীলা পত্নীর তথাবিধ বিষাদমাখা মলিন মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাকে আজি এমন দেখিতেছি কেন? কোন অসুখ হয় নাই ত?' তিনি বলিলেন, 'না, আমি বেশ সুস্থ আছি।' পতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কি?—তোমার কব্‌জায় ঐ কাল ফিতা বাঁধা কেন? ব্যথা পাইয়াছ? হাত মচ্‌কিয়া গিয়াছে কি?

তিনি বলিলেন,—'না,—সে সব কিছু নয়—কিন্তু তোমার নিকট আজি আমি কর-যোড়ে একটি প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে ত?—কাকুতি করিয়া বলিতেছি, তুমি এই ফিতা সম্পর্কে কখনও আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না। আমি যত কাল বাঁচিব, এই ফিতাটিও তত কাল আমার হাতে এমনই বাঁধা থাকিবে। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার প্রাণাধিক। তোমার নিকট আমার কিছুই গোপনীয় নাই। বোধ হয়, আমি কখনও, তোমার কোন অভিপ্রেত-রক্ষায়, এরূপ অসম্মতি প্রকাশ কিংবা আপত্তি করি নাই। তুমি জেদ করিলে, আমি অবশ্যই ইহার আমূল-বৃত্তান্ত তোমার নিকট খুলিয়া বলিতে বাধ্য। কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। তাই, আমার বিনীত অনুরোধ, তুমি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করিবে।' সার্ মার্টিন ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিলেন, 'তোমার যখন এই সামান্য বিষয়ে এত অনুরোধ, আমি এ সম্পর্কে তোমাকে আর কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিব না।'

ইহার পরে, আর কোন কথা হইল না। প্রাতরাশের কার্য্য নীরবে সম্পন্ন হইল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড আজি বড়ই উন্মনস্ক। তিনি যেন কোথা হইতে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—যেন কি একটা পাইবার প্রত্যাশায়, বারংবার চঞ্চল-নয়নে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিছু ক্ষণ পরে, তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজিকার ডাক আসিয়াছে কি?' তখনও ডাক আইসে নাই। তিনি ক্ষণে ক্ষণেই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তখনও ডাক আসিয়া পঁহুচে নাই। সার্ মার্টিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডাকের জন্য এত আকুল কেন? ডাকে কোন জরুরি চিঠি আসিবার কথা আছে কি?' তিনি বলিলেন,—'জরুরি আর কি, মৃত্যু-সংবাদ,—লর্ড টাইরণের মৃত্যু সংবাদ আসিতেছে! তিনি, গত মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ চারিটার সময়, তনুত্যাগ করিয়াছেন।' সার্ মার্টিন বলিলেন,—'আমি জানি তোমার কোনরূপ কুসংস্কার নাই। বোধ হয়, তুমি কল্য রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছ; আর সেই স্বপ্নের অসার ও অলীক কাণ্ড সত্য মনে করিয়াই, আজ এমন আকুল ও অধীর হইতেছ।' কথা শেষ হইতে না হইতেই, একটি ভৃত্য, কাল-চিহ্নাঙ্কিত একখানি চিঠি লইয়া ঐ ঘরে প্রবেশ করিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড চিঠিখানি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—'আহা, যাহা আশঙ্কা করিতেছিলাম, তাহাই হইয়াছে!—লর্ড টাইরণ জীবিত নাই!'

সার্ মার্টিন পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্রখানি লর্ড টাইরণের ষ্টুয়ার্টের লেখা। উহাতে প্রকৃতই লর্ড টাইরণের মৃত্যু-সংবাদ! লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, যে তারিখে, যে সময়ে, লর্ড টাইরণের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, ঠিক সেই তারিখে, সেই সময়েই, ঐ শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। সার্ মার্টিন বিস্মিত হইলেন; এবং আপনার মনের আবেগ সংবরণ

করিয়া, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডকে, শোক-সংবরণার্থ, নানা প্রকারে, সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতে লাগিলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড কিয়ৎকাল স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধির মত রহিয়া, শেষে বলিলেন, আমার শোক নাই,—আমি অনেক ক্ষণ হইল, শোক-সংবরণ ও চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়াছি। যাহা হউক, এই দুঃখের মধ্যেও, তোমাকে আমি একটি আশ্চর্য্য সংবাদ বলিব। তুমি শীঘ্রই একটি পুত্র সন্তান লাভ করিবে। এ সংবাদে কোন সংশয় করিও না। সার্ মার্টিন শুনিয়া প্রীতির সহিত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট কতিপয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড পুত্রবতী হইয়াছেন। সার্ মার্টিন প্রীত ও প্রফুল্ল। কিন্তু লেডী বেরেস্‌ফোর্ড তত সুখী হইতে পারিতেছেন না। সম্মুখে বৈধব্যের আশঙ্কা। পতি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবেন না, এই ভয়ে ও দুঃখে, তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তিনি নির্জ্জনে সদ্যোজাত শিশুর মুখ পানে তাকাইতেছেন, আর নীরবে অশ্রুপাত করিতেছেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন,—ছায়ামূর্ত্তির কথিত একটি কথাও মিথ্যা হইবার নহে। পুত্র জন্মিবার পরে, সার্ মার্টিন চারি বৎসর কএক মাস মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এখন বিধবা। তিনি, পতিহীনা হইলেও, নিঃসম্বলা নহেন; —পতিপরিত্যক্ত প্রচুর ধনসম্পত্তি তাঁহার ভোগ্য। তিনি, বিপন্না হইলেও, নগণ্যা নহেন;—এখনও পতির গৌরবান্বিত সুপরিচিত নামেই তাঁহার পরিচয়। অপিচ, তিনি, অনাথা হইলেও, অনাশ্রয়া নহেন,—দুটি কন্যা ও একটি শিশু পুত্র তাঁহার প্রাণের সম্বল। কিন্তু, তথাপি তিনি শোকাতুরা, এবং অহোরাত্র বিষাদ-মলিনা ও ক্লিষ্টা। পতিই স্ত্রীলোকের সকল আভরণের শ্রেষ্ঠ আভরণ,—সকল সম্পদের সার সম্পদ। বিধবা, যুবতী হইলেও, বৃদ্ধা; রূপবতী হইলেও বিরূপা; এবং প্রাসাদবাসিনী হইলেও, পথের কাঙ্গালিনী। প্রাণের অভ্যন্তরে প্রণয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস;—প্রণয়াস্পদ পতি পরলোকের অন্ধকারে;—শৈশব-সুহৃৎ, সহোদর-সদৃশ লর্ড টাইরণ স্বর্গগত। শোকাতুরা ও দুঃখবিহ্বলা লেডী বেরেস্‌ফোর্ড চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

ভারতীয় ঋষির ব্যবস্থানুসারে,—বিধবা তপোরত ব্রহ্মচারিণী। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যে দেশের বিধবা, সে দেশে বৈধব্য-ব্রতের কোনরূপ কঠোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তথাপি লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, কিঞ্চিৎপরিমাণে যতিধর্ম্মেরই অনুসারিণী হইলেন। তিনি শোক-পরিচ্ছদে শরীর ঢাকিলেন, সর্ব্বপ্রকার সুখ-সম্ভোগ ও বিলাস-বাসনা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন, এবং যার-পর-নাই দীন-দুঃখিনীর প্রাণে, দুটি কন্যা ও শিশু পুত্রটিকে বুকে আবরিয়া লইয়া, জীবন্মৃতের ন্যায়, স্বগৃহে নিরুদ্ধ রহিলেন। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড কোন সমাজে মিশেন না, ভোজে কিংবা আমোদ-প্রমোদে যোগ-দান করেন না। ছায়ামূর্ত্তির সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী, তাঁহার

প্রাণের ভিতরে, প্রতিনিয়তই যেন প্রতিধ্বনিত।

ছায়ামূর্ত্তি বলিয়াছেন,—চিত্তসংযম দ্বারা দ্বিতীয় পতি-গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলে, তাঁহার সমস্ত বিপদ কাটিয়া যাইবে। অতএব, তিনি সর্ব্বদাই সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও সাবধান। তিনি 'পার্য্যমাণে' কাহাকেও দেখা দেন না; আপনিও কাহারও পানে মুখ তুলিয়া দৃষ্টিপাত করেন না। মানুষের চক্ষুকে বিশ্বাস কি? আর আপনার চঞ্চল মনের প্রতিই বা আস্থা কি? তিনি প্রায়শঃ কোথাও যান না। যান কেবল একমাত্র প্রতিবেশী ধর্ম্মযাজকের গৃহে। উদ্দেশ্য,—ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ-গ্রহণে আত্মার পবিত্রতা লাভ।

কিন্তু, নিয়তির কঠোর-কর-রেখাকে কোথায় কবে সাধারণ লোকে অতিক্রম করিতে পারে? কালক্রমে, এই যাজক-গৃহেই লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের অধঃপাত ও সর্ব্বনাশের সূচনা হইল। যাজকের এক পুত্র ছিল। পুত্র প্রস্ফুট যুবা ও প্রিয়দর্শন; কিন্তু, কুসুমের অভ্যন্তরে বিষ-কীটের ন্যায়, তাহার প্রাণের অভ্যন্তরে, অতি প্রবল পাশব-লালসা ও আবিল ভোগ-পিপাসা। একদা কুক্ষণে যাজক-পুত্রের সহিত লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের চারি চক্ষে মিলন হইল। যুবকের চক্ষু আর ফিরিল না;—লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের—সেই সন্তানবতী সুন্দরী বিধবার বিষাদমাখা মলিন মুখে, না জানি কি দেখিয়া, কি বুঝিয়া, কি এক বিচিত্র মোহে, যাজক-পুত্রের লালসাকুল নয়ন লাগিয়া রহিল। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড অবনত মুখে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন। অনেক দিন পরে, সেই পাণ্ডুর গণ্ডে, ক্ষণকালের তরে, রক্তিমার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি রুমালের আবরণে তাহা লুকাইয়া ফেলিলেন; এবং আপনার দুর্ব্বলতায়, আপনি যার-পর-নাই লজ্জা অনুভব করিয়া, ভারাক্রান্ত প্রাণে, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এ সংসারে অনেকে একা থাকিতে পারে না। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এই শ্রেণির মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহার হৃদয়, শিশুকাল হইতেই, একা থাকিবার জন্য অযোগ্য এবং স্নেহ-লালসায় দুর্ব্বল। তাঁহার প্রাণটা, মহত্ত্ব ও উদারতায় পরিপূর্ণ হইয়াও, এমনই গঠিত যে, উহা যেন মুহূর্ত্তকালও আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত রহিতে অসমর্থ। তথাপি, ভবিষ্যদ্‌বাণী মনে পড়িল। তিনি সংকল্প করিলেন, যাজক-গৃহে আর কখনও যাইবেন না।

সংকল্প অতি সহজ কথা। সংকল্প-রক্ষায়ই প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই দিন হইতে, রূপসী বিধবা দিনে দশবার সংকল্প করিতেন, দশবারই সেই সংকল্প ভুলিয়া যাইতেন। যাজক-গৃহে যাতায়াতও প্রকৃত থামিল না। তাঁহার চঞ্চল চিত্ত, তাঁহাকে কিছু না বলিয়া, না বুঝিতে দিয়া, ধীরে ধীরে, যেন অজ্ঞাতসারে, ঐ যাজক-পুত্রের পক্ষপাতী হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার পতি-ধ্যান-নিরত পবিত্র হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেখানে যৌবন-শ্রী-সম্পন্ন কাল-সর্প-স্বরূপ, যাজক-পুত্রের প্রতিবিম্বও, চৌরের ন্যায়,

চারি ধারে, ঘুরিয়া ফিরিয়া, বিচরণ করিতেছে। কিন্তু তথাপি, তিনি আপনার চিত্ত-বৃত্তিকে যথাশক্তি সংযত রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন।

যাজক-পুত্র সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প। প্রথমে পিতা মাতার অমত ছিল। শেষে তাঁহারা পুত্রের আগ্রহে বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলেন। যুবক, লেডী বেরেস্-ফোর্ডের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণার্থ, উপস্থিত। যুবক, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই, তাঁহার চরণোপ্রান্তে জানু পাতিয়া উপবেশন করিল, এবং কহিল,—"আমি চলিলাম,—চিরজীবনের তরে চলিলাম। সৈনিক-ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। উদ্দেশ্য,—রণ-ক্ষেত্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন। আমার হৃদয়ে অন্ধকার। আমার জীবনের সমস্ত সুখ ও ভাবি সুখের আশা চিরকালের তরে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার এই বিপত্তির তুমিই একমাত্র কারণ।" বেরেস্‌ফোর্ডের বিধবা পত্নী, ভালবাসার উদ্বেল প্রবাহ বুকে চাপিয়া রাখিয়া, আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আত্মার সংকল্প, খর-বাহিনী স্রোতস্বিনীর তট-স্থিত ও তরঙ্গাহত বালুস্তূপের ন্যায়, ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংকল্পের দৃঢ়তা, বসন্ত-বাত-স্পৃষ্ট কর্পূরের ন্যায়, উড়িয়া গেল। অবলার চির-পরিচিত, পর-প্রীতি-কোমল, দুর্ব্বল প্রাণ আপন স্বভাবের পরিচয় প্রদান করিল। দ্বিতীয় পরিণয়ের পরিণাম—ঘোর বিপত্তি ও নিশ্চিত মৃত্যু। ইহা জানিয়াও, প্রণয়-মোহ-মুগ্ধা রমণী, নয়ন-জলে ভাসিতে ভাসিতে, সেই অশুভ পরিণয়ের অশুভ প্রস্তাবে,—হায় অতি অশুভক্ষণে—সম্মতি প্রদান করিলেন। তিনি, যুবকের সম্পর্কে, রূপজ মোহ অথবা করুণ-স্নেহকেই প্রণয় বুঝিয়া, বঞ্চিত হইলেন। অদূরদর্শিনী অবলার উচ্ছ্বসিত প্রীতি, কুসুম-তরু-ভ্রমে, বিষ-বৃক্ষকেই হৃদয়ে আলিঙ্গন করিল।

লেডী বেরেস্‌ফোর্ড এখন যাজক-পুত্রের পত্নী। সে হতভাগ্য যুবক মদ্যপায়ী, অপব্যয়ী ও যত-দূর-সম্ভব স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর। মনুষ্যত্বের প্রায় কোন উপকরণই তাহাতে ছিল না। লেডী বেরেস্‌ফোর্ড অল্প কএক দিনের মধ্যেই, তাঁহার নূতন পতির প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। পতির দৌরাত্ম্য ও অত্যাচারে, তিনি, বিত্তাপচয়ে বিপন্ন, সমাজে বিড়ম্বিত এবং নিজের সংসারে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। তিনি হত-মূর্খ যুবাকে ভাল বাসিতেন সেই পর-স্নেহ-লালায়িত প্রাণের টানে, সে তাঁহাকে আদর করিত পশু-ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে, এবং অর্থের প্রয়োজনে। লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের সরল হৃদয়ে, পতির স্বার্থ-পূর্ণ নির্দ্দয় ব্যবহারে. দারুণ আঘাত লাগিল। এখন আর তাঁহার প্রকৃতির সে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নাই,—সে সুখ-সংবর্দ্ধিত, সুশিক্ষা-মার্জ্জিত, সম্ভ্রান্ত-বংশ-সমুচিত সমুচ্চ জীবনের চিহ্নমাত্রও নাই। আছে ভগ্ন হৃদয়ে, আশার ভস্মস্তূপের নীচে, অনুতাপের তুষানল, আর কাতর-নয়নে অবিরল অশ্রুজল। তিনি অবশেষে এই নীচাশয় দুর্দ্দান্ত পতি হইতে পৃথক্ হইতে বাধ্য হইলেন। পৃথক্ হইলে পরে,

ভবিষ্যদ্‌বাণী হয়ত বা ব্যর্থ হইতে পারে, ইহা ভাবিয়াও, তিনি আবার আত্ম-জীবন-সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত রহিলেন। অমন পতির সহিত আর কখনও মিলিত হইবেন না, ইহাই কিছু দিনের তরে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। কিন্তু তাঁহার স্নেহ-তরল চঞ্চল-চিত্ত, দুদিন যাইতে না যাইতেই, আবার মোহমুগ্ধ ও বিবশ হইয়া পড়িল। যাজক-তনয়ের কাকুতি, মিনতি ও প্রতিজ্ঞাবাক্য তাঁহার অভিমান-শূন্য অমায়িক প্রাণের উপর কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি, আবার মোহে ভুলিয়া, তাঁহার সহিত পত্নীরূপে সম্মিলিত হইলেন।

অনেকের বিশ্বাস যে, ইউরোপের স্বাধীনা রমণী 'সর্ব্বত্রই' বড় ভাগ্যবতী ও নারী-জীবনের সুখ-ভাগিনী। লেডী বেরস্‌ফোর্ডও সেই স্বাধীন দেশেরই স্বাধীনা কুল-কামিনী। তিনি, তাঁহার অর্দ্ধজীবন অশেষ-সম্মান ও সুখ-সমৃদ্ধিতে অতিবাহিত করিয়া, প্রৌঢ়-বয়সে, প্রণয়মোহে, ধন-মান ও দেহ-প্রাণ একটা অর্ব্বাচীন, অমানুষ যুবকের হাতে তুলিয়া দিলেন। প্রণয়-বিবশা, প্রেম-পিপাসায় আত্মহারা হইয়া, অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন,—পাইলেন প্রেমের বিনিময়ে পদাঘাত, আর উদারতার বিনিময়ে, অকথ্য অপমান ও অসহ্য লাঞ্ছনা! অবশেষে অপাত্রে অর্পিত সেই প্রণয় ও জীবন, পুনরায় হাতে পাইয়াও, 'স্বাধীনা' অভাগিনী তাহা রাখিতে পারিলেন না। ইহাই কি স্বাধীনতা? আপনার উপর যাহার বিন্দুমাত্রও আধিপত্য নাই, হায় সেও কি স্বাধীন? যে স্বাধীনতা অনেক সময়েই এইরূপে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হয়, সে স্বাধীনতা অপেক্ষা হিন্দু বিধবার কঠোর যতিব্রত, এবং হিন্দু মহিলার অন্তঃপুর-নিরুদ্ধ পরাধীনতাও কি 'বহুস্থলে' সহস্র গুণে শ্লাঘ্য নহে। পতিপ্রাণা ও পূত-হৃদয়া ভারত-ললনা লেডী বেরেস্‌ফোর্ডকে নিতান্ত বিপথ-গামিনী রমণী মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায়, এইরূপ বিধবা-বিবাহের শত সহস্র বিকৃত-চিত্র অহোরাত্র সমাজের চক্ষে পড়িতেছে; বিজ্ঞ বিচক্ষণ সামাজিকেরা, সে সকল বিড়ম্বনা দর্শনে, হৃদয়ে কি মনে, কোন অংশেও বিচলিত হইতেছেন না।

দ্বিতীয় পতি হইতে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের ক্রমে দুটি কন্যা ও অবশেষে একটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু তাঁহার অবিরল-গলিত অশ্রু-ধারার বিরাম হইল না। তিনি, পুত্রপ্রসবের পর, এক দিন গণনা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই মারাত্মক সাতচল্লিশ বৎসর বয়স পার হইয়া গিয়াছে। ইহাতে অনুতাপ-দগ্ধা বিপন্না দুঃখিনীর প্রাণে, সেই দুখ-রাশির মধ্যেও, যেন ঈষৎ একটু আশার সঞ্চার হইল।

নবজাত পুত্রের বয়স, একমাস হইয়াছে। অদ্য, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জন্ম-দিন। লেডী বেট্টীকব্ তাঁহার প্রিয়তমা সখী। জন্ম দিন উপলক্ষে, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, প্রিয়-সখী বেট্টীকব্ ও আরও কতিপয় বন্ধু-বান্ধবকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রাতে সাতটার সময়, তাঁহার দীক্ষাগুরু সেই ধর্ম্ম-যাজক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ধর্ম্ম-যাজকের সহিত তাঁহার আশৈশব ঘনিষ্ঠতা। যাজক

জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি শরীরে কেমন আছ?' তিনি বলিলেন,—'এক রকম ভালই আছি। আজ আমার জন্ম দিন। আজ আমার আটচল্লিশ বৎসর বয়স আরব্ধ হইল। আপনি অদ্য আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন কি?' যাজক বলিলেন,—'কি? তোমার বয়স আট চল্লিশ? না,—না,—এ তোমার নিতান্তই ভ্রম। এ বিষয়ে তোমার মাতার সহিতও আমার মতদ্বৈধ ও তর্ক হইয়াছিল। কিন্তু এখন জানিতে পাইয়াছি, আমার কথাই ঠিক। এক সপ্তাহ হইল, তুমি যে পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ঘটনা-ক্রমে, আমি সেই পল্লীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানকার জন্ম-রেজেষ্টারী খুঁজিয়া, তোমার জন্ম-তারিখ খাটি জানিয়া আসিয়াছি। তদনুসারে অদ্য তোমার সাতচল্লিশ বৎসর বয়সের আরম্ভ।' লেডী বেরেস্‌ফোর্ড শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন,—'হায়! সত্যই কি আজ আমার সাতচল্লিশ বৎসরের প্রথম দিন,—তবে আর বিলম্ব নাই। আপনি আমার মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট জারি করিলেন। আমি আর কএকটি ঘণ্টা মাত্র জীবিত আছি।' এই বলিয়া, তিনি যাজককে তখনই চলিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কহিলেন,—'আপনি এখন আসুন, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে একটা গুরুতর বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হইবে।' যাজক, ইহা শুনিয়া এবং শিষ্যার তখনকার সেই ভাব ও অধীর মুখচ্ছবি দেখিয়া, অপ্রস্তুতের ন্যায়, ধীরে ধীরে বাহিরে গেলেন।

যাজকের চলিয়া যাওয়ার পর, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড, তাঁহার প্রথম পক্ষের দ্বাবিংশতি বৎসর-বয়স্ক প্রিয়তম পুত্র ও প্রিয়সখী লেডী কব্‌কে নিকটে ডাকিয়া, আত্মজীবনের সেই লোক-ভয়ঙ্কর গুপ্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিলেন। পুত্র ও সখী, সমস্ত শুনিয়া, একান্ত দুঃখিত, বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি কহিলেন, 'তোমরা ভীত বা দুঃখিত হইও না। আমার ধারণা ছিল, আমার বয়স আটচল্লিশ বৎসর। কিন্তু এক্ষণ নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিয়াছি, আমার বয়স আটচল্লিশ নহে, সাতচল্লিশ। পর-লোকবাসী ছায়ামূর্ত্তির ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হইবার নহে। আমি আর অল্পক্ষণ মাত্র জীবিত আছি। যাহা হউক, আমি এখন আর মৃত্যুকে বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। আমি যে অমূল্য ধনে বিশ্বাস হারাইয়া, আজীবন অশেষ-বিশেষে বিড়ম্বিত হইয়াছি, হায়, আমি জীবনের চরম মুহূর্ত্তে সেই আরাধনার ধন ফিরিয়া পাইয়াছি। আমি এক্ষণ প্রকৃত বিশ্বাস-ভক্তির পীযূষ-মন্ত্রে সুরক্ষিত। মনুষ্যের রিপু মৃত্যু। মৃত্যু এখন আর আমার কি করিবে? বস্তুতঃই আমি এখন নির্ভয়চিত্তে, এই নশ্বর দেহ হইতে চিরদিনের তরে, বিদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। আমার অঙ্গে একটি বিশেষ চিহ্ন আছে। মৃত্যুর সময় আর তাহা ঢাকিয়া রাখা অনাবশ্যক। সখি কব্‌ তুমি আমার মৃত্যুর পরে, আমার হাতের কিতাটা খুলিয়া দেখিও; আর বৎস, তুমিও কিতা ঢাকা স্থানটি একবার দেখিয়া রাখিও।' এই

বলিয়া পুত্রকে সম্ভাষণ করিয়া পুনরপি কহিলেন,—'বাবা, তোমার জন্ম-দুঃখিনী বিপথ-গামিনী, পতিতা জননী, জন্মের মত বিদায় লইতেছে। বৎস, আশীর্ব্বাদ করিও, তোমার দুঃখিনী মায়ের যেন অন্তিমে সদ্গতি হয়। আর আমার একটি অনুরোধ রাখিও। যদি জীবনে সুখী হইতে চাও, তাহা হইলে, যে রূপে পার, লর্ড টাইরণের কন্যার সহিত পরিণীত হইও। আমি এখন একটু ঘুমাই, তোমরা স্থানান্তরে প্রতীক্ষা কর।'

পুত্র ও সখী সাশ্রুনেত্রে সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। একটি পরিচারিকা মাত্র সেই কক্ষে নীরবে বসিয়া রহিল। দেড় ঘণ্টা কাল আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। অনন্তর হঠাৎ একটি করুণ শব্দ কানে পশিল। পুত্র ও সখী দ্রুতবেগে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—শয্যাতলে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের শূন্য দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। উভয়ে জানু পাতিয়া শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। লেডী কব্‌ সখীর হাতখানি ধরিয়া উঠাইলেন, এবং কিতা খুলিয়া দেখিলেন, লেডী বেরেস্‌ফোর্ড যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কর-গ্রন্থির পেশী সকল সঙ্কুচিত ও স্নায়ুসমূহ বিশুষ্ক!

কালে লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের পুত্র লর্ড টাইরণের কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া জীবনে সুখী হইয়াছিলেন। পকেট-বুক ও কিতা লেডী কবের নিকটে ছিল। তিনি, তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে, বহু বার, বহু বিজ্ঞ লোকের নিকট, শপথ-পূর্ব্বক এই কাহিনীর সত্যতা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইংলণ্ডের যে সকল সুসমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত লোক এই কাহিনী লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অধুনাতন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নামও শোনেন নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্তে অবিশ্বাস করিতে সাহস পান নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা ইহার সমস্ত ঘটনায়ই বিধাতার কর-রেখা পাঠ করিয়া ভয় ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, লেডী বেরেস্‌ফোর্ডের জন্যও, চরমে মুক্তি ও চিরন্তনী সুখ-শান্তি ব্যবস্থাপিত রহিয়াছে। কিন্তু, তাহা পরত্র ও উচ্চতর ধামে,—এবং আরও বহুবিধ শিক্ষাজনক পরীক্ষার পরে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "শ্রীমৎপরম-হংস শিবনারায়ণ স্বামি-কৃত—অমৃত-সাগর, শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণীর আনুকূল্যে প্রকাশিত।"—সম্পাদক গ্রন্থের আরম্ভেই স্বকীয় নিবেদনে লিখিয়াছেন,—"আসাম প্রদেশস্থ বগড়ীবাটীর ৵০ আনা অংশের জমীদার সত্যে নিষ্ঠাবতী শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণী

এই গ্রন্থ ছাপাইবার সমুদায় ব্যয় বহন করিয়া সম্পাদককে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।” আমরাও শ্রীমতী মাতা সুশীলাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, ধন-সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা, সজাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা বঙ্গে ভাগ্যবান্ ও ধন-সমৃদ্ধ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, উদার হৃদয়ে অগ্রসর না হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য আশার অনুরূপ বিকাশ লাভ করিবে না।

‘অমৃত-সাগর’ বৃহৎ গ্রন্থ,—রয়েল আট পেজী ৩৪৫ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। ইহাতে, পরমার্থ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, বিবাহের বয়স, বিবাহের লগ্ন, বিধবা-বিবাহ, ব্যাকরণের তত্ত্ববিচার, পূর্ণাভিষেক ও পূর্ণযোগ, এবং পৌরাণিক পূজা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পার্থিব কথারই আংশিক আলোচনা আছে। পরম-হংস-মহোদয় পর-দুঃখ-কাতর পবিত্র পুরুষ। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের নাম লইয়া বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি নির্ভয়ে ও নির্ম্মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন,—“যে বিধবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা, তিনি বিবাহ করিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। বিবাহ স্বাধীন বৃত্তির কার্য্য, স্ত্রী-পুরুষের সম্মতিতে সম্পন্ন হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ নিষিদ্ধ।” বিধবা-বিবাহ, কোন্ অবস্থায় বিধিসঙ্গত, এবং কোন্ অবস্থায় অবৈধ, আমরা এখানে,—এই ক্ষুদ্র সাহিত্যপত্রে, তাহার বিচার করিতে যাইতেছি না। বিচারে কতকটা অক্ষম। কিন্তু এক জন বিবেক-ধর্ম্ম-পরায়ণ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিবাহে স্বাধীনতার ব্যবস্থা দিতেছেন, ইহাতে অবশ্যই একটুকু বিস্মিত হইয়াছি। কারণ, সন্ন্যাসিদিগের মুখে এইরূপ সমাজ-সংস্কারের কথা প্রায়শঃ শোনা যায় না। এই গ্রন্থের অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে একটি প্রবন্ধের নাম ‘আরোগ্য বিষয়ে কর্ত্তব্য।’ তাহাতে ‘জোলাপের উপকরণ’ নামে একটি উৎকৃষ্ট পুষ্পপ্সন আছে। যথা,—‘মৌরী···১ তোলা, জাঙ্গি-হরিতকী···১ তোলা, সোনামুগীর পাতা···১ তোলা, গোলমরিচ···৭টা, লবণ···৵০ ওজন।’ ফলতঃ, এই বিষয়-বহুল বিশাল গ্রন্থে না আছে, এমন কথাই প্রায় নাই। যাঁহারা, দুটি ঘণ্টা কাল, এ গ্রন্থ লইয়া পরিশ্রম করিবেন, তাঁহারা, বিষয়-সন্নিবেশের শৃঙ্খলাকে প্রশংসা না করিলেও, অশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবেন। গ্রন্থোক্ত অনেক কথা, আমাদিগের বিবেচনায়, অমৃত-সাগর নামক গ্রন্থে একবারে অনাবশ্যক। কিন্তু, সে সকল কথাও আলোচনার যোগ্য। গ্রন্থের ভাষা সহস্র-হৃদয়-পূজাস্পদ জ্ঞান-গভীর স্বামিজির, না সম্পাদক মহাশয়ের, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। ভাষা কোন স্থলে যার-পর-নাই সরল, কোন স্থলে একবারে দুর্ব্বোধ; স্থানে স্থানে প্রচলিত রীতি-বিরুদ্ধ। আমাদিগের বোধ হয়, বহুদর্শী ও বহুতত্ত্বজ্ঞ স্বামিজি, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, ধীরে ধীরে উপদেশ করিয়াছেন, অন্যেরা তাহা যথাশ্রুত লিখিয়া লইয়াছেন। আমরা এই হেতু ভাষার সমালোচনে সাহসী হই নাই। স্বামি-মহোদয়ের

প্রসাদাৎ এবং সাহিত্যানুরাগী ও সদ্‌গুণান্বিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহনের প্রযত্নে, বাঙ্গালা সাহিত্য এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ লাভ করিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট। আমরা ভক্তির সহিত স্বামিজিকে প্রণাম করি।

২। “চরিত্র গঠন।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত;—এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।”—আমরা এই গ্রন্থের মুদ্রণ-শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। গ্রন্থের মূল্য ॥০ আনা মাত্র। জ্ঞানেন্দ্র বাবু, সুদূর এলাহাবাদ হইতে, এত অল্প মূল্যে, বাঙ্গালি পাঠককে এইরূপ সুচারু-মুদ্রিত পুস্তক উপহার দিতে পারিয়াছেন, ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। গ্রন্থখানি, ফুলের সাজির মত, নানাবিধ গদ্য-পদ্য ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সুসজ্জিত। কতক গুলি পাঁচ জনের গ্রন্থ-পত্র এবং বামাবোধিনী ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি সুপরিচিত পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু আগা গোড়া সমস্ত গ্রন্থই সুনীতিমূলক সদুপদেশে পরিপূর্ণ। গ্রন্থে, ভাষা বিষয়ে, অতি সামান্য একটুকু অসাবধানতার পরিচয় আছে। ইহা ভিন্ন আর কোন অংশেও কোনরূপ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। ভাষার এই সামান্য অসাবধানতা সংকলিত ও স্বপ্রণীত উভয় অংশেই সমান। যথা, প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠায়,—“শীলতাকে বিদায় দিলে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম লোপ পায়।”—শীল শব্দ বিশেষণ কি? আমরা যত দূর জানি,—ভয়ে ভয়ে কহিতেছি,—কারণ স্মৃতির উপর মনুষ্যের কখনই দৃঢ় নির্ভর হইতে পারে না,—আমাদের যত দূর মনে পড়ে, তাহাতে বোধ হয়, শীল শব্দ সকল স্থলেই বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অমরকোষের এক স্থানে আছে,—“শুচৌ তু চরিতে শীলম্,”—আর এক স্থানে আছে,—“শীলং স্বভাবে সদ্বৃত্তে।” ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, শীল শব্দ সর্ব্বত্রই বিশেষ্য। বিশেষ্যের পর তা প্রত্যয় করিয়া ‘শীলতা’ শব্দ সৃষ্টি করিলে, ‘চরিত্র’ শব্দের পরও তা প্রত্যয় করিয়া ‘চরিত্রতা’ শব্দ সৃষ্টি করা যাইতে পারে। কিন্তু ‘চরিত্রতা’ যেমন দুষ্য ও অব্যবহার্য্য, ‘শীলতা’ শব্দও সেইরূপ দুষ্য ও পরিত্যজ্য। এখানে ‘শীলতা’ না বলিয়া সুশীলতা বলিলেই সকল আপদ একবারে চুকিয়া যায়। আর এক স্থলে ‘আর পারি না’ নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে,—

“এ জগতে যদি আমরা আদর্শ উচ্চ, আশা অল্প এবং প্রাণ-পণ-যত্নে কর্ত্তব্যপালন করি, তাহা হইলে আশাতীত ফল প্রাপ্ত হই।” এই বাক্যে ঐ এক ক্রিয়াপদ ‘করি’ দ্বারা ‘আদর্শ,’ ‘আশা’ ও ‘কর্ত্তব্য’ এই তিনটি কর্ম্মপদ অর্থ-গত-প্রাঞ্জলতার সহিত সমানরূপে সমন্বিত হইতে পারে কি না, ইহাও বিশেষরূপে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ে পাঠ্য হইতে পারে বলিয়াই আমরা ভাষাগত রীতির সামান্য একটুকু আলোচনা করিলাম। গ্রন্থ মোটের উপর শিক্ষা বিভাগের আদর-যোগ্য, শিক্ষার্থীর উপকারজনক।

৩। “যুগান্তর—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী এম্.

এ. প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।"—এখানিও, 'চরিত্রগঠনের' ন্যায়, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, এবং মুদ্রণ-পারিপাট্যে পরিশোভিত। আমরা, গ্রন্থকার অথবা প্রকাশকের উদারতায়, প্রথম সংস্করণের 'যুগান্তর' উপহার পাইয়া, অনুগৃহীত হইয়াছিলাম। বহু দিনের পর, পুনরায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের 'যুগান্তর' উপহার পাইয়া অধিকতর অনুগৃহীত হইলাম। দেখিয়াই বোধ হইল, যেন একটি তিলক-ত্রিপুণ্ড্র-কলাঞ্ছিত, নামাবলী-পরিচ্ছাদিত, শান্ত-শিষ্ট শুদ্ধ-চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সহসা সে তিলকাদি মুছিয়া,—বেশ-পরিবর্ত্তনের দ্বারা, বড় দরের বাবু সাজিয়া, বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন; এবং সম্মুখস্থ সকলকে বিলাতী সভ্যতার সুরোচক ভঙ্গীতে সম্ভাষণ করিতেছেন। বস্তুতঃ, এ দেশের গ্রন্থ-মুদ্রণেও ধীরে ধীরে যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে। ইহা প্রেস ও প্রকাশকের বিশেষ সুখ্যাতির কথা।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রিমহাশয় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, এবং সর্ব্বাংশে পূজাস্পদ। তিনি হেম, নবীন, রবীন্দ্র ও বিহারীলালের ন্যায় কবি নহেন, কিন্তু সুকবি; কেশব, সুরেন্দ্র কিংবা প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় বক্তা নহেন, কিন্তু সুবাগ্মী; দীনবন্ধুর ন্যায় রস-সমুদ্র নহেন, কিন্তু সুরসিক; রাজকৃষ্ণ, অক্ষয়কুমার অথবা অক্ষয়চন্দ্রের ন্যায় সান্দর্ভিক নহেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট সন্দর্ভকার; বঙ্কিম শ্রীশ, তারক ও রমেশের ন্যায় ঔপন্যাসিক-কবি নহেন, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণির ঔপন্যাসিক; এবং ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় সরস-মধুর ব্যঙ্গ-কবি ও সুনিপুণ শব্দশিল্পী নহেন, কিন্তু বিদ্রূপ-পটু। বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে এক আধারে এত গুণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার অপাদান সংস্কৃত ও ইংরেজী। যাঁহারা ইংরেজী কাব্যসাহিত্য ও দর্শন-বিজ্ঞানে বিশেষরূপে অধিকারী নহেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদিগের পক্ষে বাঙ্গালা লেখা অনেক স্থলেই ব্যর্থ বাণিজ্য। কারণ, অধুনাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা প্রধান ভাগ ইংরেজী সাহিত্যেরই অনিচ্ছাকৃত ও অপরিজ্ঞাত অনুবাদ। ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভাষার শব্দবিন্যাস-ভঙ্গী, বাঙ্গালা ভাষার স্তরে স্তরে এমন আশ্চর্য্যরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কোনটুকু ইংরেজী, আর কোনটুকু খাটি বাঙ্গালা, কিংবা সর্ব্বাংশে দেশীয় বস্তু, তাহা অবধারণ করা কঠিন। যাঁহারা, প্রতিভাবলে ত্রিবেণীর তর্ক-পঞ্চানন,—ইংরেজী না জানিয়াও, ইংরেজী, ফারসী ও ফরাশি প্রভৃতি সমস্ত ভাষার সারতত্ত্বে সমান অধিকারী, তাঁহাদিগের কথা পৃথক্। কিন্তু, এখনকার দিনে, সাধারণ লোকের জন্য, ইংরেজী না জানিয়া বাঙ্গালা লিখিতে যাওয়া, সোনা না কিনিয়া স্বর্ণাভরণ-রচনার আয়োজনের মত। পক্ষান্তরে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অথবা সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা ব্যাকরণে, সামান্যরূপেও ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও, বাঙ্গালা লেখা কতকটা বৃথা শ্রম। বাঙ্গালা আর সংস্কৃত অবশ্যই এক ভাষা নহে। কিন্তু বাঙ্গালা

বহুল পরিমাণে, সংস্কৃতের অনুগামিনী। বাঙ্গালার কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস ও স্ত্রীত্ব পোনে ষোল আনা সংস্কৃত। এই হেতু, যাঁহারা সংস্কৃতে,—অথবা বাঙ্গালাভাষার অস্থিমজ্জাগত সংস্কৃতমূলক শব্দভাগে—একবারে অপ্রবিষ্ট, তাঁহারা অন্য প্রকারে অতি উজ্জ্বল ক্ষমতান্বিত হইয়াও, 'অভীষ্ট' স্থলে 'অভীষ্টনীয়,'—'প্রার্থনীয়' স্থলে 'প্রার্থিতনীয়' প্রভৃতি বিকট-বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষার উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় সমান অধিকারী। সুতরাং, তাঁহার বাঙ্গালা শিক্ষার্থিমাত্রেরই সুখ-সেব্য, ও নির্ভর-যোগ্য। তাঁহার গদ্য পদ্য—সমস্ত রচনাই সরল, মধুর, মনঃপ্রীতিক ও সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার এই যুগান্তরও, রচনার শুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ও প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি বহুবিধ প্রার্থনীয় গুণে, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেরই প্রিয়-পাঠ্য হইবে সন্দেহ নাই।

যুগান্তর উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস বলিলে এ দেশের পাঠক ও পাঠিকা, সাধারণতঃ যাহা মনে করিয়া, ঔৎসুক্যে অধীর এবং রস-পিপাসায় আকুল হন, ইহা সেই শ্রেণির উপন্যাস নহে। ইহাতে নায়ক আছে, নায়িকা আছে,—নায়িকার আশে পাশে ভাল মন্দ, ছোট বড়, অসংখ্য পাত্র ও পাত্রীর চিত্র আছে,—ইহার আখ্যায়িকায় অবশ্যই একটু প্রেমের কথা, পাশব-লালসার কথা, ছলনা, বঞ্চনা ও বিশ্বাস-ঘাতকতারও নানা কথা আছে। কিন্তু, তথাপি ইহা প্রচলিত পদ্ধতির উপন্যাস নহে। এ দেশের অধিকাংশ উপন্যাসই স্কট ও বুলওয়ার লিটন প্রভৃতির উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট, জ্ঞান-কৃত অথবা অজ্ঞান-কৃত অনুকৃতি। এখানি সে অংশে কতকটা নূতন ধরণের। ইহা এক খানি সম্মানার্হ ও সুচিন্তিত সমাজ-চিত্র। বঙ্গদেশের ভদ্র-সমাজ—বঙ্গীয় ধন-কুবের ভূম্যধিকারী অথবা ধন-হীন কৃষকদিগের কথা কহিতেছি না,—সমাজের যে ভাগ সাধারণতঃ ভদ্রলোক নামে কথিত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের সেই মধ্যবিত্ত কিংবা মেরুদণ্ডস্বরূপ ভদ্রসমাজ, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, কি অবস্থায় অবস্থিত ছিল, এবং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-রেখা-পাতে, সে অবস্থায়, কিরূপে ধীরে ধীরে একটি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ সামাজিক-জীবনে যুগান্তর ঘটিল, ইহা তাহারই ঔপন্যাসিক চিত্রপট, এবং পটের সর্ব্বত্রই শাস্ত্রিমহাশয়ের তুলি-চালন-নৈপুণ্যের পরিচয়। গ্রন্থখানি, অনুচিতরূপে বৃহৎ না হইলেও, আকারে পুষ্ট,—প্রায় চারি শত পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত, এবং আখ্যায়িকাটি একটু বেশী ধীর-মন্থরা। তথাপি, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত অংশই সুখ-প্রীতিকর এবং শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থকার একটি দেশ-ব্যাপী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বীকৃত নেতা, অথচ গ্রন্থখানি অসাম্প্রদায়িক উদারতার উজ্জ্বল নিদর্শন। আমাদিগের বড়ই দুঃখ রহিল, আমরা তর্কভূষণ ও বিজয়া প্রভৃতির চারু-চিত্রিত চরিত্র-পট প্রদর্শন করিয়া, এবং একটি একটি করিয়া চরিত্র ধরিয়া, গ্রন্থকারের চিত্র-কুশলতার পরিচয় দিতে পারিলাম না।

'কৃশ-তনু' বান্ধবের কলেবরে তাহা কুলায় না। কিন্তু, ইহা আমরা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি যে, যাঁহারা একটুকু অভিনিবেশের সহিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কতকগুলি নয়ন-মনোহারি চিত্র অথবা চরিত্রদর্শনে চিত্তে প্রীত, এবং প্রকৃতই জীবনে উপকৃত হইবেন। এই উপাদেয় গ্রন্থে মাতঙ্গিনীর কথাটা একবারে না থাকিলেই বোধ হয় ভাল হইত। যদি আলোক ও ছায়ার তার-তম্য-নিয়মানুসারে কৃষ্ণকামিনীর সুকুমার-সুন্দর সলজ্জ-শোভা দেখাইবার জন্যই, মাতঙ্গিনীর প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলেও, উহাকে লইয়া, এত নীচে নামিবার আবশ্যকতা ছিল না। আমরা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে, সাহিত্য-সম্পর্কে, বড় বেশী ভালবাসি, এবং অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। তাই, আমরা বান্ধবের প্রাণে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যুগান্তরের তৃতীয় সংস্করণে মাতঙ্গিনীর চিত্র কোন কোন অংশে বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে যত্ন করিবেন; এবং মাতঙ্গিনীর চিত্র-প্রদর্শনার্থ উপস্থাপিত উমাশঙ্করও যদি এমনই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে উহাকেও, পরিণামে, মনুষ্যত্বের গ্রামে, টানিয়া তোলা যায় কি না, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বঙ্গের অন্যতম মুখোজ্জ্বল পুরুষ। তিনি, অকালবার্দ্ধক্য-হেতু, সাহিত্যক্ষেত্রে শক্তির অনুরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন নাই। ইহা দেশের দুর্ভাগ্য। আমরা ভগবৎ-পাদ-পদ্মে প্রার্থনা করি, তিনি, সুস্থ-শরীরে সুদীর্ঘজীবী হইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার দ্বারা মাতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য যত্নপর হউন।

৪। "স্বাস্থ্য-সহায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন-কবিরত্ন-প্রণীত। কলিকাতা, ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।" —মনুষ্যমাত্রই সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু মনুষ্যের ইহা সর্ব্বদা স্মরণে থাকে না যে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। জ্ঞান, মান, যশ, পদ, প্রভুত্ব ও অর্থ-বিত্ত সুখের উপাদান বটে। কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকিলে, জ্ঞান উপার্জ্জন করে কে? আর জীব, যশের পুটুলিটুকু লইয়াই বা, কোথায় যাইয়া শান্তি অনুভব করে? জ্ঞানীরা, জ্ঞানের গৌরব-প্রদর্শনার্থ, কহিয়া থাকেন যে, পৃথিবীর অন্য সর্ব্বপ্রকার ধন চোর ও দস্যুর দ্বারা অপহৃত হইতে পারে। কিন্তু অমূল্য জ্ঞান-ধন চোর ও দস্যুর অনধিগম্য। এ কথা সত্য কি? ইহা স্বীকার করি যে, যাহারা, চোর ও দস্যু নামে, ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডিত হয়, তাহারা মনুষ্যের জ্ঞান-ধন চুরি করিতে পারে না। কিন্তু চোর ও দস্যু এক বৎসরে যে অপচয় করিতে না পারে, স্বাস্থ্যভঙ্গ অথবা রোগ, জ্ঞান-ধন সম্পর্কে, এক মুহূর্ত্তেই যে তাহা অপেক্ষাও সহস্র গুণ অধিক অপচয় করিতে সমর্থ, ইহা ইতিহাসে প্রমাণিত হয় নাই কি? ইহা মনুষ্যের জানা কথা,—ইতিহাসের দ্বারা বিশেষরূপে সমর্থিত কথা যে, অনেক প্রখর-বুদ্ধিশালী প্রতিভান্বিত পুরুষ, পঁচিশ-ত্রিশ-বৎসর, অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য-ভাণ্ডার হইতে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছেন,

স্বাস্থ্যভঙ্গের দরুণ এক দণ্ডে তাহা উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং, কিবা পণ্ডিত, কিবা মূর্খ, কিবা ধনী, কিবা নির্ধন, সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য যত প্রকার পার্থিব সম্পদে সম্পন্ন, তন্মধ্যে স্বাস্থ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। কবি কালিদাস ইহারও এক-টুকু উপরে উঠিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন,—

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

অর্থাৎ, যাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া পরলোকের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও শরীর-রক্ষার প্রতিই সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং, কালিদাসের মতে, পার্থিব অপার্থিব উভয়বিধ সম্পদই স্বাস্থ্যের অধীন। কিন্তু স্বাস্থ্য কি? কিরূপেই বা তাহা পরিরক্ষিত হয়? যাঁহারা এই গভীর তত্ত্ব-সম্পর্কে অল্প শ্রমে, অল্প সময়ে, এবং অত্যল্প অর্থ-ব্যয়ে, উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে চান, আমাদিগের বিবেচনায়, কবিরত্ন শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের এই 'স্বাস্থ্য-সহায়' নামক গ্রন্থ তাঁহাদিগের অবশ্য-পাঠ্য। গ্রন্থের মূল্য বার আনা মাত্র। যদি বার আনা মাত্র ব্যয়ে, জীবনে বারটি দিনও নীরোগ-নির্ম্মল-সুখে অতিবাহিত হইতে পারে, সে সুখ উপেক্ষার বস্তু নহে। গ্রন্থের ভাষা যার-পর-নাই সরল। পোনর বছরের বালক বালিকাও, পরের সাহায্য না লইয়া, অনায়াসে ইহা পড়িতে পারিবে,—পড়িয়া বুঝিবে; এবং যে মনোযোগের সহিত ইহা পড়িবে, নিশ্চয়ই তাহার উপকার হইবে। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মঙ্গল কামনা করেন, এবং তাহাদিগকে ভাল পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতে ভালবাসেন, ভরসা করি 'স্বাস্থ্য-সহায়' শীঘ্রই তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গ্রন্থকার সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় সুশিক্ষিত,—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার লেখায়, সকলের জন্যই শিখিবার সামগ্রী আছে। দুই এক স্থানে, কিঞ্চিৎ অর্থে 'কথঞ্চিৎ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইল। ইহা নিশ্চয়ই মুদ্রাকরের প্রমাদ।

৫। "সচিত্র চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য।—মহাকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন-কৃত ভূমিকা ও তীর্থবর্ণনা সহিত, তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲টাকা।"—এই গ্রন্থখানি, ভাষার উপযুক্ত-রূপ শুদ্ধি-রক্ষা-ভিন্ন, আর সকল অংশেই সৌভাগ্য-সম্পন্ন। বঙ্গোজ্জ্বল বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন; দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর, ইহা উৎসর্গ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সর্ব্বত্র সম্মানিত নামের সহিত ইহার নাম গাঁথিয়াছেন; মুক্তাগাছার প্রাতঃস্মরণীয়া ভূম্যধিকারিণী, দান-ধর্ম্ম-পরায়ণা শ্রীযুতা মাতা বিদ্যাময়ী দেবী গ্রন্থ-প্রার্থিত তীর্থ-সংস্করণ-কার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন,—এবং গ্রন্থকার, ইহাতে নানাবিধ শাস্ত্র-কথার সহিত, তীর্থযাত্রীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিবিধ সাংসারিক কথা সুকৌশলে গ্রথিত করিয়া, গ্রন্থ-খানির গৌরব বাড়াইয়াছেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার এবং ভারতভূমির পশ্চিমোত্তর-দক্ষিণ-প্রদেশের অনেকেই ত তীর্থ-কামনায় চন্দ্রনাথ যাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের পক্ষে এই গ্রন্থ শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের ন্যায় উপদেষ্টা, সুবিজ্ঞ পথকের ন্যায় পথ-প্রদর্শক, এবং সহৃদয় প্রিয়-সুহৃদের ন্যায় প্রমোদ-সঙ্গী ও কথার সাথী হইবে, সংশয় নাই।

এই গ্রন্থে, তীর্থ-বর্ণনা নামক অধ্যায়ে, সীতাকুণ্ড, লবণাক্ষ ও ব্যাসকুণ্ড প্রভৃতির বর্ণনা নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী হইতে উদ্ধৃত।

সে বর্ণনা কিরূপ হৃদয়হারিণী ও মনোমাদিনী, বঙ্গীয় পাঠকের নিকট তাহার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। মানুষ, অপরিজ্ঞাত দূর-দেশে, অকস্মাৎ আপনার প্রাণ-প্রিয় পুরাতন সুহৃজ্জনের দেখা পাইলে, আনন্দে ও বিস্ময়ে যেমন শিহরিয়া উঠে; আমরাও, এই অপরিজ্ঞাত গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে, অকস্মাৎ ইহার উপক্রম-ভাগে, নবীনের পুরাতন লেখার সন্নিহিত হইয়া, সেইরূপ শিহরিয়া উঠিয়াছি। আমরা একান্ত দুর্ভাগ্য; আজ পর্য্যন্তও সীতা-কুণ্ড-সদৃশ সর্ব্ব-জন-পূজ্য তীর্থদর্শনের সুযোগ পাই নাই। কিন্তু নবীনের জ্বলদক্ষর লেখা পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, ইহা এক দিকে যেমন ধর্ম্মার্থীর পুণ্য-তীর্থ, আর এক দিকে তেমনই জ্ঞান-মগ্ন ভাবুকের প্রাকৃত-তীর্থ, এবং সুতরাং সকলেরই দর্শনীয়।

"পুণ্য তীর্থ সীতাকুণ্ড!—শোভিছে উত্তরে
কনক চম্পকারণ্য। গর্জ্জিছে দক্ষিণে
হুঙ্কারি বাড়বানল—মানব-বিস্ময়!
পশ্চিমে নিরগ্নিকুণ্ড,—ব্যাস সরোবর।
বহিতেছে নিরন্তর পূর্ব্বে কল-কলে
কল-কণ্ঠা মন্দাকিনী—স্বর-প্রবাহিণী।
পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড। অপ্সরা-প্রদেশ!
জ্যোতির্ম্ময়, মনোহর! পরিপূর্ণ, মরি,
প্রকৃতির ইন্দ্রজালে;—জলেতে অনল,
অনল পাষাণে!" * * *

গ্রন্থের আবরণ-পত্রে লেখক বা প্রকাশকের নাম নাই। শুনিয়াছি, স্থানীয় অধিকারী বংশের কতিপয় শিক্ষিত যুবকের দ্বারা ইহা সংকলিত হইয়াছে। বহু দিন হয়, শরচ্চন্দ্র অধিকারী নামক একটি সুরূপ যুবার সহিত, বান্ধব-কুটীরে আমাদিগের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। আমরা, শরচ্চন্দ্রের উদার ও অমায়িক ব্যবহারে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে প্রীতি-স্নেহের চলন্ত তীর্থ-জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলাম। স্বর্গের বস্তু শরচ্চন্দ্র স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি কিংবা তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী এই গ্রন্থের সহিত অধিকার-সূত্রে সম্পৃক্ত। তাঁহাদিগের পরিশ্রম সফল হইয়াছে।

৬। "অতিথি, সচিত্র মাসিক পত্র। (বালক বালিকার জন্য)। প্রকাশক—শ্রীপ্রমথনাথ রায়, ৭৭নং দিগ্‌বাজার রোড, ঢাকা।" আমরা ক্রমে অতিথির তিন সংখ্যা উপহার পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। যাঁহারা অতিথির লেখক অথবা পোষক, তাঁহারা সকলেই শিক্ষানুরাগী সহৃদয় যুবা,—যার-পর-নাই প্রশান্ত-চরিত্র, অথচ উৎসাহ ও উদ্যমে পরিপূর্ণ। আমরা হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহাদিগের এই নবোদ্গত উৎসাহ সার্থক হউক। অতিথির আকৃতি যেমন সুন্দর প্রকৃতিও তেমনই মনোহর। এখন পর্য্যন্ত, ভালই চলিতেছে, আমাদিগের আশা আছে ক্রমে আরও ভাল চলিবে। অতিথির গদ্য-পদ্য উভয়ই বালকশিক্ষার উপযোগিনী বিবিধ সৎকথায় পরিপূর্ণ। তৃতীয় সংখ্যায় এমার্সনের জীবন-সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। এমার্সনের লেখা অল্পবয়স্কের অনধিগম্য হইলেও, প্রবন্ধটি আমাদিগের কাছে ভাল লাগিয়াছে। এই সাধুবৃত্ত, সদাশয় ও সমাজ-হিতৈষী অতিথি দীর্ঘজীবী হইলে, আমরা একান্ত সুখী হইব।

☞ আমরা, স্থানের অভাব-হেতু এই সংখ্যায়, বান্ধবের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ-প্রণীত "স্বামী না কি"? নামক ক্রমশঃ-প্রকাশ্য নবন্যাসের আর এক পরিচ্ছেদ প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"সে গেছে; এ ধরা হ'তে তাহারি পশ্চাতে,
অতুল সৌন্দর্য্য লুপ্ত তার;
ভস্ম তার মুষ্টিমেয় মিশে মৃত্তিকাতে,
চিহ্ন কিছু রহিল না আর।"*

বহু দিন হয়, নবদ্বীপের অনেকেই শচীর দুঃখে নয়ন-জলে ভাসিয়াছিল,—শচীর বিলাপ ও পরিতাপে হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিল। লোকে এখন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কেন না, শচী ইদানীং সর্ব্বাংশেই সুখ-সৌভাগ্যবতী। শচীর সংসার, সমৃদ্ধির ভাণ্ডার না হইলেও, সোনার সংসার। সর্ব্ব-জন-হিতৈষী, শান্ত-স্বভাব মিশ্র-পুরন্দর, কোন দিনও, বাড়ীতে কোনরূপ টোল করিয়া, বিদ্যা দান করেন নাই। কিন্তু, তথাপি তিনি, সুপরিচিত পণ্ডিতের মত, সর্ব্বত্রই পণ্ডিতের প্রাপ্য 'বিদায়' পাইতেন; এবং তিনি এই প্রকারে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, মিতাচার-পরায়ণা মধুর-স্বভাবা শচী, তাহার দ্বারাই সংসারের সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া, অতিথি-অভ্যাগতের পূজা ও দ্বারস্থ দুঃখি-ভিক্ষুরও সন্তর্পণ করিতে সমর্থ হইতেন। লোকে দেখিয়া বলিত, শচী কি সুলক্ষণা, শচী কি লক্ষ্মী মেয়ে; শচীর পুণ্যে জগন্নাথের কোন দুঃখ নাই। শচী নবদ্বীপের বালিকা। সুতরাং, নবদ্বীপের বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা চিরকালই তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন; এবং নীলাম্বরের সম্পর্কে তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন।

ঘরে আর কোন স্ত্রীলোক, কিংবা সঙ্গী-সাথী ছিল না। কিন্তু, শচীর স্বভাব-শীতল স্নেহশীলতার গুণে, সে অভাবও অভাব বলিয়া বোধ হইত না। যার একটা প্রাণ, নিঃস্বার্থ নিরভিমান ও নির্ম্মল প্রীতি-স্নেহে, সহস্র প্রাণে সুখ-শান্তি দান করিতে পারে, সে মানুষ না দেবতা? তার আবার অভাব ঘটে কিসে? পিপীলিকা যেমন তরল মিষ্ট বস্তুর মধ্যে একবারে ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসে, মানুষের প্রাণটাও বুঝি, সেই রূপ, পরের সরল ও তরল মিষ্ট প্রাণের মধ্যে একবারে ডুবিয়া রহিতে পারিলেই সুখানুভব করে। শচীর প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে, অনেকেই আপনার প্রাণ ও মন, শচীর প্রাণের মধ্যে,

* বঙ্গ-কবি-বরেণ্যা শ্রীমতী কামিনী রায়-জায়ার "আলো ও ছায়া" হইতে উদ্ধৃত।

যেন একবারে ডুবাইয়া রাখিতে ভাল বাসিতেন ; এবং দিবসের অনেক সময়ই, ছায়ার ন্যায়, শচীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। প্রিয়-সখী মালিনী দেবী, দণ্ডে দশ বার আসিয়া, সংবাদ লইতেন ; এবং মালিনীর আকর্ষণে, পাড়ার অনেক মেয়েই, মাঝে মাঝে, মিশ্র-গৃহে যাইয়া, স্বজনের ন্যায়, উপবিষ্ট রহিতেন। শচীর কনিষ্ঠা ভগিনীও, সেবিকার ন্যায়, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন ; এবং যখন একটু সুযোগ পাইতেন, তখনই, যেন প্রাণের কেমন এক টানে, শচীর কাছে চলিয়া যাইতেন। এই ঈর্ষ্যা-সঙ্কুল সংসারে, ভ্রাতৃ-স্নেহ যেমন একটি অপূর্ব্ব পদার্থ ; ভগিনীর প্রতি ভগিনীর অকৃত্রিম স্নেহও তেমনই এক দুর্ল্লভ সম্পদ। কিন্তু শচী আর তাঁহার কনিষ্ঠা সকল বিষয়েই এক প্রাণের মত ছিলেন।

শচীর আর এক সম্পদ ঈশানের অকপট স্নেহ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৃদ্ধ ঈশান, সাধারণ সেবক হইলেও, ভক্তি-নিষ্ঠা, স্নেহ-মমতা ও প্রকৃতির পবিত্রতা প্রভৃতি পূজনীয় গুণে, শচী ও তাঁহার শিশু-দ্বয়ের, প্রকৃত অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। ঈশান, তাঁহার আদরের ধন আমোদ-বিহ্বল গৌরাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই, এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; এবং একটুকু অবকাশ ঘটিলেই, বাড়ীতে যাইয়া, গৃহস্থালীর বিবিধ কার্য্যে, শচীর সহায়তা করিতেন। শচীর এ সকল সুখ-সম্পদের উপর, অতুল সম্পদ—সংসারে অতুল—সোনার পুতুল—বিশ্বরূপ ও গৌরাঙ্গ-বিশ্বম্ভর। নবদ্বীপে শচীর মত সুখ-সৌভাগ্যবতী কে ?

পাঠকের মনে আছে, বিশ্বরূপ যখন বৎসর বয়সের সময়ই, ব্যাকরণ, বাদার্থ ও দর্শনাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, অদ্বৈতাচার্য্যের সাহায্যে, ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। সেই বিশ্বরূপ এইক্ষণ সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, সকলের নিকট সুপরিচিত, পূর্ণায়ত যুবা ও বড় পণ্ডিত। শচী ও জগন্নাথের আর ভাবনা কি ? জগন্নাথ মিশ্র ক্রমে বৃদ্ধ ও অপটু হইতেছেন। বিশ্বরূপই এক্ষণ সংসারের সমস্ত ভার গছিয়া লইবেন, এবং পিতা মাতা ও প্রাণাধিক কনিষ্ঠ ভ্রাতার সকল আশা পূর্ণ করিবেন। যিনি, এই বয়সেই, নবদ্বীপে, উচ্চ-পদবীরূঢ় পণ্ডিত বলিয়া যশ ও মান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা না হইতে পারে কি ?

বিশ্বরূপের এইরূপ পাণ্ডিত্যের কথা অনেকের নিকট একটুকু অতিরঞ্জিত বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু, যাঁহারা নবদ্বীপ, বাকলা ও বিক্রমপুর-সমাজের সংস্কৃত-শিক্ষা-সংক্রান্ত পুরাতন ইতিহাসে অভিজ্ঞ, তাঁহারা ইহার কোন কথাই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে করিবেন না। অর্দ্ধ-শতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিক হইল, আলোক ও গোলোক নামক, নবদ্বীপের দুইটি ক্ষণজন্মা বালক, অতি অল্প বয়সেই,—বোধ হয়, ষোল কিংবা সতর বৎসর বয়সের সময়ে,—সমস্ত বঙ্গে সর্ব্বজয়ী পণ্ডিত বলিয়া পূজা পাইয়াছিলেন ; এবং যাঁহারা তখন, বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, 'একপত্রী' নামে, আমন্ত্রণ পাইতেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে, কিরাত-প্রসাদ-পুষ্ট কিরিটীর ন্যায়, প্রাধান্যের

আসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই আলোক ও গোলোকের নবদ্বীপে,—চারি শত বৎসর পূর্ব্বে,—বাসুদেব, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন প্রভৃতির অভ্যুদয়ের দিনে,—জাতীয় প্রতিভার অলৌকিক ও জীবন্ত উচ্ছ্বাসের যুগে, বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ একটুকু অলোক-সামান্য শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতে আবার বিতর্কের বিষয় কি ? বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে বিশ্বরূপের বিস্তারিত জীবন-বৃত্ত নাই। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। কিন্তু শচী ও জগন্নাথের জীবন-সর্ব্বস্ব মহাত্মা বিশ্বরূপ যে, যৌবনের আরম্ভ সময়েই, একটি জগদুজ্জ্বল অথচ নয়ন-শীতল আলোক-স্তম্ভের ন্যায়, নবদ্বীপের সহস্র নেত্র আকর্ষণ করিয়া ছিলেন, তাহা মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাস প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব কবিই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। যথা লোচনের চৈতন্য-মঙ্গলে ;—

"বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ—বিশ্বরূপ গুণধাম।
কি কহিব তার গুণ-চরিত্র-বাখান॥
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানয় সকল।
স্বধর্ম্মে তৎপর-বুদ্ধি সংসারে বিরল॥
স্বচ্ছন্দ-হৃদয় দ্বিজ-দেব-গুরু-ভক্ত।
পিতা মাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত॥
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত জানে সর্ব্ব-ধর্ম্ম-মর্ম্ম।
বিষ্ণুভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম্ম।
সর্ব্ব-লোক-প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি।
অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্ব জ্ঞানে নিষ্ঠ বুদ্ধি॥"

জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ, প্রায় সমস্ত দিনই অদ্বৈতের টোলে থাকিয়া, যোগ-শাস্ত্র ও ভক্তি-তত্ত্ব অধ্যয়নে আত্মবিস্মৃত রহেন ; এবং কোলের ধন গৌরাঙ্গও, পিতা ও ভ্রাতার শাসনে, যেন বড় দায়ে ঠেকিয়া, বাহির বাড়ীর এক খানি ঘরে বসিয়া, ইদানীং দুই বেলাই ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি ও কালি-কলম-পাত্তাড়ি লইয়া, কিছুকাল পরিশ্রম করেন। যখন দুই ভাই, মধ্যাহ্নে, ভোজন-গৃহে একত্র হন, তখন শচী দুই জনকেই তৃষিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, এবং মনে মনে কল্পনার মন্দির গড়েন। বিশ্বরূপ বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছে, শীঘ্রই বাড়ীতে বহু ছাত্র যুটাইয়া, বড় টোল করিবে। ভ্রাতৃ-স্নেহানুরক্ত বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গও, তাহারই কাছে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তাহারই মত, অথবা তাহা হইতেও অধিকতর উন্নত পণ্ডিত হইবে ;—এবং মিশ্রঠাকুর, এত দিনের পর, এই বৃদ্ধ বয়সে, দেশে বিদেশে যাতায়াত করিতে বাধ্য না হইয়া, জীবনে একটুকু শান্তি ভোগ করিবেন। শচীর মনে কি সুখ !

গৌরাঙ্গ শিক্ষাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত শিক্ষার কোন কথায় তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় নাই। কিবা ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি, কিবা কালি-কলম ও পাত্তাড়ি, ইহার কিছুই এখন পর্য্যন্ত তাঁহার ভাল লাগে না। তাঁহার ভাল লাগে গঙ্গার জলে সন্তরণ,—গঙ্গা-তরঙ্গ-নর্ত্তিত নির্ম্মাল্য-পুষ্প আহরণ,—খেলার সাথীদিগের সহিত নগর-পথে পরিভ্রমণ, এবং নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকের দ্বারা নাগরিক নর-নারীর চিত্তরঞ্জন। সমস্ত নবদ্বীপ তাঁহার নখ-দর্পণে। তিনি, ঐ বয়সেও, না জানেন, নবদ্বীপে এমন স্থান নাই ; না চিনেন, এমন জন নাই ; এবং তাঁহার

কর-স্পর্শে ও চরণ-রেণু-লাভে কৃতার্থ না হইয়াছে, বুঝি বা নবদ্বীপে এমন তরু-লতা নাই। জগন্নাথ মিশ্র যত ক্ষণ বাড়ীতে থাকিতেন, তত ক্ষণ বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে বাড়ীতে থাকিয়া লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে হইত। তবে, তাঁহার এই এক বিশেষ সুখ; মিশ্র ঠাকুর বাড়ীতে বেশী ক্ষণ অবস্থান করিবার সুযোগ পাইতেন না। যাঁহারা, টোল না করিয়াও, পণ্ডিতের মত উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগকে, সেই পরিমিত উপার্জ্জনের জন্য, অনেক সময়েই পর্য্যটন করিতে হয়। মিশ্র ঠাকুরেরও, প্রতিদিনই, কিঞ্চিৎ পর্য্যটন করিতে হইত; এবং ইহাতে গৌরাঙ্গের বড়ই সুবিধা ঘটিত। তার পর দাদা বিশ্বরূপ। তিনি ত অহোরাত্রই অদ্বৈতের টোলে। তিনি যখন বাড়ী থাকিতেন, তখনও আপনার পুঁথি পত্র লইয়াই ব্যাপৃত রহিতেন; গৌরাঙ্গের খেলা বেড়ায় বিশেষ কোন বাধা দিতেন না।

বাড়ীতে বিশ্বরূপের এক খানি পৃথক্ ঘর ছিল। সেই ঘরে তাঁহার গারু, ঘড়া, কুশাসন, কাষ্ঠপাদুকা, শয্যা-সামগ্রী, এবং শত-যত্নে সংগৃহীত পুস্তকাদি বড়ই পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত থাকিত। ভ্রাতৃভক্ত গৌরাঙ্গ ঐ ঘরে কখনও যাইতেন না, এবং ভ্রাতার পুস্তকাদির উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না। শচীর যখন প্রয়োজন পড়িত অথবা ইচ্ছা হইত, তখন তিনি একা ঐ ঘরে যাইয়া, বিশ্বরূপের কাছে কিছুক্ষণ বসিতেন, এবং তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া,—তাঁহার কাছে সংসারের অথবা স্বকীয় সুখ-দুঃখের পাঁচ কথা কহিয়া—চিত্তে একটুকু শান্তি লাভ করিতেন। কিন্তু, বিশ্বরূপকে এখন আর ঐ ঘরেও বড় বেশী পাওয়া যায় না। তাঁহার সেই স্নেহ-কোমল গভীর-হৃদয়ে, যেন ধীরে ধীরে, কেমন একটা পরিবর্ত্তের ভাব আসিয়া গাঢ়-বদ্ধ হইতেছে। চন্দ্রমঃশালিনী সুখ-শোভনা সায়ন্তনী যামিনী, নিশাবসানযোগ্য নীহার-রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইলে, সেই যেমন কিরূপ এক ঔদাস্যময়, ঈষদ্‌ভীতিজনক, অকাল-বার্দ্ধক্যের ভাব পরিলক্ষিত হয়, বিশ্বরূপের মুখ-কান্তিতেও এখন সেইরূপ কেমন একটা অকাল-বৈরাগ্যের বিরস-ভাব ছাইয়া পড়িতেছে। *

"না ভাবে সংসার-সুখ বিশ্বরূপ মনে
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্ত্তনে।
গৃহে আইলেও গৃহে ব্যভার না করে,
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে।"(বৃ)

কিন্তু, শচী বিশ্বরূপ-চরিত্রের এই পরিবর্ত্ত একেবারেই বুঝিতেন না; এবং যাহা কিছু বুঝিতেন, তাহাতেও চিত্তে কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করিতেন না। আগে জগন্নাথ মিশ্র বিষ্ণু-গৃহে নিত্য-নিয়মিত পূজা ও আরতির কার্য্য করিতেন; এখন বিশ্বরূপ, তদ্গত ভক্তির সহিত, সেই কার্য্য করিয়া পিতার শ্রম-ভার লঘু করিতেছেন। ইহা, সুখের না হইয়া, দুঃখ-দুর্ভাবনার বিষয় হইবে কেন? গৌরাঙ্গ অমন উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ও আনন্দ-চঞ্চল, তার পরিবর্ত্তে অগ্রজ বিশ্বরূপ এই রূপ ধীর, স্থির ও প্রশান্তগম্ভীর। ইহাতেই বা দুর্ভাবনার কথা কি? বিশ্বরূপ বয়স্থ ও বিশ্রুত-নামা পণ্ডিত হইয়াও, দুধের শিশুর মত, মায়ের কাছে অবনত রহিতেন; এবং শচী তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া হৃদয়ে যার-পর-নাই আনন্দ অনুভব করিতেন। মায়ের প্রাণে আর কি চায়? কোন কোন দিন বেলা দুই প্রহর হেলিয়া যাইত, বিশ্বরূপ তখনও ঘরে আসিতেন না। অদ্বৈত ও অদ্বৈত-সভার শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তবৃন্দ বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহারা বালক বিশ্বরূপকে ঘেরিয়া বসিতেন, বিশ্বরূপ তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-কথার সহিত ভক্তি-রসের মর্ম্ম-রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া মোহিত রাখিতেন।

"সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানের কৃষ্ণভক্তি সার,
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার।
* * *
বিশ্বরূপে ছাড়ি কেহ নাহি যায় ঘরে,
বিশ্বরূপ না আইসে আপন মন্দিরে।"(বৃ)

যখন অদ্বৈতের আদরে, অথবা ভক্তদিগের আবদারে, সময়ের এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিত, তখন স্নেহ-ব্যাকুলা শচী, গৌরাঙ্গকে দাদার জন্য পাঠাইয়া দিতেন; এবং গৌরাঙ্গ এক দৌড়েই অদ্বৈতের টোলে যাইয়া, দাদার পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ ধরিয়া, জোর করিয়া, টানিয়া লইয়া যাইতেন।

"রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে,
তোমার দাদারে গিয়া আনহ সত্বরে।
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায়,
আইসেন অগ্রজেরে লবার ছলায়।"

"সবারে করেন শুভ দৃষ্টি মনোহর,
* * *
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর।
ভোজনে আইসহ ভাই ডাকিছে জননী,
অগ্রজ-বসন ধরি চলিছে আপনি।
দেখি সে মোহন-রূপ সর্ব্ব ভক্তগণ;
চকিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ।"

ভক্তেরা যেমন দু'টি ভাইয়ের, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গের, রূপ দেখিয়া তাকাইয়া থাকিতেন, অদ্বৈত আচার্য্য স্বয়ংও তাঁহার নয়ন-পথের নিত্য অতিথি এবং অধ্যাপনার নিত্য বিঘ্নকারী এই অপরূপ বালককে দেখিয়া চিত্তে চমকিত হইতেন। তিনি মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেন যে, এই বালক কি মনুষ্য? মনুষ্যে কি কখনও এইরূপ রূপের ছটা সম্ভবপর হয়?

"মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়,
প্রকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি কহেন অদ্বৈত,
কোন্ বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত।
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ,
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন।"

গৌরাঙ্গ, প্রায় প্রতিদিনই, মায়ের ইঙ্গিত ক্রমে, ঠিক দুই প্রহরের সময়, অদ্বৈতের টোলে যাইয়া এইরূপ উপস্থিত হইতেন; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ তখন ধ্যান, ব্যাখ্যান কি অধ্যয়ন, যাহাতে কেন নিবিষ্ট না থাকুন, তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে তাহা হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইতেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, গৌরাঙ্গের এই ভালবাসার অত্যাচার, সকল

* "বদ প্রদোষ স্ফুট-চন্দ্র-তারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে।"

সময়েই, বিশ্বরূপের কাছে অমৃতের মত লাগিত। নয়ন-মনোহর গৌরাঙ্গ যখন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, দাদা এস বলিয়া ডাকিতেন, বিশ্বরূপেরও তখন কেমন একটু মোহের মত হইত। তিনি, আর একটি মাত্র কথা না কহিয়া, নিঃশব্দে তাঁহার সঙ্গ লইতেন।

এক দিন দুটি ভাই, কএকটি ছাত্রের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, অদ্বৈতের টোল হইতে এইরূপ বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময় পণ্ডিতবর জগন্নাথ মিশ্র হঠাৎ সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন, শচী আর তাঁহার সঙ্গিনীদিগের বিশেষ অনুরোধে, বিশ্বরূপের বিবাহের জন্য অনুরূপ পাত্রী খুঁজিতেছিলেন। তিনি যে সকল বালিকাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগের কোন্‌টি, রূপে ও গুণে, তাঁহার রূপ-নিধান বিশ্বরূপের উপযুক্ত হইবে, এই ভাবনায়ই তখন তাঁহার হৃদয়টাকে ভরিয়া রাখিয়াছে। তিনি, বিশ্বরূপকে পথে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার দিকে ক্ষণ-কাল সতৃষ্ণ ও সস্মিত-নয়নে চাহিয়া রহিলেন; এবং এই প্রকার রূপ-যৌবন-সম্পন্ন অসামান্য গুণবান্ পুত্রকে এখন পর্য্যন্তও বিবাহ দিতে পারিতেছেন না, ইহা চিন্তা করিয়া যেন একটুকু লজ্জিত, যেন একটুকু অনুতাপিত হইলেন।

জগন্নাথ ঐ সময় বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি, শুধু ঐ বিবাহের কথা এবং বিবাহযোগ্যা পাত্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে, বাড়ীতে ফিরিলেন। বিশ্বরূপও, কিছু ক্ষণ পরে, বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং পিতার মুখে আজি একটুকু অতিরিক্ত বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া, চিন্তায় বড় অভিভূত হইলেন।

"সমাধ্যায়ি-সনে কথা,—পুথি বাম-হাতে,
জগন্নাথ পিতায়ে দেখিলা রাজপথে।
ষোড়শ বরিষ পুত্র ভেল বয়ঃক্রম,
বিবাহের যোগ্য রূপ-যৌবন-সম্পন্ন।
এই মনঃকথা পিতা হৃদয়ে করিল,
বিশ্বরূপ-যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল।
চিন্তিতে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজ ঘর,
বিশ্বরূপ-বিভা দিব চিন্তিত অন্তর।
কথোক্ষণে বিশ্বরূপ দ্বিজ আইলা ঘর,
সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিল অন্তর।
তবে সেই মতে বিশ্বরূপ দ্বিজবর্য্য,
সুবিস্মিত পিতা দেখি বুঝিলেন কার্য্য।"
(চৈতন্য-মঙ্গল।)

সুখ ও দুঃখ, এসংসারে, চিরকালই, হৃদয় ও মনের অবস্থা-ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, অনুভূত হইয়া থাকে। যাহা এক জনের জন্য সুখ, তাহা আর এক জনের জন্য দুঃখ। যাহা এক জনের হৃদয়ে অসহনীয় দুঃখ, তাহা আর এক জনের হৃদয়ে অচিন্তিত-পূর্ব্ব উল্লাসময়-সুখ। পিতা, পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, এবং ব্যাকুলহৃদয়ে পুত্রের মুখখানি বারংবার তাকাইয়া দেখিতেছেন। এ দৃশ্য সংসারে প্রায় সর্ব্বসাধারণের চক্ষেই বড় পর-নাই সুখ-প্রদ। কিন্তু ইহা, অনন্যসাধারণ বিশ্বরূপের চক্ষে, অদৃষ্টের শাসনে, অতীব গভীর দুঃখজনক হইয়া উঠিল। পিতা জগন্নাথ মিশ্র, সকল সময়ই ত, বিশ্বরূপকে প্রীতি স্নেহের অমিয়-মাখা নয়নে নিরীক্ষণ করি

তেন। কিন্তু তাঁহার আজিকার 'সুবিস্মিত' দৃষ্টি, বিশ্বরূপের বৈরাগ্যময় হৃদয়ে, ঠিক একটা বহ্নি-শিখার মত অনুভূত হইল। তিনি তাঁহার পিতা মাতার কানা-কানির কথা পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ জানিতে পাইয়াছিলেন। তবে, তাঁহার ধারণা ছিল যে, পিতা, তদীয় বিবাহের জন্য, এত শীঘ্র অধীর হইবেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বুঝাইয়া বলিলে, পিতাকে এ উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু পিতার আজিকার ব্যবহারে, তাঁহার সে বিশ্বাস ও ধারণা একবারে বিলুপ্ত হইল। তাঁহার আত্মা একটা অভাবনীয় চিন্তার সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। আত্মার অন্তস্তল হইতে, যেন তাঁহার অস্থিপঞ্জর-ভেদ করিয়া, পুনঃপুনই এই এক প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল,—এখন উপায় কি?

বিশ্বরূপ, বয়সের কোন্ সময় হইতে, বিবাহ-বিষয়ে হৃদয়ে বিরুদ্ধ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থ-পত্রে যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাই অনুভব হয় যে, তিনি জীবনে কখনও বিষয়ের বিষ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না,—বিষয়-সুখের পঙ্কিল-প্রবাহে প্রাণের তরী ভাসাইয়া, আপনার মনোভীষ্ট সংসাধনার বিঘ্ন জন্মাইবেন, না, ইহাই পূর্ব্বাবধি তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। পক্ষান্তরে, পিতা মাতার প্রতিও তাঁহার বড়ই প্রবল ভক্তি ও প্রবল অনুরাগ। তিনি ক্ষণকালও যদি তাঁহার পিতা মাতার মুখচ্ছবিতে একটুকু মলিন ছায়া দেখিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার আর দুঃখের অবধি থাকিত না; এবং তিনি কি দিয়া ও কি করিয়া, তাঁহার দুঃখ-ক্লিষ্ট পিতা মাতাকে প্রফুল্ল রাখিবেন, এই ভাবনা ভিন্ন, আর কোন রূপ সাংসারিক ভাবনাই, তাঁহার স্বার্থ-চিন্তা-শূন্য উদার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এখন, এক দিকে তাঁহার সেই প্রাণারাধ্য পিতা মাতা, আর এক দিকে তাঁহার প্রাণ-নিহিত বৈরাগ্য-ধর্ম্মের ভয়ানক সংকল্প। দুইয়ের সামঞ্জস্য হয় কিসে? পিতা মাতার আজ্ঞা-লঙ্ঘন, কিংবা অপ্রিয় আচরণ মহাপাপ; অথচ আত্মার ব্রত-ভঙ্গ এবং হৃদয়ের সংকল্প-ত্যাগও, তাদৃশ উচ্চ-শ্রেণিস্থ হৃদয়িকের পক্ষে, অসহনীয় সন্তাপ। ইহার এখন উপায় কি? পিতা পণ্ডিত, তাঁহাকেও বরং বৈরাগ্য-ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু সংসার-স্নেহ-মুগ্ধা সরল-স্বভাবা মা জননী শচীকে তিনি কোন্ শাস্ত্রের কি কথা কহিয়া, তাঁহার হৃদয়ের বৈরাগ্যব্রত বুঝাইবেন। বিশ্বরূপের এই ধর্ম্ম-সমস্যা, আমাদিগের নিকট, একটা সামান্য কথা বলিয়াও, পরিগৃহীত হইতে না পারে। কিন্তু এখানে, এইক্ষণ, বঙ্গীয় ইতিহাসের যে সময়, অথবা যে যুগের কথা লিখিত হইতেছে, সেই সময়ের অথবা সেই যুগের আরও অনেকে, জগদীশ্বরের চরণারবিন্দ-লাভের জন্য, সংসারের সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা, বিশ্বরূপের ন্যায় মনস্বী না হইয়াও, আত্মায় তাঁহার মত অত্যুন্নত ব্রহ্মচর্য্যের ভাব পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা, কিরূপ ভাবের

স্রোতে, কেন হাবুডুবু খাইয়া, বিশ্বরূপের পথ লইয়াছিলেন, তাহা আমরা—বিষয়ের কীট ও বাসনার ক্রীড়নক—কিরূপে শুধু বুদ্ধির সাহায্যে অনুভব করিব?

বিশ্বরূপ আজি আর অপরাহ্ণে অদ্বৈতের টোলে যাইতে পারিলেন না। বাড়ীতেই রহিলেন। বাড়ীর যে ঘরটি, মঞ্চে মঞ্চে, তাঁহার পুস্তক-রাশিতে অলঙ্কৃত হইয়া, সারস্বত-সম্পদের প্রত্যক্ষ-বিহার-ভূমির ন্যায় শোভা পাইত, বিশ্বরূপ আজি সমস্ত অপরাহ্ণ সেই ঘরটিতেই অতিবাহিত করিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে, মায়ের কাছে বসিয়া, নানারূপ কথা দ্বারা, মায়ের একটুকু চিত্ত-সন্তর্পণ করিতে যত্ন পাইলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং বৈরাগ্যের মহিমা যেমনই কেন হউক না, বয়স ত সবে ষোল বছর। মানুষ কি, এই বয়সে, অনায়াসে, মায়ের ভালবাসা পাসরিতে পারে?—মাতৃ-স্নেহের দুশ্ছেদ্য রজ্জু ছেদন করতে সমর্থ হয়?

রাত্রি প্রভাত হইল। এই অনন্ত মানব-জগতে, যাহার অদৃষ্টে যাহাই কেন ঘটুক না, তাহারই রাত্রি প্রভাত হয়। বিশ্বরূপের রাত্রি প্রভাত হইল। শচা ও জগন্নাথেরও রাত্রি প্রভাত হইল। শচী যথারীতি গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৌরাঙ্গ, কত ক্ষণ, কোন প্রকারে, অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া, বাড়ীর অদূরে, সমান-বয়স্ক খেলার সাথীদিগের সহিত, খেলায় রহিলেন। খানিক পরে, জগন্নাথ মিশ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বেলা তখন দুই প্রহর। আহারের সময় উপস্থিত। শচী, অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহা পাত্রে পাত্রে সাজাইয়া, প্রফুল্ল-হৃদয়ে বসিয়া আছেন। বিশ্বরূপ বাড়ী আসিলেই, শ্রম-কাতর জগন্নাথ মিশ্র, পুত্র দুইটিকে লইয়া, আহারে উপবেশন করিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বরূপ কোথায়? অদ্বৈতের টোলে সংবাদ লওয়া হইল। গৌরাঙ্গ, এক দৌড়ে টোলে যাইয়া, দেখিয়া আসিলেন, বিশ্বরূপ সেখানে নাই। তবে বিশ্বরূপ এমন সময়ে কোথায় গেলেন? যিনি, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রীয় আলাপ ছাড়িয়া, তিলার্দ্ধের জন্যও স্থানান্তরে যান না। তিনি এই দুই প্রহরের সময়ে, অস্নাত ও অভুক্ত অবস্থায়, কোথায় যাইয়া রহিলেন?

জগন্নাথ মিশ্র বিষ্ণু-গৃহে অনুসন্ধান করিলেন। কেন না, বিশ্বরূপ অনেক সময়ই, সেখানে নীরব-নিষ্পন্দ ভাবে, চিত্রিত পুত্তলের ন্যায়, ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন। কিন্তু, মিশ্র ঠাকুর যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। অত বেলা হইয়াছে, তথাপি বিগ্রহের পূজা হয় নাই। পুষ্প-চন্দনাদি পূজার সমস্ত উপচার-সামগ্রীই, পাত্রে পাত্রে, অস্পৃষ্ট অবস্থায়, সজ্জিত রহিয়াছে। বিশ্বরূপ ত পূজায় কখনও এমন অবহেলা করেন না! হায় এ কি! তবে বিশ্বরূপ কোথায়? বাড়ীতে যে কয়খানি ঘর ছিল, জগন্নাথ তাহার প্রত্যেক ঘরে প্রবেশ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন;—সন্নিহিত প্রতিবেশীদিগের ঘরে ঘরে খবর লইলেন। কোথাও কোন খোঁজ নাই। কোথাও কোন খবর নাই!

ধীর-স্থির শান্ত-স্বভাব বিশ্বরূপ ত, বাড়ী আর অদ্বৈতের টোল ছাড়িয়া, ভুলিয়াও কখনও, উত্তরে কি দক্ষিণে এক পা এদিক্ ওদিক্ হন না। সেই বিশ্বরূপকে পাওয়া যাইতেছে না কেন?

দ্বিতীয় প্রহর বেলা, কেন পুত্র না আইলা,
পিতা মাতা চিন্তিত হৃদয়।
জগন্নাথ খোঁজ করে, চাহে পুত্র ঘরে ঘরে,
না পাইলা আপন তনয়॥" (চৈঃ মঃ)

পিতা মাতা এত ক্ষণ শুধুই চিন্তিত ছিলেন, ক্রমে তাঁহারা চিন্তায় আকুল ও অস্থির হইতে লাগিলেন। জগন্নাথ, আত্মহারার মত, এক দিকে ছুটিয়া বাহির হইলেন। ঈশান, কাহারও উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া, আর এক দিকে দৌড়িলেন। অদ্বৈতের টোলে অনেক ভক্ত ও অনেক ছাত্র। তাঁহারা সকলেই বিশ্বরূপকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। বিশ্বরূপকে পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া, তাঁহারাও সকলেই, পাগলের মত, চারি দিকে ছুটিলেন। কেহ, নবদ্বীপের উত্তর প্রান্তে, বেলপুকুরিয়া পল্লীতে, বিশ্বরূপের মাতামহ-নিবাসে দৌড়িয়া গেলেন। কেহ, গঙ্গা পার হইয়া, কুলিয়া ও বিদ্যানগর-প্রভৃতি স্থানে যাইয়া সংবাদ লইলেন। বিশ্বরূপ কোথায় গেলেন, কোন স্থানেই তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না কেন? অস্থির-মতি গৌরাঙ্গও, বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, দাদা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। হা মা শচী! তুমি কি তোমার নয়নের মণি বিশ্বরূপকে এ জীবনে আর কখনও দেখিতে পাইবে? তুমি বিশ্বরূপকে বিবাহ করাইয়া, ঘরে পুত্র-বধূ আনিবে বলিয়া, আশায় অধীর রহিয়াছিলে। তোমার সে আশা আর কি কখনও সফল হইবে?

বাড়ীর চারি ধারে, বিশেষতঃ বহির্ভাগে, লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে, বহির্ব্বঙ্গনে, বিগ্রহ-মন্দিরের দুয়ারে, একটি নিস্তব্ধ মূর্ত্তির মত, মৃত্তিকার আসনে, সন্তান-বৎসলা শচী। মুখে কোন কথা নাই, চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। মনে কি লইতেছে, তাহা মনোবুদ্ধির অগম্য করুণাসিন্ধু ভগবান্ বই আর কে জানিবে? শচী এক এক বার এ দিক্ ও দিক্ তাকাইতেছেন, আর মাঝে মাঝে, ঊর্দ্ধ-নয়নে, যেন সেই করুণা-সিন্ধুরই শ্রীপাদ-পদ্ম অন্বেষণ করিতেছেন। শচীর তখনকার অবস্থা কে চিন্তা করিবে? তাঁহার সোনার পুতুল বিশ্বরূপ কি গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিলেন, না মকর-কুম্ভীরের ভোজ্য হইলেন?

এরূপ অসহ্য ও অন্তর্দ্দাহি যন্ত্রণায়, প্রহরেক কি ছয় দণ্ড নিমেষের মত চলিয়া গেল। প্রায় এক প্রহর পরে, মিশ্র ঠাকুর, ধীরে ধীরে,—অতি-ধীর-পদ-ক্ষেপে, বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু, তাঁহার সেই সুখ-শান্তি-নিকেতন, প্রীতি-স্নেহের ক্রীড়া-ভবন, স্বহস্ত-রোপিত পুষ্প-বৃক্ষ-সুশোভিত পুরাতন বাড়ী, তাঁহার চক্ষে আর তাঁহার সে বাড়ী বলিয়া বোধ হইল না; এবং নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, রূপ দেখিয়া, যাঁহাকে শচী-হেন কন্যা দান করিয়াছিলেন, লোকে তাঁহার দিকে চাহিয়াও, আজি তাঁ-

হাকে আর সে জগন্নাথ মিশ্র বলিয়া অনুমান করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তের মধ্যে দুই দিকে কি দারুণ পরিবর্ত্ত! জগন্নাথ মিশ্র বাড়ীতে ফিরিলেন বটে; কিন্তু শচীর কাছে যাইতে সাহস পাইলেন না। যখনই শচীর কথা মনে হয়, তখনই তাঁহার শরীর ভয়ে কদলী-পত্রের ন্যায় থর থর কাঁপিতে থাকে। এ ভয়ের অর্থ কি? মানুষ, সুখের সময়ে, সকলের আগে, স্বজনের কাছে দৌড়িয়া যায়; এবং জীবনে কোন দুঃসহ দুঃখ ঘটিলে, সেই স্বজনকে এড়াইয়া, তাহা হইতে ভয়ে ভয়ে দূরে পালায়। ইহার কারণ কি? এরূপ ঔৎসুক্য ও ভীতির অন্তর্মূলে হৃদয়ের কিরূপ ভাব-প্রবাহ ক্রীড়া করে, তাহা মনুষ্য ভাবিয়া দেখে কি? মিশ্র ঠাকুর, বাড়ীর নিকটে যাইয়াও, প্রকৃত প্রস্তাবে বাড়ীর মধ্যে যাইতে সাহস পাইলেন না। স্তব্ধের মত বাড়ীর বাহিরে বসিয়া রহিলেন। পাছে শচীর সহিত চক্ষে চক্ষে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন শুধু এই চিন্তায়ই চিত্তের অভ্যন্তরে যম-যাতনার মত অনুভব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিপন্ন মিশ্র কত ক্ষণ—হায় আর কত ক্ষণ—আপনাতে আপনি এরূপ লুকাইয়া থাকিবেন? অগ্নি যেমন তৃণস্তূপের আচ্ছাদনে অধিক ক্ষণ ঢাকা থাকে না, অমঙ্গলের সংবাদও, এ সংসারে, তেমন অনেক ক্ষণ অপ্রকাশিত রহে না। বিশ্বরূপের সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। যাঁহারা, ভাগীরথীর পর-পারে যাইয়া, একটুকু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই, ঈশানের সঙ্গে সঙ্গে, সংবাদ লইয়া ফিরিলেন। বেচারা ঈশানের দুটি চক্ষু ফুলিয়া লাল হইয়াছে, এবং বক্ষঃস্থল চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। ঈশানের সঙ্গে প্রতিবেশীরাও সকলেই দর-দরিত অশ্রু-ধারায় আর্দ্র হইতেছেন;—এবং একে অন্যের মুখের পানে তাকাইয়া, নিরুদ্ধ-কণ্ঠের নীরব সম্ভাষণে, হৃদয়ের গভীর দুঃখ জ্ঞাপন করিতেছেন। কেহই মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতেছেন না। অথচ, সকলেই, বুকের মধ্যে একটা বৃহৎ কথার দুর্ব্বহ বোঝায় নিপীড়িত হইয়া, কষ্ট পাইতেছেন। কিছু ক্ষণ কানাকানির পর, প্রকৃত কথা প্রকাশ পাইল। নবদ্বীপের সর্ব্বত্রই মুহূর্ত্তের মধ্যে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, রাত্রি যখন পোহাইয়া আইসে, ঠিক এমনই সময়ে, বিশ্বরূপ এক খানি পুঁথি মাত্র কাখে লইয়া, একাকী ঘরের বাহির হইয়া, নবদ্বীপের মায়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন; এবং পিতা মাতার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিশ্বরূপ বিবাহে বিমুখ, বৈরাগ্যে দীক্ষিত;—অথচ বাড়ীতে থাকিয়া বিবাহ না করিলে, পাছে মা হৃদয়ে ব্যথিত হন, ইহা মনে করিয়াও নিতান্ত চিন্তান্বিত। তিনি, এই হেতু, আর উপায় না দেখিয়া, একবারে সংসারের সকল সুখ, সকল আশা, চিরজীবনের তরে, গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন, এবং গঙ্গার পর পারে যাইয়াই, এক সন্ন্যাসী গুরুর নিকট, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সুদূর দেশান্তরে আপনার পথে চলিয়া গিয়াছেন।

"বিবাহ করিব আমি নহে ত উচিত,
নহে বা জননী দুঃখ পান বিপরীত।
এই মনে, অনুমানে, রাত্রি সুপ্রভাতে,
বাহির হইয়া গেলা পুঁথি বাম হাতে।
গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈল।
গতমাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিল।
জনে জনে কানাকানি, কার্য্য হইল জানাজানি
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস ধারণ;
তোকানি মোকানি কথা, শুনে জগন্নাথ পিতা,
আচম্বিতে হরিল চেতন।" (লো)

সন্ন্যাস বলিলে এখন আর সুখ দুঃখ ও ভাল মন্দ বিশেষ কোন কথা মনুষ্যের মনে আইসে না। যাহা আপনা হইতে মনে আইসে, তাহা না আসিলে, অথবা তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারিলেই ভাল। কিন্তু, যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তখনকার সন্ন্যাসের নাম জীবন্মৃতি ও সন্ন্যাসীর নাম সজীবদেব। কারণ, যিনি শিরোমুণ্ডন ও দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারণ-পূর্ব্বক, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন, তাঁহার সহিত জনক-জননী, জন-সমাজ ও সংসারের আর কোন সংস্রব থাকিত না; এবং কোন কোন সন্ন্যাসী যতি-ধর্ম্মের এমন কঠোর নিয়ম পালন করিতেন যে, তাঁহাদিগকে কোন মনুষ্যই আপনার সমান-জাতীয় মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে সাহস পাইত না।

বৃদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র, যখন বিশ্বরূপের প্রকৃত সন্ন্যাস-বৃত্তান্ত বুঝিতে পাইলেন, তখন তিনি ক্ষণকাল অচেতনের মত রহিলেন; তার-পর, শিশুর মত ধূলায় লুটাইয়া, হা বিশ্বরূপ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। শচীর মনে এত ক্ষণ নিবু নিবু আশা ছিল। মায়ের প্রাণে উৎকণ্ঠা যেমন বেসী, আশাও তেমনই বেসী। তাই শচীর মনে আশা ছিল। তিনি, অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মনে এইরূপ ধুক-বুকি বিশ্বাস ছিল যে, বিশ্বরূপ অবশ্যই খানিক পরে ঘরে আসিবেন। যে বিশ্বরূপ, এ জীবনে, ভুলিয়াও কখনও, মায়ের অপ্রিয় আচরণ করেন নাই,—মায়ের মুখের পানে ম্লান মুখে দৃষ্টিপাত করিতেও সাহস পান নাই, সেই বিশ্বরূপ কি আজি কোন প্রকারেও তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারেন? তাঁহার বুকের ধন বিশ্বরূপ, কোথায় না জানি কি কাজে ঠেকিয়া রহিয়াছেন, এখনই আবার বুকে আসিয়া, তাঁহার তাপিত প্রাণটা শীতল করিবেন। কিন্তু, যখন বিকল-বিহ্বল জগন্নাথ মিশ্রকে সকলে ধরাধরি করিয়া শচীর কাছে লইয়া আসিল, এবং বিশ্বরূপের খাটি সংবাদ তাঁহার ঘূর্ণিগ্রস্ত ক্লিষ্ট-বুদ্ধিতে কষ্টে সৃষ্টে প্রবেশ করিল, তখন তাঁহার চৈতন্য রহিল না। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

হা মূর্চ্ছা! বুঝি এমন সময়ে তুমি ভিন্ন আর কেহই মনুষ্যের সুহৃদ্ কিংবা সহায় হইবার যোগ্য নহে। বুঝি ভগবান্ তোমাকে মনুষ্যের জীবন-রক্ষার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আজি মাতৃহীনা শচীকে মায়ের সুকোমল আলিঙ্গনে আবরিয়া রাখ,—মায়ের সুকোমল স্নেহে তাঁহার প্রাণটা রক্ষা কর। যে শোক, বুকের মধ্যে, তুষানলের ন্যায়, চিরকাল লুক্কায়িত রহিবে,—যাহা কখনও গভীর

দীর্ঘ শ্বাসে, অথবা হৃৎ-পঞ্জর-ভেদী হাহাকার-শব্দে পরিব্যক্ত হইয়া, সমীরকেও সন্তাপিত করিবে, এবং প্রতপ্ত অশ্রুজলে নিঃসৃত হইয়া, অবনীর বক্ষে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্পৃষ্ট হইবে, সেই অকথ্য শোকের প্রথম আক্রমণ হইতে তুমিই মনুষ্যকে চিরকাল রক্ষা করিয়া থাক।

জগন্নাথ মিশ্র, হাড়ে পাঁজরে দগ্ধ হইলেও, মাঝে মাঝে, সেই এক প্রকার শুষ্ক-সুস্থিরতার ভাব ধারণ করিয়া, বিবেক-বৈরাগ্যের দুই একটি কথা কহিতে পারিলেন। কিন্তু অভাগিনী শচী, কএকটি বৎসরের সামান্য একটুকু সুখ-শান্তির পরে, এই অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি চৈতন্যলাভের পর, "আমার বাবারে,—আমার বিশ্বরূপ ধনরে"—এইরূপ বলিয়া বলিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া, যে ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোকই কাঁদিয়া আকুল হইল। শচী স্বভাবতঃই বড় বেসী লজ্জাশীলা ছিলেন। বাড়ীর অতি নিকটস্থ প্রতিবেশীরাও কোন দিন তাঁহার মুখে একটি উচ্চ শব্দ শুনিতে পায় নাই। আজি তাঁহার সে লজ্জাও যেন একবারে লয় পাইল; এবং তাঁহার মুখে নানারূপ কথা ফুটিল। তিনি এক এক বার বিবশার মত হইতেছেন, আর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন,—"হা বাছা বিশ্বরূপ! তুই যে আমাকে মা বলিয়া ডাকিতি, ইহাই ত আমা-হেন কাঙ্গালিনীর পক্ষে লক্ষ ধন ছিল রে। আমি তোর ঐ মুখখানির দিকে চাহিয়াই ত আমার প্রাণের সকল সন্তাপ পাসরিয়া যাইতাম রে। তুই আমার সহিত কত কথা লইয়া কতই আখুটি করিতি। এখন কার সহিত তুই আখুটি করিবি? আর কেই বা তোর আখুটি রাখিবে? তুই ত ক্ষণকালও ক্ষুধার ক্লেশ সহিতে পারিতি না। এখন ক্ষুধার সময় তুই কার মুখের পানে তাকাইবি? আর কেই বা তোরে আদর করিয়া খাওয়াইবে? তুই কি তোর সেই লাল টুক্‌টুক্ তুলতু'লে পা দুখানিতে পথের কাঁটা ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিবি? হারে বাছা! না জানি তুই অন্তরে কি গভীর দুঃখ পাইয়া, আমার মুখে আগুন দিয়া, দীন-হীনের মত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলি। তোর পিতা এখন কোথায়? তিনি এ সময় তোর কাছে দ্রুত চলিয়া যাউন, এবং তোরে যাইয়া ধরিয়া ঘরে লইয়া আসুন। লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক, তিনি আমার পুত্র আমার কাছে আনিয়া দিউন। আমি তোরে আবার যথারীতি উপবীতি দিব, এবং তোরে বুকে জড়াইয়া, জীবন যাপন করিব।"

"তবে শচী দেবী শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি,
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোকে
কি লাগিয়া হইলা বিরক্ত॥
সে হেন সুন্দর গা, সে হেন সুন্দর গা,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
প্রহরেক ভোক তুমি, তিলেক সহিতে নার,
আখুটি করিবে আর কাথে॥
* * *
তুমি মা বলিয়া ডাক, সেই ধন লাখে লাখ,

মুখ চাঞা পাশরোঁ আপনা।
না জানি কি দুঃখ পাঞা, মোর মুখে আগি দিয়া
সন্ন্যাস করিলি দীনপনা॥
কতি গেলা তোর পিতা, যাউ বিশ্বরূপ যথা,
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে।
যে বলুক সে বলুক লোকে,
পুত্র আনি দেহ মোকে,
পুন উপবীত দিমু তোরে॥" (চৈঃ—মঃ)

শচীর সখী মালিনী, আর শচীর কনিষ্ঠা ভগিনী, পাড়ার আরও কএকটি পুরমহিলাকে লইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এইক্ষণ শচীকে ঘেরিয়া বসিলেন, এবং শচীকে সান্ত্বনাদানের জন্য নানারূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময়ে আর একটি অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। মালিনী প্রভৃতি কাহারও কোন কথায়, শচীর হৃদয়ে আত্মসংবরণ বিষয়ে যে শক্তির স্ফূর্ত্তি হয় নাই, সেই অচিন্তিত ঘটনায়, আপনা হইতেই, সেই শক্তি আসিয়া, শচীর সামান্য একটুকু স্থৈর্য্য সম্পাদন করিল। গৌরাঙ্গ এত ক্ষণ, বাড়ীর বাহিরে, দাদার অন্বেষণে ছিলেন। বাড়ীর সকলে যখন ধূলায় পড়িয়া, গড়াগড়ি দিয়া, চীৎকার করিতেছে, তখন তিনি দৌড়িয়া বাড়ী আসিলেন; এবং তাঁহার প্রাণের ভাই বিশ্বরূপ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গের প্রাণটা শিশুকাল হইতেই ভালবাসার একটা অপার অতল সমুদ্র। সে সমুদ্র যখন উথলিয়া উঠিত, তখন তাঁহার আর চেতনা থাকিত না।

"গোষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে ঊর্দ্ধরায়,
ভাইয়ের বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌররায়।
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি,
হইল ক্রন্দন ময় জগন্নাথ পুরী।" (বৃন্দাবন)

মায়ের প্রাণে আর এক দিক্ দিয়া ভয়ানক টনক লাগিল। শোকাহত প্রাণ ভয়ে শিহরিল। শচী বড় বেসী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; এবং গৌরাঙ্গকে কোলে করিয়া, তদীয় সান্ত্বনার জন্য, আপনার বুকের আগুন বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। পাঠকের ইহা বুঝিতে বাকী নাই যে, গৌরাঙ্গ, বালক হইলেও, সেই এক প্রকার বিস্ময়াবহ বালক। যার-পর-নাই অস্থির ও অবুঝ, অথচ না বুঝেন এমন কথা নাই। চৈতন্যলাভের পর, তিনি এক এক বার, ভাইয়ের জন্য, আকুল-প্রাণে ও উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিতেছেন; আবার মায়ের কোলে বসিয়া, পিতা মাতা উভয়কেই সান্ত্বনা দিতে যত্ন করিতেছেন। তাঁহার তখনকার সেই ভাবটি বড়ই হৃদয়হারি ও মধুর।

"বিশ্বম্ভর হেন কালে, বসিয়া মায়ের কোলে,
নেহারয়ে বাপের বদন।
কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতামাতা,
আমি তব করিব পালন।"
(চৈঃ—মঃ)

শিশুর মুখে এমন সুমধুর কথা শুনিলে, পিতা মাতার প্রাণটা ক্ষণকালের তরে আর্দ্র হয় বটে। কিন্তু প্রাণটা যখন দাব-দাহের জ্বলন্ত জিহ্বায় প্রথম জ্বলিয়া উঠে, তখন বোধ

হয় এইরূপ ভালবাসার কথাও উহাতে প্রবেশ পথ পায় না।

বিশ্বরূপের জন্য নবদ্বীপের অনেকেই কাঁদিল, অনেকেই হাহাকার করিল—অনেক পুত্রবতী মাতা আপনার কোলের শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়া, চক্ষের জলে ভিজাইল। কিন্তু, বিশ্বরূপের পিতা মাতার পর, বৃদ্ধ অদ্বৈতই তদীয় শোকে একটুকু বেসী অভিভূত হইলেন। বিশ্বরূপ, এই ফুটন্ত বয়সেই, সকলের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, আপনি বনবাসী হইবেন, ইহা অদ্বৈত স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেন নাই। অধ্যাপক অথবা গুরু, স্নেহ-মমতার আকর্ষণে, প্রায় পিতা মাতার মত। অদ্বৈত প্রকৃতই বিশ্বরূপকে নিতান্ত গভীর স্নেহে ভালবাসিতেন। বিশ্বরূপের শোকে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল; এবং তিনিও পুনঃ পুনঃ কপালে করাঘাত করিয়া, অবলার মত, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন। বিশ্বরূপের উপর, অপত্য-বাৎসল্যের ভাব ছাড়া, তাঁহার আর একটুকু অস্ফুট "আপনা-আপনি" ভাব ছিল। তিনি বিশ্বরূপের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ভক্তি-বিহ্বলতা দর্শনে বস্তুতঃই মোহিত হইয়াছিলেন। অপিচ, বঙ্গে ভক্তি-ধর্ম্মের বিস্তারবিষয়ে, বিশ্বরূপের উপরই এত দিন তাঁহার আশার চক্ষু ন্যস্ত ছিল। সে আশার মূলে সহসা একটা কুঠারের আঘাত পড়িল। অদ্বৈত-প্রতিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলীও, কতক স্নেহের আকর্ষণে, এবং কতকটা ঐরূপ আশা-ভঙ্গ প্রভৃতি কারণে, বিশ্বরূপের জন্য নিরন্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।—

"বিশ্বরূপ সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।
হরষে বিষাদ সবে ভাবে অনুক্ষণ॥
যেবা ছিল স্থান কৃষ্ণ-কথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সবাকার।
আমরাও না রহিব চলি যাব বনে।
এ পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ না দেখি যেখানে।

* * *

যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস,
বনে চলি যাব বলি সবে ছাড়ে শ্বাস।" লোঃ

এ দিকে, নবদ্বীপের বহুলোক আসিয়া, পণ্ডিতবর জগন্নাথ মিশ্রকে, নানারূপ সদুপদেশ দানে, প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ, তাঁহার হাত খানি হাতে তুলিয়া লইয়া, কেহ বা তাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞানে, তাঁহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া, এইরূপ বলিলেন যে, *—যদি কাহারও

* পাঠক, দেখিতে পাইবেন যে, উল্লিখিত কাহিনী, প্রায় সকল স্থলেই, অক্ষরে অক্ষরে, ভিন্ন ভিন্ন মূল গ্রন্থের লেখানুসারিণী। যথা চৈতন্য ভাগবতে,—"জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক, নিরন্তর ডাকে বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ। পুত্র শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল, প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল। স্থির হও মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে, সর্ব্ব-গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে। গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস, ত্রিকোটি কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস। হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার, সফল হইল বিদ্যা সকল তাঁহার। আনন্দ শেষ আরো করিতে জুয়ায়, এত বলি সকলে ধরয়ে হাতে পায়। এই কুল-ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর, পুত্র হইবে তোমার বংশধর। ইহা হইতে সর্ব্ব ঘুচিবে তোমার, কোটি পুত্রে কি করিবে এ যাহার।" ইত্যাদি—ইত্যাদি।

গোষ্ঠীতে একজন সন্ন্যাস-গ্রহণ করে, তাহা হইলে, সেই এক জনের সন্ন্যাসেই, গোষ্ঠীর সমস্ত নর নারী সর্ব্ব প্রকার পাপের ভোগ হইতে উদ্ধার পায়; আর, যিনি সন্ন্যাস করেন, লোকে তাঁহাকে মহাজন বলিয়া পূজা করে, এবং তাঁহার ত্রিকোটি কুল বৈকুণ্ঠবাসে চলিয়া যায়। সুতরাং, বিশ্বরূপের মত সার্থক-জন্মা মহাপুরুষের জন্য শোক কিংবা দুঃখ করা কর্ত্তব্য নহে। কেহ বা রূপের ডালি শ্রীগৌরাঙ্গকে মিশ্রঠাকুরের কোলে তুলিয়া দিয়া আদর করিয়া বলিলেন যে,—এমন সোনার চাঁদ যাঁহার নয়নের সান্নিধ্যে নাচিয়া বেড়ায়, এই সংসারে তাঁহার আবার শোক দুঃখ কিসে? এই অপরূপ বালকই মিশ্র-বংশ উজ্জ্বল করিবে।

জগন্নাথ মিশ্র বড় নম্রস্বভাব লোক ছিলেন। পাছে তাঁহার শোক-দুঃখে পাঁচ জনে সমধিক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা ভাবিয়াও তিনি যেন লজ্জিত ও দুঃখিত। তিনি, এই হেতু, প্রতিবেশীদিগের সম্মুখে, একটু শান্তভাব ধারণ করিলেন। কিন্তু বাহিরে ঐরূপ একটু শান্ত হইলেও, তাঁহার হৃদয়ে তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন কি? তিনি একবার বিশ্বরূপের সেই অনুপম রূপ-লাবণ্য এবং বিদ্যা-বুদ্ধি ও স্নেহ-সৌজন্য স্মরণ করিয়া অধীরের ন্যায় হাহাকার করিয়া উঠেন; আবার জ্ঞান-যোগে ও ভক্তির দৃঢ়-নির্ভরে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, শচীরে প্রবোধ দিবার জন্য দুই একটি হৃদয়-স্পর্শি কথা বলেন। ভক্তি-রসের কবি বৃন্দাবন দাস তাঁহার সে সময়ের গুটি-দুই কথা বড় আদর করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও ঐ কথা কয়টি এ স্থলে শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত উদ্ধৃত করিব।

"দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে,
যে কৃষ্ণ-চন্দ্রের ইচ্ছা, হইল সেই সে।
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেক শক্তি নাই,
দেহেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ, সমর্পিব তোমা ঠাঁই।"

এই পংক্তি চারিটিতে রচনার তেমন কারুকার্য্য নাই; কিন্তু ইহার অর্থ কিরূপ গভীর এবং ইহাতে ভক্তির নির্ভর ও ভগবৎ-পাদ-পদ্মে আত্ম-সমর্পণের ভাব কিরূপ সারল্যের সহিত পরিব্যক্ত হইয়াছে, সহৃদয় পাঠক তাহা চিন্তা করিবেন। এ কথা চারি শত বৎসরের। প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে, আর এক দেশে, আর এক প্রকার ঘটনায়, আর একটি ভক্তের মুখে ঠিক এমনই একটি কথা ফুটিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ভগবান্ দিয়াছেন; ভগবান্‌ই লইয়া গিয়াছেন। ভগবানের নাম মঙ্গলময় হইয়া রহুক।"* যে ভক্তি, শর-শয্যাগত-ভীষ্ম-প্রার্থিত ভোগবতী গঙ্গার পবিত্র ধারার ন্যায়, প্রাণের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া, বাহিরে প্রবাহিত হয়, তাহার ভাষা পৃথিবীর সকল দেশেই একরূপ।

বকুল ও পনস প্রভৃতি পত্র-বহুল বৃক্ষ যেমন, ঝঞ্ঝা-বায়ুর প্রমত্ত তাড়নে, কিছু ক্ষণ বিতাড়িত ও বিপর্য্যস্তবৎ হইয়া, ঝটিকার

* The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord". Job.

অবসানে, ছিন্ন-শাখ ও বিচ্ছিন্ন-পল্লব বিষণ্ণ-মূর্ত্তিতে, অল্পে অল্পে, স্থিরতা লাভ করে; হত-ভাগ্য জগন্নাথও, কিছু ক্ষণ পরে, সেইরূপ স্থৈর্য্য লাভ করিলেন। কিন্তু শচী? শচীর কথা আমরা ক্ষণ-কালের তরেও হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বরূপের সেই পুস্তকাদি-পরিবেষ্টিত পবিত্র গৃহখানি, শূন্য-পিঞ্জরের মত, সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বিশ্বরূপ বিহঙ্গ চির-জীবনের জন্য উড়িয়া গিয়াছে। চক্ষের উপর এই দৃশ্য লইয়া, জীবন যাপন করা মায়ের পক্ষে কিরূপ কঠোর পরীক্ষা, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও ইচ্ছা করি না।

বিবেক-বিগ্রহ বিশ্বরূপ, ইহার পর, তদানীন্তন ভূ-ভারতের কোন্ প্রদেশে,—কোথায়—কি ভাবে—কিছু কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, তাহা 'তখন' কেহ জানিতে পাইল না। জানিবার কথাও নহে। কারণ, সুতার টান অপেক্ষা প্রাণের টান বড় বেশী প্রবল। বিশ্বরূপের ঐ বয়সে,—ঐ রূপ সুকুমার-বাল্যে, এই পৃথিবীতে আর কে ঠিক ঐ প্রকার সুদুশ্চর কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানি না। তাঁহার স্নেহ-কোমল প্রাণটা তাঁহার পিতা মাতার প্রাণে শত সূত্রে বান্ধা ছিল। সে বাঁধনী ছিঁড়িয়া ফেলা কি সহজ কথা। সুতরাং, তিনি, আপনায় প্রাণের উপর কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, একবারে লোক-লোচনের অলক্ষ্য দূরে চলিয়া গেলেন; এবং মনুষ্য কি রূপে ভগবানের জন্য সর্ব্বাংশে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে, মানব-জাতিকে সেই আদর্শ-সন্ন্যাসের শিক্ষা-দান করিলেন। তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণের পর, কতিপয় বিশেষজ্ঞ সাধু-ভক্তের নিকট, শঙ্করারণ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

"জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য,
চলিলা অনন্ত পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।" [১]

বেলা যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন আত্মীয়-জনেরা গৌরাঙ্গ-বিশ্বম্ভরকে অন্য কোন বাড়ীতে নিয়া এক মুষ্টি খাওয়াইলেন। কিন্তু শচী ও জগন্নাথ, মালিনী ও ঈশান প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তেমনই পড়িয়া রহিলেন। কখনও উঠিতেছেন, কখনও বসিতেছেন, কখনও কখনও, উন্মত্তের মত 'ইতি উতি' চাহিতেছেন;—কখনও আবার নয়ন-জলে ভাসিয়া, শোকের আবেগে, অবরুদ্ধ-কণ্ঠে, সন্নিহিত শয্যায় ঢলিয়া পড়িতেছেন। শচীর গৃহে, সে দিন কেহই কাহাকেও, অন্ন-জল-গ্রহণের জন্য, অনুরোধ করিতে সাহস পাইলেন না। নিদ্রাও কাহারও প্রাণে, ক্ষণ-কালের তরে, শান্তি-দানে সমর্থ হইল না। দিবসের অবশিষ্ট সময়, কেমন যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত, আপনা হইতে চলিয়া গেল। শচী, চির-শোকাতুরা কুররীর ন্যায়, সমস্তটা রাত্রি, 'অহ হ' ধ্বনিতে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অতিবাহিত করিলেন।

ইতি কিশোর গৌরাঙ্গ-সন্দর্ভে বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস নামকঃ
প্রথমঃ স্তবকঃ পরিসমাপ্তঃ।

সংস্কৃত ভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা।

সংস্কৃত দেব-ভাষা। কিন্তু এই দেব-ভাষা ভারতীয় আর্য্যজাতির মাতৃ-ভাষা। পদমাধুর্য্যে, শব্দবৈভবে এবং ভাবগাম্ভীর্য্যে ও বর্ণনা বৈচিত্র্যে, ইহা জগতে অতুলনীয়। যখন পৃথিবীর অপরাপর দেশ ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন, ভারতে তখন এই ভাষায় বেদ ধ্বনিত সাম-গান উদ্গীত, উপনিষদ, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রথিত এবং কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়া জগতে জ্ঞানালোক বিস্তার করিতেছিল। কি লাটিন, কি গ্রীক, কি আরব্য, কি পারসিক, কি টেনিক প্রভৃতি প্রাচীন, অথবা বর্ত্তমান ইউরোপীয় ভাষাবলীর কোনটিই সংস্কৃতের সহিত তুলনীয় নহে। সংস্কৃত কত কালের প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা দ্বারাও এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। হিন্দুর বিশ্বাস, ইহা অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে। আধুনিক ভাষা-বিজ্ঞান (Philology) প্রভৃতি সংস্কৃত চর্চ্চারই ফল। মুসলমানের আধিপত্য সময়ে, ভারতের বহু সংস্কৃত অমূল্য গ্রন্থ বিদ্বেষ-বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। সেই ভস্মরাশিতে মানবীয় প্রতিভার কি মহার্হ রত্নরাশি চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কে বলিবে? ইহা শুধু হিন্দু জাতির নহে, মানব-জগতের দুর্ভাগ্য। এখন "গতস্য শোচনা নাস্তি" বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুসভ্য ও পরম বিদ্যোৎসাহী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় অনেক প্রাচীন বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। হিন্দুজাতি এই মহান্ উপকারের জন্য ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

সংস্কৃত মৃত ভাষা;—অর্থাৎ লোকের দৈনন্দিন কর্ম্মে ইহার ব্যবহার নাই সত্য, কিন্তু এই মৃত ভাষার আত্মা যে ভারতীয় ভাষাসমূহে এবং ইহার ভাবরাজি হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যতকাল হিন্দুর বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পৃথ্বীতলে বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বিলুপ্ত হইবে না। অথবা প্রলয়েও বুঝি বা ইহার বিলয় ঘটিবে না। হিন্দুজাতির প্রকৃতি, স্থিতি ও গতি এবং মানবজাতির জ্ঞানের প্রথমোন্মেষ সম্বন্ধে তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন অপরিহার্য্য। ইলিয়েড্, ইনিয়েড, প্যারাডাইজলষ্ট ও প্যারাডাইজরিগেন্ পাঠকরা যদি অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, তবে রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। সেক্ষপীয়র রচিত নাটকাবলী পাঠ করিলে মনে যদি অপূর্ব্ব আনন্দানুভব হয়, তবে মহাকবি কালিদাস

ও ভবভূতি রচিত অতুলনীয় নাটকসমূহও অবশ্য পাঠ্য। সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ একান্তই প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ করিতে হইলে, ইয়ুরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে আধ্যাত্মিক জগতের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও, সংস্কৃত ভাষায় অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। অধুনা ইউরোপীয় সভ্য জগতের সুধিগণ, যদিও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের নীরস জড়-বিজ্ঞানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে এক নূতন আলোকের নূতন আভা প্রদর্শন করিতেছেন, তথাপি অধ্যাত্মজ্ঞানের পুরাতন ভাণ্ডার সংস্কৃতকে উপেক্ষা করিলে, এ তত্ত্বে প্রকৃত উন্নতি লাভের উপায়ান্তর নাই। ভারতীয় মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক বলে, এবং ইয়ুরোপীয় সুধিগণ বিজ্ঞান বলে বলীয়ান্। তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনই যদি মানবীয় উন্নতির চরম আদর্শ, তাহা হইলে সংস্কৃত ও ইয়ুরোপীয় উভয়বিধ ভাষার জ্ঞান লাভ করা সমানরূপে প্রয়োজনীয়। কেবল ইংরেজী অথবা কেবল সংস্কৃত পাঠে কখনও এই অভীষ্ট সুসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব,ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতেরও আলোচনা একান্ত উচিত। এ বিষয়ে, বোধ হয়, কাহারও মতদ্বৈধ নাই। বর্ত্তমান কালে, স্কুল ও কলেজে সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয় সত্য। কিন্তু স্কুল প্রভৃতিতে যে প্রণালীতে যতটুকু সংস্কৃত শিক্ষা দান করা হয়, তাহাতে এই দুরূহ ভাষায় প্রকৃত অধিকার লাভ করার আশা বিড়ম্বনা মাত্র। ব্যাকরণ ও অভিধান সংস্কৃত ভাষার দুইটি চক্ষু স্বরূপ। পাণিনি, ব্যাড়ী, শাকটায়ন, ইন্দ্র, কাত্যায়ন, পাতঞ্জল, বোপদেব, ও দুর্গসিংহ প্রভৃতি মহামনস্বী পণ্ডিতগণ যে ভাষায় ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে ভাষায় জ্ঞান লাভ পক্ষে, উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী প্রভৃতি যথেষ্ট নহে। এতাদৃশ ব্যাকরণ পাঠে সংস্কৃত ভাষা সমুদ্রের পারগামী হওয়ার চেষ্টা ভেলকে সমুদ্র লঙ্ঘনের প্রয়াস তুল্য বিফল। তথাপি মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা চির-ঋণী। কেননা, তাঁহারই প্রসাদে, বঙ্গদেশে অন্ততঃ স্কুল কলেজে, সংস্কৃত-চর্চ্চা একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে যাহাতে স্কুল কলেজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সহজে ও অল্প সময়ে সম্যকপ্রকারে অধীত হইতে পারে, সে বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টিপাত করা উচিত। স্কুল ও কলেজে ছাত্রগণ সংস্কৃতের ঘণ্টাটি যে ভাবে অতিবাহিত করে, তাহা নিতান্ত হাস্যজনক। এ বিষয়, যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন, অতএব অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

যে ভাষার ভাণ্ডারে বেদ শীর্ষ-স্থানে বর্ত্তমান ও ষড়দর্শন, অষ্টোত্তর শতোপনিষদ্, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অসংখ্য উপপুরাণ, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শত শত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার গ্রন্থ, অগম্য ফলিত ও গণিত জ্যোতিষগ্রন্থ, কল্পগ্রন্থ, শিক্ষাগ্রন্থ, নিরুক্তগ্রন্থ, কোষ (অভিধান) গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহাকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নৈষধচরিত, শিশুপালবধ, কিরাতার্জ্জুনীয়, মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি অগণনীয় মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, সুশ্রুত, চরক, হারীত, বাভট, শানিহোত্র, অশ্ববৈদ্যক, পালকাব্য প্রভৃতি চিকিৎসা-শাস্ত্র, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য বিরচিত অপূর্ব্বগ্রন্থরাশি, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, মালতীমাধব, মৃচ্ছকটিক, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি অসংখ্য নাটক, সঙ্গীতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, চাণক্যনীতি, কামন্দকীনীতি, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎ কথা প্রভৃতি উপদেশ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, হর্ষচরিত, ভোজপ্রবন্ধ প্রভৃতি কথাগ্রন্থ, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য নানাবিধ স্তূপীকৃত অমূল্য গ্রন্থরাশি যে ভাষা ভাণ্ডারের ভাস্বর-রত্ন, সে ভাষা কদাপি উপেক্ষণীয় নহে। সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নে বৃথা কালক্ষয় করা অপেক্ষা, ইয়ুরোপীয় ভাষায় জ্ঞান লাভে জীবন মন অর্পণ করা, যাঁহারা শ্রেয়ঃকল্প মনে করেন, তাঁহাদের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, পৈত্রিক সম্পত্তি অবহেলায় নষ্ট করিয়া, কেবল পরকীয় ধনে জগতে কেহ কখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি ? যদি তাহা না হয়, তবে জাতীয় অতুল-সম্পদ,—রত্নরাজিতে উপেক্ষা দেখাইয়া, কেবল বৈদেশিক ধনে লোভ করিয়া প্রকৃত উন্নতি লাভের আশা দুরাশা মাত্র। পৈত্রিক সম্পদ না হইলেও, যথার্থ জ্ঞান-পিপাসুর নিকট

জ্ঞান-সমুদ্রের পীযুষ ধারা কখনও অবহেলার সামগ্রী নহে। এই হেতুই বিদ্যার্থী বিদেশিগণ, কণ্ঠে ভীষ্মের পিপাসা লইয়া, সংস্কৃত-সাহিত্য-সমুদ্রের সন্নিহিত হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাশি নিহিত না থাকিত, তবে মহাত্মা জোন্স্, কোলব্রুক, কাউয়েল, মনিয়ার উইলিয়মস্, বেবার, বপ্, গোলড্ষ্টুকর, মোক্ষমূলর, ডিউসেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ, কখনই অমন কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ভাষায় জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেন না। ফলতঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের অদম্য উৎসাহ এবং বলবতী জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াও, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রাজেন্দ্রলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, ভাণ্ডারকার, টেলানি, ভাউকানী প্রভৃতি দেশীয় সুধিগণ সংস্কৃত ভাষার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চার যে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিও আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখা কর্ত্তব্য। বৈদেশিক গণের বাহ্যিক বেশভূষা এবং আহার বিহারের হীন অনুকরণে জাতীয় উৎকর্ষ লাভের কোনই প্রত্যাশা নাই ;—উহা অধঃপাতেরই প্রসর পথ। বৈদেশিকদিগের মধ্যে অনুকরণীয় যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহাদিগের ঐ সাগরশোষিণী জ্ঞান-তৃষ্ণা, অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং কঠোর কর্ম্মানুরাগ।

সংস্কৃত ভাষার অসংখ্য গ্রন্থ ইংরেজী প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে।

সুতরাং, তর্কস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এক ইংরেজী শিখিলেই, যখন সকল তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তখন সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষা শিক্ষার্থ অত শ্রম স্বীকারে প্রয়োজন কি? কিন্তু কেবল অনুবাদ পাঠে মূলের ভাব ও রসাস্বাদন হইতে পারে না। কেন না, অনুবাদ ফটোগ্রাফ্‌মাত্র, তাহাতে মূলের বৈচিত্র্য উপলব্ধি করা দুরূহ, অথবা অসম্ভব। কেবল অনুকরণের উপর নির্ভর করিলে, অনেক সময় ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিতে পারে, অতএব মূলগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া, অনুবাদ পাঠ করিলেই সুবিধা হয়।

সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রে এবং অপরাপর গ্রন্থে যে সমুদয় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহার উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ করা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই সমুদয় আমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে, আমরা দেখিতে পারি না। যে সমুদয় শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিছুকাল পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বলিয়া উপহসিত হইয়াছিল, তাহাই আবার অধুনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতেছে,—আজ গঙ্গাজল, তুলসীপত্র ও গোময় প্রভৃতি পরম উপকারী বলিয়া আমরাও বিশ্বাস করিতেছি। কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। এইরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা উপোরক্ত বিষয় সমর্থিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ না বুঝাইয়া দিলে, আমরা কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে চাহি না, ইহা নিতান্ত লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। কেবল গড্ডলিকা প্রবাহে পরিচালিত হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইলে, জাতীয় উন্নতি সুদূর পরাহত হইবে। যাঁহাদের প্রতিভা অমানুষী ছিল, তাঁহাদের বংশধর হইয়া, আমরা কেবলই পরপ্রত্যাশী হইব, ইহা বোধ হয়, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নহে। ফলতঃ যতই স্থির চিত্তে পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই এই ধারণা প্রবল হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে, হিন্দুর পক্ষে ইংরেজী ভাষার অনুশীলন যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, সংস্কৃতের চর্চ্চাও তদ্রূপ অপরিত্যজ্য।

সম্প্রতি এ দেশে অনেকেই গদ্য পদ্য রচনাদ্বারা আমাদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালার পুষ্টিসাধন ও উৎকর্ষ বিধানে যত্নবান্। লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষার কোন ধার ধারেন না, তাঁহাদিগের সম্পর্কে বেসী কিছু বক্তব্য নাই। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা রচনাদ্বারা ভাষার না হইতেছে কোনরূপ শোভার স্ফূর্ত্তি, না ঘটিতেছে কোনরূপ ভাবের পুষ্টি। যাঁহারা ইংরেজীতে সুপ্রবিষ্ট, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা বিষয়-সম্পদে ও ভাবগৌরবে সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের বাঙ্গালাও আদর্শ বাঙ্গালার স্থান অধিকার করিতে পারে না। কারণ, তাঁহাদিগের ভাষায় সকল স্থানে শৃঙ্খলা থাকে না, কারক, সমাস ও তদ্ধিতের প্রয়োগে সময় সময় মারাত্মক দোষ ঘটে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। বাঙ্গালা সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎ প্রভৃতি বহুলাংশে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে অনুশাসিত। বাঙ্গালা ভাষাকে শব্দ সম্পদ ও রীতিসঙ্গত সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল করিতে হইলে, বাঙ্গালা লেখকদিগের ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায়ও বিশেষরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করা কর্ত্তব্য। অপিচ বঙ্গ ভাষাকে মনোজ্ঞ বেশ ভূষায় সজ্জিত করিতে হইলে, সংস্কৃত ও ইয়ুরোপীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে শোভন রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অলঙ্কৃতা করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমাদিগের মাতৃভাষা আশানুরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া ভুবনমোহন বেশে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিরাজমানা ও সকলের আনন্দ-বিধায়িনী হইতে পারিবে। ফলতঃ সংস্কৃত অনুশীলনকারী পণ্ডিতবর্গ ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত মহাত্মাগণের সমবেত চেষ্টাতে দেশের যে কি মহান্ উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। উপসংহারে অনুরোধ এই যে, উক্ত উভয় শ্রেণীর মহাত্মাগণ, প্রকৃত দেশ-হিতৈষীর প্রাণে এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান করুন। ভগবান্ তাঁহাদের সহায় হইবেন, এবং তাহা হইলে, আমরাও একদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিব যে, হিন্দুজাতি পুনর্ব্বার পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সভ্যজগতে বরণীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং শিক্ষাও সর্ব্বথা সার্থক ও সর্ব্বাবয়বে ফলবতী হইয়াছে।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
(মহারাজা,—সুসঙ্গ।)

রাণা কুম্ভ।

এমন সময়, নাগোরের শাসনকর্ত্তা ফিরোজ খাঁ পরলোক গমন করিলেন। এই নাগোরের ফিরোজ খাঁ রাণা মোকলের চিতোরগড় শিলালিপির "পেরোজ"* এবং গুজরাটের সুলতানের সম্পর্কিত। ফিরোজ খাঁর মৃত্যুর পর ফিরোজের ভ্রাতা মুজাহিদ খাঁ ভ্রাতুষ্পুত্র সাম্‌স্ খাঁকে গদিচ্যুত করিয়া স্বয়ং নাগোরের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্‌স্ খাঁ পলায়ন করিয়া মহারাণার শরণাগত হইলেন, এবং নাগোর পুনরধিকারের জন্য মহারাণার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কুম্ভ সাম্‌স্ খাঁর পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সাম্‌স্ খাঁকে একটি বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন। কুম্ভের পিতা রাণা মোকল একাধিকবার নাগোর আক্রমণ করিয়াছি-

* উক্ত শিলালিপি প্রকাশক অধ্যাপক কিলহর্ণ, "পেরোজ" এবং দিল্লীর তুগলাক বংশীয় সম্রাট ফিরোজসাহ একই ব্যক্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

লেন। ১৪১১ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার নাগোরের ফিরোজ খাঁকে পরাভূত করেন। * এই বিজয় উদ্দেশ্য করিয়াই প্রাগুক্ত শিলালিপিতে লিপিবদ্ধ আছে—

"নেতা পাতোত্তরাশাং যবন নরপতিং লুণ্ঠিতা শেষসেনং পেরোজং" * *

কিন্তু আর একবার নাগোর আক্রমণ করিতে যাইয়া মোকল স্বয়ং পরাভূত হয়েন এবং তাঁহার তিন সহস্র অনুচর নিহত হয়। পিতার এই পরাভব-কলঙ্ক সর্ব্বদাই যেন কুম্ভের মনে জাগরূক ছিল। ফিরোজ খাঁ জীবিত থাকিতে, তিনি এ কলঙ্ক অপনোদনের কোন সুযোগ পাইয়া উঠেন নাই। এইবার সাম্‌স্ খাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন, নাগোর পুনরাধিকৃত হইলেই সাম্‌স্ খাঁ নাগোর দুর্গের তিনটি কুন্দ্রা (চূড়া) ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। কেননা, তাহা হইলে "লোকে ত বলিবে, যদিও রাণা মোকল পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র দুর্গে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।" এ প্রস্তাবে তখন সাম্‌স্ খাঁর সম্মতি না দিয়া আর উপায় কি ?

কুম্ভ সসৈন্যে নাগোর যাত্রা করিলেন। রাণার আগমন সংবাদ পাইয়াই মুজহিদ খাঁ পলায়ন করিলেন ; এবং মালবে যাইয়া মামুদ খিলজির আশ্রয় লইলেন। সাম্‌স্ খাঁ তখন নাগোরের শূন্য গদি আরোহণ করিলেন। এইবার কুন্দ্রা ভাঙ্গিবার পালা আসিল। কিন্তু তাহাতে যেন বিলম্ব হইতে লাগিল। কুম্ভ কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া উঠিলেন; এবং দূত-মুখে বলিয়া পাঠাইলেন,—"ত্রফাই-ওয়াদা নমায়েদ"—"প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা হউক।" সাম্‌স্ খাঁ এখন একটা রাজ্যের রাজা, পাত্র, মিত্র, আমীর, উম্‌রা সকলই আছে। তাঁহাদের অভিমত না লইয়া, তিনি কি করিয়াই বা উত্তর দিবেন। সুতরাং নাগোরের সর্দ্দারগণকে ডাকিয়া তাঁহাদের সমক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। কিন্তু ইতি মধ্যেই লোকে † বলিয়া উঠিল, 'হায়! ফিরোজ খাঁ যদি কন্যা রাখিয়া যাইতেন, তবে সে কন্যাও বুঝি এই ভাবে তাহার নাম ডুবাইত না।' ফিরোজ খাঁ পুত্র কি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়টা তাঁহার মৃত্যুর ঠিক পরে হিসাব করিলে, এত গোল হইত কি? লোকের এরূপ ধিক্কারে ফিরোজ খাঁর পুত্র নিতান্ত লজ্জিত হইলেন ; এবং নাগোরবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "যে পর্য্যন্ত না আমার মাথা কাটা যায়, ততক্ষণ কুন্দ্রা নষ্ট করা অসম্ভব।" এই সংবাদ শুনিয়া কুম্ভ একটু বিপদে পড়িলেন। তিনি সাম্‌স্ খাঁর পৃষ্ঠবল হইয়া নাগোরে আসিয়াছিলেন ; তত রাজপুত সৈন্য আনয়ন করা প্রয়োজনবোধ করেন নাই। এখন কুন্দ্রা ভাঙ্গিতে হইলে, সাম্‌স্ খাঁকে দণ্ড দিতে হইবে ; এখন প্রচুর সেনা আবশ্যক। সুতরাং, এ যাত্রা নাগোর আক্রমণে বিরত থাকিয়া মিবারে ফিরিতে হইল। অনতিকালমধ্যেই উপযুক্ত সেনাবলসহ আবার নাগোরের সীমান্তে উপনীত হইতে পারিলেন, মিবার আক্রমণ না করিলে, রাণা নাগোর পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং অবিলম্বে স্বয়ং সসৈন্যে মিবার যাত্রা করিলেন। তখন খৃষ্টাব্দের ১৪৫৬ সাল।

* তাবাকাত্-ই-আকবরী", ৪৫১ পৃঃ।

† "বাজে গুফ্‌তন্দ্।"

...ন। সাম্‌স্ খাঁ রাজপুত সেনার গতিরোধ ...রিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পরাজিত হ...া দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু দুর্গে থা...তে সাহসী হইলেন না। সৈন্যসামন্তগণের ...পর দুর্গ রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং ...কদল সেনা সমভিব্যাহারে,সপরিবারে গুজ...টের রাজধানী আহম্মদাবাদ অভিমুখে যাত্রা ...রিলেন। কুম্ভ নাগোর অবরোধ করিলেন।

গুজরাটের অধীশ্বর সুলতান কুত্‌বুদ্দীন সাম্‌স্‌খাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং সম্পর্ক আরও দৃঢ় করিবার জন্য, সাম্‌স্‌খাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। হতভাগিনী বালিকা! ইহার চারি বৎসর পরে, যখন কুত্‌বুদ্দীন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তখন এই বালিকার উপর বিষপ্রয়োগের দোষারোপ করা হইয়াছিল ; এবং কুত্‌বুদ্দীনের মাতার আদেশে, ইহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল! বিবাহ উৎসবের অবসানে, নাগোরের উদ্ধারসাধনের জন্য,গুজরাট হইতে একদল সেনা প্রেরিত হইল। সাম্‌স্‌খাঁ জামাতার দরবারেই রহিয়া গেলেন। এই উদ্ধার সাধনার্থ প্রেরিত সেনাদলের পরিণামে কি হইল, ঠিক জানা যায় না। ইহারা আর ফিরিল না। নাগোর হইতে আহম্মদাবাদে সংবাদ পঁহুছিল, "রাণা কুম্ভ নাগোর রক্ষিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া,বহুসংখ্যককে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং দুর্গের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী জনপদনিচয় বিদলিত এবং বিলুণ্ঠিত করিতেছেন।" এইবার কুত্‌বুদ্দীন বুঝিতে

গুজরাটপতি আরাবল্লীশৈলশ্রেণীর ভিতর দিয়া উত্তর মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে আবুর ভীল (?) সর্দ্দার কিতাপোদা সুলতানের শরণাপন্ন হইল। রাণা কিতাপোদার দুর্গটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কিতাপোদা এখন দুর্গটি পুনর্লাভের জন্য কুত্‌বুদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কুত্‌বুদ্দীন ভীল সর্দ্দারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন না। ইমাদুলমুলুক উপাধিধারী একজন সেনাপতিকে এক দল সৈন্যসহ আবুদুর্গ উদ্ধারে নিয়োগ করিয়া স্বয়ং কমলমীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু এ যাত্রা কিতাপোদার মনোরথ সফল হইল না। আবু দুর্গ আক্রমণ করিতে যাইয়া ইমাদুলমুলুক পরাভূত হইলেন এবং তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইল। তখন কুত্‌বুদ্দীন দেখিলেন, যদি এই দুর্ঘটনার প্রতিকার করিতে হয়, তবে ইমাদুলমুল্‌কের পৃষ্ঠপোষণার্থ আরও যোদ্ধা প্রেরণ করা আবশ্যক। অথচ ঐদিকে আর যোদ্ধা প্রেরণ করিতে গেলে, মিবার আক্রমণই ক্ষান্ত রাখিতে হয়। সুতরাং, তিনি সেরূপ সংকল্প মনেও স্থান দিলেন না, এবং ইমাদুলমুলুক্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 'গুজরাট প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, আবু অধিকার করিয়া দিব,' কিতাপোদাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন।

গুজরাট সৈন্য যখন সিরোহীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন শিরোহীর রাজা উহাদের গতিরোধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিরোহীর রাজা মহারাণার একজন সম্পর্কিত এবং সমর্থনকারী। কিন্তু সিরোহীরাজের ক্ষুদ্র সেনাবল গুজরাট সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। কুত্‌বুদ্দীন অবাধে মিবারে প্রবেশ লাভ করিলেন, এবং নানাদিকে সৈন্য প্রেরণ করিয়া জনপদ লুণ্ঠন এবং দেব-মন্দির ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। "যখন কমলনীরে উপনীত হইলেন, রাণা কুম্ভ দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলেন, এবং বহুসংখ্যক সৈন্যকে মৃত্যুমুখে অর্পণ করিয়া, দুর্গে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। রাণা প্রতিদিন দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এবং উহারাও তৎক্ষণাৎ পরাস্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে তাড়িত হইতে লাগিল। অবশেষে, কুম্ভ বিনীতভাবে যথোচিত পেশকস্ প্রদান করিলেন। সুলতানও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহম্মদাবাদ চলিয়া গেলেন।" কুত্‌বুদ্দীন পেশকস্ পাইয়াই যেন কৃতার্থ হইলেন। নাগোর সম্বন্ধেও কোন কথা পাড়িলেন না, এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, কিতাপোদার দুর্গটির দিকেও একবার চাহিলেন না।

৪

পাঠকের স্মরণ আছে, নাগোরের মুজাহিদ খাঁ পলায়ন করিয়া মালবের সুলতানের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং, গুজরাট এবং মিবারে যে বিবাদ চলিতেছিল, তৎসম্পর্কে মামুদ একবারে উদাসীন ছিলেন না। তিনি বিগত দশবৎসরের মধ্যে, একটি বারও মিবার আক্রমণ করেন নাই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া মিবারজয়ের বাসনা একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। শুধু মালবের সেনাবল লইয়া কুম্ভকে নির্জিত করা সুসাধ্য নয় বলিয়া, তিনি এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। কুত্‌বুদ্দীনের পেশ্‌কস্ গ্রহণ করিয়া, কমলমীর হইতে পশ্চাৎপদ হওয়ার তাৎপর্য্য তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন। তিনিও একদিন ঐরূপ পেশকস্ লইয়া মণ্ডলগড় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং মামুদ দেখিলেন, কুম্ভের সহিত উভয়েরই সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে একরূপ। এখন যদি উভয়ে একযোগে মিবার আক্রমণ করিতে পারেন, তবে উভয়েরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু কুত্‌বুদ্দীন বৈরনির্য্যাতনের জন্য মামুদের সহকারিতা গ্রহণে সম্মত হইবেন কি? মামুদ ত কুত্‌বুদ্দীনের শত্রুতাচরণে ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ একটা সন্দেহ করিয়া মামুদ সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। যে বৎসর কুত্‌বুদ্দীন কমলমীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সেই বৎসরের শেষ ভাগেই মামুদ কুত্‌বুদ্দীনকে কুম্ভের বিরুদ্ধাচরণের জন্য সন্ধি-বন্ধনে বদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়া, গুজরাটে একজন প্রধান অমাত্য প্রেরণ করিলেন। কুত্‌বুদ্দীন অমাত্যের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধির মর্ম্মে উভয় পক্ষের মধ্যে একরূপ মিবার রাজ্য বিভাগের ব্যবস্থা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ।

স্বামী না ত কি ?

দুই সখীর কথা।

নবন্যাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাশীর সেই সুরধুনী-শীকর-সিক্ত সৌধ-প্রকোষ্ঠে, শ্রীমতী সুভাষিণী সরস্বতীর সহিত তদীয় স্বামী ললিতমোহন শর্ম্মার, কত কি কথা হইয়াছিল, তাহা পাঠকের মনে আছে কি? আজি সেই প্রণয়-মধুরা কথার কতকটা অংশ, যেন স্রোতে ভাসিয়া, কলিকাতায় আসিয়া পঁহুচিয়াছে। সুভাষিণী, তাঁহার প্রাণপ্রিয় হৃদয়-সঙ্গিনী সরযুবালার কাছে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে; এবং সরযু, সংসারের সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, আজি সেই পত্রখানিই পুনঃ পুনঃ পড়িতেছে।

সরযু এখন আর তাহার পিতৃব্য, মেঃ পি, রায়ের বাড়ীতে থাকে না। সে তাহার বিবাহের সময়ে, কলিকাতা রসা-ষ্ট্রীটের দক্ষিণাংশে, রাস্তার পূব ধারে, সুন্দর এক খানি দোতলা বাড়ী যৌতুক পাইয়াছিল। ইদানীং সে সেই বাড়ীর গৃহিণী অথবা গৃহ-স্বামিনী, এবং পিতা ও পিতৃব্যের আদরে, সর্ব্ববিধ সুখসম্পদের অধিকারিণী।

বাড়ীটি অট্টালিকা নহে, কিন্তু আনন্দ-নিকেতন। বাড়ীর দুই দিকে দুইটি ছোট ছোট উদ্যান। বহির্ব্বাটীর উদ্যানটি অপেক্ষাকৃত বড়। তথাপি, বড় উদ্যান বলিয়া গণনীয় নহে। কিন্তু উভয় উদ্যানই সুশিক্ষিত ও সুরুচি-সম্পন্ন রমণীর নয়ন-সুখ-জনক ও মনঃ-প্রীণক। উদ্যানে কামিনী, বকুল, কদম্ব, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি ছোট বড় নানা প্রকার বৃক্ষ; আর বৃক্ষে বৃক্ষে, কুঞ্জ-লতা, কনক-লতা, ঝুম্‌কা-লতা, এবং শ্যামা ও সোনালী প্রভৃতি আরও নানা প্রকার লতার ললিত-মনোহর বাঁধনিতে বিচিত্র শোভা। এ শোভার ভাগ বহির্ব্বাটীর উদ্যানটিতেই একটুকু বেশী। সে স্থানটি, নিদারুণ নিদাঘের সময়েও, দুই তিন সারি ঝাউ গাছ আর কএকটা শ্রেণিবদ্ধ ও পত্র-বহুল বকুলের শ্যামল-কান্তিতে সতত শীতল রহিত; এবং কতকগুলি শালিক, বুলবুল ও দয়েলের মধুর ধ্বনিতে সর্ব্বদাই মুখরিত হইত। যে, সেখানে যাইয়া, ক্ষণকাল বসিত, তাহারই চিত্ত, অসংখ্য বিহগ-বিহগীর আমোদ-কলহে ও আনন্দ-কোলাহলে, আপনা হইতে একটুকু দূরে,—প্রকৃতির নিত্য-লীলাময় অদৃশ্য আনন্দ-ধামের দিকে, অজ্ঞাতসারে সরিয়া পড়িত।

সরযু, বিলাত-ফেরত সুশিক্ষিত যুবার

বিবি, অথবা বউ-সাহেব হইয়া থাকিলেও, বহির্ব্বাটীতে প্রায়শঃ কখনও দেখা দেয় না। সে পূর্ব্বেও যেমন ধীর-স্বভাবা ছিল, এখনও সেই প্রকার ধীর-স্বভাবা অথবা ধীর-গম্ভীরা। তবে এই মাত্র প্রভেদ ; তাহার সেই স্বাভাবিক ধীরতার সহিত ইদানীং কেমন একটুকু মধুরতার,—সেই গম্ভীরতার সহিত কেমন একটুকু মুগ্ধ-মঞ্জুল-কোমলতার মিশ্রণ হইয়াছে। তাহার কণ্ঠের স্বর কোন দিনও কর্কশ ছিল না। এখন তাহা, সকলের কাছেই, একটুকু বেশী মিঠা, এবং অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টি কখনও কঠোর ছিল না। এখন সেই দৃষ্টি, পবিত্রতার অংশে তেমনই প্রভাপূর্ণ রহিয়াও, যেন একটুকু তরল হইয়াছে,—অথবা প্রাণের পাঁচটা কথা প্রীতির তরল ভাষায় অনুবাদ করিয়া কহিতে শিখিয়াছে।

সরযূবালা, রূপসীদিগের মধ্যেও, চিরকালই রূপবতী বলিয়া প্রশংসিত। কিন্তু, তাহার সে উজ্জ্বল ও উচ্ছল রূপ, ইদানীং সততই যেন, লজ্জার কেমন একটা অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় আবরণের মধ্যে, লুকাইয়া রহিতে যত্নপর। কে বলে যে উচ্চ-শিক্ষা লজ্জার বিঘাতিনী? যাহারা হৃদয়ের উৎকর্ষে প্রকৃত রমণী, লজ্জাই তাহাদিগের প্রিয়তম আভরণ। তাহাদিগের হৃদয় যতই উচ্চভাবে বিকশিত কিংবা পরিশোভিত হইতে থাকে, তাহাদিগের লজ্জাও, পবিত্রতার সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া, ক্রমেই উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর এবং মধুর হইতে মধুরতর মূর্ত্তি ধারণ করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিলাসিনী শিক্ষাভিমানিনী সরযূবালা এই ক্ষণ উল্লিখিতরূপ চতুরতা-শূন্য, চারু-বিকশিত প্রকৃত লজ্জার প্রতিকৃতি। যে তাহার সন্নিহিত হয়, সে-ই তাহার সলজ্জ গাম্ভীর্য্য দর্শনে হৃদয়ে ভক্তির ভাব পোষণ করিতে শিক্ষা করে;—তাহাকে, সসম্ভ্রম দৃষ্টির নীরব সম্ভাষণে, সম্মান করিতে বাধ্য হয়।

সরযূ এত দিন তাহার পুস্তক-নিচয় এবং হারমোনিয়ম ও পিয়ানোফোর্টেটি ছাড়া আর কিছুরই বেশী খবর লইত না। তাহার গভীর হৃদয়ের প্রীতি-স্নেহ এই ক্ষণ পরের প্রাণেও অল্প অল্প আনন্দ জন্মাইতেছে। তাহার ভাই দু'টি—সেই বহু দিনের পরিচিত পরেশ আর সুরেশ এখন সতত তাহার কাছেই থাকে। সরযূর একটি দেবর আছে। তাহার নাম হৃদয়-রঞ্জন। সে বি এ ক্লাশের ছাত্র,—জ্যেষ্ঠের ন্যায় সরল, স্নেহশীল ও বিনীত-চরিত্র। সেও এখন সরযূর আর একটি ভাইয়ের মত হইয়াছে ; এবং পরেশ ও সুরেশের ন্যায়, তাহার কাছে কাছে থাকিয়া, কি সূত্রে, তাহার নিকট, সাহিত্য, বিজ্ঞান অথবা কলেজের পাঠ্য বিবিধ-গ্রন্থ-সম্পর্কে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিবে, সেই পথ দেখে।

উদার-হৃদয় এম, ঘোষ, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই বালকদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করেন না। এ পৃথিবীতে কেহ হয় পুত্রাভিমানী, কেহ হয় ভ্রাতৃবলাভিমানী। মেঃ মনোরঞ্জন ঘোষ, স্বভাবতঃ অভিমান-শূন্য হইয়াও, মনের আনন্দে কন্যাভিমানী। তিনি যতই সরযূর প্রখর প্রতিভা ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইতেছেন, ততই আপনার হৃদয়, মন ও প্রাণ লইয়া, সরযূর প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। তাঁহার দাম্পত্য-জীবনে একটি মাত্র দুঃখ। বালকেরা যেমন আপনাদিগের 'বল'টি, বাঁশরীটি অথবা রাঙা-কিতা-বান্ধা পুতুলটি, আর পাঁচ বালককে দেখাইয়া, প্রীতি বোধ করে, সুশিক্ষিত যুবজনদিগের মধ্যেও অনেকে, আপনার সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী স্ত্রীকে, সেইরূপ বালকের প্রাণে, পাঁচ জন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটুকু প্রদর্শন করিয়া, প্রীতি-মিশ্রিত অভিমানের ভাব অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু মেঃ মনোরঞ্জন ঘোষের সে সাধ কিছুতেই পূর্ণ হয় না। লোকে যাহাকে, সাজাইয়া গুজাইয়া, সোহাগের পুতুল বানাইয়া, পরের কাছে প্রদর্শন করিতে পারে, বিধাতা সরযূকে সে উপকরণে গঠন করেন নাই। প্রদর্শনের কথা কানে শুনিলেই, তাহার প্রাণে একটা ভাবান্তর ঘটে,—তাহার প্রতিভা ও অভিমান-বুদ্ধি, কুপিত ভুজঙ্গীর ন্যায়, গর্জ্জিয়া উঠে। পাছে, সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, পরের নিকৃষ্ট দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইতে হয়, এই ঘৃণায় সরযূ প্রথম বয়সে খোপা বান্ধিত না। সেই সরযূ কি এখন, এত উন্নত হইয়া, পতির প্রিয় বয়স্যদিগের মন যোগাইবার জন্য, বেশ-বিন্যাস কিংবা বচন-বিন্যাসে অগ্রসর হইবে?

অপিচ, সরযূর মনের উপরে, সকল কথার উপর সুভাষিণীর কথা। সুভাষিণী, তাহার হৃদয়ের আদর্শ-রমণী না হইয়াও, অধিনায়িকা। ইহার নাম ভালবাসার আধিপত্য। যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, সে প্রকৃতই তাহার অধীন। সরযূ শিশুকাল হইতে চিরজীবনই সুভাষিণীর অধীন। পাছে সুভাষিণী, তাহার চাল চলনে কোন অংশেও বিবিয়ানার গন্ধ পাইয়া, তাহার প্রতি শ্লেষের ভাব কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার মনে সততই এই এক ভয়। আজি সে তাহার নিভৃত-কক্ষে বসিয়া, সুভাষিণীর পত্র খানি বারংবার পড়িতেছে, এবং সুভার কোন্ কথা সঙ্গত, কোন্ কথা অসঙ্গত, ইহা বিশেষরূপে চিন্তা করিতেছে।

মেঃ ঘোষ কালেজে ছিলেন। তিনি যখন অপরাহ্ণে বাড়ীতে আসিয়া সরযূর সন্নিহিত হইলেন, তখন সরযূ বড়ই আদর করিয়া পত্রখানি তাঁহাকে পড়িতে দিল।

মেঃ ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ? সইর পত্র ?

সরযূ একটু হাসিয়া বলিল,—হাঁ, আমার প্রাণ-সখী শ্রীমতী সুভাষিণী সরস্বতীর পত্র। তা না হ'লে কি, একখানা পত্র ল'য়ে এত আনন্দ করি ?

মেঃ ঘোষ কহিলেন,—তুমিও সুভারে সরস্বতী বল ?

সরযূ বলিল, দেখ—আত্ম-সম্মানে মানুষের যত না সুখ, আপনার প্রাণ-প্রিয় জনের উপযুক্ত সম্মানে, তা হ'তেও সহস্র গুণ বেশী সুখ। এ নীতি ত আমি সতত তোমার কাছেই শি'খে থাকি। আমার নামের সঙ্গে একটা উপাধি গাঁথা আছে, সুভার তা ছিল না। সুভাকে এখন সরস্বতী ব'লে ডাকতে,

তোমার আর আমার যে সুখ হবে, তা কি পরের হবে ?

মেঃ ঘোষ বলিলেন, তোমার সই সরস্বতীই বটে। তুমি সরস্বতীর পত্র পড়ে সুখী হ'য়েছ কি ?

সরযূ বলিল,—শুধু সুখী হই নাই, কোন কোন স্থান পড়্‌বার সময়ে হে'সে অধীর, অথচ হৃদয়ে একটুকু বিশেষ স্পৃষ্ট, এবং চিত্তেও একটুকু বিচলিত হ'য়েছি। সুভাষিণী রমণীকুলে ধন্যা ;—এক দিকে আমোদের ফোয়ারা, আর এক দিকে জ্ঞানের সমুদ্র, আজও সেই পাগ্‌লীটি। যখন কাছে থাকে, তখন যেমন পাগ্‌লামি করে,—হাত নে'ড়ে, পা নে'ড়ে, ভুরু না'চিয়ে, চো'খে মুখে কথা কয়, আর কথা কইতে কইতে কখনও হাসে, কখনও কান্দে,—এবং কখনও বা মনের আবেগে গায়ের উপর ঢ'লে পড়ে,—দূরে থেকেও, লেখার রঙ্গে, তেমনই পাগ্‌লামি কর্‌তে ভালবাসে। লিখ্‌তেও জানে বটে। উহার লিপিক্ষমতা যেমন অসাধারণ, উহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রও তেমনই অসামান্য। তার পর, সকলের উপর উহার ভালবাসা। কোন্ কথাটি আমার প্রাণে কেমন লাগ্‌বে,—কোন্ কথা আমার প্রাণের একটানা ভাবস্রোতকে আর একটা নূতন দিকে প্রবাহিত কর্‌বে, তা বোধ হয় এ পৃথিবীতে সুভাই জানে। পত্রখানি তুমিও পড়। তুমি স্ত্রী-শিক্ষায় অনুরাগী। পত্রখানি প'ড়ে, তুমি সুখী হবে। ভারতবর্ষে আর কোন্ স্ত্রীলোক, এইরূপ গভীর তত্ত্বকে, এমন রঙ্গরসে মিশিয়ে, এই প্রকার সরল ও মধুর ক'রে লিখ্‌তে পারে, তা আমি জানি না। পত্রের শেষ অংশের কোন কোন কথা তোমার প্রাণেও একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ন্যায় অনুভূত হবে।

মেঃ ঘোষ গাঢ় মনোনিবেশের সহিত পত্রখানি পড়িলেন, পড়িয়া তিনিও যার-পর-নাই প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। তিনি, পূর্ব্ব হইতেই, সুভাষিণীর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধানুরক্ত। তাঁহার সে শ্রদ্ধা পত্র পাঠে অনেকটা বাড়িল। তিনিও, পত্র পড়িবার সময়, পুনঃ পুনঃ হো হো করিয়া হাসিলেন। পত্র যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন তাঁহার মুখখানি বড় গম্ভীর হইল। একটা প্রশান্ত ভাব, সে মুখচ্ছবির উপর, একখানি ছায়ার ন্যায় শোভা পাইল। সরযূ বুঝিতে পাইল যে, তাহার সখীর প্রতি মনোরঞ্জনের হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। মেঃ ঘোষ, সরযূর দিকে চাহিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি তোমার সইরে পাগ্‌লীটি ব'লেছ। না ? যদি আমার প্রাণটা, ভাব-ভক্তির সমুদ্রে ডু'বে, এই রূপ পাগল হ'তে পার্‌ত, তা হলে নিশ্চয়ই এ সংসারে অনেককে একটু আনন্দ দান কর্‌তে সমর্থ হতেম। "Though this be Madness, yet there's method in it" এ পাগ্‌লামির আদ্যোপান্ত সমস্তই এক সুতায় গাঁথা ; আর সে সুতার নাম—প্রেম-ভক্তি অথবা ভক্তি-পূত প্রেম।

সুভাষিণীর প্রথম পত্র।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরঃ
শরণম্।

সোমবার।

৺ কাশী-ধাম।—

মদেক-প্রাণ-সঙ্গিনী শ্রীমতী সরযূবালা
ঘোষ-জায়া, এম. এ।

প্রাণাধিক সরযূ,

সই, তোমার কাছে এবার অপরাধিনী হইয়াছি। তোমার সেই অমিয়-মধুর পত্রখানির উত্তর দিতে অনুচিত বিলম্ব হইয়াছে। যদি কাছে থাকিতাম,—যদি—যদি লোকশ্রুতির অগোচরে, দুটি মনের কথা কহিবার সুযোগ পাইতাম,—তাহা হইলে, সেই পুরাতন মান-ভঞ্জনের অভিনয় করিয়া,—আমাদিগের সেই শৈশব-খেলার অনুসরণে সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—একটুকু নয়ন বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া, কর-যোড়ে কহিতাম,—

অয়ি মুগ্ধে !

মুঞ্চ ময়ি মানম্ অনিদানম্,—
ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ক্রীড়নং,
ত্বমসি মম রস-জলধি-রত্নং।

কিন্তু, এখন আর অদৃষ্টে এ সুখ ঘটিতেছে না। আর ঘটে না বলিয়া তেমন দুঃখও আমার নাই। কারণ, এ ভার, ইদানীং, বিধি-লিপির অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে, আর এক জনের উপরে বর্ত্তিয়াছে। অভিনয় যাহা করিতে হয়, তিনিই করিবেন। আমি শাদা সিধা লোক, শাদা সিধা ভাষায় আজি ক্ষমা মাত্র চাহিয়াই খালাস হইব।

পত্র লিখিতে যে জন্য বিলম্ব হইয়াছে, তাহা ত জান। আমাদিগের বাড়ীতে প্রায় সপ্তাহকাল আনন্দ-উৎসবের একটা তুফানের মত গিয়াছে। আমার সেই উপাধি বা আহ্লা'রে ব্যাধি লইয়া, দাদার এত আনন্দ,—দিদীর এত আনন্দ, তোমরাও দুজনে পুনঃ পুনঃ টেলিগ্রাম যোগে আনন্দ প্রদর্শন করিলে। এমন অবস্থায়, আমি একা, উন্মুনমুখীর মত, আড়ালে সরিয়া, নিরানন্দে বসিয়া থাকি কিরূপে ? আমিও, সুতরাং, বাধ্য হইয়াই, আনন্দে যোগদান করিলাম ; এবং তোমাকে মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত না হইয়া, যেন তোমাকে ক্ষেপাইবার জন্যই, মাথায় খোপা বাঁধিয়া ও সর্ব্ব-অঙ্গে আভরণ পরিয়া, দাদার অভীপ্সিত 'সরস্বতী' সাজিলাম। আমি সে সময়ে, আমার চিত্ত-চক্ষে, তোমার মানস-মোহিনী গম্ভীরা-মূর্ত্তি, সর্ব্বদা চিত্রিতবৎ, সম্মুখে দেখিতাম ; এবং মনে মনে কহিতাম,—অবলে, তোমার উন্নতিতেও ধিক্, অবনতিতেও ধিক্। আমি অবলা হইয়াও তোমায় চিনিলাম না,—চিনিতে পাইলাম না,—অন্যে তোমায় কিরূপে চিনিবে ?

আমি তোমার কাছে পত্র লিখিতে বিলম্ব করিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার পত্রখানি এক শ বার পড়িয়াছি। যখনই পড়িয়াছি, তখনই উহাতে নূতন সুখ, নূতন আনন্দ অনুভব করিয়াছি। এই যে বৈষ্ণব কবিরা বলেন,—'নিতুই নব'—'নিতুই নব', তুমি আমার সেই 'নিতুই নব,'—তোমার লেখার প্রত্যেক কথাই 'নিতুই নব'—'নিতুই নব,'—নব-রস-

নিঃস্যন্দিনী—'সুধাবর্ষীরিণী।' ঐ একখানি পত্রে শান্ত, করুণ, প্রেম, ভক্তি ও বীভৎস প্রভৃতি সকল রসই এমন আশ্চর্য্যরূপে নিহিত রহিয়াছে যে, আমি পত্রখানি ধরিয়া ক্ষুদ্র একখানি কাব্য লিখিতে পারি।

তুমি পত্রে যেখানে মনোর কথা—অর্থাৎ শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের কথা—অর্থাৎ সুশিক্ষিত, সুপরীক্ষিত, সোহাগ-তত্ত্ব-সুদীক্ষিত, সখি-ভাব-সঙ্কুক্ষিত—(হায়! আমার আর যুটিল না)—সরস-কটাক্ষ-সংবীক্ষিত, নবোঢ়া-হৃদয়-রঞ্জন, নারী-পদালক্তক-গঞ্জন, নূপুর-নিগড়-ভঞ্জন, নয়নাঞ্জন-নিভ-প্রিয়জনানুসঞ্জন শ্রীমন্-মনোরঞ্জনের মনোহারি কথা লিখিয়াছ, সেখানে তোমার প্রাণটা প্রেম-রসে ঢলঢল ;—প্রত্যেক পদ-ক্ষেপেই, একটু একটু ঢলিয়া পড়িতেছে, এবং যেন "সখি আমায় ধর" বলিয়া, দূর শ্রুত মুগ্ধ-স্বরে, আমাকেই সম্ভাষণ করিতেছে। পত্রের যে স্থানে তুমি "আকাশের ঐ অনন্ত কোটি সূর্য্য অবধি মানুষের পদ-তলস্থ ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত" জগতের সমস্ত পদার্থকে মনে মনে চিন্তা করিয়া, চিদানন্দরূপিণী জগন্ময়ী শক্তির কথা লিখিয়াছ, সেখানে ভক্তি অতুল-বৈভবে মূর্ত্তিমতী। আর, তোমার প্রতিবেশিনী দুঃখিনীর কথায় করুণ,—এবং আস্তবলের ঘোটকীর সহিত আত্মোপমায় হাস্য প্রভৃতি রস উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। বাকী ছিল বীভৎস। রস-মধুরা অবলার লেখনীতে প্রায়শঃ উহা ক্ষরে না। কিন্তু তুমি "শ্মশান-কাষ্ঠ-সদৃশ শুষ্ক-মূর্ত্তি সাততুরে বৃদ্ধ," এবং "হাড্ডিসার হাড়-গিলার" বর্ণনায়, যে সকল শব্দ বাছিয়া বাছিয়া প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাতে হাসির সঙ্গে বীভৎসও একটুকু না ফুটিয়াছে, এমন নয়। তবে, তোমার লিপি চাতুরীর এই এক প্রশংসা, বীভৎসের ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছ, অথচ আপনি উহার স্পর্শলেশ-সম্পর্কে একবারে নির্লিপ্ত রহিয়াছ। ইহা সামান্য কারিগরি নহে।

খাই মাছ, না ছুই পানি;
কিবা ন্যাকাপণা, নূতন ছলনা,
জানি না কিছুই, সকল(ই) জানি।

মনো যে তোমার মনের মত ধন হইয়াছে, ভাই, আমি এই জন্য,—এই মনোভীষ্ট-সুখলাভে, সত্য সত্যই, শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, ভোগ-রাগ সহকারে, পূজা দিয়াছি; এবং দ্বাদশটি দুঃখিনী সধবাকে, আমার অবস্থার যোগ্য, শাঁখা সিন্দূর ও শাড়ী দিয়া, সন্তর্পণ করিয়াছি। আমি সুখে ও দুঃখে, প্রতিদিন যাঁহাকে আকুল প্রাণে অর্চ্চনা করিয়া থাকি,—যাঁহাকে হৃদয়ে লক্ষ্য করিয়া, মাটীতে পড়িয়া, প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি,—আর যোগায় তুমি কাঙ্গালের ধন বলিয়া কাতরস্বরে ডাকি, সেই জগন্নিধান করুণাময়ের শ্রীপাদপদ্মে, আমি কাঙ্গালিনী, কৃতাঞ্জলিপুটে, এই প্রার্থনা করি,—তুমি মনোরে লইয়া জীবনে সুখী হও; এবং মনোও তোমার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের প্রকৃত স্বাদ পাইয়া জীবনে শীতল হউক। কবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।"

অর্থাৎ,—

রত্ন কারো করে না সন্ধান;

ছরী যেখানে থাকে, আপনি যাচিয়া তাকে,
কণ্ঠে দোলাইয়া করে গুণের সম্মান।

বি শ্রীহর্ষ কহিয়াছেন,—

"দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধে
দিশোঽপ্যন্তাৎ,
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি
বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ।"

অর্থাৎ,—

বিধি অনুকূল চক্ষে নিরখে যখন,
আপনিই দেয় ধরা হৃদয়ের ধন।
কিবা দূর দ্বীপান্তরে,
কিবা অতল সাগরে,
দিগন্ত-রেখায় কিবা থাকুক রতন,
ত্বরায় আনিয়া তারে,
গাঁথিয়া হৃদয়-হারে,
হৃদয়-বাসনা বিধি করয়ে পূরণ।

তোমার অদৃষ্টে এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তুমি—

ছিলে উদাসিনী হ'লে বিলাসিনী,
এখন বাকী কি আর আছে,
বল গো মানিনী।

তোমার বিবাহের ফুল এত শীঘ্র ফুটিবে, এবং তুমি মনোর মত মধুর-চরিত্র সজ্জনের কণ্ঠমালা হইয়া, জীবনে কৃতার্থ হইবে, আমার এমন আশা ছিল না। আমি যেমন তোমার বিবাহে সুখী হইয়াছি, আমার দাদা মহাশয় ও দিদীমাও তেমনই সুখী হইয়াছেন,—এবং যাঁহার প্রেম-স্নিগ্ধ কণ্ঠ-স্বরকে তুমি, রঙ্গ করিয়া, রাগিণী-বিশেষের সহিত তুলনা করিতে ভালবাস, তিনিও মনে প্রাণে অকৃত্রিম আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার আর এখন মনোর সহিত সাক্ষাৎকারে ভয় নাই। তিনি যেরূপ লাগিয়া পড়িয়া, দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়া, অধ্যয়নে ডুবিয়াছেন, তাহাতে আমার নিশ্চিত ভরসা আছে যে, জগদীশ্বরের কৃপায়, তাঁহার জীবনে অচিরেই এক অভাবনীয় পরিবর্ত্ত ঘটিবে। তুমি ভাই, জান, আমি আমার জ্ঞানের উন্মেষ হইতে, আগা গোড়া, সকল সময়ই, অন্তরের সহিত—Optimist অর্থাৎ মঙ্গলবাদী। আকাশ যখন ঘোরতর ঘন-ঘটায় আচ্ছন্ন রহে,—আকাশ-ব্যাপিনী-বিদ্যুন্মালা ভয়ঙ্কর চমকে খেলিয়া বেড়ায়, শত বজ্র এক সঙ্গে চারি দিকে কড়মড় করিতে আরম্ভ করে; এবং বায়ু, কখনও শোঁ শোঁ, কখনও বা হুহুঃশব্দে, সংসার-নাশিনী শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে, আমি তখনও মঙ্গলময় জগদীশ্বরের সর্ব্ব-মঙ্গল্য ও সুখ-শীতল পদারবিন্দের উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া, হৃদয় সুস্থির থাকি। জীবন অথবা যৌবনের প্রথম আরম্ভে, এই বিশ্বাসেই আমি সুস্থির ছিলাম। আমার সেই সুস্থিরতায় এখন সুফল ফলিয়াছে। জগদীশ্বরের কৃপায় এখন আমি সুখে আছি। আমিও এখন, আমার কর্ণে, সময়ে সময়ে, "ত্বমসি মম জীবনম্" প্রভৃতি ললিত-কান্ত-পদাবলী—(ছি! ছি! ছি! কি লিখিলাম)—"মধুর-কোমল-কান্তপদাবলী" শুনিতে পাইয়া থাকি; এবং আমার নিরভিমানা প্রীতি ও সাধ্বী-সমুচিত স্নেহপরিপূরিত নিশ্চলা ভক্তি সংসার-সমুদ্রের কোন না কোন স্থানে একটা সুখের ঢেউ তুলিয়াছে—অতি সামান্য

হইলেও, একটুকু সুখ-জনক পরিবর্ত্ত ঘটাইয়াছে, ইহা মনে করিয়া, হৃদয়ে অতি গভীর আনন্দ অনুভব করি। জীবনের সকল সুখই জগদীশ্বরের দান। আমার প্রাণটা যখন, অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুখ-শান্তিতে আর্দ্র হয়, আমি তখন তাঁহাকেই স্মরণ করি, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলি—

জয়-জগদীশ্বরঃ পূর্ণ-মঙ্গলঃ—
জয়-করুণাময়ো দীন-বৎসলঃ।

তুমি যে ভাবে,—যেরূপ মিঠা মিঠা শব্দে, মনোরঞ্জনের চরিত্র চিত্র করিয়াছ; এবং আর পাঁচ জনের কাছেও যেমন শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, মনো তোমার শুধু সুপুরুষ নয়। সে রমণী-জন-বাঞ্ছিত সুপুরুষ, এবং সংসার-দুর্ল্লভ সাধু পুরুষ। তুমি তোমার এমন জনকে স্বামী বলিবে, না সোহাগের সেবক বানাইয়া, পাদ-সংবাহনে নিযুক্ত রাখিবে, সে কথাটা, সখীর কাছে না জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার সুদুশ্চর-তপঃসঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে, নিজে অবধারণ করিলেই ভাল হইত না কি? ভাই, ভাষা যাহাকে রমণীর স্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, রমণীর সহিত তাহার অশেষ সম্পর্ক। সে এক দিকে স্বামী, আর এক দিকে সেবক,—এক ভাবে পোষ্য, আর এক ভাবে পোষক,—এক ভাবে শিষ্য, আর এক ভাবে শিক্ষক, এক অর্থে নিত্য-রক্ষণীয় আদরের ধন,—আর এক অর্থে সর্ব্বাচ্ছাদক সতত-রক্ষক। তাহাকে শুধু স্বামী বলিলেই চলিবে কেন? স্বামিত্ব বুঝাইবার জন্য ইংরেজী প্রভৃতি অধুনাতন ভাষায় একটি দু'টি বই শব্দ নাই। ইংরেজীতে স্বামীর নাম (husband) হাজবেণ্ড, অর্থাৎ ঘরের মানুষ;—অথবা ঘরের পুরুষ,—বড় জোর—ঘরের মালিক। কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞান ও কিয়দর্থে সমাজ-বিজ্ঞানের প্রস্রবণ-রূপিণী সংস্কৃত ভাষার ঐ এক স্বামিত্ব বুঝাইতে কত সুন্দর সুখ-শোভন শব্দই যে সাহিত্যের স্রোতে সতত প্রবাহিত, তাহা চাহিয়া দেখ। স্বামীর নাম কান্ত, অথবা প্রাণ-কান্ত ও হৃদয়-কান্ত। স্বামীর নাম, বল্লভ, অথবা প্রাণ-বল্লভ ও হৃদয়-বল্লভ। তাহাকে কান্ত অথবা বল্লভ বলিয়া প্রীতির সহিত সম্ভাষণ করিতেও তোমার পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ঘটাইবে কি?

যদি স্বামী শব্দের মৌলিক অর্থ অবধারণ করিবার জন্য ভাষা-বিজ্ঞানের আশ্রয় লও, তাহা হইলে, বোধ হয় ভাই, আরও বেশী গোলযোগে পড়িবে। কারণ শব্দের অর্থ, সমাজ-শক্তির ন্যায়, নিত্য-পরিবর্ত্ত-শীল। যে শব্দ, সমাজের এক অবস্থায়, এক অর্থ বুঝায়, সেই শব্দই সমাজের আর এক অবস্থায়, আর এক অর্থ বুঝাইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ মাতা, দুহিতা, ব্যবসায় ও মহাজন প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ। শব্দ-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, মনুষ্য যখন সামাজিক জীবনের প্রথম অবস্থায়, কৃষি-জীবীর মত, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, পৃথক্ পৃথক্ কুটীরে বাস করিত, তখন যিনি ক্ষেতের ধান মাপিয়া লইতেন, লোকে তাঁহাকে বলিত মাতা; আর যে গাভী গুলিরে দোহন করিত, লোকে তাহাকে বলিত দুহিতা। সেই মাতা এই ক্ষণ স্নেহ-মমতার-গৃহ-প্রতিষ্ঠিত পার্থিব-বিগ্রহ

স্বরূপা পরমারাধ্যা মাতৃ-দেবতা; এবং দুগ্ধ-দোহন কার্য্যে যাহার নামের সৃষ্টি, সে এখন, হৃদয়-দোহনের আশ্রয়-ভূতা, স্নেহের প্রতিকৃতি-রূপিণী প্রাণাধিকা দুহিতা। এই হইল অপকৃষ্ট অর্থ হইতে শব্দের উৎকৃষ্ট অর্থে উন্নতি। এই রূপ আবার উৎকৃষ্ট অর্থ হইতে অপকৃষ্ট অর্থে অবনতি। যে সময়ে স্বয়ং কৃষ্ণ ভারতে ধর্ম্ম-বক্তা, এবং কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস সেই ধর্ম্মের ভাষ্যকার, সেই সময়ে 'ব্যবসায়' ও 'মহাজন' প্রভৃতি শব্দ, পুষ্প-চন্দন প্রভৃতি শব্দের ন্যায়, কতই কি পবিত্র অর্থের প্রতিপাদক ছিল! সেই ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী এবং মহাজন প্রভৃতি শব্দ, এইক্ষণ সমাজ-শক্তির পরিবর্ত্তনে, ক্রমে কোথায় আসিয়া নামিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখ। কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং॥"

ইহার এই অর্থ,—হে কুরু-নন্দন, ঈশ্বরের আরাধনারূপ কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে বুদ্ধি যখন প্রকৃত ব্যবসায়াত্মিকা হয়,—অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনায় অবশ্যই উদ্ধার পাইব, এই রূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করে, তখন উহাতে একনিষ্ঠতা জন্মে,—তখন উহা এক বই দুই পথ লইতে ভালবাসে না। কিন্তু, যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনায় দৃঢ়-বিশ্বাসী নহে, সেই ঈশ্বর-বহির্ম্মুক বিষয়-কামী ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি বহু শাখায় ও অনন্ত কামনায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

যদি এই ক্ষণ কেহ, কৃষ্ণোক্ত-বাক্যের অনুসরণ করিয়া, কাহারও সম্পর্কে এইরূপ বলে যে, তিনি ব্যবসায়ীর প্রাণে ধর্ম্মসাধন করিতেছেন, তাহা হইলে মনুষ্য কি বুঝিবে? মনুষ্য কি সেই ব্যবসায়ী ধর্ম্ম-সাধককে, মুহূর্ত্তের তরেও, যথার্থ ধার্ম্মিক জ্ঞানে, হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিবে? না এখনকার "সাধু-মহাজন" (!) দিগকে, প্রকৃত সাধু-মহাজন-জ্ঞানে, পাদ্য-অর্ঘ্য-দানে, পূজা করিতে যাইবে?

তাই বলিয়াছি ভাই, স্বামীর স্বামিত্ব বুঝিতে হইলে, শব্দার্থ লইয়া বিচারে কোন ফল নাই। শব্দার্থ লইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কথারই বিচার চলে না। সে বিচার অনুসারে, তোমার ও আমার, এখন পর্য্যন্তও, আদপে বিবাহই হয় নাই। কেন না, আমাদিগকে ত কেহই, পালামোর ইতিহাস-বর্ণিতা, পতি-ক্রোড়-গৃহীতা, কোল-যুবতীর ন্যায়, 'বহন' করিয়া লইয়া যায় নাই। শব্দার্থ অনুসারে বিবাহের মূল অঙ্গ 'বহন।' * যাহাকে কেহ কোলে, কাখে, কিংবা কাঁধে তুলিয়া, অথবা দোলায় চড়াইয়া, বহন করিয়া না লইয়া যায়, তাহার আবার বি-বাহ কি?

আমার ভাগ্যে এক বৎসরের জন্য সামান্য একটুকু 'বহন' ঘটিয়াছিল। এক বৎসর কাল শ্বশুরালয়ে ছিলাম। কিন্তু তোমার ভাগ্যে ত এক দিনের জন্যও বহন ঘটে নাই! তুমি বীডনষ্ট্রীট হইতে রসাষ্ট্রীটে, অর্থাৎ কাকার বাড়ী হইতে ক্রীড়া-কানন-স্বরূপ নিজের বাড়ীতে, নিজে সখ করিয়া গিয়াছ। কোন

* পাঠক জ্ঞানানন্দ-প্রণীত প্রমোদ-লহরী অথবা বিবাহ-রহস্য নামক পুস্তক খানি পাঠ করিলে, এ বিষয়ের বহু কথা জানিতে পাইবেন।

দিনও ত বাহিত হও নাই। তার পর, পাদ-সংবাহনেরও একটা কথা থাকে। সে কথা, অন্যের কাছে বলিতে না পারিলেও, অবশ্য তোমার কাছে বলিতে পারি। সে নিগূঢ় কথার অর্থে তোমার শাস্ত্র-সম্মত বি-বাহ হইয়াছে বটে। কিন্তু,সে অর্থ মানিয়া লইলে, তুমি স্বামী শব্দের উপরও ত কোনরূপ আপত্তি করিতে পার না। কেন না, যাহারা এই প্রীতি-শোষক ও "পুরাতন কালের কুৎসিত ভাব-প্রকাশক," স্বামী শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দার্শনিক-কবিরাই আবার, কাব্যদর্শনের সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম তন্তুচ্ছেদ করিয়া, তোমা-হেন স্বামীর-অধিস্বামিনী স্বামি-সোহাগিনীদিগকে স্বাধীন-ভর্তৃকা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতেও কি ভাই তোমার দুই কুল রক্ষা পায় না? তোমার সমাজ-বিজ্ঞান ও স্বামি-প্রেমে সামঞ্জস্য ঘটে না? স্বাধীন-ভর্তৃকা কাহাকে বলে, তাহা জান ত?—

"কান্তঃ প্রেম-গুণাকৃষ্টো
ন জহাতি যদন্তিকম্,
বিচিত্র-বিভ্রমাসক্তা
সা স্যাৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা।"

অর্থাৎ,—

কান্ত যার প্রেম-গুণ-আকর্ষণে,
সদা কাছে কাছে থাকে প্রাণের বন্ধনে;
বিচিত্র-বিভ্রম-বতী,
পতি-পাগলিনী-সতী,
স্বাধীন-ভর্তৃকা তারে বলে সুধী জনে।

ভাই, আমার এই অনুবাদে ভুল থাকিতে পারে; কিন্তু আসল কথায় ভুল নাই। এই সংসারে বাঘ, ভাল্লুক এবং গণ্ডার ও মহিষের যেমন সেই এক প্রকার পশু-যোগ্য শক্তি ও শক্তির অনুরূপ আধিপত্য আছে;—শৈবাল-বেষ্টিত শত-দল, আর সিরাজী গোলাপেরও সেইরূপ একটুকু অপরূপ শক্তি ও শক্তির অনুরূপ আধিপত্য আছে। আধিপত্য না থাকিলে, সহস্র লক্ষের অধিপতিও সে শতদল ও সুরভিকোমল গোলাপকে মাথায় তুলিয়া পূজা করে কেন? এই শেষোক্ত-প্রকার সূক্ষ্মতর আধিপত্যই, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, রমণীর উপযুক্ত আধিপত্য;—আর যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগের মতেও, ইহাই আধিপত্যের চরম অথবা পরম; কারণ ইহার নাম প্রেমের আধিপত্য।—The reign of Love. মনুষ্য যখন, সমাজ-শক্তির ক্রম-বিকাশে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক ও গণ্ডার-মহিষ-সেব্য পশুত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, অথবা পশু-জীবনের বহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, এই পৃথিবীতেই প্রকৃত মনুষ্যরূপে বিচরণ করিবে,—এবং ভক্তি, প্রীতি, দয়া-ধর্ম্ম ও পরার্থ-জীবিতার মধুর-স্নিগ্ধ মহোজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, পরের সুখেই আপনার সুখ জ্ঞানে, পরকে ভালবাসিতে শিখিবে,—পরের সেবাই ভালবাসিবে, তখন সংসারের সকল রমণীই, তোমার মত স্বাধীনভর্তৃকা হইয়া, প্রেমের পবিত্র স্রোতে, সোহাগের ফুল কিংবা স্বর্ণ-কমলের মত, ভাসিয়া ভাসিয়া হায় ডুবু খাইবে; আর নিজ নিজ গৃহে—নিজ নিজ কর্ম্মাধিকারের মধ্য স্থলে,—শৈশবে

পিতা, যৌবনে পতি, ও জীবনের প্রৌঢ়াবস্থায়, পুত্র-পৌত্র প্রভৃতির হৃৎকমলে, প্রেম-স্নেহের স্বর্গীয় সিংহাসনে, রাজ-রাজেশ্বরীর মত বিরাজমানা রহিবে।

ভাই, আমি এই পত্রের স্থানে স্থানে, স্বামীর কথাপ্রসঙ্গে, স্বামীর-সোহাগেরও কথা লিখিয়াছি। তুমি, ইউরোপীয় ললনা না হইয়াও, নিরন্তর ইউরোপীয় ভাব-মণ্ডলে অবস্থান কর, এবং যাঁহারা (Ball ও At Home অর্থাৎ) নৃত্যোৎসব ও নৈশ-সাক্ষাৎ-কারে, অতি-পর-নাই অসভ্য ও অর্দ্ধ-বিবসনার ন্যায় নৃত্যাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটই লজ্জাশিষ্টতার সূক্ষ্ম-স্থূল-প্রকারভেদের বিবিধ কথা শিক্ষা করিয়া থাক। তাই অনুরোধ করিতেছি, তুমি তোমার সুধীর-গম্ভীর সুসভ্য স্বভাবে, আমার এ সকল পবিত্র অথচ প্রীতি-পূর্ণ আমু'দে কথায়, মনে কোন-রূপ ভাবান্তর পুষিও না। অথবা তোমায় এত কৈফিয়ৎই বা দিতে যাইতেছি কেন? পত্র লিখিতেছি আমার প্রাণাধিকা সখীর কাছে,—আর লিখিতেছি আমার এই ফুল্ল-বসন্ত ফুটন্ত প্রাণে। তুমি ত এখনও কচি খুকী,—কেন না নববিবাহিতা। বিবাহের পট্টাম্বর পরিত্যাগ করিয়াছ কি না, তাহা ধর্ম্ম জানেন। আমিও কিন্তু ভাই, কুড়ি পার হইয়াছি বলিয়া, বুড়ী হই নাই। তুমি ত সে দিন নিজেই দেখিয়া (!) গিয়াছ, আমার এক গাছি চুলও এখন পর্য্যন্ত পাকে নাই, এবং মুখ-শ্রীতেও বার্দ্ধক্যের কোন রূপ ছায়া পড়ে নাই। এখনও "দন্ত-রুচি-কৌমুদী" কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে, মট্ মট্ করিয়া আস্ত শুপুরি দাঁতে ভাঙ্গিয়া খাই;—এবং প্রয়োজন ঘটিলে, পুরাতন হিন্দু সমাজের প্রকৃত ব্রাহ্মণ কন্যার মত, চরণ-চুম্বি কেশ-রাশিকে সীমন্তে সুচারু চূড়ার ধরণে সাজাইয়া, ও গলার আঁচল কোমরে জড়াইয়া, অনায়াসে—অনবসন্ন-হৃদয়ে, এক শত লোকের অন্ন-ব্যঞ্জন যোগাই। যদি এমন অবস্থায়, আমার লেখনী-মুখে,—ললনা-সুলভ উৎফুল্ল-চিত্তের অলক্ষিত-সুখে, ঐরূপ দুই একটি সুখ-সৌভাগ্য-বোধক সরস শব্দ আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তাহা সর্ব্বাংশেই ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু, আমি যদি পতি-হৃদয়ের উপর সতীর আধিপত্যকে নিকৃষ্ট শ্রেণির স্ত্রৈণতা-গন্ধি ঘৃণার্হ বস্তু মনে করিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমার চিত্তের সে নিকৃষ্টতা কোন অংশেও ক্ষমার যোগ্য হইবে না। বস্তুতঃ, তাহা হইলে, আমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, এবং তোমার ও আমার শিক্ষায় ও দীক্ষায় সহস্র বার ধিক্।

ভাই সরযু, আমার প্রাণ-সখি,—আমার প্রাণ-সঙ্গিনি, তুমি যেমন সময়ে সময়ে, একটুকু গাম্ভীর্য্যের গ্রামে উঠিয়া, আমার নিকট হৃদয়ের দুই একটি গভীর কথা ব্যক্ত করিয়া থাক, আমিও আজি, সেইরূপ একটুকু উচ্চ গাম্ভীর্য্যের গ্রামে উঠিয়া, তোমার নিকট আমার হৃদয়ের দুই একটি গভীর কথা ব্যক্ত করিব। তুমি কি আমাকে একটা পশু না পিশাচ মনে কর? তুমি যেমন পুঁথি ঘাটিয়াছ, আমিও ভাই, সেই রূপ, চিরজীবনই পুঁথি ঘাটিয়াছি। আমি আমার শিশুকাল হইতে,

শুধুই পুঁথি পত্র লইয়া, এত পরিশ্রম করিয়া, এখন কি এই বয়সে, একটা পুতুলের জীবনে পরিতৃপ্ত রহিতে পারি? তুমিও রমণী, আমিও রমণী। রমণীর দুঃখে তোমার হৃদয় যেমন জর্জ্জরিত রহে, আমার হৃদয়ও সেইরূপ, প্রায় সকল সময়ই, তুষের আগুনে দগ্ধ হয়;—রমণীজাতি, এ সংসারে, শত-সহস্র স্থলে, কিরূপ লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, অথবা প্রতারিত হইতেছে, তাহার আলোচনায়, আমার এ কঠিন প্রাণ পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতে থাকে। তুমি রমণীর দুঃখ পাঠ কর ইতিহাসে ও উপন্যাসে। আমি রমণীর দুঃখ পাঠ করি শত শত বালিকা ও সমান-বয়স্কা যুবতীর প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে। যাহা চক্ষে দেখি ও কানে শুনি, তাহাই এত প্রচুর যে, এ বিষয়ে আর ইতিহাস-অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি থাকে না। কত কত সুন্দরী, সুশীলা, সরল-স্বভাবা কুল-বালা, পতির পাশব-অত্যাচার হইতে মুক্তি-লাভের জন্য,—হায়! না বুঝিয়া,—পাপের জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে;—অথবা আত্ম-হস্তে আপনার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া, পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গীর ন্যায়, উড়িয়া যাইতেছে, তাহা ভাবি আর নয়ন-জলে ভাসি। কত সোনার পুতুল বালিকা, বিকট-ভয়ঙ্কর রাক্ষসের নিকট, সোনা রূপা প্রভৃতি তৈজসের মত বিক্রীত হইতেছে,—কত ঋষি-কন্যা-সদৃশী পূত-স্বভাবা রূপসী, অবস্থার বিপাকে, অসুরের হাতে পড়িয়া, অহোরাত্র নিগৃহীত ও পাদ-নিষ্পেষিত রহিতেছে, তাহা ভাবি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলাই।

কিন্তু, এই সর্ব্বত্র-পরিলক্ষিত দুঃখরাশির মধ্যেও, আমার মনে একটুকু সুখের ঠাঁই আছে। সেই ঠাঁই, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময় ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস। এই পৃথিবীতে রূপ-গুণের কুসুম-স্বরূপা রমণী যেমন, পশু-প্রকৃতি পুরুষদিগের দ্বারা পীড়িত, প্রতারিত ও সহস্র প্রকারে বিড়ম্বিত; যাঁহারা হৃদয়ের উদারতায়,—চিত্ত ও চরিত্রের মধুর-কোমলতায়, এবং জ্ঞান ও ভক্তির পূজা-যোগ্য গভীরতায়, মনুষ্য-জাতির মহিমা বাড়াইয়াছেন, তাঁহারাও, স্থান-বিশেষে ও সময়-বিশেষে, প্রচণ্ড পশু-সদৃশ প্রতিবেশী-দিগের দ্বারা পীড়িত, প্রতারিত ও সহস্র প্রকারে বিড়ম্বিত হইয়াছেন। স্বদেশী ও প্রতিবেশীরা, কোথাও, পাগলের মত, তাঁহাদিগকে ধরিয়া নিয়া আগুনে পোড়াইয়াছে; কোথাও বিষ-প্রয়োগে তাঁহাদিগকে প্রাণে মারিয়াছে; কোথাও বা অস্ত্রাঘাতে কুচি কুচি করিয়া, তাঁহাদিগের পৃথ্বীপাবন পবিত্র রক্ত-মাংস শৃগাল-কুক্কুরকে ভোজ্যস্বরূপ উপহার দিয়াছে। কিন্তু, বিধাতার বিধান-লীলায়, স-মাজের ক্রমোন্নত-মহিমায়, উল্লিখিত উদার ও উন্নত পুরুষদিগের প্রেমময় আধিপত্য যেমন, মানবজাতির সমবেত-হৃদয়রূপ মহাযন্ত্রের উ-পর, ধীরে ধীরে, প্রতিষ্ঠিত হইতেছে,—ভাই, তুমি ইহা দৃঢ় জানিও,—এ কথা তোমার কো-মল-হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিও, রমণীর প্রীতি-স্নেহময় রমণীর আধিপত্যও সেইরূপ, সেই পৃথ্বীব্যাপি মহাশক্তিময় হৃদয়-যন্ত্রের উ-পর, ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিবে।

তবে, আমার সেই পুরাতন কথা,—এ-যদি সে কথার পোষকতায় নজীর চাও, তাহ-

হইলে বড় দরের নজীর দিতে পারি। ভবভূতির হৃদয়ারাধ্য আদর্শ-পুরুষ রাম কহিয়াছেন;—

"নৈসর্গিকী সুরভিণঃ কুসুমস্য সিদ্ধা
মূর্দ্ধ্নি স্থিতির্ণ চরণৈরবতাড়িতানি।"

অর্থাৎ,—

সুরভি কুসুম থাকে মাথার উপরে,
এই ত সৃষ্টির বিধি, কেমনে হবে অবিধি,
চরণে সে চারুফুলে নিপীড়ন ক'রে?

রাম-মুখ-নিঃসৃত উল্লিখিত মহামূল্য মধুর-কথার পর, আমাদের আর কোন্ কথা বাকী থাকে, সই? তুমি রামের কথায় ইহাও বুঝিতেছ যে, আমি যে মনুষ্য-জাতির উপর রমণীর আধিপত্যকে কিয়দংশে রূপের আধিপত্য ও কিয়দংশে রমণীয়তা প্রভৃতি গুণের আধিপত্য মনে করি, তাহা মনুষ্যের দিকে চাহিয়া নহে, জগদীশ্বরের দিকে চাহিয়া;—যে রূপ-নিধান ভুবন-মোহন, ঋষি-ভক্ত-হৃদয়ে, "রসো বৈ সঃ" ও শিব-সুন্দরং"বলিয়া ধ্যাত ও আরাধিত হইয়াছেন, এবং এই জগতে রমণী-কেই রূপের ডালি ও প্রীতি-স্নেহের নবনীত-কোমলা পুত্তলী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া। তাঁহার এই অশেষ-বৈচিত্র্যময়ী বিশাল-বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে, কি দেখি? দেখি সেই কোটি শৃঙ্খল-সূত্রিত, কোটি-স্তর-বিবর্ত্তিত, ক্রম-বিকাশ-সংবর্দ্ধিত, অচিন্ত্য সৃষ্টি-শৈলের উর্দ্ধতম শিখরে, বিধাতার চরম সৃষ্টি—রমণী। রমণী সেখানে,—জগন্মোহিনী,—জগজ্জননী,—জগদ্ধাত্রী,—জগৎ-পালয়িত্রী,—জগৎ-শিক্ষয়িত্রী,—জগদন্নপূর্ণা,—জগৎপাবনী।

ভাই, রমণীর এই সপ্তবিধ ভাব ও বৈভব এবং মানব-সমাজের সহিত তন্নিচয়ের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—অর্থাৎ রমণীর প্রকৃত আধিপত্য ও ক্রমোন্নতিশীল প্রভাব বিষয়ে আমার বহু কথা লিখিবার আছে। আর এক দিন লিখিব। তোমার পত্রে আর এক প্রকার আধিপত্য ও আর এক প্রকার প্রভাবেরও কথা আছে। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক সার্ উইলিয়ম হামিলটন যেমন এক প্রকার বিদ্যাকে "Bread and Butter Science" অর্থাৎ অন্নকরী বিদ্যা বলেন, আমিও তোমার উল্লিখিত, আত্মতন্ত্র আধিপত্য ও সামাজিক প্রভুত্বকে, অন্নবস্ত্রের আধিপত্য অথবা সাংসারিক প্রভাব বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু, নামটা যাহাই হউক না কেন, কথা গুরুতর, এবং বিশেষরূপে বিবেচ্য। আমি ক্রমে তোমার সে কথারও আলোচনা করিব। তুমিও আছ। আমিও আছি। কথা উড়িয়া যাইবে না। আমরা কথার সূত্রে আরও বহু কথার আলোচনা করিতে পারিব। অতএব, প্রাণ-সখি—বিধুমুখি, আজি এখানেই বেদ-ব্যাসের বিশ্রাম হউক। কিন্তু, আমি বিশ্রাম-বাসনায় বিবশা হইলেও, তোমায় একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইব না। তুমি লিখিয়াছ যে, মনোর ধর্ম্ম-বিষয়ক মত ও বিশ্বাস একটুকু সুস্বাদু খিচুড়ি। খিচুড়ি হইলে উহাতে অবশ্যই শ্রীক্ষেত্রের গন্ধ আছে। তুমি প্রতিদিনই নিজে কিছু কিছু খাইও। তোমার মত জ্ঞান-গৌরবিণী রমণী যদি জ্ঞানান্ন-খিচুড়ি খাইয়া পরিপাক

করিতে না পারে, তবে আর পারিবে কে? খিচুড়ি-প্রসাদে জাতিবিচার নাই। পার ত, আমায়ও কিছু পাঠাইয়া দিও। আমিও তাদৃশ-পণ্ডিত-প্রিয় প্ররোচক খিচুড়ির স্বাদ-গ্রহণের জন্য লালায়িত।

ভাই, আমি তোমার একটি কথা ইচ্ছা করিয়া রাখি নাই। আমি তোমার পত্র তাহাকে অর্থাৎ "তাঁহাকে" দেখাইয়াছি। এ বিষয় তোমার নিষেধ রক্ষা করি নাই। এই রূপ ঘনিষ্ঠ কুটুম্বতার স্থলে, কোন প্রকার ছলে কি কৌশলে, কোন বিষয়েই ঘোরপেচ খেলা কর্ত্তব্য নহে। তুমিও আমার এই পত্র খানি তোমার 'তাঁহাকে' দেখাইও; এবং আমাদিগের যুগল-হৃদয়ের সহস্র সাদর প্রণয়-সম্ভাষণ, এবং দাদা ও দিদী মার শত শত সস্নেহ আশীর্ব্বাদ, দুই জনে, এক সঙ্গে, একীভূত হৃদয়ে, গ্রহণ করিও। পরেশ, সুরেশ ও হৃদয় ত ভাল আছে? অনেক কথা বাকী রহিল। আমি শীঘ্রই আবার পত্র লিখিতেছি। আমায় ভুলিও না;—ভুলি ভুলি ভাবে, তোমার স্বাভাবিক ভোলা প্রাণে, আপনাকেও আপনি ছলিও না,—এবং ললনা-বিলসিত 'ললিত' ছলনায়, শুধুই ভাবের হিল্লোলে ঢলিয়া পড়িও না।

তোমার চির-জীবন-সঙ্গিনী
প্রীতি-স্নেহ-কাঙ্গালিনী সুভাষিণী।

ছায়া-দর্শন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যাহা অসম্ভব, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা নিশ্চয়ই বড় দুষ্কর। এই নিমিত্ত, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের কথা উঠিলেই, লোকে সম্ভব আর অসম্ভবের কথা লইয়া সর্ব্বাগ্রে তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে।

কবি ও ঐতিহাসিকের আনন্দ-স্মৃতি-রূপিণী নর্ম্মদার তটে অদ্যাপি একটি বিশাল বট বৃক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐতিহাসিকেরা কহিয়াছেন যে, এক সময়ে, দশ হাজার লোক, উহার শাখা-প্রশাখা-সমাচ্ছাদিত ছায়া ভূমিতে আশ্রয় লইয়া, যার-পর-নাই সুখে অবস্থান করিয়াছিল। এ কথা অসম্ভব বোধ হয় না। কারণ, মনুষ্য সেই ছায়া-ভূমির দীঘ ও পাশ মাপিয়া দেখিয়াছে, এবং পরিমাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানিতে পাইয়াছে যে, সেখানে দশ হাজার লোক এখনও অনায়াসে অবস্থান করিতে পারে।

পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিকেরা ইহাও কহিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উদার-মতি রাজ্যেশ্বর, রাজ্য-বিপ্লব-বিপন্ন প্রথম চার্লস, নর্দ্দামটন-

শায়ার নামক প্রদেশের অন্তর্গত ডেণ্ট্রি নামক স্থানে, সসৈন্যে অবস্থান কালে, নেস্‌বীর যুদ্ধের পূর্ব্বদিন, অর্থাৎ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন, অপরাহ্লে, ক্রমে দুইবার, তদীয় ভূত-পূর্ব্ব সুহৃৎ ও মন্ত্রী ষ্ট্রাফোর্ডের ছায়া-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। ছায়া-মূর্ত্তি, ঐ দিন, ক্রমে তাঁহাকে দুইবার দেখা দিয়াছিলেন, এবং দুইবারই যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রথম চার্লস, সে নিষেধ না মানিয়া, নেস্‌বীর যুদ্ধে, কিরূপ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হন, তাহা সকলেই জানেন। ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে অনেকে উল্লিখিতরূপ ছায়া-মূর্ত্তি দর্শনের অশেষ প্রামাণিক কাহিনী লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, অধিকাংশ মনুষ্যই সে সকল কাহিনী বিশ্বাস করিতে পারেন না। কেন না কাহিনীগুলি অসম্ভব।

কিন্তু, বিধাতার এই অনন্ত-সূত্র-জড়িত বিচিত্র জগতে, কি সম্ভব আর কি অসম্ভব, তাহা আমরা, আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে, সকল সময়ে সহজে অবধারণ করিতে পারি কি? নর্ম্মদার তট-শোভী ঐ বিশাল-বট, এক সময়ে, নয়নের অদৃশ্য অতি-ক্ষুদ্র একটি বীজের মধ্যে, কি ভাবে নিহিত ছিল, এবং কিরূপে সেই বীজ হইতে বহির্গত হইয়া, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া, ঐরূপ বিরাট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল, আমরা সেই সম্ভব অথবা অসম্ভব কথার তত্ত্ব-পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই কি?

ছায়া-মূর্ত্তি-সম্পর্কে দুইটি কথাই সাধারণ লোকের নিকট অসম্ভব বোধ হইয়া থাকে। (১) জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহ-ধারণ;—(২) সেই সূক্ষ্ম-দেহের আশ্রয়ে, সময়ে সময়ে, মনুষ্যকে দর্শন-দান ও মনুষ্যের সহিত কথোপকথন।

যাঁহাদিগের বুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক-শিক্ষার সাহায্যে, বিচার-শক্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট এই দুই কথার একটিও অসম্ভব বোধ হয় না। কারণ, তাঁহারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় জানেন যে, বায়ু ও বিদ্যুৎ যেমন লোক-চক্ষুর অদৃশ্য হইয়াও, সূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিত রহে, ও সংসারে নিরন্তর কার্য্য করে; মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ, মৃণ্ময় স্থূল-দেহ পরিত্যাগের পর, সূক্ষ্মতর আকাশিক দেহে, পরিচয়ের উপযোগি আকৃতিতে, জীবিত ও অবস্থিত রহিতে পারে, এবং সেই সূক্ষ্মতর দেহের আশ্রয়ে, নিয়ম বিশেষের সহায়তায়, মনুষ্যকে দর্শন দান ও মনুষ্যের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি কার্য্য করিতে সক্ষম হয়।

এ বিষয়ে অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিকদিগের উপদেশ অপেক্ষা অজ্ঞমানী (অর্থাৎ Agnostic) অথবা জড়-বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের জগদ্বিখ্যাত গুরু যন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা পাঠকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অধিকতর প্রামাণিক বোধ হইবে। মিলের নামে, পঞ্চাশ বৎসর কাল, পৃথিবীর মনস্বি-মণ্ডলে দোহাই চলিয়াছে। মিল এখন পর্য্যন্তও বহুলোকের মনোরাজ্যে অধীশ্বরের আসনে আসীন। মিল বলিয়াছেন "হৃদয়ের ভাব, আর মনের চিন্তা, যেমন প্রকৃত বস্তু সংসারের আর কিছুই তেমন নহে। আমরা আমাদিগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে,

শুধু এই দুই বস্তুকেই প্রকৃত বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।" *

মিলের এই কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে, হৃদয়ের ভাব ও মনের চিন্তা যাহাকে আশ্রয় করিয়া, জগতে প্রকাশিত হয়, সেই জীবাত্মাও জড় বস্তু হইতে অধিকতর সার-বিশিষ্ট প্রকৃত বস্তু, এবং সুতরাং অবিনাশী। অসার জড় বস্তুরই যদি কোনরূপে বিনাশ (annihilation) হইতে না পারে, তাহা হইলে সারত্বে উচ্চতর জীবাত্মার সম্পর্কে বিনাশের সম্ভাবনা থাকে কোথায়?

তবে, এখানে একটা গুরুতর কথা অনুক্ত রহিতেছে। জীবাত্মা কি, জড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, মনে কোনরূপ চিন্তা, হৃদয়ে কোনরূপ ভাব, এবং চিত্তে কোনরূপ ইচ্ছা পোষণ করিতে পারে? মিল, এ বিষয়ে, অধিকতর স্পষ্ট-কণ্ঠে, স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন,—"এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমরা এখানে যে সকল চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা এবং অনুভূতি লইয়া জীবিত আছি, ঠিক সে গুলিই, দেহ-ত্যাগের পরও, এমনই থাকিয়া যাইতে,—অথবা আর এক স্থানে, আর এক অবস্থায়, আবার আরব্ধ হইতে পারে।" †

মিলের এই সাক্ষ্যের পর, বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যের আর কিছু বাকী রহিল কি? বাকী রহিল প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। যাহা হইতে পারে, তাহা যে অবশ্যই হইয়াছে, ইহা কেহ চক্ষে না দেখিলে কেমন করিয়া মানিব? এ কথা সঙ্গত কথা। কিন্তু আত্মার অবিনশ্বরতা এবং লোকান্তর-গত আত্মার দর্শনাদি বিষয়ে, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যেরও অভাব নাই।

এই যে আমরা এই প্রবন্ধটি লিখিতেছি, এই সময়ে, একটি সপ্ততি বর্ষ-বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত ইংরেজ আমাদিগের সমক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি সমক্ষে বসিয়া, সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন,—"আপনি লিখুন, আমি চক্ষে দেখিয়াছি। আমি এবং আমার একটি বিধবা সুহৃদ্—আমরা দুই জনে—এক স্থানে, একই সময়ে, দুই তিনটা উজ্জ্বল দীপের প্রখর আলোকে, চক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা মনের ধাঁ ধাঁ, অথবা মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে না। আমরা, এই নগরের কোন একটি পুরাতন গৃহে, একদা রাত্রি ঠিক সাড়ে এগারটার সময়ে, আমাদিগের একটি সুপরিচিত স্বর্গগত সুহৃদের ছায়া-মূর্ত্তিকে, একটা কুঠুরীর মধ্যে,—সেই কুঠুরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুক্ষণ বিষণ্ণভাবে পাদ চারণ করিতে দেখিয়াছি। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা কিরূপে অবিশ্বাস করিব?"

* অনুবাদ আশার অনুরূপ সরল ও শুদ্ধ হইল না বলিয়া মূল লেখা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'Feeling and thought are much more real than anything else: they are the only things which we directly know to be real.'

† "We may suppose that the same thoughts, emotions, volitions, and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions."

আমরা এই স্থানে যাঁহার সাক্ষ্য উপস্থাপন করিলাম, তিনি তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার মত আরও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—বহুজ্ঞ হিন্দু, বিজ্ঞ বিচক্ষণ মুসলমান, এবং বহুদর্শী ও বিশ্বাসী ব্রাহ্ম, নিজ নিজ প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞাত বিষয়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে, নাম-স্বাক্ষর করিতে সম্মত। কিন্তু, তাঁহাদিগের নামের মহিমা কি? বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে কে তাঁহাদিগকে চিনিবেন? চিনিলেও, কয়জনে তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া, আপনার স্বর্গগত পিতৃ-পুরুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত জ্ঞানে, তদীয় পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রার্থনা কিংবা পিতৃ-তর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবেন?

আমরা, এই হেতু, আজি পাঠককে দুইটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পরীক্ষণ-পটু বৈজ্ঞানিকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-মূলক সাক্ষ্য উপহার দিব;—যাঁহাদিগকে সকলেই চিনে, সকলেই জানে, অথবা যাঁহাদিগকে না জানিলে নিজ নিজ মূর্খতা মাত্র প্রমাণিত হয়, তাদৃশ লোকের সাক্ষ্য প্রদান করিব। যদি কাহারও হৃদয়, এইরূপ সাক্ষ্যেও অস্পৃষ্ট রহে, তাহা হইলে বুঝিব, তিনি এ বিষয়ে, আরও কিছুকাল, একবারে অন্ধকারে রহিলেন।

বঙ্গদেশের বালকেরাও, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদাৎ, প্রফেসর ডি মরগেনের নামে অনুরক্ত। ডি মরগেনের সহিত কাব্য-উপন্যাস অথবা রসের কথার কোন দিনও কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি গণিত-বিজ্ঞানের কঠোর তত্ত্ব ও কৃচ্ছ্রসাধ্য গণনা লইয়াই জীবন যাপন করিয়াছেন; এবং যে সকল কথা, গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তনিচয়ের ন্যায়, সার সত্য বলিয়া গৃহীত না হইতে পারে, তাহা ঘৃণার সহিত উড়াইয়া দিয়াছেন। ডি মরগেন "জড় বস্তু হইতে জীবাত্মা" * নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আমি চক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণে শুনিয়াছি। যাহা চক্ষে দেখিয়াছি ও কর্ণে শুনিয়াছি, তাহাতে অধ্যাত্ম তত্ত্বে অবিশ্বাস করা একবারে অসম্ভব।"

ইউরোপের বিদ্যুদ্-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ যাঁহাকে আপনাদিগের শিক্ষক বলিয়া পূজা করিয়াছেন,—যিনি সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ড ও আমেরিকার অন্তর্জাতীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানীর প্রধান বৈদ্যুতিক ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, এবং সাগরের অতলগর্ভে তারে তারে তাড়িত-বার্ত্তা প্রেরণ বিষয়ে সার্ মাইকেল ফ্যারাডে এবং সার্ উইলিয়ম্ টম্‌সনকে সবিশেষ সহায়তা করেন, সেই সর্ব্বজন-সুবিদিত সি এফ ভার্লী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, ইহা স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—পঁচিশ বছর পূর্ব্বে আমি বড় কঠোর-মস্তিষ্ক অবিশ্বাসী ছিলাম। তার পর, আমার আত্ম-পরিবারের মধ্যে, অকস্মাৎ এবং নিতান্ত অচিন্তিত প্রকারে, ছায়া-

পাঠক "Matter to Spirit" নামক তাত্ত্বিক গ্রন্থখানি নিজে পড়িলেই ভাল হয়। ঐ গ্রন্থেরই দুইটি পংক্তি, এই স্থানে উদ্ধৃত হইল। "I have both seen and heard, in a manner which would make unbelief impossible regarding things called spiritual."

দর্শন সংক্রান্ত নানা প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতে লাগিল * * * আমি বাধ্য হইয়া অনুসন্ধান করিলাম। অনুসন্ধানের জন্য অনেক প্রকার কল-কৌশল করিলাম। সে সকল কল-কৌশল এমন ছিল যে, কাহারও কোন রূপ স্বার্থ-শঠতা অথবা আত্ম-বঞ্চনার সম্পর্ক থাকিলে, তাহা ধরা না পড়িয়া যাইত না। ঐরূপ বহু অনুসন্ধানের পর, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, অধ্যাত্ম ঘটনা-নিচয় প্রকৃত সত্য। সে বিষয়ে আর প্রমাণের অভাব নাই। প্রমাণ স্তূপীকৃত; এবং সে প্রমাণ সমূহকে উপেক্ষা করিবার দিন এই ক্ষণ অতীত হইয়াছে। *

এই স্তূপীকৃত প্রমাণের কথা মনে রাখিলে, আত্মিক-কাহিনী সকলের নিকটই উপন্যাস অপেক্ষা উচ্চতর পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইবে; এবং উহার প্রত্যেক ঘটনা মনুষ্যের আত্মাকে, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের তরে, পরলোকের তত্ত্ব চিন্তা করিতে বাধ্য করিবে।

"Twenty-five years ago I was a hard-headed unbeliever. ... Spirit phenomena, however, suddenly and quite unexpectedly, were soon after developed in my own family. ... That the phenomena occur there is overwhelming evidence, and it is too late now to deny there existence." C. F. Varley, the distinguished English Electrician &c. &c.

আত্মিক-কাহিনী।

জর্ম্মণীর অন্তর্গত কোন একটি ক্ষুদ্র নগরের এক ক্ষুদ্র গৃহে পতি-মনোমোহিনী মিন্না একাকিনী উপবিষ্টা। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত-প্রায়। কিন্তু তথাপি মিন্নার বিষয়ান্তরে মনো-নিবেশ হইতেছে না। মিন্না সুন্দরী ও যুবতী। কিন্তু, মিন্নার মুখশ্রী, নিদাঘ-দগ্ধ গোলাপের ন্যায়, আজি মলিন ও বিশুষ্ক। ভাবনা-কুঞ্চিত নিটোল ললাটে অল্প অল্প স্বেদ-বিন্দু। নয়নে শূন্য দৃষ্টি। যৌবন-সুলভ সরস-হাসির সুখ-নিবাস-স্বরূপ অধর-প্রান্ত আজি বিষাদ-ভারাক্রান্ত। রমণী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, আপনা আপনি কহিলেন,—'হায়, এ কাল-সমরের কি শেষ নাই!—আজ আমার প্রাণটা এমন হইল কেন?—তিনি কুশলে আছেন ত?'

অল্প দিন হয়, মিন্নার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার পতি যুবক, সর্ব্বাংশেই শ্রীমান্ ও বলিষ্ঠ। মিন্না যেমন পতি-প্রেম-মুগ্ধা ও পতি-গত-প্রাণা; তাঁহার পতিও তেমনই পত্নী-সুখানুরাগী, প্রেমিক, ও পত্নী-গত-প্রাণ। পতি সৈনিক পুরুষ। তিনি, এইক্ষণ তাঁহার প্রিয়তমা মিন্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সমর-ক্ষেত্রে সংগ্রাম-কার্য্যে ব্যাপৃত। এই হেতুই মিন্নার মুখখানি অমন মলিন; এই হেতুই তিনি ঐরূপ চিন্তাকুলা ও বিষণ্ণা। মিন্না যাঁহাকে, তিলেকের তরে, না দেখিতে পাইলে, পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে, তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। মিন্না জীবন্মৃতবৎ আত্মহারা।

যুদ্ধ-যাত্রা-সময়ে, মিন্না গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রণ-বেশে সজ্জিত পতির বীরমূর্ত্তি খানি তৃষিত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পতিও, যত ক্ষণ তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল, তত ক্ষণ বারংবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঐ গবাক্ষের দিকে কর-স্থিত রুমাল উড়াইয়া উড়াইয়া, সঙ্কেতে বিদায়ি-সম্ভাষণ জানাইতেছিলেন। মিন্নার মানস-নেত্র এখনও যেন প্রতিনিয়ত সেই দৃশ্যই দেখিতেছে;—এখনও যেন, তাঁহার কর্ণ, ক্ষণে ক্ষণেই সেই শ্রেণীবদ্ধ ঘোটকসমূহের সম-বিক্ষিপ্ত পদ-শব্দ শুনিয়া চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। মিন্না একবার সেই গবাক্ষের নিকটে যাইতেছেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া অবসন্ন-প্রাণে বসিয়া পড়িতেছেন। আজ আর তিনি কোন প্রকারেই প্রাণে শান্তি পাইতেছেন না।

হঠাৎ সিঁড়ীতে শব্দ হইল। মিন্না সেই দিকে কর্ণপাত করিলেন। শুনিলেন, পায়ের শব্দ। কিন্তু ঐ পদ-শব্দ কোন আগন্তুকের নহে,—উহা শ্রুত-পূর্ব্ব ও চির-পরিচিত। যুবতী ত্রস্তভাবে গাত্রোত্থান করিলেন। এক-পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, দরোজা খুলিয়া গেল; দেখিলেন,—সম্মুখে পতি দণ্ডায়মান! শরীরে সৈনিক সজ্জা। কিন্তু সে সজ্জা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও রুধিরাক্ত। ললাটে গভীর ক্ষত। ক্ষত-মুখে তীর-বেগে শোণিত-ধারা প্রবাহিত। প্রাণাধিক প্রিয়তমের এই ভয়াবহ শোচনীয় মূর্ত্তি অকস্মাৎ দেখিতে পাইয়া, মিন্নার বুক ধড়ফড় করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া যাইয়া, আহত পতিকে বুকে আবরিয়া লন। কিন্তু পারিলেন না। ভীতি ও বিস্ময়ে পদদ্বয় অচল ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি বজ্রাহতার ন্যায় আড়ষ্ট ও অর্দ্ধ-মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না।

মূর্ত্তি মিন্নার পানে কাতর চক্ষে তাকাইয়া বলিলেন,—'মিন্না, তুমি বিস্মিত ও ভীত হইয়াছ। ভয় ত্যাগ কর, আমি যাহা বলিতেছি, স্থিরচিত্তে শুন। এই যে, আমার ললাটে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতেছ, এই সাংঘাতিক আঘাতেই, অদ্য রণ-ক্ষেত্রে, পৃথিবীর সম্পর্কে, আমার মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে ত, আমরা উভয়ে, এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমাদিগের মধ্যে, অগ্রে যাহার মৃত্যু হইবে, সেই অন্যের সমীপে, আত্মিক দেহে উপস্থিত হইব। আমি সেই প্রতিজ্ঞা-পালনার্থই তোমাকে এই বেশে দেখা দিতে আসিয়াছি। তুমি আমার বিয়োগ-দুখে শোকাতুর ও অধীর হইও না। পর-লোকেও আমি তোমাকে ভুলিতে পারিতেছি না। এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও আমি তোমার অধিকতর নিকটস্থ। যখন প্রবৃত্তি ও শক্তি হইবে, তখনই তোমাকে দেখা দিব। প্রিয়তমে, তুমি, আমাকে দেখিয়া পাছে ভয় পাও;—যখনই আসিব, পূর্ব্বে একটি ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইবে, এবং তোমার কর্ণের নিকট বলিব,—"মিন্না, আমি এসেছি।" ইহা বলিতে না বলিতেই ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিন্না ক্ষণকাল আত্ম-বিস্মৃত ও বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। ইহার পর, যখন একটুকু প্রকৃতিস্থ

হইলেন,—তখন তাঁহার মনে এই ভাবনার উদয় হইল।—'স্বামী এরূপ ভয়ঙ্কর বেশে অকস্মাৎ দেখা দিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন! ইহা কি দেখিলাম! তবে কি সত্য সত্যই প্রিয়তম স্বর্গগত হইয়াছেন! তবে কি সত্য সত্যই আজি সমর-ক্ষেত্রে অভাগিনীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে!' ইত্যাদি উৎকট ভাবনায় তিনি একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। নয়নে ধারা বহিল। রণ-ক্ষেত্রের সংবাদ জানিবার জন্য পাগলিনীর ন্যায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

দুই চারি দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল। প্রকৃতই তাঁহার স্বামী ঐ দিন রণ-ক্ষেত্রে তনু-ত্যাগ করিয়াছেন। এই নিদারুণ শোক-সংবাদে পতি-প্রেম-বিহ্বলা মিন্নার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কখনও বা মূর্চ্ছিত এবং কখনও বা অশ্রুজলে আপ্লুত হইতে লাগিলেন।

মিন্নার আপনার জন কেহ নাই। এ দুঃসময়ে কে তাঁহার সংবাদ লইবে?—কে দুটি মিঠা কথায় তাঁহার পোড়া প্রাণে শান্তি দান করিবে? কিন্তু এক অদ্ভুত ও বিচিত্র ঘটনা, এই দুঃসহ শোকে একটু শান্তির উপায় বিধান করিল। এই সময় হইতে, পতির ছায়া-মূর্ত্তি প্রতিনিয়তই তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল। মিন্না, শোকে দুঃখে, যখন বড় বেশী আকুল হইতেন, তখনই টুন্ করিয়া একটি মৃদু ঘণ্টা-ধ্বনির মত শব্দ হইত; এবং তাঁহার কানের কাছে, তাঁহার চির-পরিচিত প্রিয়কণ্ঠে,—"মিন্না, এই ত আমি এসেছি," এই কটি কথা মৃদু মৃদু উচ্চারিত হইত।

প্রথম প্রথম ঘণ্টাধ্বনির মত শব্দ শুনিয়া মিন্না শিহরিয়া উঠিতেন, এবং কেমন একটা আতঙ্কের ভাবে অবশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু, এ অবস্থা, অনেক দিন রহিল না। দিন দিনই ভয় কমিয়া আসিল। তিনি, কিছু দিন পরে, পতির ছায়ামূর্ত্তি দর্শনে, ভীতির পরিবর্ত্তে প্রীতি, এবং উহার সহিত আলাপে, আতঙ্কের পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন কি, অবশেষে, কত ক্ষণে ছায়ামূর্ত্তির দেখা পাইবেন, এই আশায় উৎসুক-চিত্তে বসিয়া থাকিতেন; এবং একটি বিবেক-ধর্ম্ম-পরায়ণা বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী ও বাড়ীর একটি পরিচারিকাকে আত্মজীবনের এই আশ্চর্য্য-কাহিনী সবিশেষ জানাইতেন।

মিন্নার বৈধব্য-ব্রত ভঙ্গ হইল না। কিন্তু বৈধব্য-দুঃখ দূর হইয়া গেল। এই এক বিচিত্র ভাবে, চির-জ্বালা-দগ্ধ বৈধব্যও যেন, তাঁহার পক্ষে, চিত্ত-প্রীতিকর হইয়া উঠিল। ছায়া-মূর্ত্তি বলিতেন, "আমি এইরূপে, প্রতিদিনই তোমাকে দেখা দিব, প্রতিনিয়তই পরিরক্ষকের মত, তোমার কাছে কাছে থাকিব।" তিনি বলিতেন,—"আমি আর ইহ জীবনে পত্যন্তর গ্রহণ করিব না;—এবং কালে যখন এই মৃণ্ময় তনুর পিঞ্জর হইতে পরিমুক্ত হইব, তখন তোমার মত হইয়া, তোমারই সঙ্গে মিশিয়া যাইব। ইহাই আমার জীবনের চরম সুখ ও শেষ আকাঙ্ক্ষা।"

মিন্নার মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য শুনিলেই, ছায়া-মূর্ত্তির মুখ খানি গম্ভীর ভাব ধারণ করিত, এবং তিনি কহিতেন,—"মিন্না, মনে যাহাই থাকুক, সাবধান, কোনরূপ প্রতিজ্ঞায়

আবদ্ধ হইও না। তুমি স্বাধীনা; প্রবৃত্তি হয়, আবার বিবাহ করিবে; প্রবৃত্তি না হয়, না করিবে। কিন্তু, বিবাহ করিবে না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিও না।" কিন্তু, মিন্না সে নিষেধ মানিতেন না। কেন না, ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞায় প্রেমময়ীর মনে বড়ই আত্মগৌরবের আনন্দ। তিনি পতিমূর্ত্তির নিকট যেমন পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেন, আপনার বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনীকেও সে প্রতিজ্ঞার কথা জানাইতে ভালবাসিতেন।

অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। মিন্না এখন বিধবার মলিন বেশ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি এখন, সময়ে সময়ে, নাচ ও ভোজ ইত্যাদি উৎসবেও যোগদান করেন। কিন্তু এখনও তাঁহার পতি-গত পবিত্র-প্রাণে প্রকৃত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

একদা রজনীযোগে এক ভোজের উৎসবে মিন্নার নিমন্ত্রণ হইল! ভোজের সঙ্গে 'বল' বা নৃত্যের অনুষ্ঠান হইবে। মিন্না নৃত্যের সাজে সজ্জিত হইয়া ভোজ-স্থানে উপস্থিত হইলেন। উৎসব-গৃহে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে ফ্লোরেন্সের একটি যুবকের প্রতি মিন্নার নয়ন আকৃষ্ট হইল। শুধু নয়ন আকৃষ্ট হইল, এমন নহে; মনেও একটু ভাবান্তর জন্মিল। বৈধব্যের পরে, যে ভাব, তিলেকের তরেও, মিন্নার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, আজি সহসা, সেই ভাব জোর করিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া লইল। যুবক ও যুবতী উভয়ই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। চোখে চোখে মনের বিনিময় হইতে লাগিল। মিন্না ভাবিলেন,—জীবনে আর কখনও বুঝি বা সর্ব্বাংশে এমন প্রিয়দর্শন, প্রিয়ভাষী ও সুরসিক যুবা পুরুষ তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হন নাই। তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন; এবং যুবকের সানুরাগ অনুরোধে ভুলিয়া, রোমাঞ্চিত কলেবরে, তাঁহার সহিত নৃত্যে যোগদান করিতে চলিলেন। কিন্তু, অমনই, তাঁহার কানের কাছে, তাঁহার বৈধব্য-জীবনের পথ-প্রদর্শক সেই নিত্য-শ্রুত ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মিন্না উহা শুনিলেন না। সন্নিহিত কোন কোন ব্যক্তি সহসা ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন। মিন্না আর তখন আপনাতে আপনি নহেন, একবারে ফ্লোরেণ্টাইন যুবকের নব ভাবে নিমগ্ন। তাঁহার কর্ণে ঐ মৃদু ঘণ্টাধ্বনি স্থান পাইবে কেন?

ঘণ্টা আবার বাজিল। এবার আর সে মৃদুমধুর ধ্বনি নহে, মৃত্যুকালীন ঘণ্টা-শব্দবৎ সুগভীর শোক-ধ্বনি। কি বিচিত্র! উৎসব-গৃহের সকলেই উহা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া চমকিত হইলেন। "মিন্না এই যে আমি", এই কথাটিও ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মিন্নার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইল। সন্নিহিত লোকেরাও ইহা স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, কে কোথা হইতে এই কথা কহিল, জানিবার জন্য, উৎসুক-নেত্রে, চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। মিন্না চমকিয়া উঠিলেন, এবং ভয়-চকিত-চক্ষে সম্মুখস্থিত আয়নার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, উহাতে তাঁহার নিজ প্রতিবিম্বের উপরিভাগে স্বামীর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হই-

য়াছে! যুবতী অমনই অস্ফুট স্বরে 'ঐ ত আমার স্বামী'—এই বলিয়া চীৎকার করিলেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। শুশ্রূষার জন্য অনেকেই দ্রুতবেগে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। কিন্তু কে আর কাহার শুশ্রূষা করিবে? তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, মূর্চ্ছা নহে,—মৃত্যু।—মিন্না তাহার দেহে নাই। পক্ষিণী উড়িয়া গিয়াছে। শূন্য পিঞ্জর ধূলায় লুটাইতেছে। ফ্লোরেণ্টাইন যুবকের নয়ন-প্রান্তে এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। উৎসব-গৃহ স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিষণ্ণ। নাচ ও ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই, এই অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা সম্বন্ধে, নানারূপ আলোচনা করিতে করিতে, আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মিন্না যদি, তদীয় স্বর্গগত পতির ছায়া-মূর্ত্তি-সন্নিধানে, তাদৃশ কঠোর বৈধব্য-ব্রতের প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ না হইতেন, বোধ হয়, তাহা হইলে, তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাঁহার এ মৃত্যু ছায়া-মূর্ত্তির ক্রোধে নহে, তাঁহার স্বকীয় আত্মার অন্তঃস্থিত লজ্জা, দুঃখ, অনুতাপ এবং অস্বাভাবিক আতঙ্কের আকস্মিক সংঘাতে। শুধু ভয়েই অনেক স্থলে অনেকের মৃত্যু হয়। এখানে, ভয়ের সঙ্গে, অনেক প্রকার ক্লেশজনক ভাবের মিশ্রণ হইয়াছিল। হা দুর্ব্বল-হৃদয়া মিন্না! তুমি, তোমার এই অচিন্তিত মৃত্যুতে, চিন্তা-বিমুখ ও চটুল-চরিত্র মনুষ্য জাতিকে, কি শিখাইয়া, অকস্মাৎ কোথায় চলিয়া গেলে?

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "যুগল-প্রদীপ।—উপন্যাস।—শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।—১৪নং সুকিয়া,—ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" আমরা ননিলাল বাবুর আর কোন গ্রন্থ পাঠের সুবিধা পাই নাই। সাহিত্য-সম্পর্কে, আমরা যেমন তাঁহার নিকট নূতন, তিনিও তেমন আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু, এই নূতন পরিচয়ে,—যুগল-প্রদীপের আলোক-প্রলোভিত এই ক্ষণিক আলাপেই আমরা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পাইয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের পুরাতন সুহৃৎ,—সাহিত্যে সুকৃতী, এবং সমাজে সুপথ-প্রদর্শক। তাঁহার এই যুগল-প্রদীপ এক খানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর,—স্থানে স্থানে হৃদয়হারিণী। বাঙ্গালি পাঠকদিগের মধ্যে, যাঁহারা উপন্যাস-পাঠের জন্য আকুল রহেন, যুগল-প্রদীপ তাঁহাদিগকে, আনন্দ-দানের সঙ্গে সঙ্গে, অনেক সময়েই, স্নিগ্ধ-শীতল আলোক দান করিবে। গ্রন্থখানি চারি খণ্ডে পল্লবিত, এবং রয়েল আট পেজী এক শত সাত আশী পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। ইহার পরিচ্ছেদগুলি বিষয়াংশে এমনই সুকৌশলে বিভক্ত ও বিন্যস্ত যে, যিনি পড়িতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহাকেই, উত্তরোত্তর ঘটনাগুলি জানিবার জন্য, কখনও একটুকু উৎসুক, কখনও একটুকু উদ্বিগ্ন রহিতে হইবে।

কিন্তু, উল্লিখিতরূপ কৌতূহল সৃষ্টি করিতে যাইয়া, গ্রন্থকার এক অংশে যেমন কারুকৌশল দেখাইয়াছেন, আর এক অংশে তেমন কতকটা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। পাঠক, এই গ্রন্থের কএকটি পরিচ্ছেদ অতিক্রম করিলে, সততই ইহা বুঝিতে পায় যে, সে ঔপন্যাসিকের নিকট বসিয়াছে,—উপন্যাস শুনিতেছে, এবং উত্তরোত্তর ঘটনায় অধিকতর আশ্চর্য্য কিছু সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে শ্রোতা, বক্তার সম্পর্কে, এবং পাঠক ও, লেখকের সম্পর্কে, এইরূপ সতর্ক রহে, সেখানে অবশ্যই রস-স্ফূর্ত্তির কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটে। কারুখচিত কৃত্রিম ফুল যখন কৃত্রিম বলিয়া বোধ না হয়, তখনই উহা কৃত্রিমতার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে। উপন্যাসও যখন আর উপন্যাস বলিয়া প্রতীয়মান না হয়, তখনই উহা ঔপন্যাসিক উৎকর্ষের উচ্চ গ্রামে উপস্থিত হয়। যুগল-প্রদীপের অনেক স্থানই উৎসুক পাঠকের নিকট ঔৎসুক্যবর্দ্ধক উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের বিবেচনায়, গ্রন্থকার, ঘটনার বিকাশে, স্বাভাবিকতার পক্ষে, আর একটুকু সাবধান রহিলেই ভাল হইত। কিন্তু, এ অংশেও, তাঁহার পক্ষে একটা বিশেষ কথা বক্তব্য আছে। তদীয় আখ্যায়িকার এক ভাগের উপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেই লোকভয়ঙ্কর বিদ্রোহ-ইতিহাসের সামান্য একটুকু ছায়া পড়িয়াছে। সে সময়ে সম্ভব ও অসম্ভব অনেক স্থলে এক হইয়া গিয়াছিল। যুগল-প্রদীপের অসম্ভবও, সাতান্ন সালের মহিমায়, একটা সুসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যুগল-প্রদীপের উপাখ্যানে, এক বৃন্তে দুইটি ফুলের মত, একই প্রসঙ্গে দুইটি নায়িকা। একটির নাম অন্নপূর্ণা, আর একটির নাম ছায়াময়ী। যমুনা-তরঙ্গ-ধৌত বিল্বগ্রামে, বাবু হরমোহন দত্ত নামে, একজন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সাধুচরিত্র ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা। তাঁহার নাম ছায়া। সোনার পুতুল ছায়া, নিদ্রাণ-যশোদার ক্রোড়-স্থিত যোগমায়ার ন্যায়, সুতিকা-গৃহ হইতে অপসারিত হইয়া, সুদূর বৃন্দাবনে, এক সন্ন্যাসীর স্নেহ-নিকেতনে, লালিত, পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ছায়া তাহার পিতা মাতাকে জানিত না। তাহার পিতা মাতাও ছায়ার সংবাদ রাখিত না। ছায়ার মাতা অকালে স্বর্গগত হন। পিতা হরমোহন দত্ত, ছায়ার প্রতিনিধিরূপা অন্নপূর্ণাকেই, আপনার কন্যা জ্ঞানে, প্রাণভরা ভালবাসার অতুল-সম্পদ-দানে, প্রতিপালন করেন। গ্রন্থকার অন্নপূর্ণার চরিত্রে যেমন চিত্রনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তেমনই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য ফলাইয়াছেন। কিন্তু, ছায়ার চরিত্র ফোটো ফোটো হইয়াও ফোটে নাই।

এই গ্রন্থে আর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। তাহার নাম শৈবাল। শৈবাল জাতিতে নেপালিনী। সে বঙ্গদেশের এক জন দস্যুনেতৃ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল, এবং সেই দস্যুনেতার পশ্বাচারে দেহ-প্রাণে দগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু, তথাপি সে তাহার ঐ স্বজন-নিপীড়ক সর্ব্বস্ব-অপহারক দস্যু-স্বভাব-পরিরক্ষককেই প্রাণের সহিত ভালবাসিত, এবং পতিজ্ঞানে পূজা করিত। গ্রন্থকার, তাহার মুখে, এক জন অপরিচিত লোকের সম্মুখে, বিনা-প্রয়োজনে, তাহার তথাবিধ পতিত্ব-জ্ঞান,—পতি-ভক্তি ও পতি-স্তুতির যে সকল কথা ফুটাইয়াছেন, তাহা কোন অংশেও মনুষ্য-হৃদয়ের স্বাভাবিক কথা বলিয়া বোধ হয় না।

গ্রন্থে, আমাদিগের বিবেচনায়, এইরূপ দুই চারি প্রকার দোষ আছে। কিন্তু, এই সকল

দোষ কিয়দংশে মতামতের কথা। আমরা বিষয়-বিন্যাস ও চরিত্র-বিকাশের যে সকল কথাকে দোষ বলিয়া বুঝিয়াছি, গ্রন্থকার যদি সেগুলিকে দোষ বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের মতাভিব্যক্তি ও সমালোচনার কোন সার্থকতা নাই।

আমরা গ্রন্থকারের ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছি। তিনি প্রভাত-সমীর-লীলায়িত যমুনার বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিতেছেন,—"ঊষার সমীরণ-স্পর্শে, পুলকিতা, মুখরিতা, যমুনা, সুমধুর কল-নিনাদে, সাদর-তরঙ্গ-প্রহারে, সুপ্ত-সরোজদলকে জাগাইয়া দিতেছে।" তাঁহার এ গ্রন্থে এইরূপ মধুর রচনা অনেক স্থানেই পাঠকের হৃদয়কে মোহিত করিবে। যমুনার জল সুপ্ত-সরোজ-দলে সুশোভিত রহে কি না, তাহা প্রকৃতই জানি না। কিন্তু বর্ণনা সুসুপ্ত হৃদয়-সরোজের উন্মেষক,—সুনির্ম্মল সৌন্দর্য্য-সুখানুভূতির পরিপোষক। এইরূপ সুলেখকের সহিত শব্দ-গ্রন্থন-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করা সাহিত্যের উপকার-জনক। আমরা, এই হেতু, গ্রন্থের আর এক স্থল হইতে, কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব। গ্রন্থকার আর এক স্থলে লিখিতেছেন,—

"এই পৃথিবীতে মনুষ্য-সমাজে জনরবের যেমন আধিপত্য, এমন আর কাহারও নহে। * * * জনরবের নির্য্যাতনে, * * আরান ঘোষকে, বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া, নির্জ্জন নিধুবনে ধাববান হইতে হইয়াছিল।"

উপরিধৃত প্যারায় জনরবের প্রতিযোগিতা স্থলে, 'কাহারও' না 'কিছুরই' এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ পদটি অধিকতর সঙ্গত, বোধ হয় তাহা আলোচনার যোগ্য। অপিচ, 'নিধুবন' ও 'বিধুবন' প্রভৃতি শব্দকে, তালবন ও তমাল-বনের ন্যায়, বনবোধক শব্দের সঙ্গে, বাঙ্গালায় নূতন অর্থে চালাইয়া দেওয়া উচিত কি না, তাহাও বিশেষ একটা বিবেচ্য কথা।

গ্রন্থকার সমাস-রচনা ও সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ-প্রয়োগে পটু। কিন্তু, এই দুইটি বিষয়ে যে সকল পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা, বাঙ্গালা ভাষায়ও, অপরিহার্য্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে, তিনি তন্নিচয়ের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধান্বিত কি না, তাহা বুঝিলাম না। এই গ্রন্থে "মোহিনী-শক্তিময়", "নয়ন-বিমুগ্ধকর", ক্ষণধ্বংসী-দেহ," "চরণ-চুম্বিত", ও "পরিচ্ছন্ন", প্রভৃতি যে সকল সমাস-বদ্ধ পদ দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় প্রামাণিক রীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধানুরাগের পরিচায়ক নহে। প্রাচীন ব্যাকরণের সম্মান করিতে হইলে, বোধ হয়, 'মোহন-শক্তিময়', 'নয়ন-মোহন' অথবা 'নয়ন-বিমোহন,' 'ক্ষণধ্বংসি-দেহ' ও 'চরণ-চুম্বি' বলাই সুসঙ্গত। "পরিচ্ছন্ন" শব্দও, কি সূত্রে, কি অর্থে, পরিস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে, মাঝে মাঝে বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা বুঝি না। অপিচ, "বীভৎস্য" ও "শান্তনা" প্রভৃতি শব্দও আমাদিগের নিকট বিশুদ্ধ প্রয়োগ বলিয়া বোধ হইল না। ননী বাবুর মত ক্ষমতাপন্ন লেখক, শব্দ-ব্যবহারের শুদ্ধতা সম্পর্কে, আলোচনা করিলে, সাহিত্য-সেবীর উপকার হইবে।

আমরা এত ক্ষণ গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য নীতি বিষয়ে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাই নাই। সে অংশে আমরা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে নীতির যাহা সারাৎসার, অথবা সারোৎকৃষ্ট স্বরূপ নির্ম্মলতম সৌন্দর্য্য, গ্রন্থকার তাহারই উপাসক। বঙ্গীয় কুল-ললনা ললনা-কুল-রত্ন রূপিণী অন্নপূর্ণার অমল চরিত্র হৃদয়ে পোষণ করিতে পারিলে, বঙ্গ-সমাজের বিশেষ উপকার হইবে।

তিনটি গীতি কবিতা।

১। নবদ্বীপধামের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গের বিদায় গ্রহণ।

১

যাই যাই যাই, তোমায় ছেড়ে যাই,
আনন্দ-নিলয় নদীয়া আমার,—
নয়ন-মোহন ও মুরতি তব
বুঝি এ জীবনে দেখিব না আর।

২

মায়াপুরে তব, যেন মায়ের কোলে,
কত সুখে তুমি আমায় রেখে ছিলে,
সে সব স্মরণে, আজি দু নয়নে,
দর দর ধারা বহে অনিবার।

৩

তোমার তরুরাজি লতার বিতান,
নিকুঞ্জ-নিচয় অঙ্গন উদ্যান,
অই বন রেখা, প্রাণে র'ল লেখা,
এই শেষ দেখা এ ভাবে এবার।

৪

ধূলায় প'ড়ে আমি ভাসি অশ্রুজলে,
কত কাঁদিয়াছি হরি-বোল ব'লে,
তোমার ঐ ধূলায়, প্রেমের খেলায়,
উথলিত মম প্রেম-পারাবার।

৫

প্রেমাবেশে কেহ আবার কখন,
ঐ ধূলায় প'ড়ে করিলে রোদন,
কহিও তাহারে, ডাকিলে আমারে,
দেখিতে সে পাবে হৃদয়ে তাহার।

৬

দেখিতে পাইবে অই গঙ্গাজলে,
মৃদু কল-কলে কীর্ত্তনের ছলে,
তরল তরঙ্গে, প্রেমের প্রসঙ্গে,
ভাসিছে কাঙ্গাল নিমাই তোমার।

২। রাধা-কুণ্ড-তটে গৌরাঙ্গ।
ব্রজবাসীর প্রতি উক্তি।

১

দেখ সবে দেখ, আঁখি ভরে দেখ,
রাধা-কুণ্ড-তটে কে প'ড়ে ধূলায়!
কিবা রূপ-রাশি, ভূতলে প্রকাশি,
কি ভাবে কে ব্রজে এল পুনরায়।

২

যুগান্তর হ'ল রাধা বিনোদিনী,
যোগে তিরোহিত প্রেম-উন্মাদিনী,
আজি সে রাধার, বরণে আবার,
বৃন্দাবনধামে কে রে শোভা পায়?

৩

সে থির বিজরী জড়িত বরণ,
উথলে বরণে চাঁদের কিরণ,
সে বিলোল আঁখি, ব্রজে কি যে দেখি,
তমালের পানে তেমনি হে চায়।

৪

তেমনি নয়নে বহে জল-ধারা,
তেমনি আবেগে যেন আত্ম-হারা ;
তেমনি উচ্ছ্বাস, তেমনি উল্লাস,
তেমনি উন্মাদ কেন দেখি হায় !

৫

দূরে ছিল শিখী, আইল নিকটে,
বংশী ধ্বনি যেন শুনি বংশী বটে,
জলের কল্লোল, যমুনার তটে,
ব্রজের গাভী কেন ধেয়ে কাছে যায় ?

৬

শুষ্ক তরু কেন সহসা হাসিল,
ফুলে ফুলে অলি কি সুখে বসিল।
কি দেখি ময়ূর, ময়ূরী নাচিল,
বল ব্রজবাসী বল হে আমায় ?

৩। গৌর-রূপ দর্শনে
ব্রজবাসিনীর বিস্ময়।

১

তুমি ভুবন-মোহন গউর বরণ,
কে বসে তমাল তলে হে,
তোমায় দেখ্‌লে আঁখি আর ফিরে না,
পরাণ উঠে উথলে হে।

২

তরল জোছনা যতনে ছাঁকিয়া,
তরল তড়িতে সে সুধা মাখিয়া,
কোন্ বিধি কোথা, আহা কি দেখিয়া,
গড়িল তনু বিরলে হে।

৩

সে ছাঁকা জোছনা, সে মাখা বিজলী,
যা দিয়া গড়িল ও তনু পুতলী,
বুঝি রেখে ছিল, ভিজাইয়ে—
বিরহিণীর নয়ন-জলে হে।

৪

কিবা সুদীঘল নয়ন যুগল,
সদা টল টল পলকে চঞ্চল
হায় দুনয়নে, ক্ষণে ক্ষণে,—
কি যেন কি ভাবে খেলে হে।

৫

পুরুষ শরীরে প্রকৃতির রূপ,
একি অপরূপ মাধুরী অনুপ,
যেন কাঁচা সোনায় নীল মণি—
ঝলকে সদা উছলে হে—

৬

শূন্য বৃন্দাবনে শোকাকুল মনে,
কার লাগি কাঁদ কি কথা স্মরণে,
কেন আকুল প্রাণে, ডাক তুমি,
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে হে। *

* শেষ কবিতাটি মনোহর-সহী সুরে এবং আর দুইটি অন্যান্য সুরে গাইতে পারা যায়।

রাণাকুম্ভ।

সন্ধিতে, মিবার আক্রমণের যেরূপ ব্যবস্থা হইল, তাহা এই,—কুত্‌বুদ্দীন মিবারের দক্ষিণাংশ আক্রমণ করিবেন; মামুদ মিবারের উত্তরসীমা আজমীর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করিবেন ; এবং প্রয়োজন মত, যথা সাধ্য একে অন্যের সাহায্য করিবেন।

আমরা যুদ্ধ বিবরণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, সন্ধির তারিখ লইয়া একটু খুটিনাটি না করিয়া পারিব না। নিজামুদ্দীন "তাবাকাত্-ই-আকবরীর" গুজরাট খণ্ডে হিজরি ৮৬০ সালের শেষভাগে সন্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মালবখণ্ডে ৮৫৭ হিঃ সন্ধির সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফিরিস্তাও নিজামুদ্দীনের এই ভ্রম লক্ষ্য করেন নাই। ফিরিস্তার গ্রন্থে ও মালব এবং গুজরাটখণ্ডে তারিখের এইরূপ বিরোধ দৃষ্ট হয়। * ফিরিস্তা এই ভ্রমের জন্য নিজামুদ্দীনের নিকট ই ঋণী। 'মেম্নরাত-ই-সিকান্দরি' † নামক গুজরাটের ইতিহাস-প্রণেতা সিকান্দর, নানা মৌলিক গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। নিজামুদ্দীন গুজরাটখণ্ডে সন্ধির যে তারিখ দিয়াছেন, সিকান্দরও সেই তারিখ ই প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, নিজামুদ্দীন গুজরাটের ইতিহাস-সঙ্কলন-সময়ে মূলগ্রন্থ নিচয়ে যে তারিখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই বিনিবদ্ধ করিয়াছেন। মালবখণ্ডের রচনা সময়েও তিনি মূল গ্রন্থের যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা যদি মানিয়া লওয়া হয়, তবে এই বিরোধ-মীমাংসার উপায় কি ? আমাদের বিবেচনায়, প্রথম অনুসন্ধান করা উচিত, মালব এবং গুজরাট এই উভয় খণ্ড মধ্যে নিজামুদ্দীন কোন্ খণ্ডের জন্য অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজামুদ্দীন 'তাবাকাত্-ই-আকবরীর' মুখবন্ধে বহুবিধ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে নৃপতির রাজত্বকালে গ্রন্থসঙ্কলন করেন, সেই নৃপতির নামেই গ্রন্থের নামকরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মুখবন্ধের উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় মধ্যে মালবের কোন সুলতানের নামে উৎসৃষ্ট একখানি ইতিহাসেরও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অথচ, সুলতান কুত্‌বুদ্দীনের মৃত্যুর সপ্তাহকাল পরে, যিনি গুজরাটের সিংহাসন লাভ করেন, সেই মামুদসাহের নামেই "তাবাকাত্-ই-মামুদশাহ্-ই-গুজরাটী" এবং "মাসির-ই-মামুদশাহ্-ই-গুজরাটী", এই দুই খানি গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ, এই উভয়

* 'তারিখ-ই-ফিরিস্তা', লক্ষ্ণৌর লিথোগ্রাফ সংস্করণ দ্বিতীয় জিল্দ।

† সার এডোয়ার্ড যেলি কৃত "গুজরাটের ইতিবৃত্তে", 'মিরার্-ই-সিকান্দরির' ইংরেজী অনুবাদ।

গ্রন্থের প্রণেতাই কুত্‌বুদ্দীনের সমসাময়িক লোক। অথবা ঠিক সমসাময়িক না হইলেও, সমসাময়িক প্রমাণ তাঁহাদিগের আয়ত্ত ছিল। সুতরাং, মালবের মামুদের অপেক্ষা, কুত্‌বুদ্দীনের ইতিহাসের জন্য, যে নিজামুদ্দীনের অধিকতর প্রামাণিক আদি গ্রন্থ ছিল, ইহা একরূপ নিশ্চয়, এবং গুজরাটখণ্ডে প্রদত্ত সন্ধির তারিখই নির্ভর যোগ্য। নিজামুদ্দীনের গ্রন্থে, তারিখ সম্বন্ধে, ভ্রম প্রমাদ বিরল নহে। আবদুলকাদির বেদেয়নী * "তাবাকাত্‌-ই আকবরী" গ্রন্থে নিবদ্ধ সমসাময়িক ঘটনার বিবরণীমধ্যেও এইরূপ ভ্রমের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। গুজরাটখণ্ডে প্রদত্ত সন্ধির তারিখের শুদ্ধতা বিষয়ে, সিকান্দর সাক্ষ্যদান করিতেছেন। সুতরাং, মালবখণ্ডে নিজামুদ্দীনের ভ্রম হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। মালবখণ্ডে সন্ধির তারিখেই যে গোল, শুধু এমন নহে; পরবর্ত্তী যোদ্ধাদিগের বর্ণনাও অত্যন্ত এলোমেলো। আমরা নিম্নে গুজরাটখণ্ডের তারিখই গ্রহণ করিব। নিজামুদ্দীন এবং সিকান্দর উভয়েই উভয় নৃপতির প্রারব্ধ যুদ্ধব্যাপারের দুএক স্থলে সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ঘটনার উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রাগুক্ত সন্ধির তারিখ অনুসারে নিম্নের বিবরণ প্রকটিত হইল।—

১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে, উভয় নৃপতি, একই সময়ে, মিবার আক্রমণ করিলেন। মামুদ মান্দিসর প্রদেশে আপতিত হইলেন; কুত্‌বুদ্দীন পূর্ব্ব অভিযানে অবলম্বিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমর-স্রোতে নিক্ষিপ্ত কুম্ভ দেখিলেন, উভয় কূলেই বহ্নি প্রজ্বলিত। উভয় সেনার সহিত, এক সময়ে, যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারেন, এরূপ সেনাবল তাঁহার নাই। অথচ উভয় সেনা একবার সম্মিলিত হইতে পারিলে, দুর্গ-রক্ষাও অসাধ্য হইবে। উভয় শত্রু সম্বন্ধে দণ্ডনীতির অনুসরণ সম্ভবে না। কিন্তু এক জনের সঙ্গে দান এবং অপরের সঙ্গে দণ্ডনীতি অবলম্বন করা যায় না কি? এখন কাকে দণ্ড, কাকে দান? কুম্ভ হয়ত জানিতেন, তাঁহার শত্রুদ্বয়ের মধ্যে, চরিত্রগত বিশেষ প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। মামুদ শ্রমশীল, উচ্চাভিলাষী, এবং লোভী। কুত্‌বুদ্দীন অভিলাষহীন, আরাম এবং আমোদপ্রিয়। সুতরাং, কে দানে সন্তুষ্ট হইবে, ইহা তাঁহার সহজেই বুঝা উচিত ছিল। কিন্তু নাগোরের সামসখাঁর আশ্রয়-দাতার প্রতি বিদ্বেষ তাঁহাকে একবারে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই কুম্ভ কুত্‌বুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিলেন; এবং মামুদের নিকট পেশ্‌কস্‌ প্রেরণ করিলেন। মামুদ এবার পেশকস্‌ গ্রহণ করিতে আসেন নাই; মিবার রাজ্য ভারত পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিতে আসিয়াছেন। তিনি পেশকস্‌ ফেরত দিলেন। এবং মান্দিসর প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। রাজপুত কৃষকগণের আবাদের চিহ্নও রাখা হইল না। স্থানে স্থানে থানাদার নিযুক্ত হইল; এবং ঘোষণা করা হইল,—বিজিত প্রদেশ ফি-

* নিজামুদ্দীনের সুহৃৎ এবং "মুন্তাখাবু-ত্‌-তাওয়ারিখ" নামক প্রসিদ্ধ ইতিহাস-প্রণেতা।

লজিপুর নামে আখ্যাত হইবে। কিন্তু তথাপি মামুদের অনুগ্রহ লাভ সম্পর্কে কুম্ভ নিরাশ হইলেন না। পুনর্ব্বার দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "হরকদর পেশকস্‌কে আমর বসাওয়াদ কবুল দারম—যত পেশকস্‌ হুকুম হইবে, ততই প্রদান করিতে সম্মত আছি।" বর্ষা আসিতেছিল; কিছুকালের জন্য যুদ্ধ ক্ষান্ত রাখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং, মামুদ আপাততঃ যথেচ্ছ অর্থ গ্রহণ করিয়া মান্দিসর হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। বর্ষা অবসানে আবার আমরা মান্দিসরে মামুদের সাক্ষাৎ লাভ করিব।

কুম্ভ যখন মান অভিমান ত্যাগ করিয়া মামুদের কৃপা ভিক্ষা করিতেছিলেন, তখন কুত্‌বুদ্দীনও কমলমীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন। এবার প্রথমেই কিতাপোদাকে আবুদুর্গ অধিকার করিয়া দিয়া সত্যপালন করিলেন। সিরোহীর রাজা অবশ্যই পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। গুজরাট সৈন্য ক্রমে কমলমীরের সমীপবর্ত্তী হইল। কুম্ভ সসৈন্যে কমলমীরে অবস্থান করিতেছিলেন। গুজরাট সৈন্যের আবির্ভাবে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, চিতোরের অভিমুখে সরিতে আরম্ভ করিলেন।—কুত্‌বুদ্দীনও রাজপুত সেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, মহারাণা যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। সম্ভবতঃ সুচারুরূপে সেনা সন্নিবেশের উপযোগী স্থানে পহুঁছিয়াছিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সারাদিন যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তথাপি জয়-পরাজয় কিছু স্থির হইল না। ক্রমে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। চারি দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। অগত্যা উভয় পক্ষই যুদ্ধক্ষান্ত করিয়া আপন আপন শিবিরে আশ্রয় লইল। পর দিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আজ কুত্‌বুদ্দীন স্বয়ং, পারস্যের ভীম রুস্তমের ন্যায়, পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আজ রাজপুতসেনার পরাজয় হইল। রাণা পর্ব্বতমালার অন্তরালে পলায়ন করিয়া সুলতানের নিকট চারি মণ সুবর্ণ, বহুসংখ্যক হস্তী এবং আরও নানা উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। সিকান্দর এই যুদ্ধের অন্যরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাণা চিতোর দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। কুত্‌বুদ্দীনের আবির্ভাবে, চত্বারিংশ সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই শত হস্তীসহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গুজ্‌রাট সেনা আক্রমণ করিলেন। ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিবস, সমরানল প্রজ্বলিত রহিল। অবশেষে, পরাভূত হইয়া মহারাণা দুর্গ অভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। সুলতানও চিতোর অবরোধ করিলেন। তখন কুম্ভ পেশ্‌কস্‌ প্রেরণ করিলেন।

পেশ্‌কসের বিনিময়ে শান্তি ক্রয়ের প্রয়াস না করিয়া, এখন তিনি আর করিবেনই বা কি? সম্মুখে বিজয়ী গুজরাট সেনা। মামুদও পুনরায় মান্দিসর অধিকার করিয়াছেন; এখন হয়ত এই দিকেই আসিবেন। উভয় সেনা মিলিত হইয়া চিতোর অবরোধ করিলে, কত কাল অবরুদ্ধ থাকিতে পারিবেন? সুতরাং, কুম্ভ কুত্‌বুদ্দীনের নিকট দূত

প্রেরণ করিলেন। কুত্‌বুদ্দীন সহজেই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু এবার রাণাকে একটি অঙ্গীকার করাইয়া লইতে ভুলিলেন না। রাণা অঙ্গীকার করিলেন, "তিনি আর কখনও নাগোরে কোন উৎপাত উপস্থিত করিবেন না।" সিকান্দর বলেন, এই সন্ধি-সূত্রে মামুদ ও রাণার সম্মতিক্রমে মান্দিসর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহুবিধ পরগণা মালব রাজ্যের সামিল করিয়া লইলেন। এখন দেখা যাউক, এই সন্ধির সর্ত্ত কত দিন রক্ষিত হয়।

৫

"এখন পর্য্যন্ত তিন মাস কালও অতীত হয় নাই—হনোজ্ মুদ্দত্-ই সে মাহ্ নাগুজাস্তা বুদ"—সিকান্দর বলেন, ছয় মাস,—ইহারই মধ্যে গুজরাট দরবারে সংবাদ পহুঁছিয়াছে, "রাণাকুম্ভ পঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পুনরায় নাগোর যাত্রা করিয়াছেন।" অশ্বারোহীর সংখ্যাটা কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রাণা যে স্বীয় পরিণাম বিষয়ে অন্ধ হইয়া, সন্ধি ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধন্য কুম্ভকর্ণ! জানি না, কবে তোমার চৈতন্যোদয় হইবে!—এত ভুগিয়াও তুমি নাগোরের কুঙ্গ্রা ভুলিতে পারিলে না! সংবাদ পাইয়াই কুত্‌বুদ্দীন আহম্মদাবাদ হইতে বহির্গত হইয়া মিবার অভিযানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এক মাস ভরিয়া উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ওদিকে মালবেশ্বরও মিবার আক্রমণের এই সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহেন। "তাবাকাত্-ই-আকবরীর" মালবখণ্ডে আছে, মান্দিসর অধিকারের কিছু কাল পরেই, মামুদের নিকট সংবাদ আসিতে লাগিল, সেখ মুইনুদ্দীন সঞ্জরীর সমাধিস্থান, হিন্দুস্থানে মুসলমানের পবিত্র তীর্থ আজমীর এখনও হিন্দুর হস্তগত রহিয়াছে। নিজামুদ্দীন বলেন, এই সংবাদ পাইয়াই, মামুদ আজমীর আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আমরা দেখিয়াছি, মামুদ কুত্‌বুদ্দীনের সহিত সন্ধিপত্রে স্বয়ং আজমীর অধিকার করিবেন বলিয়া একটি সর্ত্ত রাখিয়াছিলেন। সুতরাং, এই সংবাদে মামুদের পক্ষে নূতন জ্ঞাতব্য বা কর্ত্তব্য কিছুই ছিল না। আমাদের অনুমান হয়, রাণা সন্ধিভঙ্গ করিয়াছেন এবং সুলতান কুত্‌বুদ্দীনও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়াই, মামুদ আজমীর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। মামুদ কুত্‌বুদ্দীনের সহিত সন্ধি করিবার সময়, ভরসা করিয়াছিলেন, কুত্‌বুদ্দীন কুম্ভকে কমলমীর কি চিতোর গড়ে অবরুদ্ধ রাখিবেন, আর তিনি স্বয়ং অবাধে মিবারে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিবেন। কুত্‌বুদ্দীন যখন কুম্ভের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন কিছু কালের জন্য মামুদকে সেরূপ আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এখন সেই সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে। এখন মামুদের মহাসুযোগ উপস্থিত। মামুদ অবিলম্বে আজমীর যাত্রা করিলেন।

চৌহান রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী আজমীর দিল্লীর পাঠান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। টডের মতে, কুম্ভের প্রপিতামহ মহারাণা ক্ষেত্র, আজমীর মিবার রাজ্যের অন্ত-

নিবদ্ধ করেন। মামুদ অবিশ্রামগতি আজমীরে উপনীত হইলেন। অবিলম্বে নগর অবরোধের ব্যবস্থা হইল। মালব-সেনা দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিল। গজধর আজমীর সেনার অধিনায়ক ছিলেন। তিনি আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া, একদল উৎকৃষ্ট রাজপুত সেনাসহ দুর্গ বহির্গত হইয়া, স্বয়ং অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর, অবশ্যই গজধরকে দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে হইল। ইহার পরে, ক্রমে চারি দিন, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পঞ্চম দিবস, গজধর সমগ্র সেনাবল লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য রাজপুত সেনাপতি স্বয়ং নিহত হইলেন। নেতাহীন রাজপুত সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়নপর রাজপুতগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া একদল মালব সেনাও নগর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইল। তার পর আর কে রক্ষা করে? দুর্গদ্বার উন্মোচিত হইল। আজমীর মালবেশ্বরের পদানত হইল। নগরে প্রবেশ করিয়া উন্মত্ত মুসলমান সৈন্য ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। রাজপুতগণের স্তূপাকার মৃত দেহে রাজপথ সমূহ আচ্ছাদিত হইয়া গেল। বিজয়ী মামুদ পবিত্রসমাধিভূমিতে যথাবিধি অনুষ্ঠান এবং আজমীর অধিকৃত রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাঠক হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, এই দুর্দ্দিনে কুম্ভ কোথায় কি করিতেছিলেন? আজমীরের পতনের সময়, কুম্ভ কোথায় ছিলেন, নিশ্চয়রূপে বলা অসাধ্য। গুজরাটে যুদ্ধসজ্জার সংবাদ পাইয়া, তিনি নাগোর অভিযান পরিত্যাগ করিয়া, মিবারে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তৎপর কিছু দিন কুত্‌বুদ্দীনের আক্রমণের আশঙ্কায় গুজরাট সীমান্তের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইল। এই অবসরেই, সম্ভবতঃ, মামুদ আজমীর অধিকার করিয়া লইলেন। ওদিকে কুত্‌বুদ্দীনও নাগোরের দিক হইতে কুম্ভের প্রত্যাগমনের সংবাদ পাইয়া শিবির ত্যাগ করিলেন, এবং আহম্মদাবাদে যাইয়া পুনরায় ভোগবিলাসে লীন হইয়া গেলেন। এই সংবাদে কুম্ভের একটা গুরুভাবনা দূর হইল। তিনি এইক্ষণ মণ্ডলগড়ে যাইয়া মামুদের সমুচিত অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে অবকাশ পাইলেন।

মামুদ মণ্ডলগড়ে উপনীত হইয়া দুর্গ অবরোধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কুম্ভ স্বীয় সেনাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, দুর্গের বাহিরে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত সেনা তিন দিক হইতে অবরোধকারিগণের উপর আপতিত হইল। তখন ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। উভয় পক্ষের বহু যোদ্ধা নিধন প্রাপ্ত হইল। যখন সূর্য্য অস্তাচলশায়ী হইলেন, তখন উভয় পক্ষ নিজ নিজ আবাস স্থানে গমন করিল—"তরফাইন দর মকাম্-ই খোদকরার গীরফ্‌তন্দ।" পর দিন প্রত্যূষে মালবের আমীরগণ সুলতানের নিকট নিবেদন করিলেন, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে। ইহাদের কিছু দিন

বিশ্রাম করা আবশ্যক। সুতরাং, এইক্ষণ বিরাম লাভের জন্য মণ্ডু প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা হউক। সুলতানের এ প্রার্থনা মঞ্জুর না করিয়া আর উপায় কি? মালব সৈন্য মালবে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ প্রাপ্ত হইল। এবারকার জন্য রাণা মণ্ডলগড়ের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হইলেন।

৬

হিজরি ৮৬১ সালে (খৃষ্টাব্দ ১৪৫৮-১৪৫৯) উভয় সুলতান দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত পুনরায় সমরে ব্রতী হইলেন। মামুদের মহতী সেনা মণ্ডলগড় অভিমুখে যাত্রা করিল। কুত্‌বুদ্দীন আহম্মদাবাদে নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলিয়াই গতবারে মামুদের মণ্ডলগড় অবরোধ নিষ্ফল হইয়াছে। এবার কুত্‌বুদ্দীন নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। স্বতঃই হউক, অথবা অন্যের প্ররোচনাতেই হউক, এবার তিনি রাণাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। গুজরাট সেনা সিরোহীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাণাও বুঝিতে পারিলেন, সম্মুখে গণনার স্থল। তিনি স্বয়ং সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। আর কেহ তাঁহার সন্ধির প্রস্তাবে বিশ্বাস করিবে না; আর কেহ তাঁহার পেশ্‌কস্ লইয়া ক্ষান্ত হইবে না। এবার সিংহাসনের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে হইবে। মহাবীর কুম্ভ এইরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার প্রজাগণও রাণার জন্য,—স্বাধীনতার জন্য, অনেক সহিয়াছিলেন, আরও সহিতে প্রস্তুত ছিলেন। যে রাজ্যের রাজা এমন বীর এবং প্রজা এমন রাজভক্ত ও স্বদেশানুরাগী, সে রাজ্য নির্জ্জিত করে সাধ্য কার? রাণা কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। মণ্ডলগড় রক্ষার যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং ধীরভাবে কমলমীরে কুত্‌বুদ্দীনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এবার মামুদ ত্রস্তব্যস্ত নহেন। এবার যে পূর্ণমনোরথ হইবেন, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই। সুতরাং, ধীরে ধীরে মণ্ডলগড় অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের গৃহ ও অট্টালিকাদি ভস্মসাৎ, দেবমন্দির ভূমিসাৎ, শস্যাদি ধ্বংস, এবং বৃক্ষনিচয় পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিয়া, প্রলয়কালীন বাত্যার ন্যায়, দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইলেন। ইহার পর দুর্গ অবরোধ। মামুদের এই তৃতীয়বার মণ্ডলগড় অবরোধ। গত দুই বারের প্রতিশোধ লইতে হইবে। অবরোধের উপযোগী আয়োজনের কোন ত্রুটি নাই। সঙ্গে অব্যর্থ আগ্নেয়াস্ত্র "তোপ"ও আছে। প্রচণ্ড বেগে মালব সেনা দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিল। পরিখা অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের সহিত সংলগ্নভাবে মৃত্তিকা স্তূপ নির্ম্মিত হইল। সম্ভবতঃ এই সকল স্তূপের উপর আরোহণ করিয়াই অবরোধকারিগণ দুর্গে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইল। বহুসংখ্যক রাজপুত সেনা হত এবং ধৃত হইল। মণ্ডলগড় দুর্গে মালবেশ্বরের পতাকা উড্ডীন হইল। কিন্তু দুর্গ অধিকৃত হইবার পূর্ব্বেই, দুর্গবাসীরা দুর্গত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী শৈলশৃঙ্গোপরি নির্ম্মিত অপর একটি দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

মামুদ মণ্ডলগড়বাসীদিগের এই শেষোক্ত আশ্রয়-স্থানও অবরোধ করিলেন। দুর্গটি ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। উহা হস্তগত করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু মামুদের তোপ বড় বিপদ ঘটাইল। ঠিক কি প্রকারে এরূপ ঘটিল, তাহা নিজামুদ্দীন স্পষ্ট করিয়া লিখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "তোপধ্বনি নিবন্ধন—ওয়াস্তে ছদা-ইতোপ—কিল্লার উপরিভাগের জলাশয় সমূহের জল নিম্নে প্রবাহিত হইল।" আমরা ইহার কোন টীকা করিব না। ফল কথা, দুর্গ মধ্যে জলাভাব উপস্থিত হইল। জলাভাবে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়া গেল। আর অধিক কাল অবরুদ্ধ থাকা অসম্ভব হইল। দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। মামুদ এবার বিজিত শত্রুর প্রতি শিষ্টতা প্রদর্শন করিলেন। দশ লক্ষ টাকা পেশকস্ লইয়া ইহাদিগকে অবাধে যথেচ্ছ গমন করিতে অনুমতি দিলেন। এই রূপে দুর্গ এবং উপদুর্গসহ মণ্ডলগড় মামুদের করায়ত্ত হইল। মামুদ মণ্ডলগড় শাসনের জন্য কাজি, মুফ্‌তি, কোতোয়াল প্রভৃতি রাজপুরুষ নিয়োগ করিয়া চিতোর অভিযানে উদ্যত হইলেন। মণ্ডলগড় অবরোধে নাকি তাঁহার প্রায় বৎসরাবধি কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।

মামুদ যখন মণ্ডলগড় যাত্রা করেন, তখন কুত্‌বুদ্দীনও সিরোহী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদেই এ যাত্রা সিরোহীরাজ সিরোহী হইতে অন্তর্হিত হইলেন! কুত্‌বুদ্দীন সিরোহী নগর ভস্মসাৎ এবং সিরোহীরাজ্যের জনপদ নিচয় লুণ্ঠন ও দলন করিয়া, কমলমীর যাত্রা করিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন, "সুলতান মামুদ খিলজি মন্দপুর অতিক্রম করিয়া (আজ্‌রাহ্ ই মন্দপুর) চিতোরগড় আক্রমণ মনস্থ করিয়াছেন, এবং মন্দপুরের নিকটবর্ত্তী পরগণাসমূহ সমস্ত অধিকার করিয়াছেন।" প্রমাদ বশতঃ এখানে মূলে মণ্ডলগড়ের স্থলে মন্দপুর লিখিত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াই মামুদ মণ্ডলগড় অবরোধে ব্যাপৃত হইলেন। এদিকে "সুলতান কুত্‌বুদ্দীন অনন্যমনে রাণাকে কমলমীরে অবরোধ করিলেন। এইরূপ অবরোধে যখন কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল, এবং সুলতান বুঝিতে পারিলেন, কমলমীর দুর্গ অধিকার দুঃসাধ্য, তখন অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চিতোরগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং চিতোরগড়ের পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ লুণ্ঠিত ও বিদলিত করিয়া আহম্মদাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।" মামুদ মণ্ডলগড় অধিকার করিয়া চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধে তাঁহার নিজ সৈন্য হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এবং যখন শুনিলেন, চিতোর আক্রমণে গুজরাট সেনার সহায়তা পাইবেন না, সম্ভবতঃ তিনিও তখন মালব প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং আমরা মামুদের চিতোর অভিযানের উদ্যোগ বিষয়ে আর কিছুই শুনিতে পাই না।

পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে কোন ঘটনারই পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করিতে সক্ষম হই নাই। আমাদের অবল-

স্বন,—নিজামুদ্দীন কোন ঘটনারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করিতে পারেন নাই। প্রায় সকল স্থলেই তাঁহার বর্ণনা অসম্পূর্ণ এবং অসম্বদ্ধ। কিন্তু মিবারে কুতুবুদ্দীনের শেষ অভিযানের ন্যায় এরূপ অসংলগ্ন এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাণাকুম্ভের প্রসঙ্গে আর কোথাও প্রাপ্ত হই নাই। আমরা উপরে উহার অনুবাদ প্রদান করিয়াছি। আমরা অনেক স্থলেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অসঙ্গত বিবরণ কতকটা সুসঙ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান স্থলে, সে অনুমানের ভার পাঠকের উপরই অর্পণ করিব। কিন্তু নিজামুদ্দীনের একটি বাক্যে, এই অভিযানে রাজপুতসেনার সহিত সংগ্রামে কুতুবুদ্দীন্ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং সহসা এরূপ প্রত্যাবর্ত্তনের প্রকৃত কারণই বা কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। নিজামুদ্দীন লিখিয়াছেন।—

"আজ্ সিপাহীয়ান্ হর্ কসেরা দর্ ইন্ সফর্ আস্প সাকাত্ সুদাযুদ্—এই অভিযানে সিপাহিগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই অশ্ব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল।"

গুজরাটের সুলতানকে বিনা পেশকসে মিবার হইতে বিদায় করিতে সক্ষম হইয়া রাণা স্বীয় শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বর্ষ ব্যাপী সমরে মিবার রাজ্যের অশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। —বহু পরগণাসহ উত্তরে আজমীর, পূর্ব্বে মণ্ডলগড়, এবং দক্ষিণে মান্দলগড় মালবেশ্বরের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ শত্রুর উৎপতনে মিবারের প্রজাসাধারণের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। রাজকোষের ধনহানি এবং যোদ্ধাশ্রেণীতে প্রাণহানির ত কথাই নাই। এই বার রাণা বুঝিলেন, সমস্ত অপচয় এবং দুর্দ্দশার মূলে নাগোর দুর্গের তিনটি কুন্দ্রা। তিনি চিরতরে নাগোরের কুন্দ্রাত্রয় চিত্তপট হইতে মুছিয়া ফেলিলেন, এবং গুজরাট অধিপতির অভিমানের সন্তর্পণের জন্য আহম্মদাবাদ দরবারে স্বীয় ত্রুটিস্বীকার পত্রসহ একজন দূত প্রেরণ করিলেন। সুলতান মহারাণার প্রতিনিধির সমুচিত সম্মান করিলেন। গুজরাট এবং মিবারে শান্তি স্থাপিত হইল। এই শান্তি অর্দ্ধ শতাব্দীকাল অব্যাহত ছিল। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, কুম্ভের পৌত্র সংগ্রাম সিংহ হিন্দু সাম্রাজ্য সংগঠন মানসে গুজরাটের করদ রাজ্য ইন্দরে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া শান্তির প্রথম ব্যাঘাত উৎপাদন করেন। গুজরাট-মিবারে সন্ধি হওয়ার পর, মামুদ, আরও নয় বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই কাল মধ্যে, একটি বারও, তিনি স্বয়ং মিবার আক্রমণ করেন নাই। মামুদের পুত্র গীয়াসুদ্দীন একবার মাত্র কমলমীর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গ অধিকার বহুকালসাধ্য মনে করিয়া, নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন। মামুদের মৃত্যুর পর মালব রাজ্য সম্বন্ধে মিবারের পক্ষ হইতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ক্রমে বিজিত প্রদেশগুলি পুনর্জ্জিত হইল। সংগ্রাম সিংহ অর্দ্ধ মালব মিবার-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া পিতামহের কলঙ্ক অপনোদন করিলেন।

এখানেই আমরা রাণা কুম্ভের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে কুম্ভ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ইঁহাদের পরিরক্ষিত এইরূপ একদেশদর্শী এবং অপূর্ণ উপকরণের অবলম্বনে কুম্ভের চরিত্রের দোষ গুণের বিচার অসঙ্গত হইবে। আমরা দুই এক স্থলে কুম্ভের অপরিণামদর্শিতা দোষের উল্লেখ করিয়াছি। এক পক্ষের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া সেরূপ দোষারোপ কতটা সঙ্গত হইয়াছে, বলা যায় না। কিন্তু উপসংহারে একটি গুণের উল্লেখ না করিয়া পারিব না। সে গুণ কুম্ভের রণ-পাণ্ডিত্য। বর্ত্তমান যুগের সামরিক আচার্য্য নেপোলিয়ন বোনাপার্টির অভিমতে, "শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় সর্ব্বদা স্বয়ং অগ্রেই শত্রুকে আক্রমণ করা।" কুম্ভ সেনা সংখ্যার বলে কখনও তাঁহার শত্রুগণের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কিন্তু শত্রু সমীপবর্ত্তী হইলে, তিনি কদাপিও আক্রান্ত হইবার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতেন না। সর্ব্বদাই স্বয়ং আক্রমণকারী হইতেন। এবং এইরূপ আক্রমণ করিয়াই ক্রমে শত্রুর কলঙ্কর করিতেন। অথচ, এমন সাবধানে সেনা চালনা করিতেন যে, আক্রমণ করিয়া কদাপিও বিপন্ন হইতেন না।

ভারতের ইতিবৃত্তে কুম্ভের স্থান অতি উচ্চ। ভারতের দুরপনেয় কলঙ্ক এবং ভারতবাসীর অধঃপতনের মূল, ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক জাতীয়তার অভাব। রাজ-শক্তি এবং প্রজা-শক্তির পরস্পর মিলনে এবং সাহচর্য্যে যে মহাশক্তির উদ্ভব, উহারই পাশ্চাত্য নাম "নেশন।" ভারতের প্রজাপুঞ্জ রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন, এবং ভারতের রাজন্যবর্গের রাজলক্ষ্মী প্রজাশক্তিরূপ মহাসম্পদে চিরবঞ্চিতা। পাশ্চাত্য জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা এবং রাজপুরুষগণ দুর্ব্বল অথবা দুর্বৃত্ত হইলেও, প্রজা-শক্তির উপর ভর করিয়া কত শত রাজ্য স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আর ভারতের শতরাজা, শতরাজ্য, বিদেশীয়ের দ্বারা নিত্য বিজিত এবং বিদলিত হইয়াছে, অথচ জনসাধারণ কথাটিও কহে নাই। তাই বলিয়া রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতা স্বীয়বক্ষে রাজনৈতিক জাতি পরিপোষণ করেন নাই, এমন নহে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা ইতিহাস রাষ্ট্রীয় জাতিরই ইতিহাস। ভারতে এরূপ জাতির মহোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মিবার। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলজি মিবার রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। চিতোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হাম্মীর তখন পলাতক। কিন্তু আলাউদ্দীনের মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরেই, দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধিকর্ত্তৃক মিবার শাসন অসম্ভব হইয়া উঠিল। পুনরায় হাম্মীরকে আহ্বান করিতে হইল, এবং ক্রমে তাঁহাকে চিতোরের সিংহাসনখানিও ছাড়িয়া দিতে হইল। প্রজাশক্তির বলেই মিবারের উদ্ধার সাধিত হইল।*

* মিবার উদ্ধারের এইরূপ বিবরণ "আইন আকবরীতেও" প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ণেল জেরেটের অনুবাদ, ২য় ভলিউম, ২৬৯ পৃঃ।

হাম্মীরের বংশধরগণের শাসনাধীন হইয়া মিবার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে লাগিল। প্রজা-শক্তির পৃষ্ঠপোষিত হইয়া মিবারের রাজশক্তি ক্রমে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। শুভক্ষণে কুম্ভ এই শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি মালব এবং গুজরাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রতিপাদন করিলেন, এই শক্তির সম্যক পরিচালন দ্বারা কি বিরাট্ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। সংগ্রাম সিংহ, কিয়ৎকালের জন্য, মধ্যভারতে হিন্দুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, এবং প্রতাপ সিংহ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বাধীনতাধন রক্ষা করিয়া, সেই বিরাট্ কার্য্যের সাধন করিয়া গেলেন। কুম্ভের আবির্ভাব না হইলে, সংগ্রাম এবং প্রতাপের আবির্ভাব হইত কি না, সন্দেহ। তাই বলিয়াছি ইতিহাসে কুম্ভের স্থান অতি উচ্চ।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ, বি, এ।

হিন্দুজ্যোতিষ।

প্রাগৈতিহাসিক সময়ে, পর্য্যটক জাতীয়েরাই অবধারণ করেন যে, গ্রীষ্মকালে সূর্য্য, উত্তর দিকে সরিতে সরিতে, যে দিন পূর্ব্ব গগনে চক্র-বাল বৃত্তের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তর বন্দুতে উদিত হন, এবং তৎপর ক্রমে দক্ষিণ দিকে গমন করেন, তাহারই নাম দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়নে সর্ব্বশক্তিমানের নিকট প্রার্থনা ও বলি প্রদান করা হইত। অয়ন ও বিষুবৎ সংক্রান্তি দিনে, ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান পর্য্যটক জাতীয়দিগের সকল শাখাতেই প্রচলিত ছিল।

খৃষ্টাব্দের ২৪২৬ বৎসর পূর্ব্বে, মহাবিষুবৎ সংক্রান্তির সময়, সূর্য্য বৃষ রাশিতে থাকিতেন। এ জন্যই পর্য্যটক জাতীয়গণ বিশেষতঃ হিন্দু ও মিসরীয়গণ, বৃষের এত সম্মান করিয়া থাকেন।

খৃষ্টাব্দের ২৩০৫ বৎসর পূর্ব্বে, সিংহ রাশির উজ্জ্বল তারা মঘা, দক্ষিণায়ন বিন্দুর নিকটবর্ত্তী ও এক যাম্যোত্তর বৃত্তে অবস্থিত ছিল। সুতরাং, সেই সময়ে সূর্য্য মঘা নক্ষত্রে যাইয়াই দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেন। এ হেতুই মিথ্রাদেশীয় পারস্য যাজকগণ দক্ষিণায়নে সিংহচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া সিংহ নামে অভিহিত হইতেন।

ইহার ১২০ বৎসর পূর্ব্বে, দক্ষিণায়ন বিন্দু কন্যা ও সিংহের সংযোগ স্থলে ছিল। এই ঘটনা হইতেই, মিসর দেশীয় স্ফিংসের Sphinx এর উৎপত্তি। উহার মস্তক ও বক্ষঃস্থল কন্যাকৃতি এবং শরীরের অপরাংশ সিংহাকৃতি। কন্যাই অধিক পূজনীয়, কি সিংহই অধিক পূজনীয়, এই সংশয়জ্ঞাপক আকৃতিই স্ফিংস্।

অমাবস্যার পরে, চন্দ্র, এক এক কলা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ণিমা দিন সম্পূর্ণ গোলাকার

ধারণ করেন এবং তৎপর আবার এক এক কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, অমাবস্যা দিন অদৃশ্য হন। ইহা লক্ষ্য করিয়া পর্য্যটক জাতীয়েরা যে আনন্দানুভব করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। এক অমাবস্যা হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্র মাসের মান কিঞ্চিদধিক সাড়ে উনত্রিশদিন, ইহাকে স্থূলভাবে ত্রিশ দিন গণনা করিয়া রাশিচক্রে এক এক রাশির পরিমাণ স্থির করা হইয়াছে। পূর্ব্বকালে, ১২ চান্দ্র মাসে, বা ৩৬০ দিনে এক সৌরবর্ষ গণনা করা হইত। তখন মনে করা হইত যে, সূর্য্য প্রতি দিন এক এক অংশ গমন করিয়া, ৩৬০ দিনে সম্পূর্ণ রাশি চক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই ভাবে সৌরকক্ষাকে ৩০ অংশাত্মক দ্বাদশ রাশিতে ভাগ করা যে সকল দেশেই এক রূপ, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং, সকলে সমবেত ভাবে থাকা সময়ে, যে সৌরকক্ষার উক্তরূপ বিভাগ করা হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমিত। জন্তু ও অন্যান্য পার্থিব বস্তুর আকার অনুসারে দ্বাদশ রাশির আকার কল্পিত। পাশ্চাত্য সমুদয় জাতির মধ্যেই রাশিদিগের আকার একরূপ, কেবল পারস্য দেশে মিথুনের পরিবর্ত্তে ছাগ মূর্ত্তির ব্যবহার দেখা যায়। চীন দেশে ১২টি রাশিই প্রচলিত, কিন্তু তাহাদিগের আকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

ক্যাল্ডীয় নাম	হিন্দু নাম	চীনদেশীয় নাম
১ মেষ	মেষ	মূষিক
২ বৃষ	বৃষ	বৃষ বা গাভী
৩ মিথুন	মিথুন	ব্যাঘ্র
৪ কর্কট	কর্কট	শশক
৫ সিংহ	সিংহ	উরগ
৬ কন্যা	কন্যা	সর্প
৭ তুলা	তুলা	অশ্ব
৮ বৃশ্চিক	বৃশ্চিক	মেষ
৯ ধনুঃ	ধনুঃ	ধনুঃ
১০ ছাগ	মকর	কুক্কুট
১১ কুম্ভ	কুম্ভ	কুক্কুর
১২ মীন	মীন	বরাহ

পর্য্যটক জাতীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করা নিবন্ধন, রাশিদিগের আকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পিত, কিন্তু সংখ্যা সর্ব্বত্রই সমান।

রাশিদিগের আকার সম্বন্ধে উক্তরূপ প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যায় যে, পর্য্যটক জাতীয়গণ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার পূর্ব্বেই, সৌরকক্ষা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করার প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল; এবং এই সৌরকক্ষারূপ মূল ভিত্তির উপরেই, তাহাদিগের বিস্তৃত জ্যোতিঃশাস্ত্র গঠিত।

পর্য্যটক জাতীয়দিগের প্রত্যেক শাখাতে, অন্ততঃ দুই শ্রেণীর প্রাথমিক জ্যোতির্ব্বিদ্ দেখা যায়। এক শ্রেণীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ, সৌরকক্ষা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে প্রধানতঃ জন্তুর আকার আরোপ করিয়াছেন, এবং অপর শ্রেণীর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৌরকক্ষা ২৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার এক এক ভাগ, চন্দ্রের দৈনিক গতি রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রাচীন জ্যোতিষে ইহাদিগের চান্দ্রগৃহ নাম।

মিসর ও গ্রীস দেশীয় পাশ্চাত্য জ্যোতিষে সৌর-কক্ষার দ্বাদশ ভাগের প্রচলনই দেখা যায়, এবং রাশি চিহ্ন হইতেই তাহাদিগের স্বতন্ত্র দেবোপাখ্যানের সৃষ্টি। প্রাচ্য জ্যোতিষে (বিশেষতঃ ভারতীয় জ্যোতিষে) প্রথম সময়ে (আদিম কালে) রাশিভাগ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, চান্দ্র বা নাক্ষত্র ভাগেরই আদর অধিক। ইহা হইতেই চান্দ্র এবং সৌরচন্দ্র বর্ষের উৎপত্তি।

ভারতবর্ষে, সূর্য্যবংশীয় রাজগণ অযোধ্যাতে এবং চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিস্থান বা বিত্র নগরে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ সৌর-প্রণালীতে দ্বাদশ রাশিভাগ এবং চান্দ্র প্রণালীতে ২৮ নক্ষত্র ভাগ স্বতন্ত্র রূপে অবলম্বন করা হেতু তাঁহারা উল্লিখিত সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশরূপে অভিহিত।

যাঁহারা, আরও পূর্ব্বদিকে, চীনদেশে যাইয়া বসতি করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও সৌরকক্ষায় উক্ত দুই প্রণালীর ভাগই প্রচলিত। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, চীনদেশীয়দিগের মধ্যে, প্রচলিত রাশির জান্তব আকার পাশ্চাত্য জ্যোতিষোক্ত আকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ২৮ চান্দ্র গৃহের ভাগ অন্যান্য প্রাচ্য জোতিষোক্ত ভাগের ঠিক অনুরূপ।

চীনদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র পরীক্ষা করিয়া, বেণ্টলি সাহেব বলেন যে, জ্যোতিষিক জ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দু হইতে চীনদেশীয়গণ যে কেবল পশ্চাৎপদ তাহা নহে, জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কে, কতিপয় উন্নতির জন্য তাঁহারা যে হিন্দুদিগের নিকট ঋণী, তাহা নিজ মুখেও স্বীকার করেন। এই চান্দ্র বা নাক্ষত্র ভাগের সংখ্যা উভয় দেশেই ঠিক একরূপ হইলেও, প্রত্যেক নক্ষত্র ভাগের পরিমাণ হিন্দুস্থান ও চীনদেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দু মতে, প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ সৌর-কক্ষার ২৭ ভাগের এক ভাগ বা ১৩ অংশ ২০ কলা। কিন্তু চীনদেশে সকল নক্ষত্রের পরিমাণ সমান নহে। কোন কোন নক্ষত্রের মান এক এক রাশি বা ৩০ অংশ; আবার কোন কোন নক্ষত্রের মান মাত্র ২৪ কলা। বেণ্টলি সাহেব বলেন যে, চীনদেশীয়েরা তাহাদিগের নক্ষত্র ভাগ আরবীয়দিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, এই দুই জাতির নক্ষত্র ভাগ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ২৮টি নক্ষত্রের মধ্যে ১৩টি ঠিক একরূপ এবং একই নিয়মে সন্নিবিষ্ট। সুতরাং, কোন সময়ে, তাহাদিগের মধ্যে যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না। তবে কি না এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, চীনদেশীয়গণ, আরবীয়দিগের নিকট, কি আরবীয়গণ, চীনদেশীয়দিগের নিকট উক্ত নাক্ষত্রিক ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা কিরূপে স্থির করা যায়? এ সম্বন্ধে বেণ্টলি সাহেব বলেন, তিনি একজন শিক্ষিত মুসলমানকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে উক্ত মুসলমান ভদ্রলোক বলেন, উহাঁদিগের কেহ কাহারও নিকট গ্রহণ করেন নাই। উভয়েই এক স্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই উহাদিগের মধ্যে এত মিল। উক্ত স্থান পারস্য দেশের উত্তরে এবং চীনদেশের পশ্চিমে, কি উত্তর

পশ্চিমে অবস্থিত তুর্কস্থান। তিনি আরও বলেন মহম্মদের পূর্ব্বে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরবীয়দিগের বিশেষ কোন জ্ঞানই ছিল না, এবং তৎপরেও জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা গ্রীসদেশীয়দিগের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে বেণ্টলি সাহেব বলেন, কোরাণে চান্দ্র গৃহের উল্লেখ আছে; এবং গ্রীসদেশে চান্দ্রগৃহরূপ ভাগ প্রচলিত ছিল না; সুতরাং আরবীয়েরা কিরূপে নাক্ষত্রিক ভাগ গ্রীসদেশ হইতে গ্রহণ করিতে পারেন? তাহাতে মুসলমান ভদ্রলোক উত্তর করেন যে, কোরাণে চান্দ্রগৃহের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা কোন বিশেষ নাক্ষত্রিক ভাগ লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, এরূপ বুঝা যায় না। কষ্টার্ড সাহেব বলেন, আরবীয়দিগের চান্দ্রগৃহরূপ সৌরকক্ষার ২৮ ভাগ ক্যাল্‌ডীয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই সকল মতের আলোচনা করিয়া ইহাই সম্ভবপর বোধ হয় যে, চীন, হিন্দু, আরবীয় ও ক্যাল্‌ডীয়দিগের মধ্যে যে চান্দ্রগৃহ রূপ ভাগের ব্যবহার দেখা যায়, তাহা ঐ সকল জাতীয়েরা যে সময়ে মধ্য এসিয়াতে সমবেত ভাবে ছিলেন, সেই সময়ে উহা তাঁহাদিগের সাধারণ সম্পত্তি ছিল; এবং এরূপ ভাগ কেহ কাহারও নিকট প্রাপ্ত হন নাই।

আরবীয় ও চীনদেশীয়দিগের মধ্যে সৌর-কক্ষার নাক্ষত্রিক ভাগের এত সাদৃশ্য দেখিয়া যখন অনুমান করা যায় যে, চীনদেশীয়গণ নাক্ষত্রিক ভাগ আরব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আরবীয়দিগের নাক্ষত্রিক ভাগের আলোচনা ও অন্য দেশীয়দিগের সহিত উহার তুলনা করা সঙ্গত।

আলগ্‌বেগ্ নামক তাতারদিগের একজন প্রধান রাজা ছিলেন। তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যয়নে সবিশেষ রত ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন মানসে তিনি তাঁহার রাজধানী সমরখণ্ডে এক মানমন্দির প্রস্তুত করিয়া, নক্ষত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি খৃষ্টীয় ১৪৩৭ অব্দে স্থিরনক্ষত্রের যে খণ্ডা প্রচার করেন, তাহা এত বিশুদ্ধ যে, টাইকোব্রাহির খণ্ডার সহিত উহার বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। আলগবেগ্ কৃত স্থির-নক্ষত্রের খণ্ডা পারস্য ভাষা হইতে ডাক্তার হাইড্ অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে আরবীয়দিগের মঞ্জিল্ আল্‌কামার বা চান্দ্রগৃহের বিশেষ বিবরণ আছে। উক্ত অনুবাদ অনুসারে চান্দ্রগৃহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আল্‌শরতীন্। ২। আল্‌বোতীন্। ৩। আল্‌ছরৈয়া। ৪। আল্ দেবাসন্ বা দবরান্। ৫। আল্‌হেকা। ৬। আল্‌হেনাঃ। ৭। আল্‌দিরা বা জারাঃ। ৮। আল্‌নেছ্‌রা। ৯। আল্ তাবকা। ১০। আল্ জেব্‌হা। ১১। আলজুব্রা। ১২। আল্ সার্‌কা। ১৩। আল্ আওয়া। ১৪। সমাক্ আল্ আজল্। ১৫। আল্ গাক্‌রা। ১৬। আল্ জবানা। ১৭। একলিল্। ১৮। আল্ কালব। ১৯। আল্ শোলা। ২০। আল্‌নায়েম। ২১। আল্ বেলদা। ২২। আল্‌দাবি বা সাওদা জাবেহ। ২৩। আল্‌বুলা। ২৪। আল্‌সণ্ড্ বা আক্‌বিয়া। ২৫। আল্‌আচ্-

বিয়া বা সউদ্। ২৬। আল্ফর্গ—মোকদ্দম্। ২৭। আল্ফর্গ মোওখ্খর। ২৮। আল্রিষা।

মিসরদেশীয় নক্ষত্র ভাগ সম্বন্ধে বেল্টলি সাহেব বলেন যে, মিসরীয় মতে জল বিষুবদ্বিন্দু চিত্রার মধ্যস্থলে, সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা খৃষ্টীয় ২৮৪ অব্দে হওয়া, গণনা করা যাইতে পারে।

প্রাচ্য জ্যোতিষে, আরও একটি বিষয়ে, সমতা দেখা যায়। যথা ষষ্টি বৎসরাত্মক আবর্ত্ত। হিন্দু মতে উহা বেদাঙ্গ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চগুণিত বৃহস্পতির ভগন এবং এই জন্য ই উহাকে বার্হস্পত্য বর্ষ বলা যায়। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শেষে স্থির করেন যে, বৃহস্পতির এক ভগন পূর্ণ ১২ বৎসরে হয় না, উহার সূক্ষ্ম পরিমাণ ১১·৮৬০৯৬২ বৎসর। খ্যাতনামা পণ্ডিত লাপ্লাসের মতে, বৃহস্পতির ভগন ১১·৮৬২ বৎসর। ৬০ বৎসরে প্রায় সপাদ ৮ মাসের পার্থক্য হয়। এজন্য ই বার্হস্পত্য বর্ষে সময় সময় সংস্কার দেওয়ার প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, চীন দেশের ইতিহাস ও সম্রাট্‌দিগের বিবরণ ষষ্টি বৎসরাত্মক আবর্ত্তে লিখিত। ক্যাল্ডীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত ষষ্টি বৎসরাত্মক আবর্ত্তের নাম শোষস্। পারস্য ও গ্রীস দেশীয় লেখকদিগের মতে ক্যাল্ডীয়দিগের মধ্যে উক্ত ষষ্টি বৎসরাত্মক আবর্ত্ত ব্যতীত আরও কতিপয় আবর্ত্তের প্রচলন ছিল। নেরস্ নামক ৬০০ বৎসরাত্মক আবর্ত্ত এবং ৩৬০০ বৎসরাত্মক অন্য এক প্রকার আবর্ত্ত ব্যবহৃত হওয়া, দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ২৩৫ চান্দ্রমাসযুক্ত ১৯ বৎসরাত্মক আবর্ত্তের নাম সারস্। এই ১৯ বৎসর পরে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বৎসরের ঠিক, সেই সেই দিনে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়া থাকে।

প্রাচ্য সকল জাতির মধ্যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা যে, একস্থানে হইয়াছিল, তাহার সমর্থনে যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাহাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস একরূপ।
২। বারের সংখ্যা ও নাম একরূপ।
৩। সৌর-কক্ষার বিভাগ একরূপ।
৪। রাশি সকল একরূপ।
৫। বৎসরের মাস গুলি পরস্পর সদৃশ।
৬। চান্দ্র গৃহরূপ ভাগের সংখ্যা সমান।
৭। ভগোলের ব্যবহার একরূপ।
৮। শঙ্কুচ্ছায়ার ব্যবহার সাধারণ।
৯। রাশি ও অন্যান্য নক্ষত্র মণ্ডলের কল্পিত নাম একরূপ।
১০। পুরাণ শাস্ত্র বা দেবোপাখ্যান একরূপ।
১১। ষষ্টিবৎসরাত্মক আবর্ত্তের ব্যবহার সাধারণ।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে, সাদৃশ্য দেখান যায় সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতি জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে একতা বা পার্থক্য দেখা যায়, তাহার সংখ্যা ও পরিমাণ সম্পর্কে, মত ভেদ হইতে পারে এবং প্রত্যেক জাতি কোন্ সময়ে, কি ভাবে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু উপরি উক্ত সমস্ত সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, অবস্থানুসারে, ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মধ্য এসিয়াস্থিত আর্য্যজাতি রূপে যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদিগের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক জ্যোতিষের প্রাথমিক ভিত্তি সংস্থপন হইয়াছিল।

শ্রীরাজকুমার সেন এম্, এ

স্বামী না ত কি ?

দুই সখীর কথা।

নবন্যাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুভাষিণীর দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরঃ
শরণম্।

বুধবার,
৺কাশীধাম।

প্রাণাধিক সরযু,

আমার প্রাণ-সখি, আমার প্রাণ-সঙ্গিনি,—ভাই, আমি গত পরশ্ব সোমবার তোমার কাছে পত্র লিখিয়াছি। পত্রখানি দীর্ঘ হইয়াছে বটে; কিন্তু, আমার আশা মিটে নাই,—আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। অথচ, হিজি বিজি মাথা মুণ্ড কত কি লিখিয়াছি, তাহার সমস্ত কথা এখন আমার মনেও নাই। তুমি আর আমি,—আমাদিগের সেই সুখ-স্মৃতিময় ফুটন্ত শৈশবে, একে অন্যের কণ্ঠ-লগ্ন রহিয়া, কখনও চোখে চোখে, কখনও মুখে মুখে, কখনও ইঙ্গিতে-আকারে, কখনও পরিস্ফুট কণ্ঠ-স্বরে, সারা দিন কত কথাই না কহিতাম,—কত কথা লইয়া হাসিতাম, কত কথা-প্রসঙ্গে দুজনেই ভয়ে ভয়ে কাঁদিতাম, তাহা তোমার মনে আছে কি? আমার সেই শত সাধের সরী, সরু ও সরো এখন আমার প্রাণ-সখী সরযুবালা ঘোষ-মহিলা এম, এ,—ফুল্ল-বিকশিতা পদ্মিনী,—পতি-প্রেম-পূজিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দীক্ষিতা, উচ্চ-শিক্ষিতা ভারত-রমণী। আর, তুমি তোমার ঐ পটল-চেরা চোখ দুটিরে, প্রণয়-কোপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, দণ্ডে দশবার যাহাকে সুবী, সুবো এবং মড়াটা, অসুরটা ও পাগ্‌লীটা বলিয়া 'সসম্ভ্রম সম্ভাষণে' অপ্যায়িত করিতে, সেই দুঃখিনী ব্রাহ্মণ-বালিকা এই ক্ষণ তোমার হৃদয়-সখী সুভাষিণী সরস্বতী !! তুমি লিখিতেছ আমার কাছে,—আমি লিখিতেছি তোমার কাছে, এবং দুই জনে লিখালিখি করিয়া মীমাংসা করিতে যাইতেছি, পৃথ্বীব্যাপিনী রমণী জাতির শুভাশুভ অদৃষ্ট-কথা। ছি! আমাদের কি লজ্জাও নাই? আমরা কি এমন দুরবগাহ ও গুরুতর সমস্যার শেষ মীমাংসার জন্য কোন অংশেও লেখনী ধারণের যোগ্য?

আমার প্রকৃতি ত তুমি জান। আমি এখনও তোমার সেই পাগ্‌লী সুবী। আমি এখনও, এক এক সময়ে, হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে

হাসিয়া কুটপাট হই। আমি আজি যখন এই পত্রখানি লিখিবার উদ্দেশ্যে তোমার পত্রখানি আবার অতি গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতে ছিলাম, তখন প্রথম কতক ক্ষণ হাসিলাম; হাসিলাম আর কবিতা আওড়াইলাম। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তোমার সখী-পতি আমার কে? এবং মনোর সহিত তোমার কি সম্পর্ক হইল? কি আনন্দময় প্রশ্ন! আমি তোমার এই প্রশ্ন পড়িলাম, আর বঙ্গের সেই পুরাতন-কবি রঙ্গ-রস-মধুর ঈশ্বর গুপ্তের একটি পুরাতন কবিতা আবৃত্তি করিলাম। পুনঃ পুনঃই মনে মনে কহিলাম,—

"ও কথা আর ব'ল না—আর ব'ল না,
বল্‌ছ সখি কিসের ঝোঁকে?
ও বড় হাসির কথা—হাসির কথা,
হাস্‌বে লোকে—হাস্‌বে লোকে!"

কিন্তু ভাই, হাসির কবিতা পড়িলাম বটে; বহু ক্ষণ ত হাসিতে পারিলাম না। হাসির সঙ্গে হাড়-পাঁজর-ভাঙ্গা দীর্ঘ শ্বাস আসিল। মনটা কেমন এক প্রকার ভাবের আবেশে উথলিয়া উঠিল। মনের সে ঢেউ, নয়নে, অশ্রুরূপে ঝরিল। তোমার মনে যেমন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উদয় হয়, আমার মনেও সেই প্রকার দুই একটি প্রশ্নের উদয় হইল। আমিও, তোমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম,—হা বিধাতঃ! এ পৃথিবীতে রমণীর সৃষ্টি হইয়াছে কেন? রমণী, সৃষ্টির সেই প্রথম সময় হইতে, মানব-প্রকৃতি-নিহিত পাশব-লালসার দুর্ব্বার রথ-চক্র-নিষ্পেষণে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই, পশু-পাদ-দলিত কুসুমের ন্যায়, নিপীড়িত, নিগৃহীত, এবং কোথায়ও বা একবারে নিষ্পেষিত হইতেছে কেন? তুমি যেমন রমণীর নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা দেখিয়া, সময়ে সময়ে, ভগবানের বজ্র-বিদ্যুৎকে উল্কাধনের ভাষায় সম্ভাষণ কর, আমিও সেইরূপ, সময়ে সময়ে, প্রকৃতির মহা-প্রলয়-রূপিণী সর্ব্ব-গ্রাসিনী সংহার-শক্তিকে উদ্বোধন না করি, এমন নহে। কিন্তু তথাপি তোমাতে ও আমাতে একটুকু মত-ভেদের স্থল আছে। সেই স্থলটুকু কোথায়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক।

প্রথম কথা, স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য-সম্বন্ধ। যিনি, এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, অহোরাত্র এই বিশ্বের সুখ-দুঃখময়ী ক্রমোন্নতির বিধান করিতেছেন;—কৃষ্ণোক্ত যন্ত্রীর ন্যায়, এই অসংখ্য চক্র-জড়িত,—চক্রান্তর্গত-চক্র-চালিত মহাযন্ত্র চালাইতেছেন, জ্ঞানীরা তাঁহাকেও প্রকৃতি-পুরুষাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তিনি, প্রকৃত প্রস্তাবে, স্বরূপতঃ, প্রকৃতি-পুরুষাত্মক কি না, তাহা আপাততঃ জ্ঞানের অগম্য হইলেও, তাঁহার এই বিশ্ব-সৃষ্টির সমস্ত পদার্থই যে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক, সে বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আর বুঝিবার কিছু বাকী নাই। তুমি, ডুবারুর সাহায্যে, সমুদ্রের অন্তস্তলে যাইয়া, কীট-কীটাণুর জীবন পরীক্ষা কর, অথবা ব্যোম-যানের সাহায্যে, বায়ু-মণ্ডলে উড্ডীন হইয়া, উড্ডীন-মেঘ-মালার পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ পরীক্ষা কর, দেখ, সর্ব্বত্রই ভাই, ঐ এক কথা;—প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলন,—প্রকৃতি-পুরুষের পরস্পর-সম্মোহন। যেন জগন্ময়ী প্রকৃতি, মনের আনন্দে মোহিনী-সাজিয়া, এবং মনোমদ ভাবে বিভোর হইয়া, জগন্ময় পুরুষকে আদরের ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া কহিতেছেন,—"এস এস, আমার কাছে এস, আমি তোমায় সুখী করিব।" আর, যেন জগন্ময় পুরুষ, প্রকৃতির সেই প্রেম-সম্ভাষণে পুলকিত, মুখরিত এবং প্রাণের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে আলোড়িত হইয়া, গৌরবে ফুলিয়া বলিতেছেন,—"এস এস, তুমিও আমার কাছে এস, আমি তোমায় ছাড়া বাঁচি না; আমি একবার তোমাকে নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া আমার এই প্রাণ জুড়াইব।" বন ও উপবনের তরু-লতা, এবং পশু-পক্ষী ও পতঙ্গাদির ত কথাই নাই। বৈজ্ঞানিকেরা ইদানীং দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করেন যে, যে সকল পরমাণুর সম্মিলনে সোনা রূপা, তামা কাঁসা, এবং লৌহ ও প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ গঠিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাদেরও একটু একটু প্রাণ আছে;—আর সেই প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন পরমাণু-পুঞ্জ প্রকৃতি-পুরুষ-ভাবে পৃথগ্‌ভূত রহিয়া, একে অন্যকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং পরস্পরের সম্মিলনে, সংসারের এই অনন্ত সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া, সৌন্দর্য্য-ফলিত লীলার অনন্ত বৈচিত্র্য দেখাইতেছে।

ইহার দ্বারা এই একটি কথা নিঃসংশয় প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রী-পুরুষের দাম্পত্য-জীবন জগদ্-যন্ত্র-নিয়মিত অপরিহার্য্য ধর্ম্ম; এবং এই ধর্ম্মের ক্রমিক-বিকাশ ও ক্রমিক

উন্নতিতেই জগতের অনন্ত-বিধ কর্ম্ম। কারণ উহার মূলমন্ত্র প্রেম,—উহার নিত্য ক্রিয়া প্রেমের বিকাশ,—এবং উহার পরিণাম সমস্ত বিশ্বে প্রেমের বিস্তার। গভীর তমসাচ্ছন্ন লৌহ-খনিতে উহার আরম্ভ। কেন না, সেখানেও পরমাণু পরমাণুকে আকর্ষণ করিতেছে। আর, অযোধ্যার আলোকোজ্জ্বল স্বর্ণ-সিংহাসনে, অথবা মালিনীর মৃদু-কল-তরঙ্গ-ধৌত তপোবনে, কণ্বের আশ্রমে, উহার আপাত-দৃশ্য শেষ। কেন না, সেখানেও প্রাণ প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং পরস্পরের আকর্ষণে, প্রাণের সহিত প্রাণ গাঁথিয়া, আনন্দ ফলাইতেছে।

এই ক্ষণ প্রশ্ন এই, এই যুগল-ভাব অথবা যোড়া-বান্ধা জীবনই যদি জগদ্‌ব্যাপি প্রেমের প্রথম ভিত্তি অথবা প্রকট মূর্ত্তি, তাহা হইলে, সংসার অথবা সমাজের কিরূপ গঠন সেই প্রেম-ধর্ম্ম অথবা প্রেম-জীবনের অনুকূল? স্বামীরে স্বামী বলিব, না আর কোন প্রকার "ললিত-মনোরঞ্জন" ললনা-মোহন নামে সম্ভাষণ করিব, তাহাতে বিশেষ কিছু হয় না। কারণ, স্বামীর স্বামিত্ব অথবা সেই এক-প্রকার তনু-মনোব্যাপি সুখ-প্রীতিকর "সেবার আধিপত্য" শুধু একটা শব্দের সহিত গ্রথিত অথবা শব্দের দ্বারা সূচিত নহে। মানুষ যদি নয়নকে নয়ন না বলিয়া চরণ নামে নির্দ্দেশ করে, তাহা হইলে নয়নের নয়নত্ব কিছু কমে কি ভাই? মানব-জাতির মহাগুরু মহাকবি কহিয়াছেন, আর আমি মূঢ়মতি কুল-যুবতীও সেই কথারই প্রতিধ্বনিতে কহিতেছি,—

নামে কি করে ?
যেখানে যে ভাবে রাখ,
যে নাম ধরিয়া ডাক,
গোলাপ আপন গুণে সৌরভ বিতরে।

ফলতঃ, ভাই, নামের কিছু মাহাত্ম্য নাই। আর, একটা পুরাতন ও প্রচলিত নামের অর্থ লইয়া অনর্থক বিচার-বিতর্কও তোমার ও আমার শোভা পায় না,—আমাদিগের উচ্চ শিক্ষার যোগ্য হয় না। কিন্তু,যাহাকে প্রকৃতি-নিহিত পরমার্থ-প্রেম-পিপাসায়,অথবা পার্থিব-সুখের প্রয়োজক লালসায়, যেন বাধ্য হইয়া, প্রাণের পুতুল বানাইতে হইবে, তাহাকে লইয়া এই পৃথিবীর কোন্ দেশে,—কোথায়, —সমাজ-বন্ধনের কিরূপ অবস্থায়, সেই প্রেমের ধর্ম্মে একটু বেশী উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, তাহাই বিশেষরূপে বিচার্য্য। যখন প্রেমময়ের এই প্রেম-রাজ্যে, প্রেমেরই প্রবর্ত্তনায়, পরিপূর্ণ প্রেমানন্দ-লাভের জন্যই, জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, তখন একা থাকিতে পারিব না। প্রকৃতি তাহা দিবে না। একার সে আত্মতন্ত্র, আত্মতৃপ্ত, আত্ম-মাত্র-পরায়ণ শূন্য-জীবনে অধিকার পাইব না। বোধ হয়, তাদৃশ শূন্য-জীবনের শুষ্ক ও শূন্য সুখে হৃদয়-মনও কোনরূপ সুখ অনুভব করিবে না। সুতরাং, কিরূপে সেই প্রাণের শূন্যতা পরিহার করিয়া, পূর্ণতায় পঁহুছিতে পারি, তাহাই প্রধান-তম কথা।

যদি কোন রমণী, আপনাতে আপনি পরিতৃপ্ত রহিয়া, মনে মনে, এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করেন যে,—আমি প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইব না,—আমি আমার এই প্রাণের ভালবাসা হইতে, কাহাকেও একটি ফোঁটা বিলাইয়া দিব না;—আমি কাহাকেও ভালবাসিব না,—কাহারও কাছে ভালবাসা চাহিব না,—আমার এই প্রাণটা কখনও পরের প্রাণে মিশাইয়া এ জগতে প্রাণ-সম্মিলনের আনন্দ বাড়াইব না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি পাণ্ডিত্যে ও কৃতিত্বে যত বড় উচ্চ হউন না কেন, তাঁহার প্রাণটা একটা অপ্রাকৃত বস্তু! এ বিষয়ে ভাই, আমার অবশ্যই অশেষ কথা বলিবার আছে। তোমায়ও কোন দিন কিছু বলিয়াছি, এবং তাহা অদ্যাপি তোমার স্মৃতিতে লেখা রহিয়াছে। কিন্তু তোমার মত শিক্ষিত রমণীকে, তোমার বর্ত্তমান সুখের অবস্থায়, এখন আর এত কথা বলিবার প্রয়োজন কি ? তুমি আপনি যখন বিবাহ করিয়াছ,—বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছ, এবং প্রেম-ধর্ম্মের পীযূষ-স্বাদে অধিকার পাইয়াছ, তখন অবশ্যই তুমি ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছ যে, যাহারা দাম্পত্য-সম্বন্ধ অথবা প্রেমজীবনে স্বভাবতঃ বিমুখ, তাহারা প্রকৃতির বহির্ভূত,—বিশ্বনিয়ন্তার প্রেম-রাজ্যের বহিশ্চর। এস, আজি আমরা তাদৃশ অপ্রাকৃত অথবা অতি-প্রাকৃতদিগের কথা পরিত্যাগ করিয়া,প্রাকৃতদিগের কথা লইয়াই আলোচনা করি, এবং প্রাকৃত রমণী, এই পৃথিবীর কোন্ স্থানে, অপেক্ষাকৃত সুখ-সম্মানে, অবস্থান করিয়া, প্রেমের কুসুমরূপে বিকশিত হইবার জন্য অধিকতর সুবিধা পাইয়াছে, সেই প্রধান কথাটা তলাইয়া দেখি।

এ বিষয়ে পৃথিবীকে কএকটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রথম ভাগ অথবা প্রথম কল্পে, পৃথিবীর অসভ্য সমাজ। মনুষ্য, সে সকল স্থানে, পোনে ষোল আনা পশু, অত্যল্প অংশে মনুষ্য ;—গাছে না থাকিলেও, শাখা-মৃগের মত, এবং পশু-জীবনের প্রবল প্রবৃত্তি ও ভোগ-বাসনা লইয়াই সতত ব্যাপৃত। এক জন, আর এক জনের মুণ্ডপাত করিয়া, আপনি একটুকু বেশী সুখী হইবার জন্য, সর্ব্বদা চেষ্টা পাইতেছে ;—সকলেই সকলকে ঠকাইতেছে, এবং কিরূপে কে কাহাকে বেশী ঠকাইবে, অথবা উৎপীড়ন, অত্যাচার ও প্রবঞ্চনা, করিয়া আপনার সুখ-স্বার্থের ভাগ কতকটা বাড়াইয়া লইবে,তজ্জন্য বৃক, ব্যাঘ্র ও শৃগালাদির ন্যায়, শুধুই ছলনার পথ অন্বেষণ করিতেছে। উড, বুএল, রাট্‌জেল ও লবক প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ সে সকল অসভ্য-জাতির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল অবস্থাই সুপরিস্ফুটবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। রমণী, ঐরূপ অসভ্য সমাজে, কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা এক্ষণ তোমার ও আমার আলোচনার বিষয় নহে। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, রমণীও, ঐ সকল স্থলে, পুরুষেরই মত, পোনে ষোল আনা পশুভাবাপন্ন ;—সুতরাং ঐরূপ পশু-সমাজেই সুখ-সম্পন্ন। শূকরী শূকরের সংসর্গেই সুখ-তৃপ্তি লাভ করে। শৃগালী, শৃগালের সঙ্গ ছাড়িয়া, আর কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় কল্পে, চীন তাতার ও তুর্ক প্রভৃতি অর্দ্ধ-সভ্য জাতিসমূহের আবাস-ভূমি। মনুষ্য, এ সকল স্থলে, অপেক্ষাকৃত উন্নত, অতএব অর্দ্ধ-মনুষ্য ;—অর্থাৎ কিয়দংশে মনুষ্য, কিয়দংশে পশু। এ সকল জাতি বাহিরে যত কেন উন্নত বলিয়া উপলব্ধ না হউক, ইহাদিগের সমস্ত উন্নতিই পশু-বল-সাপেক্ষ। তবে এই মাত্র প্রভেদ, ইহারা পশুর নখ-দন্ত-প্রহরণের পরিবর্ত্তে, নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার করে,—ভূ-গর্ত্তে কিংবা বৃক্ষ-কোটরে বাস না করিয়া, মৃণ্ময় কিংবা ইষ্টক-নির্ম্মিত বাস্তু-গৃহে বসতি করিয়া থাকে, এবং শুধুই অপক্ক ও রুধিরাক্ত মাংস-ভোজ্যে পরিতৃপ্ত না রহিয়া, ফল-মূল-তণ্ডুলাদিরও কতকটা আস্বাদ লয়। ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, রমণী এ সকল স্থানেও উপযুক্ত সম্মান পাইতে পারে না। মর্ক্কটের গলায় মণি-মালা, এবং শূকরের সম্মুখে মতির হার, সংসারে কোথায়ও কোন দিন আদৃত হইয়াছে কি ? যে সকল অর্দ্ধ-বিকশিত বর্ব্বরেরা, কুসুম-কলির ন্যায় শিশুগুলিরেও, সময়ে সময়ে, পাদ-প্রহারে নিগৃহীত করে,—ছাগ আর মহিষকেই আপনাদিগের আদর্শজ্ঞানে উপাসনা করিয়া, অহোরাত্র লালসায় উত্তেজিত ও ক্রোধে বিচ্ছুরিত রহিতে ভালবাসে, স্বভাব-কোমলা ও সুকুমার-তনু রমণী তাহাদিগের নিকট কি আশা করিতে পারে ? তাহাদিগের মধ্যে স্বামিত্ব আর সর্ব্বগ্রাসি রাক্ষসত্ব, অথবা সর্ব্বত্রাসি অসুরত্বে প্রভেদ থাকিবে কেন ?

তৃতীয় কল্পে, সুসভ্য ইয়ুরোপ ও আমে-

রিকা। যাঁহারা এইক্ষণ সুশিক্ষিত এবং জ্ঞানের উচ্চতর-তত্ত্বে সুদীক্ষিত, তাঁহাদিগের চিত্ত ও চক্ষু উভয়ই এই দুই মহাদেশে নিবদ্ধ। বস্তুতঃ, পৃথিবীর এই দুই মহাদেশ মনুষ্যজাতিকে কত বিষয়ে যে প্রতিনিয়ত কতই কি নূতন-তত্ত্ব শিখাইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে, হৃদয় বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় আপনা হইতে অভিভূত হইয়া পড়ে। তোমার আর আমার কথা কি সই? তুমি আর আমি যাদৃক্ পণ্ডিত-জনের পদ-রজঃ-স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহি, তাদৃশ মহিমময় মহাপুরুষেরাও, ইয়ুরোপ এবং আমেরিকার নাম শুনিলে, ভক্তির সহিত মাথা নোয়াইয়া থাকেন; এবং ধন্য ইয়ুরোপ, ধন্য আমেরিকা ইত্যাদি বাক্য বলিয়া, হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তুমিও সেই ইংলণ্ড ও আমেরিকার দিকে চাহিয়াই রমণীর দাম্পত্য-সুখ-সম্মানের কথা চিন্তা করিতেছ, এবং আমিও ইয়ুরোপ ও আমেরিকার দিকে চাহিয়াই, রমণীর সামাজিক-জীবনের কথা আলোচনা করিতেছি। রমণী, পার্থিব-সভ্যতার নন্দন-কানন-স্বরূপ ইয়ুরোপ ও আমেরিকায়, সুখ-সম্মানের কিরূপ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এবং স্বামিত্ব সেখানে ঘটত্ব-পটত্বের ন্যায় কিরূপ দার্শনিক তত্ত্বে অথবা স্বাদু-শীতল রসত্বে পরিণত হইয়াছে, সেই কথাটাই আমাদিগের খুব ভাল-রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা নব-বিবাহিতা ইয়ুরোপীয় যুবতীর অবিরাম-বাহিনী আমোদ-লহরীর দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া, মুহূর্ত্তের তরেও, নবোঢ়া ভারত-বধূর মলিন মুখচ্ছবি খানি তাকাইয়া দেখিবেন, তাঁহারা, মালাবারির ন্যায় সমাজ-সংস্কারক না হইলেও, নিশ্চয়ই মনে একটু ক্লেশ পাইবেন। যাঁহারা সমাজ সংস্কারক,—সমাজ-মঙ্গলের মূল-মন্ত্র-স্বরূপ সাম্য-তত্ত্বের উপাসক, তাঁহারা, হৃদয়ের দুঃখবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, নয়ন-জলে ভাসিবেন। ইয়ুরোপীয় যুবতী, পরিণয়ের পূর্ব্বে, ভাবি-পতির নিকট, কখনও ভাবিনী, কখনও ভামিনী, কখনও ভাব-লীলার সুখ-মোহিনীর ন্যায়, এলাইত অবস্থায় উপবিষ্ট রহেন;—কখনও বা ভাবে ফুলিয়া, ভাবে ভুলিয়া, ভাবের আবেশে ঢলিয়া পড়েন; এবং সেই প্রণয়-প্রার্থী, সুখ-শিক্ষার্থী পূর্ণ-বিকশিত যুবা, পৃথিবীর ভাব-সমুদ্র হইতে বাছা বাছা রস ভাবময় দৃষ্টি, আর পৃথিবীর শব্দ-সমূহ হইতে বাছা বাছা রস-মাধুর্য্যময় শব্দ সংকলন করিয়া, রস-পিপাসু রমণীর নেত্র-কর্ণ ও হৃদয়-মন সন্তর্পণ করিতে নিবিষ্ট থাকেন। কোথায় এই রমণী-জন-স্পৃহণীয় নাটকীয় দৃশ্য, আর কোথায় নবোল্লসিত ভারত-বালিকার বিবাহের প্রাক্কালীন বিকট-বীভৎস রূপ পরীক্ষা। ভাবি-পতির গৃহ হইতে দাসী, বাঁদী, চাকরাণী ও মেথরাণী প্রভৃতি যে আসিতেছে, সেই একবারের স্থলে পাঁচবার করিয়া বালিকার রূপ দেখিতেছে,—রূপের পরখ লইতেছে,—রূপ-পরীক্ষার প্রয়োজন উল্লেখে, মাথার খোপা খুলিয়া, সেই খোপার চুল অবধি পায়ের নখ পর্য্যন্ত, শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শত প্রকারে পর্য্যুপরি পরীক্ষা

করিয়া দেখিতেছে;—এবং মনে যাহা লইতেছে, তাহাই মুখ ফুটিয়া কহিয়া দাসী-জীবনের সাধ মিটাইতেছে। যে এক সময়ে পতি-হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা, এবং পতি-গৃহের সর্ব্ব-জন-পালিনী কর্ত্রী কিংবা ঠাকুরাণী হইবে, তাহার আজিকার এ বিড়ম্বনা দর্শনে কাহার চক্ষু না আর্দ্র হয়? দাসীর উদরে দাসেরই জন্ম হয়, বীর অথবা ঠাকুরের জন্ম হয় না। বীর অথবা ঠাকুরের জন্ম হয় সম্মান-সম্পূজিতা ঠাকুরাণীর উদরে। লঙ্কার রাবণ লক্ষ বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পুত্র বীরবাহু জন্মিয়াছিল চিত্রাঙ্গদার গর্ভে। আর মেঘনাদ জন্মিয়াছিল, মন্দোদরী ঠাকুরাণীর উদরে। তাই বলিতেছি ভাই, যে হইতে যাইতেছে বহু-সম্মান-সম্ভাবিতা ঠাকুরাণী, এবং পূজাস্পদ ঠাকুর ও কর্ম্মবীরের মা-জননী, আজি চাকরাণী কিংবা মেথরাণীর কাছেও তাহাকে লাঞ্ছিত দেখিলে কাহার প্রাণ না ক্লেশিত হয়? ঠাকুরাণীকে দাসীর সমান করিয়া রাখিলে, দেশের দুর্দ্দশা কি কখনও দূর হইতে পারে? দেশ কি কখনও দৃপ্ত পুরুষের জন্মভূমি হইয়া পৃথিবীতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়?

আবার চাহিয়া দেখ। ইয়ুরোপীয় যুবতী, পরিণয়-সূত্রে গ্রথিত হইবার অব্যবহিত পর-মুহূর্ত্তেই, গাড়ীতে চাপিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, অথবা বেলুনে উড়িয়া, পতির সঙ্গে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যায়;—অথবা, পক্ষিণী যেমন এক গাছি তৃণ কিংবা একটুকু খাদ্য বস্তু ঠোঁটে করিয়া, উড়িয়া যাইয়া বট-অশ্বত্থের ঊর্দ্ধতম শাখায় বসে, সেও, সেই প্রকার, তাহার নবপরিণীত "সখের পতি ও সুখের সাথীকে" শ্বশুর শাশুড়ী এবং দেবর ও ভাসুর প্রভৃতির নিকট হইতে এক রকম কাড়িয়া লইয়া, যেন ঠোঁটে করিয়া, কোনরূপ বিলাস-নিকেতনের উচ্চতম মঞ্চে যাইয়া উপবিষ্ট হয়। আর তাহার স্থলে, নূতন-পরিণীতা ভারতীয় বালিকা, আপনার চন্দ্র-মুখ খানিরে ঘোমটায় ঢাকিয়া, ঘরের এক পাশে বসিয়া, নাগিনী-হেন ননদিনী ও স্থানবিশেষে বাঘিনী-হেন শাশুড়ীর, এবং উনুনমুখী প্রতিবেশীনীদিগের ঝামটা খাইয়া, দাম্পত্য জীবনের প্রথম স্বাদ অনুভব করিতে আরম্ভ করে। ভাই, মনুষ্যের মধ্যে কে এমন পাষাণ অথবা পশু, যে এ তুলনায় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে? রমণীর মধ্যে কে এমন হৃদয়-শূন্য, যে এই তুলনার চিত্র চক্ষে দেখিয়া চিত্তে একবারে অস্পৃষ্ট রহিতে সমর্থ হয়?

ভারতীয় দাম্পত্য-জীবনে, এ সকল ছাড়া আরও বহুবিধ দুঃসহ দুঃখ আছে। সেই দুঃখ-দুর্গতির দীর্ঘ তালিকায় দুই তিনটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক, যাহারা কুলীন অথবা কুল-কুঠার বলিয়া সমাজের ক্রোড়ে সংবর্দ্ধিত, তাহাদিগের সেই কুল-প্রথা-গত বহু-বিবাহ। আর, তোমার "বহ্নি-বর্ষি-বর্ণ-চিত্রিত শ্মশান-কাষ্ঠ-সদৃশ শুষ্ক-মূর্ত্তি সাতাত্তুরে বৃদ্ধের সহিত সাত বছরের বালিকার দুর্ব্বিবাহ। তৃতীয়, পৃথিবীর কোথাও যাহাদিগের স্থান নাই,—যাহারা পরের কাছে যাইয়া, প্রাণে সাহস বান্ধিয়া, কথাটি কহিতেও কণ্ঠ-শোষ-ক্লেশ

অনুভব করে, অথবা কদলী পত্রের মত থর থর কম্পিত রহে,—অথচ অন্তঃপুরে প্রবেশ মাত্রই, শিশুশিক্ষার সেই ভাস্বুরক সিংহের ন্যায়, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, অবলার আতঙ্ক-সম্পাদনেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, তাদৃশ অপুরুষ অথবা কাপুরুষের গল-গ্রহ হওয়া স্বরূপ গর্হিত-বিবাহ। এইরূপ বহু-বিধ কলঙ্ক-রেখা ভারতীয় দাম্পত্য-জীবনের জ্যোতিঃশীতল চন্দ্রকে এখানে সেখানে মনু-ষ্যের চক্ষে কলঙ্কিত করিয়া রাখিতেছে। কিন্তু, বিহঙ্গ যেমন, সোনার পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া, আপনার শত-কণ্টক-সমাচ্ছাদিত শান্তি-বিটপীর অন্বেষণ করে, আমিও ভাই, সেইরূপ একটুকু সুশীতল শান্তির জন্যই, ইয়ুরোপীয় সভ্যতার স্বর্ণোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া, ঋষি-তাপস-প্রবর্ত্তিত ভারতীয় দাম্পত্য-জীবনের আশ্রয় খুঁজিয়া থাকি। ইহার অবশ্যই একটুকু নিগূঢ় কারণ আছে।

রমণীর প্রকৃত সুখ কিসে? প্রকৃত সম্মান কি? আর রমণী-জীবনের সার্থকতাই বা হয় কিরূপ জীবনে? ইহা আমার বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, এ তিনটি প্রশ্নের প্রত্যু-ত্তর-সম্পর্কে, তুমি আর আমি, বাহিরে বিভিন্ন-পথ-গামিনী হইয়াও, চির-দিনই আত্মার অভ্যন্তরে এক ভূমিতে দণ্ডায়মান। তুমি জ্ঞানের প্রখর-প্রতিভায় প্রদীপ্ত-হৃদয়া হই-লেও, হৃদয়ে পবিত্রতার উপাসক; এবং আমিও ভাই, বেদ-বেদান্ত ও কাব্য-নাটকের সমুদ্র শুষিয়া, আমার সমস্ত প্রাণের সহিত পবিত্রতারই পরিপোষক। সেই যে ছোট বেলায়, তুমি আর আমি নাটকের রঙ্গে, এক জনে সাজিতাম সীতা, আর এক জনে সাজি-তাম সাবিত্রী, তাহা তোমার মনে আছে কি? আমি সীতা সাজিয়া, আমার মনঃ-কল্পিত রাবণকে, মুখ বাঁকাইয়া তাড়াইয়া দিতাম; এবং সেই মহাসতীর মত মনে মনে ব্রহ্ম-তেজের ভয়ঙ্কর বহ্নি পোষণ করিয়া, আপনাকে আপনি ক্ষণ-কাল দেবতা জ্ঞান করিতাম। আর, তুমি তোমার শৈশব-সংবর্দ্ধিত স্বভাব-সন্ধুক্ষিত অভিমানে সাবিত্রী সাজিয়া, তোমার সাধের পুতুল সত্যবানকে যমের গ্রাস হইতে কাড়িয়া রাখিতে করিতে, এবং ক্রোড়স্থ স্বামীর জীবন-রক্ষা করিয়াছ বলিয়া গৌরবে ফুলিতে, সে সুখের খেলা, সে সরস-স্ফূর্ত্তির আমোদ ভাই ভুলিয়া গিয়াছ কি? ভারতীয় ঋষিরা তাঁহাদিগের প্রাণারাধ্য ভারত-ভূমির প্রত্যেক রমণীকেই সীতা অথবা সাবিত্রী বানাইতে, এবং ভার-তের নগরে ও গ্রামে,—প্রাসাদে ও কুটীরে,—বস্তুতঃ এই পুরাণ-কীর্ত্তিত পুণ্য-ভূমির গৃহে গৃহে সীতা ও সাবিত্রীর চরিত্র-লীলাময় চিত্ত-হারি নাটক ফলাইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা, রমণী-জীবনের চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, জলদ-মধুর গম্ভীর স্বরে কহিয়াছেন—

"যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্।

"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

ইহার এই তাৎপর্য্য,—যিনি আজি স্ত্রী, তিনিই ভাবি-জীবনের জননী। কারণ, পুরুষ তাঁহাতে পুত্ররূপে পুনরায় জন্ম গ্রহণ

করিয়া থাকেন। সুতরাং, যে পর্য্যন্ত পুরুষ তদীয় জীবনার্দ্ধ-ভাগিনী জায়ারূপিণী জীবন-সঙ্গিনীর সহিত ধর্ম্মতঃ সম্মিলিত না হন, সে পর্য্যন্ত তিনি অর্দ্ধেক পুরুষ। সেই জীবন-সঙ্গিনী স্ত্রী গৃহের শ্রী-স্বরূপা। অতএব, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কোন প্রভেদ নাই।

ইহা কেমন স্বামিত্ব, কেমন স্ত্রীত্ব,—স্ত্রীর ইহাতে কি প্রকার সমুচ্চ ও সুপবিত্র সম্মান, তাহা ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি? সেই মহাপুরুষেরা মহর্ষি মনুর মুখেও উপদেশ করিয়াছেন,—

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহু-কল্যাণমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥"

অর্থাৎ,—যদি পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দে-বর প্রভৃতি পৌরজনেরা সর্ব্ব-বিষয়ে কল্যাণ কামনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা পুর-মহিলাদিগকে পূজার ভাবে সম্মান করি-বেন। যে পরিবারে, অথবা যে সমাজে, পুর-নারী প্রকৃত ভক্তির ভাবে পরিপূজিত হইয়া থাকেন, দেবতারা সেখানে প্রীতির সহিত অবস্থিত রহেন। যেখানে পুর-নারীর পূজা নাই, সেখানে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্মই এক-বারে নিষ্ফল হয়। পরন্তু, যে কুলে কুল-কা-মিনী অসম্মানের তুষানলে অন্তরে দগ্ধ হইতে থাকেন, সেই কুল অতিশীঘ্রই সমূলে উৎসন্ন যায়; আর, যে কুলে, কুল-কামিনীরা সুখ-সম্মানে প্রফুল্ল রহেন, সেই কুলও সুখ-সমৃদ্ধিতে সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যে গৃহে গৃহ-লক্ষ্মীরা, অপমানে ক্লিষ্ট হইয়া, অভিসম্পাত করেন, সে গৃহের সকলেই অভিচারগ্রস্তের ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে বিনাশ পায়।

রমণীর এই প্রকার পারিবারিক পূজা কিরূপ পবিত্র অথচ প্রীতি-স্নিগ্ধ ভক্তির দ্বারা প্রণো-দিত, তাহা যদি তোমা-হেন অসামান্য রমণীও না বোঝে, তাহা হইলে অন্যে বুঝিবে কি প্রকারে? আর রমণী যেখানে পরিজন-দিগের প্রীতিস্নেহে ও স্বামীর সাদর-প্রেম-ভক্তিতে এইরূপ পূজিত রহে, সেখানে স্বা-মীর স্বামিত্বেই বা আর দোষ ঘটে কিসে? ঋষিরা স্বামিকৃত পূজা ও প্রেম-সেবার প্রক-রণ-পদ্ধতিটা পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া যান নাই। তা তাঁহারা বুড়ো মানুষ, তাঁহা-দিগকে এতটুকু ক্ষমা করা যাইতে পারে। তাঁহারা যাহা বাকী রাখিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি লোকোত্তর পুরুষেরা, পাদ-সংবাহনাদি প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা, কার্য্যতঃ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন;—এবং সুকীর্ত্তিত ভারত-বীরদিগের মধ্যে, অনেকেই, রামের অনুকরণে, ও যেন রাজ-শক্তি-সম্পন্ন ইয়ুরোপীয় বীর-দিগের সিভাল্‌রী-ধর্ম্মের অনুসরণে, রমণীর পূজা করিয়া, ঋষি-বাক্যের সার্থকতা ও বীর-চরিত্রের উজ্জ্বল মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন। ঋষি-বাক্য ব্যাবর্ত্তিত হইলেই কবিবাক্য। যথা সেই চিরস্মরণীয় কবি-গাথা—

"None but the Brave deserve the Fair."

অর্থাৎ,—

বীর বিনে আর কার কণ্ঠ-হার
হইবে কুলের নারী।

তুমি বলিবে সে পুরাতন ভারত আর ভারত-বীরেরা এখন কোথায়? এখনকার রূপ-পরীক্ষা ও রস-রঙ্গ-শিক্ষার পদানত ভারতে এ সকল কথা তুলিয়া ফল কি? আমি বলিতেছি, ফল আছে। কেন না, পুরাতন ভারত এখনও তোমার ও আমার প্রাণের মধ্যে বিরাজিত; আর পুরুষের মহত্ত্ব ও প্রকৃত বীরত্ব জগতের সর্ব্বত্রই রমণীর স্বর্গ-সুলভ শক্তি-প্রদ প্রেমে সঞ্জীবিত। যাহা ভাল, ভগবানের রাজ্যে তাহার বিনাশ নাই। পুরাতন ভারতের মৃত-কল্প অথবা অর্দ্ধমৃত দেহ, সতীর সেই শত-পীঠ-বিচ্ছিন্ন দেহের মত, আমাদিগের সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। যদি নিঃস্বার্থ, নির্ব্বিষ ও নির্ম্মল প্রেমের মহামন্ত্র শিখিয়া থাক, তাহা হইলে উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর;—যাহারা এই পুণ্য-ভূমিতে জন্ম লাভ করিয়াও পশুজীবনে প্রীত,—পশুসেব্য সামান্য সুখে পিপাসানুরক্ত, তাহাদিগকে মানুষ বানাইতে যত্নপর হও,—হিন্দুরে হিন্দুত্বের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দাও,—কাপুরুষের কদর্য্য প্রাণে পুরুষকারের যজ্ঞীয় বহ্নি জ্বালাও,—নীচ ও নিকৃষ্টকে মহত্ত্বের নিখিল-জগদারাধ্য সুধাময় স্নিগ্ধ-মাধুরীর স্বাদ শিখাও,—যে স্বার্থ-সুখ-মুগ্ধ অল্প-প্রাণ, তাহাকে পরার্থা প্রীতির মহাপ্রাণতায় অনুপ্রাণিত কর, তাহা হইলেই রমণী আবার দেবতার যোগ্য পূজা পাইবে;—রমণীর স্বামী, সকল স্থানেই 'মনোরঞ্জন' ময়নার মত, মনের পিঞ্জরে, প্রীতির আদরে, পোষ মানিয়া, প্রেমের গীত গাইবে।

ভারতের সে সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-দর্শী সংসার-পরিরক্ষক মহাজনেরা মহর্ষি-পরাশরের মুখেও কহিয়া গিয়াছেন,—

ভোজ্যালঙ্কারবাসোভিঃপূজ্যাঃস্যুঃসর্ব্বদাস্ত্রিয়ঃ,
যথা কিঞ্চিন্ন শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃভিঃ।
আয়ুর্বিত্তং যশঃপুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাংসদা,
নশ্যন্তি তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্।
স্ত্রিয়ো যত্র তু পূজ্যন্তে সর্ব্বদা ভূষণাদিভিঃ,
পিতৃদেবমনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি।
স্ত্রিয়স্তুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাদ্রুষ্টাশ্চেদ্দুষ্টদেবতাঃ,
বর্দ্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টা নাশয়ন্ত্যপমানিতাঃ।
নাবমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতিশ্বশুরদেবরৈঃ,
পিত্রা মাত্রা চ ভ্রাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ।"

অর্থাৎ,—পুরুষেরা পুরনারীদিগকে ভোজ্য, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদিদ্বারা পূজা করিবেন, এবং যাহাতে তাঁহারা কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও মনঃক্ষোভের কারণ না পান, সে বিষয়ে সাবধান রহিবেন। পুরুষের আয়ু, বিত্ত, যশঃ ও পুত্র-সম্পদ্ স্ত্রীর প্রীতির উপর নির্ভর করে। স্ত্রী, হৃদয়ে ক্লিষ্ট হইয়া, অভিসম্পাত করিলে, নিশ্চয়ই এ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পুর-স্ত্রীরা যে বাস-ভবনে ভূষণাদিদ্বারা সম্পূজিত রহেন, পিতৃগণ, দেবগণ এবং পৃথিবীর মনুষ্যগণও সেই বাস-ভবনের প্রতি সুপ্রীত-প্রসন্ন থাকেন। পুর-স্ত্রী, প্রীতিতে পরিতুষ্ট রহিলে, প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী, আর অসম্মানিত হইয়া রুষ্ট হইলে, দুষ্ট দেবতা। কারণ, তদীয় সন্তোষে

কুলের সমৃদ্ধি, আর অপমান-জনিত অসন্তোষে কুলের নাশ। পতি, শ্বশুর ও দেবর অথবা পিতা ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ যদি সুমানুষ হন, তাহা হইলে, তাঁহারা কখনও পুর-রমণীদিগের অবমাননা করিবেন না।

উল্লিখিত জগদ্গুরু ঋষি তাপসদিগের জগন্মঙ্গল্য সংকল্প সফল হউক আর নিষ্ফল হউক,—মনুষ্য তাঁহাদিগের মনের ভাব বুঝুক, আর না বুঝুক, তাঁহারা সীতা-সাবিত্রীর সংসার-পূজ্য চরিত্র-স্বরূপ মহানাটকের মর্ম্মার্থ জ্ঞাপন করিতে কোন অংশেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু, সে নাটকের অর্থ কি? অর্থ পবিত্রতা। পৃথিবী, যে পবিত্রতার মূর্ত্তি দর্শনে, প্রাণে চমকিত হইয়া, আপনা হইতে, প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি লইয়া, সসম্ভ্রমে সম্মুখে দাঁড়ায়;—পৃথিবীর অসুর ও পিশাচ-রাক্ষসেরাও, যে পবিত্রতার সন্নিহিত হইলেই, ভয়ে জড়সড় হইয়া, ভক্তিতে মাথা নোয়ায়, সেই পবিত্রতা। যে পবিত্রতা, রূপ-লাবণ্য-বঞ্চিতা লজ্জিত-দুঃখিতা কুলবালাকেও রূপের সেই এক দিব্য কান্তিতে আবরিয়া লইয়া, রমণীর শিরোমণিরূপে প্রতিভাত করে,—এবং রাজ-পথের কাঙ্গালিনীকে রাজ-রাণীর রমণীয় বৈভবে বিভূষিত করিয়া মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে রমণীর অপার্থিব সৌন্দর্য্যের অমল আভা মুদ্রিত করিয়া রাখে, সেই পবিত্রতা। সুতরাং তোমার ও আমার উভয়েরই এই সার-সিদ্ধান্ত যে, রমণীর যে সুখ, যে সম্মান, এবং জীবনের যে অবস্থা সেই জগদ্দুর্ল্লভ পবিত্রতার অনুকূল নহে, তাহা মণিমুক্তার ন্যায় মনোহর হইলেও পূতি-পঙ্ক, এবং অমৃতের ন্যায় আপাত-হৃদয়-হারি হইলেও বিষ। এ কথাটা ঠিক নয় কি ভাই?

তবে কি ইয়ুরোপীয় ও আমেরিক সভ্যতা অপবিত্রতার পুষ্টি-বর্দ্ধক, এবং দাম্পত্য-জীবনের শান্তিনাশক? এ প্রশ্ন বড় গুরুতর,—এ প্রশ্ন বড় ভয়ঙ্কর। এ প্রশ্ন উত্থাপনের সময় সত্যই আমার হৃৎকম্প হইতে থাকে। এক দিকে সেই ইতিহাস-কীর্ত্তিত পোর্শিয়া, মেরাইয়া হেনরিএটা, ও জান রোলন, এবং আর এক দিকে সারা অষ্টিন, এলিজাবেথ ব্রাউনিং ও আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয়া রাজ্যেশ্বরী, আয়ুষ্মতী ও পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়ার মত সতী লক্ষ্মী রমণী। ইহাঁদিগের মুখের দিকে চাহিয়া, অথবা ইহাঁদিগের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, কোন্ মূঢ় পাপিষ্ঠ এমন কথা মুখে আনিবে যে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দেবতাসমুচিত পবিত্রতা ও দাম্পত্য-জীবনের প্রকৃত আদর্শে বঞ্চিত রহিয়াছে? আকাশের ঐ সূর্য্য সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃপিণ্ড বটে। কিন্তু, তাহা হইতেও অধিকতর সমুজ্জ্বল সতী-লক্ষ্মীর চারিত্রজ্যোতিঃ। যদি ইয়ুরোপ ও আমেরিকা সে জ্যোতিতে একবারে বঞ্চিত হইত, তাহা হইলে, উহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপমালা এত দিনে একটি একটি করিয়া নিবিয়া যাইত,—উহার রেলের গাড়ী ও কলের জাহাজ দম না পাইয়া বন্ধ হইত,—উহার অযুত-সূত্র-বিস্তারিত তাড়িত-তারের পৃথ্বীব্যাপি জাল ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া রহিত, এবং উহার সহস্র-বিধ-সম্পদ-শোভিত শত-সহস্র-তরবারি-পরিরক্ষিত স্বর্ণসিংহাসন,

ভূকম্প-বিলোড়িত ভগ্ন অট্টালিকার ন্যায়, চূড়্মুড়্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। তাই বলিতেছি, ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় অমল-স্বভাবা সতী নাই, দাম্পত্য-জীবনে পবিত্রতা নাই, এবং রমণীর পবিত্রতা-জনিত দেব-জীবনের প্রকৃত সম্মান নাই, এমন কথা মুখে আনাও মহাপাতক।

কিন্তু, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার স্বভাব-প্রস্ফুট সতী-লক্ষ্মী রমণীরা এক পদার্থ, এবং ইয়ুরোপের স্বভাব-দ্রোহিণী শুদ্ধি-নাশিনী সভ্যতা আর এক পদার্থ। আমেরিকা ইয়ুরোপেরই নবোদ্ভাত শাখা, অথবা একটি নবীভূত মূর্ত্তি। আমি যখনই ভাই, ইয়ুরোপীয় সভ্যতা বলিব, তখনই তুমি ইয়ুরোপ ও আমেরিকা এই উভয় দেশের সভ্যতা লক্ষ্য করিয়া লইও। সে সভ্যতা কি কোন অংশেও রমণীর সম্মান-বর্দ্ধক অথবা দাম্পত্য-সম্মানের পরিরক্ষক? এক জনের স্ত্রীকে আর এক জনে কাঁকে জড়াইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেছে, এবং বিশ্রাম-সুখ-লালসায় বিনোদ উদ্যানে লইয়া যাইতেছে। তুমি কি ইহা কোন অংশেও রমণীর সম্মান-জনক অথবা আত্মতন্ত্রতা ও আত্ম-স্বামিত্বের পরিপোষক বলিয়া মনে করিবে? যে এত দিন পর ছিল, সে যদি, প্রেমের আকর্ষণে অথবা সামাজিক নিয়মের অনুশাসনে, স্বামিত্ব লাভ করিয়া, রমণীকে, প্রকৃত সুহৃজ্জনের ন্যায়, সর্ব্ব প্রকার প্রলোভন হইতে রক্ষা করে, এবং কলুষ-কর্দ্দম-শূন্য কুসুমের মত, পবিত্রতার উচ্চ আসনে তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহার সে প্রীতিলভ্য স্বামিত্ব কি কুল-রমণীর উল্লিখিতরূপ আত্ম-স্বামিত্ব অপেক্ষা মানব-জগতের অধিকতর মঙ্গল্য নহে? অসূর্য্যম্পশ্যা এই শব্দটি, ইংরেজীতে অনুবাদিত হইলে, গালিবাচক হয়; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ইহার অর্থ বড় বেশী মর্য্যাদা-প্রকাশক ও মান-গৌরব-বোধক।

সুন্দরী যুবতীরা, সোহাগে ফুলিয়া, অর্দ্ধ-বিবসনা উন্মাদিনীর মত নৃত্যোৎসবে ঢলিয়া পড়িতেছে, এবং যার তার কণ্ঠ লগ্ন ও কর-লতা-বেষ্টিত অবস্থায় সারা রাত্রি নাচিয়া নাচিয়া, শরীরে ও মনে অবসন্ন হইতেছে। তুমি কি রমণীর এ দুর্নীত-দুর্গতিকে কোন অংশেও সমুচ্চস্বাধীনতা অথবা দাম্পত্য-সম্মানের অনুকূল মনে করিতে সাহস পাইবে?

তুমি এখানে হয় ত তোমার ঠোঁট ফুলাইয়া ও ভ্রূ বাঁকাইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে,—আমার আসল কথার কি হইল? ইয়ুরোপীয় সভ্যতার এ সকল দোষ আছে, তা জানি; কিন্তু তাহাতে আমার আসল কথার আসে যায় কি? আসে যায় অনেক, এবং আসে যায় নানা প্রকারে। আমি এখনই সে আসল কথায় আসিব,—সেই আসল কথাই অতি যত্নের সহিত তোমাকে বুঝাইয়া দিব, এবং কল্য না পারিলেও পরশ্ব তোমার কাছে এক খানি সুদীর্ঘ, 'সুললিত' সার-তত্ত্ব-সংবলিত পত্র লিখিব।

সেই যে একটি পুরাতন কবি-সূক্তি আছে, তাহা জান ত ভাই?—"বিদিতে চাপি কর্ত্তব্যং সুহৃদ্ভিরনুরাগতঃ" অর্থাৎ,—

জানা কথা প্রিয় জনে জানাইয়া রাখি,—

প্রীতির এই ত রীতি, প্রণয়ের এই নীতি,
চাখা রস প্রিয়-মুখে বার বার চাখি।

আমি লিখি আর না লিখি, তুমি আমার পত্রখানি অবশ্যই তোমার অস্বামিক মনোরঞ্জনকে আদর করিয়া দেখাইবে,—তাঁহার চক্ষে চক্ষু মিলাইয়াই ইহার দোষ গুণ পরীক্ষা করিবে, এবং যদি ইহাতে কোন স্থানে কোন প্রকার স্বাদুসুরভি সুরস পদার্থ থাকে, তাহাও বোধ হয়, তাঁহার জিহ্বায়ই চাখিতে ভাল বাসিবে। যখন না কহিলেও ইহা করিবে, তখন আমার আর কহিবার আপত্তি কি? আমি সাড়ে তিন শত মাথার কিরা দিয়া কহিতেছি, আমার পত্রখানি শ্রীল শ্রীমন্ শ্রীপদানন্দ-মনঃ-স্বামীকে একবারের স্থলে শতবার দেখাইও, এবং যাহাতে এই নিরক্ষর-মুখরা, কদক্ষর-কঠোরা, ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ হয়, সে বিষয়ে বিশেষ একটু অনুরোধ-প্রক্ষেপ করিও। আমি মূর্খ, ঐ রূপ মহাপণ্ডিতের নিকট লেখিকা রূপে সম্মুখীন হইতে হৃদয়ে কিরূপ বিচলিত হই, তাহা আমার প্রেমালস-মন্থরা মধুর-বিধুরা ধীর-গম্ভীরা বুঝিতে পাও কি? তাঁহাকে আমার অনুনয় জানাইও,—এবং প্রস্তাবিত বিষয়ে আমাকে উপযুক্ত উপদেশ-দানের জন্য আদেশ, উপদেশ, নিদেশ ও সন্দেশ করিও।—

লিখিলাম যেন তেন,
অলমতিবিস্তরেণ,—
তুমি মেন সদা রে'খ মনে,
'স্বামিত্ব' প্রেমের 'স্বত্ব'—
'মমতার' আধিপত্য,
এ মধুর মহাতত্ত্ব বুঝাই কেমনে।
তোমার চির-জীবন-সঙ্গিনী,
সখিত্ব-সুখাভিমানিনী,
সেই পাগলিনী—সুভাষিণী।

দ্বীপ-সৃষ্টি।

ধরিত্রী-দেবী সর্ব্বদা বহুরূপিণীর বেশে সজ্জিতা। তাঁহার নিভৃত-নিকেতনে নীরবে দিন দিন যত অদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহা সামান্যবুদ্ধি মানবের ধারণা ও চিন্তার অতীত। কল্য যে ভূমি আমরা অনুর্ব্বর উষর দেখিয়াছি, অদ্য তাহা শস্য-শ্যামলা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি। মরীচিকাময় প্রান্তরের অনাবরণ-বেশ দর্শনে যে স্থলে পথিকের ভীতি-সঞ্চার হইয়াছিল, সেই স্থানকে আবার তরুলতার হরিৎ-স্নিগ্ধ-জনপদে পরিণত দেখিতেছি। একদিন যে স্থানে সম্পদের সৌধ-কিরীটি বিলাস-ভবনের বিমল-বিভায় নয়ন ঝলসিত হইয়াছিল, ধ্বংস-নীতির নিয়মিত অনুবর্ত্তনে আজি সেই স্থানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; আবার তাহারই উপকরণ লইয়া আর এক স্থানে, আর

এক নূতন সাম্রাজ্যের প্রথম পত্তন হইয়াছে। যে উন্মত্ত বঙ্গ-সমুদ্রকে, উদ্দাম-তরঙ্গাভিঘাতে, সৈকত-বেলা-ভূমি বিতাড়িত করিতে দেখিয়াছি, প্রকৃতির নিয়মে, তাহাকেই আবার শান্ত শিশুর ন্যায়, ধীর গম্ভীর ভাবে, বিশ্বনিয়ন্তার অন্যতর উদ্দেশ্য সাধনে নিরত দেখিতেছি। বস্তুতঃ, জগতের দৈনন্দিন ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, ইহাই প্রতীতি হয় যে, এই বহুবিস্তৃত আসমুদ্র পৃথিবীকে ঈশ্বর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুস্থির থাকিতে দেন নাই; সর্ব্বদা তাহাকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়াছেন। যে প্রস্তাবটি অদ্য আমরা পাঠকবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাও বিধাতৃ-লীলারই এক বৈচিত্র্যময় ঘটনা; একবার দৃষ্টি করিলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

সমুদ্রের এই অনন্তবিস্তৃত নীলাম্বুরাশি দর্শন করিয়া অনেকে মুগ্ধ হন। কিন্তু সমুদ্রগর্ভস্থ অসংখ্য অদ্ভুত বস্তু দেখিলে, সমুদ্রের বিরাট্ মাহাত্ম্য অধিকতর হৃদয়ঙ্গম হয়। ঐ সকল বস্তু হইতেই দ্বীপাদির ন্যায় বিচিত্র বহুজীবলীলাময় বাস্তুর উৎপত্তি। সমুদ্র-সন্নিহিত প্রদেশে যাঁহাদিগের বাস, তাঁহারা অনায়াসে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, সমুদ্রোপকূলস্থিত স্থানগুলিও এক সময়ে সমুদ্র ছিল। কাল-মাহাত্ম্যে চড়া পড়িয়াছে, এবং ক্রমে গ্রাম, নগর ও পল্লীরূপে পরিণত হইয়াছে। হাতীয়া, সন্দ্বীপ, বাম্‌নী, মহেশখাল প্রভৃতি দ্বীপসমূহ যে নিয়মে বঙ্গ-সমুদ্র-বক্ষে জাগিয়া উঠিয়াছে, সমুদ্র-সন্নিহিত আকেয়াব, কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান গুলিও সেই একই নিয়মে সমুদ্ভূত হইয়াছে। সমুদ্রগর্ভ হইতে কিরূপে বিবিধ দ্বীপোৎপত্তি হয়, এস্থলে তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

দ্বীপ-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কর্দ্দম এবং জল-প্রবাহ। কখন কখন ভূমিকম্পও ইহার অন্যতম কারণ হইয়া থাকে। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে, ভারতে যে একবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সমুদ্র সমীপবর্ত্তী কচ্ছ প্রদেশের এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড, দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল, বিস্তারে ১৬ মাইল এবং ঊর্দ্ধে ১০ ফিট পরিমাণে পর্ব্বতাকারে উত্থিত হইয়াছিল। লোকে ইহাকে আল্লাবন্ধ (The mount of God) বলিত। সম্প্রতি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী মুখে যে একটি বৃহৎ চড়া পড়িয়া, সমুদ্রযাত্রি-নাবিকদিগের বিশেষ বিঘ্ন জন্মাইতেছে, তাহাও গত ভূমিকম্পের ফল। আবার দ্বীপান্তরিত অভাগাদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যে নির্ব্বাসন-স্থান,—আন্দামান দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার অনতিদূরস্থিত "বেরণ দ্বীপ" সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম-সময়ে উদ্ভূত হইয়াছিল। আগ্নেয় গিরির সঙ্গে দ্বীপোৎপত্তির নৈকট্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা অগ্রে তৎসম্বন্ধে একটু বলিবার চেষ্টা করিব।

পাঠকবৃন্দের মধ্যে আগ্নেয় গিরির নাম, বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহার অভ্যন্তরে অগ্নি, ভস্ম, ধূম প্রভৃতি থাকে বলিয়া ইহার নাম আগ্নেয় গিরি।

এই দহ্যমান পদার্থগুলি প্রতিনিয়ত পৃথিবী গর্ভে নিহিত রহিয়াছে; ঐ সকল পদার্থ, প্রকৃতির প্রয়োজন মতে, সময় সময়, ভীষণরবে উদ্গিরিত হইয়া থাকে। অগ্নিদেবতা Vulcan হইতে আগ্নেয়গিরির ইংরেজী নাম Volcanoes হইয়াছে। আদিম অগ্নি উপাসক রোমাণেরা এই সমস্ত পর্ব্বতকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন। এইরূপ পর্ব্বতগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—এক প্রস্তরময়, দ্বিতীয় মৃন্ময়। যাঁহাদের বাসস্থান পর্ব্বতোপরি তাঁহারা সহজে ইহা অনুভব করিতে পারেন যে, সমতল ভূমির তুলনায় শিখরদেশ অপেক্ষাকৃত শীতল। আবার যাঁহারা কখনও ভূগর্ভে নামিয়াছেন, তাঁহারাও ইহা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগ অপেক্ষা তলদেশ অসহনীয় উষ্ণতাপূর্ণ। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, ভূগর্ভের তিন মাইল নিম্নে এরূপ একটি স্তর আছে, যে স্থানে কখনও অগ্নির বিরাম হয় না, জল সর্ব্বক্ষণ ফুটিতে থাকে। পৃথিবীকে এই অনলদাহ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, একটি বৃহৎ আস্তরণ ঐ অগ্নিস্তরটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ভৌতিক পদার্থের বিমিশ্রণে, যখন অগ্নিশিখা অধিকতররূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তখন উহা উপরের আবরণ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিবার চেষ্টা করে;—এবং যে স্থানের আস্তরণ যমাট বাঁধে নাই, বা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, সেই স্থান ভেদ করিয়া উহা প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, ধাতু (*) প্রভৃতি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। এইরূপ পর্ব্বতের স্থিতি-স্থান শুদ্ধ পৃথিবীর উপরিভাগে নহে। জলধি-হৃদয়েও অনেক আছে। যখন এই সমস্ত পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাত আরব্ধ হয়, তখন বাড়বানল সমুত্থিত হইয়া সমুদ্রের উপরিভাগকে তরঙ্গায়িত করে। জলযানগুলিকে সেই সময় সত্বর নিরাপদ স্থানে লইয়া না গেলে, নূতনোত্থিত চড়াতে ঠেকিয়া শীঘ্র বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

যে সমস্ত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আগ্নেয়গিরির দেহ রচিত হইয়াছে, ইংরেজীতে ঐ সকলকে Granite বলে। সমুদ্রের উপরিভাগে বায়ু সঞ্চালিত হইলে ঊর্ম্মিসঙ্কুল হয়। কিন্তু তলদেশ নির্ব্বাত সরসীর ন্যায় স্থির, শান্ত ও নিস্তরঙ্গ থাকে (*)। কেবল একটি আভ্যন্তরিক স্রোত ধীরে ধীরে, মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত বিক্ষিপ্ত পদার্থগুলিকে এক এক স্থানে অনুচ্চ স্তূপাকারে সঞ্চিত করিয়া রাখে। যে স্থানে একবার এরূপ পদার্থ সংগৃহীত হইয়াছে, সহজে উহারা সে স্থানচ্যুত হয় না; ক্রমে স্তরের উপর স্তর বয়নদ্বারা দ্বীপপুঞ্জের ভিত্তি সংস্থাপন করে।

মৃণ্ময় পর্ব্বতে প্রস্তরের ভাগ অতি সামান্য। মৃত্তিকা ও বালুকার অংশই অধিক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে উপকরণ দ্বারা সমুদ্রবক্ষে চড়াভূমি ও দ্বীপাবলীর সৃষ্টি হয়, সমুদ্র-উপকূলস্থ সৈকত-ভূমিও তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে

(*) Melted matter.

(*) সমুদ্রের ৫০০ ফিট নীচে তরঙ্গ থাকে না।

বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত দ্বীপ ও পর্ব্বত রচিত হইতে সমুদ্রোদক, কর্দ্দম, বালুকারাশি ও উপলখণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন। প্রাবৃটের কূলপ্লাবনী বন্যায় যখন গ্রাম, পল্লী, নগর প্রভৃতি ভাসিয়া যায়, তখন নদীর স্রোত-বেগ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। এই স্রোত নিকটস্থ শৈলগাত্রকে বিধৌত করিয়া সমুদ্রবক্ষে পলল (Argillacious) প্রক্ষেপ করে। এবং ইহা দ্বারা চড়া ভূমি ও দ্বীপাবলী ক্রমে পুষ্টি লাভ করিয়া স্ফীত বক্ষে জলের উপর ভাসিয়া উঠে। কিন্তু সন্নিহিত স্থান ও পর্ব্বতগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণকলেবর হইয়া অস্তিত্ব হারাইতে আরম্ভ করে। এই নিমিত্ত সমুদ্রের অনেক স্থল দ্বীপে এবং দ্বীপের অনেক অংশ সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে।

সমুদ্রের যে স্থল বহুবিস্তৃত, সেই স্থান সাধারণতঃ অতিশয় গভীর। এই নিমিত্ত সেই সেই স্থানের স্রোত-বেগও মৃদু এবং মন্থরগামী। অনেকে বলিয়া থাকেন, সমুদ্রে কখনও জোয়ার ভাঁটা হয় না। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম-বিশ্বাস। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, জোয়ার ও ভাঁটার সময়, সমুদ্রেও জলের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা না থাকিলে নদীতে জোয়ার ভাঁটা হইবার সম্ভাবনা কোথায়? সমুদ্রের বিচিত্র কার্য্যগুলি যদি কেহ একবার বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে ইহাও তাঁহার অনুভূত হইবে যে, সমুদ্রে অবিরত তিনটি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। একটি জোয়ার ভাঁটাজনিত, আর একটি আবর্ত্তনশীল পঞ্চতরঙ্গজাত, এবং তৃতীয়টি নদ্যম্বু-সমুৎপন্ন। এই তিনটি কারণেও সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয় গিরির সাহায্যে, ত্রিস্রোতের সঙ্গম-স্থলে সাধারণতঃ দ্বীপাবলীর বা চড়া ভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ষার বারি ধারাও ইহার অন্যতম কারণ। প্রবাহের সংযোগ-স্থলে নির্ব্বাত সময়েও উগ্র মূর্ত্তিতে বীচিমালা খেলিতে থাকে। এবং সেই স্থান চড়া পড়াতে উন্নত হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে আঘাত লাগিয়া জল-কল্লোল উত্থিত হইয়া থাকে। বঙ্গসমুদ্রের যে স্থান দিয়া পূর্ব্বে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানগুলি অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত, এখন আর তাহা পারে না। সে স্থান চড়া পড়া হেতু এত উন্নত হইয়াছে যে, এখন সে স্থানে একখানা সামান্য তরণী পর্য্যন্ত চড়ায় ঠেকিয়া মারা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ষার জল-প্রবাহ যেরূপ পর্ব্বত-দেহ বিধৌত করিয়া সমুদ্রে পলল প্রক্ষেপ করে, সেইরূপ স্রোত-বেগে নানা স্থান ভগ্ন হইয়াও পর্ব্বত-প্রবাহিণী নদী-বক্ষে নিপতিত হয়। তখন নদীর খরতর স্রোত সে সময় মৃত্তিকা, কর্দ্দম প্রভৃতি লইয়া যাইয়া পঞ্চতরঙ্গ (*) মধ্যে নিক্ষেপ করে। এবং ভাঁটার সময় স্রোত-বেগে সেই সমস্ত পদার্থ সমুদ্রের বহু দূরে নীত হয়। মৃত্তিকা গুরু পদার্থ অধিকক্ষণ জলের সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে পারে না; স্বাভাবিক গুণ-গুরুত্বহেতু নিম্নে পড়িয়া যায়। এইরূপে স্তরের উপর স্তর-সঞ্চারে দুই চারি বর্ষার মধ্যে, সেই স্থল উন্নত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে।

(*) এদেশে ইহাকে পাঁচগরিয়া বলে।

এই লবণাক্ত চড়াভূমি বা দ্বীপগুলি কিরূপে জীবজন্তুর বাসোপযোগী হয়, তাহা দর্শন করিলে, বিস্ময়-রসে আপ্লুত হইতে হয়। নবপ্রসূত চড়াভূমি যখন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া জল হইতে মস্তকোত্তোলন করে, তখন কোথা হইতে অসংখ্য কুলীরক আসিয়া সেই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। * এই ক্ষুদ্র জীব-শরীরকে ঈশ্বর অতি সুন্দর সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। পৃষ্ঠদেশ কারুকার্য্যময় বিচিত্র আবরণে আবৃত; দুই পার্শ্বে দুই ক্ষুদ্র কৃষ্ণ রেখা। সর্ব্বাঙ্গ ঘোর লোহিতবর্ণে রঞ্জিত। যখন, অগণিত সংখ্যায় কুলীরকেরা, উদিত ভাস্করের স্বর্ণ-রশ্মি অঙ্গে মাখিয়া, নবজাত চড়াভূমিতে তাহাদের ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে, তখন দেখিলে স্রষ্টার বিশ্বব্যাপক শক্তি মনে পড়ে। ভগবান্ এই ক্ষুদ্র জীব-শরীর কি মহাশক্তি দিয়াই গঠন করিয়াছেন! ভাটার সময় জল যতই সৈকত-ভূমি হইতে সরিয়া পড়ে, ততই ইহাদের কার্য্যের বিস্তৃতি ঘটে, ততই ইহারা অবিশ্রান্ত ভাবে সেই আর্দ্রভূমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করিতে আরম্ভ করে। সমুদ্র-সন্নিহিত স্থানে এরূপ গর্ত্তের নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্দ্বারা অন্তঃসলিলা চড়াভূমিকে বিশুষ্ক করিয়া শীঘ্র মনুষ্যাবাসের উপযোগী করিয়া তোলে।

কাঁকড়াগুলিও মূষিকের ন্যায় বালুকা রাশিকে গর্ত্তমুখের চারি দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তীব্র উত্তাপে যখন উহা শুষ্ক হইয়া যায়, তখন বায়ু-হিল্লোলে উড়িতে উড়িতে এক এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া পড়ে। একবারে যেখানে বালুকা সঞ্চিত হইয়াছে, পরস্পরের আধিভৌতিক সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বালুকা আসিয়া সেই স্থানেই পতিত হয়। এইরূপ পতন দ্বারা শীঘ্র সেই স্থান (Sand-Dail) আরও উচ্চ হইয়া উঠে। কিন্তু লবণ-জল-সিক্ত ভূমিখণ্ডে প্রথমতঃ কোন তরুলতাই জন্মে না। সত্বর উহাকে শস্য-প্রসূ করিবার নিমিত্ত প্রকৃতি উহার উপর পাঁকের প্রলেপ নিক্ষেপ করেন; তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। বিধাতার এই নূতন রাজ্য পাছে সমুদ্রাক্রমণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এই ভয় অপনোদনার্থ লতাগুল্ম * বাহু বিস্তার করিয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া রাখে। গ্রীষ্ম, বর্ষার আতিশয্য সহ্য করিয়া ভূমি ক্রমে ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিলে, নুনা নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ জন্মে।

* এই জাতীয় কাঁকড়াগুলি কখনও লবণ-জল ভিন্ন থাকিতে পারে না। একবার আমরা সমুদ্র-তট হইতে কতকগুলিকে আনিয়া এক তড়াগ মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু সমুদ্রোদক ভিন্ন কোন মতেই ইহারা বাঁচিতে পারিল না। কএক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্তগুলি মরিয়া গেল।

* Marine creeper.

ইহারা মূল দ্বারা ভূমির লবণাংশ শোষণ করে বলিয়া নুনা (Salt-sucker) নামে অভিহিত হইয়াছে। লোকেরা পূর্ব্বে নুনা গাছগুলির কাষ্ঠ জ্বালাইয়া লবণ প্রস্তুত করিত; এখন তাহা পারে না। এইরূপ শোষণ-প্রণালী দ্বারা যখন ভূমির লবণাংশ একবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন উড়ি নামে এক প্রকার ঘাস জন্মে; তাহা পায়ে সূচী-বিদ্ধ-বেদনা উৎপাদন করে। ইহার পরই আবাদের আরম্ভ। নূতন পয়স্থী জমির অত্যধিক উর্ব্বর-শক্তি দেখিয়া লোকেরা প্রথমতঃ খামার বাটি (Temporary Shed) প্রস্তুত করিয়া কৃষি কার্য্য আরম্ভ করে; তাহার পর ক্রমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

মা—না মহাশক্তি ?

অমাবস্যার রাত্রি। রাত্রির প্রায় একার্দ্ধ অতীত হইয়াছে। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। উত্তরে—দক্ষিণে, পূর্ব্বে—পশ্চিমে, ঘোর গভীর অন্ধকার। মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, এবং সেই বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, যেন প্রকৃতির সংহার-শক্তিতে, শোঁ শোঁ শব্দে, তুফান বহিতেছে। মাঝে মাঝে, কবি-কল্পিত প্রলয়-শিঙ্গার প্রাণাতঙ্ক গর্জ্জনের মত, কেমন একটা ভয়াবহ শব্দ হইতেছে। মানুষ কি এমন সময়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে ?

যে নিদ্রিত ছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া শয্যার উপরেই এখন বসিয়া আছে; এবং বাস্ত-গৃহে, ক্ষণে ক্ষণে, ভূকম্পনের ন্যায়, কেমন একটা কম্পনের ভাব অনুভব করিয়া, ভয়ে একবারে জড়ীভূত হইতেছে। যাহারা, তখন পর্য্যন্তও, নিজ নিজ দেহ-প্রাণ নিদ্রার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া, সে রাত্রির জন্য কর্ম্মজগতের নিকট বিদায় লয় নাই, তাহারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, এবং এক এক বার গৃহের রুদ্ধ দ্বারগুলিকে অধিকতর অবরুদ্ধ করিবার জন্য, আতঙ্কের অন্ধপ্রেরণায়, অকারণ প্রয়াস পাইতেছে। তাই, হৃদয়ে ঐ জিজ্ঞাসা আবার উপস্থিত হইতেছে,—আকস্মিক নৈশ-ঝটিকার এইরূপ গ্রাম-নগর-বন-ব্যাপি উন্মত্ত বিলোড়নের সময় কি মনুষ্য নির্ভয়ে নিদ্রা-সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়?

যাহার প্রাণ, জানিয়া অথবা না জানিয়া, আর একটা বৃহত্তর প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রহে, এইরূপ সৃষ্টি-বিনাশি খণ্ডপ্রলয়ের সময়েও, সে অনায়াসে প্রশান্ত নিদ্রা অনুভব করিয়া থাকে। প্রমাণ—মায়ের কোলে শিশু। কিবা প্রাসাদে, কিবা পর্ণকুটীরে, মাতৃক্রোড়স্থ শিশু সকল স্থানেই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়। প্রাসাদের কথা কহিব না। কারণ প্রকৃত মাতৃত্ব,—মানব-জাতির চির-পূজ্য প্রকৃত মাতৃভাব, প্রাসাদের প্রভুত্ব-সংগ্রাম

প্রমোদ-লালসার মধ্যে, সকল সময়ে, ফুটিবার অবকাশ পায় না। কিন্তু পর্ণকুটীরে উহা প্রায় সকল স্থলে ও সকল সময়েই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে, ও পূর্ণ সম্পদে বিকশিত হয়। অতএব এখানে এইক্ষণ পর্ণকুটীরেরই কথা কহিব।

গ্রামের প্রান্তভাগে পর্ণকুটীর। দুঃখিনী বিধবা, সে পর্ণকুটীরে, আপনার দুধের শিশুটিকে বুকে আবরিয়া, একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তৃণ-শয্যায় শুইয়া আছে, এবং শিশু যেন কোন মতে ক্লেশ না পায়, সেই জন্য, আপনার ক্লিষ্ট তনু দ্বারা শিশুর সুকুমার তনুখানি ঢাকিয়া রাখিতেছে। শিশু এক এক বার বজ্রের কড়-মড় শব্দে ও বায়ুর হুহুঙ্কার গর্জ্জনে ভয়ে চমকিত হইয়া, অর্দ্ধস্ফুট শব্দে ডাকিতেছে—মা; মা অমনিই, তাহার বুকের ধনকে যেন বুকের মধ্যে আরও টানিয়া লইয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া, আশ্বাসিত করিয়া কহিতেছে—এই ত আমি। মাতৃস্নেহের এইরূপ মধুর-মনঃশীতল সুকোমল অভয়-স্পর্শের পর শিশু আর ভয় করিবে কেন ?—শিশুর আর ভয় থাকিবে কিসে ?

জ্ঞান-বৃদ্ধ মনুষ্যও এই সংসারে কতকটা ঐ শিশুরই মত নয় কি ?

শিশুরই মত সে জাগিয়া নিশীতে,
শিশুরই মত সে কাঁদে ভীত-চিতে,
কাঁদিয়া আকুল আলোক পাইতে,
কণ্ঠ-স্বরে শুধু করুণ-ক্রন্দন। *

শিশু যেমন মায়ের ক্রোড়ে নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়, মনুষ্য কি এই নিখিল জগতের কোন স্থানেও, করুণা ও স্নেহের তাদৃশ আশ্রয় লাভ করিয়া, সেইরূপ নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইতে পারে ? সংসার যখন অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়,—সাংসারিক দুঃখ চারি দিকে ঝটিকার ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে;—পর-দ্রোহী প্রতারকের বিষাক্ত-লোভ-জনিত বিকার, বিদ্বেষ ও বিশ্বাস-ঘাতকতা বজ্রের ন্যায় বিকট শব্দে হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মায়;—এবং কঠোর-মূর্ত্তি বিপত্তি, উহার করাল জিহ্বা প্রসারণ করিয়া, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তিকে, রাক্ষসীর মত, একই গ্রাসে উদরস্থ করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, মনুষ্য কি তখন এই অনন্ত-বিস্তারিত অচিন্ত্য জগতের কোন স্থানেও, মাতৃক্রোড়ের ন্যায় একটুকু স্থান লাভ করিয়া, প্রাণে আশ্বস্ত হইতে পারে ? দুধের শিশু, যেমন ভয় পাইয়া মা বলিয়া ডাকে, দীপ্তবুদ্ধি মনুষ্যও কি সেইরূপ ভয়-ব্যাকুলতার সময়ে, কাহাকেও আত্মার অন্ধবিশ্বাসে মা বলিয়া ডাকিয়া, প্রাণে শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ?

এই প্রশ্ন শুধু আমার নহে ও তোমার নহে। ইহা সমগ্র মানবজাতির দুঃখ-নিপীড়িত সমবেত-হৃদয়ের অন্তস্তল-সমুত্থিত অবশ্যম্ভাবি

* মহাকবির মূল লেখায় তিনটি মাত্র উক্তি; আমরা প্রসঙ্গ-সঙ্গতি ও অর্থ-প্রতীতির অনুরোধে, অনুবাদে, সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া, একটি পংক্তি বাড়াইয়াছি। মূলে এইরূপ,—

An infant crying in the night,
An infant crying for the light;
And with no language but a cry.

প্রশ্ন। মনুষ্য, জ্ঞানের উন্মেষ-সময় হইতে, ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া, বাহু তুলিয়া, আর্ত্তনাদের আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে, ঊর্দ্ধস্থিত ঐ অনন্ত-শূন্যকে এই প্রশ্ন করিয়াছে; এবং তাহার ভয়ার্ত্ত ও তৃষার্ত্ত প্রাণ, যত কাল না শান্তি পায়, তত কালই ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া এই রূপ প্রশ্ন করিবে। এই প্রশ্নের কি কোন উত্তর নাই? মনুষ্য কি চিরকালই নিরাশ-হৃদয়ে এই ভাবে কাঁদিতে থাকিবে, এবং এই অনন্তজগতে কেহই কি তাহার সে করুণ ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবে না?

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে মনুষ্য যখন ভূগর্ত্তে কিংবা বৃক্ষকোটরে বাস করিয়াছে, এবং একে অন্যের বুকের রক্ত শুষিয়া খাইয়া, অসুরের ন্যায় অট্টহাস্যে সেই এক প্রকার আনন্দে উদ্‌ভ্রান্ত রহিয়াছে, ভক্তি-তত্ত্বের জন্ম-স্থান-রূপিণী পুণ্যময়ী ভারত-ভূমি, সেই সময়েও, মনুষ্যজাতিকে, মনস্বি-ভক্তদিগের মধুর-গম্ভীর পবিত্র-কণ্ঠে, উপদেশ করিয়াছেন,—

"মনুষ্য ভয় করিও না, যিনি এই জগৎ লইয়া জগন্ময়ী, জগতে আনন্দ বিলাইবার জন্য চিরকাল চিদানন্দ-রূপিণী, সেই "সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্যা,"—"সর্ব্বার্থ-সাধিকা,—"শরণা-গত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা,"—সর্ব্বভূতস্থিতা জগন্মাতা অভয়াই তোমার মা। তুমি মাতৃ-হীনের ন্যায় বিলাপ করিয়া বিষাদে ডুবিও না। তুমি বিশ্বাসে অটল হও, এবং মায়ের শ্রীপাদপদ্মে, অথবা স্নেহময়-ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাও।"

মহা-যোগ-মগ্ন ভক্তি-বৈভব-সম্পন্ন তাত্ত্বিক-দিগের উল্লিখিত মহাবাক্য অবশ্যই মনুষ্যের প্রাণে শান্তি দান করিতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞান উহা মানিয়া লইবে কেন? যাহা চক্ষু কর্ণ ও চর্ম্ম-প্রভৃতি ইন্দ্রি-য়ের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, বিজ্ঞানের নিকট শুধু তাহাই সত্য, এবং অন্য সমস্তই অলীক, অমূ-লক, অন্তঃসার-শূন্য ও অসত্য। তুমি তোমার তৃষ্ণাকুল তাপিত প্রাণে শান্তি পাও আর না পাও,—তুমি ধূলায় লুটাইয়া ক্রন্দন কর, অথবা হৃদয়ের আবেগে ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া আর্ত্ত-নাদ করিতে থাক, বিজ্ঞান তোমার মনঃ-কল্পিত বস্তুকে মঙ্গলাত্মিকা মাতা বলিয়া পূজা করিতে যাইবে কি জন্য?

ইহা পৃথিবীর বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, মনুষ্য-জাতির অনেকে, যে বিজ্ঞানকে, এত দিন অপদেবতার কর-ধৃত কৃত্রিম-দীপিকা (Will-o-the wisp or Ignis fatuous) জ্ঞানে, ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলিত, এবং যে বিজ্ঞানের নাম শুনিলেই ভীত-ত্রস্তবৎ শিহ-রিয়া উঠিত, আজি সেই বিজ্ঞানই ভক্তি-ধর্ম্মের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপদেশক; এবং যাঁহারা প্রকৃত সাধকের ন্যায়, সত্যের অন্বেষণ করিয়া মনুষ্যজাতিকে ধীরে ধীরে, সোপানের পর সোপানের উপরে, প্রকৃত উন্নতির দিকে টানিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অদ্য জগন্ময়ী মহাশক্তির মন্ত্রদীক্ষিত উপাসক। বিজ্ঞান-গুরু হর্ব্বার্ট স্পেন্সার অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই চরম-বার্দ্ধক্যে সমগ্র মানব-জাতিকে সম্ভাষণ করিয়া, যে আপনার সাক্ষ্য-দানের উদ্দেশেই উপদেশ

করিয়াছেন যে,—"যিনি এই জগতের আদি-কারণ-রূপা, তিনি অনন্তা ও অনাদ্যা শক্তি;—তাঁহা হইতেই এই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে,—বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থিত রহি-য়াছে, এবং আমরা সকল সময়ই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছি।" *

সে মহাশক্তি বজ্র-বিদ্যুতের ন্যায় অচে-তন, না মনুষ্যের মন ও বুদ্ধির ন্যায় সচেতন? স্পেন্সার এ সম্পর্কে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন যে, সেই জগজ্জীবন-রূপিণী অনাদ্যা শক্তি, মনোবুদ্ধির অগম্যা হইলেও, হৃদয়, মন ও বুদ্ধি বৃত্তির প্রস্রবণ-স্বরূপা। সংসার যখন অজ্ঞান ও অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখনকার প্রাথমিক মনুষ্য সেই শক্তিরই অন্বেষণ করি-য়াছে; এবং মনুষ্য, এখনকার জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে দাঁড়াইয়াও, তাঁহারই অন্বেষণ করি-তেছে। সেই যুগ-যুগান্তর-ব্যাপি অন্বেষণের ইহাই সার-সিদ্ধান্ত যে, যে শক্তি বহিঃস্থ জড়-জগতের সমস্ত কার্য্যে সতত প্রকাশিত, সেই শক্তিই আমাদিগের অন্তঃস্থ জগতে,—আমা-দিগের অন্তরাত্মায় † চৈতন্যরূপে উচ্ছলিত।—ইহার এই তাৎপর্য্য,—প্রস্ফুট কুসুমে তাঁহা-রই হাসি,—পর্ব্বতের কঠিন-দেহে তাঁহারই সামর্থ্য, সরোবরের স্বচ্ছ-শান্ত সুরম্য সলিলে অথবা সমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্কুল বিশাল বক্ষে, তাঁহা-রই বিভিন্ন শোভা, এবং সংসারের সর্ব্বত্র—অর্থাৎ চেতন অচেতন ও অর্দ্ধ-চেতন সমস্ত পদার্থের সর্ব্বপ্রকার বিকাশ ও ক্রিয়াতেই তাঁহার ক্রীড়া ও তাঁহার লীলা। ভারত-ভিখারী শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, "ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা;"—আজি শঙ্করের সে কথার পুন-রুক্তি করিয়া, স্পেন্সার কহিতেছেন যে, জগতের যেখানে যাহা কিছু সত্য, অর্থাৎ অস্তিত্ব-বিশিষ্টরূপে, প্রতিভাত হইতেছে, সেই জগন্ময় শক্তিই তাহার পশ্চাদ্ভাগে পরম-সত্য-রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেন সেই মহা-শক্তি জড়-জগতে মহানিদ্রায় অভিভূত,—জড় হইতে ঈষদুন্নত উদ্ভিদ-জগতে অল্প-জাগৃত;—জীব-জগতে সুখ-স্ফুরণে ক্রিয়া-ন্বিত,—এবং জীব-জন্তুর উপরিস্থ মানব-জগতে, চৈতন্য-স্ফূর্ত্তিতে, চিন্তারত।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, যিনি স্পেন্সা-রের বিজ্ঞান-পরীক্ষিত বিশুদ্ধ জ্ঞানে, অনন্ত-

* "Ever in presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed," শক্তি শব্দের বিশে-ষণে, অনন্ত স্থলে অনন্তা ও অনাদি স্থলে অনাদ্যা প্রভৃতি শব্দে স্ত্রীত্ব-বোধক আপ্ ও আ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দাদির প্রয়োগ জাতীয় সংস্কার ও জগদাদৃত সংস্কৃতভাষার পুরাতন গৌরব-রক্ষার্থ।

† "The final outcome of that speculation commenced by the primitive man is that the Power manifested throughout the universe distinguished as material is the same Power which in ourselves wells up under the form of consciousness" (Religion: A Retrospect and Prospect.)

রূপিণী অনাদ্যা, এবং শঙ্করের আত্মার জগন্ময় ব্রহ্ম, তিনই ভক্তের প্রাণে জগন্মাতা ব্রহ্মময়ী,—প্রাণারাধ্যা মা। কারণ, এই সংসারে কোটি কোটি, অসংখ্য অর্ব্বুদ-কোটি মায়ের প্রাণে অহোরাত্র যে অমৃতময় স্নেহের স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তিনিই তাহার অক্ষয়-প্রস্রবণ। পর্ব্বত-নির্ঝরে জল না থাকিলে, নদীর খাতে জল থাকে না। সেই আদি অথবা অনাদি প্রস্রবণেও অনন্ত-স্নেহরাশি না থাকিলে, মায়ের প্রাণে স্নেহ থাকিতে পারে না।

এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জননী মাকে যেমন স্নেহ-মমতার আধারস্বরূপ এক নির্দ্দিষ্ট 'জন' কিংবা 'ব্যক্তি' বলিয়া মনে করি, আমাদিগের ব্রহ্মময়ী জগন্মাতায়ও কি সেই-রূপ কিছু 'জনত্ব' অথবা 'ব্যক্তিত্ব' আছে? তিনি কি শুধুই প্রীতিস্নেহের একটা অতল, অপার, অমেয় সমুদ্র, না স্নেহ-চৈতন্য বিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি? স্পেন্সার এ বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা আরও সুন্দর,—আরও সুখ-শান্তিপ্রদ। তাঁহার কথার মর্ম্মার্থ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্যেই যেমন একটা জনত্ব ও ব্যক্তিত্বের ভাব আছে, সেই জগন্ময় শক্তিরও সেইরূপ কিংবা তাহা হইতে উচ্চ-তর জনত্ব ও ব্যক্তিত্ব আছে। * তবে, এই এক বিশেষ কথা, তিনি স্বয়ং, এক জন হইয়াও, অনন্ত-কোটি জনের অনন্ত-বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ জনত্বের পৃষ্ঠদেশে পরমা-শ্রয়রূপে বিরাজিত;—অথবা, যেন জন না হইয়াও অসংখ্যপ্রকার জনত্বে বিকাশিত।

যাঁহারা, বিজ্ঞানের নিকট, আকুল প্রাণে, আলোক না চাহিয়া, অন্ধকারের অন্বেষণ করেন, এবং নিজ নিজ হৃদয়ের ইচ্ছাসঞ্চিত অন্ধকারকে আদরে পুষিয়া রাখিবার জন্য, বিজ্ঞানের অতিকঠোর সত্যনিষ্ঠাকে পরিহার করিয়া, দুই একটি উদ্‌ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকের দোহাই দিতে ভালবাসেন, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, হর্ব্বার্ট স্পেন্সারের কথায় কি হইল? তিনি, অধুনাতন বৈজ্ঞানিক-জগতের গুরু হইলেও, একা একটি মাত্র মনুষ্য। তাঁহার ঐ একটা আত্মায় যাহা লইয়াছে, তাহা যদি আমার আত্মায় না লয়,—তাঁহার বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা যদি আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত না হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সাক্ষ্যে অথবা বাক্যে আমার প্রতীতি অথবা উপকার হইবে কেন?

এ কথা সর্ব্বথা সুসঙ্গত। যিনি, আকাশের ঐ জ্বলন্ত জ্যোতিঃপিণ্ডস্বরূপ সূর্য্যের দিকে চাহিয়াও, আলোকের জগদুজ্জ্বলা শক্তি অনুভব করিতে অসমর্থ রহেন, কে তাঁহাকে কি প্রকারে আলোর মহিমা বুঝাইবে? যিনি, পূর্ণচন্দ্রের প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন জ্যোৎস্না দেখিয়াও, জ্যোৎস্নার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে না পারেন, কে তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের সর্ব্ব-জন-মোহন সানন্দমাধুর্য্য সম্পর্কে শিক্ষা দিবে? এই জন্যই সত্য সাধনসাপেক্ষ, এবং উৎকর্ষ-লাভ ও উপার্জ্জন নিয়মিত-শ্রমাপেক্ষ। অর্থাৎ, যে যথানিয়মে সাধনা না করে,—না ডাকে, না খোঁজে,—না ভজে, না পূজে, সত্য তাহার সন্নিহিত রহিয়াও তাহার কাছে প্রকাশ পান না;—এবং যে, যথারীতি পরিশ্রম করিয়া, সোপানের পর সোপানে উঠিবার ক্লেশ স্বীকার করে না, সে কোন বিষয়েই উন্নত হয় না,—কোন কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারে না।

কিন্তু, ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, হর্ব্বার্ট স্পেন্সারের মত যুগ তত্ত্বের আচার্য্য, জগৎপূজ্য জ্ঞান-গুরু পুরুষেরা এ সংসারে কোন দিনও একা রহেন নাই, একা চলেন নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র। তাঁহাদিগের একটা প্রাণ শত-সহস্র প্রাণের ভাষ্যকার অথবা ভাব-জ্ঞাপক,—শত-সহস্র প্রাণের স্বাভাবিক আকর্ষক ও শক্তিপোষক। তাঁহাদিগের এক জনের বুদ্ধি ও এক জনের হৃদয়, স্বদেশে ও বিদেশে, শত-সহস্র মনুষ্যের বুদ্ধি ও হৃদয়কে, উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে সঞ্চালন করিবার যোগ্য। ইহা তাঁহাদিগের মহিমা নহে, মহিমা সত্যের; আর ইহার প্রমাণ পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম-বাণী ও আনন্দময়-ভক্তির উচ্ছ্বাস। যখন অষ্টাদশ শতাব্দী, লোক-ভয়ঙ্কর ফরাশি-রাষ্ট্র-বিপ্লবের অবসান সময়ে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় ডুবু ডুবু, তখন সমস্ত সুসভ্য জগৎ কেমন একটা অন্তঃশোষক নৈরাশ্যের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তখন ভক্ত মাত্রই মনে বিষণ্ণ, হৃদয়ে অবসন্ন,—ভক্তি আর জ্ঞান পরস্পর-বিরোধে বিপদাপন্ন। আজি যে সকল কথা নিহিলিজ্‌ম্ (Nihilism) অথবা নাস্তিবাদ নামে সংসারে উপেক্ষিত ও উপহসিত হইতেছে,—যে সকল কথা কহিয়া মাইকেল বেকুনিনি * প্রভৃতি বৃথা-জ্ঞানাভিমানী বিশ্ব-দ্রোহী ব্যক্তিরা মনুষ্যের নিকট ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত হইতেছে, তখন অধিকাংশ জ্ঞানীই সেই সকল কথার প্রচারক; আর, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্নেও যাহাদিগের সাক্ষাৎকার ঘটিত না,—ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না, তাহারাও ঐ ভাবেরই ভাবক, ঐ পথেরই পথক, এবং ঐ বাদ্যেরই তাল-বাদক।

সে দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। মানবজাতির চিন্তাস্রোতে এক শতাব্দীর তর তর ভাটার পর নূতন জোয়ার বহিয়াছে, নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে;—এবং পৃথিবীর পণ্ডিত ও মূর্খ, তাত্ত্বিক ও ভাবুক, বৈজ্ঞানিক ও কবি, ঐতিহাসিক ও উপন্যাসিক, সকলেই স্পেন্সর, টেনিসন, ফিস্কে ও স্যাভেজ প্রভৃতির ন্যায়, সেই স্বচ্ছ সুখ-শীতল জোয়ারের জলে, স্নাত-পূত হইয়া, জয় জগন্ময় বলিয়া মনের আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে;—সকলেই যেন বহু দিনের পর হারাধন পাইয়া, তাহা যার-পর-নাই যত্নে তুলিয়া, বুকের মধ্যে লুকাইয়া

* "The choice is rather between Personality and something that may be higher"

* "The begining of all those lies which have ground down this poor world in slavery, is, God." (God and the State: Michael Bakounini.)

রাখিতেছে, আর আরাধনার আনন্দময় উচ্ছ্বাসে নয়ন জলে ভাসিতেছে।

বিজ্ঞান-সমালোকিত মানব-জাতির এই-রূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব হর্ষোৎসবের কারণ কি? ইংলণ্ড, উহার কণ্ঠস্বরকে সপ্তমে তুলিয়া, সহর্ষ-পুলকে বিশ্বাস ও ভক্তির বিজয়-সঙ্গীত গাইতেছে;—অতলান্ত-সমুদ্রের পর-পার হইতে, আমেরিকা সেই সঙ্গীতে সুর মিশাইতেছে;—এবং ফ্রান্স, জর্ম্মণী, রুষ, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ-নিচয়ও, সেই সুধাময় সঙ্গীতেই অতি গভীর সহানুভূতির স্বর-সংযোগ করিয়া, পৃথিবীর মনুষ্যকে অপার্থিব স্বর্গীয়-গীতির সমতানতা বিষয়ে শিক্ষা দিতেছে। পুনরপি জিজ্ঞাসা করি, ইহার কারণ কি? বিজ্ঞান কি তবে, এত কালের পর, সেই অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে? জীব কোন কালে যাঁহাকে চক্ষে দেখে নাই,—কোন কালেও যাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করে নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান কি সেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' অচিন্ত্য শক্তির দর্শন পাইয়াছে? তাহা নহে। মনুষ্য কোন দিনও চর্ম্ম চক্ষে তাঁহার দর্শন পাইবে না। কিন্তু বিজ্ঞান যে পথে চলিয়া,—যে উচ্চ শৈলে উঠিয়া, যে ভাবে যাহা দেখিতে পাইয়াছে, তাহা তাঁহারই প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতিরূপ।

এই যে অনন্ত জগৎ, মনুষ্যের সম্মুখে ও পশ্চাতে,—দক্ষিণে ও বামে—ঊর্দ্ধ-দিকে ও অধোমুখে বিস্তারিত রহিয়া, আলোকে ও অন্ধকারে সমান বিস্ময় জন্মাইতেছে, বিজ্ঞানের চক্ষে ইহা এইক্ষণ হস্ত-ধৃত আমলকবৎ এক অখণ্ড—অচ্ছিন্ন—অবিভক্ত—অন্তর্বহিরণুস্যূত—পূর্ণপদার্থ। মনুষ্য, পুরাকালে, এই একটি জগৎকে এক কোটি পৃথক্ পৃথক্ জগৎ মনে করিত। যেন আকাশের সূর্য্য এক বস্তু, চন্দ্র আর এক বস্তু, এবং বনের ফুল তৃতীয় বস্তু। কিন্তু ইদানীন্তন-বিজ্ঞানে ইহা প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণিত হইয়াছে যে, কিবা আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, কিবা উদ্যানের যূথিকা ও গোলাপ, কিবা সহস্র-কোটি যোজনের পর-পার-স্থিত সুদূরবর্ত্তি সিরিয়স নক্ষত্র, কিবা সুকুমারী ও সুরুচিবালার সুস্নিগ্ধ-পবিত্র প্রশান্ত মুখচ্ছবি, অথবা লিলী ও এমেলীর আনন্দ-বিলসিত স্মিত-নেত্র, সংসারের সমস্ত বস্তুই এক বস্তু,—সমস্ত পদার্থেই এক পদার্থ,—একই সূত্রে জড়িত,—একই উপকরণে গঠিত;—এবং অনন্ত-বৈচিত্র্যে বিভক্ত হইলেও একই কার্য্যে নিযুক্ত,—একই পরিণাম অথবা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত।—

——এক বিধি,—এক বস্তু,—
এক দিব্য—দূর-ভব্য—ভাবী পরিণাম,
সমস্ত বিশ্বের গতি সেই এক দিকে,—
আজি তুমি আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছ,—আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছি। কিন্তু তুমি আর আমি এক-প্রাণ,—একই প্রাণ-সমুদ্রের আপাত-পৃথগ্‌ভূত অথচ পরস্পর-সংযুক্ত দুইটি বিন্দু। আর ঐ যে ক্ষীণ-প্রভ খদ্যোত, যেন চন্দ্রোদয়ে লজ্জিত হইয়া, লতা-পাতার আড়ালে

* টেনিসনের অনুবাদ-চেষ্টা।

লুকাইয়া রহিতেছে,—চন্দ্র আর খদ্যোত উভয়েরই আলোকময় তনু একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন রূপ। এই অনন্ত বিশ্বের উল্লিখিত-রূপ একত্ব কিংবা একময়ত্ব চিন্তা করিলে, মনুষ্যের মন, কোথায় যাইয়া, কি ভাবে, কাহার কাছে ঢলিয়া পড়ে,—যাহা বহিশ্চক্ষুর অদৃশ্য, তাহাও কিরূপ বিস্ময়াবহ কৌশলে, চিত্তচক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়া, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মায়, তাহা ভাষায় কেহ পরিব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবে কি?

জগতের একত্ব যেমন আজি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিদ্ধ-তত্ত্ব, জগৎ-প্রকাশিত শক্তি-সমূহের তথাবিধ একত্ব, অথবা একময়ত্বও, সেইরূপ, অধুনাতন বিজ্ঞানের নিকট আর একটি পরীক্ষিত সত্য। ইহা কথিত হইয়াছে যে, জগতের জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে, সর্ব্বত্রই শক্তির শত-বিধ কার্য্য,—সহস্র-প্রকার ক্রীড়া সতত মনুষ্যের চক্ষু, কর্ণ ও চিত্ত-বৃত্তিকে আকর্ষণ ও আলোড়ন করিয়া থাকে;—এবং মনুষ্য প্রকৃত তত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে পারুক আর না পারুক, সে সকল স্থলেই, সেই শক্তি-সম্ভাবিত বৃষ্টিপাত-প্রভৃতি স্বাভাবিক-কার্য্য হইতে আপনার দেহ-প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য, সর্ব্বদা যত্নপর রহে। আকাশ যখন বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরণ-প্রতিভায় কেমন এক আশ্চর্য্য-ভয়ঙ্কর বিচিত্র-সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হয়,—বিজলীর সেই মোহন-রেখা, যখন একটি জ্বলন্ত বহ্নি-রেখা অথবা বহ্নিময় সর্পের ন্যায়, মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, বালকের মন তখন যেমন হয় বিস্ময়ে চমকিত, তেমন হয় ভয়ে অভিভূত। তাহাকে কেহ উপদেশ না করিলেও, সে ভীত-ভীত হৃদয়ে দৌড়িয়া ঘরে চলিয়া যায়; এবং মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়া, মেঘ-বিলাসিনী বিদ্যুদ্বরণী মহাশক্তির বাড়ী, ঘর ও গৃহস্থালীর বিবিধ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, কারণ-জিজ্ঞাসু ও তত্ত্ব-পিপাসু মনুষ্য-প্রকৃতির পরিচয় দেয়।

মনস্বি-জন-মাননীয় মোক্ষমূলর বলেন * যে, বালকের মনে এই যে ভীতির সঙ্গে বিস্ময়ের স্ফূর্ত্তি, ইহারই অন্তস্তলে, আপনা হইতে উচ্চতর, জগচ্চর বহিঃস্থ-শক্তির অনুভূতি,—এবং সেই অনুভূতিই বালকের অবশ্যম্ভাবি ধর্ম্ম-জীবন অথবা অনন্তোন্মুখী ভক্তির প্রথম ভিত্তি। বালক, আপনার মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝে না,—যাহা কিছু বুঝে, তাহাও আর এক জনকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারে না। কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে, যেন তাহার বুদ্ধির অগোচরে, ধীরে ধীরে, একটা জ্ঞান-বিশ্বাসের অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে। ইহা স্বভাবতঃই তাহার মনে লয় যে, সে যেমন এক জন, তাহার বাহিরে,—এই বহিঃস্থ সংসারে, আরও অনেক জন আছেন। তাঁহাদিগেরই শক্তিতে, সূর্য্য প্রাতঃসময়ে উদিত হইয়া, সারা দিন শূন্য পথে আকাশ ভ্রমণ করিয়া, সন্ধ্যাকালে শূন্য-সাগরে ডুবিয়া যায়;—চন্দ্র মেঘের

* The Lectures on The Perception of The Infinite and Fetishism &c.—The Hibbert Lectures.—1878.

আড়ালে উকি ঝুকি দিয়া, বালক-বালিকার সম্ভাষণ করিয়া, হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়;—মেঘ সকল, উড়ন্ত পর্ব্বতের মত, আকাশে ঘুরিয়া ফিরিয়া, উড়িয়া বেড়াইয়া, কখনও ক্রোধে গর্জ্জিতে রহে, কখনও গায়ের উপর জল-ধারা ঢালিয়া দেয়;—বায়ু, মনের বিরাগে ঝটিকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বড় বড় গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া ফেলায়, ও দুষ্ট নষ্ট লোকের ঘর বাড়ী উড়াইয়া নেয়;—এবং অগ্নি, গ্রাম-জনপদ-দাহি গৃহ-দাহের সময়, উহার লক লক জিহ্বা প্রসারণ করিয়া, কাঙ্গালের কুটীর ও সমৃদ্ধের সুসজ্জিত সুরম্য গৃহ,—সমস্তই পুড়িয়া ফেলায়!

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, জগতের সকল স্থানই শক্তির কোন না কোন রূপ লীলা-স্থান, এবং বালক ও বৃদ্ধ, অসভ্য ও সুসভ্য, সকলেরই সে বিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান। মনুষ্য-জাতির মধ্যে যাহারা আজ পর্য্যন্তও বনেচর জীবের অবস্থায় রহিয়াছে—বন-জঙ্গলে বাস করিয়া, বন্যপশু কিংবা পিশাচ ও রাক্ষসের মত জীবন যাপন করিতেছে, তাহারাও এক প্রকারে শক্তিরই উপাসক। তাহারা কখনও আকাশে, কখনও উচ্চ বৃক্ষে, কখনও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বৃহৎ-কায় সর্পাদির শরীরে, ঝড়-তুফানের অধিনায়ক জগচ্চালক শক্তিনিচয়েরই অস্তিত্ব কল্পনা করে; এবং সে সকল শক্তি-বিগ্রহের সন্তোষ-সাধনার্থ, ফল মূল, মিষ্ট বস্তু, অথবা মাংসাদি সামগ্রী উপহার দিয়া, আপনাকে একটু আশ্বস্ত মনে করিয়া থাকে।

কিন্তু সে শক্তি এক, না অসংখ্য? স্পেন্সর যে শক্তির ধ্যান ও মননকে ধর্ম্ম-জীবনের মহত্তম অনুষ্ঠান বলেন;—মনুষ্য, তাঁহার মতে,—এবং এবট, ড্রেসার, হপ্‌স্, হিউবার, ও ট্রাইন প্রভৃতি শত শত বৈজ্ঞানিক-ভক্তের বিশ্বাস-অনুসারে—দিবসে নিশীথে,—জাগরণে ও সুষুপ্তিতে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যে শক্তির ক্রোড়ে অবস্থিত, আমাদিগের 'প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান' প্রাকৃত-শক্তি-সমূহের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? যে শক্তি, পৃথিবীতে, নিউটনের সময় হইতে, আকর্ষণী নামে অভিহিত রহিয়াছে, এবং গ্রহ ও নক্ষত্র-নিচয়কে নিজ নিজ কক্ষে বিধৃত ও পরিভ্রামিত রাখিয়াছে, সেই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত অগ্নির সন্তাপনী, বিদ্যুতের বৈদ্যুতী,—অম্ল-জানাদির রাসায়নী ও অয়স্কান্তের চৌম্বকী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতশক্তির বিশেষ কোন সম্পর্ক মনুষ্যের জ্ঞান-গোচর হইয়াছে কি! অপিচ, এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ শক্তির সহিত সেই মূলীভূত-মহাশক্তিরও কোন প্রকার বিশিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ বন্ধন বিজ্ঞানের আলোকে উপলব্ধ হইতেছে কি?

বিজ্ঞান এ বিষয়েও, ধীরে ধীরে ধীরে বহু শতাব্দীর পরীক্ষণ ও পরিশ্রমের পরে, একটি অমূল্য, অভ্রান্ত, অনন্ত-বিস্তারিত মহা-সত্যের আশ্রয় লাভ করিয়াছে,—যেন অপার ও অগাধ সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গরাশির মধ্যে দাঁড়াইবার একটুকু ঠাঁই পাইয়াছে; এবং মনুষ্যজাতিকে মুক্তকণ্ঠে উপদেশ করিতেছে যে, মনুষ্যের কর-স্পৃষ্ট কুসুম-রেণু ও কোটি-কল্প-যোজন-দূরস্থ নক্ষত্র যেমন এক

পদার্থ, জগতের সমস্ত শক্তিই সেইরূপ, একই অবিনাশি, অনন্ত-বিলাসি মহাশক্তির মহৈশ্বর্য্য-লীলা ও এক-তন্ত-বদ্ধ। আগুন দ্রষ্টব্যে নিবিয়া যায়। কিন্তু, উহার সন্তাপনী শক্তি, ঐ মুহূর্ত্তেই, আর এক মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করিবার অবকাশ পায়। ঝড় থামিয়া যায়;—ঝটিকার ক্রীড়া-সঙ্গিনী কনক-দামিনী, মনুষ্যের দৃষ্টি-পথ হইতে অপসৃত হইয়া, যেন আপনাতেই আপনি লুকায়। কিন্তু প্রকৃতির যে সকল শক্তি, বায়ু-রাশিকে উদ্বেলিত করিয়া, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতে প্রবাহিত ও বিদ্যুৎ-প্রভায় বিভাসিত হইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎই, নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর ন্যায়, রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া, আর পাঁচ প্রকার অপরিহার্য্য প্রাকৃত কার্য্যে প্রয়োজিত হয়।

সার্ উইলিয়ম গ্রোভ, 'শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ,' * নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে, বহু-বৈজ্ঞানিকের মুখ-পাত্র-রূপে, এই কথাই বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সহকারে অশেষ-বিশেষে বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছেন;—তাঁহার প্রধান ব্যাখ্যাকর্ত্তা উইলিয়ম লেণ্ট কারপেণ্টার, তদীয় 'প্রকৃতি-নিহিত-শক্তি' † নামক গ্রন্থেও, আলোক, উত্তাপ, আভাসনী ও আকর্ষণী প্রভৃতি শক্তির সহিত জগতের সর্ব্ববিধ শক্তির একাত্মতা ও এক-সূত্র-বদ্ধতা যান্ত্রিক প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া, ভক্তিতে তদ্গত হইয়াছেন;—এবং শক্তির সুবিখ্যাত উপাসক টিণ্ডেল, মূর্খের নিকট নাস্তিক অথবা অনস্তিবাদী বলিয়া পরিচিত হইলেও, ভাব-বিভোর-কণ্ঠে কহিয়াছেন,—

* "শক্তির প্রবাহ অনন্ত কালই সমান বা এক। উহা সঙ্গীতের কল-মধুর-ধ্বনিতে, যুগান্ত হইতে যুগান্তরে গড়াইয়া যাইতেছে, এবং জগতের সর্ব্ব-বিধ শক্তি, জীবনের সমস্ত প্রকার স্ফূর্ত্তি, ও দৃশ্য-নিচয়ের বিবিধ ক্রিয়ায়, উহারই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখাইতেছে।"

পূর্ব্বে কহিয়াছি যে, স্পেন্সর এই মহা-শক্তিকে চৈতন্যময়ী না বলিলেও, চৈতন্যের প্রস্রবণ-রূপিণী, অথবা চৈতন্য হইতে উচ্চতর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই কথার মধ্যে একটি গুরুতর প্রশ্ন পিহিত রহিয়া যাইতেছে। সেই প্রশ্ন এই,—চৈতন্য হইতে জড়-শক্তির উৎপত্তি, না জড়-শক্তি হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি? ইহা পাঠক অবশ্যই বুঝিতেছেন যে, যাহা চৈতন্য বলিয়া এখানে উল্লিখিত হইতেছে, তাহারই দ্বিতীয় নাম প্রাণ,—তৃতীয় নাম পরম-পদার্থ-রূপী আত্মা। সুতরাং, প্রশ্ন পরিষ্কৃত ভাষায় এই-

* The correlation of Physical Forces. By W. R. Grove,, Q. C,. M. A., V. P. R. S.

† Energy In Nature,—By WM. Lant Carpenter B. A, B. Sc.,

* "The flux of power is eternally the same. It rolls in music through the ages, and all terrestrial energy, the manifestations of life, as well as the display of phenomena, are but modulations of its rhythm." (Tyndal.)

রূপে পরিণত হইতেছে; যে, জগতে আগে চৈতন্য,—না আগে জড় ? আমরা এই জগতে অহোরাত্র যে অদৃশ্য-শক্তির লীলা মাত্র দেখিতেছি, তাঁহা হইতেই জল অগ্নি প্রভৃতি জড়বস্তুর ক্রম-বিকাশ,—না জল অগ্নি প্রভৃতি জড়বস্তু হইতে সেই শক্তির প্রকাশ ?

সংসারে জড় ও অজড়, অথবা চেতন ও অচেতন, এই উভয়-বিধ বস্তুই যে সর্ব্বত্র-বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? মানুষ হাসিতেছে, কাঁদিতেছে,—ক্রোধে ফুলিতেছে,—কামাদি পাশব-বৃত্তির উত্তেজনায়, ছাগ-কুক্কুরকেও লজ্জা দিতেছে ;—লোভে শৃগালের মত হাত বাড়াইতেছে ;—ক্ষোভে মার্জ্জারের মত অবসন্ন হইয়া দূরে সরিয়া বসিতেছে ;—সুখের অনুভূতিতে ফুলের মত ফুটিতেছে ;—আবার শোক ও দুঃখের অনুভূতিতে শুষ্ক-লতার মত ঢলিয়া পড়িতেছে ;—কখনও পরার্থা প্রীতিতে দ্রবীভূত হইয়া, আপনার মুখের গ্রাস পরের মুখে তুলিয়া দিতেছে ;—কখনও বা স্বার্থ-মোহে অন্ধীভূত হইয়া, পরের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিতেছে,—সে পর, যার-পর-নাই উপকারী জন হইলেও, তাহাকে বৃথা-বিপন্ন করিয়া, আপনার প্রভুত্ব-বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতেছে। মানুষের এ সকল ক্রিয়া ত নিত্য-প্রত্যক্ষ। আর, এই ক্রিয়া-সমুদয় মনুষ্যের হর্ষ বিষাদ, কাম ক্রোধ, লোভ ক্ষোভ, সুখ দুঃখ, প্রীতি ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি যে সকল ভাবের বহিঃপ্রকট মূর্ত্তিমাত্র, প্রত্যক্ষ না হইলেও, সেগুলি অবশ্যই জল অগ্নি ও সোনা রূপার ন্যায় প্রকৃত পদার্থ ;—মিলের মতে ("The only real thing") একমাত্র নিঃসংশয়প্রতীত প্রকৃত ও সত্য পদার্থ। কিন্তু উল্লিখিত হর্ষবিষাদাদি চৈতন্যাত্মক পদার্থ-সমূহ জড়-শক্তিরই বিবিধ ক্রিয়া ;—না, ঝটিকা বৃষ্টি ও বজ্র-পাত প্রভৃতি যে সকল ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন জড়ীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে সকলেরও অন্তর্ম্মূলে চৈতন্য ?

বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে পঁহুচিয়াছে,—জড়-বস্তুকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, আগুনে পোড়াইয়া, জলে ভিজাইয়া, তাপে গলাইয়া, এবং আরও অশেষ-প্রকার তন্তুচ্ছেদে বিশ্লেষ করিয়া, যে সার-কথা জানিতে পাইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের নিকট বড় বেশী বিস্ময়-জনক বোধ হইলেও, প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট প্রাণ-প্রীতিকর ও পরমানন্দপ্রদ। বিজ্ঞানের সেই সার-কথা অথবা সারসিদ্ধান্ত এই যে,—মনুষ্য এত কাল যাহাকে জড় বস্তু জ্ঞানে যজনা করিয়াছে, তাহার পৃথক্ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই ; কারণ, জড়-বস্তুর পরমাণু চৈতন্য-শক্তিরই চরম-বিন্দুবৎ। আমরা এ মহাতত্ত্ব সকল-শ্রেণীর পাঠককে সহজে বুঝাইতে পারিব, এমন আশা করি না। কিন্তু এখনকার প্রধান ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রসঙ্গে যাহা কহিয়াছেন, বোধ হয়, সে কথাগুলি কানে শুনিলে, পাঠকের মন অচেতনবৎ-প্রতীয়মান জড়-জগৎ হইতে চৈতন্য-শক্তিময় ঊর্দ্ধ-জগতে উঠিবার জন্য উৎকৃষ্ট-সোপান-পরম্পরা লাভ করিবে।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে হক্‌শ্লি ঘোরতর (Materialist) জড়বাদী বলিয়া বিখ্যাত। হক্‌শ্লি বলিয়াছেন যে, জড় হইতে চৈতন্য, না চৈতন্য হইতে জড়,—অর্থাৎ এক দিকে পূর্ণ জড়-বাদ, আর এক দিকে পূর্ণ চৈতন্য-বাদ,—অথবা অনুভূতিবাদ,—এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে আপনার বলিয়া গছিয়া লইতে হইলে, আমি এই শেষোক্ত তত্ত্বকেই, সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। * হোয়েফ কুক এক জন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে শিক্ষক ও সদুপদেষ্টা বলিয়া সম্মান করেন। তিনি তাঁহার 'জীবন-বিজ্ঞান' † নামক গ্রন্থে ইহাই বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছেন যে, এ জগতে মনুষ্যের চক্ষে যাহা শক্তি বলিয়া প্রতিভাত হয়, আত্মা অথবা চৈতন্যই তাহার আদি-মূল। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, মনুষ্য ততই পরিষ্কাররূপে বুঝিতেছে যে, পরমাত্মাই প্রাকৃত-নিয়মে শক্তিরূপে স্বয়ং বিদ্যমান। ইয়ুরোপে যেমন স্পেন্সর, আমেরিকায় তেমন ফিস্‌কে। উভয়েই প্রায় সমান-পদবী-রূঢ়, এবং ক্রম-বিকাশ-তত্ত্বের প্রখ্যাত-নামা গুরু। অতি অল্প দিন হইল ফিস্‌কে স্বর্গগত হইয়াছেন। তিনি, আগে স্পেন্সরের চিন্তা-ক্রম বিবরিয়া বুঝাইয়া, পরিশেষে নির্ভীক-কণ্ঠে কহিয়াছেন যে,—"জড়-বাদের দিন চির-দিনের তরে লোপ পাইয়াছে, উহা আর ফিরিবে না।" ‡ "যে অনন্ত-শক্তি এই জগতে দেদীপ্যমানা, তিনি স্বরূপতঃ চৈতন্যময়ী অথবা পরমাত্ম-রূপিণী। § মহাত্মা মার্টিনিয়ু বিজ্ঞান-ভিত্তির উপরই দৃঢ়-দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছেন ;—"Force is will." অর্থাৎ শক্তির নাম ইচ্ছা। কার্পেন্টার বলিয়াছেন যে,—আমরা শক্তিকে ইচ্ছারই ক্রিয়া অথবা ইচ্ছাময়ী ভিন্ন আর কোনরূপে চিন্তা করিতে পারি না। আর কঠোর-পরীক্ষক সার্ উলিয়ম ক্রুকস্ ব্রিটিশ আশোসিয়েসনের সভাপতি-রূপে, ব্রিষ্টল-নগরে, সমবেত-বৈজ্ঞানিক-মহাসভায় সহস্র বৈজ্ঞানিককে সম্ভাষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, "জড় বস্তুর যত প্রকার মূর্ত্তি আছে, আমি প্রাণ অথবা চৈতন্য-শক্তিতেই তাহার আশা ও অঙ্কুর নিহিত দেখিতেছি।" ‖

বস্তুতঃ; আমরা কাহার কথা ছাড়িয়া কাহার কথা কহিব। আকাশে যখন সন্ধ্যাকালে

* "If I were obliged to choose between absolute materialism and absolute idealism, I should feel compelled to accept the latter alternative." মণিয়র উইলিয়মস্ idealism শব্দকে অবিদ্যা, অমূর্ত্তিবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন।

† Biology, by Joseph cook.

‡ Henceforth, we may regard materialism as ruled out, and religated to the limbo of crudities &c. (Cosmic Philosophy.)

§ Through Nature to God. By Jhon Fiske.

‖ "in life I see the promise and potency of all forms of matter."

একটি একটি করিয়া সুখ-সুন্দর তারা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখন শিশুরা, প্রথমতঃ, প্রাণের উৎসাহে, এক, দুই, তিন—চারি, পাঁচ, ছয়—এইরূপ প্রক্রমে তারা গণিতে আরম্ভ করে। তার পর, আর গণিতে না পারিয়া, অত্যধিক আনন্দের সেই এক প্রকার অবসাদে, নীরবে বসিয়া রহে। আমাদিগেরও প্রায় সেইরূপ অবস্থা। কারণ, যাঁহারা ইদানীং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নক্ষত্ররূপে ফুটিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই মুগ্ধ মূর্ত্তিতে এক আভা;—মুখে অচিন্ত্যরূপিণী অনন্ত-ব্যাপিনী চৈতন্যময়ী শক্তির প্রাণ-স্পর্শি-প্রভাব সম্পর্কে সকলেরই এক কথা। আমরা, ভক্তি ও প্রীতির সহিত, উদ্দেশে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

কিন্তু তাঁহাদিগের সে প্রকৃতির-প্রাণরূপিণী পরমারাধ্যা মহাশক্তি কোথায়? যাঁহাকে মা বলিয়া চিনিয়াছি,—মা বলিয়া বুঝিয়াছি, এবং হৃদয়ের আবেগে সকল সময়েই কোথায় মা বলিয়া করুণ-কণ্ঠে ডাকিতেছি;—যিনি মাতৃগর্ভের অন্ধকার-কারা-কোটরে প্রাণে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং মায়ের বক্ষঃস্থলে দুগ্ধ-ধারা ও হৃদয়ে স্নেহের পীযূষ-রাশি ঢালিয়া দিয়া, এত বাড়াইয়াছেন, সেই জগন্ময়ী মায়ের প্রাণ-শীতল অভয় স্পর্শ লাভের জন্য কোথায় যাইব?

মনুষ্যের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম যত কাল বিজ্ঞানের বিমল আলোকে বঞ্চিত ছিল, মনুষ্য তত কাল সেই জগন্ময়ী শক্তিকে জগতের বহিঃস্থ অথবা উর্দ্ধস্থ বস্তু জ্ঞানে ধ্যান করিতে ভালবাসিত, এবং তাঁহাকে সম্মুখীনরূপে চিন্ত করিতে হইলে, সে মনে মনে, কল্পনার রথ আরোহণে, সুদূর স্বর্গের দিকে ধাব মান হইত। গ্রীকদিগের আরাধ্য দেবতা উচ্চ পর্ব্বতে অবস্থিত রহিতেন; এবং কখনও কখনও সেখান হইতে ভূতলে অব তীর্ণ হইয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতেন। য়িহুদিদিগের আরাধনার ধনও আগে ঐরূপই দূরস্থ ছিলেন;—জাতীয় জ্ঞান-সম্পদের বিস্তারের সঙ্গে ক্রমে নিকটস্থ হই-লেন। ভক্ত-কবি দান্তে ভগবজ্জ্যোতিকে এমনই এক অপরূপ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আবরিয়া রাখিয়াছেন যে, সাধারণ মনুষ্য সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও ভীত হয়। কবি-শেখর মিল্টন, অন্তর্জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াও, বিজ্ঞানের সাহায্য-বিরহে, কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার পরম-ধাম, পরম-ব্যোমের পর-পারে, দূরাদপি—দূরে দুশ্চিন্ত্য শূন্য-সাগরে।

কিন্তু বিজ্ঞান যাঁহাকে এইক্ষণ প্রত্যক্ষবৎ পরিলক্ষিত পরমা (The Absolute) অথবা জ্ঞান-বুদ্ধি এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার অপ-রিহার্য্য আশ্রয়রূপিণী অনন্তা (The Infinite) বলিয়া পূজা করিতেছে, আর জা-তীয় ভক্তের প্রাণ, এ সকল তত্ত্বের কিছুই না বুঝিয়া, এত কাল ধরিয়া, যাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে, তিনি কাহারও সম্পর্কে দূরস্থিত নহেন। তিনি সকলেরই কাছে, সকল সময়ে, যার-পর-নাই নিকট-স্থিত,—মনুষ্যের মনোমন্দিরে অথবা মস্তক-

...স্থ—“সহস্রারে—মহাপদ্মে”—মহাশক্তির ...ায় অবস্থিত। আগে বিজ্ঞান গাইত এক গীত, ভক্তি গাইত আর এক গীত; বিজ্ঞানের কণ্ঠে ছিল এক সুর, ভক্তির কণ্ঠে ছিল আর এক সুর। এখন বিজ্ঞান আর ভক্তি, প্রেম-বদ্ধ দম্পতির ন্যায় এক-প্রাণ হইয়া, একে অন্যের কণ্ঠ-স্বরে স্বর মিশাইয়া, মনুষ্য মাত্রকেই কহিতেছে,—

... মনুষ্য, তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত-জগতের অনন্ত-সৌন্দর্য্য সেই অনন্তরূপিণীরই রূপের আভা। কারণ,—“নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্”। পক্ষান্তরে তুমি নয়ন মুদিয়া ধ্যান কর, তোমার আত্মার অভ্যন্তরেও, তাঁহারই জ্ঞানের প্রভা। কালের কোন প্রকার কল্পিত-...বচ্ছেদেও, এমন কাল ছিল না, যে কালে, কাল-ভয়বারিণী কালময়ীরূপে, তিনি না ছি-লেন; আর, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে তিনি স্থিতিরূপে অব-স্থিত নহেন। তিনিই নয়নে জ্যোতি, কর্ণে ...তি, এবং হৃদ্‌যন্ত্রে অবিরাম-গতি। তিনিই সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপিণী,—বুদ্ধির বোধনী,—...রণে স্মৃতি,—সামর্থ্যে শক্তি,—সন্তোষে তুষ্টি এবং সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিতে পুষ্টি। এই নিখিল ...গৎ সুখের জন্য লালায়িত, তিনিই সুখ ও শান্তি;—জগতের সকলেই দয়ার ভিখারী, তিনিই সর্ব্বভূতে দয়ারূপে সমবস্থিতা। তিনি ...বোধ শিশুর সহিতও, শিশু-বুদ্ধির উপযোগী ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। শিশুর ...খাদ্যের প্রয়োজন, তখন তিনি তাহার দেহে ক্ষুধারূপে অনুভূত হন; শিশুর যখন পানের প্রয়োজন, তখন তিনিই আবার তৃষ্ণারূপে অনুভূত হইয়া থাকেন; এবং সে যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত, তখন তিনি তাহার দেহ-প্রাণে নিদ্রারূপে অনুভূত হইয়া, তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন।

পৃথিবীর নিরাশ্রয় দুঃখি! তুমি কি মনুষ্যের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া, আপনাকে আপনি অসহায় জ্ঞানে, অন্তরে ক্লিষ্ট রহিয়াছ? যাহারা মনুষ্যজগতে ধন-মদ-মত্ত অথবা বাহু-বল-দৃপ্ত, তাহারা তোমায়, মনুষ্যোচিত স্নেহের ভাষায় সম্ভাষণ করে না বলিয়া, তুমি কি হৃদয়ে কাতরতা অনুভব করিতেছ? তুমি মুহূর্ত্তের তরেও, হৃদয়ে এরূপ বিষাদ কিংবা অবসাদের ভাব পোষণ করিও না। কেন না, যিনি এই সীমা-শূন্য শত-কোটি-সৌর-সাম্রাজ্য-সম্পন্ন বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বরী, তিনি তোমার সুখে ও দুঃখে,—স্বাস্থ্যে ও রোগে,—সম্পদে ও বিপদে,—শয়নে ও জাগরণে, তোমার প্রাণের প্রাণরূপে, তোমাতে রহিয়াছেন;—এবং তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আবরিয়া রাখিয়া, তোমার তৃষিত-প্রাণে, ভালবাসার অমৃত-সমুদ্র ঢালিয়া দিবার জন্য, সত্যই, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তুমি যত চাহিবে, তত পাইবে, এবং প্রাপ্ত-ধন যত বিলাইবে, তোমার পূর্ণ ভাণ্ডার তত বেশী পূর্ণ রহিবে। বস্তুতঃ, তাঁহাতেই তুমি জীবিত,—তাহাতেই তুমি প্রাণিত ও অনুপ্রাণিত, এবং বায়ু-বিহারী বিহঙ্গ ও জলসঞ্চারী মৎস্যের ন্যায়, তাঁহাতেই তুমি, অন্তরে ও বাহিরে,—ওত-প্রোত-রূপে,

জড়িত ও পরিবেষ্টিত। তুমি যখন সদ্যোজাত শিশুরূপে মা জননীর ক্রোড়ে ছিলে, তখনও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিত,—তুমি যখন জঠর-শয্যায় অবস্থিত, তখন অধিকতর নিকটস্থ হইলেও, তাঁহার নয়ন-পথ হইতে দূরে রহিতে। কিন্তু জগজ্জননী মায়ের সহিত কোন সময়েও তোমার বিচ্ছেদ নাই, এবং তুমি নিমেষ-কালের জন্যও তাঁহার নিদ্রাশূন্য নয়ন-পথের বহির্ভূত নও। তুমি তাঁহাকে তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভক্তি কর আর ভালবাস; এবং মায়ের সন্তান-জ্ঞানে, মনুষ্য-মাত্রেরই মঙ্গলসাধনে, নিরত-ব্রতী হও। ইহাতেই তোমার প্রাণের পরমা শান্তি,—আর এই সুদুর্ল্লভ মানব-জন্মের চরম সুখ-সম্পদ্ ও পরমা তৃপ্তি।

তবে এস মনুষ্য, আজি আমরা বিজ্ঞান ও ভক্তি উভয়কেই গুরুজ্ঞানে পূজা করিয়া, বিজ্ঞানের মহাশক্তিকেই, ভক্তির আনন্দময় উপদেশে, একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকি,—এবং মায়ের জগন্মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, সকলে সম-স্বরে এক-বাক্যে বলি,——

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং;—
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।

আধার-ভূতা জগতস্ত্বমেকা;
বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া;
ত্বয়ৈকয়া পূরিত মম্বয়ৈতৎ;
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ।

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে,
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো মাতর্জ্জগন্মাত র্নমোঽস্তু তে।

ছায়া-দর্শন।

৭ম অধ্যায়।

যে অতি মন্দ, তাহাকেও এক সময়ে ভাল হইতে হইবে। যাহার দুরভিমান-দম্ভে ও দয়ালেশ-বর্জ্জিত ক্রোধ-গর্জ্জনে, আজি সন্নিহিত মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়, পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া উঠিতেছে,—যাহার বিকট-দৃষ্টি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কোমল-হৃদয়েও বিষাক্ত শালাকার ন্যায়, দাহ জন্মাইতেছে, তাহাকেও সম্মুখবর্ত্তী অনন্তকালের কোন না কোন সময়-ব্যবচ্ছেদে শাক্যসিংহের ন্যায় দয়া-ধর্ম্ম-পরায়ণ, এ... শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় তন্ময়-ভক্ত সাধু-সজ্জন হইতে হইবে। ইহাই অপার করুণা... বিশ্ব-বিধাতার অনুল্লঙ্ঘনীয় বিধি, ... সকল দেব-প্রকৃতি নর-নারী, সময়ে সময়ে মনুষ্যকে দর্শন-দান করিয়া, পারলৌকিক জীবন-সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের উপদেশের সার। কিন্তু, ...

বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্ত,—এই প্রকৃত পুনর্জ্জন্ম কাহারও আরব্ধ হয় ইহলোকে, কাহারও আরব্ধ হয় পর-লোকে। এই পৃথিবীতে অনেকে, মৃত্যু-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্তও, মনুষ্যের অপকার সম্পাদন, অথবা আশে পাশে সকলেরই সর্ব্ব-প্রকার জ্বালাতন করিয়া, কেমন এক অস্বাভাবিক সুখ অনুভব করে;—অনেকে আবার, সময় থাকিতেই, ভয়ে কিংবা ভক্তিতে সুমতির আশ্রয় লইয়া, অল্প অল্প পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। আজি আমরা পাঠককে এইরূপ অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের একটি আশ্চর্য্য কাহিনী উপহার দিলাম। যাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টিতে অস্পৃশ্য অঙ্গারও, সুস্বাদু শর্করায় পরিণত হয়, দুষ্কৃত-নিষ্ঠুর দৃক্‌পাত-শূন্য মন্দ-চরিত্রও, অবশ্যই তাঁহার মঙ্গলময় স্নেহ-শাসনে, এক দিন না এক দিন, মধুর হইয়া, মনুষ্যের মন যোগাইবে,—এক সময়ে, অন্তরে বাহিরে—সর্ব্ব প্রকারে, ভাল হইয়া, ভগবানের জগন্মঙ্গল-ব্রতে যোগ দান করিবে।

আত্মিক কাহিনী।

ইংলণ্ডের এক কৃষিপল্লীতে মেস্তর হাণ্টের বাস। পল্লীটি, রাজধানী হইতে, মাত্র বার মাইল দূরবর্ত্তী। ইংলণ্ডের পল্লী, এ দেশের পল্লীগ্রামের মত, নীরব, নিস্পন্দ ও মৃতবৎ নিস্তেজ নহে। উহা চিরজীবন্ত ও কর্ম্ম-কোলাহলে নিত্য উৎফুল্ল। পল্লীর দুই পার্শ্বে লোকের বসতি। মধ্য দিয়া পরিসর পথ। মাঠ ও শস্যক্ষেত্র পল্লীর বহির্ভাগে অবস্থিত। প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই ধর্ম্ম-যাজক আছেন। চার্চ্চ, হোটেল ও হাঁসপাতাল আছে। সংবাদ-পত্রের গ্রাহক ও পাঠক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাধারণ-মতের একটু প্রভাব ও প্রভুত্ব আছে। হাণ্ট স্বীয় পল্লীর অদূরবর্ত্তী কোন্ বড় ভূম্যধিকারীর প্রধান শিকার-রক্ষক। হাণ্ট, বহুদিন, সৈন্য-দলে সিপাহীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছে। বহু বার রণ-ক্ষেত্রে, অজস্র গোলা গুলির মধ্যে, নির্ভয়ে বিচরণ করিয়াছে। ভয় কাহাকে বলে, স্বপ্নেও সে তাহা জানিত না। তাহার মত অসমসাহসী, কঠোর-কর্ম্মা ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক, পল্লীতে আর একটিও ছিল কি না, সন্দেহ।

হাণ্টের শরীর সুদীর্ঘ, পেশল ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল। বক্ষ বিস্তৃত ও পাষাণ ফলকের ন্যায় দুর্ভেদ্য। লোকের বিশ্বাস,—হাণ্টের বুকে ঠেকিয়া বন্দুকের গুলি ফিরিয়া যায়। তাহার চপেটাঘাতে ষাঁড়ের মস্তক বিদীর্ণ হয়। তাহার আরক্ত-নেত্রের খর দৃষ্টিতে বাঘের চক্ষুও আনত হইয়া থাকে। হাণ্টের পাদ-ভরে মাটী কাঁপিত; কণ্ঠস্বরে পল্লী প্রতিধ্বনিত হইত। হাণ্টের নাম লইয়া জননী ক্রোড়স্থ দুরন্ত শিশুকে শান্ত করিতেন। হাণ্টের সাড়া পাইলে, ক্ষিপ্ত বুল-ডগও লেজ গুটাইয়া কোণে লুক্কায়িত রহিত। রক্ষিত শিকারের উপর, সময়ে সময়ে, অশ্বারোহী দস্যুদল আসিয়া আক্রমণ করিত। দস্যু-দল-কর্ত্তৃক শিকার আক্রান্ত হইলে, হাণ্ট যেরূপ বীরত্ব ও সাহস-সহকারে উহাদিগকে তাড়াইয়া দিত, তাহা বস্তুতই ভয়াবহ ও বিস্ময়কর।

হাণ্টের পাষাণ হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্য, শিষ্টতা ও মিষ্টতার লেশ-মাত্রও ছিল না। হাণ্ট ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় ভীতির আস্পদ ও গণ্ডারের ন্যায় অপ্রতিহতগতি ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। সে যে পথে যাইত, বালকেরা সে পথে চলিতে সাহস পাইত না। ক্ষীণকায় দুর্ব্বলেরা আতঙ্কে সরিয়া যাইত। হাণ্টের গতি-পথ হইতে গৌরবিণী স্বাধীনা রমণীরাও আপন আপন সম্ভ্রম লইয়া সশঙ্ক পলায়ন করিতেন।

হাণ্ট তাহার মনের যে ভাবটিকে ভালবাসা বা অনুরাগ বলিয়া বুঝিত, সে ভাবেরও বিন্দুমাত্র স্থায়িত্ব ছিল না। তাহার তথাবিধ ভালবাসা আজি একদিকে গড়াইয়া পড়িত, কালি আবার আর এক স্থানে যাইয়া আদর প্রদর্শন করিত। কিন্তু তথাপি, কি অলক্ষ্য সূত্রে, জানি না, সে তাহার এই বিসদৃশ কাচের বিনিময়ে, প্রকৃত কাঞ্চন লাভে অধিকারী হইয়াছিল। একটি সুকুমারমতি যুবতী এই ভয়াবহ ব্যাঘ্রকে বস্তুতই প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। যুবতী তাহার পরিণীতা পত্নী!

সে যুবতী পত্নীর রূপের কথা বলিব না। যুবতীর সুকোমল দেহে, ততোধিক সুকুমার কোমলপ্রাণে, যে সুষমা, যে মাধুরী টুকু ছিল, নিষ্ঠুর পতির প্রাণশূন্য কর্কশ ব্যবহারে, তাহা শুকাইয়া শুকাইয়া ক্রমেই নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল। পাদ-দলিত শুষ্ক-কুসুমের অতীত গৌরবের বিষাদ-কাহিনী কহিয়া আর ফল কি? হাণ্ট, তাহার মধুর প্রকৃতি, মুগ্ধস্বভাবা ও আজ্ঞাধীনা পত্নীকে দুই চক্ষের কোণে দেখিতে পারিত না। কোন প্রতিবেশিনী গ্রাম্যবিলাসিনী সম্প্রতি তাহার নয়নরঞ্জিনী ও অনুরাগ-ভাগিনী।

ক্রমে এই প্রসঙ্গে, গ্রামে, সাধারণের মধ্যে, হাণ্টের নামে যার-পর-নাই কুৎসা ও নিন্দা রটিত হইল। হাণ্টের পত্নী ইহা শুনিলেন; কিন্তু প্রথম বিশ্বাস করিলেন না। পরে স্বামীর ব্যবহারে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। যন্ত্রণা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। যুবতীর সরল ও পবিত্র প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। তিনি লুক্কায়িত অনলে অহোরাত্র দগ্ধ হইয়া অকালে ভগ্নদেহে ও ভগ্নহৃদয়ে শয্যাশায়িনী হইলেন। এই রোগ-শয্যা হইতে আর তিনি উঠিলেন না।

পত্নীর মৃত্যু হইল। হাণ্ট অস্পৃষ্ট! তাহার পাষাণ প্রাণ বিন্দুমাত্র ব্যথিত হইল না। নীরস চক্ষে এক ফোঁটা জল ঝরিল না। সে অম্লানবদনে, পত্নীকে সমাধির গহ্বরে বিসর্জ্জন দিয়া, প্রফুল্ল মুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এখন আর কোন বাধা, বিঘ্ন বা অন্তরায় রহিল না। গ্রাম্য-বিলাসিনী এখন অনা... আসিয়া হাণ্টের গৃহস্বামিনী হইয়া বসিলেন। পত্নী-বিয়োগের পর ত্রিরাত্রি অতীত না হইতেই, হাণ্ট উহার সহিত বিবাহ-বন্ধনে ... সূত্রে গ্রথিত হইল। এই নিষ্ঠুর পাশব বি...হের পরে, গ্রামের লোক সকলেই তাহাকে আরও বেশী ঘৃণা করিতে লাগিল। হাণ্টের নিন্দাবাদে গ্রাম ভরিয়া গেল। কিন্তু হাণ্ট দৃকপাতশূন্য। দ্বিতীয় পত্নী হাণ্টের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন, না ভয়ে, অসুরের ভো...

...আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই।

এক মাস হইল, হাণ্ট পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়াছে। যে নয়নানুরাগ বা ভোগলালসায় সুশীলা পত্নী চক্ষের বিষ হইয়াছিলেন, সে ভালবাসায় অবশ্যই এখন ভাটার টান। কিন্তু স্রোত এখনও অন্য কোন দিকে গড়াইবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং, পতিপত্নী এখনও এক ঘরেই বাস করিতেছে। একদা রাত্রিযোগে হাণ্ট নব-পরিণীতা পত্নীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছে;—তখনও তাহাদিগের নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। এমন সময়, রুদ্ধ গবাক্ষের গায়ে কে ঠক ঠক করিয়া শব্দ করিল। শব্দ উভয়েই স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তাহারা মনে করিল,—কোন পথিক হয়ত পথ ভুলিয়া, ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু আবার জানালায় পূর্ব্ববৎ ঠক ঠক ঠক শব্দ হইল। তথাপি হাণ্ট উঠিল না। ব্যাপার কি, জানালার বাহিরে কে শব্দ করিতেছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত হাণ্টের আদেশ ক্রমে, পত্নী শয্যাত্যাগ করিয়া গবাক্ষের নিকটে গমন করিল, এবং দ্রুত-হস্তে জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালা খুলিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে আর সে প্রকৃতিস্থ রহিল না;—"ওমা!—ওকি!"—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

"অ্যা। একি!—এ আবার কোন্ ন্যাকাপনা" এই বলিয়া স্বামী গর্জ্জিয়া উঠিল। যুবতী ভীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে জানালার পানে তাকাইয়া, করে কর কচলাইতে কচলাইতে, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল—"তোমার স্ত্রী!—"তোমার স্ত্রী।—দেখ—দেখ—ঐ জানালার দিকে চাহিয়া দেখ,—ঐ ত—সে—দাঁড়াইয়া রহিয়াছে,—দেখ ঐ ত ঐ খানে।"—

মধুর-ভাষী স্বামী উত্তর করিল,—"দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তোমার মাথা। নির্ব্বোধ,—নেকী যাও, যাও,—আবার ভাল করিয়া দেখ,—কে;—আর না হয়, জানালা টা একবারে বন্ধ করিয়া আইস।"

পত্নী উঠিল না। জানালার কাছে কিছুতেই গেল না। হাণ্টের ভৈরব গর্জ্জনেও, সে ভয় পাইয়া, শয্যায় ফিরিয়া আসিল না। হাণ্ট একান্ত দায়ে ঠেকিয়া, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল। "এ পাপের ন্যাকামিতে একটু ঘুমাইতেও পারিব না" এই মর্ম্মে কি বির্ বির্ করিতে করিতে, নিতান্ত অনিচ্ছায়, জানালার নিকটে উপস্থিত হইল।

হাণ্ট জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া যাহা দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার চক্ষুস্থির হইল, মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিল,—গবাক্ষ হইতে মাত্র এক ফুট ব্যবধানে, প্রকৃতই তাহার পরলোকগতা স্ত্রী দাঁড়াইয়া! জীবিত থাকিতে সে সর্ব্বদা যে পরিচ্ছদ পরিত, পরিধানে সেই পরিচ্ছদ;—এক দৃষ্টিতে তাহারই মুখ পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। সে পলকশূন্য দৃষ্টি এত তীব্র ও মর্ম্মভেদী যে, হাণ্টের পাষাণ-কঠিন নির্ভীক প্রাণও কাঁপিয়া

উঠিল। আজি সে ও দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অদম্য সাহস ও দুর্জ্জয় গর্ব্ব যেন কোথায় উড়িয়া গেল? হাণ্ট সংজ্ঞাশূন্য ও বিমূঢ় অবস্থায় পশ্চাদ্দিকে সরিয়া আসিল। তাহার আপাদ-মস্তক সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! সে আর দাঁড়াইতে পারিল না;—অবসন্ন দেহে একটা চ্যায়ারে বসিয়া পড়িল; এবং বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, আকুলকণ্ঠে, আপনা আপনি নানারূপ প্রলাপ কহিতে আরম্ভ করিল। "আমার স্ত্রী!—সত্যই আমার স্ত্রী!—ঐ ত সে। আমি যে পাপ করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে শাস্তি দিতে আসিয়াছে।—আমি তাহাকে যত যাতনা দিয়াছি, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে! ও কি চক্ষু! ও কি দৃষ্টি!—সুশীলে, আমাকে ক্ষমা কর। পায়ে ধরি, অমন বাঘিনীর মত চোখ করিয়া আর আমার দিকে চাহিও না।—ঐ ত, ঐ ত, আবার আবার!—হায় আমি কি করিব?—হায় আমি এখন কোথায় পলাইব?"

হাণ্ট আর সে হাণ্ট নহে;—একবারে বিকল ও উন্মাদ। হাণ্টের গৃহে এত রাত্রিতে গণ্ডগোল ও চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী-দিগের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ হাণ্ট ও হাণ্টের স্ত্রীর এই আকস্মিক ক্ষিপ্ততার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষ যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা পতি ও পত্নীকে সুস্থির ও প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিলেন। হাণ্টের স্ত্রী, বহু যত্ন ও শুশ্রূষায়, কিছুক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। প্রতি-বেশীরা তাহার মুখে ছায়া-দর্শনের অদ্ভুত কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু হাণ্ট কিছুতেই প্রবোধ পাইল না। তাহার চক্ষু দুটি বিস্ফা-রিত; চক্ষের তারা ঊর্দ্ধে উত্থিত; বদনে বিকট আর্ত্তনাদ; অন্তরে ঘোর আতঙ্ক। কে যেন তাহাকে ধরিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, কে যেন তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে অসি উত্তোলন করিতেছে। সহস্র বৃশ্চিক যেন এক সঙ্গে তাহার মর্ম্মস্থান দংশন করিতেছে; ক্ষিপ্ত অধীর ও বিমূঢ়চিত্ত হাণ্টের এই ভাব কিছুতেই প্রশমিত হইল না। শরীরের রোমাঞ্চ ঘুচিল না; কম্প থামিল না। সে একবার উঠিতেছে, আবার বসিতেছে, আবার দৌড়াইয়া পলাইতে চাহি-তেছে। ঐ ত আমার স্ত্রী,—ঐ ত এল—ঐ এল—মুখে কেবল এই শব্দ।

ইহার পরে চারি পাঁচ মাসেও হাণ্ট ভালরূপ সুস্থ হইতে পারিল না। অবশেষে বহু দিন অন্তে, যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে সম্পূর্ণ আর এক মানুষ। তাহার সে দুর্দ্দান্ত কঠোর স্বভাবের সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিল। মুখে অনুতাপের বিষাদ-রেখা। সে আর তেমন পরুষভাষী উগ্র রহিল না, সকলের নিকটই যার-পর-নাই নম্র ও বিনীত এবং একান্ত শিষ্ট শান্ত। জীবন ভরিয়া যাহার যে অপকার করিয়াছে, তাহার সেই ক্ষতিপূরণে প্রয়াসপর ও পাপের প্রায়শ্চিত্তে যত্নবান্। ইহার পর, যখনই সে কাহারও নিকট ছায়া-দর্শনের ঐ কাহিনী বর্ণন করিত, তখনই তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত

হইত;—সে স্বর্গগত সতী লক্ষ্মীর নাম করিয়া ধারায় চক্ষের জল ফেলিত; এবং পত্নীর সেই প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিজের সেই অমানুষ নিষ্ঠুরতার বিষয় যুগপৎ স্মরণ করিয়া, নয়ন-জলে মনের আগুন নিবাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিত।

পরলোক-গতা পত্নী যে অমন ভাবে দেখা দিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার আপনার প্রাণ-নিহিত বিষাদ-ক্ষোভে,—আত্মবিড়ম্বনার প্রতিশোধ-লইবার কামনায়, না হাণ্টের এই মঙ্গলজনক পরিবর্ত্তন উদ্দেশে, কোন দেব-পুরুষের উপদেশে, কে তাহা বলিবে?

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গবাসীর উপহার।—আমরা বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী স্বনাম-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুগ্রহ ও উদা-রতায়, কতকগুলি সুচারু-মুদ্রিত, সর্ব্বত্র-সমা-দৃত উপাদেয় পুস্তক উপহার পাইয়াছি। এখানে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত সে পুস্তক-গুলির নাম মাত্র উল্লেখ করিব—১। শ্রীরঘু-নন্দন-গোস্বামি-বিরচিত শ্রীরাম-রসায়ন। ২। ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক সর্ব্ব-শাস্ত্র-সমা-লোচক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন ক-র্ত্তৃক সরল ও সুখ-পাঠ্য বাঙ্গালায় অনুবাদিত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। ৩। মহাকবি ৺ঘন-রাম চক্রবর্ত্তি-কবিরত্ন-প্রণীত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল। ৪। বঙ্গানুবাদিত কাশীখণ্ড। ৫। বঙ্গানুবাদ-সমেত সংস্কৃত উৎকলখণ্ড। ৬। ৮ মুকুন্দরাম চক্র-বর্ত্তী প্রণীত শ্রীকবি-কঙ্কণ চণ্ডী। ৭। ভারত-চন্দ্রের গ্রন্থাবলী। ৮। যাটটি পালায় সম্পূর্ণ দাশরথি রায়ের সমগ্র পাঁচালী। ৯। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ফোক্‌লা দিগম্বর। ১০। শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামি-বিরচিত —গীতমালা। ১১। শ্রীভাগবতাচার্য্য-বিরচিত শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চকাধ্যায়। ১২। আরায়েশ মাহ-ফিল বা হাতেমতাই; প্রথম খণ্ড। ১৩। আরায়েশ মাহফিল বা হাতেমতাই; দ্বিতীয় খণ্ড। ১৪। কৌতুক-কণা। ১৫। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি কর্ত্তৃক সম্পাদিত,—পাঠান্তর ও উদ্ধৃত-শ্লোকাবলির স্থান-পরিচয়-সংবলিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল। ১৬। মডেল ভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস-চরিতামৃত প্রভৃতি উপ-ন্যাস-প্রণেতা কর্ত্তৃক বিরচিত, নেড়া হরি-দাস, দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৭। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী।

বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর সহিত আমাদিগের কোনরূপ পরিচয় নাই। ইহা আমাদিগে-রই দুর্ভাগ্য। কিন্তু পরিচয় না থাকিলেও, আমরা ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক দিকে যেমন বিশেষ-শক্তিশালী শব্দশিল্পী, আর এক দিকে

ও যুবতী উভয়েরই রূপ-প্রসঙ্গে, নানা স্থানে, নানা প্রকারে, কল্পনার অশ্রান্ত উত্তেজনা। গ্রন্থের যে স্থানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই স্থানেই প্রকৃতির শোভা অথবা রমণীর রূপ-চিত্র হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে; এবং সে সকল চিত্র অনেক স্থলেই চিত্তে প্রীতি জন্মাইবে। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা বলিবার আছে। স্বাদে যাহা অতি-মধুর, তাহা যেমন সময়ে সময়ে একটুকু বিস্বাদ বোধ হয়, কাব্যেও তেমন অতি-সুন্দরের চিত্রণ-চেষ্টা সময়ে সময়ে সামান্য একটুকু বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে। এই গ্রন্থের প্রথম তিন স্বর্গ, প্রায় সর্ব্বত্রই, অতি-সুন্দরের জন্য আয়াসের চিহ্নে চিহ্নিত;—এবং কোন কোন স্থান লালসার উৎকট ও অতি-স্ফুট বর্ণে লাঞ্ছিত। যথা,—গৈরিক-পরিহিতা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতা তাপস-বালা, তপোবন-বাসিনী দুঃখিনী সুনীতিরে দেখিয়া, কহিতেছেন,—

ফুল্ল ফুলে—পরিমলে না পূরিতে সাধ,
কে দলিল,—ঘটাইয়ে অলির বিষাদ।

এখানে পতি-প্রাণা সতী, দুঃখ-দগ্ধা সুনীতিই দলিত কুসুম, আর দয়া-ধর্ম্ম শূন্য সতী-প্রাণ-পীড়ক উত্তানপাদই ঋষি-বালার বিষাদিত অলি। ঋষি-বালা পবিত্র-হৃদয়া, তাই তাঁর প্রাণে, অবলার দুর্দ্দশা দর্শনে, দয়ার সঞ্চার হইতেছে। কিন্তু সে দয়া পাদ-দলিত অবলা, অর্থাৎ দলিত-কুসুমের জন্য নহে, কুসুম-পরিমল-বঞ্চিত অলির জন্য। গ্রন্থে অলির কথা ও কুসুমের কথা একটুকু বেশী। এক স্থানে আছে অলি তালে তালে নাচিতেছে। এরূপ বর্ণনা রস-স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন-জনক।

কিন্তু গ্রন্থ খানি তথাপি সুন্দর ও সুখ-প্রীতিকর। 'যশোকীর্ত্তি' ও 'দুর্ব্বোধ্য' প্রভৃতি দুই চারিটি অপপ্রয়োগ এখানে সেখানে পাঠকের চক্ষে ঠেকিবে। কিন্তু সে গুলি সম্ভবতঃ মুদ্রাকর-প্রমাদ।

২। মণি ও মুক্তা,—কাব্য,—শ্রীভুবনমোহন দাস-গুপ্ত-প্রণীত। কলিকাতা নব-ভারত প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির নাম মণি ও মুক্তা না হইয়া ফুলের সাজি হইলেই ভাল হইত। মণি ও মুক্তা মনুষ্যের মনোমোহন করে, রূপের ঝলমল চমকে; ফুলের সাজি যে মনুষ্যের মন ভুলায়, সে সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ আভায় ও সুশীতল সৌরভে। মণি ও মুক্তার প্রায় সমস্ত কবিতাই, আমাদিগের নিকট, বিষাদ-ছায়া-মলিন ফুলের মত, কেমন একটুকু নিষ্প্রভ অথচ নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে সুন্দর বোধ হইল। ভাব হৃদয়গ্রাহি, ভাষা সরল; এবং একটি কবিতার সহিত আর একটি কবিতার বিষয়-সম্পর্ক না থাকিলেও, প্রত্যেক কবিতাই, শিশির-সিক্ত ফুলের মত, করুণার অশ্রু-সিক্ত ও করুণ-রসময় আনন্দপ্রদ।

মণি ও মুক্তার কবিতা, নভোমণ্ডলে ঊর্দ্ধস্তরে উঠিয়া, মেঘের মত গর্জ্জে না;—মূর্চ্ছনা ও বিলম্পতের গভীর ঝঙ্কারে বিস্ময় জন্মায় না;—কিন্তু রামায়ণী মন্দিরার মত মৃদু মৃদু কাঁদে;—নিদাঘ-সন্তাপিত চাতকের ন্যায় মৃদু বিলাপে চিত্ত স্পর্শ করে। ভুবন-মোহন উচ্চশক্তিসম্পন্ন না হইলেও, স্বয়ং কবি। তাঁহার কণ্ঠ-স্বরে স্বর্গগত দীনেশচরণের সেই দুঃখ-গদ্‌গদ করুণ-স্বরের একটু সঙ্গতি উপলব্ধ হয়। ইহা নূতন লেখকের পক্ষে অসামান্য প্রশংসা।

আশীর্ব্বাদ।

"———it is twice blessed;
It blesseth him that gives and him that takes."

——দুই দিকে সুমঙ্গল,
যে দেয় তাহার পক্ষে যেমন মঙ্গল,
যে পায় তাহার পক্ষে তেমনি সুফল।

জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক,—সকল আশা পূর্ণ হউক,—তোমার জীবন সজ্জন-সেব্য সুখ-সম্পদে সংবর্দ্ধিত, এবং তোমার শক্তি ও সমৃদ্ধি মনুষ্যের মঙ্গল-সাধনে সার্থক হউক। এইরূপ প্রীতি-স্নেহপূর্ণ পীযূষ-শীতল বাক্যেরই নাম আশীর্ব্বাদ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহার অল্প বা অধিক প্রচলন আছে।

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা বন-জঙ্গলে, পর্ব্বতে কিংবা পাহাড়িয়া টিলায়, অথবা সভ্য-জগতের সুদূরবর্ত্তী দ্বীপ ও উপদ্বীপে অর্দ্ধবর্ব্বরের অবস্থায় বাস করে,—যাহাদিগের প্রকৃতিতে ছাগ, শৃগাল, সর্প ও মহিষাদির ভাগই একটু বেশী প্রকট,—যাহাদিগের চক্ষে নিকৃষ্ট বুভুক্ষা ও ক্রোধ-স্ফুরিত দৃষ্টি, এবং কণ্ঠস্বরে কড়-মড় গর্জ্জন ভিন্ন প্রায়শঃ আর কিছুই ফুটিবার অবকাশ পায় না, তাহারা অবশ্যই এক জনে আর এক জনকে আশীর্ব্বাদ করে না; বরং পারিলে, এক জনে আর এক জনের রক্তপাত করে। কিন্তু, যে সকল জাতীয় মনুষ্য শিক্ষা ও সভ্যতার পথে সামান্য মাত্রায়ও উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে জানে,—আশীর্ব্বাদ করিতে ভালবাসে, এবং এক জনে আর এক জনকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া আত্মায় একটুকু সুখ-শান্তি অনুভব করিয়া থাকে। পুত্র-কন্যা, পিতা মাতার নিকট আসিয়া, ভক্তির সহিত প্রণত হয়; পিতা মাতা, তাহাদিগের মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া, প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। *

যদিও আশীর্ব্বাদের প্রথা সুসভ্য মানব-জাতির সাধারণ সম্পত্তি, তথাপি সকলেই একথা জানেন, এবং সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমাদিগের এই ভারত-ভূমিতেই ইহার একটুকু বেশী প্রচলন। ভারতীয়

* এই প্রকার হস্তস্থাপন-সহকারে আশীর্ব্বাদ করা ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও এইক্ষণ বিশেষরূপে প্রচলিত। তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় এক জনের আত্মার প্রভাব অর্থাৎ Spiritual aura, এবং তড়িন্ময়ী জীবনী শক্তি, অর্থাৎ Electric vitality আর এক জনের শরীর ও মনে সঞ্চারিত হয়।

হিন্দুর পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান এক ভাগই পরস্পর-সম্পর্কে আশীর্ব্বাদ। বৃদ্ধ শৈবেরা, পুত্র-পরিজনের মঙ্গল-কামনায়, প্রতি দিন শিবের মাথায় বিল্বপত্র না দিয়া জলগ্রহণ করেন না। বৃদ্ধ বৈষ্ণবেরাও আবার, ঐরূপ আশীর্ব্বাদের ভাবে, স্বজনের কল্যাণে, নারায়ণের পাদপদ্মে সচন্দন তুলসী দান করেন। বিজয়ার উৎসব আশীর্ব্বাদের এক দেশ-ব্যাপি বিরাট উৎসব। দেশের ছোট ও বড়, কাঙ্গাল ও কোটীশ্বর, মূর্খ ও পণ্ডিত, দুর্জ্জন ও সুজন, সকলেই এই সময়ে কেমন এক অমায়িক প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়; এবং যে যাহাকে মর্ম্মঘাতী শত্রু বলিয়া বিদ্বেষ করে, সেও এই সময়ে তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া, বুকে টানিয়া লইয়া, আশীর্ব্বাদ করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসবও অকৃত্রিম ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদের এক আনন্দময় উৎসব। এই উৎসবের জন্য শরৎকালই চিরনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রানুমোদিত কাল। ইহারও একটুকু বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। বোধ হয়, যে জন্য শরতে অকাল-বোধন, সেই জন্যই শরতের অবসান-সময়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ-সম্ভাষণ। শরৎকাল, ভারতবর্ষে, বহুকাল হইতেই, কৃতান্তের ভয়াবহ ক্রীড়ার কাল বলিয়া পরিচিত। কেন না শরতেই ব্যাধির বিশেষ প্রভুত্ব এবং মৃত্যুর প্রভাব। বস্তুতঃ, শরৎ শব্দের এক অর্থ মৃত্যু আর এক অর্থ সংবৎসর। এই হেতু, আগে হায়ণ অর্থাৎ বর্ষগণনা হইত অগ্রহায়ণ হইতে, বর্ষসমাপ্তি হইত শরতের শেষভাগে, অর্থাৎ কার্ত্তিকে; এবং সকলেই সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিত,—তুমি একশত শরৎ জীবিত রহিও। কালিদাসের সময়েও শরৎ শব্দ সংবৎসর-বোধক অর্থেই সমধিক প্রচলিত। যথা রঘুবংশে,—

পৃথিবীং শাসতস্তস্য পাকশাসন-তেজসঃ
কিঞ্চিদূনমনূনর্দ্ধেঃ শরদাময়ুতং যযৌ।

কিন্তু, শরৎকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অথবা ভগিনীর আশীর্ব্বাদ-উৎসব শরৎ শব্দের বর্ষ-বাচক অর্থের উপলক্ষণ নহে; উহা স্পষ্টতঃই মৃত্যুবোধক অর্থের উপলক্ষণ। ইহার প্রমাণ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আর এক নাম যম-দ্বিতীয়া। ভগিনী, এই আশীর্ব্বাদের উৎসবে, সর্ব্বাগ্রে যমরাজের পূজা করিয়া থাকেন; তার পরে, যেন সেই যমের গ্রাস হইতে ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য, আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—

“ঢাক বাজে, ঢোল বাজে,
বাজে বীর-কাড়া,
আজ অবধি ভাইটি আমার
না যেয়ো যমের পাড়া।”

কোন কোন স্থানে এই মন্ত্রের পাঠ অন্য-রূপ। যথা,—

“ভাইয়ের কপালে দেই ফোঁটা,
যমের দুয়ারে দেই কাঁটা।”

কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আশীর্ব্বাদ যে ভার-তীয় সভ্যতার পুরাতন সময়েও ভ্রাতার আয়ুঃশক্তি-বৃদ্ধির জন্যই কল্পিত হইত, পুরাণাদি শাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভবিষ্য-পুরাণে এই আশীর্ব্বাদ-দ্বিতীয়ার বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠিরঃ।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেহর্চ্চিতঃ॥
অতো যমদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো নরৈঃ॥

পুনশ্চ যম-পূজা-মন্ত্রে,—

এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ পাশহস্ত,
যমান্তকালোকধরামরেশ,
ভ্রাতৃ দ্বিতীয়াকৃত-দেবপূজাং
গৃহাণ চার্ঘ্য ভগবন্নমস্তে॥

উল্লিখিতরূপ পারিবারিক উৎসবের প্রীতি-স্নেহময় গাম্ভীর্য্যে, এবং আশীর্ব্বাদের অমিয়-মাধুর্য্যে, এক সময়ে, এদেশে, হৃদয়ে হৃদয়ে, আনন্দের তাড়িত উৎস উথলিত। সে আনন্দ, এখনও নয়ন-জলে প্রবাহিত হইয়া, বর্ষ-সঞ্চিত বিকার ও বিদ্বেষ এক দিনে ধুইয়া ফেলিত; —ঈর্ষ্যার আগুন উহার স্পর্শমাত্রেই নিবিয়া যাইত; এবং আগুনের ভস্মাবশেষ, ভালবাসার সুরভি-সুকোমল, স্বর্গ-সুলভ কুসুমে পরিণত হইয়া, প্রকৃত হিন্দুত্বের মহিমা দেখাইত। কিন্তু এখন তাদৃক্ আশীর্ব্বাদের ভাষা কাহারও আর ভাল লাগে কি? আশীর্ব্বাদের আদান-প্রদানেও কাহারও আর তেমন প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় কি?

বস্তুতঃ, নব্য-ভারতের নূতন সভ্য, আশীর্ব্বাদে অতিমাত্র বিদ্বেষী না হইলেও, অবিশ্বাসী,—উহার অন্তর্নিহিত শক্তিতে তাঁহার আস্থা নাই; সুতরাং উহার জন্য মুহূর্ত্তমাত্র সময় ব্যয় করিতেও তাঁহার অবকাশ নাই। ভাইটি, বিলাত-ফেরত সাহেব না হইয়াও, সাহেবী বাবু,—চোখে চশমা, গায়ে চোগা, বুকে-চিত্তহারি চুলের চেন। তিনি কাছারীতে যাইবার জন্য ব্যস্ত,—‘অতএব কারণাৎ’ প্রণাম করিতে পারেন না। প্রণাম করিতে গেলে, পাছে মাথার শামলা স্খলিত, এবং সুচারু-বিন্যস্ত এলবার্ট সিঁতি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, এই ভয় সহজে দূর হইবে কেন? ভগিনীরও আশীর্ব্বাদ করিবার অবকাশ বড় অল্প। তিনি খাস গ্যাদারি কৌচের উপর আলুলিত-কেশে, আধো লম্বিত বিলসিত-বেশে, সখের উপন্যাস পড়িতেছিলেন, আর ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেছিলেন। তিনিও বা সে আমোদ পরিত্যাগ করিয়া আশীর্ব্বাদের অর্থশূন্য মন্ত্র পড়িতে উৎসাহিত হইবেন কি জন্য?

আশীর্ব্বাদ-প্রদান-বিষয়ে বৃদ্ধ দিগের মধ্যে এখনও এখানে সেখানে একটুকু প্রকৃত আগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃদ্ধা মাতা, বিশ্বাস-ভক্তি-পরায়ণ বৃদ্ধ গুরু, অথবা বৃদ্ধোপদিষ্ট বিজ্ঞ-বিচক্ষণ পুরোহিত, পুত্র কিংবা শিষ্য ও যজমানকে আশীর্ব্বাদ করিবার অভিলাষে, এখনও এ দেশে, স্থানে স্থানে চিত্তে যার-পর-নাই স্নেহময় উৎসাহ ও ঔৎসুক্য অনুভব করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহাদিগের দৃঢ় সংস্কার আছে যে, আশীর্ব্বাদ একবারে নিষ্ফলে যায় না। মনুষ্য যখন মনুষ্যকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করে, তখন আশীর্ব্বাদিত * ব্যক্তি

* যাহাকে আশীর্ব্বাদ করা যায়, তাহাকে, সর্ব্বজন-বোধ্য সরল ভাষায়, আশীর্ব্বাদিত বলা যাইতে পারে। আশীর্ব্বাদিত এই পদ

অবশ্যই কোন না কোন অপরিজ্ঞাত প্রাকৃত নিয়মে একটুকু উপকৃত হয়। সাধারণতঃ ইহার ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য আকুল, তাহাকে সহজে পাওয়া যায় কৈ? যদিই বা মুহূর্ত্তের তরে তাহার দর্শন-লাভ সম্ভবে, তথাপি তাহার হৃদয় ও মনকে আকর্ষণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় কৈ?

কিন্তু আমরা এখানে আজিকার শিক্ষাভিমানী সুখ-সৌখীন যুবক মাত্রকেই অতি গভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আশীর্ব্বাদের কিছুই কি অর্থ কিংবা সার্থকতা নাই? কিছুই কি মূল্য নাই? শুনিয়াছি রাম, ও কৃষ্ণ প্রভৃতি সহস্র-কোটি-হৃদয়-পূজিত দেব-পুরুষেরা, এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও মাথা নোয়াইয়া আশীর্ব্বাদ লইতেন,—গুরুজনের আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য লালায়িত রহিতেন। শুনিয়াছি অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিশ্বরী অমল-হৃদয়া ভিক্টোরিয়া, অনেক সময়ে, অতি কাতর কাঙ্গালিনীর মত, পূজাস্পদ ব্যক্তির নিকট হইতে করপুটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন। আশীর্ব্বাদ যদি একবারেই অন্তঃসারশূন্য কথা হইত, তাহা হইলে, উহার জন্য, তাদৃশ মহানুভবদিগের হৃদয়ে তেমন আগ্রহ জন্মিবার সম্ভাবনা হইত কি? মনে কর, আশীর্ব্বাদ-প্রথার অর্দ্ধেকই যেন ভুল। কিন্তু, স্তূপীভূত আবর্জ্জনার মধ্যে, দুই একটি সুগন্ধি-সুন্দর ফুলের পাতার মত, ভুলের মধ্যেও সত্যের ছিটা ফোঁটাটা পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না কি? সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ইউরোপ যাঁহাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রকৃতই তত্ত্ব-গুরু বলিয়া পূজা করিয়াছে, সেই সূক্ষ্মার্থ-দর্শী বৈজ্ঞানিক বড়ই ধীরতার সহিত বলিয়াছেন যে, যাহা অতি মন্দ, তাহার মধ্যেও ভালর অংশ আছে; এবং যাহা একান্ত ভ্রমাত্মক, তাহার মধ্যেও সত্যের অংশ আছে।* কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতে পাইয়াছি, তাহাতে জানি, আশীর্ব্বাদের আগা গোড়া প্রায় সকলই ভাল, এবং উহাতে ভ্রমের অংশ বড় কম।

আশীর্ব্বাদ কি? তোমার মঙ্গল হউক, মনুষ্য-চিত্তের এই ঘনীভূত চিন্তা এবং মনুষ্য-হৃদয়ের এই ঘনীভূত প্রীতি-স্নেহময় পবিত্র ভাবই প্রকৃত আশীর্ব্বাদ। এই জন্যই, আশীর্ব্বাদের প্রসাদে, অনেকে দুশ্চিকিৎসা রোগ হইতে সহসা আরোগ্য লাভ করিয়া মনুষ্যের বিস্ময় জন্মায়, †—দুর্ব্বল বলীয়ান্ হয়,—

তিঙন্ত-নাম-ধাতু-প্রক্রিয়া অনুসারে সুসিদ্ধ। অপিতু, "তৎকরোতি তদাচষ্টে" এই পুরাতন ও প্রচলিত পাণিনীয়-গণ-সূত্র ঈদৃশ অসংখ্য আবশ্যক শব্দের অক্ষয় প্রস্রবণ।

*"We too often forget that not only is there 'a soul of goodness in things evil,' but very generally also, a soul of truth in things erroneous." First Principles, by Herbert Spencer.

† "The positive pole of this principle is that thought, which disorders, can order; that ideas, which enfeeble can strengthen * * * Medical practice knows hosts of

দুঃখ-সন্তাপ-দগ্ধ দয়ার ভিখারী হৃদয়ে শান্তি ও শক্তি লাভ করে, এবং সুজনের আশার তরী, সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ-প্রহারে ডুবু ডুবু হইয়াও, পুনরায় ভাসিয়া উঠে।

যাহারা ইট কাঠ, কাঁসা তামা, অথবা জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড় বস্তুকেই জগতের সারাৎসার সত্য অথবা সার বস্তু মনে করে, তাহারা আশীর্ব্বাদ-তত্ত্বের গূঢ় রহস্য সহজে বুঝিতে পারিবে এমন বোধ হয় না; বুঝিতে পারিলেও বুঝিতে চাহিবে না। কারণ, মনুষ্যের বুদ্ধি যখন অভিমানের আবর্ত্তে পড়িয়া একটা বিকট বিকৃতি লাভ করে, তখন আর উহাতে আলোক-পাতেরও সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, যাঁহারা স্বয়ং সাধনা করিয়া, অথবা গুরু-বাক্যের উপর নির্ভর করিতে শিখিয়া, তত্ত্ব-চিন্তার পথ পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন, এবং তাঁহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্যের হৃদয় ও মন অথবা হৃদয়ের ভাব ও মনের চিন্তা, ইট, কাঠ ও জল, অগ্নি প্রভৃতি জড় বস্তু হইতে সহস্রগুণ অধিক সারবৎ বস্তু, এবং সুতরাংই সহস্র গুণ অধিক শক্তি-সম্পন্ন।

এই বিশ্বজগতে, জড় বস্তুর মধ্যে, আলোক ও বিদ্যুতেরই একটুকু বিশেষ মহিমা। আলোক, সূর্য্যমণ্ডল হইতে শুভযাত্রা করিয়া, আট সেকেণ্ডে ভূমণ্ডলে আসিয়া পৌঁছে; এবং বিজলী, আঁখির পলক পড়িতে না পড়িতে, আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে যাইয়া রূপের চমক অথবা শক্তির মহিমা দেখায়। কিন্তু মনুষ্যের চিন্তা আর ভাব উহা হইতেও দ্রুত উড়িয়া যায়,—এবং যে কার্য্যে প্রেরিত হয়, দৃঢ়লগ্ন জড়-শক্তির ন্যায়, সেই কার্য্য সম্পাদনে রত রহে। আলোক ও বিদ্যুতের শক্তি দেখিতে না দেখিতেই বিলুপ্ত অর্থাৎ রূপান্তরে বিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু চিন্তা আর ভাবের শক্তি চিরস্থায়ি পদার্থের ন্যায় পরিণাম ফলায়। তুমি এলাহাবাদে বসিয়া রহিয়াছ; তোমার অনুজ অথবা আত্মজ, আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে রহিয়া, জীবনের কার্য্য করিতেছে। এলাহাবাদ হইতে তাঁহাদিগের নিকট টেলিগ্রাম পাঠান অসাধ্য না হইলেও কঠিন; কিন্তু আশীর্ব্বাদের আয়ুঃপ্রদ শক্তি-প্রেরণ যার-পর-নাই সহজ। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, তুমি তোমার এলাহাবাদের কুটীরে বসিয়া প্রগাঢ়-মনঃসন্নিবেশের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলে, সে আশীর্ব্বাদ অমনিই তোমার ভ্রাতা কিংবা পুত্রের নিকট

instances of such miracles of healing wrought, under the inspiration of a great joy, a great hope, a new creative thought, a regenerative rush of feeling. * * * A great change is coming over the minds of medical men concening this truth. Its recognition is now spreading rapidly through the profession."

Dr Heber Newton.

"Psycholigic biology proves, that mind governs organic tissue and physiologic function, because it creates them and constitutes their life.

Professor Elmer Gates.

আমেরিকায় যাইয়া পহুঁছিবে,* এবং তাহারা যে অবস্থায় থাকুক, উহা তখন নিশ্চয়ই তাহাদিগের হৃদয়ে একটু অননুভূত আনন্দ এবং প্রাণে একটু শক্তির স্ফূর্ত্তি জন্মাইবে।

ভক্তিপূত জ্ঞানি-পুরুষেরা, এই নিমিত্ত, উপদেশ করেন যে, যাহাকে ভালবাস, তাহাকে কখনও আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিও না। হীরা-মণি ও স্বর্ণ-রজত-বিরচিত শোভন-সামগ্রী উপহার দিয়া চিত্তসন্তর্পণ করা, সকলের পক্ষে এবং সকল সময়ে, সম্ভব-পর না হইতে পারে। কিন্তু প্রাণভরা ভালবাসার আশীর্ব্বাদ-দানে কৃপণতা করিবে কেন? আর,—যদি পার,—যদি আত্মার শক্তিতে কুলায়,—তাহা হইলে শত্রু মিত্র সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিও। মনুষ্যমাত্রই চরম-সম্বন্ধে মনুষ্যের পরম বান্ধব। যাহাকে অদ্য পর মনে করিতেছ, সে হয়ত কল্য তোমার প্রাণপ্রিয় সুহৃৎ হইবে,—যাহাকে এইক্ষণ মন্দজ্ঞানে ঘৃণা করিতেছ, তাহাকে হয়ত এক সময়ে মহাপুরুষ জ্ঞানে পূজা করিতে শিখিবে,—এবং সকলেই সম্মুখবর্ত্তি অনন্ত কালের কোন এক অধ্যায়ে একে অন্যের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যাইবে। ইহাই মনুষ্য জীবনের মঙ্গল্য নিয়তি। সুতরাং সকলেই সকলের আশীর্ব্বাদের পাত্র,—সকলেই সকলের নিকট আশীর্ব্বাদ পাইতে অধিকারী।

এইরূপ উদারতা একান্ত অসম্ভব হইলেও, আপনার জনকে নিত্য-নিয়মিত প্রণালীতে সতত আশীর্ব্বাদ করিয়া, হৃদয়ে আশীর্ব্বাদের সঞ্জীবনী শক্তি পোষণ করিতে শিখিও। যে মনুষ্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক আবেগে জগতে ভালবাসারই অমৃত বিলায়, তাহার জীবন, সময়ে সময়ে, দুঃখ-দুর্ভোগের দীর্ঘকাহিনীর মত প্রতীয়মান হইলেও, পরিণামে একবারে বিফলে যায় না। যে কর্ত্তব্য-বোধে আশীর্ব্বাদ করিতে শিখে, তাহার জীবনও অতি-দীর্ঘকাল অন্তঃসার শূন্য রহে না। কারণ, ঐ আশীর্ব্বাদ-দানের মানসিক প্রক্রিয়া বলেই তাহার মনঃশক্তি কর্ম্ম-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হইতে অভ্যস্ত হয়;—তাহার হৃদয় ও মন, বহির্জ্জগতের জড়-প্রাচীর ভেদ করিয়া, সূক্ষ্মতর অধ্যাত্ম-জগতে প্রবেশের পথ পায়। কিন্তু ধিক্ তাহাদিগকে, যাহারা মনুষ্যকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া অভিসম্পাত করে। আর শত বার—শতসহস্র বার ধিক্কার তাহাদিগকে, যাহারা, সদনুষ্ঠানের দ্বারা, মনুষ্যের আশীর্ব্বাদ সংগ্রহের জন্য যত্নপর না রহিয়া, পিশাচের মত, পরের প্রাণে আঘাত করিতে উৎসুক রহে,—পরের আহত-প্রাণ-সমুদ্গীর্ণ প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসেও যেন অস্পৃষ্টবৎ রহে।†

শ্রীমৎকল্যাণভট্ট শর্ম্মণঃ।

* "Ether vibrations have power and attributes abundantly equal to any demand—even the transmission of thought." Sir William Crookes.

† Many a man has been made sick by having the ill thoughts of a number of people centred upon him; some have been actually killed.

Ralph Waldo Trine.

হীরার আংটী।

(ক্ষুদ্র উপন্যাস)

(১)

মিবারের অধীন ভূম্যধিকারী, সোলাঙ্কি-রাজবংশ-সম্ভূত, বিদ্রোহী বীরবল সিংহ, আজ তিন দিবস হইল, মিবারের সৈন্যদলের নিকট সসৈন্যে ও সশস্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার রামপুর নগরের নূতন দুর্গের প্রায় সমস্ত অংশ রাণার নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রসিংহের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু দুর্গের অভ্যন্তরস্থ অন্তঃপুরের অবরোধ এখনও শেষ হয় নাই। কেন না, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ এখনও আত্মসমর্পণ করেন নাই। জিতেন্দ্রসিংহ বৃদ্ধ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমণীগণের এ অকারণ প্রতিযোগিতায় কি ফল, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

বীরবল উত্তর করিলেন, "যাহা আমার বুদ্ধ্যাতীত, তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করা বৃথা। আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না, অন্তঃপুরের লৌহকপাট ভিতর হইতে বন্ধ করেছে। আমি ইচ্ছা কর্‌লেও অন্তঃপুরে যেতে পারি না ও নারীগণকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারি না।" জিতেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "তবে আমি আমার সেনাদলকে লৌহকপাট ভাঙ্গিতে আদেশ করি। যাতে রমণীগণের প্রতি বৃথা বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন ক'রবেন।"

"আপনার যেরূপ অভিরুচি। আমি এখন আপনার বন্দী মাত্র।"

জিতেন্দ্রসিংহ কতিপয় সৈনিকসঙ্গে দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতে লৌহকপাট ভাঙ্গিয়া গেল। পাছে সেনাগণ অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, এই আশঙ্কায় সেনাপতি তাহাদিগকে আপন আপন শিবিরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তিনি একাকী লৌহদ্বারের অপর দিকে আসিলেন। কিন্তু দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ চমকিয়া সেই খানে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে চঞ্চল সৌদামিনীর ন্যায় রমণীমূর্ত্তি দীর্ঘ অসিহস্তে সম্মুখে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। জিতেন্দ্র আপন তরবারি কোষমুক্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সবিস্ময়ে সেই চঞ্চলা, অধীরা, রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণীও তাঁহাকে দেখিয়া, চমকিয়া পশ্চাতে সরিয়া, উত্থিত অসি ভূতলে প্রোথিত করিয়া বলিল, "হায়! এ কি? তুমি?"

জিতেন্দ্র বলিলেন "আপনি কি আমাকে চেনেন?"

রমণী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "তুমি কোন্ সাহসে, একাকী আমা-

দের অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে সাহস ক'রেছিলে ?"

"আপনি কি জানেন না, রাণার আদেশ অনুসারে আমি বিদ্রোহী বীরবলের নূতন দুর্গ অধিকার ক'রেছি।"

"আমার পিতা বীরবল সিংহ, আমার জন্য এই স্বতন্ত্র অন্তঃপুর ও ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্বতন্ত্র বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ ক'রেচেন। এতে তোমার রাণার কি অধিকার ?"

"সে বিষয়ের মীমাংসা রাণা স্বয়ং কর্‌বেন। আমি কেবল তাঁর আদেশ প্রতিপালন কর্‌তে এসেছি।"

"তবে তুমি কি প্রকারে আমার এ অন্তঃপুর অধিকার কর্‌বে ?"

জিতেন্দ্র বলিলেন "সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক অধিকার কর্‌ব।"

রমণী মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "তুমি বড় মূর্খ। যদি সহজে অধিকার কর্‌বার হ'ত, তা হ'লে কি আমি এত দিন রণসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে দ্বাররক্ষা কর্‌তেম ? নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে রমণী কোন্ কালে তরবারি ধারণ করে ? তবে কি প্রকারে, আমার দুর্গ অধিকার কর্‌বে, কর।"

জিতেন্দ্র উত্তর করিলেন, "নারী ও শিশুর প্রতি নিতান্ত আবশ্যক না হ'লে বলপ্রয়োগ কর্‌তে রাণার নিষেধ আছে।"

"আর নিতান্ত আবশ্যক হ'লে কি কর্‌বে ? আমি যখন তরবারি হস্তে তোমার নিকটে এসে তোমার বক্ষঃস্থলে তরবারি প্রহার কর্‌তে এলেম, কই, তখনওতো আত্মরক্ষার জন্য তোমার কোষবদ্ধ তরবারি কোষমুক্ত কর্‌বার সাহস হ'ল না ?"

"আমি আপনাকে দেখে সহসা আত্মহারা হয়েছিলেম।"

"এখন তো আত্মসংবরণ কর্‌তে পেরেছ ? তবে তরবারি খোল। আমি সঙ্কল্প ক'রেছিলেম, আমার জীবনসত্ত্বে কেহ আমার দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বে না।"

জিতেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "অসম্ভব ! যদি আপনি তরবারি প্রহারে আমার এ শরীর শত খণ্ডে বিভক্ত করেন, তবুও আমি আপনার অই পারিজাতসুকুমার দেহ স্পর্শ কর্‌তে পার্‌ব না !"

রমণী হাসিয়া বলিল "তবে কি এ দুর্গ অধিকার না ক'রে ফিরে যাবে ? রাণাকে কি উত্তর দিবে ?"

জিতেন্দ্র বলিলেন "আজ আমি ক্ষত্রধর্ম্মে পতিত হলেম। রাণা সংগ্রাম সিংহের নিকট বিশ্বাসঘাতক হলেম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে, আমার এ ঘোর অপরাধের জন্য উপযুক্ত দণ্ড ভিক্ষা কর্‌ব। আপনি আপনার অন্তঃপুরে ফিরে যান। আমার দুর্গ অধিকারের সাধ শেষ হ'ল। আজ আমার বীরগৌরবের শেষ অভিনয় হ'ল।"

রমণী উত্তর করিল "আমি তোমাকে এই মাত্র বল্লেম, আমি সঙ্কল্প করেছিলেম যে, আমার জীবনসত্ত্বে কেহ আমার এ দুর্গ বলপূর্ব্বক অধিকার কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু তখন কি জান্‌তেম যে, তুমি এতবার

পরে আমার প্রতিযোগিতায় এখানে এসে দাঁড়াবে ? তোমাকে দেখেই আমি আমার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ ক'রেছিলেম। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে পতিত হবার পূর্ব্বেই আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পাপে পতিতা হ'য়েছি। তবে এখন আমার দুর্গ তোমারই অধিকৃত হ'ল।"

জিতেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমাকে চেনেন ? আমাকে কি পূর্ব্বে কোথাও দেখেছেন ?"

রমণী জিতেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "কি জিজ্ঞাসা কর্‌লে ? তোমাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছি ? হায় ! তুমি জান না, আমি তোমাকে কতবার, কত সহস্রবার দেখেছি।"

জিতেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় ?"

রমণী আবার অতৃপ্তলোচনে, ব্রীড়াসঙ্কুচিত কটাক্ষে, জিতেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল "কোথায়, তা জানি না। এ জন্মে, কি পূর্ব্ব জন্মে, জাগ্রতে, কি স্বপ্নে, তাও বল্‌তে পারি না। কিন্তু তোমাকে শত শতবার দেখেছি। না জানি, কত দিন পরে, আজ আবার তোমাকে এখানে দেখ্‌লেম। সে যা'হোক্, এখন তো আমি তোমার বন্দী হ'লেম। আমাকে আমার পিতার সঙ্গে উদয়পুরে লয়ে যাবে, তা জানি। কিন্তু যখন রাণা সংগ্রামসিংহ জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন, দুর্গ কি প্রকারে অধিকার কর্‌লে, তখন তাঁকে কি উত্তর দিবে ?"

পশ্চাৎ হইতে কে জলদগম্ভীর স্বরে বলিল "রাণা সংগ্রাম সিংহকে আর কিছু বল্‌তে হবে না। সে স্বচক্ষে সমস্ত দেখেছে, সমস্ত শুনেছে।

জিতেন্দ্র সিংহ দেখিলেন, ভগ্ন তোরণের পার্শ্বদেশে, ছদ্মবেশে দাঁড়াইয়া, মহারাণা সংগ্রাম সিংহ !"

(২)

রাণা সংগ্রামসিংহ ও মন্ত্রী বিহারী দাস মন্ত্রণাভবনে উপবিষ্ট। রাণা বলিলেন, "মন্ত্রীবর, বিদ্রোহী বীরবলের বিচার পরে হবে। সে আমার কাছে করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছে। আমি তাকে আপাততঃ সপরিবারে উদয়পুরে থাক্‌তে আদেশ ক'রেছি। আজ আমি নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রের অপরাধের দণ্ডবিধান কর্‌ব !"

রাণা জিতেন্দ্রসিংহকে আনিবার জন্য প্রহরীর প্রতি আদেশ করিলেন, জিতেন্দ্র সিংহ রাণার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সংগ্রাম সিংহ তাহার সুকুমার মুখমণ্ডল ও সুদীর্ঘ বীরদেহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "নবীন সেনাপতে ! তোমার যে অপরাধের বিচারে আজ আমরা প্রবৃত্ত হ'য়েছি, তা তুমি জান। বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হ'য়ে, তোমার রাজার আদেশ অবহেলা ক'রে, তুমি যুদ্ধকালে নারীর কটাক্ষে মুগ্ধ হ'য়েছিলে। তোমার এ অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক।"

জিতেন্দ্রসিংহ যুক্তকরে উত্তর করিল, "আমিই স্বয়ং মহারাণার নিকট দণ্ডাজ্ঞা ভিক্ষা কর্‌ছি। আমি জানি, আমার মত কাপুরুষের জন্য অতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা আবশ্যক। আপনি

যে কোন দণ্ডবিধান কর্‌বেন, আমি সানন্দ-চিত্তে গ্রহণ কর্‌ব।"

সংগ্রামসিংহ বলিলেন, "তবে শুন। তুমি যে যুবতীর কমলনয়নের কটাক্ষপাতে আত্ম-হারা হ'য়েছিলে, যত দিন সে যুবতী যৌবন ও প্রৌঢ়কাল অতিক্রম ক'রে, বার্দ্ধক্যদশায় উপনীতা না হয়, তার সে উজ্জ্বল নয়নযুগল জ্যোতিহীন না হইয়া যায়, তার সে কুসুম-সুকুমার মুখমণ্ডল কোন রাজপুত যুবকের মন হরণে অসমর্থ হইয়া না উঠে, এবং তার সে কোমল বাহুলতা শুষ্ক ও বিবর্ণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের গ্রীবাবেষ্টনের অনুপযুক্ত না হইয়া পড়ে, তত দিন তোমাকে একাকী নির্জ্জন কারাগারে জীবনযাপন কর্‌তে হবে।"

রাণা ও মন্ত্রী সবিস্ময়ে দেখিলেন, জিতেন্দ্র সিংহ এ নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া কিছু মাত্র বিচলিত হইল্ না। তাহার মুখমণ্ডলে অণু-মাত্র বিষাদ-চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। সে স্থির গম্ভীর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া রাণার কঠোর দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল।

বিহারীদাস বলিলেন, "মহারাজ! আজ লঘু পাপে এ গুরুদণ্ডবিধান কেন কর্‌চেন, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

রাণা মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "লঘু পাপ!"

বিহারীদাস বলিলেন, "ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কর্‌বেন! মহারাণা স্বয়ং নিজের কিশোর জীবন স্মরণ ক'রে দেখুন।"

রাণা মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রীবর! যদি তোমার মতে লঘু পাপ হয়, তবে এ গুরুদণ্ডের পরিবর্ত্তে লঘুতর দণ্ড প্রয়োগ কর্‌চি। শুন, নবীন সেনাপতে! আমি আজি পর্য্যন্ত কখনও আমার মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী বিহারী দাসের পরামর্শ অবহেলা করি নাই। সেই জন্য তাঁরই পরামর্শ মত আমার পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্ত্তে নূতন আদেশ দিচ্চি। যত দিন তোমার সেই মনোমোহিনী রমণী অন্য কাহারও সঙ্গে পরিণীতা না হয়, তত দিন তোমাকে নির্জ্জন কারাবাসে একাকী থাক্‌তে হবে। তবে এখন যাও। প্রহরিগণ তোমাকে তোমার কারাবাসের স্থান দেখিয়ে দিবে।"

জিতেন্দ্রসিংহ সসম্ভ্রমে রাণাকে অভি-বাদন করিয়া প্রহরিগণের সঙ্গে চলিয়া গেল।

(৩)

সংগ্রামসিংহ সহাস্যমুখে বিহারী দাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মন্ত্রীবর! আমি এ নবীন সেনাপতির প্রতি যে দণ্ডবিধান কর্‌লেম, তা শুনে তুমি বিস্মিত হ'য়েছ, সন্দেহ নাই।"

বিহারী দাস উত্তর করিলেন, "কেন বিস্মিত হ'য়েছি, তা নয়। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আপনার এ অপূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা শুনে যারপর নাই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হ'য়েছি। আমার মতে আপনি যদি এই কিশোর ক্ষত্রিয়কে সামান্য অপরাধ ক্ষমা কর্‌তেন, তা হ'লে আপনার ভুবনবিদিত মহত্ত্বেরই পরিচয় দিতেন। কন্দর্পের তীক্ষ্ণ শরাঘাতে কোন্ যুবকের হৃদয় ক্ষণকালের জন্য বিচলিত হয়? আজ আমি যা দেখ্‌লেম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার যাবতীয় ক্ষত্রিয় সৈন্য-গণের মধ্যে এই নবীন যুবকের মত

আর কেহ নাই। আজিকার রাজপুতানাব্যাপী এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, এই বীর যুবক কারা-বাসে না থেকে, যদি অসিহস্তে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাক্‌ত, তা হ'লে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মিবারের গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'ত।"

সংগ্রামসিংহ বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু কি জন্য আমি আজ এ অপূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা বিধান কর্‌লেম্, তার কারণ জান্‌তে পার্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, এতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই!"

"কি কারণ? অনুমতি করুন।"

"তবে সত্য কথা তোমাকে বলি। আমি মনে মনে স্থির ক'রেছি, আমি স্বয়ং বীর-বরের সুন্দরী দুহিতার পাণি গ্রহণ কর্‌ব।"

বিহারী দাস চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার আসন পরিগ্রহ করিয়া সংগ্রামসিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হ'লেম। আপনি আমার সঙ্গে আজ বিদ্রূপ কর্‌চেন কি না বুঝ্‌তে পার্‌চি না।"

"কেন মন্ত্রীবর! এতে আবার বিস্ময়ের বিষয় কি? তুমিই তো আমাকে এই মাত্র বল্লে, মন্মথের তীক্ষ্ণশরে কার না হৃদয় বিদ্ধ হয়?"

বিহারী দাস যেন আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "মহারাণার পরিণয় উৎসবের উপ-যুক্ত সময় বটে। উদয়পুরের সিংহদ্বারে শত্রুদলের বিজয়ভেরী, যবনের ক্ষত্রিয়-শোণিতপিপাসু তরবারির ঘোর ঝন্‌ঝনা রব, মিবারের অবশ্যম্ভাবী অন্ধকার দর্শনে মহা-রাষ্ট্র-দস্যুর অট্টহাসি,—মহারাণার বিবাহ-উৎসবের আনন্দধ্বনির এমন উপযুক্ত সময় আর কবে হবে?"

রাণা বলিলেন "ভগবান্ কন্দর্পের মান-সোৎসবের কি সময় অসময় আছে?"

বিহারী দাস বলিলেন, "আপনিই কেন একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখুন না, এক মহিষী সত্ত্বে পুনরপি দারপরিগ্রহ করা কি রাজনীতিবিরুদ্ধ নহে? আপনার স্বর্গীয় পিতামহ মহারাণা জয়সিংহের কথা একবার মনে ক'রে দেখুন। দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে তাঁর সে অতুল গৌরবময় রাজ্যশাসনেও কি বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল।"

রাণা উত্তর করিলেন "হা! ধিক্ মন্ত্রীবর! সেই পূর্ণশশীর সঙ্গে আমার মত খদ্যোতের তুলনা?"

বিহারী দাস বলিলেন "মহিষী কর্ণাবতী কি আপনার এ প্রস্তাবে সম্মতা হয়েছেন?"

রাণা আবার মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "দেবী কর্ণাবতী এ বিবাহে সম্মতা হবেন কি না, পরে তোমাকে সে কথা বল্‌ব। এখন তুমি বিশ্রাম কর।"

বিহারী দাস বিষণ্ণবদনে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

রাণা এক জন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "একবার পরিচারিকা চন্দ্রকলাকে আমার নিকটে একাকিনী আস্‌তে বল। তাকে বল, তার সঙ্গে আমার অতি প্রয়োজনীয় কথা আছে।"

চন্দ্রকলা রাজমহিষী কর্ণাবতীর প্রিয় সহচরী। যে দিন কর্ণাবতী বিবাহের পর পিত্রালয় হইতে উদয়পুরে আসিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসর-কাল চন্দ্রকলা তাঁহার চিরসঙ্গিনী। চন্দ্রকলা অতি চতুরা ও বুদ্ধিমতী রমণী বলিয়া, রাজ-অন্তঃপুরে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রকলা ভৃত্যের সঙ্গে রাণার নিকটে আসিল। রাণা ভৃত্যকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, চন্দ্রকলার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাধিরাজ সংগ্রামসিংহের সঙ্গে একজন সামান্যা পরি-চারিকার নির্জ্জনে, গোপনে, কি কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, আমি তাহা জানি না। অনেক ক্ষণ পরে, চন্দ্রকলা অন্তঃপুরে ফিরিয়া গিয়া মহিষী কর্ণাবতীর কানে কানে কি বলিল। কর্ণাবতী উচ্চহাস্য করিয়া, তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিলেন।

(৪)

অচিরাৎ উদয়পুরের চারিদিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল যে, বীরবলের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে রাণা সংগ্রামসিংহের মহাসমারোহে বিবাহ হইবে। নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্র-সিংহের নির্জ্জন কারাগারেও প্রহরিগণ এ শুভসংবাদ ঘোষণা করিল।

আজ এক সপ্তাহ হইল, উদয়সরোবরের পার্শ্ববর্ত্তী পুরাতন প্রস্তর-ভবনে জিতেন্দ্র-সিংহ অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি সন্ধ্যার সময় একাকী গবাক্ষদ্বারে বসিয়া অস্তগামী তপনের রক্তিম মূর্ত্তির সঙ্গে উদয়সরের সফেণ, শতবর্ণে রঞ্জিত, চলোর্ম্মিপুঞ্জের আনন্দলীলা দেখিতেছিলেন। হঠাৎ কারা-গারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একজন রমণী কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিল। জিতেন্দ্র সিংহ দেখিলেন, চন্দ্রকলা। চন্দ্র-কলা হাসিতে হাসিতে বলিল "জিতেন্দ্র সিংহ! আমি তোমার জন্য শুভসংবাদ ল'য়ে এসেছি।"

"আমি কারাগারবাসী, অপরাধী বন্দী, আমার আবার শুভসংবাদ কি?"

"আমি তোমাকে কারাগার হ'তে মুক্ত কর্‌তে এসেছি।"

"কি প্রকারে, কার অনুমতিতে তুমি আমাকে কারামুক্ত কর্‌বে?"

চন্দ্রকলা বলিল "রাজমহিষী কর্ণাবতীর আদেশে। এই দেখ, তোমার জন্য স্ত্রীলো-কের পরিধেয় বসন এনেছি। এটি আমার বসনের মত। আর এই দেখ, এই লাল কাগজে কারাগারে প্রবেশ কর্‌বার এখান হ'তে ফিরে যাবার অনুমতি-লেখা আছে। একটু অন্ধকার হ'লেই, তুমি আমার এই নারীর বসন পরিধান ক'রে আর এই নিদর্শন-পত্র হাতে ল'য়ে বাহির চ'লে যাবে। কেহ তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে না। তার পর তুমি অনা-য়াসেই যেখানে ইচ্ছা, পলায়ন কর্‌তে পার্‌বে।"

জিতেন্দ্র সিংহের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি বলিলেন "আমি কারাগার হ'তে পলায়ন ক'রলে, মহিষী কর্ণাবতীর

লাভ?" চন্দ্রকলা বলিল "তাও তুমি এখনতক জান না। রাণা যে তোমাকে এই কারা-গারে বন্ধ ক'রে, ঘোষণা ক'রেচেন যে, তিনি স্বয়ং বীরবলের সুন্দরী কন্যা অম্বা-লিকাকে বিবাহ ক'র্‌বেন। চারিদিকে বিবা-হের নানাবিধ উদ্যোগ হচ্চে। কিন্তু তুমি তো জান, অম্বালিকা তোমাকে বই আর কাহাকেও বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা করে না। কিন্তু রাণা তার রূপ দেখে, তাঁর এই প্রৌঢ়-বয়সে এতই মোহিত হ'য়েচেন যে, তিনি স্থির ক'রেচেন, যেমন ক'রেই হোক্ তিনি অম্বালিকাকে বিবাহ ক'র্‌বেন। মহিষীর তো প্রতিজ্ঞা, তিনি কোন মতেই এ বিবাহ হ'তে দিবেন না। তাই তিনি আমাকে এই সঙ্কেতচিহ্ন, আর এই নারীর বসন দিয়ে, তোমার নিকটে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি এই কারাগার হ'তে বাহিরে এলেই, তোমাকে সঙ্গে ল'য়ে গিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে একটি অতি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখ্‌ব। কেহ কিছুই জান্‌তে পার্‌বে না। তারপর অম্বালিকাকে গোপনে তোমার কাছে ল'য়ে আস্‌ব। তখন তুমি তোমার প্রণয়িনীকে সঙ্গে ল'য়ে, দূর দেশে পলায়ন ক'রে, তাকে বিবাহ করতে পার্‌বে। রাণার প্রৌঢ় বয়সের মনের সাধ মনের ভিতরেই থেকে যাবে। আর এই দেখ, মহিষী তোমার জন্য কত মণিরত্ন পাঠিয়ে দিয়েচেন।"

চন্দ্রকলা বসনের মধ্য হইতে বহুসংখ্যক মহামূল্য রত্ন মাণিক্য বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, এই সকল অমূল্য জিনিস মহিষী তোমাকে আর তোমার প্রণয়িনীকে উপঢৌকন দিয়েচেন। এতে চিরকাল তোমরা দুজনে পরম সুখে জীবন যাপন ক'র্‌তে পার্‌বে। আর তিনি আমাকে ব'লেচেন—"

জিতেন্দ্র সিংহ সরোষে অধর দংশন করিয়া, সবলে ভূতলে পদাঘাত করিয়া বলি-লেন "ক্ষান্ত হও দুশ্চারিণি! অনেক হ'য়েছে। আমি বহুক্লেশে এতক্ষণ আত্মসংযম ক'রেছি। তুমি অবলা রমণী না হ'লে, এতক্ষণে পদাঘাতে তোমার অস্থি চূর্ণ কর্‌তেম। এখন এখান হ'তে প্রস্থান কর। মহিষীকে বলিও, 'শক্তাবত' ক্ষত্রিয়বংশের পবিত্র শোণিত আমার ধমনীতে প্রবাহিত। তিনি কি মনে করেন, আমি এতই নীচাশয় যে, মণিরত্নের লোভে, আর রমণীর প্রণয়-লালসায়, রাণার বিনা আদেশে, চোরের ন্যায় কারাগার হ'তে পলায়ন ক'র্‌ব।"

চন্দ্রকলা উত্তর করিল "তা আমার উপর অকারণ এত রাগ কর্‌চো কেন? তুমি যা ব'ল্‌লে, আমি মহিষী কর্ণাবতীর নিকটে গিয়ে, তাঁকে ব'ল্‌চি।

চন্দ্রকলা বাহিরে যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। জিতেন্দ্র তাহাকে পুনরপি সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শুন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ইচ্ছা করি। সোলাঙ্কিদুহিতা অম্বালিকা কি আমার সঙ্গে পলায়ন ক'র্‌তে সম্মতা হ'য়েছিল?"

"তার সঙ্গে এখনও আমার দেখা হয় নাই। তোমাকে কারামুক্ত ক'রে, তার নিকটে যেতেম। কিন্তু তুমি—"

জিতেন্দ্র বলিলেন "তবে তুমি আমার একটি অনুরোধ পালন কর্‌তে সম্মতা আছ কি? আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেম, সে জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌চি। তুমি একবার অম্বালিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, আর আমাকে যে সকল কথা বল্‌লে, তাকেও এইরূপে এই সকল কথা বলিও। এই সমস্ত বহুমূল্য রত্নমাণিক্য তাকেও দেখাইও। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করিও, আমি কারাগার হ'তে পলায়ন কর্‌লে, এই সকল রত্নরাজি ল'য়ে, সেও আমার সঙ্গে পলায়ন কর্‌তে সম্মতা আছে কি না? যদি সে সম্মতা হয়, তা হ'লে আর আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। আর যদি সে সম্মতা না হয়, তোমার এই সব প্রলোভনের কথা শু'নে, তারও মন যদি ঘৃণা ও অবজ্ঞায় এমনই শিহরিয়া উঠে, তা হ'লে দয়া ক'রে, আমাকে সে আনন্দ-সংবাদটি দি'য়ে যেও। আমি তখন বুঝ্‌তে পার্‌ব, সোলাঙ্কিদুহিতা অম্বালিকা মহারাণা সংগ্রামসিংহের রাজরাজেশ্বরী হ'বার উপযুক্তা রমণী।

চন্দ্রকলা জিতেন্দ্রসিংহের অনুরোধ পালন করিবে প্রতিশ্রুতা হইয়া চলিয়া গেল।

(৫)

পরদিন বীরবল সিংহের অন্তঃপুরে অম্বালিকার সঙ্গে চন্দ্রকলার কথোপকথন হইতেছিল। অম্বালিকা বলিতেছিলেন "তবে বুঝি তুমি এখনও আমার সমস্ত কথা মহারাণাকে বল নাই?"

চন্দ্রকলা বলিল,—"সমস্ত কথা বলেছি। তুমি যে সকল কথা বল্‌তে বলে'ছিলে, আমি আদ্যোপান্ত সকল কথা তাঁকে এক একটি ক'রে শুনিয়েছি।"

"তুমি তাঁকে বলেছিলে, তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ অসম্ভব।"

তাও ব'লেছিলেম। তিনি বল্‌লেন,'কিসে অসম্ভব, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না।'

"তবে বুঝি তুমি তাঁকে বল নাই, আমি জিতেন্দ্রসিংহের বিবাহিতা স্ত্রী, আর তার জন্মজন্মান্তরের দাসী।"

"তাও বলেছি।"

"তাতে তিনি কি উত্তর দিলেন?"

"তিনি উচ্চহাস্য ক'রে বল্‌লেন, সোলাঙ্কিসুন্দরী বোধ হয় কোন দিন স্বপ্ন দেখে থাক্‌বে। স্বপ্নে অমন তার মত কিশোরীগণ কত নবীন নায়কের গলায় ফুলের হার পরিয়ে দিয়ে থাকে। তা বলে কি তারা সেই সব নায়কের বিবাহিতা স্ত্রী হ'য়ে যায়?"

অম্বালিকা সাশ্রুনয়নে বলিলেন "হায়! আমার কথা তিনি বুঝ্‌তে পারেন নাই। জিতেন্দ্রসিংহ যে আমার ইহজন্মের, পূর্ব্বজন্মের আর জন্মজন্মান্তরের পতি,তা রাণাকে কেমন ক'রে বোঝাব?"

চন্দ্রকলা বলিল,—"আর তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি যখন কোন কথাই বুঝ্‌বেন না, তখন আর এ সব কথায় লাভ কি?"

অম্বালিকা অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন "আমি শুনেছিলেম, রাণা সংগ্রামসিংহ তপনদেবের ন্যায় পবিত্র কিরণ বিতরণ

তাঁর রাজ্যের কুলকামিনীগণকে শশাঙ্ক-সুধায় পুলকিত করেন। কিন্তু অভাগিনীর ভাগ্য দোষে, আজ দেখ্‌চি, তিনি রাহুর রূপ ধারণ কর্‌লেন!"

চন্দ্রকলা বলিল,—"যখন তিনি স্থির-সঙ্কল্প হয়েছেন,আর আক্ষেপ করা বৃথা। আর তোমার পিতা মাতার নিতান্ত ইচ্ছা,তুমি রাণাকে বিবাহ ক'রে, রাজরাজেশ্বরী হও। তাঁদের আদেশ তো তোমাকে পালন কর্‌তে হবে।"

অম্বালিকা বলিলেন "তবে তাই হবে। পিতা মাতার আদেশ পালন কর্‌ব। রাণার ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌ব। লৌকিক আচার অনুসারে তাঁর সঙ্গে পরিণীতা হব। কিন্তু তাঁকে একটি কথা বলিও, আমার জীবনসত্ত্বে তিনি আমাকে স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বেন না।" চন্দ্রকলা বলিল,—"আমি সে কথাও তাঁকে বলেছিলেম। তিনি তাতে উত্তর দিলেন 'আগে বিবাহ তো হোক্। সে সব কথা পরে দেখা যাবে। মানিনী যুবতীরা এমন অনেক আবদার, অনেক অভিমান করে থাকে, তা আমি জানি।' এখন তিনি তোমাকে বিশেষ ক'রে যে কথাটি জিজ্ঞাসা কর্‌তে বলে দিয়েচেন, তার উত্তর দাও।"

"কি বিশেষ কথা।"

"তিনি বল্‌লেন, সোলাঙ্কিসুন্দরীর অলঙ্কার নির্ম্মাণের জন্য কোষাধ্যক্ষকে লক্ষ মুদ্রা দিতে আদেশ করেছি। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস,এই লক্ষ মুদ্রায় কোন্ কোন্ অলঙ্কার নির্ম্মাণ করা হবে।"

অম্বালিকা সহসা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে কি একটি নূতন কল্পনার আবির্ভাব হইল। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন "রাণাকে বলিও, তিনি যেন বিবাহের সময় আমাকে এই লক্ষ মুদ্রার একটি বিমিশ্র হীরার আংটী দেন। আমি অন্য কোনও অলঙ্কার চাহি না। এই হীরার আংটীতেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হবে।"

চন্দ্রকলা সেখান হইতে রাণার নিকটে গেল। রাণা একাকী বসিয়া তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চন্দ্রকলা তাঁহাকে অম্বালিকার সমস্ত কথাগুলি শুনাইল। শেষে হীরার আংটীর কথাও বলিল। রাণা সহাস্যে বলিলেন "চন্দ্রকলা, একবার তুমি মহিষী কর্ণাবতীর নিকটে যাও। অম্বালিকার কথাগুলি তাঁকে সমস্ত বল। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সোলাঙ্কিসুন্দরী কেবল একটি লক্ষ মুদ্রার হীরার আংটী কেন চেয়েছে। মহিষী কি বলেন, তুমি এখনি এখানে এসে আমাকে বলিও। আমি তাঁর উত্তর প্রতীক্ষায় এইখানে অপেক্ষা কর্‌ব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্রকলা মহিষী কর্ণাবতীর উত্তর লইয়া ফিরিয়া আসিল। সে বলিল "মহিষী বল্‌লেন, তোর রাণার ঘটে কি একটুকু বুদ্ধি নাই যে, তিনি এই স্পষ্ট কথাটাও বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। হীরায় বিষ থাকে, তাকি তিনি জানেন না? অম্বালিকা বিষপান কর্‌বে বলে, লক্ষ টাকার বিমিশ্র হীরার আংটী চেয়েছে।"

সংগ্রামসিংহ বলিলেন "আমিও তাই মনে করেছিলেম।"

(৬)

আজ উদয়পুরের চারি দিকে আনন্দ-কোলাহল। আজ মিবারাধিপতি সংগ্রাম সিংহের পরিণয় উৎসব। রাজপুতানার যাবতীয় রাজগণ সমবেত হইয়াছেন। অদূরবর্ত্তী একটি উন্নত প্রাসাদ বিবাহসভার জন্য সজ্জিত হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত রাজগণ ও অন্যান্য বরযাত্রিগণকে বিবাহস্থলে লইয়া যাইবার জন্য অগণিত অশ্ব ও হস্তী রাজ-প্রাসাদসমীপে সমবেত হইল ও প্রাসাদের তোরণদ্বারে ঘোর রবে বাদ্যযন্ত্রধ্বনি উত্থিত হইল।

রাণা সংগ্রামসিংহ মন্ত্রী বিহারীদাসকে সঙ্গে লইয়া একটি নিভৃত কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই নিভৃত কক্ষের একপার্শ্বে চন্দ্রকলা একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল। রাণা বলিলেন "মন্ত্রীবর, মনে আছে, আজ দুই সপ্তাহ হ'ল, নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্রসিংহকে কারাগারে রুদ্ধ করা হ'য়েছিল। আজ সোলাঙ্কি সুন্দরীর বিবাহ,তাই তাকে কারামুক্ত করা হইয়াছে।" রাণা জিতেন্দ্রসিংহকে ঐ স্থানে আনিবার জন্য এক জন প্রহরীকে ইঙ্গিত করিলেন। জিতেন্দ্র রাণাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। রাণা চন্দ্রকলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "জিতেন্দ্র! তুমি অবশ্য ইহাঁকে চেন, আর ইনি যে রাজমহিষীর প্রিয় পরিচারিকা, তাও অবশ্য জান। তুমি নাকি সে দিন কারাগারে ইহাঁকে আর মহিষী কর্ণাবতীকে অনেক অপমানসূচক কথা ব'লেছিলে, তাই দেবী কর্ণাবতী তার প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে একটি সুন্দর পরিচ্ছদ পাঠা'য়ে দিয়েছেন। শুন্‌লেম, এই পরিচ্ছদটি প্রস্তুত করার জন্য মহিষী দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেছেন।"

জিতেন্দ্র দেখিল, চন্দ্রকলার হাতে একটি মহামূল্য, রত্নরাজিখচিত, বিচিত্র পরিচ্ছদ। সে সবিস্ময়ে রাণার দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিল,—"প্রভো! ক্ষমা কর্‌বেন। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।" রাণা সহাস্যে বলিলেন,—"এখনি সমস্ত বুঝ্‌তে পারবে। যে দিন আমি তোমার কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিই, বিহারী দাস আমাকে ব'লেছিলেন যে, মিবারের এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, তোমার মত বীর সেনাপতি কারাগারে না থে'কে, আমার পার্শ্বে অসিহস্তে দণ্ডায়মান থাক্‌লে, ভবিষ্যতে মিবারের বহু উপকারের সম্ভাবনা। কেমন মন্ত্রীবর! কথাটা মনে আছে তো? মন্ত্রীর কথা কতদূর সত্য, পরীক্ষা কর্‌বার জন্য আমিই চন্দ্রকলাকে কারাগারে তোমার নিকট পাঠায়ে ছিলেম। তুমি অকারণ দেবী কর্ণাবতীর উপর ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলে। তিনি ইহার কিছুই জান্‌তেন না। আমার নিকট হ'তে তোমার কথা শুনে, তিনি সেই দিন অবধি প্রতিদান দিতে উৎসুক হ'য়েছেন। তুমি অবশ্য শুনেছ, আজ সন্ধ্যার পর সোলাঙ্কি সুন্দরী অম্বালিকার পরিণয় উৎসব সম্পন্ন হবে। মহিষীর ইচ্ছা, তোমাকে নিজ হস্তে এই সুন্দর পরিচ্ছদে শোভিত ক'রে, শ্বেতচন্দনে তোমার ললাট চর্চ্চিত ক'রে, তোমার অই সুন্দর বীরবপু

বরমাল্যে শোভিত ক'রে, তোমার অই উন্নত মস্তকে মিবারের ইষ্টদেবী কালিকার চরণ-স্পৃষ্ট অর্ঘ্যদানে আশীর্ব্বাদ ক'রে,সোলাঙ্কিসুন্দরীর বিবাহ-সভায় তোমাকে পাঠিয়ে দিবেন। তিনি বলেন, তা হ'লে নাকি তুমি আমার মহাপ্রাজ্ঞ মন্ত্রী বিহারী দাসের ভবিষ্যবাণী পূর্ণ কর্‌বে, আর আজীবন আমার দক্ষিণ পার্শ্বে অসিহস্তে দণ্ডায়মান থেকে, মিবারের গৌরব রক্ষা ক'র্‌বে। তবে চন্দ্রকলার সঙ্গে অন্তঃপুরে মহিষী কর্ণাবতীর নিকটে যাও। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌চেন। মহিষীর অভিলাষ পূর্ণ ক'রে শীঘ্র আবার এখানে ফিরে এস।"

জিতেন্দ্র সিংহ অধিকতর বিস্মিত হইয়া চন্দ্রকলার সঙ্গে অন্তঃপুরে গেল। বিহারী দাস ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিলেন, দেব, আপনার মনের ভাব আমার নিকট হ'তে এত দিন গোপন ক'রেছিলেন কেন? এই দুই সপ্তাহ কাল আমি অকারণ নানা অনর্থ চিন্তায় কাল যাপন ক'রেছি।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই জিতেন্দ্র সিংহ মহিষী কর্ণাবতীর অপূর্ব্ব বরাভরণে ও মনোহর জয়মাল্যে শোভিত হইয়া, মন্মথের মনোহর রূপ ধারণ করিয়া, সস্মিতমুখে সংগ্রাম সিংহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রকলা বলিল মহিষী ব'লেদিয়েছেন, বরকে বিবাহ-সভায় দিয়ে যাবার জন্য, তাঁর পিত্রালয়ের "উচ্চৈঃশ্রবা" ঘোড়াকে মণি মুক্তাহারে সজ্জিত ক'রে, এখনি পাঠিয়ে দিবেন।"

সন্ধ্যার পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ বীরবল সিংহ সম্প্রদানের সময় আগত প্রায় দেখিয়া, অবগুণ্ঠনবতী কন্যার পার্শ্বদেশে বসিলেন। পুরোহিত নারায়ণ সম্মুখে ফুল বিল্বদল রাখিয়া, বরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিবাহদর্শনাভিলাষী নাগরিকগণ বরের আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারদেশে চাহিয়া রহিল। পৌরাঙ্গনাগণ ছাদের উপরে ও গবাক্ষ দ্বারে আসিয়া, উৎসুকনেত্রে রাজ-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা ঘোররবে দশদিক নিনাদিত করিয়া, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল ও তাহার সঙ্গে অসংখ্য অশ্ব ও গজ যূথের পদধ্বনি, আনন্দ-কোলাহল, শত কণ্ঠের উচ্চ সঙ্গীত ও সহস্র হস্তের করতালি ধ্বনি মিশিল। রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁহার নবীন সেনাপতি জিতেন্দ্র সিংহের বাহু ধারণ করিয়া, বিবাহ-সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, তাঁহার পরিধান শুভ্র পট্টপত্র। অম্বালিকা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে রাণার দিকে চাহিয়া, মুগ্ধা, বিস্মিতা ও জ্ঞানশূন্যা হইয়া দেখিল, রাণার দক্ষিণ-পার্শ্বে সুন্দর রাজপরিচ্ছদ ও রাজ-উষ্ণীষে শোভিত, শ্বেত-চন্দন-চর্চ্চিত, জয়মাল্য-বিভূষিত, কন্দর্পকান্তি জিতেন্দ্র,—তাহার সেই জন্মজন্মান্তরের পতি, বরবেশে দণ্ডায়মান! সংগ্রাম সিংহ বলিলেন "বিবাহের উপযুক্ত লগ্ন উপস্থিত। তবে আর বিলম্ব কেন? বীরবল! তোমার লক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যাকে আমার অপত্যপ্রতিম, নারায়ণতুল্য, নবীন সেনাপতিকে সম্প্রদান কর।" পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করি-

লেন। রমণীগণ সুমঙ্গল-শঙ্খধ্বনি করিল! বীরবল অম্বালিকার কর ধারণ করিলেন। সংগ্রাম সিংহ জিতেন্দ্রের বাহুধারণ করিয়া, অম্বালিকার উৎথিক করের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া, প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে নবদম্পতির দিকে চাহিয়া, সস্নেহে অম্বালিকার কর আপন হস্তে লইয়া, জিতেন্দ্রের হাতে একটি হীরকাঙ্গুরীয় দিলেন ও অম্বালিকাকে পরাইয়া দিতে বলিলেন। রাণার আদেশ মত জিতেন্দ্র সিংহ অম্বালিকার অঙ্গুলিতে হীরার আংটী পরাইয়া দিল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "ভদ্রে! তো- মার অভিলাষ মত আমি তোমাকে কেবল মাত্র এই লক্ষমুদ্রা মূল্যের হীরার আংটী দিলেম। মহিষী কর্ণাবতী ইহার দ্বিগুণ মূল্যের অলঙ্কার সমূহ তোমার যৌতুকেরজন্য প্রস্তুত রেখেচেন। এই হীরার আংটীতে, তোমার মত সুন্দরী নারীর নয়নের ন্যায়, বিষ আছে, আবার অমৃতও আছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দুজনে, চিরজীবন এই "হীরার আংটী হ'তে নিরবচ্ছিন্ন অমৃতধারা পান করা।

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গারো জাতির বিবরণ।

মানবীয় সভ্যতার ক্রম-বিকাশের ইতিবৃত্ত অবগত হইতে হইলে, ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিবরণ সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করা একান্ত আবশ্যক। ভারতে সভ্যতার, নিম্নতম হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত, সর্ব্বপ্রকার মানবই অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, সভ্যতার আদিস্থান ও আদিলীলা-নিকেতন এই ভারত বর্ষ। ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর সংক্ষিপ্তসার, বোধ হয়, এ কথা অতিরঞ্জিত বা অপ্রকৃত নহে। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমাস্থিত গারো পর্ব্বতবাসী পার্ব্বত্য জাতির বিষয় আলোচনা করিয়া পাঠকবৃন্দের কৌতূহল তৃষ্ণার তর্পণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। গারোপর্ব্বত তুঙ্গশৃঙ্গ চিরতুষার-কিরীটী হিমাচলেরই শাখা মাত্র। এই শৈল-মালা পূর্ব্বে 'সুসঙ্গ-পর্ব্বত' নামে অভিহিত হইত এবং সুসঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধুনা রাজ-বিধানে আসাম রাজ্যের অন্তর্নিহিত হইয়া "গারোহিল" নামে কথিত হইতেছে। এই গিরিমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় নয়নমনোহর। বর্ত্ত- মান প্রবন্ধে পার্ব্বত্য নৈসর্গিক শোভার বিষয় কিছুই বিবৃত হইবে না। কেবল তত্রস্থ অধিত্যকা ও উপত্যকা নিবাসী "গারো" নামক অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির বিবরণ সংগ্র- হের চেষ্টা করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত হাজং, বানাই, হাসি, ডালু, হাঁচু প্রভৃতি আরও কতকগুলি পার্ব্বত্য অর্দ্ধ সভ্যজাতি উক্ত

পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে বাস করে, তাহাদের ও বিবরণ ক্রমে পাঠক বর্গের গোচর করিবার ইচ্ছা আছে। কতদূর কৃতকার্য্য হইব, তাহা বলিতে পারি না, তবে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্রদোষঃ"। গারোজাতি সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে নিম্নলিখিত বিষয় গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে। ভরসা করি, এ গুলি পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।

১। আকৃতি প্রকৃতি
২। বেশভূষা
৩। আহার ব্যবহার
৪। বাসগৃহ ও গৃহোপকরণ
৫। গীত বাদ্য ও নৃত্য
৬। সামাজিক উৎসব
৭। কৃষি বাণিজ্য
৮। বিবাহ ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতি
৯। শিল্প ও কারুকার্য্য
১০। ভাষা
১১। ধর্ম্মমত
১২। বর্ত্তমানশিক্ষা ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন
১৩। শিশু পালন ও চিকিৎসা প্রণালী
১৪। মৎস্য ধরা ও শিকার

(১) আকৃতি প্রকৃতি।

গারো জাতি নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু এবং দৃঢ়কায়। ইহাদের শরীর লোমবিশিষ্ট; এবং ইহাদের শ্মশ্রু গুম্ফ অল্প, কেশ রুক্ষ, নাসিকা নিম্ন, খর্ব্ব ও স্থূল, ক্ষুদ্র, ওষ্ঠাধর স্থূল, গণ্ডদেশ উচ্চ। ইহাদের বর্ণ গাঢ়কৃষ্ণ নহে। গারো বালকগণ দেখিতে কিছু রুগ্ন বলিয়া বোধ হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইহারা ক্রমে দৃঢ়কায় হইতে থাকে। ইহারা নিতান্ত ভীরু, কিন্তু নৃসংশ; পূর্ব্বে অতি নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভাবে নরহত্যা করিয়া অপরিসীম আনন্দানুভব করিত। ইহারা আহারের নিমিত্ত বধ্য পশু গুলিকে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া থাকে। তবে হাড়িকাঠে ফেলিয়া আমরা যে ভাবে ছাগ বধ করিয়া থাকি, তাহাও কম নিষ্ঠুরতা নহে। গারোদের মধ্যে একতার ভাব খুব প্রবল। ইহারা মনে মনে যে সংকল্প করে, তাহা হইতে সহসা বিচলিত হয় না, ইহাদের দলপতির কথা সকলেই মান্য করিয়া চলে। পূর্ব্বে ইহারা সরল-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিল, মিথ্যা কথা প্রায় বলিত না, কিন্তু অধুনা সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে মিথ্যা বলিতে বড় কুণ্ঠিত হয় না। সভ্যতার অন্যান্য দোষও ইহাদের মধ্যে ক্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। আমার বোধ হয় বিলাসিতা-বৃদ্ধি ও তজ্জনিত অভাবই এই প্রকৃতি বিকৃতির কারণ, ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে, "Ignorance is bliss" এই বাক্যের যথার্থ্য উপলব্ধি হয়। কোনও কার্য্যে অযথা কাল-গৌণ ঘটিলে, ইহারা অতিশয় বিরক্তি বোধ করে।

(২) বেশ-ভূষা।

গারো পুরুষের পরিধানে কৌপীন;—প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ বলিলেও হয়। কৌপীনবস্ত্র স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বে নিজেই বয়ন করিত; এখন

অনেকে ক্রয় করিয়া লয়। মস্তকে একখণ্ড বস্ত্র বিজড়িত থাকে। গলদেশে প্রস্তরের মালা এবং কর্ণে ছোট পিত্তলের বলয়। ইহারা শ্মশ্রু উৎপাটনের জন্য একটি সোন (ছোট চিম্‌টা বিশেষ) গলদেশে ঝুলাইয়া রাখে। পুরুষের মধ্যে যাহারা একটু পদস্থ (দলপতি) তাহারা বাহুতে একটি পিত্তল অথবা রৌপ্য বলয় ধারণ করে এবং মস্তকে একখানা রক্তবস্ত্র জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীজাতির কটিদেশ হইতে কিঞ্চিন্নিম্ন পর্য্যন্ত স্থান একখানা অল্প পরিসর বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে। ইহাও তাহারা নিজেই প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহাকে 'গেলা' বলে। কিন্তু বক্ষস্থল অনাবৃত। ইহাদের কর্ণভূষণ বিচিত্র;—৩।৪টি বড় পিত্তলের বলয় কর্ণে বিলম্বিত রহে এবং তাহার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে বলয়ের ভারে কান ছিঁড়িয়া যায়। কথিত আছে, এই অবস্থাই সৌন্দর্য্যের চরম। ইহা অসম্ভবই বা কি? কারণ, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ—সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেশভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন, এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। স্ত্রীজাতির গলদেশে রাশীকৃত প্রস্তরের মালা বিলম্বিত থাকে। অধুনা সভ্যতা, বৃদ্ধি সহকারে এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যাজকদের কৃপায়, অনেকেই বেশভূষা পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, এখন কৌপীন ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ধুতি, কোট, জ্যেকেট ও অন্যান্য সভ্যজনোচিত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেছে। এক কথায় বলিতে হইলে,ইহাদের বিলাসিতা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা শুভ কি অশুভ চিহ্ন বলিতে পারি না। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম বটে, কিন্তু গারোদের সম্বন্ধে ইহা ঠিক সেই নিয়মেরই পরিণতি কি না সন্দেহ। কারণ, এই বিলাসিতা-বৃদ্ধি যেন কতকটা আকস্মিক ও অস্বাভাবিক। উপত্যকাদেশবাসী গারোদের বেশভূষা পার্ব্বত্য গারোদের বেশভূষা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন।

(৩) আহার বিহার।

গারো জাতিকে, এক প্রকার সর্ব্বভুক্ বলিলেও হয়; ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়ই মদ্যপায়ী,—মদ্য ইহারা নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই মদকে পঁচুই বলে;—গারো ভাষায় বলে 'চু'। প্রায় সর্ব্ব প্রকার জীব ইহারা অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় ভক্ষণ করে। মাংস মস্তক ও পুচ্ছ ছেদন করিয়া আহার করে ইহারা কুক্কুরকে বেস পরিপূর্ণরূপে খাওয়াইয়া উহাকে দগ্ধীভূত করতঃ, পাকস্থলীস্থিত অন্ন ভোজন একান্ত দেয় মনে করে। মানব জাতির হার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে যায় যে, পৃথিবীর অনেক দ্রব্যই কোনও জাতির আহার্য্য। এক পক্ষে যাহা ঘৃণাকারজনক অপর নিকট তাহা পরম উপাদেয় এবং তৃপ্তিকর। আহার-তত্ত্বে আলোচনা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব, ভয়ে, তাহাতে বিরত হইলাম। প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। গা

গণ আম মাংস ভোজন করে না। চাল সিদ্ধ করিয়া খায়,ব্যঞ্জন পাকের সময়, কেবল লঙ্কা ও অল্প লবণ এবং হরিদ্রা ব্যবহার করে। পূর্ব্বে লবণ ব্যবহার করিত না। কোনও ক্ষার পদার্থ দ্বারা সেই অভাব পূরণ করিত। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত কোনও দ্রব্যই ইহাদের প্রিয় নহে। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধিহেতু বেশ ভূষার যেমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে আহারাদি সম্বন্ধেও তাহার অন্যথা হয় নাই। ইহারা মান কালে তৈল ব্যবহার করিত না। কিন্তু এখন অনেকে তৈল দূরের কথা,সাবান প্রভৃতিও ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা একবারে ভূরি ভোজন করে না,প্রাতে দুইপ্রহরে এবং সায়ংকালে অল্প অল্প ভোজন করিয়া থাকে। রাত্রিতে আহার করে না। অনেকে কেবল প্রাতে ও সায়ংকালে ভোজন করে। একবার আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া উদ্‌বৃত্ত হইলে, তাহা শাল পাতায় বাঁধিয়া রাখে,পরে তাহা আহার করে। মল ত্যাগ করিয়া ইহারা জলশৌচ করে না; শুষ্ক বৃক্ষপত্র দ্বারা মলদ্বার মুছিয়া ফেলে। বোধ হয়, সংবাদ-পত্রের ব্যবহার জানিলে, এই অসুবিধা দূরীভূত হইত, এবং তাহা সভ্যতারও অননুমোদিত হইত না, কালে যে তাহা না হইবে, এমন কথা কে বলিতে পারে? ভোজন কালে ইহারা প্রায়শঃ দুই হস্তই ব্যবহার করিয়া থাকে, ভোজন-পাত্র বৃক্ষপত্র এবং পানপাত্র শুষ্ক অলাবু অথবা বংশনির্ম্মিত চোঙ্। মৎস্য না হইলে, গারোদের ভোজন প্রায় চলে না; অভাবে সকলই চলে। বর্ষাকালে অনেকেই কেবল মাত্র ফল মূল আহারে জীবন ধারণ করে।

(৪) বাসগৃহ ও গৃহোপকরণ।

পার্ব্বত্য গারোদের বাসগৃহগুলি প্রায়শঃ নদী অথবা প্রস্রবণের ধারে, উচ্চ ভূমিতে নির্ম্মিত হয়। ইহারা অনেকে একত্র বাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এক গ্রামবাসীর ন্যায় অবস্থান করে। এক এক গ্রামে ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৩০।৪০ এবং ন্যূনকল্পে ১০।১২ খানা গৃহ নির্ম্মিত হয়। ঘরগুলি দীর্ঘে ৩০।৩২ এবং প্রস্থে ১২।১১ হাত হয়। ইহার ইতর বিশেষও হইয়া থাকে। ঘরগুলি দুই চালা এবং ভূমি হইতে ৮।১০ হাত উচ্চ খুঁটির উপর নির্ম্মিত হয়। মেজেতে মাচাং প্রস্তুত করিয়া তাহা বংশনির্ম্মিত চাটাই দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে। যে দিকে পর্ব্বতের ঢালু থাকে, সেই দিকের খুঁটিগুলি বড় এবং যে দিকে উচ্চ সেই দিকের খুঁটিগুলি ছোট করিয়া থাকে। ঘরে দুই তিনটি দরজা রাখে। ছন অথবা পাতি দ্বারা ঘর ছাউনীর কার্য্য করিয়া লয়। গৃহাভ্যন্তরে অগ্নি স্থাপনের জন্য একটি মৃত্তিকার মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পরই ইহারা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ফেলে। রাত্রিতে আরণ্য জন্তুর ভয়ে কেহ ঘরের বাহির হয় না; এমন কি মল গৃহের মধ্যেই ত্যাগ করে। কিন্তু মাচাংএর উপর মল ত্যাগ করে না,একটি ছিদ্র থাকে তদ্দ্বারা মল মূত্র ভূমিতে পতিত হয়। ইহাদের একটি অতি সুন্দর পদ্ধতি আছে;—'বাটার চাঙ্গ' নামে একটি পৃথক গৃহ থাকে, তাহাতে

কেবল অতিথি এবং অবিবাহিত পুরুষগণেরই বাস করিবার অধিকার,অন্য কাহারও নহে। ঘরে উঠিবার জন্য একটি কাষ্ঠময় সোপান নির্ম্মিত হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘরগুলি সুন্দর হইলেও, অতি দুর্গন্ধময়। গৃহোপকরণ অতি সামান্য,—২।১টি মদের হাঁড়ি,২।১ খানা বল্কল (শয়ন জন্য), ২।৪ খানা বল্লম এবং ২।৩টি মাদল (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) মাত্র। এতদ্ব্যতীত আরও ২।৪টি সামান্য উপকরণ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। পূর্ব্বে নরমুণ্ড গৃহদ্বারে বিলম্বিত রাখা অত্যন্ত গৌরবের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। অধুনা পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসনে সে প্রথা একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) গীত বাদ্য ও নৃত্যাদি।

গারোগণ তাহাদের সামাজিক ও বার্ষিক উৎসবে, বিবাহাদি ব্যাপারে, নবান্ন গ্রহণে, পিতৃ, মাতৃ ও আত্মীয় স্বজন-বিয়োগে নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষে একত্র হইয়া নৃত্য করাই ইহাদের পদ্ধতি। নৃত্য-কালে উভয়েই সুরাপানে উন্মত্ত হয়। নৃত্য-কালে পুরুষদের হস্তে, এক এক খান ডিগ্রী লৌহঅস্ত্র বিশেষ ও বেত্রনির্ম্মিত ঢাল থাকে; ও তাহাদের মস্তক কুক্কুট প্রভৃতির পালক দ্বারা বিভূষিত হয়। কতকগুলি পুরুষ মাদল ও কাংস্য-নির্ম্মিত বাটা (প্রকাণ্ড বাটি) বাজাইতে থাকে, ঐ বাটাগুলি একটি বাঁশের শলাকা দ্বারা আহত হইয়া বাদিত হয়। এগুলি ক্রয় করিয়া আনে। এই বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি মহিষ অথবা গোশৃঙ্গনির্ম্মিত শিঙ্গা (ভেরী) বাদিত হইয়া তাহাদের তাণ্ডব নৃত্যের সহায়তা করে। নৃত্যকালে পুরুষ-গণ বিকট চীৎকার করিয়া থাকে। বাদ্যের তাল প্রায় ড্রামের মত। গীত ও নৃত্যাদি আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিতে থাকে, ইহার যতি-ভঙ্গ নাই। অনেক ক্ষণ ধরিয়া শুনিলে বিরক্তিজনক বোধ হয়। ইংরেজীতে বলিলে, ইহাদের গীত বাদ্যকে অতিশয় (monotonous) বলা যায়, তবে একটু বীরত্বব্যঞ্জক বটে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা, বিএ।
(মহারাজ সুসঙ্গ)

বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় বিপত্তি।

কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে তাঁহার পুত্র প্রশ্ন করিয়াছিল—"বাবা, গ্রীষ্ম ঋতুতে দিন কেন বড় এবং শীত কালে কেন ছোট হয়?" বিজ্ঞানবিৎ পিতা সগৌরব দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া অতি গম্ভীরভাবে কহিলেন—"বাছা, তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমি অতীব

সন্তুষ্ট হইলাম। এক সময়ে, এই গূঢ় প্রশ্নটি আমার মনেও উদিত হইয়াছিল। তখন আমার মত বিদ্বান্ কেহ ছিলেন না। দর্শন, কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি কলাবিদ্যায় কাহার কাহার পারদর্শিতা থাকিলেও, সে সময়ে, ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের চর্চ্চাটা আরব্ধ হয় নাই। ষড়দর্শন হইতে দার্শনিকেরা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য হইতে কবিরা এবং পাণিনি কলাপ হইতে বৈয়াকরণেরা হ্রাস বৃদ্ধির কারণ বিষয়ে কত কত সূত্রদ্বারাই প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। সেই সকল প্রমাণ একত্রীকৃত হইলে-বৃহদায়তনের গ্রন্থ হয়। তৎসম্বন্ধে এ-স্থলে বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন হইলেও, তাঁহা-দের প্রত্যেকের মুখাবলোকনে বুঝিতে পারি-লাম,—তাঁহারা যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রসঙ্গত ও নির্ভুল। মূল বিষয়ে, তাঁহাদের সন্দেহ না থাকিলেও, আমার কিন্তু সংশয় দূর হইল না। তাঁহারাও আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াই যেন কহিলেন, শাস্ত্রো-দ্ধৃত এত প্রমাণ প্রয়োগেও যখন তোমার সং-শয় দূর হইল না, রাক্ষসদের জ্যোতিষের মত, ম্লেচ্ছ এবং যবনদের বিজ্ঞান বলিয়া কি এক বিদ্যা আছে, হয়ত তাহা পাঠ করিলে, তো-মার সংশয় দূর হইতে পারে। তদবধি আমি বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। প্রায় ৩৫ কি ৩৬ বৎসর গত হইল, কোন বিখ্যাত মা-সিক পত্রিকার একটা প্রবন্ধে এইরূপ লেখা ছিল যে, এক বৎসরে, সূর্য্য এবং পৃথিবীর ব্যবধান একবার অতি নিকট আর একবার অতি দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। কেবল ভগ-বানের কৃপায়ই নিকটবর্ত্তী থাকা সময়ে, পৃথিবী সূর্য্যে পতিত এবং দূরে অবস্থিতি-সময়ে সূর্য্য হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে না। ইহারও অনেক পূর্ব্ব হইতে আমি বিজ্ঞান শিখিতেছি। কিন্তু তখনও আমি যে উদ্দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সফল হয় নাই; অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মে কেন দিন ছোট বড় হয়, সে সংশয় দূর হয় নাই। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধে ভগবানের কৃপার কথা পড়িয়া জ্যোতি-র্ব্বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া আমার ধারণা হয় না। যে-হেতু,বিশ্বসংসারের কার্য্যপ্রক্রিয়ার প্রণালী সংক্রান্ত নিয়মকে বিজ্ঞান কহে। তবে সেই প্রণালীতে ভগবানের কৃপা রহিয়াছে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে; অথবা কার্য্য-প্রণালীই তাঁহার দয়ার নিদর্শন, ইহা বলাও সমীচীন। কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলার বাহিরে তাঁ-হার দয়ার একটা স্বতন্ত্র ক্রিয়া আছে, ইহা বিশ্বাস্য নহে। যাহা হউক, ঐরূপ কথা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিজ্ঞ লোকের উপদেশে বিজ্ঞানরূপেই আমি জ্যোতির্ব্বিদ্যা অধ্যয়ন করিলাম। পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, অন্যান্য শাস্ত্রে কেবল বিবাদ; জ্যোতিষই একমাত্র সফল শাস্ত্র। যে হেতু, উহাতে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান এবং জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানই জ্ঞান হইতে ধ্যানে উপ-নীত হইবার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ।—এত শাস্ত্র পড়িলাম, কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান হইতেই এইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাসের উদয় হইল। গতি-বিজ্ঞান পাঠে,—কেন পৃথিবী সূর্য্যের নিকট-বর্ত্তী হইয়াও উহাতে পতিত হয় না এবং দূরস্থ

হওয়া কালীন চলিয়া যায় না, তাহাও বুঝিলাম; কিন্তু তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ এবং যে প্রশ্ন সেই সময় হইতে সর্ব্বদা আমার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল, তাহার মীমাংসা কিছুতেই হইল না। কিন্তু অবশেষে তাপ-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াই হঠাৎ আমার সংশয় দূর হইয়া গেল। এক্ষণ তোমাকে আমি তাহার মর্ম্ম বলিতেছি।—তাপ-বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়েই তাপের একটা গুণ,—বস্তুর বিস্তৃতি-বিধান এবং শৈত্যের গুণ সঙ্কোচন, এই অভিনব তত্ত্ব হৃদঙ্গম করিলাম। এখন তুমি আমার কথার আভাসেই, তোমার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, অবশ্য বুঝিতে পারিতেছ, পদার্থ মাত্রকেই যখন গ্রীষ্মে বিস্তারিত এবং শীতে সঙ্কুচিত করে, তখন গ্রীষ্মে এবং শীতে দিনকে ছোট বড় করিবে না কেন?—অবশ্য করিবে।"

এই গল্পটি আমার শুনা কথা হইলেও, অবিশ্বাসের যোগ্য নহে। ঠিক এই প্রকারেরই একটি ঘটনা আমার সম্মুখেও ঘটিয়াছিল। এমন কি, সে বিষয়ে পরে আমাকে লোকের নিকট সাক্ষ্যদানও করিতে হইয়াছিল। কিছু দিন হইল, এই শ্রেণীর আর গুটি দুই কথা কোন নব্য মাসিক পত্রিকায় পাঠ করিয়াছি। এস্থলে আমি ঐ সকলের উল্লেখ করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকের কত দায়িত্ব, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমি ভারতীয় জরিপের বৈজ্ঞানিক বিভাগে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার কিছু কাল পরে, ঢাকা কলেজের একটি বিএ পাস এবং একটি এফ্ এ ফেইল ছাত্র ঐ বিভাগীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তাঁহারা পৃথক্ বাড়ী ভাড়া করার পূর্ব্বে, কর্ম্মস্থলে যাইয়া, প্রথম কএক দিন, আমার সঙ্গে এক বাটীতে বাস করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে পরিচয় দিবার নিমিত্ত আমি এই প্রবন্ধে বিএ উত্তীর্ণ ছাত্রটিকে 'ত' ও এফ এ ফেইলটিকে 'ল' নামে নির্দ্দেশ করিব। এক দিবস রাত্রিতে 'ল' জিজ্ঞাসা করিলেন 'ত'কে,—প্রত্যেক ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের অধিক হয় কেন? ইহাকেই ত গোলকাধিক্য Spherical excessবলা হয়। 'ত' 'ল' অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান্। কারণ, তিনি বিএ পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তিনি অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন। আলোবিজ্ঞানে তোমার ব্যুৎপত্তি নাই। আমরা বিএ পাঠ্যে তাহা পড়িয়াছি। এ অতি সহজ প্রশ্ন। বায়ুর ভিতর দিয়া কোন পদার্থের আলো আসিয়া যখন আমাদের চক্ষে পতিত হয়, উহা সরল ভাবে আসে না,—ঘনত্ব পদার্থের গাঢ়তার ন্যূনাধিক্যানুসারে বক্র ভাবে আলোর গতি হয়। এই নিমিত্ত একটি জল-শূন্য পাত্রের নিম্নভাগে একটি বস্তু,—মনে কর, একটি টাকা কি পয়সা এমন ভাবে রাখিয়া দেও যে, পাত্রের পার্শ্বে দৃষ্টি অবরুদ্ধ থাকে, আর সেই অবস্থায় পাত্রে চক্ষু রাখিয়া উহাতে জল ঢালিয়া দেও, অমনি সেই পাত্রে তলস্থিত টাকা কি পয়সা তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহাকে তুমি আলোর ওগুই বল অথবা প্রতিবন্ধকতা হেতু আলোর চক্রগমনে বাধাই বল, যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার।

ইহাই ইংরেজী পারিভাষিক শব্দে Refraction of light বলিয়া উক্ত হয়।—তবে যে একটি ত্রিভুজের গোলকাধিক্য দর্শনে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীটার অবয়ব আকার প্রকার পরিমিত হইতে পারে, তাহার কারণটুকু আমিও এক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। তাপ-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মত, আলো-বৈজ্ঞানিকও যে প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কেমন পাঠক, এই দুইটি উত্তর এক না হইলেও যে বহুল পরিমাণে একই ধরণের সে বিষয়ে কি আর কোন সন্দেহ আছে? পুত্র পিতার উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল কি না, জানি না। কিন্তু 'ত'এর উত্তরে 'ল' নিঃসংশয় না হইয়া পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

আমি কএক মাস হইল, গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯। ২য় বর্ষ ১১শ ও ১২ সংখ্যা একত্র বান্ধান একখানি সাহিত্য পত্র পাঠ করিয়াছিলাম। এক জন এম্ এ, বি এল, উহার সম্পাদক। পত্রিকা খানা মাসিক। উহাতে, 'প্রকৃতি গ্রন্থ-পাঠ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধের, প্রথমে লেখা আছে—'শেষ প্রস্তাব।' এই শেষ প্রস্তাবের একস্থলে লিখিত রহিয়াছে,—পৃথিবীর স্বীয়-কক্ষ পরিভ্রমণ জন্য কল্পিত গতিরেখা ঠিক বৃত্তাভাস ক্ষেত্রের অনুরূপ। সুতরাং সূর্য্য-মণ্ডল হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ন্যূনাধিক্য বশতঃ কোথাও উত্তাপের আধিক্য কোথাও ন্যূনতা অনুভূত হয়। পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু প্রান্তে উষ্ণতার এতাদৃশ অভাব যে, সূর্য্যের আলোক প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুতঃ তথায় শৈত্য এত অধিক যে, পারদ পর্য্যন্ত জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। এজন্য মেরু-সন্নিহিত লাপ্‌ল্যাণ্ড দেশে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়।" ঐ প্রবন্ধেরই আর এক স্থানে লিখিত রহিয়াছে,—"পৃথিবীর ছায়া সূর্য্যে নিপতিত হইলে, সূর্য্যগ্রহণ হয়।"

ঈদৃশ উক্তি অপেক্ষা অবৈজ্ঞানিক কথা,—বিজ্ঞান সম্বন্ধে মারাত্মক ভ্রম আর কি হইতে পারে? বিজ্ঞপাঠক পাঠমাত্রই বুঝিতেছেন, এস্থলে লেখক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কি বিসদৃশ বিপত্তি ঘটাইয়াছেন।

প্রবন্ধ লেখকের নাম উহ্য রাখিয়া সম্পাদকের উপাধি কেন দিলাম। ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে, বিস্ময়ের কারণ থাকিবে না। পত্রিকা-সম্পাদক ও কলেজের প্রিন্সিপালের মত দায়িত্বশূন্য জীব সংসারে দ্বিতীয় আছে কি না, সন্দেহ। আজকাল ইহা কে না জানে? সম্পাদক মূর্খ কি বিদ্বান্, তাহা পাঠকের জানিবার সাধ্য নাই। প্রবন্ধ যেমনই কেন না হউক, তাহার নিমিত্ত জবাব-দিহি একমাত্র লেখকের। সম্পাদক এইমাত্র বলিয়াই খালাস। অধিকাংশ মাসিক-পত্রেই সম্পাদকের লিখিত প্রবন্ধ ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই একত্র বান্ধান দুই সংখ্যায় ১৩টি প্রস্তাব আছে; সম্পাদকের লেখা কিন্তু একটিও নহে। যে সম্পাদকের লিখন এবং প্রবন্ধ মনোনয়ন, এ উভয় বিষয়েই সময়, সুযোগ বা মনোযোগের অভাব, তিনি যে কেন তাঁহার গৌরবাত্মক

নাম ও উচ্চ উপাধিটির ব্যবহারে অনুমোদন করিয়া,আপনি নিশ্চিন্ত বা উদাসীন থাকেন, ইহা যেমন এক দিকে আমার কিছুতেই বুদ্ধিস্থ হইতেছে না, তেমন অন্যদিকে, ইহাও বুঝিতেছি না যে,লেখকগণও এতদূর অসতর্ক হইয়া লেখনী চালনা করিতে পারেন কিরূপে? ভুলভ্রান্তি সকলেরই আছে। কিন্তু যে ভুল ভ্রান্তি কুশিক্ষা বা অশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, সে সকল ভ্রমপরিহারার্থ লেখক মাত্রেরই বিশেষ সতর্ক, সাবধান ও যাত্নিক হওয়া একান্ত আবশ্যক। উল্লিখিত মাসিক পত্রের সম্পাদক এম্‌এ, বি এল মহাশয় আমাদিগের পরিচিত এবং সাহিত্যে ও সমাজে সুকৃতী। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি যে পত্রের সম্পাদক, সে পত্রে কিছু লিখিতে হইলে, লেখকদিগেরও, অন্ততঃ সম্পাদকের নাম ও গৌরবের দিকে চাহিয়া, একটু দেখিয়া শুনিয়া ও ভাবিয়া চিন্তিয়া লেখনী চালনা করা কর্ত্তব্য। বান্ধব সম্পাদক মহাশয় এবং বান্ধবের পাঠকগণ এবিষয়ে কি বলিবেন, জানি না। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে আমাকেই নিন্দুক আখ্যা প্রদান করা সঙ্গত মনে করিবেন। তা করুন। কিন্তু ইহা নিন্দা হইলেও সত্য। ভরসা করি, এই হেতুই আমার অপরাধ গুরুতর হইলেও মার্জ্জনীয়।

এক্ষণ এ দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে। ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ যে কোন বিষয়ে, যে কোন উপাদেয় তত্ত্বই ব্যাখ্যাত হউক না কেন,ঐ ব্যাখ্যাটি বিজ্ঞানের অনুমোদিত,সঙ্গে এই সার্টিফিকেটটুকু দিয়া দিতে পারিলেই, উহা যেন সকলের অধিকতর গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া থাকে। সময়ের এই লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, বৈজ্ঞানিক, কু-বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক, সকলেই, আপন আপন লেখায় বিজ্ঞানের দোহাই দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা বিজ্ঞানে অধীতি ও সম্যক্ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। যাঁহারা বিজ্ঞান-শিক্ষায় কেবল তোতাবৃত্তির অনুসরণ করিয়া আপনাদিগকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা নামে বৈজ্ঞানিক হইলেও, কাজে কু-বৈজ্ঞানিক। অবৈজ্ঞানিক হইতেও কু-বৈজ্ঞানিক ভয়ঙ্কর পদার্থ। অবৈজ্ঞানিকেরা বৈজ্ঞানিকের উক্তিরই পুনরুক্তি করে, মাত্র। বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত প্রকটনে তাহাদিগের তত সাহস হয় না। কুবৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে সে কথা নহে। তাঁহারা বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় অসম-সাহসী, কাজে কাজেই, সময় সময়, বিজ্ঞান-ব্যাখ্যার তাঁহাদিগের হাতে, উল্লিখিতরূপ সাংঘাতিক বিপত্তি সংঘটিত হয়।

সম্প্রতি বিজ্ঞলোকেরা স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের ঈদৃশ কু-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানবিৎ তত্ত্বদর্শী বিজ্ঞলোকদিগকে বিজ্ঞান-বিষয়ে লেখনী ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আমি কলেজ ছাড়িয়াই গবর্ণমেণ্টের বৈজ্ঞানিক অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হই। এবং ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল বিজ্ঞান-বিভাগীয় অনেক উন্নত শাখা প্রশাখায় হাতে কলমে কার্য্য করিয়া অধুনা অবসর গ্রহণ করিয়াছি। এই হেতু অনেকে

আমাকেও এক জন প্রকৃত কৃতী বৈজ্ঞানিক মনে করিয়া বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিতেছেন। আমি জীবনে কখনও কোন বাঙ্গালা পত্রে প্রবন্ধাদি লিখি নাই। অপরিহার্য্য অনুরোধে বাধ্য হইয়াই আজি লেখনী ধারণ করিলাম। আমি এই পথের নূতন পথিক। বৈজ্ঞানিকত্বেও আমি আমাকে অভ্রান্তদর্শী বলিয়া গর্ব্ব করিতে সাহসী নহি। ধারাবাহিক রূপে এই চারিটা প্রবন্ধ লিখিলে, তাহাতে আমার কোন ভ্রান্তি ঘটিবে না, এমন কথা বলিতেও আমার সাহস নাই। ভুল ভ্রান্তি থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু তথাপি, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমার লিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে উল্লিখিত রূপ মারাত্মক ভুল বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিপত্তি ঘটিতে পারিবে না। অন্য প্রকারে ইহা হইতেও মারাত্মক ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান কালে নহে,—ভবিষ্যতে যদি কোন বর্ত্তমান স্থির-সিদ্ধান্ত অসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়;—তবে। তাহা কেবল আমার কেন পুরুষপ্রধান মহাবৈজ্ঞানিক নিউটনেরও অনেক সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে নূতনবিধ তত্ত্বাধিকারে ভুল বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইরূপ ভুল পরিলক্ষিত হওয়া অসম্ভব নয় যে,কোন কোন সময়,বর্ত্তমান স্থির-সিদ্ধান্তে ঐকমত্য হইতে না পারিয়া আমি অন্যরূপ সিদ্ধান্তে কারণ দর্শাইয়া উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহাতে বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকিবে। বিজ্ঞান-বিষয়ে পূর্ব্বপ্রদর্শিতরূপ ভ্রমাত্মক প্রস্তাব এ জীবনে আমার দ্বারা লিখিত হওয়া একরূপ অসম্ভব কথা। ব্যাকরণ ও ভাষার ভুল পংক্তিতে পংক্তিতে থাকাও অসম্ভব নহে,—ইহা আমি প্রথম প্রবন্ধেই স্বীকার করিয়া লইতেছি। কারণ, বাঙ্গালা ভাষায় আমার জ্ঞান কি পরিমাণ অন্যে না জানিলেও বান্ধবের ভাষাপণ্ডিত বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় অবশ্যই তাহা অনবগত নহেন। কলেজ ছাড়িয়াই পশ্চিম প্রদেশে ৩০ বৎসর থাকা হেতু বাঙ্গালা যেটুকু জানিতাম, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। যাহা হউক যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তৎসম্পর্কে কতক মুখে, কতক হাতে মনের ভাব আপনাদের কাছে প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। ভরসা করি, সহৃদয় বিজ্ঞ পাঠকবর্গ আমার ভাষাগত ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীঃ—

মধু-মক্ষিকার গৃহস্থালী।

এই বিশাল বিশ্বে মক্ষিকা অতি ক্ষুদ্র জীব। অনেক পশু পক্ষীর তুলনায় মানব ক্ষুদ্র হইলেও, বাক্‌শক্তি প্রভাবে জীব-জগতে মানবের স্থান সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত। সেই হিসাবে মক্ষিকা বা পিপীলিকা জাতি মানব-শক্তির নিকট নগণ্য সন্দেহ নাই। নগণ্য হইলেও, মানব জাতি বহু বিষয়ে, এমন কি সভ্যতার প্রধান অবলম্বন,—রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, এবং গার্হস্থ্য-নীতি সম্বন্ধেও, সময় সময়, এই সকল হীন জীবের পদানুসরণ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারে।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে মধু-মক্ষিকার গৃহস্থালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সূক্ষ্ম-দর্শী পাঠক দেখিবেন, মানব-সমাজে এই ক্ষুদ্রতম প্রাণীদিগের গার্হস্থ্য-নীতি কতদূর অবলম্বিত হইলে, তাহা কোন কোন অংশে স্বর্গীয় দেব-সমাজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

মধুচক্র একটি সুবিশাল রাজ্য। এই বিশাল রাজ্যের শাসন-ভার একটি মাত্র রমণীর উপর সংন্যস্ত। রমণীই এ রাজ্যের রাণী। এক একটি রাজ্যের অধিবাসী সংখ্যাও কম নহে,—এক লক্ষেরও অধিক হইয়া থাকে। রাজ্যে বহুসংখ্যক কুঠরী (Cells)। প্রায় লক্ষাবিধ কুঠরীতে মধু ও পুষ্প-রেণু প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। ঐ সকল কুঠরীকে ভাণ্ডার-গৃহ বলে। প্রায় ৬০০০০ ষাট হাজার গৃহে অণ্ড, অণ্ডোদ্ভূত কীট ও গুটিকা প্রভৃতি রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত ছয়টি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গৃহে ঐ রাজ-সন্তানের বাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐ ৬টি গৃহ Royal cell বা রাজ-প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত। ইহার সন্নিকটেই রাণীর সুবৃহৎ প্রাসাদ। এই প্রাসাদ-পুরীতে রাণী তাঁহার Ladies of honour বা সহচরী ও পরিচারিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন।

সুশৃঙ্খলায় রাজ্য-শাসন ও নিরাপদে জীবন যাপন নিমিত্ত এই রাজ্যের অধিবাসিগণ আপনাদিগের মধ্যেই সমুদায় কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছে।

মধুমক্ষিকা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব।

প্রতি চাকে একটি মাত্র স্ত্রী মক্ষিকা থাকে এবং সেই চাকের রাণী। পুরুষ মক্ষিকা এক চাকে ২০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত থাকে। ক্লীব * মক্ষিকা লক্ষাধিকও হইয়া থাকে।

* M. Bannier সাহেব ক্লীব জাতিকে স্ত্রী জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"বাসস্থান ও পথ্যের তারতম্য অনুসারেই এই সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহারের অল্পতা এবং বাস-স্থানের সংকীর্ণতা

হারাই কার্য্যকারক Workers। কার্য্যকারকগণ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত।—রাণীর সহচরী, পরিচারিকা, খাদ্যসংগ্রাহক, শুশ্রূষাকারিণী, ভৈষজকার, পাখাওয়ালা, রাজ-মিস্ত্রী, গৃহনির্ম্মাতা, ভাস্কর, মোম-প্রস্তুতকারক, ভাণ্ডার-রক্ষক বা আবরণনির্ম্মাতা, সৈনিক বা প্রহরী ও বাহক প্রভৃতি।

ডিম্ব প্রসবন ব্যতীত রাণীর অপর কোন কার্য্য নাই। এমন কি ডিম্বের সংস্থান এবং প্রতিপোষণের চিন্তাও রাণীকে করিতে হয় না। Chamber maid বা পরিচারিকাগণই তাহা করিয়া থাকে। রাণী জন্ম দিবসেই সিংহাসন লাভ করিয়া থাকেন। এবং তৎপর দিবসেই * কোন পুং মক্ষিকার সহিত তাহার উদ্বাহ ক্রিয়া রীতিমত অনুষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে।† উদ্বাহ-বিহার

স্ত্রী মক্ষিকার জননেন্দ্রিয়ের শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং তাহারা গর্ভ ধারণ ও ডিম্ব প্রসবে অক্ষম হয়।"

Lubbock, Westwood প্রভৃতির মতও অন্যরূপ নহে।

* রাণীর জন্মের দ্বিতীয় দিনে বিবাহ হইলে, ক্লীব ডিম্ব বেশী হয়। জন্মের ১ সপ্তাহ পরে বিবাহ হইলে, পুরুষ ও ক্লীব সমান হয়। ১ সপ্তাহ পরে হইলে, কেবল পুরুষ ডিম্ব হয়। সুতরাং ২য় দিবসেই বিবাহ হওয়া আবশ্যক।

† পাণ্ডুরাজার ন্যায় পুরুষ মক্ষিকার উপরও কোন গুপ্ত অভিসম্পাত আছে কি তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। অথবা চাকের ভিতরে সম্পাদিত হয় না। রাণী প্রিয় প্রেমিক সহ উড্ডীয়মানা হইয়া আকাশমার্গে বিহার করিতে করিতে প্রেম-কৌতুকে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। বিবাহ-যাত্রায় রাণী স্বীয় Maids of honour বা সহচরীমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়াই বহির্গত হন।

বিবাহ-দিবসেই নবপরিণীতা যুবতী রাণীকে চির-বৈধব্য ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। মক্ষিকা-সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই। আবশ্যকতাও নাই। কেন না, স্ত্রী পুরুষের এক বার মাত্র সহবাসেই স্ত্রী মক্ষিকা আজীবন অণ্ড প্রসব করিতে পারে। ধন্য বিধাতার বিধান!!

রাণীর নিকট ৬ জন হইতে ১২ জন পর্য্যন্ত পরিচারিকা সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে। বিবাহের ৩৬ ঘণ্টা পর হইতেই রাণী অণ্ড-প্রসব করিতে থাকেন। এক একটি কুঠ-

রাণীর উপর আর এক জন রাজা বর্ত্তমান থাকিলে, বহুনায়ক-সমাজের ন্যায় মক্ষিকা সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে ভাবিয়া ভাগ্যবান্ মক্ষিকাজাতি এমন কোন দেব-আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল কিনা, তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু প্রকৃতির ইহাই নিয়ম—পুং মক্ষিকা পত্নীতে একবার মাত্র উপগত হইলেই জীবন হারাইবে। প্রাণী-তত্ত্ববিদেরা বলেন, "পুং মক্ষিকার জননেন্দ্রিয় অতি কোমল, সংসর্গ মাত্র জননেন্দ্রিয় স্খলিত হইয়া যায়। এবং তাহাতেই মৃত্যু ঘটে।"

রীতে এক একটি অণ্ড রক্ষিত হয়। রাণী অণ্ড প্রসব করিতে করিতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে থাকেন। পরিচারিকাগণ অণ্ড গুলিকে যথা স্থানে রক্ষা করিয়া যাইতে থাকে; আর অমনি কামরার নির্দ্দিষ্ট পরিচারিকাগণ আসিয়া তাহাদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করে। যদি কোন প্রকোষ্ঠে দুই বা ততোধিক অণ্ড পতিত হয়, তবে সঙ্গীয় পরিচারিকাগণ তাহা বহন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে রাখিয়া দেয়। প্রতি প্রকোষ্ঠে একটির বেশী অণ্ড থাকিতে পারে না।

রাণী মিনিটে দুইটি হইতে ৬টি অণ্ড প্রসব করেন। এইরূপে এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত লক্ষাধিক অণ্ড প্রসব করিয়া থাকেন। কোন ঋতুতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ২০০০। ৩০০০ অণ্ডও প্রসূত হইয়া থাকে।

ক্লীব ডিম্বের ছয়টিকে উপর্য্যুক্ত রাজকীয় ছয় বৃহৎ প্রকোষ্ঠে রক্ষা করা হয়। এবং তাঁহাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ছয় জন করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত থাকে। অণ্ডোৎপন্নেরাই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিণী।

এই ভাবী রাণীদিগের আহার ও শুশ্রূষার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। রাণীর খাদ্য মধু। ইহাঁদিগকেও মধু প্রভৃতি Royal paste বা রাজভোগই দেওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে রাজবাটীতে রাখিয়া, রাজ-ভোগে প্রতিপালন করিয়া সাধারণ ক্লীব ডিম্বকে রাণী করিয়া ফুটাইয়া তোলা হয়। মক্ষিকা-সমাজের বিধি অনুসারে একবারে ছয়টির অধিক প্রাণীকে এরূপ সুবিধা প্রদান করা হয় না।

এই ডিম্ব ছয়টি ষোড়শ দিবসের ভিতরই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বাহির হয়। এবং বাহির হইয়াই সিংহাসনের দাওয়া করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাণী ডিম্ব প্রসব করিবামাত্র নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠচারিণীগণ ডিম্বগুলির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে। প্রথম চারি দিন বিশেষ কিছু করিতে হয়না। ৫ম দিবস হইতে নিয়মিত রকমে আহার দিতে এবং কুঠরী পরিষ্কার রাখিয়া বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। ৫ম দিবসে সেই ডিম্বের ওজন, প্রসবকালীন ওজন অপেক্ষা ১৪০০ গুণ বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে, প্রকোষ্ঠের মুখ উপর দিক দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় ডিম্বগুলি কায় পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। ছোট ছোট গুয়ে ক্লীব শাবকগুলি এইরূপে ২১ দিনে পূর্ণাব প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। পুং শাব গুলি ২৪ দিনে বাহির হয়।

রাজ-প্রাসাদের শাবকগুলি ষোড়শ দিবসে বহির্গত হয়। এই শাবকগুলি বাহির হইবার পূর্ব্বেই, রাণী তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাণীর সহচরীগণ রাণীর মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে তাহা করিবার অবকাশ প্রদান করে না! তাহার ভাব বুঝিয়া রাণীর চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকে। এই সময় রাণীর মানসিক ভাব পরিবর্ত্তন হেতু কএক দিন সন্তান হওয়া (ডিম্ব প্রসব) বন্ধ থাকে। *

* Frank Marshall White তাঁহার

এ দিকে ভাবী রাণীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রে আলোক দর্শন করেন, তিনি ফুটিয়াই মাতৃসিংহাসনের দাবি করিয়া মাতাকে দেশান্তরিত বা তাঁহার প্রাণান্ত করিতে অগ্রসর হন। তখন রাজ্যের ভিতর একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হইয়া যায়। প্রতিদ্বন্দ্বিদিগের মধ্যে পরস্পরে যুদ্ধ ও জয় পরাজয়ের মীমাংসার পর, যিনি যুদ্ধে জয় লাভ করেন, তিনি রাজ্যের রাণী হইয়া পুনরায় শান্তি সংস্থাপন করেন।

অনেক সময়, আপোসেও কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চাকে অধিবাসীর সংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি দেখা গেলে, প্রাচীন রাণী উপযুক্তসংখ্যক অধিবাসীসহ অন্যত্র যাইয়া উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক কতক দিনের জন্য সুখে বাস করিতে প্রায়াস পান। নবপ্রসূতা সিংহাসন-লাভ-প্রয়াসিনী রাণীদিগের মধ্যেও অনেকে এইরূপ উপনিবেশের অধিকার

"A day in a Bee hive" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন "রাজ-প্রাসাদের ৬ বিশেষ কক্ষে ৬টি ডিম্ব রক্ষার ষোড়শ দিবসে হঠাৎ রাণীর ডিম্বপ্রসব বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতেই রাণীর মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। চাকে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া যায়। তখন চাকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাবী বিপদের সূচনা অনুভূত হয়। রাণীও বিপদ আশঙ্কা করিয়া ষড়শাবকের বিনাশ সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সঙ্গীয় পরিচারিকারা তাঁহাকে সেই সময়ে রাজ-প্রাসাদ হইতে এক পদও অগ্রসর হইয়া যাইতে দেয় না।"

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপোসে নিষ্পত্তির স্থলেই এইরূপ হইয়া থাকে। নতুবা অনেক স্থলে রক্তপাতই পরিণাম ফল হইয়া দাঁড়ায়।

রাণীর উদ্বাহ-ভ্রমণেও বিপদের আশঙ্কা আছে। রাণী প্রেমান্ধ হইয়া স্বীয় প্রেমিকের সহিত বহু ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেলে, অনেক সময়, গগনবিহারী পক্ষী সকল তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। এইরূপে বা অন্য কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন প্রকারে রাণীর মৃত্যু ঘটিলে, ধাত্রীগণ সতর্কতার সহিত প্রকোষ্ঠান্তর হইতে তিন দিনের কমবয়স্ক ক্লীব ডিম্ব আনিয়া পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ ছয় প্রকোষ্ঠের কোন একটিতে রক্ষা করে এবং অতিশয় যত্নের সহিত প্রতিপালন করে। অতঃপর ষোড়শ দিবসের ভিতরই তাহা হইতে রাণীত্বের দাবি প্রকটিত হয়।

যখনই কোন মক্ষিকা উড়িবার উপযুক্ত হইয়া প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করে, অমনি গৃহধাত্রীগণের কেহ তাহার স্থানে আর একটি আনিতে যায়। কেহ গৃহস্থিত মোম প্রভৃতি পরিষ্কার করে, কেহ পূর্ব্ব ডিম্বের খোসা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেয়। এইরূপে দেখিতে দেখিতে অতি ক্ষিপ্রহস্তে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়া যায়।

খাদ্য সংগ্রাহকদিগের কার্য্যাবলী অতি আশ্চর্য্যজনক। প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলেই তাহাদের ইঙ্গিতে অনুসন্ধানকারিগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হয় এবং অতি সত্বরে আসিয়া মধুযুক্ত পুষ্প পত্রাদির তত্ত্ব প্রদান করে; আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে মক্ষিকা তাহাদের প্রদর্শিত

পথে ধাবিত হইতে থাকে। এবং আপন আপন চুপড়ি বা Basket * ভরিয়া মধু আহরণ করিয়া আনিতে থাকে। ভাণ্ডার রক্ষকগণও মহাব্যস্ততার সহিত আহরণকারীদিগের সংগৃহীত দ্রব্য ভাণ্ডার গৃহে রক্ষা করিতে থাকে। এক একটি প্রকোষ্ঠ পূর্ণ হইবা মাত্র Capsulmaker বা মুখাবরণ নির্ম্মাতাগণ প্রকোষ্ঠের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে।

চাকের কাজ দিন ভরিয়াই চলিতেছে। ভৈষজকারগণ বয়ঃক্রম অনুপাতে শাবকদিগের পথ্য পরিমাণ করিয়া দিতেছে। বর্ষীয়সী ধাত্রীগণ দক্ষতার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া শাবকদিগকে যথারীতি † তরল বা Dilute

* চুপড়ি খাদ্য-আহরকদিগের পদের নীচে ক্ষুদ্র গর্ত্ত আছে, তাহাই Basket বা চুপড়ি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মক্ষিকা ঐ গর্ত্ত ভরিয়া মধু ও পুষ্পরেণু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চাকে সঞ্চয় করে। যাহারা মধু আহরণ করে, তাহাদেরই কেবল এইরূপ চুপড়ি আছে। সকল মক্ষিকার তাহা নাই।

† Dilutionটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ডাক্তারেরা যেমন রোগ বিশেষে একই ঔষধ 'ক্রম' করিয়া রোগ-ভেদে ব্যবহার করিয়া থাকেন, মক্ষিকারাও সেইরূপ এক মধু বা রসই 'ক্রম' দ্বারা এক এক রকম গুণ-বিশিষ্ট করিয়া এক এক বয়সের শাবকদিগকে দিয়া থাকে। ১৬ দিবসের শাবকের যে মধু পথ্য, ৫ দিবসের কীটের পক্ষে তাহা কখনই পথ্য নহে। ৫ দিন, ৭ দিন বা ১০ দিনের কীট বা গুটিকার পথ্য অগ্রে ধাত্রী

করিয়া খাওয়াইতেছে। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, শাবকদিগের পথ্য প্রদানের ভারটী বর্ষীয়সী এবং অভিজ্ঞাদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। এই কার্য্যটি বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ। নবীনা মক্ষিকাগুলি কুঠরী হইতে বাহির হইয়াই প্রবীণাদিগের সাহায্য করিতে নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে শুশ্রূষার কার্য্য শিক্ষা করিয়া থাকে। শুশ্রূষা কার্য্যে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া অন্যবিধ কার্য্যে গমন করে।

রাজ-মিস্ত্রী, গৃহ-নির্ম্মাতা, মোম-প্রস্তুতকারক, ভাস্কর সকলেই সমভাবে কার্য্যে নিযুক্ত। কেহ মোম প্রস্তুত করিতেছে, কেহ বৃক্ষ বিশেষের কষ Propolis সংগ্রহ করিয়া চাকের সংস্কার করিতেছে, কেহ রাজ্য-বৃদ্ধির বাসনায় চাকের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে। কেহবা কুঠরী প্রস্তুত করিতেছে। বায়ু চালকগণ বিশেষ ব্রতস্থ ভাবে চাকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, অবস্থাভেদে উহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু উৎপাদন করিতে হয়। চাকে অধিবাসী সংখ্যা-বৃদ্ধি হইলে, স্বভাবতঃই চাক গরম হইয়া উঠে। ঐ অত্যধিক গরমে কুঠরীনিবদ্ধ শাবকের অপকার হয় ও সঞ্চিত মধুতে ক্লেদ উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় বায়ু-চালকগণকে সময় বুঝিয়া কৃত্রিম উপায় অবলম্বন

নিজে পান করে, পরে উদর হইতে তরল করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দেয়। এইরূপ ৫—১০—১৫ ও ২০ দিনের পোকার জন্য পৃথক্ পৃথক্ রূপই আহারের Dilution বা 'ক্রম' করিতে হয়।

করিতে হয়। স্বীয় স্বীয় পাখার ঘন ঘন নাড়না দ্বারা বায়ু উৎপাদন করিয়া শাবকগুলির অনিষ্ট নিবারণ করিতে ও সঞ্চিত মধুর ক্লেদরাশিকে বাষ্পীভূত করিয়া উড়াইয়া দিয়া ভাণ্ডারস্থিত মধু রক্ষা করিতে হয়।*

প্রহরী শ্রেণীকেও সর্ব্বদা বিশেষ সতর্কতা সহকারে অবস্থান করিতে হয়। ইহাদের অতিরিক্ত চোর ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব বিরল নহে। এক চাকের মক্ষিকা অন্য চাকে আসিয়া মধু লুণ্ঠন করিতে চেষ্টিত থাকে। এখানে বলা আবশ্যক, মক্ষিকাগণ স্বীয় চাকের অধিবাসিগণকে দেখিলেই চিনিতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ঘ্রাণ-শক্তির প্রবলতা হেতু, বিভিন্ন চাকের কোন মক্ষিকা নিকটস্থ হইলেই, টের পাইয়া থাকে, † এবং

* মক্ষিকাদিগের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেও এইরূপ পাখা নাড়া দিতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণ ও পরিত্যাগের জন্য ইহাদের শরীরে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। বহু পোকার একত্র সমাবেশে যখন চাক গরম হইয়া কার্য্যশীল পোকাদিগের কার্য্যে অসুবিধা উৎপাদন করে, তখন ঐ সকল বায়ুচালকগণ পক্ষদ্বারা বায়ু উৎপাদন করিতে থাকে। ঐ বায়ু ছিদ্র পথে শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া শরীর শীতল করে ও শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে। চাকে পোকাদিগের পক্ষ-শিহরণ, বোধ হয়, অনেক পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন।

† Longstroth তাঁহার Treatise on the Honey-bee গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "তিন

যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনে চোরকে ধৃত করিয়া ফেলে।

দস্যু-তস্করের আক্রমণে, অনেক সময়, আহরণকারীকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সঞ্চিত মধু পরিত্যাগ করিতে হয়। কখন কখন আহরণকারী সদলে ধৃত হইয়া মধুসহ অপর চাকে নীত হয়। এমন স্থলে অনেক সময় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

চাক সম্বন্ধে একটি নিয়ম,—বাহির হইতে কেহ মধু বা ফুল-রেণু সংগ্রহ না করিয়া ভাণ্ডার-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আবার চাক হইতেও কেহ মধু বা ফুল-রেণু লইয়া বাহির হইতে পারিবে না।

যদি কোন এক চাকের মক্ষিকা ভ্রমবশতঃ স্বীয় সংগৃহীত দ্রব্য লইয়া অপর চাকের সমীপবর্ত্তী হয়, তবে তাহাকে অপর চাকের মক্ষিকারা সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া যায় ও মধু লুণ্ঠন করিয়া রাখিয়া ছাড়িয়া দেয়। সন্ধ্যা সমাগত দেখিলে, সে দিন অতিথি সৎকার (?) করিয়া পর দিন ছাড়িয়া দেয়।

কুলীদিগের কার্য্য, বাড়ী ঘর পরিষ্কার রাখা। মক্ষিকারাজ্যেও ব্যাধি পীড়ার অস-

চারি চাকের মক্ষিকা যখন কার্য্যকারণে একত্র হয়, তখন তাহারা গাত্রগন্ধ দ্বারা নিজ নিজ সমাজের বা চাকের ভগিনীগণকে চিনিয়া লইতে পারে।"

Lubbock তাঁহার Ant, Bee &c. গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "এক এক চাকের মক্ষিকার গাত্রগন্ধ এক এক রূপ।"

ভাব নাই। মাঝে মাঝে আমাশয় ও প্লেগ লাগিয়া হাজারে হাজারে মক্ষিকা মৃত্যু-মুখে নীত হইতে থাকে। চাকে মক্ষিকা মরিলে কুলী বা মজুরেরা তাহা বহন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে।

অতঃপর পুং মক্ষিকা সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মক্ষিকা-সমাজের এই অধ্যবসায়, শ্রম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভিতরেও আলস্য, জড়তা ও পেটুকতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সমাজের পুরুষগুলি নেহাৎ অকর্ম্মা। রাণীর যেমন ডিম্ব প্রসব ব্যতীত অন্য কর্ম্ম নাই, পুরুষগুলিরও ডিম্ব উৎপাদনে সহায়তা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম নাই। তাহাতেও প্রতি রাণীতে মাত্র একটি মক্ষিকারই প্রয়োজন।

এই নিষ্কর্ম্মাদল সারা দিন পড়িয়া নিদ্রা যায় ও সঞ্চিত মধু পান করে। ইহাদের দ্বারা কার্য্যশীল মক্ষিকাদিগের কার্য্যেরও বহু পরিমাণে অনিষ্ট হইয়া থাকে। সে জন্য অনেক সময় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মক্ষিকাদল একত্র হইয়া ঐ "আলালের ঘরের দুলাল"দিগের পাখা ছিঁড়িয়া উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়।

বসন্তের প্রারম্ভ হইতে শরতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে। শরতের প্রারম্ভেই তাহাদিগকে চাকে প্রবেশ করিতে হয়। তারপর ৬ মাস আর বাহির হয় না। সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতেই আহার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। চাকে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অধিবাসী-সংখ্যার এবং সঞ্চিত আহার্য্যের একটা হিসাব হয়। অবস্থা বুঝিয়া হিসাবের পরদিন প্রত্যূষে নিষ্কর্ম্মা পুরুষগুলির নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই সঙ্কেত অনুসারে দলে দলে ক্লীব মক্ষিকা আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে ও মারিয়া ফেলে। ঐ হতভাগাদিগের হুল নাই। সুতরাং আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া জীবন দিতে বাধ্য হয়।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

☞ আমরা এই প্রবন্ধটির উপসংহারে, পাঠকের প্রীত্যর্থে, ঊনবিংশতি শতাব্দীর অন্যতম তত্ত্বগুরু মহামতি ফ্রান্সিস্ নিয়ুমানের তিনটি প্রসিদ্ধ পংক্তি উপহার স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। নিয়ুমান, এই জড়জগতের অনন্ত দৃশ্যে, মনঃশক্তির পরিচয়-প্রসঙ্গে কহিয়াছেন,—

"The geometry is celebrated, which conducts the honeycell,
Husbanding the wax with scientific thrift,
Yet none imagine that the bee is mentally a geometer :"

ইহার ভাবানুবাদে বাঙ্গালায় সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে,——

বিচিত্র জ্যামিতিবিদ্যা জগতে বিদিত,
বিরচয়ে যাহা মধুক্রম মনোহর,
বৈজ্ঞানিক যত্নে রক্ষি মধূত্থনিকর,—
কেহ ত বলে না মক্ষী জ্যামিতি-পণ্ডিত!

(সম্পাদক)

মহাকবি মাঘ-কৃত

শিশুপাল-বধ। *

প্রথম সর্গ।

(কৃষ্ণ নারদ সম্ভাষণ।)

(১)

শাসিতে জগৎ জগত-আধার
নিবাসি শ্রীবাস বসুদেব ঘরে,
দেখিলা শ্রীপতি একদা অম্বরে
নামিছেন মুনি ব্রহ্মার কুমার।

(২)

বক্রভাবে রবি করেন গমন ;—
ঊর্দ্ধ-শিখা-যুত জ্বলে হুতাশন ;—
এই তেজোরাশি † চৌদিকে স্ফুরিত
অধোগামী হেরি' সকলে বিস্মিত।

(৩)

তেজোরাশি হরি দেখিলা প্রথমে,
দেহীর আকার প্রকাশিল ক্রমে ;
পরে অঙ্গ-যুত পুরুষ-মূরতি
নিরখি' নারদে চিনিলা শ্রীপতি।

(৪)

নব মেঘতলে ক্ষণ মুনিবর
শোভিলা কর্পূর-ধবল বরণ,
বিভূতিধবল যেমতি শঙ্কর,
গজাজিন § তুলি' নাচেন যখন।

(৫)

শারদ চন্দ্রমা সম কান্তি তাঁর,
কমল-কেশর-পীতজটাভার,
তুষারে মণ্ডিত হিমগিরি প্রায়
আবৃত পিঙ্গল ব্রততীমালায়।

(৬)

কৃষ্ণাজিনে ঢাকা সেই শ্বেতকায়,
আঁটা কটিতটে পীত মুঞ্জদাম,
যেন নীলবাসে সিত বলরাম,
বাঁধা অন্তরীয় স্বর্ণ মেখলায়।

(৭)

হিম শুভ্রদেহে শোভে উপবীত
নন্দনের স্বর্ণ-লতার গঠন,
গরুড়ের পক্ষসম সুলম্বিত,
শরদের মেঘে বিজলী যেমন।

(৮)

শোভে পৃষ্ঠদেশে মৃণাল-ধবল
চমরুর চর্ম্ম স্বভাব-সুন্দর,
বিচিত্র উজ্জ্বল রোমে সুকোমল
ইন্দ্রাসন যেন ঐরাবত'পর।

(৯)

করে জপমালা স্ফটিকে গঠিত,
নিত্য বীণা-তার-কর্ষণে লোহিত

† নারদরূপী তেজোরাশি।
§ গজ চর্ম্মের সহিত নবমেঘের উপমা।

* রঘুবংশের অনুবাদক শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

নখরাজি-প্রভা পড়িয়াছে তায়,
যেন অর্দ্ধ-গাঁথা প্রবাল মালায়।

(১০)

বাজিছে "মহতী" নারদের বীণা,
সুস্বর-লহরী পবন তাড়নে
তাল মান লয় খেলে সমূর্চ্ছনা,
হেরিছেন মুনি ঘন বীণা পানে।

(১১)

অতীন্দ্রিয়-জ্ঞাননিধি তপোধনে
নমি দেবগণ লইলা বিদায়;
দানব-সূদন কেশব-সদনে
উতরিলা মুনি যেন অমরায়।

(১২)

অস্তগামী ভানু প্রায় মুনিবর
না নামিতে ভূমে, অগ্রে পীতাম্বর
উচ্চাসন হ'তে উঠিলা ত্বরিত
গিরি হ'তে যেন মেঘ সতড়িৎ। *

(১৩)

কৃষ্ণের সম্মুখে ভূমিতে তখন
রাখিলেন পদ ব্রহ্মার নন্দন,
ভরে নত-ফণা ধরে ফণিগণে
ঊর্দ্ধে দৃঢ় করি পাতালে যতনে।

(১৪)

অর্ঘ্য যথাবিধি দিয়া নারায়ণ
পূজিলেন সেই সাধু মুনিবরে,
ইচ্ছা করি কভু মনীষী সুজন
না রাখেন পদ অসাধুর ঘরে।

(১৫)

হিমাচল আর নীলাঞ্জন গিরি
জিনি দাঁড়াইলা নারদ শ্রীহরি।

* পীতবসনের আভা বিদ্যুদ্বৎ।

না দেখিতে লোকে, স্বকরে আসন
দিলেন মুনিরে মুনিপুরাতন।

(১৬)

নীলমণিনিভ কৃষ্ণের সম্মুখে
উচ্চাসনে বসি শুভ্র ঋষিবর,
বিরাজিলা যেন শ্যাম সন্ধ্যা-মুখে
উদয় শিখরে স্থিত শশধর!

(১৭)

পূজায় প্রসন্ন করি মুনিবরে
লভিলা পরম প্রীতি নারায়ণ,
যে প্রীতির তরে মহাত্মা নিকরে
করেন যতনে পূজ্যের পূজন।

(১৮)

কমণ্ডলু হ'তে লয়ে নিজ করে
পাপ-বিনাশন নানাতীর্থবারি,
করিলা প্রক্ষেপ নারদ আদরে,
নতশিরে তাহা লইলা মুরারি।

(১৯)

মুনিবাক্যে যবে সুবর্ণ আসন
গ্রহিলা শ্রীহরি জলদ-বরণ,
সুমেরুশিখর হল বিড়ম্বিত
নীলজম্বুফলে যবে সুশোভিত। *

(২০)

চন্দ্রের শ্যামিকা জিনিয়া বরণ,
পীতবাস যেন তরল কাঞ্চন
বিরাজিলা হরি নীলাম্বুধি প্রায়,
ব্যাপৃত যখন বাড়ব-শিখায়!

* স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের কৃষ্ণবর্ণ ফলের সহিত কৃষ্ণের উপমা।

(২১)

কেশবের সেই শ্যাম-দেহ-তেজে
মিশিল ঋষির শুভ্র-দেহ-ভাতি,
পশিয়া কম্পিত তরুপত্র মাঝে
মিশে নিশাকালে জোছনা যেমতি। *

(২২)

সপ্তপর্ণ-রেণু শ্বেতমুনিবর,
তমাল কুসুম—শ্যাম নারায়ণ—
স্ফুরিত আভায় মিলি পরস্পর
একবর্ণ হ'ল উভয় বরণ।

(২৩)

সুতনু শরীরে ধরেছিলা হরি
যুগান্তে বিশাল এ বিশ্ব সংসার,
ধরিতে অক্ষম আজি কৈটভারি
মহর্ষি-দর্শনে আনন্দ অপার!

(২৪)

লভি সূর্য্যতেজা ঋষি দরশন
হরষে কৃষ্ণের নয়ন-কমল
সুপ্রসন্ন হ'ল "রাজীব-লোচন"
নাম তাঁর আজি হইল সফল!

(২৫)

মৃদু হাসি' হরি বচন রুচির
কহিলা, বিমল দশন-প্রভায়
উজলি মুনির ধবল শরীর,
শ্বেত-সৌধ যথা কৌমুদী-ছায়ায়।—

* রাত্রিকালে শ্যামায়মান তরু পত্র সমূহ যখন মৃদু বায়ুতে কাঁপিতে থাকে, তদ্বিবর অর্থাৎ ফাঁকের মধ্যে শুভ্র জ্যোৎস্না প্রবেশ করিলে শ্বেত ও কৃষ্ণের মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব শোভা হয়।

(২৬)

"ত্রিকালেই শুভ তব দরশন—
পূর্ব্ব পুণ্যফলে লভে তাহা নরে,
বর্ত্তমানে তাহা পাপ-বিনাশন,
সাধে তা মঙ্গল ভবিষ্যের তরে।

(২৭)

"সহস্র কিরণে প্রকাশি ভাস্কর
অক্ষম যে তমঃ করিতে সংহার,
অমিত তোমার তেজে মুনিবর,
বিনাশে মোহের নিবিড় আঁধার।

(২৮)

"নিশ্চিন্ত বিধাতা প্রজাহিত তরে
সুপাত্র জানিয়া আরোপি তোমারে
বিপুল সম্পদ—বেদের ভাণ্ডার,
দান বিতরণে ক্ষয় নাহি যার।

(২৯)

কলুষ-বিনাশি তব দরশন
লভিয়া কৃতার্থ যদিও এ মন,
তবু ইচ্ছা শুনি সুবাক্য তোমার—
শ্রেয়ো বস্তু ভোগে তৃপ্তি হয় কার?

(৩০)

"আগমন-হেতু জিজ্ঞাসি কেমনে?
স্পৃহাহীন তুমি জানে সর্ব্বজন;
দিয়াছ যে মান হেথা আগমনে
করিয়াছে তাহে সাহস বর্দ্ধন!"

(৩১)

উত্তরিলা ঋষি চাহি কৃষ্ণপানে—
"কেন হেন রূপ কহিছ, সুধীর?
আসিয়াছি, হরি, তব দরশনে,
এ হ'তে অধিক কি আছে যোগীর?

(৩২)

"রোধে মুক্তি-পথ বাসনা বিষম,
যে মুকতি-পথে, অক্ষুণ্ণ, দুর্গম,
ধার্ম্মিকের তুমি অভয় আশ্রয়,—
পেলে যাঁরে, ভবে ফিরিতে না হয়।

(৩৩)

"জানে পুরাবিদ্, তুমি উদাসীন
অনাদি পুরুষ, বিকার-বিহীন,
প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন স্বরূপ,
সংযত মানসে হেরে অন্যরূপ।

(৩৪)

"নাগলোক-ছাদ সদৃশ ধরায়
বরাহ রূপেতে তুলিয়া হেলায়,
রাখিয়াছ তুমি, বিশ্ব-শিল্প-কর,
ফণীন্দ্রের ফণা স্তম্ভের উপর!

(৩৫)

"তব আদিরূপ মহিমা অপার
করিতে বর্ণন শকতি কাহার?
ভব-পাশ-নাশী গুণে দেবাসুরে
জিনিয়াছ তুমি নর-অবতারে।

(৩৬)

"স্বর্গ হ'তে ভবে আসিয়াছ তুমি
হরিতে ধরার উৎপীড়ন-ভার;
এবে তব ভরে গুরু সেই ভূমি,
স্থিত ত্রিজগৎ উদরে তোমার।

(৩৭)

"জগতের অরি করিতে সংহার
নিজ তেজে তুমি না এলে ধরায়,
এ দর্শন লাভ হ'ত কি আমার
যতীরাও যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়?

(৩৮)

"তুমিই সক্ষম রক্ষিতে ধরারে
মদান্ধগণের ঘোর অত্যাচারে,
নৈশ-তমোরাশি-মলিন অম্বর
কে করে ক্ষালন বিনা দিবাকর।

(৩৯)

"কংস আদি ভূপ হরিণের প্রায়,
তারি বধে লোকে তব গুণ গায়;
অগৌরব তাহা, বধিলা যে হরি
হিরণ্যাক্ষ্য আদি মহাসুর করী—

(৪০)

"আপন ইচ্ছায় শ্রম পরিহরি
ক্রমে দুষ্টদলে দমিছ, শ্রীহরি;
তথাপি আলাপ করিতে নির্জ্জনে
লোলুপ মানস, আজি তব সনে।

(৪১)

"বৃত্রহা ইন্দ্রের আদেশে এখন
যে বাক্য বলিব বিশ্ব-হিত-কর,
হে উপেন্দ্র, তাহা করহ শ্রবণ;
ইন্দ্র-কার্য্যে তুমি সদাই তৎপর।"

ক্রমশঃ

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির,
তদবধি প্রভু চিত্তে হইলা সুস্থির।" (ভা)

গৌরাঙ্গের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য এক্ষণ হইতে একটুকু কমিতে লাগিল। বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের পর হইতেই তিনি একটুকু ধীর ও গম্ভীর হইলেন। তিনি আগে অনেক সময়ই বাহিরে থাকিতেন; এখন প্রায় সকল সময়ই বাড়ীতে পুঁথি পত্র লইয়া নিবিষ্টমনে অধ্যয়ন করেন; এবং যখন সুযোগ পান, তখনই শোক-সন্তপ্ত পিতা মাতার কাছে যাইয়া, শিশু-সমুচিত বিবিধ সুকুমার কৌশলে, তাঁহাদিগের চিত্ত সন্তর্পণে যত্নপর হন। আগুনে কখনও অমৃত উছলে না, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু যাঁহাকে তত্ত্বদর্শী ঋষিতাপসেরা "আনন্দরূপমমৃতং" বলিয়া অহোরাত্র হৃদয়ে আরাধনা করিতেন, তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কৌশলে, এই পৃথিবীর অনেক স্থলে, শোকের মুমূর্ষাহি তুষানলের মধ্য হইতে অমলস্নেহের অমৃত উথলিয়াছে। বালক-গৌরাঙ্গের হৃদয় এখন সেই অমৃতে অভিষিক্ত,—আর বালকের অশান্ত আকর্ষণে শচী ও জগন্নাথের প্রাণও ক্ষণ সেই অমৃতেই অল্প অল্প আর্দ্রীভূত। কেহই মুখ ফুটিয়া কোন একটি কথা কহেন কেহই কাহাকেও প্রবোধ কিংবা সান্ত্বনা দানে যত্নপর হন না। অথচ সকলেই একে অন্যকে একটুকু সুখী করিবার জন্য সতত চিন্তিত—সতত ব্যাপৃত। সকলেরই মুখচ্ছবি, যেন স্নেহের কেমন এক ঔদাস্যমিশ্র মাধুরী অথবা অমৃতময় আভায় আভাসিত।

"খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে,
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে।
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়,
আর বার উলটিয়া সবারে ঠকায়।
নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে,
দুঃখ পাসরায় সুখে জননী জনকে।" (ভা)

জগন্নাথ মিশ্র নিজে এক জন সুযোগ্য পণ্ডিত; সুতরাং তাঁহার বাড়ীতে অনেক সময়ই নবদ্বীপবাসী যোগ্য-বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের যাতায়াত হইত। সেই সকল পণ্ডিত মহাশয়েরা ধীরে ধীরে গৌরাঙ্গের অপার্থিব প্রতিভার পরিচয় পাইতে লাগিলেন, এবং সাত বছরের বালককে ব্যাকরণ শাস্ত্রে গাঢ়-প্রবিষ্ট দেখিয়া, অনেকেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিলেন। কেহ বলিলেন, এ বালক বাঁচিয়া থাকিলে বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত হইবে।

কেহ বলিলেন, ইহার মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন বালক ত্রিভুবনে কাহারও ঘরে নাই। প্রশংসার তরল ভাষায় সকল সময়েই একটুকু প্রীতিমুখরিত অতিবাদ থাকে। কিন্তু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে ইহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে যে, তিনি সাত বৎসর বয়সের সময়ই, বুদ্ধি ও মেধার অনন্যসাধারণ তেজস্বিতায়, দশ জনের দর্শনীয়। আকৃতি-তত্ত্ববাদীরা বলিয়া থাকেন,—

"যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।"

অর্থাৎ যেখানে সুন্দর আকৃতি, সেখানেই বিবিধ সদ্গুণের নিত্য বসতি। এ কথা, সকল স্থলে ও সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও, গৌরাঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছিল। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা, গৌরাঙ্গের আকৃতি দেখিয়া যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার সমুজ্জ্বলা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াও, তাঁহারা তেমনই বিস্ময় বোধ করিতে লাগিলেন।

"দেখিয়া অপূর্ব্ববুদ্ধি সবেই প্রশংসে,
সবে বলে ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে।
সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ স্থানে,
তুমি ত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে।"(ভা)

এ প্রশংসা, জগন্নাথের অন্তরে, অন্য সময়ে, অবশ্যই, শ্বেত-চন্দন-লেপের ন্যায়, শীতল বোধ হইত; কিন্তু এখন উহা ঠিক বিষের ছিটার মত স্পৃষ্ট হইল। গৌরাঙ্গের এইরূপ প্রশংসাবাদে তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বরূপ তাঁহার বুকে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সে কথা, তিনি কিংবা শচী কখনও মুখে আনিতেন না বটে; কিন্তু সে সুগভীর শোক-স্মৃতি, কিবা শয়নে, কিবা জাগরণে, সকল সময়ে লুক্কায়িত বহ্নি-শিখার ন্যায়, তাঁহাদিগের বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলিত। পণ্ডিতে যখন ক্রমেই গৌরাঙ্গের অত্যধিক প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন জগন্নাথ মিশ্রের হৃদয়ের মধ্যে অন্ধ অপত্যস্নেহ, আপনাই তেই যেন কহিয়া উঠিল, হা বিধাতঃ! তুমি এটিরেও কি লইয়া যাইবে? মিশ্রের আর কন্যা ছিল। তাহারা নাই। দুইটি পুত্র তাহারও একটি চিরজীবনের তরে অদৃ হইয়াছেন। মিশ্র, ষোলটি বৎসর কাল, তরুর মূলে জল সেচন করিয়াছিলেন, তরু, তিলে তিলে প্রবর্দ্ধিত এবং অনন্ত পুষ্পে পরিশোভিত হইয়া, জনক-জননী হৃদয়ে অসংখ্য আশার উৎস খুলিয়া দি ছিল। কিন্তু যেই ফলের সময় ঘনা আসিল, অমনিই উহা মায়াতরুর মো ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া, কে কোথায়, চলিয়া গেল। এখন একা গৌ ঙ্গই জগন্নাথ ও শচীর হৃদয়ের সম্বল ও নের সর্ব্বস্ব। জগন্নাথের বিকল হৃদয় পুনঃই যেন তাঁহাকে এই কথা লওয়াইত এ বালকের এত বেশী বিদ্যা বুদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে।

জগন্নাথ কএক দিন নীরবে ও নি ভাবে কেবলই এই সকল কথার ক করিলেন; তার পর, হঠাৎ এক দিন, বুদ্ধির ন্যায় গৌরাঙ্গের কাছে যাইয়া, হাত দুখানি হাতে তুলিয়া লইয়া, অতি

র বলিলেন, বাছা! তোমার লেখা পড়া জি হইতে এখানেই পরিসমাপ্ত হইল। মি তোমার পিতা। যদি এ কথার অন্যথা , তাহা হইলে আমার শপথ। তুমি যখন া চাহিবে, তাহা, যেরূপে হউক, আমিই মায় আনিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্তচিত্তে, াপদে ঘরে বসিয়া আনন্দ কর। যথা ন্য ভাগবতে,—

"আজি হ'তে আর পাঠ নাহিক তোমার,
ইহাতে অন্যথা কর শপথ আমার।
যে তোমার ইচ্ছা বাপ, তাহা দিব আমি,
ঘরে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি।"

জগন্নাথ এইরূপে গৌরাঙ্গের অধ্যয়ন বন্ধ রিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া যাওয়ার উদ্যোগ রিলেন। গৌরাঙ্গ কিছু ক্ষণ স্তব্ধের মত সিয়া রহিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, গৌরাঙ্গ মনে অপরিসীম কষ্ট পাইলেন; কিন্তু তিনি মুখে একটি কথা বলিয়াও পিতৃবাক্যের প্রতিবাদ করিলেন না। তিনি তাঁহার পিতাকে যেমন হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, তেমনই আবার ভয় করিতেন। জন্মাবধি শচীর উপরই তাঁহার সমস্ত আবদার ও ভালবাসার অত্যাচার। পিতার সহিত ব্যবহারে তাঁহার একটুকু পার্থক্য ছিল। তিনি পিতার কথায় কখনও বাদ-প্রতিবাদ করিতেন না, আজিও করিলেন না। জগন্নাথ মিশ্র যখন বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি তাঁহার দিকে চাহিয়া, টল টল চক্ষে, এইমাত্র বলিলেন, "আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।"

শচী কাছে ছিলেন। বালকের অন্তরের বেদনা তাঁহার অন্তরে গিয়া পহুঁচিল। শচী বিগত দুই বৎসরের নিত্যজীবনে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহার পাগল নিমাই খেলার জন্য যত উন্মত্ত, অধ্যয়নের জন্য তাহা অপেক্ষাও শত গুণ বেশী মত্ত। তিনি প্রতিদিনই দণ্ডে দশবার উঁকি দিয়া দেখিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গ যখন গাঢ় মনঃসন্নিবেশের সহিত অধ্যয়নে উপবিষ্ট হন, তাঁহার সে স্বর্ণোজ্জ্বল শরীর হইতে তখন কেমন একটা জ্যোতিঃ উছলিয়া পড়ে,—তখন তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তাই, অপণ্ডিত হইয়াও তিনি এইটুকু বুঝিলেন যে, পণ্ডিতবর মিশ্রপুরন্দরের এই ব্যবস্থা গৌরাঙ্গের পক্ষে অসহ্য ক্লেশকর। গৌরাঙ্গ যে সময়ে আবদার করিয়া শচীর মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিতেন, তখনও শচী, ক্ষণকালের তরে ক্রুদ্ধ না হইয়া, স্নেহে গলিয়া, গৌরাঙ্গের গায়ে হাত বুলাইতেন। সেই গৌরাঙ্গ, আজি মনের বিষাদে মুখ ভার করিয়া, মায়ের মুখ-পানে বারে বারে চাহিতেছেন। শচীর প্রাণে ইহা সহিল না। শচীর প্রকৃতিতে, ক্রোধ এক বস্তু, কখনও পরিস্ফুট হইত না। ফলতঃ, পতি-পুত্র কিংবা প্রতিবেশীর উপর কেমন করিয়া মানুষে ক্রোধ করে, ইহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার প্রকৃতির এ নবনীত-নিন্দি কোমলতার কথা উল্লেখ করিয়া, জগন্নাথও পূর্ব্বে কোন কোন সময়ে পরিহাস করিতেন। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে করিত। আজি শচী ক্রোধে ফুলিয়া রহি-

লেন, এবং যেই জগন্নাথ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, অমনিই পুত্রের হইয়া তাঁহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন।

শচী বলিলেন,—"তুমি এ কি ব্যবস্থা করিয়াছ? নিমাই যদি মূর্খ হইয়া ঘরে রহে, তাহা হইলে শেষ কালে তোমার ও আমার গতি হইবে কি?" জগন্নাথ কহিলেন,—"গতি—কৃষ্ণ।"

"মিশ্র বলে তুমি ত অবোধ-বিপ্রসুতা,
হর্ত্তা কর্ত্তা পিতা কৃষ্ণ,সবার রক্ষিতা।" ভা

জগন্নাথ আরও বলিলেন,—হা! দুদিনেই সব ভুলিয়া গেলে? তোমার কি এখনও পুত্রের পাণ্ডিত্য বিষয়ে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই? অবোধিনি! তোমার বিশ্বরূপ এখন কোথায়? বিশ্বরূপ ত তোমার বড় পণ্ডিত হইয়াছিল। তুমি কি নিমাই বিশ্বম্ভরকেও আবার বড় পণ্ডিত বানাইতে ইচ্ছা কর? এ সকল কথা আর মুখেও আনিও না। এই নিমাই এখন তোমার ও আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। নিমাই মূর্খ হইয়া ঘরে রহুক, তাহাতেই তোমার ও আমার প্রাণ শীতল রহিবে।

"এইমত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র,
জানিল সংসার সত্য নহে তিল মাত্র।
সর্ব্ব শাস্ত্র মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর,
অনিত্য সংসার হ'তে হইলা বাহির।
এও যদি সর্ব্বশাস্ত্রে হয় গুণবান্,
ছাড়িয়া সংসার সুখ, করিবে পয়ান।
এই পুত্র সবে দুই জনার জীবন,
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ।
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই,
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাই।" (ভা)

এইরূপ আলাপে দুই জনেই কতক ক্ষণ অশ্রুধারায় আপ্লুত হইলেন। কিন্তু শচীর স্নেহময় প্রাণ ভবিষ্যতের চিন্তায় আকুলিত হইলেও, উহা কোন প্রকারেই তাঁহার প্রাণের পুতুল নিমাইর পক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। তিনি কিছু ক্ষণ পরে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলাইয়া, ধীরে ধীরে, অতি অস্ফুট স্বরে, পুনরপি নিমাইর হইয়া বলিলেন,—মূর্খ হইয়া ঘরে রহিলে, কে ইহাকে কন্যা দান করিবে? মায়ের পোড়া প্রাণ পুড়িয়া যেন ভস্ম হইতে চাহে না। তাই মা শচীর অর্দ্ধদগ্ধ প্রাণে,মাতৃস্নেহেরই অচিন্তনীয় গুণে, আশার মৃদু মৃদু সঞ্চার। মায়ের এ আশা পূর্ণ হইবে ত!

জগন্নাথ আশাশূন্য না হইলেও, ঘোরতর অদৃষ্টবাদী এবং অকৃত্রিম বৈষ্ণব। তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভর কৃষ্ণনামের উপর! তিনি বলিলেন,—"বিবাহ মনুষ্যের ইচ্ছায়ত্ত নহে, উহাও নিয়তিনির্দ্দিষ্ট। কৃষ্ণ যাহার সহিত যে কন্যার বিবাহের বন্ধন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, সে আপনা হইতেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

"কিবা মূর্খ, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে,
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হবে আপনে।

জগন্নাথ আবার কহিলেন,—তুমি অবোধ অবলা অদৃষ্ট মান না। অদৃষ্টের ফলাফল আপনার ঘরেই কেন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে না? আমি এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও অন্ন-

বস্ত্রের অভাবে নিপীড়িত, অথচ যাহারা বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য মূর্খ, তাহারা সহস্র পণ্ডিতের দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পার যে, বিদ্যা মনুষ্যকে পালন করে না, মনুষ্যকে পালন করেন স্বয়ং কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। ভয় করিবার কথা কি?

"সাক্ষাতেই এই কেন দেখ না তোমার,
পড়িয়াও ঘরে ভাত নাহিক আমার।
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতে যে বা নারে,
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে।
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ,
কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন।"(ভা)

শচীর হৃদয়, আবার জগন্নাথের দিকে ফিরিয়া আসিল। সুপণ্ডিত জগন্নাথ, জ্ঞানে ও গুণে বড় হইয়াও, চিরজীবন যত কষ্ট পাইয়াছেন, তাহা শচীর মনে জাগিল। পতির জন্য সতীর দুঃখ হইল। পতির ব্যবস্থাই আবার ভাল লাগিল। পতিগত-প্রাণা শচীর সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। তিনি নিরুত্তর হইলেন। ভক্তি,প্রীতি ও স্নেহ-মমতা প্রভৃতি বৃত্তি, মানব-হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ হইয়াও স্বভাবতঃই অন্ধ। শচী ও জগন্নাথ, এখানে স্নেহের অন্ধতায়ই একে আর বুঝিয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন! উভয়েই এক-মনে স্থির করিলেন যে,পুত্র রুষ্ট হউক, আর তুষ্ট হউক, তাহার লেখা পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়াই সকল দিকে মঙ্গলজনক।

কিন্তু, পিতা মাতা যেমন একে আর বুঝিলেন, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গৌরাঙ্গও, যেন বুঝিয়া শুঝিয়া, এখন হইতে একে আর করিতে লাগিলেন। তিনি শিশুকালে যেমন উদ্ধত ছিলেন, আবার ঠিক্ তেমনই উদ্ধত হইয়া উঠিলেন, এবং নবদ্বীপের বহু বালক সঙ্গে যুটাইয়া পুনরায় নানাধিক ক্রীড়ার আমোদে নগরের পথে পথে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে,
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু সঙ্গে।
কিবা নিজ ঘরে প্রভু, কিবা পর ঘরে,
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে, অপচয় করে।
নিশা হইলেও প্রভু না আইসেন ঘরে,
সর্ব্বরাত্র শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে।" ভা

এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল আমোদের মধ্যে, এক দিন গৌরাঙ্গ দুই প্রহরের খরতর রৌদ্রের উত্তাপ মাথায় লইয়া, গঙ্গার তটে, বালুভূমির উপরে, বালক বৃন্দের সহিত লাঁফাইয়া ঝাঁপাইয়া খেলায় আছেন, এমন সময়ে, জগন্নাথ মিশ্র সেখানে যাইয়া উপস্থিত। জগন্নাথকে দেখিয়াই তিনি বাড়ী মুখে দৌড়িয়া চলিলেন, এবং জগন্নাথও হাতে একখানি "ছড়ি"লইয়া, তাঁহার পাছে ছুটিলেন। গৌরাঙ্গ যখন বাড়ীর অদূরে, তখন শচী ইহা দেখিতে পাইয়া পুত্রকে কোলে সাপটিয়া লইলেন, এবং জগন্নাথকে সক্রোধ কণ্ঠে দুই একটি কথা বলিলেন। শচী মনে করিয়াছিলেন যে, জগন্নাথ সত্য সত্যই গৌরাঙ্গকে প্রহার করিবেন। অবোধ অবলা, এরূপ স্থলে, অনেক সময়েই পতি-হৃদয়ের গূঢ়গতি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া থাকে। স্বভাব-কোমলা শচীও যে শোকাকুল

পতির মনের গতি বুঝিতে পারিলেন না, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। কিন্তু জগন্নাথ যখন হাতের ছড়ি দূরে ফেলাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার গৌরচন্দ্রকে কোলে সাপটিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন শচীও নয়ন-জলে ভাসিয়া পতিপুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

"অন্তরে পোড়ায়ে মিশ্রের বাহিরে কঠিন,
ফেলিল হাতের সাট প্রেম-পরাধীন।
সজল-নয়নে পুত্র তুলি নিল কোলে,
পুত্রকে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে।"

এইরূপ ঘটনা ইদানীং প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতে লাগিল, এবং বিশ্বরূপের শোক-বহ্নি জগন্নাথ ও শচীর বুকের মধ্যে দিবা রাত্রি কিরূপ জ্বলিতেছিল, সকলেই তাহা বুঝিতে পাইল। অপিচ, এবার শত অত্যাচার সত্ত্বেও প্রতিবেশীরা গৌরাঙ্গের উপর বিরক্তি দেখাইল না। গৌরাঙ্গ অধ্যয়নে কিরূপ অনুরক্ত, তাহা তাহারা দেখিয়াছিল। তাই তাহারা জগন্নাথ মিশ্রের অদৃষ্টলিপির উপরই সমস্ত দোষ আরোপণ করিল। প্রতিবেশীরা সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গের মধুর প্রকৃতি যে এইরূপ বিকৃত হইতেছে, শোকাহত জগন্নাথ মিশ্রের অবিহিত ব্যবস্থাই তাহার মূল।

শচীও কিছু দিন পরেই আবার পুত্রের সপক্ষ হইলেন। এক দিন জগন্নাথ মিশ্র বাড়ীতে নাই, এমন সময়ে শচী ঘরের বাহির হইয়া দেখেন যে, গৌরাঙ্গ মনে একটুকু বিরক্ত কিংবা ক্রুদ্ধ হইলে, ছোট বেলায় যেমন বাড়ীর অপবিত্র আবর্জ্জনার আগারে, হাঁড়ি পাতিলের উপরে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন, আজিও সেইরূপ বসিয়া রহিয়াছেন।

"লাগিল হাঁড়ির কালি সব গৌর-অঙ্গে,
কনক পুতলি যেন হাসে বহু রঙ্গে।" (ভা)

শচী দৌড়িয়া কাছে গেলেন। কিন্তু এবার আর হাতে ছড়ি তুলিয়া নিতে পারিলেন না। বিশ্বরূপ যে দিন চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার হাতের ছড়ি খসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার হাত দু'খানি অবশ হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাই হাতে কিছু না লইয়াই দৌড়িয়া গেলেন, এবং সম্মুখে যাইয়া অতি মিষ্ট স্বরে বলিলেন,—বাছা নিমাই! তুই আবারও সেইরূপ অপবিত্র স্থানে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলি?

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—মা! কি পবিত্র কি অপবিত্র তাহা আমি অশিক্ষিত ও ভাল-মন্দ জ্ঞান-বঞ্চিত গণ্ড মূর্খ কি প্রকারে বুঝিব?

"মূর্খ আমি, না জানি যে ভাল মন্দ স্থান,
সর্ব্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান।"

কহিতে কহিতে, আবার সেই শৈশবের অমানুষী ভক্তি, ভক্তপাবনী ভাগীরথীর ন্যায় সহসা তাঁহার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া রসনায় ঝরিল। বলিলেন;—মা! যে মস্তক বস্তু অনন্তদেব বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সেবার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহাও কি কখনও আবার অপবিত্র হইতে পারে? তাহার স্পর্শ লাভেও অশুচি শুচি হইয়া যায়।

"এ সব হাঁড়িতে মূলে নাহিক দূষণ,
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন।
বিষ্ণুর রন্ধন হাড়ি কভু দুষ্ট নয়,
এ হাঁড়ির পরশে আর স্থান শুদ্ধ হয়।"(ভা)

শচী গৌরাঙ্গের এই সকল কথা শুনিয়া এখন আর পূর্ব্বের মত হাসিলেন না,—হাসিতে সাহস পাইলেন না। তিনি জন্ম-যোগী বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া বিষাদে জর্জ্জরিত হইলেন। কিন্তু পুত্রকে বশে না আনিলেই নয়, এই জন্য পুনরপি বলিলেন,—

বাছা! লোকে এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাইলে, তোরে কি আর ভদ্র লোক বলিয়া আদর করিবে?

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—মা, যে বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত থাকে, তাহার আবার ভদ্রাভদ্র কি?

"প্রভু বলে যদি মোরে না দেহ পড়িতে
তবে আর নাহি যাব কহিনু তোমাতে।"ভা

শচী এতক্ষণের পর বালকের হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং নানারূপে সাধিয়া ভজিয়া, স্নান করাইয়া ঘরে লইয়া গেলেন। ইহার কিছু ক্ষণ পরেই জগন্নাথ মিশ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনিও শচীর কাছে সকল কথা শুনিয়া, এবং বালকের ভাব-ভঙ্গী আলোচনা করিয়া, পুনরায় তাঁহাকে অধ্যয়নের অনুমতি দিলেন।

এই সময়ে গৌরাঙ্গের জীবনে এক দিন একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। বাড়ীতে বিষ্ণুনৈবেদ্য সজ্জিত ছিল। গৌরসুন্দর সেই বিষ্ণুনৈবেদ্য হইতে একটি পানের খিলি খাইয়া তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। খানিক পরে, যখন পিতা মাতার সস্নেহ প্রযত্নে, তাঁহার ভালরূপ সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন তিনি,

শচী ও জগন্নাথ উভয়ের দিকে চাহিয়া, একটি অদ্ভুত কাহিনী বলিলেন। তিনি কহিলেন,—আমি আজি আমার দাদা বিশ্বরূপকে দেখিতে পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি যেন আমাকে এখান হইতে লইয়া গেলেন, এবং আমাকে সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য উপদেশ করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে,—

"এক দিন নৈবেদ্যতাম্বুল খাইঞা,
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা।
আস্তে ব্যস্তে পিতা মাতা মুখে দিলা পানি,
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অদ্ভুত কাহিনী।
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লৈয়া গেলা
সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা।"

শচীর শরীর ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু বিশ্বরূপের নাম শ্রবণে তদীয় হৃদয়ের তন্ত্রীতে আর এক দিকে টনক লাগিল। তিনি কহিলেন,—তার পর?

গৌরাঙ্গ কহিলেন, "তার-পর আমি কহিলাম, দাদা! আমার পিতা মাতা উভয়েই অনাথ। আমি এ বয়সে তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া ভাসাইয়া আসিব? আমি অবোধ বালক, এ বয়সে সন্ন্যাসের কথাই বা আমি কি বুঝিব? আমি যদি ঘরে থাকিয়া পিতা মাতার সেবা করি, তাহাতেই লক্ষ্মীনারায়ণ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

"আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাতা,
আমিহ বালক সন্ন্যাসের কিবা কথা।
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃমাতৃ-সেবন
ইহাতে সন্তুষ্ট হবে লক্ষ্মীনারায়ণ।" (চ)

গৌরাঙ্গ ক্ষণেক পরে, শচীকে সম্ভাষণ করিয়া আবার বলিলেন,—

"মা, দাদা বিশ্বরূপ আমার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমাকে পুনরায় এখানে রাখিয়া গেলেন, এবং তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম জানাইলেন।"

"তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইলা মোরে,
মাতারে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে।"

কবিরাজ গোস্বামী এই কাহিনীটিকে অদ্ভুত কাহিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অদ্ভুত অথবা যার-পর-নাই অলৌকিক হইলেও এইক্ষণ আর বিজ্ঞ-বিচক্ষণের নিকট অপ্রাকৃত বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না। এই কাহিনীর অর্থ কি? ইউরোপের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদীরা ইহা অশেষ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, যে যাহারে অত্যন্ত ভালবাসে, সে তাহারে অনেক স্থলেই অন্তিম-কালে একবার দেখা দিয়া যায়;—*অথবা যদি উভয়েরই শরীর-মনে অধ্যাত্ম-শক্তি(Psychic Power) একটু বেশী থাকে, তাহা হইলে, একে অন্যের আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করে;—এবং যেখানে তাদৃক্ শক্তি নাই, সেখানেও পারিপার্শ্বিক আর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইলে, হয় স্বপ্নে, না হয় আবেশে, না হয় অপূর্ব্ব ছায়া-মূর্ত্তিতে, ক্ষণমাত্রের তরে, প্রিয়তমের সন্নিহিত হইয়া থাকে। ভ্রাতৃস্নেহবদ্ধ বিশ্বরূপও কি তাহাই করিয়াছিলেন?

বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক Balfour Stewart F. R. S. উক্ত অনুসন্ধান-সমিতির সভাপতি ছিলেন, এবং Professor Barret ও Professor Lodge প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য গূঢ় গভীর তত্ত্ব-সমালোচনায় সম্পাদকত্রয়ের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে গ্রন্থ-প্রকাশের পর অধ্যাত্ম-তত্ত্ব সংক্রান্ত বিবিধ কথার আলোচনায়, ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজে ভয়ঙ্কর হুলুস্থুলু পড়িয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের পুরাতন হিন্দু প্রাচীন সময় হইতে যে সকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সে সকল তত্ত্বের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় নব্য-শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সমস্ত সূক্ষ্ম কথাকেই মোটা কথায় প্রেত-তত্ত্ব নামে নির্দ্দেশ করিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন। ইহা তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষা ও উচ্চাশয়তার উপযুক্ত হয় কি?

* মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনার জনকে এই প্রকার দর্শন দানের অসংখ্য প্রামাণিক বৃত্তান্ত Edward Gurney, M. A., Frederic W. H. Myers, M. A. এবং অনস্তিবাদীর অগ্রগণ্য Frank Podmore, M.A. এই তিন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সম্পাদকতায় সঙ্কলিত ও লণ্ডনস্থ Phychical Research Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত, Phantasms of the Living নামক বিখ্যাত ও দুই ভালুমে সমাপিত বৃহৎগ্রন্থে সবিস্তরে বর্ণিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে জড়-

এই ভারতভূমির পশ্চিমপ্রান্তে, ঐ সময়ে, পাণ্ডুপুর নামে একটি পুণ্যময় তপোবন ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যার মত তাপস-সন্ন্যাসীদিগের সে পাণ্ডুপুর এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও অনেক ভক্ত-বৈষ্ণব, পাণ্ডুপুরে যাইয়া, উহার ধূলি তুলিয়া লইয়া, গায়ে মাখিয়া থাকেন। কিন্তু পাণ্ডুপুরের সে পুরাতন ও পবিত্র তপঃশোভা এখন আর মনুষ্যের মনোমোহন করে না। মহামুনি মাধবেন্দ্রের অন্যতম মুখ্য শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী বলিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কথা অনুসারে বৈষ্ণব-গ্রন্থপত্রে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, বিশ্বরূপ শঙ্করারণ্য নাম গ্রহণের কিছুদিন অন্তর বহু পর্য্যটনের পর, পাণ্ডুপুরের পূত-প্রশান্ত তপোবনে যাইয়া অধিষ্ঠিত হন; এবং সেখানে নবীন যৌবনে, নয়ন মুদিয়া, বিশ্বময় পরাৎপরের ধ্যান করিতে করিতে, পৃথিবীর জীবন পরিত্যাগ করেন। তিনি কি সেই সময়ে, প্রাণের প্রবল টানে, নবদ্বীপ আসিয়া, তাঁহার প্রাণের নিমাইকে একবার দেখা দিয়াছিলেন? না, নিমাইর ভক্তবৎসল আত্মাকে যোগ-ভক্তিবলে আপনার কাছে আকর্ষণ করিয়া, মহা-প্রয়াণের পূর্ব্বে মা শচীকেও তাঁহার প্রণাম জানাইয়াছিলেন? বিশ্ব অনন্ত। বিশ্বের সমস্ত রহস্যই অনন্ত ও অতল সমুদ্রের ন্যায় মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। দু'দিনের মনুষ্য, দীপ-শিখাস্বরূপ অদীক্ষিত বুদ্ধির ক্ষীণালোকে, কিরূপে এ সকল পারমার্থিক রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবে? জগন্নাথ মিশ্রও আর এক দিন স্বপ্নাবেশে এইরূপ এক বিস্ময়াবহ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যেন তাঁহার নিমাই, নবীন-সন্ন্যাসীর বেশে, করে কমণ্ডলু লইয়া, নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোক নিমাইকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তনে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে।

"অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ কহন না যায়,
হাসে নাচে কাঁদে কৃষ্ণ বলিয়া সদায়।"(ভা)

বৈজ্ঞানিকেরা, এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্নেরও * অর্থ করিতে যত্নপর হইয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকার বহু ঘটনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ ও অর্থালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা একটুকু বেশী সত্ত্বগুণান্বিত, তাঁহাদিগের আত্মায় কখনও কখনও প্রিয়তম জনের ভাবি জীবনের চিত্র-প্রতিবিম্বি ছায়াপাত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বহুলোকই এখন পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিকতার এ সকল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা অতি

* অধ্যাত্মবাদীদিগের মতে ইহার নাম Psychometric Dream. সাইকোমিট্রিক অর্থাৎ সূক্ষ্মচিত্রদর্শন-শক্তিসম্পন্ন বহু লোক অদ্যাপি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন। তাঁহারা কাহারও নিত্যব্যবহারের কোন একটি বস্তু দেখিতে পাইলে, সেই বস্তুর প্রতি স্থির-নেত্রে তাকাইয়া, বিনা স্বপ্নেও তদীয় অতীত ও সম্মুখবর্ত্তি জীবনের সমস্ত ঘটনাচিত্র প্রত্যক্ষবৎ বলিয়া দিতে পারেন।

সুশিক্ষিত ও সজ্জন হইলেও,তাঁহাদিগের দৃষ্টি, চিরপ্ররূঢ় সংস্কারের শাসনে, স্থূল-গঠিত জড়-প্রাচীরের পর-পারে যাইতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনাই পিতা ও পুত্র উভয়ের হৃদয়ে অতি গভীর ভাবে

অঙ্কিত রহিয়াছিল ; এবং যাহা হৃদয়ের অতি
গভীরতম প্রদেশে লুকায়িত ছিল, তাহাই
এক জনের স্বপ্নে ও আর এক জনের আ-
বেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইল। হা!
মনুষ্য, তুমি কত কাল অভিমানের বিকারে
অন্ধ রহিয়া আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিবে!

পুরীর রথ আর পুরীর পথ।

পুরীর রথ, এই সাগরাম্বরা ভারত-ভূমিতে, অসংখ্য পৌরাণিকের প্রাণারাধ্য পদার্থ। যাঁহারা, পুরাণ-শাস্ত্রের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া, ভক্তির অমৃত-রস-স্বাদে ইচ্ছুক নহেন, পুরীর প্রেম-কোলাহলময় রথের উৎসব তাঁহাদিগের হৃদয়েও একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মাইয়া থাকে। এক দিকে অপার, অতল, সুনীল-সমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ-মালা, আর এক দিকে অসংখ্য ভক্ত-ভাবুকের ঊর্দ্ধনেত্র মুখ-মালা ;—এক দিকে শত সহস্র সামুদ্র-তরঙ্গের ভৈরব-গর্জ্জন, আর এক দিকে শত সহস্র সুভাষিত-মৃদঙ্গের জলদ-গম্ভীর মধুর নিঃস্বন। সম্মুখে—কোটিহৃদয়ের আরাধনার ধন—রথস্থ বামন। এ অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিলে কাহার প্রাণ না উথলিয়া উঠে?

কিন্তু পুরীর রথ যেমন স্মরণীয় বস্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, পুরীর পথ তেমন স্মরণীয় বস্তু নহে। প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, পুরীর রথোৎসব বর্ণনা করিয়া,

আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন ; অথ
যখনই আবার কথাপ্রসঙ্গে পুরীর পথ-ক্লেশ
ও দুঃখ-দুর্গতির কথা উঠিত, তখনই তাঁ-
হারা ঘৃণায় সংকুচিত, এবং বিদ্বেষ-বিরক্তি
ও ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া, ভগবৎ-পাদ-
পদ্মের উদ্দেশ্যে বারংবার নমস্কার-পূর্ব্বক
কহিতেন যে, ঠাকুরের রথ যেন চিরকাল
প্রাণে অঙ্কিত থাকে ; কিন্তু ঠাকুরের দে
রথ-দর্শনের পথ যেন কখনও আর মনে না
পড়ে। তাঁহাদিগের চিত্তে এক দিকে ঐরূপ
তদ্গত ভক্তির কারণ থাকা অভক্তও কতকটা
অনুমান করিতে পারে। আর এক দিকে
তাদৃক্ অস্থি-পঞ্জর-ভেদি বিদ্বেষ-বিরক্তির
অবশ্যই বিশেষ কিছু কারণ ছিল। সে কা-
রণ পথের দুর্গমতা আর দুর্দ্ধর্ষ-দস্যু-ভীতি।

যাঁহারা পদব্রজে পুরী যাইতেন, তাঁহা-
দিগের মধ্যে অনেকে প্রাণে মারা পড়িতেন;
—অনেকে প্রাণে মারা না পড়িলেও, অনা-
হার ও অনিদ্রার ক্লেশে, অর্দ্ধমৃতবৎ দেশে

রিতেন। অনেকে, অর্থসম্পদের মহিমায়,
কল অংশে, অপেক্ষাকৃত অক্লিষ্ট রহিয়াও,
থর কোন না কোন স্থানে, পুরুষানু-
মিক জাতিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, জীব-
নের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হাড়ে হাড়ে দগ্ধ
হইতেন ; এবং স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াও,
সে মর্ম্মদাহি দুঃখস্মরণে, মাঝে মাঝেই
নয়ন-জলে ভাসিতেন। কারণ, সে দুর্গম
পথে শুধুই চোর দস্যুর অত্যাচার সহিতে
হইত না। যে সকল হতভাগ্য সমৃদ্ধ ব্যক্তি
চোর-দস্যু হইতেও সমাজের অধিকতর
শত্রু,—সমাজের শক্তিশোষক, শান্তিনাশক
ও সামাজিক-জীবনের সুখ-ভিত্তি-বিঘাতক,
তাহারা তখন, আইভান্হো নামক বিখ্যাত
কাব্যবর্ণিত* নর্মান্ ভূস্বামী ও নাইট্-টেম্প্লার

প্রভৃতির ন্যায়, দস্যুর আবরণে দেহ আবরিয়া দল-বল-সহকারে দুঃস্থ পথিকদিগের উপর হানা দিত; এবং মনুষ্য যে বিপত্তি অথবা যে অপমানকে মৃত্যু হইতেও সহস্রগুণ বেশী ক্লেশকর মনে করে,—যাহার দুঃসহ স্মৃতি যুগপৎ শত-বৃশ্চিক-দংশনবৎ মৃত্যুকালেও মনুষ্যের প্রাণে জ্বালা জন্মাইয়া থাকে, অনেকের সম্পর্কে সেই বিপত্তি ও সেই অপমানের নিদান হইয়া, শ্রীধাম পুরীর প্রসিদ্ধ পথকে কুম্ভীপাকের পথ হইতেও অধিকতর কলঙ্কিত করিয়া তুলিত।

যে সকল উপাদেয় সামগ্রী, সাহিত্য-জগতে উপন্যাস-কাব্য নামে আদৃত, আলোচিত ও অনেকের পক্ষে অবসর-মুহূর্ত্তের এক মাত্র আশ্রয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বোধ হয়, তন্নিচয়েরও এক অংশ পুরীর রথ এবং

---

* এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ যখন লিখিত হয়,
তখন এদেশের একটি সুশিক্ষিত যুবা লেখ-
কের নিকট উপবিষ্ট। তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎ-
পন্ন, বাঙ্গালায় সুপণ্ডিত, অথচ ইংরেজীর
একটি অক্ষরের সহিতও তাঁহার পরিচয় নাই।
লেখক তাঁহারই অনুরোধের গৌরব-রক্ষার্থ
নিম্নস্থিত নোটটি পত্রস্থ করিতে বাধ্য হইলেন।
আইভান্হো ইংরেজী ভাষায় লিখিত
একখানি উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাস।
তাহার রচয়িতার নাম ওয়াল্টার স্কট্। আই-
ভান্হোর আখ্যায়িকা যে সময়ের কথা, সে
সময়ে ইংলণ্ডের নর্মান্ জাতীয় ভূস্বামি-
দিগের মধ্যে অনেকে বড় দুর্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্র
ছিল। তাহারা, দস্যু সাজিয়া, বহুসংখ্য

দস্যুতুল্য ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, বন-পথে বিচরণ করিত, এবং ভদ্রলোকের ঝি বউ কাড়িয়া লইয়া যাইত। ঐ সময়ে ইংলণ্ডে এক দল ধর্ম্মযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা নাইট্ টেম্প্লার নামে সর্ব্বত্র সম্মান পাইতেন। তাঁহারা, ইহুদী দেশে যাইয়া, মুসলমান সৈনিকদিগের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে নিজ নিজ বীরত্ব ও ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে, ধর্ম্ম-যাজকের পরিচ্ছদ পরিয়া,—ধর্ম্মের জয়-ধ্বজা উড়াইয়া, পুর-ললনার সর্ব্বনাশ সম্পাদনে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরের অর্থ-বিত্তাপহরণে, যত্নে ত্রুটি করিতেন না।

শ্রীকঃ

আর এক অংশ পুরীর পথ বলিয়া কল্পিত হইতে পারে। কেন না, ঐ সকল আখ্যায়িকার শেষ অংশ প্রায়শঃই প্রাণ-শীতল পবিত্র সৌন্দর্য্য; অথচ সে সৌন্দর্য্যে পহুঁচিবার পথটা, পুরীর রথ-দর্শন-পথের নায়, বিপজ্জনক ও কদর্য্য। কাব্যের এ কলঙ্ক কত কালে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে? পুরীর পথ এই ক্ষণ সুপরিরক্ষিত ও সুখ-শান্তিলভ্য সুসেব্য রাজপথে পরিণত হইয়াছে। কাব্যরথের আপাত-রমণীয় আতঙ্ক-সঙ্কুল পথ, আর কত কালে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়া, পথিক মাত্রেরই মঙ্গল্য হইবে? সমাজের এমন সৌভাগ্য কখন হইবে,—এমন দিন কবে আসিবে, যখন মাতা ও পুত্র, পিতা ও দুহিতা, ভ্রাতা ও ভগিনী, এবং শিক্ষক ও ছাত্র, এক সঙ্গে, একই কাব্য পড়িয়া ও একই কাহিনীর একই কথা একে অন্যকে শুনাইয়া, আনন্দে ভাসিবেন; এবং ভাব-বিহ্বল জ্ঞানীরা, এই অনন্ত-সৌন্দর্য্যময় জগৎ-কাব্যপাঠে, জীবনে যে শিক্ষা, শক্তি ও শান্তি লাভ করেন, সুখ-সৌন্দর্য্য-বিলসিত সামাজিক কাব্য পড়িয়াও তাঁহারা সেইরূপ শিক্ষা, শক্তি ও শান্তিলাভে কৃতার্থ হইবেন।

কতক গুলি ঔপন্যাসিক কাহিনীর আদি বা অন্ত, কোন স্থানেও রথের রমণীয় দৃশ্য নাই,—আছে শুধুই উল্লিখিত প্রকার পথের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা! এখানে সেগুলির কথা হইতেছে না। যাঁহারা, ঐরূপ নিকৃষ্ট, নির্ঘৃণ ও নির্ল্লজ্জ কাব্য সৃষ্টি করিয়াও, হৃদয়ে প্রীতি অনুভব করেন, তাঁহাদিগের সম্পর্কে কিছুই কহিতে যাইতেছি না। তাদৃশ চিন্তা-শ্রম-শূন্য উদাসীন লেখকদিগের কবিত্ব অথবা কাব্য-চাতুর্য্য-প্রসঙ্গে, কবিবর ভবভূতির পদানুসরণে, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হয় যে,—

"—জানন্তি তে কিমপি
তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।"

কিন্তু, যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য উদার, আকাঙ্ক্ষা উন্নত, কল্পনা ও কারুনৈপুণ্য উভয়ই প্রশংসা-যোগ্য,—যাঁহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে সমাজ-হিতৈষী, এবং কোন কোন বিষয়ে সামাজিক-দিগের আদর্শ-স্থানীয়, তাঁহারাও যে সময়ে সময়ে, সম্ভবতঃ আমোদ-বিহ্বলতার অসাবধানতায়, অথবা অবর্য্য ভাব-সমূহের প্রাবল্যিক উচ্ছ্বাসে, রথের কথা ভুলিয়া, রথ-পিপাসু পাঠককে, পথের পঙ্কিল হ্রদেই প্রায় পীড়িত করিবার আয়োজন করিয়া রাখেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় নয় কি? পূর্ব্বেই কহিয়াছি, তাঁহাদিগের কাব্যের সংহার, পুরীর রথ-শোভার ন্যায়, অতি প্রীতিপ্রদ ও আশ্চর্য্য বস্তু। যে পৌঁছিলে, অবিশ্বাসী, বিশ্বাসের আলো পাইয়া, আত্মায় এক অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করে;—যে চিরকাল ক্রূর-জন-সেবিত কদর্য্য স্বার্থপরতা ও নৃশংস পাশব-লালসা নিরয়কূপে ডুবিয়া রহিয়াছিল, সে মাধুর্য্য, পবিত্রতা ও পরার্থ-জীবিতার সৌন্দর্য্য দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া, জীবনের নূতন অধ্যায়ে প্রবিষ্ট হয়;—যে কৃপণ, মুক্ত-হস্তে দান করিতে শিখে; যে পর-কাতর, পর-নিন্দক ও পর-পীড়ক, সে পরে

প্রাণে প্রাণ মিশাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠে;—যাহার স্বভাবে সর্প অথবা শকুনির ভাগই একটু বেশী,—যে সম্মুখে মধুর, পরোক্ষে আর, সে ক্ষণকাল শ্যামা বাবুল্ ও দয়েলের সংগীত-সুখ-সুধায় অঙ্গ ঢালিয়া দেয়;—কাপুরুষ, পুরুষকারের প্রতিজ্ঞায় প্রজ্বলিত হইয়া, প্রপীড়িত স্বত্বের স্বয়ং রক্ষকরূপে দাঁড়ায়; এবং যে জন্মাবধি পর-পর সকলের কাছেই অসুরের অবতার বলিয়া শঙ্কার পাত্র, সেও কাব্য-চিত্রের কমনীয় ছায়ায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, ভাবের অমৃত-প্রবাহে ঢলিয়া পড়ে। কিন্তু হায়! যাহার পরিণাম এমন প্রার্থিত-দুর্ল্লভ পুণ্য-নিকেতন, তাহার প্রবেশ-পথ যে স্থানে স্থানে নিতান্তই নিদারুণ দুঃখ ও ভীতি-বিপত্তির প্রচ্ছন্ন আবাস, ইহা অপেক্ষা আর পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? অপিচ, দুর্ব্বল-হৃদয় পাঠক যদি, সেই দেব-বাঞ্ছিত শোভাময়-পরিণতি দর্শনের পূর্ব্বেই, হৃদয়ে কতকগুলি মন্দ ভাবকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়া, বিপন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার আর সার্থকতাই বা থাকে কোথায়?

কাব্যরস-মগ্ন কোলরিজ্ কহিয়াছেন,—

"Poetry has given me the habit of wishing to discover the Good and the Beautiful in all that meets and surrounds me."

ইহার এই ভাবার্থ যে,—তিনি কাব্য ভালবাসিতেন, এবং এই জন্য, তাঁহার আশে পাশে যা কিছু দেখিতেন, তাহা হইতেই কাব্যের উপাস্য শুভ ও সুন্দরের অংশ খুঁজিয়া বাহির করিতে যত্নপর রহিতেন। কোলরিজ্ যাঁহার পদ-রেণু পাইলেও কৃতার্থ হইতেন, এমন কোন কবিহৃদয় মহাত্মা বলিয়াছেন যে,

"The end of Poetry is the elevation of the soul. * * * The ultimate result should be the improvement and elevation of the moral and spiritual nature of man."

ইহারও এই তাৎপর্য্য যে,—কাব্যের উদ্দেশ্য আত্মার উন্নতি। সুতরাং, মনুষ্যের নৈতিক জীবন ও অধ্যাত্ম-প্রকৃতির প্রকৃত উৎকর্ষ-সাধনই উহার পরিণাম-ফল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যে সকল উৎসাহশীল নূতন লেখক বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে 'কবি-যশঃপ্রার্থী' অথবা কাব্য-সাহিত্য-বিলাসী বলিয়া পরিচিত, এবং সাহিত্যের উন্নতিকল্পে উচ্চকামনায় দীক্ষিত, তাঁহারা উপরিধৃত কথাগুলি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলে, নিশ্চয়ই দেশীয় সমাজ ও সাহিত্যের উপকার হইবে। উদ্দেশ্য মঙ্গল্য—আকাঙ্ক্ষা মহৎ। তবে কেন অন্তঃসার-শূন্য আবিল রসিকতার আবর্ত্তে পড়িয়া, কতকগুলি সুকুমারমতি পাঠক ও পাঠিকার সর্ব্বনাশ করিতে যাইব? সংকল্প করিয়াছি শিব গড়িব,—শিব-সুন্দরের স্বর্গীয় শোভা দেখাইয়া সমাজ-শক্তিকে শত হস্ত উপরে টানিয়া তুলিব। তবে কেন শিবমন্দিরের প্রবেশ-পথে আবার কতকগুলি পাতাঢাকা কূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া পথিকের বিপদ্ কিংবা বিড়ম্বনা ঘটাইব?—

অথবা চারিধারে কতকগুলি বীভৎস চিত্রপট প্রদর্শনের দ্বারা আগেই দর্শকের দৃষ্টিশক্তিতে বিকৃতি জন্মাইব? এ দেশে ইদানীং বালক বালিকাও কবিত্বের উন্মাদ-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত,—কাব্য-উপন্যাসের কথা লইয়া রসের সৃষ্টি, রসের পুষ্টি ও রস-বিলাস-পটুতায় পরস্পরের তুষ্টিসম্পাদনে লালায়িত। সুতরাং দেশীয় কাব্যের গতি ও পরিণতি বিষয়ে সাহিত্যিকদিগের এখন আর উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে।

এখানে পাঠকের মনে একটি কথা উঠিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সামান্য-মাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও হয় ত বলিবেন যে, সৌন্দর্য্যের উচ্চতর উৎকর্ষ দেখাইতে হইলে, সে চিত্রের অনতিদূরে কদর্য্যের বিকট পট প্রদর্শন করা আবশ্যক। নহিলে, সৌন্দর্য্যের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব উৎকর্ষ অনুভূত হয় না,—উহা দর্শকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না।

এ কথা সর্ব্বথা সু-সঙ্গত। বাল্মীকি-ব্যাস-প্রমুখ জগদাদর্শ মহাকবিরাও কাব্যতত্ত্বের এই সূত্র অবলম্বন করিয়া, নানাবিধ পরস্পর-বিরূপ অপরূপ চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং যিনি যেখানে, কবির তুলি হাতে লইয়া, সৃষ্টি-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে যত্ন পাইয়াছেন, তিনিই ভাল ও মন্দ একত্র আঁকিয়া এক সঙ্গে দেখাইয়াছেন। বাল্মীকি-ব্যাসের চিত্রপটে নয়নাভিরাম রাম ও নয়ন-মনঃপ্রদাহী রাবণ, সীতা আর শূর্পণখা, সর্ব্বজন-হিতৈষী যুধিষ্ঠির আর সর্ব্বজন-গ্রাসী সুযোধন ও শকুনি যেমন এক পটে চিত্রিত; সুকীর্ত্তিত আধুনিক কবিদিগের আলেখ্য-পটেও উচ্চ ও নীচ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, ধর্ম্মাত্মা ও ধিক্‌কৃত-পামর ঠিক সেই প্রকার কৌশলে একত্র প্রদর্শিত।

কিন্তু, কিবা পুরাতন, কিবা অধুনাতন প্রকৃত কবির এই এক বিশেষ লক্ষ তাঁহাদিগের ভালই মনুষ্যের মনে অনুরাগ জন্মায়, মন্দ কোন অংশও অনুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত ম[illegible] চিত্রের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম কো[illegible] দিকেও প্ররোচকতার চিহ্ন থাকে না তাঁহারা প্রকৃতি-নিহিত পুরীর রথ-প্রদর্শ[illegible] মনুষ্যদিগকে, যেন তাহাদিগের অজ্ঞাতসা[illegible] ধীরে ধীরে, মহত্ত্ব, মাধুর্য্য ও অমল-সৌন্দ[illegible] উপাসনা বিষয়ে আকর্ষণ করেন; ক[illegible] পথে কোনরূপ লাঞ্ছনা ঘটাইয়া অধঃপা[illegible] কারণ হন না। সুতরাং সিদ্ধান্ত ক[illegible] হইবে যে, যে কাব্যের ভাল ও মন্দ উ[illegible] মানবহৃদয়ে প্রায় সমান আকর্ষকতায় [illegible] রহে,—যাহার মন্দ অংশও, মুহূর্ত্তের তরে, [illegible] ষ্যের মনে প্রীতি জন্মায়,—মনুষ্যকে ম[illegible] দিকে প্ররোচিত করে, তাহা পরিণাম[illegible] হর হইলেও প্রকৃত কাব্য নহে,—কাব্য[illegible] মনোমৃগ-হননের ভয়ঙ্কর ফাঁদ;—[illegible] বিপদ্‌বিঘ্ন-কণ্টকিত ভয়াবহ পথের [illegible] পরিত্যজ্য।—— শ্রীমৎ কল্যাণভট্ট শর্ম[illegible]

প্রবেশিকা।

[illegible]কলেই জানে, কিন্তু কদাচিৎ বুঝে —
আজিকে কহিব আমি হেন ক'টি কথা;
[illegible]কৃত সৌন্দর্য্য যাহা নয়নের কাছে,
চটক না থাকে তার সত্য এ বারতা।

উল্লসিত ছন্দোবন্ধ,—বাণী তরঙ্গিণী,
বিভাসিত সমুজ্জ্বল বর্ণনা আখ্যান,
[illegible]ই গৌরব তার, কভু নহে জানি
হৃদয়ের একটুকু কথার সমান।

সৌন্দর্য্য শান্তির ছায়া, কোমল সৌষ্ঠব,
মিতভাষী চিরদিন মুখর-জগতে;
কোলাহল নাই তার, তাহার গৌরব
বিলম্বে বাড়িয়া উঠে, জানে না মরিতে।

ঈশ্বর—প্রকৃতি আর মানব মিলনে
এই জগতের তত্ত্ব রহস্য নিলয়,
মরীচিকা ভাসে সদা ছলিতে নয়নে,
উপরেতে ছায়া ভাসে সত্য নীচে রয়।

ভাবময় এই বিশ্ব ভাবের বিকাশ,
ভাব শুধু সত্য হেথা তাই কবিগণ,
জগত মথিত করি, তুলিয়া নির্য্যাস,
ভাবের নবীন বিশ্ব করিছে রচন।

এ জগত সুমধুর তারি পাশে পাশে,
এ জগত সুমধুর তাহারি ছায়ায়,
শৈল নদী লতা পাতা কুসুমে বাতাসে,
ওতপ্রোত হয়ে আছে অপূর্ব্ব মায়ায়।

এ বিশ্ব-মন্দিরে কবি মহা-পুরোহিত,
অজ্ঞাত বস্তুর স্রষ্টা দ্রষ্টা যুগপৎ,
তুচ্ছ সেই প্রতিপদে করে সে জাগ্রত
আপন কর্ত্তব্যে আর আদর্শে মহৎ।

এ ক্ষুদ্র সাহিত্য এই ধরণী বিস্তৃত,
দেশে দেশে কত ভাবে প্রতিভা খেলায়,
কে চাহিবে কীটোদর করিতে পূরিত
পাঠায়ে অযোগ্য বস্তু জগত মেলায়।

হৃদয়-সমুদ্র হ'তে মুকুতা তুলিয়া,
বেছে লও সমুজ্জ্বল নিটোল কঠিন,
কালের আঘাতে যাতে না যায় গলিয়া,
মহাপ্রলয়ের আছে বহু বহু দিন।

বৃথা গর্ব্ব অহঙ্কার মিছে অভিমান,
অগ্নির পরীক্ষা আছে বৈতরণী পারে,
তার মধ্য দিয়া কভু না হ'লে প্রয়াণ
কাহার গৌরব কত কে বলিতে পারে?

কালের করাল মূর্ত্তি, কুলা করে ল'য়ে,
সমাহৃত শস্যপুঞ্জে দিতেছে বাতাস,
কত রাজ-চক্রবর্ত্তী গিয়েছে উড়িয়ে,
কত দীন হীন দুঃখী পেয়েছে আশ্বাস।

এ জগত সুমধুর যাদের বিভাসে,
জাতি-বর্ণ-হীন তারা সূর্য্যালোকপ্রায়,
তাদের প্রতিভা জ্যোতিঃ মোদের আকাশে
অতর্কিতে এ সাধনে নিযুক্ত ধরায়।

কে বড়, কে ছোট, কার যশের সংবাদ
বাড়িল, ভাবিয়া তারা হয় না বিকল;
তারায় তারায় নাই অসূয়া বিবাদ
লক্ষ্য শুধু বিশ্বরাজ্য করিতে উজ্জ্বল।

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

ছায়া-দর্শন।

অষ্টম অধ্যায়।

উপক্রম।

ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য, ক্রমেই অধিকতর ঔৎসুক্য দেখাইতেছেন; এবং ছায়াদর্শনের কাহিনী-গুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া, পারলৌকিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা পরিগ্রহ করিতে যত্ন পাইতেছেন। আমরা এবার তাঁহাদিগকে, তিন দেশের, তিন বিভিন্ন প্রকারের, তিনটি কাহিনী উপহার দিলাম। যাঁহারা এই তিনটি প্রামাণিক কাহিনীর আমূল বৃত্তান্ত মনোযোগের সহিত আলোচনা করিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ক-একটি সার সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

১। মৃত্যুর নাম মহানিদ্রা অথবা মহা-নির্ব্বাণ নহে; মৃত্যুর নাম দেহত্যাগ। সর্পের দেহ একটা বহিরাবরণে আবৃত থাকে। উহার সাধুভাষিত নাম নির্ম্মোক এবং প্রচলিত নাম খোলস। সর্প যেমন, উহার সেই দৈহিক নির্ম্মোক অথবা খোলসটিরে পরিত্যাগ করিয়াও, ঠিক্ যেমন ছিল, তেমনি থাকে,—কোন অংশেও পরিবর্ত্তিত হয় না। মনুষ্যও সেইরূপ, তাহার এই অস্থিমাংসময় স্থূলদেহ পরিত্যাগের পর, সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া, ঠিক যেমন ছিল, তেমনই রহে;—কোন অংশেও কোন রূপ পরিবর্ত্তনের ঘটে হইয়া, আর এক জন হইয়া যায় না।

২। মৃত্যুর পর আকৃতির যেমন পরিবর্ত্ত হয় না, কাহারও প্রকৃতিতেও সেইরূপ সহসা কোন পরিবর্ত্ত ঘটে না। যে মূঢ়স্বভাব এবং মনুষ্যের উৎপীড়ক,—মনুষ্যের সুখ-শান্তিনাশক, সে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের ন্যায় আত্মদ্রোহ-জনিত অনুতাপের পরিশোধ অগ্নিতে পোড়া পোড়া হইয়া, ক্রমশঃ হয়,—ক্রমশঃ পবিত্র, প্রশান্ত, প্রেম-ভক্তি ও পরার্থ-সেবী দেব-পুরুষ হইয়া উন্নতি করে। কিন্তু, কাহারও এই প্রকার পরি এক দিনে ঘটে না; ক্রমে ঘটে। যখন এ

তে এই প্রকার প্রার্থিত পরিবর্ত্ত ঘটে, ন আকৃতিও যার-পর-নাই সুন্দর ও ৎস্নার ন্যায় সুখ-শীতল হইয়া সকলের নন্দ জন্মায়। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত, এখানে যেমন ছিল, পরলোকেও তেমন কে, এবং এখানে যাহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত কিংবা বিরক্ত ছিল, সেখানেও তাহার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত কিংবা বিরক্ত রহে।

৩। ইহলোক ও পরলোক, অথবা পৃথ্বী-ধাম ও অধ্যাত্ম জগৎ উভয়ই ধর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত,—ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিধাতার প্রেম-মঙ্গলময় আজ্ঞানুগত। মনুষ্য এখানে ধর্ম্মকে কতকটা এড়াইয়া চলিতে পারে। কিন্তু সে-খানে তাহা একবারেই সম্ভবপর নহে। কেন না, সেখানে সকলেই সকলের পার্থিব-জীবন সংক্রান্ত সমস্ত কথা প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পায়, —এবং জানিয়া, যে যেমন আদরের উপযুক্ত, তাহাকে সেই প্রকার আদরে অভ্যর্থনা করে। তবে এই এক বিশেষ কথা। সেখানে কেহই কাহারও অপকার করে না। সকলেই সকলের উপকার করিবার জন্য আকুল রহে।

আজিকার প্রথম কাহিনীটিতে যাহার কথা, সে পর-পারে যাইয়াও, প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয় ঋণ-যন্ত্রণায় নিপীড়িত। ঋণ সামান্য, তথাপি সে ঋণ। দ্বিতীয় কাহিনীর আত্মা অপত্য-স্নেহের প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীতে আকৃষ্ট। অনেকেই এই রূপ আকৃষ্ট হয়; কিন্তু সকলে আসিতে পারে না। কেহ কেহ, যাতায়াতের শক্তি লাভ করিলেও, পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া দেখা দিতে ইচ্ছা করে না। তৃতীয় কাহিনীর আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই দুঃসহ দুঃখের কথা। যাহার দুঃখময় জীবনের আখ্যায়িকা প্রকাশিত ও লিখিত হইয়াছে, সে পর-পারে যাইয়াও আপনার প্রাণাধিকা আশ্রিত বালিকার বিপদ্ ও দুঃখে আত্ম-বিস্মৃত। পাঠক এই তিনটি কাহিনীতেই শিক্ষা ও পরীক্ষার বহু কথা পাইবেন।

আত্মিক-কাহিনী।

(১)

আত্মার শান্তি।

স্কট্‌লণ্ডের রাজধানী এডিনবরা হইতে তেতাল্লিশ মাইল দূরে, টে-নদীর দক্ষিণ তটে, পুরাতন পার্থ্ নগর। পার্থ্ নগরে, সেনা-নিবাসের সন্নিকটে, দুটি দুঃখিনী বিধবার বাস। একটির নাম আনি সিম্‌সন (Anne Simpson), * আর একটির নাম মালয় (Maloy)। আনি ও মালয় একগৃহে বাস করে না; কিন্তু তাহারা পরস্পর অতি সন্নিহিত প্রতিবেশিনী। উভয়েই প্রৌঢ়বয়স্কা। আনি সিম্‌সনের কেহ নাই; মালয়েরও ইহ জগতে আপনার জন কেহ ছিল না। পরস্পর নিঃসম্পর্কিত হইলেও, আনি ও মালয়ে বড়ই সৌহার্দ্দ। আপন আপন দৈনিক জীবিকা অর্জ্জনে, উভয়েই সমস্ত দিন পরিশ্রম করিত,

* Anne এই নামটিরে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে এন্ বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কিন্তু আমরা, আনি বিশান্ত নামের অনুকরণে বাঙ্গালা পদ্ধতিতে আনি সিম্‌সন লিখিলাম।

এবং অবসর সময়ে উভয়ে একত্র হইয়া, আপন আপন দুঃখের কথা কহিয়া কহিয়া শ্রান্তি দূর করিত।

কাল ক্রমে, মালয় পীড়িত হইল। পীড়া সাংঘাতিক। আনির শুশ্রূষা ও অশ্রুসিক্ত সম্ভাষা তাহাকে রাখিতে পারিল না। মালয় তনুত্যাগ করিল। নিরাশ্রয়া কাঙ্গালিনীর খবর কে লইবে?—ভিক্ষাজীবিনী, দুঃখিনীর মৃত্যুতে কাহার প্রাণ ব্যথিত হইবে? মালয় নীরবে চলিয়া গেল। আনির এক বিন্দু অশ্রু ও একটি নীরব নিশ্বাসে তাহার অন্তিম সংকার হইল, এবং নীরবে শবের সমাধি সমাপ্তি পাইল। আনির অন্য কেহ নাই;—দুঃখিনীর দুঃখ-সঙ্গিনী ছিল একমাত্র মালয়। সেও আজি পরলোকের অন্ধকারে অন্তর্হিত। কুটীর-বাসিনী আনি এখন সম্পূর্ণ একাকিনী।

আনি সিম্‌সন এক্ষণ, সমস্ত দিন, গ্রাসাচ্ছাদনের অন্বেষণে, নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; রাত্রিতে আপন কুটীরে বিশ্রাম করে। এই নৈশ-বিশ্রামেও বিঘ্ন উপস্থিত হইল। মালয়ের মৃত্যুর কিছু দিন পরে, এক রাত্রিতে, সহসা আনির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরে মিটি মিটি আলো জ্বলিতে ছিল। দেখিতে পাইল,—তাহার শয্যার পার্শ্বে, মালয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই মুখ, সেই চক্ষু, পরিধানে সেই মলিন বসন, কিন্তু অধিকতর কাতর, অধিকতর বিষণ্ন। আনি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। ভাবিল,—এ কি দেখিতেছি,—ধাঁ ধাঁ বুঝি। দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া আবার ভাল করিয়া চাহিল। দেখিল,—সেই মূর্ত্তি, তেমনই [illegible] দণ্ডায়মান। শরীরে রোমাঞ্চ হইল, [illegible] ভয়ে চক্ষু বুজিল।

ছায়া-মূর্ত্তি কহিল—"আনি, কাহাকে [illegible] করিতেছ? চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ,—আমি তোমারই সেই প্রতিবেশিনী দুঃখি[illegible] মালয়। জান ত পৃথিবীতে আমার কে[illegible] নাই,—কিছুই নাই। ভগিনি, তোমার নি[illegible] আমার একটি ভিক্ষা।"

সেই মূর্ত্তি, আর মূর্ত্তির মুখে এই [illegible] স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে [illegible] একবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। চক্ষু মেলি[illegible] সাহস হইল না। বহুকষ্টে কম্পিত-কণ্ঠে, [illegible] কহিল;—"সত্যই কি তুমি সেই মাল[illegible] তবে কি তুমি এখনও জীবিত আছ?"

ছায়া-মূর্ত্তি কহিল,—"তোমাদের হি[illegible] আমার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু আমি এখ[illegible] যেমন ছিলাম, তেমনই আছি। আছি, [illegible] কষ্টে। বোন, তুমি আমার একটু উপ[illegible] করিবে কি? আমি কিছু ঋণ রাখিয়া [illegible] য়াছি। ঋণ বেশী নহে,—তের আনা [illegible] এই ঋণই আমার সকল কষ্ট ও [illegible] কারণস্বরূপ হইয়াছে। এই ঋণ থাক[illegible] আমি এখানে তিলেকের তরেও শান্তি [illegible] তেছি না। আনি, তুমি আমার জন্য [illegible] পরিশ্রম কর,—একটি ধর্ম্মযাজককে [illegible] লইয়া তাঁহার নিকট আমার ঋণের [illegible] বল। ধর্ম্মযাজক দুঃখিনী বলিয়া দয়া [illegible] বেন। তিনি অবশ্যই আমার ঋ[illegible] করিয়া দিবেন।"

আনি, ইহার পরে সাহসে ভর করিয়া, [illegible] মেলিল। চাহিয়া দেখিল, ছায়া-মূর্ত্তি আর [illegible]নে নাই। আনির ভয় ও বিস্ময় দূর [illegible] না। সে কি দেখিল, কি শুনিল?—ইহা [illegible] স্বপ্ন, না বিভীষিকা। কিছুই সে বুঝিতে [illegible]ল না। আনি অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া [illegible]বাহিত করিল।

এই দিন হইতে প্রতি রাত্রিতেই, আনি [illegible]সন, যেই শয্যায় গা দিত, অমনিই মাল[য়ে]র ছায়া-মূর্ত্তি আসিয়া তাহার নিকটে উপ[স্থি]ত হইত, এবং ঐ ঋণের কথা কোন ধর্ম্ম[যা]জকের নিকট বলিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিত। আনির এখন রাত্রিতে নিদ্রা নাই,—ছায়া-মূর্ত্তির উৎপীড়নে; দিবসে শান্তি নাই,—আপন দৈনিক কার্য্যের উপরে, ধর্ম্মযাজকের অনুসন্ধানার্থ পর্য্যটনে। আনির দারিদ্র্যনিপীড়িত দুঃখের জীবন অধিকতর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে, ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে (Rev. Charles McKay) পার্থশায়র মিশনের প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পার্থ্ নগরে উপস্থিত হইলেন। আনি সিম্‌সন, এই সংবাদ পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং যথারীতি অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান রহিল।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি চাও, বাছা?"

আনি কহিল,—"মহাশয়, আজি সাত আট দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রিতে একটি ছায়া-মূর্ত্তির আবির্ভাবে যার-পর-নাই কষ্ট পাইতেছি। প্রতিকার-কামনায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আপনার আশ্রয় না পাইলে, আমার আর উপায় নাই।"

ধর্ম্মযাজক কহিলেন,—"তুমি কি ক্যাথলিক?"

আনি কহিল,—"না, মহাশয়, আমি প্রেস্‌বিটিরিয়ান।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"তবে তুমি আমার নিকট আসিলে কেন মা? আমি ত ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু।"

আনি কহিল,—"যে রমণী আমাকে প্রতি রাত্রিতে দেখা দিতেছে, সে আমাকে যে কোন ধর্ম্মযাজকের দেখা পাই, তাঁহারই কাছে তাহার কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছে। এক সপ্তাহ হইল, আমি ধর্ম্মযাজকের অনুসন্ধানে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"সে তোমাকে ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইতে অনুরোধ করিতেছে কেন?"

আনি কহিল,—"সে বলে, সে নাকি কিঞ্চিৎ ঋণ রাখিয়া গিয়াছে; এবং ধর্ম্মযাজক সেই ঋণ শোধ করিবেন।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"ঋণের পরিমাণ কি?"

আনি কহিল,—"তের আনা মাত্র।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"এই তের আনা সে কাহার নিকট ধারে?"

আনি কহিল,—"আমি তাহা জানি না। সে বলে নাই।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"তুমি স্বপ্ন দেখ নাই ত?"

আমি কহিল,—"না বাবা,—কখনও না। ধর্ম্ম সাক্ষী, এ কখনও স্বপ্ন হইতে পারে না। সে প্রতি রাত্রিতে আমাকে দেখা দিয়া বারংবার এই ঋণের কথা বলিতেছে। আমি স্বপ্ন দেখিব কি, ক্ষণকালও ঘুমাইতে পারিতেছি না।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"ঐ রমণী কি তোমার পরিচিত ছিল?"

আমি কহিল,—"সে আমার অতি-নিকট প্রতিবেশিনী ছিল। সেনা-নিবাসের নিকটে আমরা দুই জনে দুই কুটীরে স্বতন্ত্র-ভাবে বাস করিতাম। তাহার সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা শুনা হইত;—একটুকু প্রণয়ও ছিল। তাহার নাম মালয়।"

ধর্ম্মযাজক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন,—মালয় রজকীর কাজ করিত ও ঐ সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। মালয় কাহার নিকট ঋণী, ইহা বাহির করিতে তাঁহাকে আরও একটুকু শ্রম স্বীকার করিতে হইল। যে মুদীর দোকান হইতে মালয় আহার্য্য ক্রয় করিয়া লইত, অবশেষে তিনি সেই মুদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মুদী কহিল,—মালয়ের নিকটে তাহার কিছু প্রাপ্য আছে বটে; কিন্তু কত পাওনা, তাহা তাহার স্মরণ নাই। মুদী তাহার খাতা খুলিয়া দেখিল, এবং হিসাব করিয়া বলিল,—মালয়ের দেনা মাত্র তের আনা।

ধর্ম্মযাজক শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অমনিই ঐ তের আনা পয়সা দিয়া মালয়ের ঋণমুক্ত করিয়া আসিলেন। মুদী মালয়ের মৃত্যুসংবাদ অবগত ছিল না। ইহার পর ধর্ম্মযাজক মহাশয় আনি সিম্‌সনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি যে দিন ঐ তের আনা ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে, আনি আর সে ছায়া-মূর্ত্তি সাক্ষাৎ পাইতেছে না।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাঙ্কে স্রুজ্‌বেরীর কাউণ্টের ধর্ম্মগুরু ও সুহৃদ্। ছায়া-দর্শন-সম্বন্ধে এই বিচিত্র কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে, তিনি এবং স্রুজ্‌বেরীর কাউণ্ট-পত্নী (Countess of Shrewsbury) আর কাউণ্ট অব্ স্রুজ্‌বেরীর অন্যতম বন্ধু, Anatomy of Melancholy অর্থাৎ বিষাদ-বিশ্লেষ-তত্ত্বমালা গ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টার রবার্ট মানবজগতের নিকট দায়ী। ডক্টার বার্টন স্বকীয় গ্রন্থে, স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ বিষয়ে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক ঘটনা আর তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় নাই। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আরও ত সহস্র লোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সংসার হইতে চলিয়া যায়। তাহারা ফিরিয়া আইসে না কেন? আইসে না প্রবৃত্তি, শক্তি ও সুযোগের অভাবে, অথবা সেখানেই মার্জ্জনা জনের কৃপায় ক্ষমা পায় বলিয়া। ইহা ব্যতীত আরও কত অজ্ঞাত কারণ থাকিতে পারে, কে তাহার তত্ত্ব-নির্দ্দেশ করিবে?

(২)

অপত্য-স্নেহ।

বিদেশে স্বামীর বিয়োগ ঘটিয়াছে। বিধবার প্রাণে মর্ম্মর-দাহ, নয়নে অশ্রু-প্রবাহ। পাঁচ বৎসরের একটি মাত্র অবোধ শিশু এখন তাঁহার সংসারের সম্বল। শিশু বালিকা কখনও ছাঁদিয়া গলা ধরিয়া মায়ের কোলে চাপিয়া বসিতেছে, কখনও মায়ের বিষণ্ণ মুখপানে তাকাইয়া তাকাইয়া কচি হাতে মায়ের নয়ন জল পুছাইয়া দিতেছে, আর ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"তুই এখন কেবলই কাঁদিস্ কেন মা?—আবার তেমনই করিয়া তুই হাসিবি কবে মা?" বালিকা যখন এইরূপ প্রশ্ন করে, তখনই বিধবার বুক পাঁজর ভাঙ্গিয়া অশ্রুধারা বহিতে থাকে; কিন্তু তিনি শিশুর প্রাণের দিকে চাহিয়া কষ্টে আত্মসংবরণ করেন। বালিকা শুনিয়াছে, তাহার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। স্বর্গ কোথায়, স্বর্গে গমনের অর্থ কি, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ইহাও জানে না, অথবা বুঝে নাই যে, তাহার মা বিধবা হইয়াছেন, আর সে পিতৃহীনা হইয়াছে।

বিধবা, এক দিন, কোন আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। মেয়েটি তাঁহার সঙ্গে। আত্মীয়ার অনুরোধে তিনি তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। বালিকাটিকে বুকে করিয়া বিধবা ঘুমাইয়া রহিলেন। সহসা বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বালিকা চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইল, শয্যার পার্শ্বে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বাপের আদর-সোহাগিনী মেয়ে অমনই 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল "বাবা, তুমি কখন আসিয়াছ, আমার জন্য স্বর্গ হইতে কি আনিয়াছ? আমি যে পুতুলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কৈ?" ইহার পরে বালিকা নিদ্রাগতা জননীকে জাগাইবার নিমিত্ত জোরে ধাক্কা দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"মা মা, উঠ উঠ, চাহিয়া দেখ বাবা আসিয়াছে।" কিন্তু বিধবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। খানিক পরে, বালিকা দেখিতে পাইল পিতা শয্যাপার্শ্ব হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য একটি কোঠার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালিকা কিছুক্ষণ ঐ দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

যথাসময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। বিধবা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। বালিকাও উঠিল। বালিকা শয্যা হইতে উঠিয়াই, ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে মায়ের হাত ধরিয়া, পিতাকে রাত্রিকালে যে কোঠায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, সেই কোঠার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।—কহিল,—"মা, বাবা আসিয়াছেন। তুই ঘুমাইয়া ছিলি, বাবা আসিয়া আমাদিগের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি কত ডাকিলাম, কত চেঁচাইলাম, তবু মা তোর ঘুম ভাঙ্গিল না। বাবা তোর মুখের পানে, অনেক ক্ষণ, এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আমি পুতুল চাহিলাম। কিছু বলিলেন না। শেষে তুই জাগিলি না দেখিয়া ঐ কোঠায় চলিয়া গেলেন। চল্ মা চল্, ঐ কোঠায় যাই। ঐখানে গেলেই বাবাকে দেখিতে পাইবি।"

বিধবা, বালিকার বর্ণনা শুনিয়া এবং

উহার জেদ ও আগ্রহ দেখিয়া, স্পষ্টই বুঝিতে পাইলেন যে, বালিকা প্রকৃতই রাত্রিকালে উহার স্বর্গগত পিতার ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে। লোকান্তরিত পতি তাঁহাকে দেখা দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিতান্তই দুর-দৃষ্ট, তাই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। মুগ্ধস্বভাবা শিশুবালিকার ভাব দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি অশ্রুপ্লুত নেত্রে উর্দ্ধ-মুখী হইয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"প্রিয়তম, আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী, তাই তোমার দেখা পাইলাম না। তুমি অবোধ শিশুকে দেখা দিয়া ইহাই বুঝাইয়া গেলে যে, স্বর্গ-গত হইয়াও তুমি আমাদিগকে একবারে ভুলিতে পার নাই।"

বালিকা কাতর চক্ষে মায়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুই আকাশের দিকে চাহিয়া কাহার সঙ্গে কথা কহিলি? বাবা কি তবে আইসেন নাই? মা, বাবা কো-থায়?" মা আকুল প্রাণে উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"তিনি ঐ স্বর্গে।" বা-লিকা কহিল,—"বাবা স্বর্গ হইতে আবার কবে ফিরিয়া আসিবেন?" বিধবা কহিলেন, —"হায়, তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন কি?" এই বলিয়া বিধবা বালিকাকে বুকে টানিয়া লইলেন, এবং অবসন্ন দেহে ও অধীর প্রাণে বসিয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতার মৃত্যু হইয়া-ছিল দেশান্তরে। বালিকা মৃত্যু দেখে নাই। বালিকা সে দিন মায়ের সঙ্গে অন্যের গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিল। পিতার কথা এক বারও চিন্তা করে নাই। এইরূপ চিন্তাশূ[ন্য] অবস্থায়ও, সে তাহার পিতার দেখা পাইল, ইহাই ঘটনার বৈচিত্র্য। ইহাতে কোন রূপের কল্পনার সংস্পর্শ নাই, এবং বর্ণনায়ও কোন প্রকার অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য ইহা ছায়া-দর্শনের একটি বিশেষ কাহিনী। পণ্ডিত-সমাজে সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত মিস্ ফেলিসিস্ স্কিন ক্যাসেল্স্ ম্যাগাজিন নামক সাহিত্যপত্রে এই ঘটনা সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন।

(৩)

আশ্রিত-বাৎসল্য।

শ্যাম-সাগরের তটে,—সুসভ্য জগতের বহুদূরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালার উপরে, প্রাকৃ[তিক] শোভাশালিনী ওদেসা নগরী। ওদেসা (Odessa) রূষসাম্রাজ্যের চতুর্থ নগরী বলিয়া বিখ্যাত। উহার লোকসংখ্যা এইক্ষণ তিন লক্ষের কম নহে। দরিদ্রের নিবাস সমুদ্রের নিকট নিম্ন ভূমিতে; এবং সমৃদ্ধদিগের নিবাস, সাধা-রণতঃ সমুদ্র হইতে একটু দূরে, উচ্চ ভূমিতে। এখানে বিস্তৃত কাঠের কারবার আছে। ওদেসার কোন কাঠের গোলায়, একটি বৃদ্ধ সমস্তদিন কড়ি কাঠের উপর বসিয়া, ভিক্ষা করিত। বৃদ্ধের নাম মাইকেল। মাইকেল অন্ধ। মাইকেল একটি কাঠের পাত্র সম্মুখে রাখিয়া দিত। ঐ পথ দিয়া যাইবার সময় যাঁহার প্রবৃত্তি হইত, তিনি ঐ কাঠের পাত্রে বৃদ্ধের জন্য কিছু রাখিয়া যাইতেন। এই প্রকারে ভিক্ষালব্ধ বস্তুই বৃদ্ধের দৈনিক উপজীবিকা। মাইকেলের কেহ নাই। কে অন্ধের হাত ধরিয়া, তাহার কর-ধৃত নড়ি ধরিয়া, সুদূরস্থিত [ধনী]দিগের বাড়ী বাড়ী, ভিক্ষার্থ তাহাকে লইয়া যাইবে? তাই এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া মাইকেল যাহা পাইত, তদ্দ্বারাই অতি কষ্টে ও অতি দুঃখে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। সকলেরই একটা পরিচয় আছে। কাঠের গোলার অন্ধও সর্ব্বসাধা-রণের নিকট ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিল। অন্ধ মাইকেল যৌবন-সময়ে বড় সাহসী যোদ্ধা ছিল। সে যুদ্ধে অনেকবার আঘাত পাইয়াছিল। লোকে বলিত, একবার গুলির আঘাতে তাহার দুটি চক্ষুই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং সেই ঘটনা হইতেই সে এই অবস্থায় পড়িয়া আছে। লোকের মুখে মুখে বৃদ্ধ মাইকেল সম্বন্ধে এই প্রকার মন্তব্য ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু বৃদ্ধ কখনও এইরূপ জনরব-রচিত উপন্যাসের সম্পর্কে একটি কথাও কহিত না। সে নীরবে বসিয়া শুনিত; শুনিয়াও নীরব রহিত।

একদা রাত্রি কালে অন্ধের কুটীর-দ্বারে অতি ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর রোদন-শব্দ শ্রুত হইল। অন্ধ দ্বারে আসিয়া হস্তস্পর্শে বুঝিতে পারিল, একটি বালিকার অনাবৃত ও কঙ্কালসার দেহ ভূপতিত রহিয়াছে। রুষিয়ার শীতে নদী জমিয়া যায় ও স্ফটিক-নির্ম্মিত বিশাল-পরিসর রাজপথের মত শোভা পায়;—শিরায় শো-ণিতের গতি নিরুদ্ধ হইয়া আইসে। দুঃসহ শৈ-ত্যের মারাত্মক শীতল নিঃশ্বাসে মানুষের গায় ফোস্কা পড়ে। এইরূপ শীতেও বালিকার গায়ে বস্ত্র নাই। শীতের অসহনীয় ক্লেশে বালিকার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। জিহ্বায় কথা সরিতেছে না। উদরে অন্ন নাই; বালিকার উত্থানশক্তি রহিত, এবং চরমমুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী। চক্ষু মেলিয়া চায় না। কোনরূপ শব্দ করিয়াও মনের ভাব বুঝাইতে পারে না। বুকের ধুক্‌ধুকি টুকুও যেন থামিয়া আসিতেছে। বৃদ্ধের অন্ধনেত্রে ধারায় অশ্রু ঝরিল। ইহা অশ্রু নহে, মন্দা-কিনীর অমৃত ধারা। তুমি কে গো বাছা, এই অবস্থায় এই বৃদ্ধ ও অক্ষম অন্ধের দুয়ারে আসিয়া ধূলায় লুটাইতেছ?—এই বলিয়া বৃদ্ধ কোলে করিয়া বালিকাকে ঘরে লইয়া গেল।

বৃদ্ধের যত্নে ও শুশ্রূষায় এবং কুটীরস্থ বহ্নির উত্তাপে বালিকা ক্রমে একটুকু প্রকৃতিস্থ হইল। অতঃপর বৃদ্ধ জানিতে পারিল যে, বালিকার নাম (Powleska) পৌলেস্কা। বয়স মাত্র দশ বৎসর। অভাগিনীর পিতা মাতা ভাই বন্ধু, নাই বলিতে ইহ জগতে কেহই নাই। নিরাশ্রয়া ও বিপন্না বালিকা, আজি মুমূর্ষু অবস্থায়, নিরাশ্রয় ও বিপন্ন অন্ধ বৃদ্ধের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রাণে বাঁচিল।

অন্ধ, বালিকাটিকে আপন পুত্রীর ন্যায়, কুটীরে আশ্রয় দিয়া রাখিল। পিতৃস্নেহের কাঙ্গালিনী দুঃখিনী বালিকাও, বাবা বাবা বলিয়া, বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আপনার অফুটন্ত শিশু প্রাণ শীতল করিল। অন্ধ বালিকাকে, এবং বালিকা অন্ধকে, পাইয়া কৃতার্থ। উভয়েই এখন পরম সুখী। অন্ধ এখন আর কাঠের গোলায় কড়িকাঠে বসিয়া সদয় পথিকের দয়ার প্রতীক্ষায় হাত পাতিয়া

থাকে না। বালিকাও এখন আর, রাত্রির অন্ধকারে, নিরাশ্রয়ে ও অনাহারে, শীতে কাঁপিয়া, পথে পড়িয়া, মরিয়া থাকিবার ভয় রাখে না। বালিকা অন্ধের নয়ন ও নড়ি; অন্ধ একাধারে বালিকার পিতা, মাতা ও প্রাণের আশ্রয়। অন্ধ এখন পৌলেস্কার সাহায্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে সমর্থ। অন্ধের দিন এখন বেশ সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাঁচটি বৎসর পার হইয়া গেল। বালিকা এখন পঞ্চদশ-বর্ষীয়া।

কিন্তু অদৃষ্ট, বিশ্বরহস্যের অজ্ঞাত নিয়মানুসারে, আবার তাহাদের প্রতি দ্রষ্টব্যে বিমুখ হইল। একদা প্রাতে অন্ধ ও বালিকা এক বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল। সেই বাড়ীতে চুরি হইল। পুলিশ, গৃহস্বামিনীর কথা অনুসারে, সন্দেহ করিয়া, পৌলেস্কাকে ধরিল ও তাহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে অভিযোগের উল্লিখিত অপহৃত বস্তু বাহির করিয়া ফেলিল। চুরির প্রত্যক্ষ প্রমাণে পুলিশ পৌলেস্কাকে অন্ধের আশ্রয় হইতে তৎক্ষণাৎ কাড়িয়া লইয়া গেল। অন্ধ আবার, যে একাকী সেই একাকী হইয়া, আঁধার চক্ষে আরও ভয়াবহ অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

এই দিন হইতে অকস্মাৎ অন্ধও অদৃশ্য। কেহই আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধ এইরূপে গা ঢাকা দিলে, চুরির সন্দেহ যাইয়া তাহার উপরেও গড়াইয়া পড়িল। বৃদ্ধ কোথায় আছে, সম্ভবতঃ বালিকা ইহা জানে, এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বালিকাকে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে আনয়ন কর[illegible] হইল। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাইকেল কোথায় আছে, তুমি বলিতে পা[illegible] কি?" বালিকা বলিল,—"সে নাই"। এ[illegible] বলিয়া বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফু[illegible]রিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা তিন দিন অবধি হাজতে আবদ্ধ[illegible] বাহিরের কোন খবর তাহার নিকট পঁহু[illegible] নাই। অথচ সে দৃঢ়তার সহিত বলিতে[illegible] যে, মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে। শুধু, মু[illegible]খেই ইহা বলিতেছে, এমন নহে;—বলি[illegible] বলিতে প্রকৃতই পিতৃহীনা বালিকার ন্যায়, আকুল প্রাণে কাঁদিতেছে। এ বস্তুতঃই [illegible] বিস্ময়াবহ।

মাজিষ্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাইকেল মরিয়া গিয়াছে, এ কথা তোমা[illegible]কে বলিল?"

বালিকা বলিল,—"কেহ বলে নাই।"

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,"—ত[illegible] তুমি ইহা জানিলে কিরূপে?"

বালিকা বলিল,—"আমি দেখিয়াছি,তা[illegible]হাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"তুমি ত কখনও কারাগারের বাহিরে যাও নাই। তবে দেখি[illegible] কিরূপে?"

বালিকা বলিল,—"তথাপি প্রকৃতই আমি ইহা দেখিয়াছি।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"ইহা কিরূ[illegible] সম্ভবপর? কথাটি ভাল করিয়া বুঝাই[illegible] বল দেখি।"

বালিকা বলিল,—"আমি তাহা পারিব [illegible] আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি [illegible]হাকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি।"

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোন্ সময়ে, কিরূপে তাহাকে মারিয়া ফেলিল?"

বালিকা বলিল,—"আমাকে যে সময়ে [illegible] আনে, সেই সময়েই।"

মাজিষ্ট্রেট আবার বলিলেন,—"তা কেমন করিয়া হইবে? তুমি যখন ধৃত হও, তখন ত সে জীবিত।"

বালিকা বলিল,—"হাঁ তা ছিলেন। আমি ধৃত হইবার এক ঘণ্টা পরে, তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে ছুরিকার আঘাতে মারিয়াছে।"

মাজিষ্ট্রেট ক্রমেই অধিকতর বিস্মিত। তিনি কহিলেন,—"তুমি তখন কোথায় ছিলে?"

বালিকা কহিল,—"তা জানি না; কিন্তু আমি ইহা দেখিয়াছি।"

বালিকা যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কথা বলিতেছে, তাহাতে তাহার কথায় অবিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। অথচ কথাগুলি এমনই অসম্ভব ও অযৌক্তিক যে, শ্রোতারা উহাতে বিশ্বাস করিতেও পারিতেছেন না। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন,—বালিকা হয় উন্মাদিনী হইয়াছে, আর না হয় ত উন্মাদের ভাণ করিতেছে। অতঃপর তাঁহারা মাইকেলের কথা ছাড়িয়া দিয়া চুরি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"থাক্ সে কথা। তুমি কি চুরি করিয়াছ?"

বালিকা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"না—না—না, আমি চুরির কিছুই জানি না।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তবে তোমার ঝুলিতে অপহৃত বস্তু আসিল কিরূপে?"

বালিকা কহিল,—"আমি তা জানি না। আমি মাইকেলের হত্যা ভিন্ন আর কিছুই দেখি নাই।"

মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"মাইকেল মারা পড়িয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ দেখা যায় না। সে মরিলে, তাহার মৃত দেহ অবশ্যই পাওয়া যাইত।"

বালিকা "কহিল,—কেন, পয়ঃপ্রণালীর মধ্যেই ত তাহার মৃত দেহ আছে।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তুমি বলিতে পার?"

বালিকা কহিল,—"হাঁ, পারি। হত্যা করিয়াছে একটি স্ত্রীলোকে। পুলিশ আমাকে মাইকেলের নিকট হইতে লইয়া আসিবার পরে, তিনি একাকী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিলেন। একটি স্ত্রীলোকও একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হাতে লইয়া তাঁহার পিছে পিছে চলিয়াছিল। মাইকেল পায়ের শব্দ পাইয়া যেই ফিরিলেন, অমনি স্ত্রীলোকটি, এক খানি ধূসর বর্ণের বস্ত্র তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিয়া, মুখ ঢাকিয়া লইল, এবং বারংবার ছুরিকাদ্বারা আঘাত করিল। ক্রমে আটটা আঘাতের পর মাইকেল পড়িয়া গেলেন। ধূসর বর্ণের বস্ত্র খানি রক্তে ভিজিয়াছিল। স্ত্রীলোক উহা তুলিয়া লইল না; যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই রহিল। সে

মৃত দেহটাকে দ্রুত টানিয়া নিয়া নিকটবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালীতে ফেলিয়া দিয়া, চলিয়া গেল।"

মাজিষ্ট্রেট দেখিলেন, এই উক্তির সত্যতা পরীক্ষা করা সহজ। তিনি তৎক্ষণাৎ পয়ঃপ্রণালী (Aquiduct) * খুঁজিয়া দেখিবার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, বালিকা যেরূপ বলিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায়, ধূসর-বর্ণ-বস্ত্রে মণ্ডিত-মস্তক মৃতদেহ পয়ঃপ্রণালী হইতে উত্তোলিত হইল। সে দেহ মাইকেলের।

মাইকেলের মৃতদেহ পাওয়ার পরে, মাজিষ্ট্রেট আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য করিয়া বল দেখি, বাছা, তুমি কিরূপে এ সব জানিতে পাইলে।" সে কেবল, এই উত্তর করিল,—"আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি চক্ষে যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাই বলিয়াছি।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"আচ্ছা, যে হত্যা করিয়াছে, তাহার নাম বলিতে পার?—তাহাকে তুমি চেন?"

বালিকা কহিল,—"নামটা ঠিক বলিতে পারিব না। যে স্ত্রীলোকটি তাঁহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সেই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। অদ্য রাত্রিতে তিনি আমাকে এ বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন, কহিয়া- ছেন। যদি বলেন, কাল আপনাদিগকে সমস্ত জানাইব।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তিনি কে?"

বালিকা কহিল,—"কেন, সেই মাইকেল, —নিশ্চয়ই সেই মাইকেল।"

মাজিষ্ট্রেট বালিকাকে হাজতে লই- যাইতে আজ্ঞা দিলেন। বালিকা চলি- গেল। তিনি, বালিকা কোন প্রকারে টে- না পায়, এরূপ ভাবে, সমস্ত রাত্রি যে- করে, না করে, ভাল করিয়া দেখিবার নিমি- চতুর লোক নিযুক্ত করিলেন।

প্রহরীরাও কৌতূহলাবিষ্ট ও সংশয়া- কুল। তাহারাও প্রকৃত সত্য জানিবার জ- যার-পর-নাই যত্নবান্। তাহারা দেখিল,- বালিকা শয়ন করিল না। কেমন এক প্রক- আধ' অবসাদ, আধ' নিদ্রার ভাবে প্রায় স- মস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইল। শরীর সাধারণ- স্পন্দন-রহিত হইয়াও মাঝে মাঝে স্নায়বি- আলোড়নে আলোড়িত; এবং বালিকা, যে- সম্মুখের দিকে তাকাইয়া, কাহারও সহি- অস্ফুট স্বরে কথোপকথনে ব্যাপৃত! পর দি- এই রিপোর্ট সহ, বালিকা মাজিষ্ট্রেট সমী- আনীত হইল। বালিকা মাজিষ্ট্রেটের কা- আসিয়াই বলিল,—"আমি হত্যাকারিণী- চিনিয়াছি, এবং তাহার পরিচয় পাইয়াছি, এখন তাহার নাম বলিতে পারি।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"ভাল, আ- তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করি, তারই উ- দাও। মাইকেলের চক্ষু কিরূপে নষ্ট হই-

* রুশ-রাজ্যে দ্নিষ্টার (Dniester) নামে একটি নদী আছে। সে নদী ওদেসা হইতে ২৭ মাইল দূরে। দ্নিষ্টার হইতে Aquiduct অর্থাৎ পয়ঃপ্রণালী যোগে জল আইসে, এবং সেই জলই ওদেসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

-ল, তাহা সে জীবিত থাকিতে তোমাকে -য়াছিল কি?"

বালিকা কহিল;—"না। কিন্তু যে দিন আমি ধৃত হই, সেই দিন প্রাতে তিনি আমাকে ইহা বলিবেন, বলিয়াছিলেন; এবং ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।"

মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল কিরূপে?"

বালিকা কহিল,—"গত রাত্রিতে মাইকেল আমার কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি ঐ দিন যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আমাকে দেখাইয়া গিয়াছেন। মাইকেল, যেখানে বসিয়া, তাঁহার চক্ষু নষ্ট হওয়ার আগা গোড়া সমস্ত কাহিনী আমাকে বলিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেখানে, তাঁহার ও আমার পশ্চাৎ ভাগে, একটি লোক লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছিল। লোকটি ইহা শুনিয়াই"—

মাজিষ্ট্রেট, বালিকাকে তাহার বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া, একটু দ্রুত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ঐ লোকটির নাম বলিতে পার?"

বালিকা কহিল,—"তাহার নাম (Luck) লাক্। লাক্, মাইকেলের এই কথা শুনিয়াই, একটা পরিসর পথের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঐ পথটি হারবার (Harbour) অর্থাৎ জাহাজঘাটার দিকে গিয়াছে। কিছু দূর যাইয়া, সে ডাহিনের দিকের তৃতীয় বাড়ীতে প্রবেশ করিল।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তুমি ঐ ষ্ট্রীটের নাম জান?" বালিকা কহিল,—"না, আমি ষ্ট্রীটের নাম জানি না। কিন্তু সেই ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীর লোকের সহিত একটি স্ত্রীলোকের যে সকল কথা হইয়াছে, এবং তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সমস্তই আমি এইক্ষণ মাইকেলের নিকট প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পাইয়াছি, এবং বিবরিয়া বলিতে পারি।"

মাজিষ্ট্রেট ও কোর্টের সকলেই তখন সবিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"বল, বল,—তুমি যাহা কিছু জানিয়াছ, সমস্তই খুলিয়া বল।" তখন বালিকা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—

"পূর্ব্বে কহিয়াছি, লাক্ আমাদিগের কথা শুনিয়া চলিয়া গেল, এবং জাহাজঘাটের নিকটবর্ত্তী ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সে ঐ বাড়ীর একটি ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, একটি স্ত্রীলোক তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। স্ত্রীলোকটির নাম ক্যাথেরিণ। ক্যাথেরিণ কহিল,—'কেমন লাক্, উহার পেটের কথা পাইয়াছ?' লাক্ কহিল,—'হাঁ পাইয়াছি, এবং পাইয়া প্রকৃতই একটু ভীত হইয়াছি।' ক্যাথেরিণ কহিল,—'তবে আর বিলম্ব করিতে নাই; যেরূপে পার, উহাকে আজিই শেষ কর। নতুবা সকল কথা বাহির হইয়া পড়িবে।' লাক্ কহিল,—'না, না,—তা আমি পারিব না,—কোন মতেই না। মাইকেল আমার কি অপকার করিয়াছে? পনর বৎসর অতীত হইল, এই বেচারা তোমার দুয়ারে পড়িয়া

ঘুমাইতেছিল। সেই সময় আমি তোমার প্ররোচনায়, উহার চক্ষু দুটি পোড়াইয়া দিয়া যার-পর-নাই পাতকের কার্য্য করিয়াছি। এখন আবার হত্যা! ইহা নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হইবে না।—আমার দ্বারা নহে।'

সেই নিরাশ্রয়া বালিকা কহিয়া যাইতেছে, আর কোর্টের সমস্ত লোক উহার প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অক্ষরটি পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য, গলা বাড়াইয়া, কান পাতিয়া শুনিতেছে। কোর্টে অসংখ্য লোক, কিন্তু সকলেই চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দ ও নীরব। মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"এইরূপ কথোপকথনের পর কি হইল?"

বালিকা কহিল,—"এরূপ কথাবার্ত্তা হইবার খানিক পরেই আমরা ঐ ক্যাথেরিণের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে গেলাম। ক্যাথেরিণ একটা প্লেট আনিয়া আমার ঝুলিতে ভরিয়া রাখিল, এবং তাহার প্লেট চুরি গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। ক্যাথেরিণ, তারপর নিজেই একটা তীক্ষ্ণ ছুরি লইয়া পয়ঃপ্রণালীর কাছে যাইয়া লুকাইয়া রহিল। অবশেষে, আমি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার পরে, ক্যাথেরিণ ছুরির আঘাতে মাইকেলকে মারিয়া ফেলিল।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"তুমি এত তত্ত্ব জান, তবে বাছা তোমার ঝুলিতে প্লেট খানা রাখিলে কেন? আর এ বিষয়ে, কোন সংবাদই বা পূর্ব্বে প্রচার করিলে না কি জন্য?"

বালিকা কহিল,—"আপনার ত মহাশয় সবই ভুল হইতেছে! আমি সে সময়ে ইহার কিছুই জানিতাম না। মাইকেল কল্য রাত্রিতে আমাকে এই সমস্ত যেন দেখাইয়া দিয়া ভাল করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কিন্তু ক্যাথেরিণ, এ দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? মাইকেল তাহার কে?"

বালিকা মাথা হেঁট করিয়া কহিল,—"ক্যাথেরিণ মাইকেলের স্ত্রী। সে মাইকেলকে পরিত্যাগ করিয়া আর এক পুরুষের আশ্রয় গ্রহণে অভিলাষিণী হয়, এবং ওদেসায় পলাইয়া আসিয়া লাকের সহিত গৃহবাস করে। মাইকেলও তাহার অনুসন্ধানে ওদেসায় চলিয়া আইসেন। ক্যাথেরিণ মাইকেলকে দেখিতে পাইয়া, লুক্কায়িত ভাবে, নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করে। মাইকেলও তাহা দেখিতে পান, এবং ক্যাথেরিণ তাঁহাকে দেখে নাই, এই মনে করিয়া, তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তাহার দুয়ারে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার ঘুম আইসে। তাঁহাকে নিদ্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পাইয়া লাক্ তাঁহার চক্ষু দুটি দগ্ধ শলাকার দ্বারা পোড়াইয়া দেয়, এবং তাঁহাকে দূরবর্ত্তী স্থানে রাখিয়া আইসে।"

মাজিষ্ট্রেট কহিলেন,—"মাইকেলই কি সত্য সত্য এই সমস্ত তোমাকে বলিয়াছেন?"

বালিকা কহিল,—"হাঁ,—তিনিই বলিয়াছেন। তিনি কারাগৃহে আগেও আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কল্য রাত্রিতে আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। দেখিলাম, তিনি বড় কাতর। মুখ পিঙ্গল বর্ণ, ...

...র রক্তে মাখা। তিনি আমাকে হাতে ...য়া তুলিয়া তাঁহার শরীরের সমস্ত আঘাত... আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন; এবং ...র সমস্ত দুঃখের কথা বুঝাইয়া কহিয়াছেন।"

ইহার পর লাক্ আর ক্যাথেরিণ ধৃত হইল। মাজিষ্ট্রেটের মন একবারে নিঃসংশয় নহে। কিন্তু তাঁহার এইক্ষণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, খারসান নামক স্থানে, প্রকৃতই ক্যাথেরিণের সহিত মাইকেলের বিবাহ হইয়াছিল, এবং ক্যাথেরিণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন এক দিকে পলাইয়া গিয়াছিল।

ক্যাথেরিণ আর তাহার প্রাণের সাথী অথবা পাপের সাথী প্রথমে অপরাধ স্বীকার করিতে চাহিল না। কিন্তু পৌলেস্কা যখন, তাহাদিগের চক্ষের দিকে চাহিয়া, চাক্ষুষদর্শনের মত দৃঢ়তার সহিত, একে একে সমস্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক সকল কথা কহিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন কিবা লাক্, কিবা ক্যাথেরিণ, কাহারও মুখে আর কথা সরিল না। উভয়েই তখন আত্মদুষ্কৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইল; এবং বিচারক ও দর্শক, সকলের প্রাণেই একটা অভাবনীয় বিস্ময় জন্মিল। ওদেসার বিচার-গৃহে তখন লোকে লোকারণ্য। সমস্ত লোকই, মাইকেলের অতীত জীবন এবং আত্মিক পুরুষের সাক্ষ্য-প্রসঙ্গে নানা কথা কহিয়া, ভয়ে ও ভক্তিতে ভগবানের নাম লইল। যাহারা ধার্ম্মিক, তাহারা উর্দ্ধনেত্র হইয়া, অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-সহকারে, একে অন্যকে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কহিল। সকলেই বুঝিল যে, কিবা অদ্য, কিবা কল্য, জগদীশ্বরের এই অনন্ত ধর্ম্মরাজ্যে, পরিণামে ধর্ম্মেরই জয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "কণিকা। শ্রীঅনঙ্গমোহিনী দেবী প্রণীত। স্বাধীন ত্রিপুরা,—আগরতলা—...লিত যন্ত্রে, শ্রীঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।"—পূর্ব্ববঙ্গের বৃদ্ধ কবি উদার-হৃদয় শ্রীযুক্ত মদনমোহন মিত্র এই কবিতা পুস্তকের অবতরণিকায় লিখিয়াছেন,—

"কণিকা ত্রিপুররাজ্যের রাজকুমারী কর্ত্তৃক বিরচিত। ইনি বর্ত্তমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের কনিষ্ঠা সহোদরা, গুণিগণাগ্রগণ্য স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুরের প্রথমা কন্যা। * * * স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুররাজ্যে কবিতা ও গীত-বাদ্যের দেশব্যাপী স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন; রাজদুহিতাও কবিত্বে স্বভাবতঃ পিতৃ-পদানুসারিণী।"

আমরা কণিকা পড়িয়া প্রকৃতই সুখী হই-

য়াছি, এবং সে সুখের জন্য, স্বাধীন ত্রিপুরার সহৃদ্যমশীল সাহিত্যসেবী, কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে প্রস্তুত আছি। কণিকা উচ্চ লক্ষ্যের কাব্য নহে; কিন্তু উৎকৃষ্ট কাব্য। ভাষা সরল, ভাব রস-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়াও নির্ম্মল প্রীতির অনুগুণ। এখনকার বাঙ্গালা কাব্য, বাঙ্গালির হৃদয়ের ন্যায়, অনেক স্থলেই দুর্ব্বোধ। কণিকার সকল কবিতাই সুখ-বোধ্য,—সুখ-প্রীতিকর। গ্রন্থখানি পিতার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। আমরা উৎসর্গ-পত্রের দুইটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিব।

"এ নহে কবির গাঁথা কবিতা-কুসুম-মালা,
সুবাসিত চির-মধুময়,
এ কেবল শুষ্ক ফুল, বিহীন সুবাস মধু,
মলিন বিশীর্ণ দল চয়।
তবু পিতঃ, উৎসর্গিনু স্বর্গীয় চরণে তব,
অতি ক্ষুদ্র মম উপহার,
অশ্রুজল বিন্দু সহ ভকতি প্রণাম এই,
লহ পিতা দীন তনয়ার।"

স্নেহার্দ্রহৃদয়ের এ সকল কথা আপনা হইতেই হৃদয়ে যাইয়া স্পৃষ্ট হয়। আগরতলা রাজপরিবার ভক্তবৈষ্ণব এবং প্রকৃতি-পুরুষ অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমোচ্ছ্বাসময়ী ব্রজলীলার উপাসক। কণিকার ব্রজভাবের যে কয়টি কবিতা বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহা বংশীধ্বনির ন্যায় শ্রুতিমনোহর।

২। "বুদ্বুদ। শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত।" ইহা একখানি ধর্ম্মভাবময় ও ধার্ম্মিক-জন-সমুচিত সাধুশব্দগ্রথিত খণ্ড কাব্য। ইহাতে চির-মধু, অলসতা,—অবলা আমার বন্ধু, আনন্দসংগীত, ভাব ও ভাষা, বাঁশরী সভ্যতা, এবং নববিংশ ও নামামৃত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামযুক্ত চৌরাশীটি কবিতা আছে; এবং সমস্ত কবিতাই সাধু উদ্দেশ্যে, সৎশিক্ষার অভিলাষে, বিশেষ সাবধানতার সহিত লিখিত হইয়াছে। খণ্ডকবিতা-নিচয়ের আনুপূর্ব্বিক সমালোচনা সুদুষ্কর কার্য্য। কেন না, এক কবিতার সহিত আর এক কবিতার প্রায়শঃ কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু বুদ্বুদের কবিতা গুলি, বিষয়াংশে পরস্পর-সম্বন্ধশূন্য হইলেও, ভাবে একে অন্যের সহিত অনুস্যূত। ইহার কোন কোন কবিতা আরম্ভে অথবা উপসংহারে আবেগময়। যথা 'করে ধর মম' নামক কবিতার আরম্ভ।

"তিমিরে আচ্ছন্ন পথ পিতাহে আমার,
ঘন মেঘরাশি দেখ ছাইল গগন,
ভীষণ অশনি রব মস্তক উপর,
দেখ দেখ পিতা আহা কি ভাবে এখন,
রয়েছি দাঁড়ায়ে হত বুদ্ধি প্রায়,
করে ধর পিতঃ মম স্নেহময়,
গভীর আঁধার হেন,
তোমার সন্তান দীন,
নিরাপদে বাড়ী নিয়ে চল।"

কিন্তু, একই বৃক্ষের সব ফুল যেমন রূপে ও গুণে সমান হয় না, একই হৃদয়ের সমস্ত কবিতাবুদ্বুদও সেইরূপ, ভাবে ও ভাষায়, প্রায়শঃ সমান হইতে দেখা যায় না। পাঠক 'অধর' নামক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-নিচয় পাঠ করিলেই এ কথার প্রমাণ পাইবেন। যথা,—

"অধর তোমাতে নাকি নাহি ধরে সুধা,
ক্ষরিয়া প্রেমিকে দেয় নিদারুণ ক্ষুধা।
মধুর হাসিটি সনে দন্ত পাঁতি নিয়া,
নিমিষে হৃদয়ে দেয় অমিয় মাখিয়া।
রক্তিম বরণ যবে তাম্বুল চর্চ্চিত,
সুন্দর সুন্দর আহা, উপমা অতীত।"

উপরিধৃত কবিতা দুইটির মধ্যে প্রথমটির ভাব ও ভাষা হৃদয়গ্রাহি। কিন্তু, বোধ হয় উহাতে বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধনের প্রচলিত নিয়ম পরিরক্ষিত হয় নাই। কারণ, 'আমার' ও 'উপর', 'প্রায়' ও 'ময়', এবং 'হেন' ও 'দীন' শব্দে, দেশের প্রথা অনুসারে মিল ঘটে না। দ্বিতীয় কবিতাটির ছন্দে কোন দোষ নাই। কিন্তু, উহার অর্থ-প্রতীতি কঠিন। বুদ্বুদের ভাব ও ভাষা নামক কবিতাটি শুধু চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে। যাঁহারা ভাব ও ভাষার বিকাশ লইয়াই ব্যাপৃত, তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া অনেক ভাল কথা ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পাইবেন।

৩। "বিদ্যাসাগর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হুগলী, বিদ্যাসাগর পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵।"—পুস্তক খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সুপাঠ্য। যাঁহারা মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমলজীবনসম্পর্কে সর্ব্বদা আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। ইহার রচনা সাধারণতঃ শুদ্ধ, ভাষা স্থানে স্থানে উদ্দীপনাময়ী।

৪। "ভূদেব-নির্ব্বাণম্। কাব্যম্। শ্রীমন্-মহেন্দ্রনাথ কবিরত্ন-প্রণীতম্।"—কবিরত্ন মহাশয় সর্ব্বথা কবিরত্ন নামের যোগ্য। বঙ্গে এইক্ষণ সংস্কৃত কবিতার তেমন আদর নাই, আশ্রয় নাই, উৎসাহদাতা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে, ভূদেবনির্ব্বাণ-রচয়িতা নিশ্চয়ই সম্মানের উচ্চ আসন এবং উচ্চতর শক্তি-বিকাশের সুযোগ পাইতেন।—"তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

৫। "ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীআবদুল করিম, বি, এ, প্রণীত।"—এ দেশে, এতকাল, মুসলমান ভদ্রলোকেরা এক ছত্তর বাঙ্গালা লিখিতে জানিতেন না। এখন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালা-সাহিত্যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষান্বিত। মৌলবী আবদুল করিম তাদৃশ শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তিনি বাঙ্গালা-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও শব্দ-বিচার-ক্ষম। আমরা তাঁহার এই ইতিহাস পুস্তক পড়িয়া বুঝিয়াছি, তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুরাগী। তাঁহার রচনা সরল, সুন্দর ও সুরুচির পরিচায়ক। তাঁহার ভারত-বর্ষের ইতিহাস, বালকের জন্য, বাল্যশিক্ষার উপযোগি ভাষায় লিখিত হইয়া থাকিলেও, ইহা সুশিক্ষিতের নিকট সুখ-পাঠ্য বোধ হইবে; আর ইহার চারুমুদ্রিত ছবিগুলি চিত্র-দর্শনানুরাগিণী পুররমণীদিগের চিত্তেও প্রীতি জন্মাইবে।

৬। "সমাজ-তত্ত্ব। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্র-

ণীত।"—যাঁহারা বঙ্গে চিন্তাশীল লেখক বলিয়া পরিচিত, পূর্ণ বাবু তাঁহাদিগেরই এক জন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমন সুলেখক, এবং সমাজের শুভাভিলাষী শিক্ষক। তাঁহার এই সমাজতত্ত্ব গ্রন্থের আগা গোড়া সমস্তই জ্ঞানগর্ভ কথায় পরিপূর্ণ। তবে, ইহাকে সমাজতত্ত্ব নাম দেওয়া সঙ্গত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আমাদিগের সংশয় আছে। সমাজ-তত্ত্ব বলিলে, সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেণিস্থ সমাজের উৎপত্তি,স্থিতি ও ক্রমিক উন্নতি সংক্রান্ত নানা কথাই আপনা হইতে চিন্তার ভূমিতে উপস্থিত হয়। এ গ্রন্থ পাঠে তাহা হয় না। এই গ্রন্থে হিন্দুসমাজই প্রধানতঃ গ্রন্থকারের আলোচ্য,এবং তাহারও এক দিক্ মাত্র। কিন্তু গ্রন্থোক্ত কথার সহিত মত-দ্বৈধ ঘটিলেও, সকলেই গ্রন্থকারকে সম্মান করিতে বাধ্য হইবেন। গ্রন্থের ভাষা প্রশংসাযোগ্য। মহাভারতে আছে, এক ঋষি এক দেবপুরুষের স্তুতিবন্দনায় কহিতেছেন,—"আপনি এমন, —আপনি তেমন,—আপনি অর্থযুক্ত বাক্য কহিয়া থাকেন।" ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, দেবতাদিগের মধ্যে সকলে অর্থযুক্ত বাক্য কহিতেন না। পূর্ণ বাবুর সকল বাক্যই অর্থযুক্ত, এবং সে অর্থ স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয়-তত্ত্বভুক্ত। কুত্রচিৎ দুই একটি শব্দের প্রয়োগে সামান্য অসাবধানতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে অসাবধানতা নিশ্চয়ই প্রুফশোধকের। যথা, ১২০ পৃষ্ঠায়,—"তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি।"এখানে, কিঞ্চিৎ অর্থে কথঞ্চিৎ শব্দের প্রয়োগ আমাদিগের নিকট উপযুক্ত বোধ হয় নাই। সমাজ-তত্ত্বের উপসংহার সকলেরই হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবার যোগ্য।

৭। "বাজী রাও।—৮। মহামতি রাণাডে। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।" গ্রন্থকারের নাম শ্রবণে প্রতীতি হয়, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; আর তাঁহার গ্রন্থপাঠে প্রতীতি হয়, তিনি বঙ্গের এক জন শ্রেষ্ঠ লেখক। দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনও এক সময়ে মহারাষ্ট্রীর নাম শ্রবণে কম্পিত হইত। সেই মহারাষ্ট্রী আজি বঙ্গে উপনিবিষ্ট হইয়া, এবং বাঙ্গালা শিখিয়া ও বাঙ্গালা লিখিয়া,বাঙ্গালির উপকার করিতেছেন,—বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বাড়াইতেছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ হর্ষপ্রীতির বিষয়। তার পর লেখার দোষ-গুণ-পরীক্ষা। আমরা সে অংশেও বলিতে পারি, দেউস্কর মহাশয় যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সুলেখক। তাঁহার এই উভয়গ্রন্থেই দেশ-হিতৈষিতা, বিচারক্ষমতা ও লিপিকৌশল প্রভৃতি বিবিধ গুণের পরিচয় আছে।

৯। "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত। শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র সেন-কৃত ভূমিকা সহ" মুদ্রিত। বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ-ধৌত চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশের চির-প্রসিদ্ধ স্থান। সাগরের উদ্বেল-তরঙ্গ যেমন, মাঝে মাঝে চট্টল-বাহিনী নদীর মুখে প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গদেশকে বিকম্পিত করিয়াছে; রাজ-নৈতিক শক্তির উন্মাদ-তরঙ্গও সেইরূপ, চট্টলপ্রদেশ হইতে পরিচালিত

হইয়া, বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবিধ পরিবর্ত্ত ঘটাইয়াছে।—বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যিক ইতিহাসে চট্টগ্রামের উচ্চ আসন, এবং ইহা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে, প্রতিভাশালী কবি ও পণ্ডিত-পূজ্য সান্দর্ভিকদিগের প্রসাদাৎ বঙ্গের নব্য সাহিত্যেও উহার উচ্চ সম্মান। এইরূপ সমৃদ্ধিশালী দেশের ইতিবৃত্ত দেশানুরাগী ব্যক্তির নিকট একটি দুর্ল্লভ সামগ্রীর মত আদর পাইবার যোগ্য। তবে, এই এক কথা, গ্রন্থকার যাদৃক্ শিক্ষিত পণ্ডিত,গ্রন্থখানি তাদৃক্ বৃহৎ বস্তু নহে। চট্টলের ইতিবৃত্তে লিখিবার কথা অবশ্যই অনেক আছে। সে সকল কথা গ্রন্থকারের সুপরিচিত তত্ত্ব। কিন্তু তিনি, যেন বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত-বিমুখতায় বিরক্তি দেখাইয়া, সে সকল কথা কতকটা এড়াইয়া গিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই সুপাঠ্য। তাঁহার লেখায় একটু অনন্যসাধারণ আকর্ষকতা আছে। শুনিয়াছি, লেখক বার্দ্ধক্যের সন্নিহিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী হইয়া স্বজাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যত্নপর রহিবেন।

১০। "অবলা বালা,—১১। সহমরণ,—১২। উপন্যাস-মালা। শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত।"মিত্র মহাশয় দক্ষিণেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরমহংসদেবের প্রিয় শিষ্য। তিনি গুরুর কৃপায় যে সকল গূঢ়তত্ত্ব শিখিয়াছেন, তাহাই উপন্যাসের কথায় গাঁথিয়া বহু সহস্র পাঠককে শিখাইতে যত্নপর হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা সর্ব্বজন-বোধ্য,—বর্ণনা স্থানে স্থানে চিত্তহারিণী। কল্পনা, বঙ্কিম, রমেশ ও শ্রীশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদিগের কল্পনার ন্যায়, সকল সময়ে,পরিচিত-পথ-গামিনী নহে। ইহা, অনেকের কাছে, রস-সৃষ্টির একটুকু বিঘাতক বলিয়া বোধ হইবে; আর গ্রন্থকার পতিপ্রাণা সতীর প্রেমোন্মাদ ও বিগ্রহসেবিকা দেবহৃদয়া রমণীর ধর্ম্মোন্মাদের যে প্রকার পট আঁকিয়াছেন, তাহাও অসাম্প্রদায়িক পাঠকের একটু বেশী বিস্ময় জন্মাইবে। তাঁহার এই তিন খানি পুস্তকে আট নয় খানি উপন্যাস। তিন ছত্তরে আমরা ইহার অধিক আর কি বলিব? কিন্তু এই পুস্তকত্রয়ে আমরা প্রীতি ও ভক্তির অনেক পবিত্র কথা শিখিয়াছি; তজ্জন্য সহৃদয় গ্রন্থকারের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিব। সত্য বাবুর রচনায় রসোচ্ছল শব্দের যেরূপ রমণীয় ছটা, ব্যাকরণ বিষয়ক বিশুদ্ধিরও যদি সেইরূপ একটু আদর থাকিত, তাহা হইলে প্রকৃতই সোনায় সোহাগার সম্মিলন ঘটিত। উপন্যাসমালার ৭ম পৃষ্ঠায় আছে,—"সুশীলা রূপে জ্যোৎস্নাময়ী,কেশে আধারময়ী,হাস্যে বিদ্যুৎময়ী। উপরে সুকৃষ্ণ কেশদাম,—নিম্নে ললিত-লাবণ্য-মাধুর্য্যময়ী দেহ।"উদ্ধৃত অংশটুকু উদাহরণ মাত্র। এই তিন গ্রন্থে এই রূপ বাক্য অনেক আছে। পড়িবার সময়ে আপনা হইতেই প্রতীতি জন্মে যে, এই গ্রন্থগুলি গ্রন্থকারের স্বায়ত্ত তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু, অধিকাংশ পাঠকই বর্ণনার চমকে মোহিত থাকে, এ সকল কথা ভাবিবার অবকাশ পায় না। গ্রন্থকার সুকবি, বাঙ্গালা

সাহিত্যের সহৃদয় সুহৃৎ। তিনি এখনও বৃদ্ধ হন নাই। আমরা বিনয়ের সহিত অনুরোধ করি, তিনি যেন ভবিষ্যতে তদীয় উপাদেয় গ্রন্থগুলি নিজে ভাল করিয়া দেখিয়া শুদ্ধ-মুদ্রণের সহায়তা করেন।

১৩। "মৃচ্ছকটিকা। ইংরেজী অনুবাদ ও উপযোগিনী টীকা সহিত ডক্টর নিশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় P. H. D. কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" যাঁহাদিগের প্রখর প্রতিভা ইউরোপ ও আমেরিকার সুদূর-প্রান্তেও পুরাতনী ভারত-সভ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে,—ভারতোজ্জ্বল ঋষি ও কবিদিগের গুণ-গাথা গাইয়াছে, ডক্টর চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এখন এ দেশের দুধের শিশুও, অনায়াসে কালাপানি পার হইয়া, বারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু, যে সময়ে দেশ-ত্যাগ আর জীবনত্যাগ প্রায় এক কথা ছিল,ডক্টর চট্টোপাধ্যায় সেই সময়ের লোক। তিনি, বঙ্গীয় নব্য সভ্যতার সেই ঊষাসমাগমে,সাংসারিক সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ইউরোপে চলিয়া যান, এবং জর্ম্মণ পণ্ডিতদিগের নিকট বহু সম্মানার্হ ডক্টর অব্ ফিলজফি উপাধি লাভ করিয়া তুষার-শীতল রুষে যাইয়া কএক বৎসর অবস্থিত রহেন। আমরা তাঁহার এই মৃচ্ছকটিকা উপহার পাইয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি তাঁহার স্বদেশস্থ সুহৃদ্বর্গকে এখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আমরা সময় ও সুযোগ অনুসারে, তদীয় গ্রন্থের সমালোচনা করিব।

১৪। "চিত্র-বিচিত্র। শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।"—বাণিজ্যের যেমন অনেক বিভাগ আছে, সাহিত্যেরও তেমন অনেক শাখা আছে। আমরা শৈলেশ বাবুর এই এক খানি পুস্তক পাঠ করিয়াই বুঝিয়াছি, তিনি বাঙ্গালাসাহিত্যের আমোদ-রঙ্গ-বিভাগে অচিরেই মহাজনের গদি পাইবেন। সাহিত্যে যাহা সাধারণতঃ সৌখীন লেখা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, শৈলেশচন্দ্র তাহাতে সিদ্ধহস্তবৎ,—অল্প বয়সেই আচার্য্য। তাঁহার এই চিত্র-বিচিত্র, ভাব ও ভাষার রস-মাধুরীতে, গোলাপজলের একটি চারুচিত্রিত ক্ষুদ্র ফোয়ারার মত হইয়াছে। ইহা, প্রাণস্পর্শিনী প্রীতির ন্যায়, প্রগাঢ় আনন্দদানে সমর্থ না হইলেও, নিশ্চয়ই প্রণয়িজনের শ্লেষপ্রফুল্ল মৃদুহাস্যের ন্যায়, বহু হৃদয়কে আমোদিত করিবে, এবং কখনও কখনও আমোদের সঙ্গে আত্মপরীক্ষার উপযোগিনী শিক্ষা দিবে। সমাজচিত্রের এই প্রকার পুস্তকে ইহাই সম্ভাবনার অনুরূপ সার্থকতা। শৈলেশচন্দ্রের রচনা যেমন সুন্দর, তেমন বিশুদ্ধ। বাঙ্গালায় শুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের এইরূপ সুখ-মিশ্রণ প্রকৃতই একটুকু বিরল। আমাদিগের নিকট দুই চারিটি শব্দ ভাল লাগে নাই। যথা, ১০৩ পৃষ্ঠায়—আদরের মধু অর্থে 'আপ্যায়িত সুধা'। আপ্যায়িত-সুধা এই শব্দ সুন্দর নহে, ইহা বুঝি; শুদ্ধ কি না, তাহা বিচার্য্য। পুস্তকের কোন কোন স্থান রীতিমত ইঙ্গ-বঙ্গ অর্থাৎ Anglo-Vernacular ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালির এত সাধের বাঙ্গালা ভাষাকে শৈলেশের মত সুনিপুণ শব্দশিল্পীও এই ভাবে ভাসাইয়া দিতে ভালবাসিবেন কেন?

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"যজ্ঞ স্থানে নিয়ে এলো শচীর নন্দনে,
যথা বেদধ্বনি করে ব্রাহ্মণের গণে।
রক্ত বস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে,
রূপ দেখি ভুলে গেল আপনি অনঙ্গে।"

ভারতবর্ষীয় হিন্দুর সহিত পৃথিবীর অন্যান্যজাতীয় মনুষ্যের অনেক বিষয়েই বিশিষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু, একটি বিষয়ের পার্থক্য নিতান্তই পরিলক্ষণীয়। এই অবনীতে, সমাজবদ্ধ মনুষ্য কোথাও একবারে ধর্ম্মশূন্য নহে। যাঁহারা লণ্ডন, বার্লিন ও পারিস প্রভৃতি সুসভ্য নগরে, দূরবীক্ষণ ও বিদ্যুচ্চালন প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিকযন্ত্রে বেষ্টিত হইয়া, শত-দীপ-সমুজ্জ্বল সুরম্য প্রাসাদে বসতি করেন, তাঁহাদিগেরও ধর্ম্ম আছে; আর যাহারা কোন দুর্গম অরণ্যে, কিংবা সুদূর-সাগর-মধ্যবর্ত্তী কোন দুর্গম দ্বীপে, বনের পশুর সহিত, বন্য জীবের জীবন যাপন করে, তাহাদিগেরও ধর্ম্ম আছে।

বস্তুতঃ, মনুষ্য-পদবী-রূঢ় জীব মাত্রই জগদীশ্বরের কৃপায় ধর্ম্মের অধীন। যাহারা কর্ম্মপাকে, অথবা বুদ্ধির বিপাকে, বিশ্বচিন্তার সূতা হারাইয়া, আপনাদিগকে অকারণ নাস্তিক কিংবা অস্তিবিমুখ বলিয়া পরিচয় দিতে ভালবাসে, তাহারাও সাধারণতঃ একটা মনগড়া ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া থাকে। কেন না, যে কোন ধর্ম্ম জানে না,—কোন ধর্ম্ম মানে না, অথবা কপটতা করিয়াও কোনরূপ ধর্ম্মের দোহাই দেয় না, মনুষ্যনিবাসে কোন প্রকারেই তাহার ঠাঁই হইতে পারে না। * কিন্তু, ভারতবাসী হিন্দু, শুধু ধর্ম্মাধীন নহে। সে তাহার আচারে ব্যবহারে, আহারে বিহারে, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন-বর্ত্মের প্রত্যেক পাদ-চারে, সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মসর্ব্বস্ব। হিন্দুর, প্রাতরুত্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, পুনরায় গভীর নিশীথে সুখ-শয়ন পর্য্যন্ত, প্রতিদিনের প্রত্যেক

* ইহার প্রমাণ উৎকট নিহিলিষ্টগণের সহিত আধুনিক ইয়োরোপ ও আমেরিকার অবিশ্রান্ত বিবাদ।

কার্য্য ও প্রত্যেক প্রক্রমই ধর্ম্মের শাসনে শাসিত। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত ক্রিয়া, এবং সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত অনুষ্ঠান, ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষারই নামান্তর মাত্র। ইহা ভাল কি মন্দ, সে কথার বিচার করা এইক্ষণ আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কারণ, যাহা অতি ভাল, তাহারও অনিচ্ছাকৃত অনুষ্ঠান আত্মার স্বাভাবিক উন্নতির বিঘাতক হইতে পারে। তবে, হিন্দুর নিত্য ও নৈমিত্তিক জীবন সম্পর্কে ইহাই যে বেদের ব্যবস্থা, গৃহ্যসূত্রনিচয়ের উপদেশ, গৃহধর্ম্মবিবরিণী স্মৃতির অনুশাসন, এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায়, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই নিমিত্তই হিন্দু, অনেক সময়ে, এবং অনেকের কাছেই, একটুকু অবোধ্য বস্তুর মত।

পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ প্রভৃতি শোকাবহ ঘটনায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, লোকে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া,একাকী বসিয়া, অশ্রু বিসর্জ্জন করে। হিন্দু তখন, হৃদয়ের শোক হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া, পিতা মাতার পারলৌকিক-মঙ্গল ও পার্থিব-প্রতিপত্তি কামনায় এক বৃহৎ কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত রহে। এই নিমিত্তই,অনেক সময়ে, হিন্দুগৃহের এক পার্শ্বে সকরুণ আর্ত্তনাদ, আর এক পার্শ্বে সানন্দ উলুধ্বনি ;—এক প্রকোষ্ঠে তুলসী-গঙ্গাজল-যোগে চরম সময়ের পরিচর্য্যা, আর এক প্রকোষ্ঠে বর-বধূর জন্য শাস্ত্রানুশাসিত পুষ্প-শয্যা। ইহাই হিন্দুসমাজের সুখ,—ইহাই হিন্দুসমাজের দুঃখ। কেহ, নয়নজলে গৃহ-দাহের ভস্মরাশি ধুইয়া ফেলিয়া, সেখানে মঙ্গল্য কদলী রোপণ করিতেছে,—কেহ বা, নয়নের জল অঞ্চলে মুছিয়া, মুখে সেই এক-প্রকার বিষাদের হাসি হাসিয়া, কোনরূপ অপরিহার্য্য উৎসবে ক্ষণকালের তরে আত্ম-বিস্মৃত হইতেছে।

আজি আমাদিগের পূজাস্পদ মিশ্রপুরন্দর মহাশয়ের বাটীতেও ঐ প্রকারের অপরিহার্য্য উৎসব ; এবং তাই সহসা অচিরশ্রুত আর্ত্তনাদের পর পুনঃ পুনঃ উলুধ্বনি, এবং বহু লোকের আনন্দময় কলরব। গৌরাঙ্গের এক্ষণ উপনয়নের বয়স। মিশ্রপুরন্দর পরম শাস্ত্রী ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। এই বয়সে পুত্রকে যজ্ঞোপবীত না দিলে জাতি যায় ও ধর্ম্মলোপ হয় ; সুতরাং জগন্নাথের হৃদয়ে এক্ষণ আর বিশ্বরূপের জন্য দুঃখ করিবার অবকাশ নাই। তিনি গৌরাঙ্গের ব্রহ্মণ্য উৎসব লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। জগন্নাথ সমাগত ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সামাজিকদিগকে লইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন ; শচী, তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী মালিনী প্রভৃতিকে লইয়া, আইয়ো সু'য়োর অভ্যর্থনায়, এবং গন্ধ, আমলকী প্রভৃতি দ্বারা গৌরাঙ্গের মঙ্গল্য স্নানে মনের মর্ম্মনিহিত তুষের আগুন মুহূর্ত্তকাল নিবাইয়া রাখিতে যত্ন পাইতেছেন। যথা লোচনদাসকৃত চৈতন্য মঙ্গলে—

"নবম-বরিখ * পুত্র যোগ্য সুসময়,
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয়।
* * *

* উপনয়ন সময়ে গৌরাঙ্গের কত বয়স, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লেখা। কোন গ্রন্থে এমনও লেখা আছে যে, গৌরাঙ্গ বিশ্বরূপ সন্ন্যাসের বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এ সকল কথার সামঞ্জস্যের জন্য যত্ন করি নাই।

মিশ্র আচার্য্য আনি খ্যাত যে পণ্ডিত,
যজ্ঞ-কর্ম্ম জানে যে, জানয়ে বেদ-রীত।
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মণেরে দিল,
শত শত কুল-বধূ সিন্দুর পরিল।
* * *
শঙ্খ শব্দ হুলাহুলি জয় জয় জয়,
গন্ধ অধিবাস করে গোধুলি সময়।
রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি মিশ্রপুরন্দর,
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধবিধি করিল সুন্দর।
ব্রাহ্মণে পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া,
যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিল সময় বুঝিয়া।
এথা শচী দেবী যত আইয়ো সু'য়ো লৈয়া,
পুত্র মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া।
তৈল হরিদ্রা বিশ্বম্ভর অঙ্গে দিল,
গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মার্জ্জিল।
অভিষেক করাইল সুর-নদী-জলে,
আপনা পাসরে শচী আনন্দ-হিল্লোলে।"

এদেশে, এ সকল অনুষ্ঠানে, আজিও ঘরে ঘরে, যেরূপ রীতি নীতি; উদ্ধৃত পংক্তি কয়টি পাঠে দেখা যাইতেছে যে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও সেই রীতি, সেই নীতি, এবং সেই আচার-পদ্ধতিই বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। গৌরাঙ্গ প্রচলিত রীতিতে গলায় যজ্ঞসূত্র পরিলেন, এবং যজ্ঞস্থলে পিতা জগন্নাথ মিশ্রের নিকটই গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আর এক রূপ ধারণ করিলেন। *

* বিশ্বকোষ-সম্পাদক বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ বসু, তৎপ্রণীত চৈতন্যচন্দ্র নামক প্রবন্ধে, চূড়ামণিদাসকৃত চৈতন্যচরিতের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে,—"বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নিমাইয়ের উপনয়ন হইয়াছিল। পণ্ডিত গঙ্গাদাস নিমাইয়ের সাবিত্রী দীক্ষার আচার্য্য।" যথা তদুদ্ধৃত চৈতন্যচরিতে,—

"পীড়ায় বসিয়া মিশ্র গঙ্গাদাসে কয়,
দিন করি বিশ্বম্ভরে দেহ উপনয়।
ভাল যে বুঝিয়া দিন করে গঙ্গাদাস,
অক্ষয়তৃতীয়া তিথি শ্রীবৈশাখ মাস।"

বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে, শ্রীগৌরাঙ্গের উপনয়ন হওয়া কোন অংশে অসম্ভব নহে। কিন্তু, পণ্ডিত গঙ্গাদাস তদীয় সাবিত্রী দীক্ষার আচার্য্য কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে। কারণ, চূড়ামণি হইতে অধিকতর সুপরিচিত এবং সুতরাং অধিকতর প্রামাণিক, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল নামক কাব্যে স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"বিশ্বম্ভর কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ,
দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ।"

ঠাকুর বৃন্দাবন দাস এবং কবিরাজ-গোস্বামী প্রভৃতি অন্য কোন বিশেষজ্ঞ গ্রন্থকারই গৌরাঙ্গের সহিত গঙ্গাদাসের উল্লিখিতরূপ দীক্ষাসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নাই। এমন অবস্থায়, অপরিচিত চূড়ামণি

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"তুমি স্বপ্ন দেখ নাই ত?"

আনি কহিল,—"না বাবা,—কখনও না। ধর্ম্ম সাক্ষী, এ কখনও স্বপ্ন হইতে পারে না। সে প্রতি রাত্রিতে আমাকে দেখা দিয়া বারংবার এই ঋণের কথা বলিতেছে। আমি স্বপ্ন দেখিব কি, ক্ষণকালও ঘুমাইতে পারিতেছি না।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন,—"ঐ রমণী কি তোমার পরিচিত ছিল?"

আনি কহিল,—"সে আমার অতি-নিকট প্রতিবেশিনী ছিল। সেনা-নিবাসের নিকটে আমরা দুই জনে দুই কুটীরে স্বতন্ত্র-ভাবে বাস করিতাম। তাহার সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা শুনা হইত;—একটুকু প্রণয়ও ছিল। তাহার নাম মালয়।"

ধর্ম্মযাজক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইলেন,—মালয় রজকীর কাজ করিত ও ঐ সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। মালয় কাহার নিকট ঋণী, ইহা বাহির করিতে তাঁহাকে আরও একটুকু শ্রম স্বীকার করিতে হইল। যে মুদীর দোকান হইতে মালয় আহার্য্য ক্রয় করিয়া লইত, অবশেষে তিনি সেই মুদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মুদী কহিল,—মালয়ের নিকটে তাহার কিছু প্রাপ্য আছে বটে; কিন্তু কত পাওনা, তাহা তাহার স্মরণ নাই। মুদী তাহার খাতা খুলিয়া দেখিল, এবং হিসাব করিয়া বলিল,—মালয়ের দেনা মাত্র তের আনা।

ধর্ম্মযাজক শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং অমনিই ঐ তের আনা পয়সা দিয়া মালয়কে ঋণমুক্ত করিয়া আসিলেন। মুদী মালয়ের মৃত্যুসংবাদ অবগত ছিল না। ইহার পরে ধর্ম্মযাজক মহাশয় আনি সিম্‌সনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি যে দিন ঐ তের আনা ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছেন, সেই দিন হইতে, আনি আর সে ছায়া-মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইতেছে না।

রেভারেণ্ড চার্লস্ ম্যাক্কে স্রুজ্‌বেরীর কাউ-ণ্টের ধর্ম্মগুরু ও সুহৃদ্। ছায়া-দর্শন-সংক্রান্ত এই বিচিত্র কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে, তিনি এবং স্রুজ্‌বেরীর কাউণ্ট-পত্নী (Countess of Shrewsbury) আর কাউণ্ট অব স্রুজ্‌বেরীর অন্যতম বন্ধু, Anatomy of Melancholy অর্থাৎ বিষাদ-বিশ্লেষ-তত্ত্বনামক গ্রন্থ-প্রণেতা বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টার বিশ্ব... মানবজগতের নিকট দায়ী। ডক্টার বিশ্ব... স্বকীয় গ্রন্থে, স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, এরূপ বিষয়ে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক ঘটনা আর তাঁহার জ্ঞানগোচর হয় নাই। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, আরও ত সহস্র লোক ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সংসার হইতে চলিয়া যায়। তাহারা ফিরিয়া আইসে না কেন? আইসে না প্রবৃত্তি, শক্তি ও সুযোগের অভাবে, অথবা সেখানেই মহা-জনের কৃপায় ক্ষমা পায় বলিয়া। ইহা ছাড়া আরও কত অজ্ঞাত কারণ থাকিতে পারে, কে তাহার তত্ত্ব-নির্দ্দেশ করিবে?

(২)

অপত্য-স্নেহ।

বিদেশে স্বামীর বিয়োগ ঘটিয়াছে। বিয়োগ-[illegible]রা বিধবার প্রাণে মুর্ম্মুর-দাহ, নয়নে অশ্রু-প্রবাহ। পাঁচ বৎসরের একটি মাত্র অবোধ বালিকা এখন তাঁহার সংসারের সম্বল। শিশু বালিকা কখনও ছাঁদিয়া গলা ধরিয়া মায়ের কোলে চাপিয়া বসিতেছে, কখনও মায়ের মলিন মুখপানে তাকাইয়া তাকাইয়া কচি হাতে মায়ের নয়ন জল পুছাইয়া দিতেছে, আর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"তুই এখন কেবলই কাঁদিস্ কেন মা?—আবার তেমনই করিয়া তুই হাসিবি কবে মা?" বালিকা যখন এইরূপ প্রশ্ন করে, তখনই বিধবার হাড় পাঁজর ভাঙ্গিয়া অশ্রুধারা বহিতে থাকে; কিন্তু তিনি শিশুর প্রাণের দিকে চাহিয়া কষ্টে আত্মসংবরণ করেন। বালিকা শুনিয়াছে, তাহার পিতা স্বর্গে গিয়াছেন। স্বর্গ কোথায়, স্বর্গে গমনের অর্থ কি, সে তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে ইহাও জানে না, অথবা বুঝে নাই যে, তাহার মা বিধবা হইয়াছেন, আর সে পিতৃহীনা হইয়াছে।

বিধবা, এক দিন, কোন আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। মেয়েটি তাঁহার সঙ্গে। আত্মীয়ার অনুরোধে তিনি তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। বালিকাটিকে বুকে করিয়া বিধবা ঘুমাইয়া রহিলেন। সহসা বালিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। বালিকা চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইল, শয্যার পার্শ্বে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বাপের আদর-সোহাগিনী মেয়ে অমনই 'বাবা' 'বাবা' বলিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল "বাবা, তুমি কখন আসিয়াছ, আমার জন্য স্বর্গ হইতে কি আনিয়াছ? আমি যে পুতুলের কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কৈ?" ইহার পরে বালিকা নিদ্রাগতা জননীকে জাগাইবার নিমিত্ত জোরে ধাক্কা দিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে বলিতে লাগিল,—"মা মা, উঠ উঠ, চাহিয়া দেখ বাবা আসিয়াছে।" কিন্তু বিধবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। খানিক পরে, বালিকা দেখিতে পাইল পিতা শয্যাপার্শ্ব হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া নিকটবর্ত্তী অন্য একটি কোঠার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালিকা কিছুক্ষণ ঐ দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

যথাসময়ে রাত্রি প্রভাত হইল। বিধবা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। বালিকাও উঠিল। বালিকা শয্যা হইতে উঠিয়াই, ত্রস্ত ব্যস্ত ভাবে মায়ের হাত ধরিয়া, পিতাকে রাত্রিকালে যে কোঠায় প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, সেই কোঠার দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।—কহিল,—"মা, বাবা আসিয়াছেন। তুই ঘুমাইয়া ছিলি, বাবা আসিয়া আমাদিগের শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আমি কত ডাকিলাম, কত চেঁচাইলাম, তবু মা তোর ঘুম ভাঙ্গিল না। বাবা তোর মুখের পানে, অনেক ক্ষণ, এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। আমি পুতুল চাহিলাম। কিছু বলিলেন না। শেষে তুই জাগিলি না দেখিয়া ঐ কোঠায় চলিয়া গেলেন। চল্ মা চল্, ঐ কোঠায় যাই। ঐখানে গেলেই বাবাকে দেখিতে পাইবি।"

বিধবা, বালিকার বর্ণনা শুনিয়া এবং

বলিয়াছিলেন, আমরা এ স্থলে তাহার কএক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—

"শ্রীমুরারি গুপ্তবেত্তা প্রভুর অন্তরীণ,
সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা সেই ভকতপ্রবীণ।
দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে,
এ কথার তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে।
কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন্ শক্তি,
ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি।"
"মুরারি কহয়ে শুন, শুন মহাশয়,
আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের হৃদয়।
যে কিছু কহি যে নিজ বুদ্ধি অনুমানে,
যুক্তিসিদ্ধ হয় যদি রাখহ মরমে।
শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে আর সঙ্কীর্ত্তনে,
হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্ত জনে।
নিজ দেহ, দেহ নহে, নির্গুণ আকার,
গুণে সে গুণের ভোগ আচার বিচার।
এতেকে ভকত-দেহ দেহ করি মানে,
স্বচ্ছন্দবিহার তহি সব আচরণে।"

* * *

"রসময় বিগ্রহ লাবণ্যময় দেহ,
সকল সম্পদ্ তনু নিরমল স্নেহ।
মায়ার কারণে আগে না হয় বেকত,
ভক্ত দেহে বিলাস করয়ে অবিরত।"

মুরারি গুপ্তের কথার সারার্থ এই যে, ভগবানের "রসময় বিগ্রহ" ও "লাবণ্যময়-দেহ" সগুণ হইয়াও নির্গুণ, এবং নিরাকার বস্তুর মত। তিনি যখন জগতে প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করেন, তখন ভাব-ভক্তিময় পবিত্র দেহেই এইরূপে তাঁহার প্রবেশ ও স্বচ্ছন্দ বিলাস হইয়া থাকে। যাঁহারা ভক্তির রস-পিপাসায় আকুল, ভক্তিলীলাময় ললিত তনুতে ভগবানের এইরূপ আবেশের কথা, তাঁহাদিগের নিকট অবশ্যই অমৃতের ন্যায় আনন্দপ্রদ।

জগন্নাথ মিশ্র, যজ্ঞোপবীতের কিছু দিন পরেই, গৌরাঙ্গকে নবদ্বীপ-নিবাসী গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। গঙ্গাদাস ব্যাকরণ শাস্ত্রে যার-পর-নাই বিচক্ষণ ছিলেন। বোধ হয় তৎকালীন বৈয়াকরণদিগের মধ্যে, বঙ্গে গঙ্গাদাসের গৌরব ও প্রাধান্য বিষয়ে কাহারও মনে কোন প্রকার সংশয় ছিল না। গঙ্গাদাসের প্রতি গৌরাঙ্গেরও একটুকু বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। গৌরাঙ্গ, আনন্দে ঢল-ঢল, এবং বাল-চাপল্যে চঞ্চল হইলেও, ঐ সময়েই অতি বড় তীক্ষ্ণ প্রতিভাশালী বালক বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রও গৌরাঙ্গের বুদ্ধিকে মনে মনে সম্মান করিতেন। তিনি পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, পণ্ডিতবর গঙ্গাদাসের হাতেই তাঁহাকে সঁপিয়া দিলেন; এবং পণ্ডিত গঙ্গাদাসও তাদৃশ তেজঃপুঞ্জ ছাত্র লাভ করিয়া আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিলেন। *

* "ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত,
গোষ্ঠী মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত।
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি,
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দপনি।
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ,
তাঁর ঠাঁই পড়িতে প্রভুর সমীহিত।
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর,
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-দ্বিজ-ঘর।
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা,
আলিঙ্গন করি এক আসনে বসিলা।
মিশ্র বলে পুত্র আমি দিব তোমা স্থানে,
পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে।
শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস,
পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ। (ভা)

লোচনদাসের লেখা অনুসারে গঙ্গাদাসের টোলে গৌরাঙ্গের প্রবেশ ইহার বহু দিন পরে,অর্থাৎ জগন্নাথের স্বর্গারোহণের পর।

* কলাপের আর এক নাম কাতন্ত্র অর্থাৎ অল্প কথার শাস্ত্র, তৃতীয় নাম কৌমার অর্থাৎ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ। যথা দুর্গবৃত্তির নমস্কার শ্লোকে,—

"দেবদেবং প্রণম্যাদৌ
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি
ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিক।"

পাঠকজ্ঞাত আছেন যে গৌরাঙ্গ তাঁহার প্রথম-বাল্যেই ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা কোন্ ব্যাকরণ? নবদ্বীপে ইদানীং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণেরই সমধিক প্রচলন। কিন্তু, গৌরাঙ্গের সময়ে, বঙ্গে মুগ্ধবোধের কোনরূপ মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গৌরাঙ্গ যে ব্যাকরণ পাঠ করিয়া বিদ্যা লাভ করেন, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য প্রণীত * সুপ্রসিদ্ধ কলাপ। পূর্ব্ববঙ্গে—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম,—সর্ব্বত্রই এই ব্যাকরণ প্রচলিত; এবং যাঁহারা দুর্গসিংহকৃত বৃত্তি ও টীকা, ত্রিলোচনের পঞ্জী এবং শ্রীপতিদত্তের পরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত এই ব্যাকরণ আদ্যোপান্ত শিক্ষা করেন, তাঁহারা অদ্যাপি বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রধান শাব্দিক বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘরের বালকেরা, এ দেশে এখনও, পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময়েই কলাপের সূত্রবৃত্তি কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করে। জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাস যখন শ্রীহট্ট, তখন তাঁহার ঘরে কলাপ ব্যাকরণেরই আধিপত্য থাকা সম্ভব। অপিচ, কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ কলাপ ব্যাকরণে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন।† সুতরাং, বঙ্গীয় গ্রন্থপত্রের মধ্যে বিচার-বিতর্কের বিলাসক্ষেত্র স্বরূপ কলাপ ব্যাকরণই যে সর্ব্বপ্রথম গৌরাঙ্গের হাতে উঠিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

গৌরাঙ্গ, তাঁহার পিতা কিংবা ভ্রাতার নিকট রীতিমত পাঠ গ্রহণ করিয়া, ইতঃপূর্ব্বেই ব্যাকরণে এক প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এইক্ষণ,ব্যবসায়ি-বৈয়াকরণ বিশ্রুতনামা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে, বহুসংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রমোদ-উল্লাসে অধ্যয়নের অবকাশ পাইয়া, তিনি শাস্ত্রচিন্তায় প্রকৃতই এক প্রকার ডুবিয়া গেলেন। তিনি প্রাতে ও অপরাহ্নে গঙ্গাদাসের টোলে বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন; এবং মধ্যাহ্নে যখন বাড়ীতে থাকিতেন, তখনও, আহারের পর-

† "ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াও কলাপ,
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের প্রতাপ।"
(চৈতন্য চরিতামৃত)

ক্ষণ হইতেই নিভৃতে বসিয়া, ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি কিংবা টীকার উপর স্বরচিত টিপ্পনী লিখিতেন।

এ দেশে, ইদানীং ব্যাকরণের অধ্যয়ন এক প্রকার রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ আর, রোহিতের ন্যায় অগাধ-জল-সঞ্চারী গভীরসত্ত্ব বৈয়াকরণ প্রায়শঃ লোকের দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা আছেন,তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই গণ্ডূষ-জল-বিহারী শফরের ন্যায়, সুখ-শ্রুত শব্দের ভিখারী। আগে ব্যাকরণ বলিলে, বাদার্থের সমস্ত গ্রন্থ এবং সাহিত্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি বহু শাস্ত্রই তাহার অন্তর্গত বলিয়া লোকের মনে উঠিত। এখন ব্যাকরণের নাম হ-য-ব-র-ল। আগে যাঁহারা দশ পোনর বৎসরের প্রগাঢ় অধ্যয়নে, ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রবীণতা লাভ করিতেন, তাঁহারা স্মৃতি কিংবা ন্যায়ের বিচারেও, মধ্যস্থের আসন পাইয়া সম্মানিত * হইতেন। এখন যাঁহারা সাড়ে তিন দিনেই সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্র উদরস্থ করিয়া ফেলেন, তাঁহারা, ন্যায়াদিশাস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, নীতিশাস্ত্রের নিত্যব্যবহার্য্য কথা লইয়াও বিপন্ন হইয়া পড়েন। পুরাতন বঙ্গের সে বিদ্যাগৌরব এখন স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হয়। কিন্তু আজিকার এই রঙ্গ-রস-চঞ্চলা বঙ্গভূমিই যে, এক সময়ে ব্যাকরণ-বাদার্থ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের গুরুস্থান বলিয়া ভারতে বিখ্যাত হইয়াছিল, তাহা মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা পুণ্যপ্রদ ও মঙ্গলজনক।

পুঁতিপত্রে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয় যে, গৌরাঙ্গও এক মাত্র ব্যাকরণ শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই, সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম-গ্রহণে অধিকারী হইয়াছিলেন; এবং সেই সময়ে, সমগ্র বঙ্গে, ব্যাকরণের সর্ব্বপ্রধান পদ-লাভের প্রত্যাশায়, পরিশ্রমের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পরিশ্রমের উপর তাঁহার সূক্ষ্মার্থদর্শিনী স্বাভাবিক প্রতিভা। অগ্নি আপনিই জ্বলিয়া উঠিতেছিল, অধ্যয়নের ঘৃতাহুতি তাহাকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিল।

কবি কর্ণপূর লিখিয়াছেন যে, গঙ্গাদাসের টোলে বহুসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন; এবং গঙ্গাদাস, পুরাতন প্রথানুসারে, বিদেশের সমস্ত ছাত্রকেই, বিদ্যাদানের সঙ্গে অন্ন দান করিয়া আপনার কাছে রাখিতেন। গঙ্গাদাসের যে সকল ছাত্র গৌরাঙ্গের সহাধ্যায়ী, চৈতন্য ভাগবতে তাহাদিগের মধ্যে তিন জনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

"শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত নাম,
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান।"

শ্রীহট্টীয় মুরারি গুপ্ত, পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত। এই অধ্যায়েও ইঁহার কথা কহিয়াছি। ইনিই কালে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান পুরুষ হইয়াছিলেন

* পূর্ব্ববঙ্গের পীতাম্বর, কৃষ্ণানন্দ ও ত্রিলোচন এবং পশ্চিমবঙ্গের তারানাথ এই শ্রেণীর বৈয়াকরণ ছিলেন। পূর্ব্বস্থলীর মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথও ইদানীং বঙ্গে ব্যাকরণ শাস্ত্রের মীমাংসাস্থল বলিয়া বহু সম্মানিত। তাঁহার বৃহন্মুগ্ধবোধ বাঙ্গালির কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ।

বঙ্গীয় সংস্কৃত-সাহিত্যে কমলাকান্তের নাম-মুদ্রা দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণানন্দের নাম আছে। কৃষ্ণানন্দ কালে আগমবাগীশ বলিয়া বঙ্গে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; এবং লোকে এইরূপ বলে যে, তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করিয়া সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই তখন বয়স্থযুবা। মুরারি গুপ্তের বয়স সম্ভবতঃ ত্রিশ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোলে এখনও কুত্রচিৎ ত্রিশ কিংবা পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রৌঢ় ছাত্র পরিলোকিত হইয়া থাকেন। মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি সকলেই গৌরাঙ্গের প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া প্রীত ও প্রথম বয়সের স্বভাববশতঃ কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। যথা বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতে—

"সবারে চালেন প্রভু ফাকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশু জ্ঞানে কেহ কিছু না বলে হাসিয়া।"

এইরূপ ফাকি জিজ্ঞাসা বঙ্গদেশের সকল প্রদেশেই অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এক জনে প্রশ্ন করেন, আর এক জনে তাহার উত্তর দেন; এবং প্রশ্নকর্ত্তা সেই উত্তরের উপর দোষারোপ করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাভব করিতে যত্ন পান। ইহারই নাম ফক্কিকা কিংবা ফাকি জিজ্ঞাসা। সামান্য একটি ফাকি জিজ্ঞাসা উপলক্ষে মুহূর্ত্তের মধ্যে নানা শাস্ত্রের নানা কথা আলোচিত হয়; এবং যাঁহারা প্রশ্ন স্থাপন কিংবা প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে যাইয়া বাদ-প্রতিবাদে পক্ষভুক্ত রহেন, তাঁহাদিগের বিদ্যা ও শিক্ষার অতি কঠোর পরীক্ষা হইয়া যায়। গৌরাঙ্গ এই ফাকি জিজ্ঞাসা অথবা বিদ্যা-ব্যায়ামে অচিরেই একজন অতি নিপুণ মল্ল বলিয়া, নবদ্বীপে পরিচিত হইলেন; এবং কিবা টোলে, কিবা টোলের বাহিরে,—বিশেষতঃ গঙ্গার তটে, যাহাকে তাহাকে উল্লিখিতরূপ ফাকি অর্থাৎ শাস্ত্রের অশেষবিধ কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন।

তখন নবদ্বীপের গলিতে গলিতে টোল, প্রতি টোলেই অসংখ্য ছাত্র, এবং গঙ্গার তটে, স্নান ও সায়ন্তন-সন্ধ্যাবন্দনাদির সময়, ঘাটে ঘাটেই ছাত্রের হাট। ছাত্রেরা যখন, মধ্যাহ্ন বেলায়, তৈলাক্তদেহে, হাতে গাড়ু ও কাঁধে গামছা লইয়া, পিপীলিকার মত সারি বান্ধিয়া, গঙ্গার অভিমুখে চলিতে থাকিত, তখন নবদ্বীপে প্রকৃতই আনন্দের একটা হুলুস্থুলু হৈ চৈ শব্দ উঠিত; এবং বঙ্গভূমির রাজনৈতিক জীবন গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন পাইয়া থাকিলেও, বঙ্গের সেই এক প্রকার শিক্ষা-সম্পদময় * সামাজিক জীবন লোকের হৃদয়ে একটা সজীব শক্তির ন্যায় অনুভূত হইত।

এ বর্ণনা আপাততঃ একটুকু অতিরিক্ত বোধ হইতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহাতে অতিরেকের গন্ধমাত্রও নাই। কারণ, তখন দেশে স্কুল নাই, কলেজ নাই,—স্থানে স্থানে ফারসী শিক্ষার মখ্‌তব্ ভিন্ন আর কোন প্রকার বিদ্যালয় নাই। সুতরাং তখনকার উচ্চশিক্ষা ও মনুষ্যত্ব-পরীক্ষার একমাত্র স্থল টোল, এবং যে খানে বহু টোল, সেখানেই,অল্প

* সম্পদ্ ও বিপদ্ প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ হলন্ত ও অকারান্ত উভয়রূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

স্থানে অসংখ্য ছাত্রের একত্র অবস্থান হেতু, অনবরত হুটরোল। নবদ্বীপবাসী ছাত্রনিবহের কলকল শব্দে শুধু নবদ্বীপ নহে, নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহও নিপীড়িত রহিত; এবং ছাত্রেরা যখন টোলের বন্ধন হইতে বাহির হইয়া বিচারযুদ্ধে ব্যাপৃত হইত, তখন শাস্ত্র-সম্পর্ক-শূন্য নিরীহ নর-নারীরা প্রকৃতই একটা উৎপাত মনে করিয়া ভয়ে একপাশে সরিয়া পড়িত। গৌরাঙ্গ সহাধ্যায়ী ছাত্র-বৃন্দের সেনাপতি সাজিয়া গঙ্গার ঘাটে যাইতেন, এবং সেখানে এক এক দিন এক এক টোলের ছাত্রমণ্ডলীর সহিত বিচার-সংগ্রামে মত্ত হইয়া আনন্দে ভাসিতেন। বৃন্দাবন দাস, গৌরাঙ্গের এইরূপ বিচার-মল্লতার অতি সুন্দর চিত্র দিয়াছেন। আমরা তাঁহার কএকটি পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিব। জাতীয়শিক্ষার অতীত চিত্র—নানা কারণেই মনুষ্যের আলোচ্য বস্তু।

এই মতে প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া,
গঙ্গাস্নানে যান প্রভু বয়স্য লইয়া।
পড়ুয়ার অন্ত নাই নবদ্বীপ-পুরে,
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গা স্নান করে।
এক অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যান্যে কলহ করয়ে অনুক্ষণ।
প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব-চঞ্চল,
পড়ুয়া গণের সহ করেন কোন্দল।
কেহ বলে তোর গুরু কিবা বুদ্ধি তার,
কেহ বলে এই দেখ্ আমি শিষ্য যার।
এই মতে অল্পে অল্পে হয় গালাগালি,
পরে জল-ফেলা-ফেলি পরে দেয় বালি।
তবে হয় মারা মারি যেবা যারে পারে,
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে।
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কারে ধরে,
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ও পারে। (ভা)

যাহারা, বিচারঘটিত বিড়ম্বনার ভয়ে, গঙ্গার পরপারে পলাইয়া যাইত, তাহারাও গৌরাঙ্গের কাছে অব্যাহতি পাইত না। কারণ, তাঁহার পারাপার প্রভেদ ছিল না। তিনি বিচারের পিপাসায় যেমন নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে বেড়াইতেন; তেমনই আবার কোন কোন দিন সন্তরণের দ্বারা গঙ্গার পূর্ব্ব পারে যাইয়া, বিদ্যানগর ও কুলিয়ার ছাত্রগণের সহিত বিবাদ বাঁধাইতেন। কিন্তু তাঁহার এই বিচার-বিবাদে আমোদ ও উৎসাহ ভিন্ন কখনও কোনরূপ বিকার কিংবা বিদ্বেষ লক্ষিত হইতনা। তিনি সকল সময়েই হাসি মুখে, যেন শুধুই শাস্ত্রালোচনার বিমল-সুখে, আত্মবিস্মৃত রহিতেন; এবং যাহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহাদিগের চিত্তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সকলকেই কোন প্রকার প্রিয় ব্যবহারে কিংবা প্রেমালিঙ্গনে সুখী করিতে যত্ন পাইতেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরাও, এই হেতু, বিচারের বিরোধমত্ততা বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার প্রিয়ব্যবহারে পরিতৃপ্ত থাকিত, এবং অনেকে পরাস্ত হইয়াও তাঁহার প্রতি প্রীতি দেখাইত।

"যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ,
সন্তোষে সবাকে করিতেন আলিঙ্গন।
পড়ুয়া সকলে বলে আজি ঘরে যাও,
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও।

গৌরাঙ্গের এইরূপ বিচারনৈপুণ্য দেখিয়া, অধ্যাপক গঙ্গাদাস আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। বিদ্যাদানে ইহাই গুরুর বিশেষ গৌরব।

"দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত,
সর্ব্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত।"(ভা)

গুরুর যদি এত সুখ, তাহা হইলে পুত্রের পাণ্ডিত্য দর্শনে ও প্রতিপত্তির কথা শ্রবণে গুণানুরক্ত ও পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠাযুক্ত পিতার হৃদয়ে যে কত আনন্দ, কত আশা, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

ব্রহ্ম দেশের কাহিনী।

হতভাগ্য থিবুর অধঃপতন হইতে একটি বিস্তীর্ণ মহাপ্রদেশ ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। এই প্রদেশের নাম ব্রহ্মদেশ। ইহার উত্তরে তিব্বৎ; পূর্ব্বে চীন, শ্যাম ও সানষ্টেট; পশ্চিমে বঙ্গ-অথাত ও ভারতবর্ষ। পূর্ব্বে আসাম, মণিপুর ও পার্ব্বত্য-ত্রিপুরা ব্রহ্মরাজের শাসনাধীন ছিল। ইংরেজ অভ্যুদয়ের পর, এই তিনটি রাজ্য ব্রহ্মদেশ হইতে স্খলিত হইয়া বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেই সময়ে চট্টগ্রাম একবার মোগলবাদশাহের করতলস্থ, আর একবার তেনাসরিমের বৌদ্ধ ভূপতির হস্তে নিপতিত হয়। উপর্য্যুপরি যবন ও মঘ নৃপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং রাজ-নৈতিক বিপ্লবে পড়িয়া রক্ষকবিহীন চট্টগ্রাম একেবারে বিধ্বস্ত হইবার পথে গিয়াছিল; কিন্তু ইংরেজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতে উহা পুনঃ ইংরেজ সুশাসনে আসিয়াছে।

সমস্তদেশকে শাসকের দৃষ্টি পথে রাখিবার মানসে পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।—উত্তরে আরাকাণ, মধ্যে পিগু এবং দক্ষিণে রাজপাট তেনাসরিম। লর্ড ডফারিণের ব্রহ্ম-অভিযানের অব্যবহিত পর হইতে ইহার বিভাগ হইয়াছে,—উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম। মধ্য ভাগ এই দুইয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

স্থানের আয়তন ২৮০০০০বর্গ মাইল
লোক-সংখ্যা ন্যূনাধিক ৮০০০০০০।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।—ব্রহ্মদেশ সাধারণতঃ একটি পর্ব্বতময় প্রদেশ। ইহাতে সমতলভূমি অতিবিরল। কিন্তু ইহার গিরিকন্দর-সমাচ্ছন্ন স্বভাব-চিত্রটি দৃষ্টি-সুখ-প্রদ ও মনোহর। সমতল ভূভাগটি পর্ব্বতের মূল দেশ হইতে ক্রমে ঢালু হইয়া সুদূরবর্ত্তী ইরাবতীর কোল-দেশে যাইয়া নামিয়া পড়িয়াছে। ভারতের অনেক স্থান সাধারণতঃ যেরূপ অনুর্ব্বর ঊষরক্ষেত্র ব্রহ্মদেশের কোন অংশ সেইরূপ নহে। পর্জ্জন্য দেবের কৃপা দৃষ্টিতে ইহা সর্ব্বদা 'সজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা।' এই নিমিত্ত ক্ষেত্র-সমূহে দিন দিনই প্রকৃতির নবীন সৌন্দর্য্য, নবীন পরিচ্ছদ ও নবীন শোভা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

একটি চির-নীলিম অত্যুচ্চ পর্ব্বত-মালা উদ্বেলিত সাগর-তরঙ্গের ন্যায় উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই গিরি-পদ প্রক্ষালিত করিয়া সেই পবিত্রসলিলা ইরাবতী, পার্শ্ববাহিনী সীতা-গঙ্গা, ও সন্-উইন নদী, শ্রান্ত পথিকের ন্যায়, ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সর্ব্বত্র সমান-উচ্চ যোমা (Yoma) শৈল-প্রাচীর পিণ্ড হইতে আরাকাণ প্রদেশকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; এবং সুদূরবর্ত্তী দক্ষিণ প্রান্ত ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া প্রস্তরময় "নিগ্রীশ" অন্তরীপে শেষ হইয়াছে। এই স্থানকে বিধৌত করিয়া অনেকগুলি গিরি-নির্ঝরিণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর আকারে সমুদ্র-গর্ভে নিপতিত হইয়াছে।

দ্বীপ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুইটি মাত্র বৃহৎ দ্বীপ,—রামব্রী ও চেতুরাং উত্তর প্রান্তে মনুষ্যবাসের উপযোগী হইয়াছে। দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জ আয়তনে নিতান্ত ক্ষুদ্র। এই দ্বীপাবলিতে লবণ প্রস্তুত হয়। এবং মৎস্যজীবী ধীবরেরা নিদাঘের উত্তপ্ত বালুকাতে মৎস্যাদি বিশুষ্ক করে। শুষ্ক মৎস্যের বাণিজ্য ব্রহ্মবাসীর একচেটিয়া ব্যবসায়।

নদ নদীর মধ্যে পুণ্য-তোয়া ইরাবতীই সর্ব্বপ্রধান। ইহার জল পবিত্র ও সুখ-স্পর্শ। এই নিমিত্ত বহু সহস্র যাত্রী বৎসর বৎসর এই স্থানে সমবেত হইয়া থাকে। ইরাবতীর দশটি মুখ। সমস্তই উত্তর গিরির পাদমূল প্রক্ষালিত করিয়া ১১০০ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দশ-মুখে প্রতি বর্ষায় রাশীকৃত পলল প্রক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া সমুদ্রের এই অংশটি ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এবং উহাতে চড়া পড়িতেছে। সমগ্র ব্রহ্মদেশের মধ্যে এই নদী-উপকূল স্থান-মাত্র সমতল ও বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত স্থান বন্ধুর ও অত্যল্পপরিসর। লক্ষ্মীর চির-নিলয় অসংখ্য বাণিজ্যপোতে ইরাবতীর বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা সুশোভিত। কিন্তু বৃহদাকারের জলযানগুলি নদী-মুখ হইতে ৭৮০ মাইল অর্থাৎ ভামো পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তদূর্দ্ধ প্রদেশ জলাভাব হেতু অগম্য। সীতা-গঙ্গার গতি কেবল ৩৫০ মাইল মার্টাবান পর্য্যন্ত। সন্-উইন নদী আয়তনে ক্ষুদ্র ও স্বল্পতোয়া। ইহার গতি এখন পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ইহার বক্ষদেশ দুর্গম কঠিন প্রস্তর রাশিতে পরিপূর্ণ; সুতরাং নৌ-চালনের অনুপযুক্ত।

স্বাস্থ্য-নিদান জল বায়ু, ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র সমান নহে। পর্ব্বত সন্নিহিত স্থানে জলনির্গমের বিশেষ সুবিধা না থাকাতে, বর্ষার জল জমিয়া যায় ও ভূমি আর্দ্র হইয়া পড়ে এবং তাহাতে নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তি স্থান গুলিতে গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই দুই ঋতুই অনুভূত হয়, অন্যান্য ঋতু গুলি অননুভব্য। এ স্থানে বর্ষার প্রাবল্য অধিক। বৎসরে ১২৭ ইঞ্চি পর্য্যন্ত জল হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর ব্রহ্মে সেইরূপ বর্ষণ হয় না। এই স্থানে তিনটি প্রধান ঋতু,—শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা সমভাবে ক্রীড়া করে। নাই কেবল শরৎ ও বসন্ত। সুতরাং এই স্থানে

শরদ চন্দ্রমার ফুল্ল জ্যোৎস্নাও দেখা যায় না এবং বিরহিণীদিগের প্রাণ-উন্মাদন কোকিল স্বনও শ্রুতিগোচর হয় না; আবার কোন অন্ধ ব্রহ্ম-রমণী বিরলে বসিয়া প্রবাসীর চিন্তিত রূপও চিন্তা করে না। তাহাদের শৈশব কালের শিক্ষা,—"কেন্দ্র স্থান হইতে অপসর হও, লক্ষ্য স্থানে অবশ্য উপনীত হইবে।"

ধাতু ও খনিজ পদার্থ।—ধাতু ও খনিজ দ্রব্যের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশ চির-প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত মর্ম্মর প্রস্তরের খনি, মান্দালা নগরীর ১৫ মাইল উত্তরে এখন পর্য্যন্ত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ব্রহ্মবাসীরা এই প্রস্তর দিয়া তাহাদের উপাস্য দেবতা,—মহামুনি মন্দির, বুদ্ধদেব প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া 'কেয়ান্দ' গৃহে (ধর্ম্ম মন্দিরে) রক্ষা করে। ইরাবতীর উপকণ্ঠে অনেক গুলি 'মেটে' তৈলের কূপ আছে। এক একটি কূপের গভীরতা ২০০ হইতে ৩০০ ফিট্ পর্য্যন্ত। এই সমস্ত কূপ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্রধারে তৈল উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে প্রতি বৎসর ১২০০০ টন তৈল ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়। মান্দালা নগরের ৬০।৭০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে শতাধিক বর্গ মাইল ব্যাপী মণি মাণিক্যের খনি। নীলকান্ত ও পদ্মরাগ মণির নূতন পরিচয় আর দিতে হইবে। এই অনন্যসুলভ রত্নরাজি এই স্থানে প্রচুরপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চীন দেশের অতিপ্রিয় কর্ণভূষণ, এই দেশজাত 'জাদী' প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত মহার্হ রত্ন সমূহ একমাত্র রাজার সম্পত্তি ছিল। ব্রহ্ম-ভূপতির কঠোর আদেশে কোন বৈদেশিক বণিক্ এই প্রস্তর খনির সান্নিধ্যে যাইতে পারিত না। খনি-প্রসূত সমস্ত বস্তুই রাজ-ভাণ্ডারের শোভা সংবর্দ্ধন করিত। ইহা দ্বারা রাজার বাৎসরিক আয় হইত দেড় লক্ষ টাকা। ফেরোজা রঙের পদ্মরাগ মণিও এই স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা অপ্রচুর।

উদ্ভিজ্জ।—ব্রহ্মদেশে গোধুমের চাষ নাই। তণ্ডুলই এই স্থানের প্রধান খাদ্য। এই নিমিত্ত এস্থানে ধান্যের চাষ অপর্য্যাপ্ত। ব্রহ্মবাসীরা বলিয়া থাকে, এই স্থানে ১০২ রকম ধানের চাষ আছে। সমতল ভূমিখণ্ড একটি বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। বায়ু-হিল্লোলে যখন ধান্যের উন্নত শীর্ষগুলি দুলিতে থাকে, তখন সাগর-তরঙ্গবৎ প্রতীয়মান হয়। বহির্বাণিজ্যের আধিক্য হেতু এই স্থান হইতে প্রতিবৎসর ৬ ক্রোড় টাকার চাউল রপ্তানী হইয়া থাকে। দক্ষিণ ব্রহ্মের এত উন্নতি এই ব্যবসায় হইতেই হইতেছে। ইহার অন্যতর উন্নতির কারণ কাষ্ঠের ব্যবসায়। বনস্থলী দিগন্তব্যাপী ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। গগনস্পর্শী সেগুন বৃক্ষ গুলি যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া আকাশের সীমা নিরূপণ করিতেছে। কাষ্ঠফলক গুলি এইস্থানে অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুরোধে পর্ব্বতমূল হইতে এই সমস্ত কাষ্ঠখণ্ডকে হস্তী দ্বারা টানিয়া আনিয়া নদী-স্রোতে নিক্ষেপ করা হয় এবং তথা হইতে বর্ষারম্ভে অভিলষিত স্থানে লইয়া যাওয়া যায়।

ব্রহ্মবাসী আবালবৃদ্ধ সকলেই সখ করিয়া চুরটের ধূম পান করে। রমণী মহলেও ইহার প্রচুর ব্যবহার। কিন্তু পুরুষগুলি এত দূর চুরটখোর যে, স্থান নাই, সময় নাই, সর্ব্বস্থলে সর্ব্বক্ষণ চুরট একটি তাহাদের ওষ্ঠাধরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম দেশে তামাকের চাষ এত অধিক। কিন্তু তাহাতেও সঙ্কুলন হয় না;—প্রতিবৎসর ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে তামাক আমদানি করিয়া লইতে হয়। এস্থানের আর একটি প্রধান খাদ্য কদলী। কিন্তু আম, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি ফলও দুষ্প্রাপ্য নহে।

যিনি ধনীর বিলাস-বিলসিত সুরম্য হর্ম্ম্য-তলে একবার মাত্র প্রবাসী হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মবাসীর মঞ্চ-গৃহে অবস্থিতি করিতে ভাল বাসিবেন কি? কপটতা ও অহঙ্কার ছাড়িয়া যদি একবার তুলনায় সমালোচনা করা যায়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, এই বংশ-মঞ্চ-গুলিও দেখিবার বস্তু। বাস্তবিক এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য, এরূপ নির্ম্মাণ-কৌশল, এবং এরূপ রঙফলান গৃহ দেখিলে কাহার না চক্ষে প্রীতি জন্মে? প্রকৃতির বিলাস-ক্ষেত্র ব্রহ্ম-দেশের বনে ও নদীসৈকতে নানা জাতীয় বংশের উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত, বংশই গৃহ-নির্ম্মাণের প্রধান উপকরণ।

পশু পক্ষী।—স্বভাবের নিভৃত নিকেতনে যে সমস্ত জীব জন্তু সুখে বিচরণ করে, কে তাহাদের অনুসন্ধান লয়? ব্রহ্মদেশের গভীর বন-কান্তার বিবিধ জন্তুর আশ্রয়স্থান। ব্রহ্ম-দেশ হইতে বৎসর বৎসর বন্য ও পালিত নানাপ্রকারের পশু পক্ষী সংগৃহীত হইয়া থাকে। বনাবৃত গিরিগুহা ব্যাঘ্র ভল্লুকের আসভূমি। দূরবর্ত্তি কানন মধ্যে এক ও দ্বিশৃঙ্গ গণ্ডার গুলি বাস করে। নিবিড় অর-ণ্যানীতে বহুবিধ কৃষ্ণ হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। থিবুর মণিমুক্তা-খচিত দ্বিরদ-রদ রত্ন-সিংহাসন এই ব্রহ্মহস্তীদন্তে নির্ম্মিত ছিল। বন্য ও পালিত পশু দিগের মধ্যে গো, শূকর, মহিষ ও কুক্কুর প্রভৃতি জন্তু গুলি ব্রহ্মবাসী-দিগের অনেক কাজে নিয়োজিত হয়। ব্রহ্ম-ঘোটকের এত আদর, তাহা সান-পর্ব্বত হইতে আনীত হয়। কুক্কুট, মরাল, রাজহংস প্রভৃতি গৃহ-পালিত পক্ষী গুলি যেন ব্রহ্মবাসী-দিগের রসনা পরিতৃপ্তির নিমিত্তই সৃষ্ট হই-য়াছে। নদ নদী ঝিল বিল মৎস্যাদিতে পরি-পূর্ণ। তাম্রচূড়ের যুদ্ধ দর্শন এস্থানের এক প্রধান আমোদ।

লোকচিত্র।—ব্রহ্মদেশে অনেক জাতির বাস। আদি শব্দ "ম্রাণমা" হইতে ব্র... শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অপভ্রংশে ইহা বামা বলিত, বামা হইতে ব্রহ্মা নাম হইয়াছে। এই ব্রহ্মা জাতি, তৈলিঙ্গ, কেরেণ, সান, চী... প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত। এস্থলে পাঁচটি মাত্র প্রধান জাতির উল্লেখ করিব।

(১) ব্রহ্মজাতি,—অমিশ্র ব্রহ্মারা খ... ও খর্ব্বকায়; বর্ণ তাম্রাভ, নাসিকার মধ্য... কিঞ্চিৎ চাপা, মুখে বিরল শ্মশ্রু। সু... মস্তকে সুদীর্ঘ কর্কশ কেশরাশি। মান... চীনের সংস্পর্শে এ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা শ্রমশীল এবং সূত্রধর ও কর্ম্মকার ব্যবসায়ে সুনিপুণ। ইহাদের বিশেষ আসক্তি ...টবল খেলাতে, মল্লযুদ্ধে, নৌচালনে, ক্ষিপ্র ...ক্ষেপণী ক্ষেপণে এবং নানাবিধ কায়িক কষ্ট-সাধ্য ক্রীড়াতে।

(২) তৈলিঙ্গ জাতি।—দক্ষিণ ব্রহ্মের আদি জাতি মুন্‌স্ (Muns) হইতে এই জা-তির উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহু বৎসর পূর্ব্বে বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুরোধে, অনেকগুলি ভারতবাসী উৎকলের দক্ষিণ প্রদেশ,—তৈলিঙ্গ হইতে ব্রহ্ম দেশে সমাগত হইয়াছিল। তাহারা 'মুন' রমণীর কমনীয় কান্তি ও বিলম্বিত বেণীর শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে। এবং তৎকালের স্বর্ণভূমি নামে অভিহিত, ইরাবতী, সীতাগঙ্গা ও সন্‌উইন নদীর মোহনার নিকটবর্ত্তি স্থানে পণ্য-বী-থিকা নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক সুখে বসবাস করিতে থাকে। ব্রহ্ম দেশের উপনিবাসী হইলেও এখন পর্য্যন্ত ইহারা জাতীয় নাম, তৈলিঙ্গ বলিয়াই পরিচিত। দুই বিভিন্ন দেশের সংমিশ্রণে ইহাদের গঠন-প্রণালী সুন্দর হইয়াছে। উন্নত নাসিকা এবং মুখ সম্পন্ন ও লাবণ্যময়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ব্রহ্মের অমিশ্র তৈলিঙ্গ ১৫৫০০০ এবং ...তি শঙ্কর তৈলিঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ...০০০। ইহাদের অধিকাংশই তেনাস-সেরিম প্রদেশবাসী।

(৩) কেরেণ জাতি।—এই জাতির সংখ্যা ...ণ ব্রহ্মে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে অর্দ্ধ লক্ষেরও অধিক ছিল। প্রবাদ ১৩০০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে মধ্য এশিয়া হইতে অনেক লোক, উত্তপ্ত বালুকাময় গোবী-মরুভূমি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মে সমাগত হইয়াছিল। পরে তাহারা স্থানীয় লোকের সাহায্যে বিবা-হাদি করিয়া এস্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। তাহারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথমতঃ পোঃ (Pwo) অর্থাৎ মাতৃশাখা, দ্বিতীয় এস্‌গাউ অর্থাৎ পিতৃশাখা, বহু বিস্তৃত তৃতীয় শাখার নাম ভাগাই। ইহাদের অনেকগুলি উপশাখা আছে। তন্মধ্যে এক-টির নাম লৌহিতকেরেণ।

৪। সান জাতি।—সানদেশ হইতে সমাগত বলিয়া ইহাদের নাম হইয়াছে সান। ইহাদের বসতি স্থান পূর্ব্বব্রহ্ম। লোকে অনু-মান করে, ইহারা আসাম প্রদেশের আদিম নিবাসী ছিল। এই নিমিত্ত আসামের আহাম জাতির সঙ্গে ইহাদের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহারা কৃষিজীবী এবং অতি কর্ম্মঠ লোক। ব্যবসায় বাণিজ্যেও ইহারা সুচতুর। নানা-বিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া ইহারা বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে এই স্থানে ইহাদের জন-সংখ্যা ৬০ সহস্র মাত্র ছিল।

৫। চীনজাতি।—বোমা পর্ব্বতমালায় অনেকগুলি অসভ্য জাতি বাস করে। ইহারা চীন, কাকিয়ান, এবং সিঙ্গফোসে নামে অভিহিত। পূর্ব্ববঙ্গের পর্ব্বত সন্নিহিত স্থানে, যেরূপ লুসাই ও কুকি প্রভৃতি পাহাড়ী লো-কের উৎপাত ছিল, ইহারাও সেইরূপ সম-তল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া নিরীহ অধিবাসী-

দিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিত। ইহারা সমস্ত উত্তর ব্রহ্মের অধিবাসী। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ লৌহবর্ম্মে আবৃত; এবং দেখিতে ভয়ানক। জাতীয় চিহ্ন,—কুমারী ও বালিকা দিগের ভ্রূযুগল হইতে সমস্ত মুখমণ্ডল বিশ্রী উল্‌কী দ্বারা কলঙ্কিত করা। এখন ইহারা ক্রমে সভ্য হইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং অতি সত্বরতার সহিত ব্রহ্মাদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে।

ব্রহ্মবাসীদিগের দৈনিক-জীবন।

আদি ব্রহ্মাদিগের ন্যায় সকল অবস্থায় সুখী ও নিরীহ জাতি, বোধ হয়, আর ছিল না। পূর্ব্বে তাহারা অদম্য ধন-পিপাসাকে অতি যত্নের সহিত দমন করিবার চেষ্টা করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, সম্পত্তি বৃদ্ধির চেষ্টাই দুর্ভাগ্যের চিহ্ন, এবং ঐহিক সম্পদের শ্রীবৃদ্ধিই সমস্ত অনর্থের মূল হেতু। সেই সময়ে, সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি কাহারও সম্পদ্ বৃদ্ধি ঘটিত, তাহা বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহে ব্যয় না করিয়া পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরের উন্নতি কল্পে, নিরন্নকে ভোজ্য প্রদানে, এবং সাধারণ হিতকর কার্য্যে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইত। তখন তাহাদের ধারণা ছিল, বাসনা উদ্বেলিত চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত করিয়া ধর্ম্মভাবে বলীয়ান্ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এখনও অনেক ধর্ম্ম-ভীরু ব্যক্তি, অর্থ-চিন্তা ও ধনবৃদ্ধির চেষ্টাকে সময়ের অপব্যবহার মনে করে। কিন্তু তাহাদের সেই দেব-ভাব ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয়ে সয়তানের মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে তাহাদের কার্য্য যেরূপ আড়ম্বরশূন্য ও সরলতাপূর্ণ ছিল, এখন আর সেরূপ নহে। উহাতে নানা প্রকার ছল চাতুরি প্রবেশ করিয়াছে। তখন সংসারের কোন দুঃখ কষ্টই তাহাদিগকে হতাশ ও ভগ্নোদ্যম করিতে পারিত না। কি ভোজনে কি গমনে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, সর্ব্বত্রই তাহারা প্রীতি-প্রফুল্ল ছিল। যদি নিম্নের ঘটনাটির প্রতি একবার লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে একথা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। মহানগরী মান্দালার এক ক্ষুদ্র পল্লিতে একবার ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল। অধিবাসিগণ এই দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া একেবারে নিঃসম্বল হইয়া যায়। পরিধেয় বস্ত্রখানি ভিন্ন আর সমস্তই হুতাশনের কুক্ষিগত হয়। তাহাদের এইরূপ দারুণ দুঃখ কষ্টের সংবাদ শুনিয়া দূর স্থানীয় কোন সদাশয় ব্যক্তি গৃহনির্ম্মাণ তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য দান করি চাহিলেন। তাহারা তাঁহার সেই দান অম্লানবদনে উপেক্ষা করিলই, অপিচ তিনি দে খিতে পাইলেন, পূর্ব্বের ন্যায় এখনও তাহা সেইরূপ হাসি খুসী মুখ। আবার সেই ভিটাতে তাহারা নৈশ অন্ধকারে কেরো নের মশাল জ্বালিয়া সময়োচিত এক নাট্যশালা সজ্জিত করিয়াছে, এবং সম বন্ধু বান্ধব লইয়া এক খানা হাস্য-রসা প্রহসনের অভিনয় করিতেছে। পূর্ব্ব ন্যায় পুত্র কলত্র, সকলেই এই আনন্দে দিয়াছে। কাহার মুখে বিষাদের চিহ্ন মা

নাই। ব্রহ্মবাসীদিগের একটি মহৎ দোষ এই যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই উদ্ধত। অতি সামান্য কারণেই জ্বলিয়া উঠে। যাহার প্রতি রুষ্ট হইল, তখনই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিল। স্ত্রী যত্নের সহিত অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্বামী সম্মুখে উপস্থিত করিল; কিন্তু তাহা স্বামীর রসনার তৃপ্তিজনক হইল না। স্বামী রাগের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীকে তখনই শমন-সদনে প্রেরণ করিল। একবার একটি লোক নৌকায় রঙ্ দিতেছিল। রঙের গন্ধ তাহার প্রতিবেশীর সহ্য হইল না। যখন কাজ শেষ করিয়া সে বাড়ী ফিরিতেছিল, প্রতিবেশী একখানা দামাদ্বারা তাহার গলাটি কাটিয়া লইল। এরূপ সামান্য সামান্য কারণেও ব্রহ্ম দেশে হত্যা হইয়া থাকে।

খাদ্যাখাদ্য।—ব্রহ্মবাসীরা আহারে একঅংশে বড় পরিমিত। তাহারা দিবসে দুইবার মাত্র ভোজন করে। নৈশ-ভোজন তাহাদের নাই। প্রাতে ৮ ঘটিকা ও অপরাহ্ণ ৫টার মধ্যেই সকলে ভোজন কার্য্য শেষ করে। ভোজ্য দ্রব্যের মধ্যে অন্নব্যঞ্জনই প্রধান খাদ্য। মৎস্য পক্ক ও অপক্ক উভয় অবস্থায়ই খাদ্য। কোমল কিশলয়, চ্যুত-কলিকা ও তেঁতুলের কচি পত্র দরিদ্রদিগের প্রিয় ভোজ্য। গৃহকর্ত্রী এক বৃহৎ বেত্রনির্ম্মিত বারকশে (ভোজন পাত্র বিশেষ) অন্নগুলি স্তূপীকৃত করিয়া রাখে। তাহার চতুর্দ্দিকে সকলে হাঁটু গাড়িয়া খাইতে বসে। ব্যঞ্জনগুলি বিষম লবণাক্ত। একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেয়ালাতে (Bowls) করিয়া সে গুলি দেওয়া হয়। এবং যত জন খাইতে বসিবে, ভোজন-পাত্র একটি হইলেও প্রত্যেকের ব্যঞ্জনের বাটী পৃথক্ হওয়া চাই। লঙ্কার ঝাল এবং পলাণ্ডুর কুচি প্রচুর রূপে না দিলে, ব্যঞ্জন তাহাদের মুখ-রোচক হয় না। মশলার মধ্যে লাল পিপড়ার ডিম্ব, পচা মৎস্যের কাই, প্রভৃতি অধিকরূপে ব্যবহৃত। যে দিবস ব্যঞ্জনে এ সমস্ত না থাকিবে, কোন ব্রহ্মবাসীই খাওয়া তৃপ্তিকর ও সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে না। মৎস্য কাই নানা প্রকারের প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং সচরাচর হাটে বাজারে উহার ক্রয় বিক্রয় হয়। প্রধান কএকটির নাম, মৎস্যের অপক্ক খাদ্য কাই, আর এক প্রকারের চাপ্ চাপ্ মৎস্য আর কতগুলিকে মৎস্য চূর্ণ বলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মারা অত্যন্ত চাখোর জাতি। কিন্তু কোনরূপ মিষ্টি মিশাইয়া তাহারা চা খায় না। মিছিরি এক টুকরা অগ্রে মুখে লইয়া তাহার পর চা পাত্রে চুমা দিবে। গৃহের এক কোণে একটি বৃহৎ জল-পাত্র থাকে, ভোজনান্তে সকলে সেই স্থানে যাইয়া মুখ প্রক্ষালন করে। তৎপর চুরটের ধুম্র-পান ও সঙ্গে সঙ্গে তাম্বুল চর্ব্বণ চলিতে থাকে। চুরট গুলি সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দীর্ঘ করিয়া প্রস্তুত করা হয়। সর্ব্বাঙ্গ সেগুন পত্রে আবৃত। এ জাতি পূর্ব্বে কখন মদ্যপায়ী ছিল না। কিন্তু এখন তাহাদের সেই গৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। নবীন সভ্যতার গুণে দক্ষিণ ব্রহ্মা আজ সুরা-প্লাবিত। কিন্তু সেই স্রোত এখন পর্য্যন্ত

রমণী মহলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাহারা ইহার ভয়ানক বিরোধী।

স্ত্রীমূর্ত্তি।—আজি কালি বিলাস-বিভ্রমে মাতিয়া ব্রহ্মযুবকগণ যেরূপ অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রী গুলিতে এখন পর্য্যন্ত সে ছায়া পড়ে নাই। তাহারা এখনও কার্য্যক্ষম ও কষ্ট-সহিষ্ণু। বোধ হয়, শুধু ইহাদের গুণেই ব্রহ্মদেশ স্বর্গ-ভূমি নামে অভিহিত হইয়াছে। বঙ্গবাসি! একবার ব্রহ্মবাসীর মঞ্চ-গৃহে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর,—দেখিবে স্বামীকে পতিত্বে বরণ করার পর যেন একটি গুরুতর দায়িত্ব স্ত্রীর স্কন্ধে পড়িল। মাদকসেবী ও চির-অলস স্বামী, তখন সংসারের সমস্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিল। কিন্তু পত্নী প্রেমের অনন্ত উচ্ছ্বাস হৃদয়ে লইয়া কঠোর সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইল। তখন গোশালায় স্ত্রী, গৃহকার্য্যে স্ত্রী, চাষবাসে স্ত্রী, পাকশালায় স্ত্রী, বসন বুননে স্ত্রী, হাট বাজারে স্ত্রী, দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ে স্ত্রী, আদান প্রদানে স্ত্রী, স্ত্রী না করিতেছে সংসারে এমন কোন কার্য্যই নাই। নির্লজ্জ স্বামী মনে করে, আপনাকে সংসারের ঝঞ্ঝাবাৎ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্ত্রীজাতির জন্ম হইয়াছে। কিন্তু পত্নী কখনও স্বামীর এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে না। স্বামীর প্রতি এখনও তাহাদের অনাবিল শ্রদ্ধা ভক্তি আছে বলিয়া তাহারা মনে করে পতিকে সকল কায়িক পরিশ্রম হইতে বিমুক্ত করার নিমিত্তই নারীজাতির জন্ম ও ইহাই তাহাদের মহাব্রত। কিন্তু এই সমস্ত সদ্গুণ রাশির মধ্যেও অন্ধকারের ছায়া একটুকু আছে। ব্রহ্মরমণীরা যখন রাগিয়া উঠে, তখন তাহারা একেবারে জ্ঞানবিবর্জ্জিতা হইয়া পড়ে। মুখ হইতে তখন অজস্র গালিবর্ষণ হইতে থাকে। সেই গালি নিতান্তই অবাচ্য ও অশ্রাব্য।

প্রবন্ধের উপরি লিখিত অংশটুকু পাঠ করিয়া আমাদিগের সম্মানার্হ বঙ্গীয় ভগিনীগণ কি বলিবেন, জানি না। কিন্তু আমাদের এই রূপ দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস যে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককেই সজ্জিত পুত্তলিকার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ও ভক্তিশূন্য বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী,—সুতরাংই দেবী। দেবী হইয়াও নিম্নশ্রেণীস্থ মানবীর ন্যায় তাঁহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে শুধুই সুখ-লালসার দাসত্ব করিতে দেখিলে, ক্ষোভে দুঃখে আমাদের অন্তর দগ্ধ হইয়া যায়। ভারতে চিরকাল দেবীপূজার প্রাধান্য ছিল। সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি ভারত-ললনাগণকে আর্য্য-সমাজ দেবীভাবে পূজা করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম-পুরাঙ্গনাগণ আবার তাঁহাদের সেই আসন গ্রহণ করুন, আমরাও সেইরূপ দেবী জ্ঞানে তাঁহাদিগকে পূজা ও ভক্তি করিব।

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

গারোজাতির বিবরণ।

(৬) সামাজিক উৎসব।

চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ছাগ ও শূকর বধ করিয়া আহার ও গ্রামবাসী সকলে মিলিত হইয়া সুরাপানে উন্মত্ত হওয়া, গারোগণের একটি চির-প্রচলিত প্রথা। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে নবান্ন ভক্ষণ, আর একটি উৎসব। এতদুপলক্ষেও সুরাপানের সমারোহ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিশেষ উল্লেখযোগ্য অন্য কোনও সামাজিক উৎসব নাই। সুরাপানই প্রত্যেক উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কোনও কোনও সময়ে গারোগণ গল্পচ্ছলে রামায়ণের প্রস্তাবটি বর্ণনা করিয়া থাকে। অবশ্য তাহাতে রামলক্ষণ, সীতা প্রভৃতি বরেণ্য নামের উল্লেখ নাই; কিন্তু প্রস্তাবটি অবিকল রামায়ণেরই বটে। কি সূত্রে আদি কবির অমৃতনিঃস্যন্দিনী পরম পবিত্র বিশ্ববিমোহিনী রামায়ণী কথা এই অসভ্য মানবসমাজেও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। ধন্য মহাকবির প্রভাব ও তাঁহার অমানুষী প্রতিভা! যাবৎ চন্দ্র দিবাকর, রামায়ণ-কথা লোক-সমাজে প্রচলিত থাকিবে। কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

(৭) কৃষি, বাণিজ্য।

পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশবাসী গারোগণ ইতি পূর্ব্বে, (কতকে এখনও) বলীবর্দ্দ দ্বারা হল-চালনের পদ্ধতি অবগত ছিল না। তাহারা এক একটি টীলার অর্থাৎ উচ্চ ভূমির জঙ্গল কাটিয়া, ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহা অগ্নি-সংযোগে দগ্ধীভূত করিয়া; ঐ পরিষ্কৃত ভূমিতে বীজ রোপণ করিয়া থাকে। অরণ্য প্রজ্বলিত হইলে, দূরস্থ নিম্নভূমি হইতে তাহার দৃশ্য বড় রমণীয় হয়। বাস্তবিক তাহা দর্শনীয় বটে। জঙ্গল পরিষ্কৃত হইলে, স্ত্রীলোকগণ দক্ষিণ হস্তে একটি বংশনির্ম্মিত শলাকা লইয়া পৃষ্ঠে দোদুল্যমান ঝুড়ী হইতে (প্রচলিত ভাষায় এই ঝুড়ীকে জুঙ্গা বলে) বাম হস্তে বীজ গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ হস্তস্থিত শলাকাদ্বারা ভূমিতে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ঐ বীজ নিক্ষেপ করিতে থাকে। বীজ গুলি এমন সুকৌশলে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয় যে, তাহার একটিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় না। ধান্য, মাকু, দেওধান (বজরা), লঙ্কা, চুকাই, (একপ্রকার রক্তবর্ণ ফল, ইহাতে উৎকৃষ্ট অম্বল প্রস্তুত হয়) চিংরা, (একপ্রকার ফল, ইহা প্রায় খরবুজার মত) কুচ্‌কুমড়া, গজদন্ত, শকরন্দ আলু প্রভৃতি সমস্তই এক সঙ্গে রোপিত হয়। এবম্প্রকার কৃষি-কার্য্যকে প্রচলিত ভাষায় আদাং করা বলে। ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্য প্রায়শঃ নিজ ব্যবহারেই ব্যয়িত হয়। অন্যান্য দ্রব্যাদি

বাজারে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। তৃণ-ভোজী আরণ্য জন্তুর উপদ্রব হইতে ক্ষেত্র রক্ষার জন্য তাহাতে মাচাং বাঁধিয়া অহোরাত্র প্রহরী নিযুক্ত রাখা হয়। কোনও কোনও সময়ে, টাট্ট দ্বারাও ক্ষেত্র রক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিক্রয়ার্থ দ্রব্যাদি পৃষ্ঠবিলম্বিত ঝুড়ীতে এবং সময় সময় এক কাষ্ঠের নির্ম্মিত কুন্দা নৌকাতে বাহিত হয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বিক্রেয় দ্রব্য বহন করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় গুরুভার বহনে সক্ষম। চুঙ্গাটি রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় শিরোবেষ্টন করিয়া পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকে। পূর্ব্বে প্রায়শঃ দ্রব্য বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা অর্থ-বিনিময় প্রচলিত হইয়াছে এবং সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে, ব্যবসায়ে চাতুরীও পরিলক্ষিত হইতেছে। বংশ, বেত্র, কাষ্ঠ প্রভৃতি অরণ্যজাত দ্রব্য, নানাবিধ পশুপক্ষীর শাবক, মৃগচর্ম্ম, ও শৃঙ্গ প্রভৃতি, বংশ ও বেত্র-নির্ম্মিত নানাদ্রব্য, কুন্দা নৌকা (এক কাষ্ঠের নৌ বিশেষ) গারোগণ বিক্রয়ার্থ বাজারে আনিয়া থাকে। দিবার প্রথম ভাগেই ইহারা ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া লয়। কৃষিবাণিজ্য প্রসঙ্গে ইহাও বক্তব্য যে, গারোগণ বর্ত্তমান কালে অনেক বিলাসিতার উপকরণ ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এবং ক্রমে তথাকথিত সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা ক্রমবিকাশের অবশ্যম্ভাবি ও অনিবার্য্য নিয়ম অনুসারেই সংঘটিত হইতেছে, এমত অনুমান করা বোধ হয় অবৈধ হইবে না।

(৮) বিবাহ ও শ্রাদ্ধ।

গারো জাতির বিবাহ-পদ্ধতি বিচিত্র ও কৌতুকাবহ। ইহা মনুক্ত, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ ও আসুর, এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কোন্‌টির অন্তর্গত নিম্নোক্ত বর্ণনা হইতে পাঠকগণ তাহা নির্ণয় করিবেন। ইহাদের মধ্যে (১) মান্দে, (২) আবেং, (৩) আতং, এবং (৪) নিগাম, এই ৪টি শ্রেণী-বিভাগ আছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে ভাষা ও ব্যবহারগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে ইতঃপর বিবৃত করা যাইবে। মাতৃজাতিতে বিবাহ হইতে পারে না। ভাগিনেয়ী, খুল্লতাত-ভগ্নী, পিতৃব্যপত্নী, বিবাহ যোগ্যা নহে; কিন্তু মাতুলানী, মাতুলকন্যা এমন কি শ্বশ্রূকেও বিবাহ করিতে পারে। মাতুলানী বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। মাতুল কন্যাও আদরণীয়া বটে। ইহাদের বিবাহে বরকন্যা পিতামাতা অথবা অন্য কোনও আত্মীয় কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হয়। বর মনোনীত হইলে, কন্যার পিতা গ্রামের লোক সহ বরের বাড়ীতে যাইয়া নির্ব্বাচিত বরকে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। বর তখন জঙ্গলে অথবা অন্য কোনও গুপ্ত স্থানে পলায়ন করিবে। কখন কখন বৃক্ষারূঢ়ও হইয়া থাকে। বরের অনুসন্ধান পাইলে, তাহাকে বাঁধিয়া পাত্রীপক্ষ কন্যার বাড়ীতে নিয়া যাইবে। অনেক সময় ৪।৫ জনে স্কন্ধে বহন করিয়া নিয়া যায়, তখন তাহার হস্ত পদাদি রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে। বরকে এই প্রকার সম্মানসহকারে কন্যার বাড়ীতে আনা হইলে, কন্যাকে ও বরকে মদ্য

পান করান হয় এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেরাও মদ্য পান করে। অতঃপর একটি পুং ও একটি স্ত্রী কুক্কুটকে আহার্য্য দিয়া লগুড়ের এক আঘাতে হত্যা করা হয়। এদিকে দেবতাকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। যদি এক আঘাতে দুইটি পাখী যুগপৎ হত হয়, তবে বিবাহ মঙ্গলজনক হইবে, নতুবা অশুভসূচক। কুক্কুট দুইটি নিহত হইলে, তাহাদের পেট কাটিয়া অন্ত্রাদি পরীক্ষিত হয়। অতঃপর পাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কন্যা মনোনীতা হইল কি না? যদি তাহা না হয়, তবে সে চলিয়া যাইবে এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সসম্মানে আনা হইবে। কন্যা তাহারও অমনোনীতা না হইলে, বরের ভাগিনেয়কে পূর্ব্বরীতি অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আনাইবে। এই প্রকারে পর পর তিনটি বরই যদি কন্যাকে অমনোনীত না করে, তবে গ্রামান্তর হইতে নূতন পাত্র ধরিয়া আনার ব্যবস্থা করা হয়। বিবাহের পর, সন্ধ্যার সময়, বর ও কন্যাকে এক ঘরে রাখিয়া ২।৪ টি বালক তাহাদের প্রহরী স্বরূপ সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় থাকে। উদ্দেশ্য বোধ হয়, বরকন্যা কোনও প্রকার স্ত্রী পুরুষ ঘটিত ব্যবহার করিতে না পারে। আমাদের বাসর ঘরের ব্যবস্থাও কতকটা এই উদ্দেশ্য-মূলক নয় কি? যদি বর কন্যাকে মনোনীত করিয়া থাকে, তবে সে শ্বশুরালয়েই থাকিবে, নতুবা চলিয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু এক স্ত্রী দুইটি পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না। দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইলে, প্রথমা স্ত্রীর আত্মীয়াকেই বিবাহ করিতে হইবে। কারণ, শ্বশুরালয়ে বাসই গারোদের নিয়ম। অন্য গ্রামের স্ত্রী বিবাহ করিলে, প্রথমা স্ত্রীকে কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সে পুনর্ব্বিবাহিতা হইতে পারে। তাহার গর্ভজাত কোনও সন্তান সন্ততি থাকিলে, মাতার সঙ্গেই যাইবে। বিবাহের বয়স সম্বন্ধে কোনও সীমাবদ্ধ নিয়ম নাই। কন্যা বর হইতে বয়োজ্যেষ্ঠা হওয়া দোষাবহ নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারে। এই অবস্থায় পরস্পরই দায় দেওয়ার নিয়ম আছে। একটি কাঁসার বাটা, একটি শূকরের মূল্য ও ২।৩ হাঁড়ি মদ, ইহাকেই দায় বলে। গারোদের মধ্যে সতীত্বের বিশেষ আদর আছে বলিয়া বোধ হয় না। তবে পারদারিকতা নিন্দনীয় বটে। কোনও স্ত্রী পরপুরুষাসক্তা হইলে, সে ত্যজ্যা। যে পুরুষে আসক্তা হইবে, সে পূর্ব্বস্বামীকে দায় দিয়া সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। এই অবস্থায় স্ত্রীর গর্ভজাত কোন সন্তান থাকিলে, সে উক্ত আসক্ত পুরুষেরই অধিকারে যাইবে।

গারোদের কন্যাই উত্তরাধিকারিণী। পুত্র সন্তান সম্পত্তির অধিকারী নহে। কন্যা না থাকিলে, স্ত্রীর আত্মীয়গণই সম্পত্তি পাইয়া থাকে। পর্ব্বতের উপত্যকাবাসী গারোগণ পাত্রপণ দিয়া থাকে। অন্যান্য বৈবাহিক নিয়ম পার্ব্বত্য গারোদের ন্যায়। অতএব এতৎসম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। জগতে বিবাহ-পদ্ধতি যত বৈচিত্র্যপূর্ণ, কোনও

সামাজিক প্রথাই বোধ হয় তদ্রূপ নহে। গারোদের বিবাহ-পদ্ধতি যথাসাধ্য বিবৃত হইল। পাঠকগণ ইহার সহিত অন্যান্য সভ্যাসভ্য জাতির বিবাহ-পদ্ধতি তুলনা করিয়া দেখিবেন। গারোগণ মৃত দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া, ভস্মাবশেষ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখে। অতিসার (Cholera) অথবা অন্য কোন সংক্রামক পীড়াতে মৃত্যু হইলে, শবদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে। মৃত দেহ আত্মীয়স্বজনদিগকে না দেখাইয়া ভস্মীভূত করে না,—দূরস্থ অত্মীয়স্বজন থাকিলে, ২। ১ দিন পর্য্যন্তও শবদেহ রাখিয়া দেয়। অতঃপর দেহ সৎকৃত করিয়া সকলে মদিরা পানে উন্মত্ত হয়। যে স্থানে শব দাহ করা হয়,সে স্থানে বাঁশের টাট্টি দিয়া ঘেরিয়া একটি মাঁচা প্রস্তুত করে। এক বৎসর পরে ঐ টাট্টী ও মাঁচা অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া ফেলে এবং ভস্মগুলি একটি পাত্রে ভরিয়া আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে লইয়া যায়। তৎপরে মৃত্তিকাতে গাড়িয়া রাখে। চৈত্র মাসে একবার এবং কার্ত্তিক মাসে একবার গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলে মদ্য পানে মত্ত হয়, এবং শূকর কুক্কুট প্রভৃতি পশু বধ করিয়া আহারান্তে নৃত্য গীত করিয়া থাকে। এই প্রকার আমোদ-প্রমোদ ক্রমাগত ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় পাবন লাগা বলে এবং ইহাই গারোজাতির শ্রাদ্ধ ক্রিয়া। এক জনের মৃত্যুতে দুবার ব্যতীত পাবন হয় না। ইতঃপর আর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হয় না। দেহাবসানে জন্মান্তর লাভ, কি স্বর্গ নরক গমনে গারোদের বিশ্বাস নাই। আত্মার অস্তিত্বই ইহারা স্বীকার করে না। দেহের অবসানেই সমস্ত সুখ দুঃখের পরিণতি হইয়া যায়। গারোদের বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে আর বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই। অতএব বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা, বি,এ
(মহারাজ সুসঙ্গ)

শৈলসঙ্গীত।

জন্মভূমি।

আমার জনম ভূমি! আমার জননী!
মা তোর পর্ব্বত-অঙ্কে উপল-বন্ধুর
আমার হৃদয় খানি দিবস যামিনী
ঘুরিছে, কুরঙ্গ যেন কাতর বিধুর!

চিরকাল ঘুরিতেছি বিদেশে বিদেশে,
কত দেশ, কত গ্রাম করি পর্য্যটন।
এটুকু বলিতে পারি সর্ব্ব অবশেষে,
তোর মত মাতা মাগো! মিলে নি কখন

এখনও আসে যেন জাগ্রত স্বপনে
মা তোর পার্ব্বত্য ঊষা, নির্ঝরের গান;
এখনও পাই যেন লতার বিতানে
লুক্কায়িত কুসুমের অযাচিত ঘ্রাণ।

এখনও মাঝে মাঝে বিভুঁই বিদেশে
মনে হয় শুয়ে আছি যেন তোরি কোলে,
ধরা কোলাহল দূরে জনহীন শেষে;
চারি দিকে শত শত স্নেহকর দোলে!

ঊর্ম্মিত হরিত বুক! অজস্র ধারায়
শত মুখে ঝরে সেথা অমৃতের ধার—
মা তোর অসীম স্নেহ অধীরের প্রায়
ছল ছল কল কল করে অনিবার।

আজি এ বিদেশে মাগো! গোধূলী কিরণে
কোথা হতে ভেসে আসে সেই পুরাতন;
সংসার-সমর-ক্লান্ত নির্ব্বাসিত প্রাণে
আনে সুশীতল বায়ু, বিহঙ্গ-কূজন!

মায়া কুহেলিকাময় সকলি অচল!
—মা তোর যেখানে যাই,সেখানেই বসি।
সেথা সুখ, সেথা শান্তি, সেথায় কেবল,
স্নেহ বুকে প্রীতি-ক্ষীর উঠিছে উচ্ছ্বাসি!

সেই চিরন্তন গ্রাম, রাস্তায় পড়িয়া
ছেলে গুলি খেলা করে ধুলা বালি নিয়ে;
তুলসী-শোভিত-কক্ষা, আবর্জ্জিত-কায়া
মাধুরী আনতমুখী যায় পাশ দিয়ে!

সহজ সারল্যময়ী পল্লী-সীমন্তিনী
—স্নেহভরা অশিক্ষিত সহজ-বিলাস
সুধাভরা বুক মুখ, সরল চাহনি—
হৃদয় জুড়িয়া যেন ছাড়ে মায়াপাশ।

কৃষক কৃষক-পত্নী—শান্তি আর শ্রম,
তাপ আর বরিষার প্রথম বর্ষণ—
নিরখিলে তাহাদের পবিত্র আশ্রম,
অজ্ঞাতে ভিজিয়া যেন আসে দুনয়ন।

দিন আসে, দিন যায়,সন্ধ্যা আর ঊষা।
—দুইটি ভগিনী যেন একই স্বরূপ—
পরিয়ে আরক্ত বাস, পরি ফুল-ভূষা
অলক্ষিতে চলে যায় অতি অপরূপ।

নিত্য কবিতার উৎস! সমুদ্র-নিশ্বাসে
নিত্য পবিত্রিত কায়া! স্নেহের আধার!
যোগিনী, তাপসী মাগো! দেহমাত্র শেষে।
গরীয়সী জন্মভূমি! জননী আমার!

বিদেশে, পরের দেশে যবে যেথা যাই,
শত মুখে তোর কথা কহি অনিবার—
মা তোর সন্তান আমি! তাই, যেন তাই
করি গর্ব্ব, করি দম্ভ, করি অহঙ্কার!

কেহ ত বোঝে না তোরে, কেহ মৃদুহাসে,
মুখ ফিরায় না কেহ ঘৃণায় লজ্জায়—
হৃদয়ের অতিগুপ্ত কোমল প্রদেশে
লোহার শলাকা যেন বিঁধাইয়া যায়!

কেন মা, বোঝে না কেহ হৃদয়-নিহিত
অমর-সঙ্গীত তোর! সুগভীর ধ্যান!
ভগ্নীদের কাছে তুই এতই ঘৃণিত
কঠোর উদাস হাস্যে করে অপমান!

তোরি ত সন্তান আজ * *

* * *

* * *

* * *

মাগো, কত শত তোর নবীন অঙ্কুর
অযত্নে মরিয়ে রয় আঁধার গুহায়!
কত গান সুতরল, কঠোর মধুর
পার্ব্বত্য বাতাসে বহে, ঝরে জ্যোছনায়!

কি লাগে তাদেরে মাগো জাগায়ে তুলিতে?
করিতে স্ফুলিঙ্গে বহ্নি পর্ব্বত আকার!
জানি তাহা আছে শুধু তোরি হৃদয়েতে
আর কারো—কারো নাই এই বাঙ্গালার!

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে ডুবিতে ডুবিতে
মা তোর হৃদয় মাঝে ডুবেছি কেবল;
তখনি স্তম্ভিত হয়ে পেরেছি বুঝিতে—
অতল স্পর্শের মত উহাও অতল!

ও অতল হৃদয়েতে সুধা আছে কত
আছে কত স্নেহ-হাস্য, কল্লোল ক্রন্দন
বুঝিয়াছি! বুঝে যথা স্তন্য-পান-রত
ক্ষুদ্র শিশু, জননীর হৃদয় স্পন্দন;

সে অমৃত তল হ'তে উৎসের মতন
বিস্ফুরিয়া তোল দেখি সুধার ভাণ্ডার!
উঠে কিনা উঠে মাগো! চকিত মতন
প্রতি দরী-গৃহ হ'তে বীণার ঝঙ্কার!

উঠে কিনা উঠে দেখি! জড়িয়া, কুঞ্চিয়া
তোর বুক হ'তে যথা মেঘ উথলয়—
এই বিশ্ব ঈশ্বরের আরতি করিয়া
সর্জ্জরস ধূম মত সহস্র হৃদয়!

তারা প্রভঞ্জন মত সুপ্তোত্থিত উঠি
শুনাবে, জগতময় কলউত রোল!
তাহারা মেঘের মত করি ছুটাছুটি
তুলিবে আকাশময় বিজলী-হিল্লোল!

তারা তোর দুঃখ অশ্রু দেবে মুছাইয়া,
জগতের মাঝে তোর করে দেবে স্থান,
নরের বিস্ময় ভক্তি বলে আকর্ষিয়া
গাবে তারা জগতের মহা সামগান!

আমার কি আছে মাগো! শুধু এ হৃদয়।
এ হৃদয় দিয়ে ফেলিব আবরি;
প্রতি নিরঝরে হ্রদে প্রেম-সুধাময়
আমার জীবন বিন্দু যাইব বিতরি!

তোর ফুল পাতাগুলি মানব-শোণিতে
নিষিক্ত হইয়া হ'বে সজীব, মুখর;
মানবে দেখাবে তারা—প্রত্যহের পথে।
চরণে দলিত যারা, তারাই সুন্দর!

সুখ যদি চাও, তবে সুখ সেথা আছে;
পারত বুঝিয়ে লও ধেয়ানের পথে।
অন্যথা চলরে চল করমের কাছে—
অনন্ত কল্লোলময় উন্নতির রথে!

কি হবে তাহায়? মাগো, আর কিবা চাই
লক্ষ সুত তোর আজি ঘুমে অচেতন।
জাগাইতে পারি যদি একটিও ভাই
মানিব আমাকে ধন্য সার্থক জীবন!

আমার সে প্রাণে যদি একটি সোদর
পায় প্রাণ, পায় বল পায় মা জীবন;
পশি এই জগতের হৃদয় ভিতরে
বুঝে পর্ব্বতের ধ্যান, সমুদ্র গর্জ্জন!

বুঝে, এই বিশ্ব মাঝে তারো কাজ আছে।
ওই উঠে চন্দ্র সূর্য্য নিয়ম অধীন!
যে যায়, সে যায়, কেহ নাহি যায় পাছে—*
সুক্ষ্মসূত্রে দূরাদূর করম-নিলীন।

খাওয়া আর বেঁচে থাকা এ নহে জীবন,—
কালক্ষেপ, আত্মহত্যা তরল কৌতুকে!
মানব মানব শুধু দেখিবে জীবন
আপনার প্রতিকৃতি আপনার বুকে—

যদি কেহ বুঝে, আর চলে সেই পথে;
সে আনন্দে প্রাণ মোর উঠিবে গলিয়া!
মা তোর করুণাময় নেত্র প্রান্ত হতে
সার্থক অশ্রুর মত পড়িব ঝরিয়া!

ঝরিয়া পড়িব কোথা? মাগো তোরি বুকে
কোথা আর ডুবিবার মরিবার স্থান?
কমিবে কি তৃষ্ণা? যদি চিররত সুখে
শত যুগ ধরি তোর করি স্তন্যপান!

যুগ হতে যুগান্তরে, জন্ম জন্মান্তরে
মা তোর সন্তান হই, বুঝি তোর প্রাণ!
ফুল হই, ফল হই, গিরি গুহান্তরে
নির্ঝরের সাথে সাথে করি কলগান।

বৃদ্ধ বট বৃক্ষ হই, ধ্যানের গৌরবে
শত বর্ষ চেয়ে রই নভো অভিমুখে!
উচ্চ গিরিশৃঙ্গে উঠি, মহাকলরবে
জল-প্রপাতের মত ঝাঁপি তোর বুকে!

পিকী হই, শিখী হই নর্ত্তন-চতুর!
স্বরের তরঙ্গে করি হিয়া ভাসমান!
লহরী-চুম্বন মত্ত সমুদ্র-বায়ুর
করি সেই অনলস স্বাধীনতা গান!

মানবের হৃদয়েতে কত মধু ধরে,
কত স্নেহ দুগ্ধ আছে বুকে প্রকৃতির,
যোগিনি মা! তোর হতে সব বুঝিবরে!
মাগো তুই সুভাগিনী মেয়ে ধরণীর!

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

* "Could you perceive the shadows o'er you,
And behold that seraph-band,
Long lost friends would, bright before you,
In angelic beauty stand."

"The tomb is not an endless night,
It is a thoroughfare—a way
That closes in soft twilight,
And opens in eternal day." (Victor Hugo)

ছায়া-দর্শন।

নবম অধ্যায়।

উপক্রম।

মহাকবি মিল্টন কহিয়াছেন,—

Millions of spiritual beings
walk the earth
Unseen, while we wake
and when we sleep.

অর্থাৎ

অসংখ্য আত্মিক সদা অলক্ষিত রূপে
বিচরে অবনী ধামে,—যখন আমরা
জাগরিত রহি, কিংবা রহি নিদ্রাগত।

মহাকবির এই মহাবাক্য, এত কাল, বাল্মীকি ও ব্যাসের সর্ব্বজন-বিদিত সাক্ষ্যের ন্যায়, কল্পনার কথা মাত্র বলিয়া উপেক্ষিত ছিল। এইক্ষণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের মধ্যে শত সহস্র ব্যক্তি ইহা বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষায় বিশেষরূপে জানিতে পাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেহত্যাগ করিয়া দ্রষ্টব্যে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মরিয়া যান নাই,—অথবা আকাশে মিলিয়া যান নাই। তাঁহাদিগের সহিত সকলেরই আবার সর্ব্বজন-সমক্ষে সাক্ষাৎকার ঘটিবে; এবং কেহ তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে কৃতার্থ, কেহ বা তাঁহাদিগের অভিসম্পাতে ক্লিষ্ট হইয়া, আত্মজীবনের অতীত কাহিনী স্মরণ করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহারা এইক্ষণ, আত্মিক তনু ধারণ করিয়া, নিজ নিজ কর্ম্ম-ফল-নিয়মিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, আত্মকৃত অথবা অন্যদীয় কর্ম্মের আকর্ষণে, —কখনও বা উচ্চতর ভাবের অনুশাসনে,— পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যের সংবাদ লইতেছেন। বস্তুতঃ, তাঁহারা জড়জগতে যে প্রকার জীবিত ছিলেন, অধ্যাত্মজগতে যাইয়াও, ঠিক সেই আকৃতি, সেই প্রকৃতি, সেই আকাঙ্ক্ষা ও সেই অভিজ্ঞতা লইয়া, সেই প্রকারই জীবিত আছেন; এবং সেখানে, শরীর ও মনে, উচ্চতর শক্তির বিকাশ হয় বলিয়া, জীবিত হৃদয়ের উপর কার্য্য করিবার জন্য অধিকতর সুবিধা পাইতেছেন।

মা, আপনার দুধের শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধধামে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন; তিনি সে শিশুর সুকোমল স্নেহময় আকর্ষণ এড়াইতে পারিতেছেন না। তাঁহার প্রাণ তাহা দেয় না, এবং দেবধামের অধ্যক্ষেরা তাহা ইচ্ছা করেন না। তিনি তাই, প্রতি নিয়ত পৃথিবীতে আসিয়া, আপনার প্রাণ ধনকে অলক্ষিতভাবে সান্ত্বনা দান করেন এবং কখনও বা, তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া আপনার উপস্থিতির পরিচয় দেন। মাতৃ সাংসারিক জীবনের এক মাত্র সম্বল, উ যুক্ত পুত্র, অকস্মাৎ উৎকট রোগে অভিভূ

ইয়া, অকালে পৃথিবীর বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। তিনিও তাঁহার শোকাতুরা মাতাকে ক্ষণকালের তরে ভুলিতেছেন না। তিনি, এই হেতু, দয়াময়ের শক্তি-সঞ্চালিত দেবপুরুষদিগের দয়ার বিধানে, মধ্যে মধ্যেই পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন, এবং মায়ের উপকারের জন্য পরের হৃদয়ের উপর কার্য্য করিতে যত্নপর হন।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, যাঁহারা পরলোকের অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীর সহিত যে যত বেশী জড়িত, পৃথিবীতে যাতায়াত করিবার জন্যও, তাঁহার হৃদয় তত বেশী লালায়িত। কিন্তু, এ সকল আকর্ষণ ছাড়া আর এক প্রকার আকর্ষণ আছে। তাহা অতি ভয়ানক ও ক্লেশকর। কেহ কোন স্থানে, অতি গোপনে, পরের প্রাণে আঘাত করিয়া, আপনার স্বার্থ উদ্ধার করিয়াছে। সেই ক্ষণস্থায়ি স্বার্থ, এইক্ষণ, কালের অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া থাকিলেও, তাহার পাপের স্মৃতি এবং স্মৃতির আকর্ষণ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। সে যেখানে অন্ধকারে অন্যের বুকে ছুরি মারিয়াছিল, তাহার আত্মা, বহুকাল পর্য্যন্ত, সেখানেই নিগড়-নিবদ্ধের ন্যায় অবস্থিত রহিতেছে;—এবং সেখানে, যেন নির্জ্জন কারাভবনে, কর্ম্মজনিত অনুতাপের আগুনে, দগ্ধ হইয়া, ধীরে ধীরে প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতেছে। কেহ বা, আপনি সে গর্হিত পাতকে নির্লিপ্ত হইয়াও, প্রতিহিংসার প্রবল আকর্ষণে, তাদৃশ পাপ-স্থলে উপস্থিত হইতেছে, এবং সেখানে, মাঝে মাঝে, মনুষ্যকে ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া, প্রাণের অতৃপ্ত ক্রোধ ও অন্তর্দ্দাহি জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে।

এই শেষোক্ত প্রকার ছায়ামূর্ত্তি সম্বন্ধে তাত্ত্বিকদিগের মধ্যে একটু মত-ভেদ আছে। আমাদিগের পাঠকবর্গ অবশ্যই থিয়োসোফিষ্ট (Theosophist) অর্থাৎ দিব্যতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের নাম শুনিয়াছেন। থিয়োসোফিষ্টেরা জড়বাদী নহেন। তাঁহারাও, অধ্যাত্মবাদীর ন্যায়, জড়-দেহ-মুক্ত জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন; এবং মনুষ্য, মৃত্যুর পর, অধ্যাত্মজগতে অবস্থান করিয়া, স্বকৃত কর্ম্মের দণ্ড-পুরস্কার ভোগ করে, এ কথা পরীক্ষালব্ধ সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য, এখানে সেখানে, ছায়ামূর্ত্তির মত যাহা দেখিতে পায়, তাহার প্রকৃত সারবত্তা ও বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে।

উল্লিখিত সম্প্রদায়ের আধুনিক উপদেষ্ট্রী, বাগ্মিকুল-ভূষণা আনি বিসান্ত (Annie Besant) বলেন যে, মনুষ্য পৃথিবীতে যে সকল ছায়ামূর্ত্তি (apparition) দেখিয়া চমকিয়া উঠে, তাহা প্রধানতঃ Revelations in astral light—অর্থাৎ আত্মিক মূর্ত্তির আকাশিক প্রতিবিম্ব। * ইহার এই নিগূঢ়

* "This kind of (unconscious) apparition was nothing more than what Theosophy described as a picture or revelation in the astral light. The *modus operandi* was this. There

অর্থ যে, নিহত ব্যক্তি স্বয়ং তাহার হত্যা-স্থলে বদ্ধ রহে না। কিন্তু তাহার আত্মা, অধ্যাত্মজগতের কোন বিশেষ স্থানে থাকিয়া, নিরন্তর যে সেই শোকাবহ হত্যার ঘটনা চিন্তা করে, তাহাতেই তদীয় চিন্তাময় মূর্ত্তি সময়ে সময়ে চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া মনুষ্যের ভয় কিংবা বিস্ময় জন্মায়। থিয়োসোফিষ্ট সম্প্রদায়ের মত-অনুসারে তাদৃশ মূর্ত্তির নাম Thought-body অর্থাৎ চিন্তাত্মিকা তনু। সে মূর্ত্তি কিংবা সে তনুর চক্ষু আছে, কিন্তু চক্ষে দৃষ্টি নাই; কর্ণ আছে, কর্ণেও কোন প্রকার শ্রুতিশক্তি নাই।

এইরূপ নির্জীব মূর্ত্তির কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন। ড্রেসডেন-নগর-নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত প্রফেসর ডমার (Professor Daumer) বলেন যে, মনুষ্যের আত্মা যখন দেহের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখন সে দূর স্থানে থাকিয়াও নানা প্রকার মনঃকল্পিত মূর্ত্তি দেখাইতে পারে। তাঁহার মতে, এই শ্রেণীর প্রদর্শিত মূর্ত্তির নাম আইডোলন (Eidolon) অর্থাৎ আভাসিকা। *

অধ্যাত্মবাদী অর্থাৎ Spiritualist নামে অভিহিত দার্শনিকেরা এবং ভারতীয় ঋষিরাও এবংবিধ অন্তঃসার-শূন্য আভাসিত মূর্ত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না; এবং নিহত ব্যক্তি নিয়তই তাহার হত্যার স্থলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এমনও তাঁহারা বলেন না। কিন্তু যেখানে মূর্ত্তি, মুখ বাঁকাইয়া ও সজীব চক্ষে চাহিয়া, কথা কহে,—অথবা কথা না কহিয়াও, হাত বাড়াইয়া, স্থানবিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে;—কিংবা নিয়মিত প্রণালীতে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নানা ব্যক্তিকে দেখা দিয়া, প্রতিহিংসার পরিতর্পণ ও প্রাণের জ্বালা নির্ব্বাপণ করিতে চেষ্টা পায়, সেখানে আর শুধু প্রতিবিম্ব-কল্পনার স্থল থাকে কোথায়? আমরা আজি পাঠকের নিকট যে মূর্ত্তির কাহিনী লইয়া উপস্থিত হইতেছি, উহা নীরব হইলেও নিষ্পন্দ কিংবা নিষ্ক্রিয় নহে। উহা নির্জ্জীব, না সজীব, পাঠক নিজে তাহার বিচার করিবেন।

এই প্রবন্ধে প্রতিহিংসার বাসনাকে একটা প্রবল পার্থিব আকর্ষণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীদিগের মতে প্রতিহিংসা অতি বড় গর্হিত মহাপাতক। যাহারা, পরের রোষে, কিংবা পরের দোষে, প্রাণে নষ্ট হইয়া, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়, এবং পরিশেষে প্রতিহিংসার আশ্রয় লইয়া, পৃথিবীতে ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় বিচরণ করে, তাহারা প্রকৃতই হতভাগ্য জীব। তাহাদিগের কর্ম্মের গতি, মানবজগতে এক এক সময় কি প্রকার লোক-ভয়ঙ্কর পরিণতি প্রাপ্ত হয়, আজিকার কাহিনীটি তাহারই একটি প্রামাণিক ইতিবৃত্ত। কিন্তু প্রতি-

was an intense thought in the mind of some person. That thought was a real energy,—a real force,—quite as real as electricity."—Lecture at Milton Hall, Hawley-crescent, Kentish Town.

* "These apparitions are neither bodies nor souls."

হিংসা দুষ্য ও গর্হিত হইলেও, তাহা হইতে শত সহস্রগুণ অধিকতর দুষ্য ও অধিকতর গর্হিত প্রতিহিংসার প্রবর্ত্তক প্রাথমিক পাপ। যাহারা সুখ-সুপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার প্রাণে প্রতিহিংসার প্রবলবহ্নি জ্বালিয়া দেয়, তাহাদিগের মত দুষ্কৃত হতভাগ্যের ছায়াদর্শনও মনুষ্যের বিপজ্জনক।

আত্মিক কাহিনী।

ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে ডার্‌বি শায়র। চেষ্টারফিল্ড ডার্‌বিশায়রের একটি সমৃদ্ধ নগর। চেষ্টারফিল্ড হইতে ছয় মাইল দূরে 'হার্ডউইক হল' (Hardwick Hall)—অর্থাৎ হার্ডউইক-বংশীয় ভূস্বামিদিগের বাসভবন। 'হার্ডউইক হল' অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। ১৫৮৪ খৃষ্ট অব্দে, ডিবন শায়রের ডিউক কর্ত্তৃক, আমোদময় এলিজাবেথীয় যুগের উৎকৃষ্ট আদর্শ অনুসারে এই অট্টালিকা গঠিত হয়। হার্ডউইক হলের অধিস্বামী ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ব্যারনেট,—সুতরাং পুরুষানুক্রমিক সার্ উপাধি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক। উহার চতুঃপার্শ্বস্থিত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহারই সম্পত্তি।

হার্ডউইক হলের চারিদিকে, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত, ঘন-সন্নিবিষ্ট বিশাল বন। বহু বিস্তৃত ও তরঙ্গায়িত শ্যামল-বন-ভূমির মধ্য স্থলে, সুনীল সাগর-বক্ষে স্বর্ণকান্তি মৈনাকের ন্যায়, উন্নত-শীর্ষ, ঔপাদেয় কারুকার্য্যখচিত, সুবৃহৎ হার্ডউইক হল। যুগযুগান্তদর্শী দেবদারু ও অন্যান্য অতি পুরাতন প্রকাণ্ড তরুরাজি, জড় প্রকৃতির কঠোর সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া হার্ডউইক হলের প্রাচীনত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিল। হার্ডউইক হল, এক সময়ে, উত্তর ইংলণ্ডে, প্রকৃতই একটি দর্শনীয় সামগ্রী এবং শোভা ও সম্পদের উজ্জ্বল চিহ্নস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল।

ইংলণ্ড যখন আত্মদ্রোহে বিধ্বস্ত ও বিড়ম্বিত,—যখন ক্রমওয়েল ইংলণ্ডে জন-সাধারণের অদ্বিতীয় নায়করূপে সর্ব্বত্র সম্পূজিত, সেই সময়ে, সেই লোক-ভয়ঙ্কর হল-হলার দিনে,—কানন-বেষ্টিত হার্ডউইক হলের নিভৃত-কক্ষে ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় অঙ্ক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডের বিপ্লব-বিপন্ন হতভাগ্য নৃপতি প্রথম চার্লস্ (Charles The First) সিংহাসনের আশ্রয় হারাইয়া, কিছু দিন, হার্ডউইক হলের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেন। হার্ডউইকের তদানীন্তন অধিস্বামী, আপনার ক্লেশার্জ্জিত অর্থরাশি, হৃদয়ের শোণিত, এবং হৃদয়ের প্রগাঢ়-স্নেহপুষ্ট ও স্নেহসংবর্দ্ধিত প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রের জীবনটি পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, সমর-ক্ষেত্রে, চার্লসের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে হার্ডউইক হলের অধিপতি অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হন। এমন কি, গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া এবং স্থাবর-সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াও, তিনি প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কুলন করিতে সমর্থ হন নাই। কাল-মাহাত্ম্যে রাজভক্ত ভূস্বামীর এইরূপ প্রাণস্পর্শিনী অকৃত্রিম রাজভক্তিও রাজদণ্ডার্হ গুরুতর অপরাধে পরিণতি পাইল। রাজপক্ষ-

সমর্থনে অস্ত্রধারণ হেতু, ক্রমওয়েলের পার্লিয়ামেণ্ট-সভার বিচারে তিনি প্রভূত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ও একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে, হার্ডউইকের এইরূপ সমৃদ্ধ-ভূস্বামী, অভাবের নিপীড়নে অবসন্ন হইয়া, উদরান্নের জন্যও অন্যদীয় আশ্রয় প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার সঙ্কল্পভঙ্গ হইল না। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রিয় পুণ্যব্রত হইতে এক পদও স্খলিত হইলেন না। এই ঘটনাচক্রের শেষ অঙ্কে ইংলণ্ড যখন রাজরক্তে কলঙ্কিত হইল, তখনও দারিদ্র্য-নিপীড়িত হার্ডউইক, নির্ব্বাসিত ও নিরাশ্রিত রাজকুমার দ্বিতীয় চার্লসের দিকে তাকাইয়া, বজ্রের ন্যায় অটল রহিলেন।

মানুষের আপদ বিপদ চিরস্থায়ি নহে। ইংলণ্ডে আবার রাজ-ভক্তির নূতন জোয়ার বহিল,—রাজশক্তির নূতন পতাকা উড়িল; সুখ-শান্তির সুদিন ফিরিয়া আসিল। কঠোরকর্ম্মা ক্রম্‌ওয়েলের সেই বীর-বিক্রমের কথা অতীত স্মৃতির কুক্ষিস্থ হওয়ার কিছুকাল পরেই, দ্বিতীয় চার্লস্‌ পুনরায় ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হার্ডউইকের ভাগ্যপটেও পরিবর্ত্তন ঘটিল। হার্ডউইকের শোভা ও সম্পদ-সামর্থ্যে, অচিরেই আবার চেষ্টারফিল্ডের ঐ অঞ্চল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ইহাই হার্ডউইক হলের অতি পুরাতন ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। যাঁহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সহজেই এইক্ষণ স্থানটার সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক যুগের বহুকাল পরে,—অর্থাৎ অধুনাতন ইতিহাসের যে সময়ে আমাদিগের এই ছায়া-দর্শন-কাহিনীর সূচনামাত্র সংঘটিত হয়, সে সময়ে, হার্ড উইকের সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। হার্ডউইক হল তখন পূর্ণ গৌরবে গৌরবান্বিত। তখন একটি হৃষ্টদেহ বলিষ্ঠ যুবক হার্ডউইক হলের লর্ড বা অধিস্বামী। যুবকের নাম সার্‌ রাল্‌ফ হার্ডউইক (Sir Ralph Hardwick)। সার্‌ রাল্‌ফ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় রাজরাজেশ্বর ও ধনকুবেরগণও বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, ভদ্রলোকের মধ্যে বসিবার স্থান পান না। তাই সার্‌ রাল্‌ফ রীতিমত শিক্ষিত এবং তাঁহার অমল স্বভাবে সম্পদ-সম্ভ্রমের সহিত জ্ঞান-গৌরবও আশাতীত রূপে সম্মিলিত। কিন্তু এত গুণ সত্বেও সার্‌ রাল্‌ফ হার্ডউইক সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্তয়ের দুই একটি চিরপরিচিত দোষের সংস্পর্শ হইতে সর্ব্বাংশে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি, এক দিকে যেমন, বংশগত গুণাবলীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, অন্য দিকে আবার বংশানুক্রমিক দোষ-সমূহেরও তেমনই আধার স্বরূপ ছিলেন।

ভোজনে তাঁহার প্রতিনিয়তই অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার প্রখর জঠরানল কোন দিনও অল্প আহুতিতে তৃপ্তি লাভ করিত না। পানেও তাঁহার ভীষ্মের পিপাসা,—ভৃঙ্গারের প্রমত্ত ধারায়ও উহা নির্ব্বাপিত হইতে চাহিত না। সার্‌ রাল্‌ফ, পিতামহের ন্যায় মৃগয়ামত্ত,—অসমসাহস, অব্যর্থসন্ধান, অথচ দৃক্‌পাতশূন্য। তিনি অশ্ব-বিলাসেও এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত। তাঁহার অশ্বগৃহ অসংখ্য বাজীরাজিতে সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিত। নিউমার্কেট ও ইপ্‌সমের ঘোড়দৌড়ে সার রাল্‌ফের জয় পরাজয়েই দর্শকের চক্ষু সমধিক আকৃষ্ট হইত। হার্ডউইকের বিশাল অরণ্যানীরক্ষিত শিকারসমূহ, এবং তাঁহার দংষ্ট্রাকরাল, ব্যাঘ্রবিক্রম ও নির্ভীক শিকারী-কুক্কুরের দল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। পক্ষান্তরে, অভ্যাগত অতিথির জন্য হার্ডউইক হল, সকল সময়েই অবারিত-দ্বার। অতিথিবৎসল সার্‌ রাল্‌ফ মুক্তহস্তে ও মুক্তপ্রাণে অতিথিসৎকার করিতেন এবং অতিথির মধ্যে যাহারা অতি দীন-দুঃখী, তিনি তাহাদিগকেও অন্তরের সহিত সম্মান করিতে ভালবাসিতেন। দোষ ও গুণের এইরূপ সংমিশ্রণে, প্রতাপ-প্রতিপত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদ-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয় হার্ডউইক হল, নানাবিধ অভ্যাগতের নিত্যসমাগমে, উৎসব-বাটিকার ন্যায় অষ্ট প্রহর উৎসবময় থাকিত, এবং সার্‌ রাল্‌ফ হার্ডউইকের, নাম ও যশ দেশের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইত।

সার্‌ রাল্‌ফ দার পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিংশৎ বৎসর। তদীয় পুত্রবৎসলা জননী তখনও জীবিতা আছেন। রাল্‌ফের নবোঢ়া রমণী যেমন রূপসী, তেমনই নানা গুণে গুণবতী। হার্ডউইকের ঊর্ম্ম্য-শোভা নবীনা গৃহস্বামিনীর চারিত্র-

সৌন্দর্য্যে দ্বিগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। জননী, সুন্দরী ও সর্ব্বাংশে সুশীলা পুত্রবধূ দর্শনে, কৃতার্থ হইলেন। ঈদৃশ পত্নী লাভে, ভাগ্যবান্‌ সার্‌ রাল্‌ফও আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করিলেন।

যথাসময়ে সার্‌ রাল্‌ফের একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। চিরন্তন রীতি অনুসারে এই পুত্রই হার্ডউইকের ভাবী প্রভু। সমগ্র হার্ডউইক ইষ্টাট উচ্ছ্বসিত প্রাণে নবজাত প্রভুতনয়ের সংবর্দ্ধনা করিল। পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরিচয়ে শিশুর নাম রাখা হইল,—রাল্‌ফ এস্‌সিটন হার্ডউইক (Ralph Assheton Hardwick)। সার্‌ রাল্‌ফ পুত্রলাভে সুখী; হার্ডউইক হল আমোদে উৎফুল্ল। আমোদ ও আনন্দে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। লেডী রাল্‌ফ পুনরায় সন্তানবতী হইলেন। এবার একটি কন্যা জন্মিল। কিন্তু স্বামিসোহাগিনীর সুকুমার দেহ কঠোর প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। হার্ডউইকের গৃহলক্ষ্মী, হায় বুঝি চিরকালের তরে, অকালে ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু এস্‌সিটন এক প্রকার অনাথ, ও হার্ডউইক হল অন্ধকার হইল। অকস্মাৎ সার্‌ রাল্‌ফের বুকে শত বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাতৃহীন শিশুর এখন পিতাই একমাত্র স্নেহের আশ্রয় ও জীবনের অবলম্ব। সার্‌ রাল্‌ফ এক হাতে অশ্রুসংবরণ করিলেন, আর এক হাতে মাতৃহীন শিশুকে বুকে আবরিয়া লইলেন।

অনেক দিন হইল, বৃদ্ধ পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন। জননী জীবিতা ছিলেন।

তিনিও, যেন স্নেহময়ী পুত্রবধূর সঙ্গে সঙ্গে, পরলোকবাসিনী হইলেন। শোকাতুর সার্ রাল্ফ বস্তুতঃই চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সে রমণীয় প্রাসাদ এখন শূন্য শ্মশান;—প্রাণ, মন ও হৃদয় সমস্তই যেন শূন্যময়। বিস্তৃত ভূসম্পত্তি, সুবিস্তৃত গৃহ, প্রাঙ্গণ ও প্রাবরণ-বনভূমি, অনুগত সেবক, আজ্ঞাবাহী পরিচারক ও আশ্রিত পরিজন, কিছুরই অভাব নাই। লোক আসিতেছে,লোক আদৃত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। অভ্যাগত ও অতিথির সৎকার ও অভ্যর্থনায়, হার্ডউইক হল, অহোরাত্র উৎসবগৃহের ন্যায় সজ্জিত ও মুখরিত হইতেছে। কিন্তু সার্ রাল্ফ, তথাপি, আপনাতে আপনি, একাকী ও অসহায়, এবং তাঁহার পক্ষে সমস্তই যেন নীরব, নিস্পন্দ ও নির্জীব। ক্রমে এই অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে পুনরায় দার পরিগ্রহে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু বিবাহার্থিনীদিগের মধ্যে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপা রমণী কোথায়? তিনি যে দেবস্বভাবা অবলাকে অকালে সমাধির গ্রাসে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহার অদৃষ্টে আবার তাদৃশ জন ঘটিবে কি?

সার্ জারভেজ মুর (Sir Gervase Moore) হার্ডউইক হলের সন্নিহিত প্রতিবেশী। সার্ জারভেজ মুর সদ্বংশজাত ভদ্রলোক,—সম্ভ্রান্ত নাইট, অথচ নিঃস্ব। তাঁহার অবস্থা যে এক সময়ে খুবই সচ্ছল ছিল 'নাইট' উপাধিই উহার পরিচয়। তাঁহার গৃহটিও, এক দিন ধনীর বিলাস-প্রাসাদের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়া, হার্ডউইক হলের অতিথিদিগেরও নয়ন আকর্ষণে সমর্থ ছিল। কিন্তু এক্ষণ উহা ছাড়া বাড়ীর মত অযত্ন-রক্ষিত, ভগ্নদশাগ্রস্ত ও যেন বিষাদ-মলিন।

সার্ জারভেজ মুর অপরিণামদর্শী ও অমিতব্যয়ী। তিনি, একটু অধিক বয়সে, এক রমণীর সহিত বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হন। পত্নী যৌতুকস্বরূপ বিস্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুরেরও পৈতৃক সম্পত্তি প্রচুর ছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, দারিদ্র্যদশাগ্রস্ত হইয়া, নানা প্রকারে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মুর নিজে অপব্যয়ী, পত্নী ততোধিক উচ্ছৃঙ্খল। পত্নী, যেন পতির সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াই, ব্যয়ের নিত্য নূতন প্রকার উদ্ভাবন করিতেন; এবং যে সূত্রে যাহা কিছু সঞ্চিত হইত, তাহাই সুখ-লালসার প্রবল ঝটিকায় উড়াইয়া দিতেন। এইরূপ উন্মত্ত অপব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও ক্ষয় পায়, ক্ষুদ্রবল মুরের সম্পত্তি আর কত বড় কথা। পতিপত্নীর অনুচিত ব্যবহারে, অচিরেই তাঁহাদিগের গৌরবের পসার দুর্গতির গ্রাসে পড়িয়া পড়িল; মুরপরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রাম্য লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

লেডী মুর এক সময়ে রূপবতী ছিলেন। অনেক দিন হইল, জীবনের সে বসন্ত অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বার্থই এইক্ষণ তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, কাপট্য তাঁহার অলঙ্কার। তিনি চিরদিনই ক্রূদ্ধস্বভাবা,—ক্রূরমতি, কর্কশ-প্রকৃতি, মদ-গর্ব্বিতা এবং কঠোর-

চনা। অর্থে তাঁহার অপরিসীম লোভ, অথচ অর্থের সদ্ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কোন্ সখের জিনিষটি,—কোন্ বিলাস-সামগ্রীটুকু, কিরূপে—কত অর্থ ব্যয়ে, কোথা হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাই তিনি জানিতেন, ইহাই বুঝিতেন, এবং শুধু ইহাই তিনি বিরলে বসিয়া ভাবিতেন।

মুরের গৃহে একটি মাত্র কন্যা। কন্যার নাম ইথেল মুর (Ethel Moore)। ইথেল যুবতী ও অনূঢ়া। ইথেলের স্ফুরন্ত রূপরাশিই ইদানীং দুঃখতমসাবৃত মুর-গৃহের আলোক-স্বরূপ। ইথেল মুরের মোহময় রূপের এই এক বিশেষ লক্ষণ যে, উহা, আগে দর্শকের চক্ষু,—তার-পর, অবস্থাবিশেষে,—দর্শকের মন ও প্রাণ পর্য্যন্ত টানিয়া লয়। সে রূপে জ্যোৎস্নার শীতল মাধুরী,—জ্যোৎস্নাশীতল শেফালিকুসুমের হৃদয়হারিণী আকর্ষণী নাই। উহাতে চক্ষু জুড়ায় না,—ঝল্‌সিয়া যায়। কিন্তু, সময়বিশেষে, ঐ রূপই আবার, স্নেহময় সরলতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যুবতীর মুখশ্রীতে কেমন একটু বিচিত্র রঙ্ ফলায়।

এই সময়ে, যুবতী ইথেল মুর, এক দিন, অকস্মাৎ বন-বিহার-সুখ-ভ্রান্ত বিপত্নিক সার্ রাল্ফের নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইল। মোহনচতুরা মুর-তনয়া, যেন প্রথম দৃষ্টিতেই রাল্ফের মনোগত ভাব বুঝিতে পাইয়া, আপনার প্রখর রূপের তীব্র ছটার উপর প্রশান্ত মাধুরীর সেই সাময়িক রঙ্ ফলাইয়া লইল। রাল্ফ যুবতীর কমনীয়কান্তি তৃষিত-নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন; এবং দর্শনমাত্রই রূপসীর চরণপ্রান্তে হৃদয়, মন ও প্রাণ বাঁধা দিয়া, মন্ত্রমুগ্ধের মত, কি ভাবিতে ভাবিতে, গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সার্ জারভেজ মুর ও লেডী মুর যাহা কখনও ভাবেন নাই,—স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করেন নাই, আজি তাঁহাদিগের শুভাদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। দুঃখনিপীড়িত মুরের দীননিকেতনে হার্ডউইকের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইলেন, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। মুর-দম্পতীর প্রাণে আনন্দ আর ধরে না। উচ্চবংশসম্ভূত ও অমিত-ধন-স্বামীর উপরে কন্যার এই আকস্মিক আধিপত্য সার্ জারভেজ মুরের নিকট আশাতীত সম্পদ্ বলিয়া বোধ হইল। তিনি এই সম্বন্ধ-সূচনায় আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিলেন; এবং লেডী মুরও রাল্ফের প্রজ্বলিত প্রণয়বহ্নিতে অতি সাবধানে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, নিরানন্দ হার্ডউইক হল অচিরেই আবার উৎসবময় হইল। সার্ রাল্ফ হার্ডউইক, কএকটি দিন যাইতে না যাইতেই, ইথেল মুরের পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার শূন্য গৃহ পূর্ণ হইল। হার্ডউইক হল ফিরিয়া গৃহকর্ত্রী লাভ করিল। কিন্তু মাতৃহীন শিশু এস্‌সিটন ফিরিয়া মা পাইল কি?

রূপাভিমানিনী ইথেল এক্ষণ লেডী রাল্ফ হার্ডউইক রূপে, রাজরাণীর প্রতাপে, হার্ডউইক হলের গৃহস্বামিনী হইয়া বসিলেন। পরিচারক ও পরিজনেরা সকলেই তাঁহার আজ্ঞাধীন। তাঁহার সুদীর্ঘ ও সুপুষ্ট দেহ, সগর্ব্ব দৃষ্টি ও

সাড়ম্বর ব্যবহারে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত। তিনি, অচিরেই, হার্ডউইক হলে, প্রদর্শনের একটি উপাদেয় বস্তু অথবা ধনি-গৃহের একটি জীবন্ত গৃহসামগ্রীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে সার্ রাল্‌ফের আভিজাত্য অভিমান, প্রথমতঃ কিছুকাল, কোন কোন সময়ে, কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিত বটে ; কিন্তু তাঁহার নিষ্ঠুর দৃষ্টি, নীরস সম্ভাষণ, এবং প্রীতিস্পর্শ-বর্জ্জিত শূন্যগর্ভ আড়ম্বর সার্ রাল্‌ফেরও শেষে ভাল লাগিত না। রাল্‌ফের হৃদয়ও ক্রমে শুষ্ক হইয়া উঠিল। প্রণয়ের প্রাণে নিদারুণ আঘাত লাগিল। সার্ রাল্‌ফ সংসারসুখে উদাসীন, অনুৎসাহ ও অকালবার্দ্ধক্যে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি কাঞ্চনজ্ঞানে কাচ ক্রয় করিয়াছেন, এবং পুষ্পমালা ভ্রমে কাঠের কণ্ঠী গলায় পরিয়াছেন, ইহা বিবাহের দু দিন পরেই বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়া, প্রাণে নিরাশ ও সমস্তবিষয়েই উদ্যমবিহীন হইলেন।

লেডী জারভেজ মুরের ন্যায় মাতার গর্ভে ইথেল্ মুরের মত কন্যার উৎপত্তিই স্বাভাবিক। প্রীতি, পবিত্রতা, প্রফুল্লতা ও স্নিগ্ধ মৃদুতা প্রভৃতি কমনীয় গুণরাজি সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও, এই গুলিই নারীজাতির প্রকৃত সম্পদ্ ও স্পৃহণীয় আভরণ। কিন্তু মুর-মহিলার ন্যায় জননীর গর্ভে জন্মিয়া,এবং তাদৃশ মাতার যত্নে ও তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করিয়া, তনয়ার এ অংশে ভাগ্যবতী না হওয়া বিস্ময়ের কথা নহে। কন্যা অল্পকালেই, স্বার্থপরতা ক্রূরতা ও দম্ভমাৎসর্য্য প্রভৃতি মাতৃসম্পদে পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে লাগিলেন। কন্যার উর্ব্বর প্রাণে মাতৃপ্রদত্ত উপদেশের এক কণিকাও ব্যর্থ বা নিষ্ফল হয় নাই। ছল, চাতুরী, কাপট্য ও মনোগত-ভাব-গোপনে কন্যা এত দূর কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য লাভ করিলেন যে, মাও সময় সময় মেয়ের কাছে হারি মানিতে বাধ্য হইলেন। ঈদৃশ সর্পস্বভাবা রমণীর সংসর্গ সরলপ্রাণ ও উদারহৃদয় সার্ রাল্‌ফের হৃদয়ে সুখকর হইবে কেন ?

স্বর্গগতা লেডী হার্ডউইকের পুত্র রাল্‌ফ এস্‌সিটন এক্ষণ চারি বৎসরের শিশু। ধনি-সন্তানেরা এক অংশে বড়ই দুর্ভাগ্য। তাঁহাদের শিক্ষার পথে সর্ব্বত্রই বহু কণ্টক ও বিবিধ অন্তরায়। অত বড় ইষ্টাটের ভাবী মালিক, শিশু হইলেও সোহাগের পুতুল, খোকা হইলেও প্রভু। কিন্তু, সার্ রাল্‌ফ এ অংশে বিশেষ সতর্ক ছিলেন বলিয়া, বালকের প্রকৃতিতে শৈশব-বিকারের কোনরূপ মন্দ ফল ফলিতে পারে নাই। অমন প্রতিকূল অবস্থা ও মারাত্মক উপসর্গ সত্ত্বেও, শিশু অল্প বয়সে অকালপক্ক প্রভু সাজিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। বয়োবৃদ্ধি সহকারে এস্‌সিটনের প্রকৃতিতে বিবিধ স্পৃহণীয় গুণের অঙ্কুর-উদ্গম হইতে লাগিল।

এস্‌সিটনের যখন চারি বৎসর মাত্র বয়স, তখন নবীনা লেডী হার্ডউইক একটি সুরূপ পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। সার্ রাল্‌ফ নবকুমার লাভে প্রীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন

পত্নীর পাষাণ প্রাণ, হয় ত এখন, সন্তান-বাৎসল্যের মধুর সংস্পর্শে, আপনিই স্নেহের উৎসে পরিণত হইবে ; এবং তিনিও, সেই স্থানে, তাঁহার জ্বালাদগ্ধ জীবনের জন্য, একটুকু সুখ-শীতল আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। কিন্তু রাল্‌ফের এ আশাও নৈরাশ্যের আঁধারে ডুবিল। পত্নী যেমন ছিলেন, তেমনই রহিলেন। পাষাণ গলিল না। শুষ্ককাষ্ঠে ফুল ফুটিল না।

সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক অতঃপর পত্নীর প্রেমে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া, পুত্রদ্বয়ের সুশিক্ষার প্রতি, বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দুটি পুত্রই প্রিয়দর্শন ও কান্তিমান্। কিন্তু জ্যেষ্ঠের মুখমাধুর্য্যে হার্ডউইক বংশের চিহ্ন যেরূপ সুস্পষ্ট অঙ্কিত, দ্বিতীয় পুত্রে তাহা নাই। জ্যেষ্ঠ সর্ব্বাবয়বে হার্ডউইক। কনিষ্ঠ অর্দ্ধ হার্ডউইক, অর্দ্ধমুর। কনিষ্ঠের মুখশ্রীতে মাতৃমূর্ত্তিরই সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব, এবং উহার চক্ষের চাহনি ও অধরের হাসিতেও মুরবংশেরই সাদৃশ্য দেখিয়া সার্ রাল্‌ফ মনে ক্লিষ্ট রহিলেন। হার্ডউইক হলের লোকেরাও তত প্রীতি লাভ করিতে পারিল না। যাহা হউক, তথাপি সার্ রাল্‌ফ পুত্রদ্বয়ে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন ; এবং ভাই দুটির মধ্যে যাহাতে কোন অংশে কোনরূপ তারতম্য বা পার্থক্য না ঘটে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বৈমাত্র-ভ্রাতৃদ্বয় এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উভয়ের একত্র অবস্থান, একত্র ভোজন, একজাতীয় ও একই রকমের ঘোটকে বিহার-ভ্রমণ, এবং একই শিক্ষকের উপদেশে শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থাপিত হইল। বসন, ভূষণ, শয়ন, বিচরণ, আদর ও আবদার, কোন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য রহিল না।

উভয়ের মধ্যে দ্রষ্টব্যে কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও, পরিবারস্থ সকলেরই চিত্তে, মূলে এক বিষয়ে অতি গুরুতর পার্থক্য। সে পার্থক্য এই যে, এক জন বিস্তৃত হার্ডউইক সম্পত্তির অদ্বিতীয় ভাবী উত্তরাধিকারী ; আর এক জন ইষ্টাটের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। এক জন কিছু দিন পরে রাজার মত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ভূস্বামী হইবেন ; আর এক জন ব্যাগ ও ব্যেগেজ বগলে লইয়া, পৃথিবীর কোথাও খাটিয়া খাইবেন। এই পার্থক্য সার্ রাল্‌ফ কোন দিনও ভাবেন নাই, অন্যেরা জানিয়াও ইহা লক্ষ্য করে নাই। ইহা প্রথম বুঝিলেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার মাতামহী লেডী মুর। শেষে বুঝিতে পাইলেন, মাতা মুর-তনয়া,—অর্থাৎ লেডী হার্ডউইক। লেডী মুর, এক দিন, তনয়াকে এমন ভাবে এই পার্থক্য বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার মুখের প্রত্যেকটি শব্দ লেডী হার্ডউইকের হাড়ে হাড়ে যেন গাঁথা হইয়া রহিল। মায়ে ঝিয়ে নিভৃতে অনেকক্ষণ কানাকানি ও অনেক কথা হইল। কি কথা হইল, কি যুক্তি বা মন্তব্য অবধারিত হইয়া রহিল, কেহ তাহা জানিল না। লোকে এইমাত্র দেখিল ও বুঝিল,—সার্ রাল্‌ফের নবীনা

পত্নী যখন মায়ের মন্ত্রণাস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখচ্ছবি যার-পর-নাই গম্ভীর, অথচ মলিন,—চক্ষের দৃষ্টি এমন তীব্র ও ভয়ঙ্কর যে, দেখিলেই চিত্ত চমকিত হইয়া উঠে।

এদিকে রাল্‌ফ এস্‌সিটন ক্রমে বয়সে বাড়িতে লাগিল,বিমাতাও তাহার প্রতি ক্রমে একটু বেশী বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনলের সৃষ্টি হইল, কিন্তু জ্বলিল না;—উহা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে প্রধূমিত অবস্থায় রহিয়া গেল। কালক্রমে কুমারদ্বয় কিশোর-কাল অতিক্রম করিল। মা তখনও, যেন সময়ের প্রতীক্ষায়, ধীর, স্থির ও প্রশান্তমূর্ত্তি।

কিছু দিন পরে, লেডী জারভেজ মুর লোকান্তরবাসিনী হইলেন। সার্ রাল্‌ফের বৃদ্ধ শ্বশুর, সার্ জারভেজ মুরও পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। অন্য এক জারভেজ মুর গৃহের মালিক হইয়া বসিলেন। লেডী রাল্‌ফ, এই সময়ের মধ্যে আরও কএকটি সন্তানের মা হইয়া বর্ষীয়সী মহিলার সম্মান পাইতে লাগিলেন। ভাল ও মন্দ এত ঘটনা ঘটিল, এত পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু তাঁহার প্রাণের আগুন নিবিল কি? লুক্কায়িত কাল-সর্পের সে বিষদন্ত খসিয়া পড়িল কি?

সার্ রাল্‌ফের সহিত তাহার পত্নীর মৌখিক কোনরূপ অসদ্ভাব ছিল না। দুইয়ের প্রণয় ছিল কি না, তাহা বাহিরে কেহ বুঝিত না। পত্নী, গম্ভীর মূর্ত্তিতে, মুখ ভার করিয়া, পতির সম্মুখীন হইতেন; পতিও, সেই গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াই, গৃহস্থালীর কার্য্য ব্যবস্থা করিতেন। সার্ রাল্‌ফের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও অনুরাগ, সমস্তই ক্রমে পরিবর্দ্ধমান জ্যেষ্ঠ পুত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িল।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্যেষ্ঠ এস্‌সিটন নানাবিধ উচ্চ গুণের আধার হইল। সে আকারে যেমন প্রিয়-দর্শন,স্বভাবেও তেমনই সর্ব্বজনের প্রিয়কারী;—পিতার অনুগত ও আজ্ঞাধীন। বিমাতার বিষোদ্গারে সময়ে সময়ে জ্বালাতন হইয়াও এস্‌সিটন দ্রষ্টব্য-ব্যবহারে বিকারশূন্য। বৈমাত্র ভ্রাতা ফিলিপ-জারভেজ-হার্ডউইক (Philip Gervage Hardwick) তাহার সহোদর-প্রতিম ও প্রাণাধিক প্রিয়। সে কখনও ভৃত্য ও পরিজনের প্রতি কঠোর ব্যবহার করে না। সকলেই তাহাকে ভালবাসে, সেও সকলকেই প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে। বস্তুতঃ, রাল্‌ফ এস্‌সিটন, বিশ্রুতনামা হার্ডউইক বংশের উপযুক্ত বংশধর রূপে, ইদানীং সর্ব্বত্রই সম্মানিত। বৃদ্ধ সার্ রাল্‌ফ এতকাল সাংসারিক সুখে নিরাশ রহিয়া থাকিলেও সম্প্রতি উপযুক্ত পুত্রের অমায়িক আচরণে আশায় উৎফুল্ল। পুত্রের বয়স বিংশতি বৎসরের সমীপবর্ত্তি। আর দুটি বৎসর কাটিয়া গেলেই, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও সম্পত্তির অধিকারী হইবার যোগ্য হইবে। ভগবান্ উহার মঙ্গল করিলে, তিনি নিশ্চয়ই পুত্রকে পৈতৃক সম্পত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া চক্ষু বুজিতে পারিবেন।

কিন্তু হায়! তাঁহার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। সার্ রাল্‌ফ বয়োগণনায় তেমন বৃদ্ধ না হইয়া থাকিলেও, রোগজনিত অকালবার্দ্ধক্যে শরীরে নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ। ইহার উপরে, ঘটনাক্রমে শিকার-ক্ষেত্রে একটা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এই যে শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিলেন না। তিনি, অন্তিম সময়ে, প্রিয়তম পুত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে, ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। কনিষ্ঠকে স্নেহরুদ্ধ কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়া গেলেন,—"বাছা, তুমি সর্ব্বাংশে তোমার জ্যেষ্ঠের অনুরূপ ও আজ্ঞাবহ হইও।"

সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক স্বর্গগত। দুই এক মাস পরেই, যুবক এস্‌সিটন, সার্ রাল্‌ফ এস্‌সিটন রূপে, হার্ডউইক-সম্পত্তির অধিকারী হইবে। সার্ রাল্‌ফ হার্ডউইক পুত্রের শৈশবসময়েই তাহার ভাবী পত্নী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এস্‌সিটনের বয়ঃপ্রাপ্তি ও পরিণয়-উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা সার্ রাল্‌ফেরই শেষ আজ্ঞা। পরিজনেরা শোকাভিভূত হইলেও স্বর্গগত প্রভুর আজ্ঞাবহ। তিনি স্বয়ং এস্‌সিটনের বিবাহের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। কে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করিবে? তাই সকলে, আসন্ন উৎসবের আশায় ও উৎসাহে, আমোদবিহ্বল না হইয়াও, উৎসুক। উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে। পূর্ব্বনির্ব্বাচিত পাত্রী মিস্‌ফিলিশিয়া উইন গ্রোভ, (Miss Felicia Wingrove) তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতের সমভিব্যাহারে, আজি কএক দিন হইল, অভ্যাগত রূপে, হার্ডউইক হলে উপস্থিত হইয়াছেন।

মিস্ ফিলিশিয়া সুন্দরী যুবতী। তাঁহার কমনীয়কান্তি প্রস্ফুট গোলাপের ন্যায় মনোহারিণী। তাঁহার নবোদ্গত প্রীতির নির্ম্মল উৎসস্বরূপ নয়ন-যুগলের সরল দৃষ্টি, ছাঁচে কাটা নিটোল ললাট, এবং নয়ন-হারি অধর-প্রান্তে সলজ্জ হাসির অর্দ্ধবিকশিত মাধুরী, যে দেখিল, সেই প্রীত ও মোহিত হইল। সুন্দরী ফিলিশিয়ার মৃদু-মধুর বিনীত ব্যবহার এবং অকৃত্রিম সৌজন্য ও শিষ্টাচার দর্শনে, হার্ডউইক হলের সকলেই তাঁহাকে উহার উপযুক্ত গৃহ-স্বামিনী জ্ঞানে সাদরে ও সসম্ভ্রমে নমস্কার করিল। ফিলিশিয়ার পিতা স্বর্গগত সার্ রাল্‌ফের অতি পুরাতন সুহৃৎ। মিস্ ফিলিশিয়া যে সময়ে একটি সুগঠিত রজত-পুত্তলিকার ন্যায় ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে শৈশব-দোলায় দোলায়িত, সেই সময়ই, সার্ রাল্‌ফ, তাঁহার সহিত স্বীয় পুত্র রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। মিস্ ফিলিশিয়া এই হিসাবে এক প্রকার বাগ্দত্তা। ফিলিশিয়া পিতৃপক্ষ হইতেও বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী।

গ্রীষ্মকাল। অপরাহ্ণ। মৃদু মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সায়াহ্ণ-কিরণ হার্ডউইক হলের সুবিস্তৃত কুসুম-উদ্যানে তরল সোনার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। হার্ডউইক হলের দ্বিতল-গৃহের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে, বাতায়ন-পার্শ্বে একটি প্রৌঢ়া রমণী উপবিষ্টা।

রমণীর বয়স প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। প্রগল্‌ভ রূপের প্রখর প্রভা এখনও নিস্তেজ নহে। রমণীর প্রদীপ্ত নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উহা ডাহিনে বামে বৃক্ষবহুল উদ্যানের বিশাল-বিস্তারে বিচরণ করিতেছে না। রমণী একটি যুবক ও যুবতীর গতিবিধি, স্নেহশূন্য নীরস-নেত্রে, লুব্ধা মার্জ্জারীর মত, লুক্কায়িত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যুবক ও যুবতী, বিশ্রব্ধ আলাপে আত্মবিস্মৃতবৎ, পুষ্পোদ্যানের এক নির্জ্জন বর্ত্মে ধীরে ধীরে হাটিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা ক্রমে বাতায়নের নিম্ন দেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। রমণী ভাল করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন, তাহাদের কথা শুনিলেন। নিদাঘ-সমীর তাহাদের কল-কণ্ঠের মৃদুধ্বনি রমণীর উৎসুক কর্ণে বহিয়া লইয়া গেল। এই রমণী আর কেহ নহেন,—সার্ রাল্‌ফের বিধবা পত্নী—লেডী হার্ডউইক,—মুর-তনয়া ইথেল। যুবক তাঁহারই গর্ভজাত পুত্র, রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বৈমাত্র ভ্রাতা ফিলিপ। যুবতী রাল্‌ফ এস্‌সিটনের বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নী ফিলিশিয়া উইনগ্রোভ।

লেডী রাল্‌ফ মুখভঙ্গিসহকারে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন,—"মন্ত্রণা বিফল হইবে না। ঔষধে প্রায় ধরিয়াছে। এই ত এরা দুটি। আমার কর্ম্মারম্ভের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। যা হউক,আমার পথ আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। হতভাগ্য ফিলিপের প্রাণে যদি প্রকৃতই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা কিংবা উচ্চ আশা থাকে, এবং তাহাতে যদি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বিন্দুমাত্রও সন্ধুক্ষণ করান যায়, তাহা হইলে আর যায় কোথায়?" বলিতে বলিতে লেডী হার্ডউইক ব্যঙ্গ-বিকৃত স্বরে ক্ষণকাল হাসিলেন।

পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে কার যেন পদ-শব্দ? ফিলিপের নয় কি? লেডী হার্ডউইক ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—হা—ফিলিপই বটে। অমনি মৃগয়াবেশে সজ্জিত একটি বলিষ্ঠ যুবা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—"ফিলিপ!" মুহূর্ত্ত পরে, একটু উচ্ছ্বসিত অথচ স্নেহযুক্ত কণ্ঠে, পুনরপি কহিলেন,—"ফিলিপ-জারভেজ-হার্ডউইক!"

ফিলিপ কহিল,—"মা এই যে আমি।" লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—"তুমি যদি ফিলিপ জারভেজ হার্ডউইক, তাহা হইলে, ঐ দিক্ পানে চাহিয়া দেখ ত।" এই বলিয়া বাগানের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

ফিলিপ মাতার আজ্ঞা পালন করিল। সে বাতায়নের নিকটে গেল; বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিল; এবং সহসা শোণিত-সঞ্চারে আরক্তগণ্ড হইয়া, অবনত মুখে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

মা কহিলেন,—"ঐ যুবতীকে, তুমি অবশ্যই জান।

ফিলিপ কহিল,—"হা জানি। অনন্ত দিবার আলোক অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর প্রভা,—দেবপ্রভাময়ী ঊষা অপেক্ষাও অধিকতর মনোহারিণী ঐ যুবতীকে কে না জানে মা?—মা, আমি পাগলের মত হইয়াছি; আমি

উহাকে ভালবাসি। কিন্তু সে কথা উহার নিকট মুখ ফুটিয়া কহিতে সাহস পাই না। আমি এই মাত্র উহার নিকট অস্ফুট কৌশলে যে প্রকার দয়া ভিক্ষা করিলাম, তৎসম্পর্কে ইহার মুখে অনুকূল উত্তর না পাইলে, আমি স্থির থাকিতে পারিব না; নিশ্চয়ই পাগল হইব, না হয় ত মা প্রাণে মরিব।"

লেডী রাল্‌ফ কহিলেন,—"তুমি কি শুন নাই বাছা, ও অচিরেই তোমার বৈমাত্র ভ্রাতার পত্নী হইবে। যুবতী তাহার জন্য ত রীতিমত বাগ্‌দত্তা হইয়া রহিয়াছে। তুমি অভাগিনীর ভিখারী পুত্র। তোমার আর আশা কি? তুমি মনের মত উত্তর পাইবে কি না, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ।"

ফিলিপ কহিল,—"কেন, আমি কি ইহার প্রতিরোধে অসমর্থ? প্রতিরোধ করিতে,"—

মাতা হঠাৎ বাধা দিয়া, একটু হাসিয়া কহিলেন,—"কি—তুমি কি তবে বলপ্রয়োগ করিতে চাহ?"

ফিলিপ বলিল,—"আবশ্যক হইলে তাহাও করিব। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার নিকট যখন যাহা শুনিয়াছি, তাহার এক বর্ণও আমি ভুলি নাই।"

মাতা বলিলেন,—"তুমি তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছ কি?"

ফিলিপ কহিল,—"কাহাকে?—আমার বৈমাত্র ভ্রাতাকে নয়?—তাহাকে বুঝিতে আর চিনিতে কি এখনও বাকি আছে?"

মাতা একটুকু ক্লিষ্ট কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—"না—না—তুমি তাহাকে এখনও ভাল করিয়া চিনিতে পার নাই। তুমি যাহা ভাবিতেছ, শুধু তাহাই নহে। সে তাহা অপেক্ষাও অনেক বড়।"

ফিলিপ যেন কথাটার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়াই কহিল,—"বড়!—বড় কোন্ অংশে?"

লেডী হার্ডউইক বলিলেন,—"তবে কি তুমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ?"

ফিলিপ বলিল,—"সমস্ত কি—মা, আমি কোন্ কথা ভুলিয়া গিয়াছি?"

লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—"রাজপ্রাসাদের ন্যায় এই বিরাট অট্টালিকা, বিস্তৃত ভূম্যধিকার, বিপুল সম্পত্তি,—ভিতরে ও বাহিরে দুই চক্ষে যাহা কিছু দেখিতেছ,—ঐ উদ্যান, ঐ বনভূমি, মাঠ, হ্রদ ও নদী, এই সমস্তেরই অদ্বিতীয় অধিপতি সে! হা মূর্খ, এ কথা কি তোমার মনে আছে?"

যুবকের দন্তে দন্তঘর্ষণ ও নিমেষকাল নয়ন-যুগলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গনির্গম হইল। কণ্ঠে, ক্রুদ্ধ অজগর-গর্জ্জনের ন্যায়, নিঃশ্বাস বহিল। যুবক বিকৃত স্বরে কহিল, "হাঁ মনে আছে মা, সব মনে আছে;—এখনই সমস্ত লেঠা মিটাইয়া ফেলিতেছি দেখ।"—"পেওলো (Paolo)—পেওলো কোথায় মা?"

লেডী হার্ডউইক কহিলেন,—"সে অরসিনোর (Orsino) সঙ্গে আছে। গর্ত্ত খনিত হইয়াছে। উহাদিগকে যাহা যাহা করিতে বলা হইয়াছিল, উহারা সমস্তই করিয়াছে। সমস্ত যোগাড়-যন্ত্র ঠিক্ করিয়া উভয়েই উহারা চলিয়া গিয়াছে।"

ফিলিপ সবিস্ময়ে কহিল,—"চলিয়া গিয়াছে !—কোথায় ?"

লেডী হার্ডউইক বিকৃত মুখ-ভঙ্গিসহকারে হাসিয়া কহিলেন,—এখানে অনেকেই উহাদিগকে চিনিত। যেখানে গেলে, উহাদিকে কেহই আর কখনও দেখিতে কিংবা চিনিতে পাইবে না, উহারা সেই স্থানে চলিয়া গিয়াছে।"

ইহার পরে যুবক ফিলিপ কি করিল, কোথায় কি হইল, আর কেহই তাহা জানিতে পাইল না। একটি পুরাতন পরিচারিকা মাত্র গুপ্তভাবে মাতা পুত্রের এই ভয়ঙ্কর কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। যে সময়ে শুনিয়াছিল, সে সময়ে পরিচারিকাও সমস্ত কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া কথাটা আর একটি পরিচারিকার কাছে কানে কানে বলিল। সেও এ হিজিবিজি কথার কিছুই না বুঝিয়া তখনকার জন্য নীরব থাকাই উচিত মনে করিল।

সূর্য্য অস্তগত হইল। ক্রমে হার্ডউইক হল সর্ব্বদুঃখহারিণী যামিনীর নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু ঐ রাত্রিতেই রাল্‌ফ এস্‌সিটন হার্ডউইক অকস্মাৎ অদৃশ্য হইলেন। স্বর্গগত সার্ রাল্‌ফের প্রাণাধিক ও আদরের ধন, হার্ডউইকের ভাবী অবলম্ব, প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ংবদ এস্‌সিটনকে ইহার পরে আর কেহই দেখিতে পাইল না।

এস্‌সিটন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া,—কিছুই না কহিয়া,—এভাবে কোথায় চলিয়া গেলেন,—কি উদ্দেশ্যে এমন করিয়া কোথায় যাইয়া লুকাইলেন, বুঝিতে না পারিয়া, হার্ডউইক প্রদেশের সমস্ত ব্যক্তিই বিস্মিত, উৎকণ্ঠিত ও একান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়িল। পেওলো ও অরসিনো নামক ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়কেও ঐদিন হইতে কেহ আর দেখিতে পাইল না। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে লেডী হার্ডউইক ইটালীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ইটালী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, ঐ দুই ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে আনীত হইয়াছিল। লোকে, স্বভাবতঃই সন্দেহ করিল,—রাল্‌ফ, এস্‌সিটনের আকস্মিক তিরোধানের সহিত, ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের ঐ প্রকার তিরোধানের বিশেষ সম্পর্ক আছে।

দেশ ভরিয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিল। সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভের দল চারি দিকে অনুসন্ধানে বহির্গত হইল। তাহারা বন, গ্রাম, ও নগর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। রাজপুরুষেরা এবং বিমাতা ও বৈমাত্র ভ্রাতা প্রচুর পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন। তথাপি রাল্‌ফ এস্‌সিটন ও ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

ক্রমে আন্দোলনের জল্পনা কল্পনা ও অনুসন্ধানের কল-কল কলরব নীরব হইল। হার্ডউইক হলের উৎকণ্ঠা ও শোকের উচ্ছ্বাসও, ভাবী অধিস্বামীর আদরে ও উপচারে একটুকু প্রশমিত হইয়া আসিল। এস্‌সিটনের বৈমাত্র ভ্রাতা সার্ জারভেজ ফিলিপ হার্ডউইক হলের উত্তরাধিকারী রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। কৃষক, জোতদার, ইষ্টাটের অন্যবিধ প্রজা এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম্য লোকেরা প্রচুর

মদ্যমাংসে তৃপ্তি লাভ করিয়া সার্ জারভেজ ফিলিপের দীর্ঘায়ু কামনা করিতে লাগিল। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়া রহিল যে, সার্ জারভেজ ফিলিপ, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই, হতভাগ্য জ্যেষ্ঠের বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী কুমারী ফিলিশিয়া উইন গ্রোভের পাণিগ্রহণ করিবেন; এবং যে দিন পৈত্রিক আসনে প্রভুরূপে বসিবেন, সেই দিনই, রূপসী ফিলিশিয়াকে, পরিণয়-সূত্রিত ফুলের মালার মত, গলায় দোলাইয়া জীবনে কৃতার্থ হইবেন।

দুঃখের পর সুখ। শোকের পর উৎসব। ভাবী উৎসবের সাড়ম্বর আয়োজনে আবার হার্ডউইক হল ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। কিন্তু,আমোদগৃহের অদূরে পশুপক্ষীর বিলাপধ্বনিজনিত আশঙ্কিত বিষাদের ন্যায়, ইহারই মধ্যে হার্ডউইক হলে কেমন একটা অচিন্তিত বিষাদের ছায়া পড়িল। হার্ডউইক হলের ভৃত্য ও পরিচারকগণ, প্রতিদিন, নিশাসমাগমে, যার-পর-নাই ভীত ও ব্যস্ত হয়; এবং এখানে সেখানে, চুপি চুপি, অতি বড় বিষণ্ণ ও বিপন্নের ন্যায়, কিসের যেন কানাকানি করে। ইহার কারণ কি ? তাহাদিগের মধ্যে অনেকে কর্ম্মত্যাগে প্রস্তুত, তথাপি মধ্যরাত্রে হার্ডউইক হলের কোন কোন স্থানে,—বিশেষতঃ নির্দ্দিষ্ট একটা গেলারীর নিকটে, কিছুতেই যাইতে সম্মত হয় না। পরিজনদিগের এই প্রকার উদ্বিগ্নচিত্ততার মূলে মনঃকল্পনা ছাড়া প্রকৃতও কিছু আছে কি ?

মূলে কিছু না থাকিলে, শুধুই মনগড়া কথা মনুষ্যজীবনের সুখ-শান্তির স্রোতে স্বপ্নেরও অগোচর ও অতি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্ত ঘটাইতে পারে না। কথা গোপনে রহিল না। যাহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য এত যত্ন হইয়াছিল, তাহা যেন ঢাকে ঢোলে বাজিয়া উঠিল। ক্রমে সকলেই জানিতে পাইল, হার্ডউইক হল, কিছুকাল হইতে, ছায়া-মূর্ত্তির নৈশ বিচরণে, একটু বেশী উৎপীড়িত হইতেছে; ওখানে মনুষ্যের বসতি কঠিন। কেহ কেহ অবশ্য অবিশ্বাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল। যাহারা না দেখিয়াও বিশ্বাস করিল, কিংবা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিল, তাহারা যার-পর-নাই ভীত ও সঙ্কুচিত হইল। ছায়া-মূর্ত্তির দর্শন ও উৎপীড়ন প্রাসাদের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ নহে। হল ও হলের বহিঃস্থিত উদ্যান ও বনভূমি উভয়ত্রই অতি ভয়াবহ ও অদ্ভুত দৃশ্য লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। বাড়ীর ভিতরে নিশীথ-সময়ে, লম্বিত-পরিচ্ছদ ও শ্মশ্রুবিমণ্ডিত বিকটদৃশ্য দুটি ছায়ামূর্ত্তি প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত। উহারা কাহাকেও কিছু বলিত না বটে; কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত চক্ষে যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত, সেই আকস্মিক ভয় ও বিস্ময়ে আড়ষ্ট, স্তম্ভিত অথবা একবারে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িয়া যাইত। বাড়ীর বাহিরে যাহা দৃষ্ট হইত, নিম্নবর্ণিত মৃগয়া ব্যাপারের সাড়ম্বর অনুষ্ঠানেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

একদা হার্ডউইক হলের যুবক উত্তরাধিকারী সার্ ফিলিপ হার্ডউইক মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। সঙ্গে শত শত সহচর ও পারিষদ।

ফিলিপ বেগবান্ উচ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবি অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, সুন্দরী ফিলিশিয়া, তদীয় দক্ষিণ পার্শ্বে, অন্য ঘোটকের উপরে। পশ্চাতেও, অশ্বারোহণে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা। অশ্বের হ্রেষা-রব, শিকারী কুক্কুরের শঙ্কাজনক হুহুঙ্কার, এবং পাদচারী শিকারীদিগের শিঙ্গা ধ্বনিতে বনস্থলী বিলোড়িত। চারি দিকে হাসির হিল্লোল, আমোদের উচ্ছ্বাস, বিদ্রূপের তরঙ্গ ও বীরত্বের বাহ্বাস্ফোটন।

সর্ব্বপ্রথম একটি মৃগশাবক শিকারী-দিগের সম্মুখে পতিত হইল। প্রাণভয়ে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হরিণশিশু বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল। ফিলিপ হার্ডউইক, হসিতচ্ছবি ফিলি-শিয়ার সহিত মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ অশ্বারোহীর দল। তাহারাও ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। সকলেই তরঙ্গায়িত বন-ভূমির ভিতর দিয়া এতদূর অগ্রে সরিয়া পড়িলেন যে, হার্ডউইক হলের চূড়াটিও তখন অদৃশ্য হইয়া আসিল। যাইতে যাইতে কি একটা সুখ-সোহাগের কথা কহিবার নিমিত্ত, ফিলিপ যেই তাঁহার সুন্দরী সঙ্গিনীর পানে ফিরিয়া চাহিলেন, অমনই দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারই পার্শ্বদেশে, তাঁহারই মত বায়ুবেগে, অপর কে একটি অশ্বারোহী চলিয়া যাইতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—এ অশ্বারোহী ও অশ্ব অন্য অশ্বা-রোহী বা অশ্বের মত নহে। এ অশ্বারোহী ও অশ্বের গতি আছে, শব্দ নাই। অবয়ব আছে, সে অবয়বে জড়পরমাণুর ঘনসন্নি-বেশ নাই। অশ্বারোহী ও অশ্ব উভয়ই যেন বাষ্পময় ছায়া-মূর্ত্তি। সহসা ফিলিপের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। ফিলিপের বেগবান্ অশ্বও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ছায়া-মূর্ত্তির মুখে কোনরূপ বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। কিন্তু উহাঁ, অশ্বপৃষ্ঠে নিশ্চল ভাবে রহিয়া, গভীর ঘৃণা ও তিরস্কারব্যঞ্জক তীব্রদৃষ্টিতে ফিলিপের সঙ্গিনী যুবতীর দিকে তাকাইতে লাগিল। যুবতী দেখিলেন, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং ছায়ামূর্ত্তির মুখ দেখিয়াই প্রকৃত পরিচয় পাই-লেন। তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া গেল, মুখশ্রীতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই কেমন একটা পরিবর্ত্ত ঘটিল।

ইহার পরে, ছায়া-মূর্ত্তি উহার সেই জলন্ত অনল-নেত্র ফিলিপের দিকে ফিরাইল, এবং ভ্রুকুটি-কুটিল বিকট মুখভঙ্গিসহকারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, অদূরে একটি স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ স্থানের লতা গুল্ম প্রভৃতি উৎ-পাটিত, ঝোপ ও ঝোর ছিন্ন ভিন্ন। ছায়া-মূর্ত্তি যেন অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইহাই কহিল,—"চাহিয়া দেখ্, ঐ সেই স্থান।" ফিলিপের কম্পিত প্রাণও যেন ঐ ভয়াবহ ইঙ্গিতে ইহাই বুঝিয়া লইল,—"হাঁ—ঐ ত সেই স্থান।"

ফিলিপ আকুল-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভয়চকিত ঘোটকও, অধিকতর ভয়ে অধীর ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, লাঁফাইতে লাগিল। অশ্বারোহীদিগের মধ্যে, আরও অনেকে, ছায়া-মূর্ত্তির এই বিস্ময়জনক দৃশ্য দেখিয়া, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। চারি দিকে কেমন একটা আতঙ্কের ধ্বনি উঠিল। ফিলিপ আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন

না। তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহার রক্তাক্ত তনু ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। কতিপয় অশ্বারোহী, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া, পরিচারকদিগকে চীৎকারের কণ্ঠে আহ্বান করিলেন। পরিচারকেরা ফিলিপকে কাঁধে করিয়া গৃহাভিমুখে বহিয়া লইয়া চলিল। ফিলিশিয়া মাটীতে পড়িলেন না বটে; কিন্তু তাঁহারও, বদনে বিবর্ণ পাণ্ডু রেখা, বুকে ধড়-ফড়ি, এবং সমস্ত শরীরে ভয়ঙ্কর কম্প। জনৈক অশ্বারোহী, অশ্বের বল্গা ধরিয়া, তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। পাছে তিনি পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায়, ঘোটকের দুই পার্শ্বে দুই জন পরিচারক তাঁহাকে ধরিয়া চলিল। এই ভাবে ফিলিশিয়া তাঁহার বিশ্রাম ভবনে নীত হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই শিকারের সেই উৎকট হলহলা ও আমোদ-উচ্ছ্বাস বিষাদে ডুবিয়া গেল।

যাঁহারা পশ্চাতে রহিলেন, কুক্কুরগুলির গতিবিধি, তাঁহাদিগের নিকট, বড়ই বিচিত্র, বিস্ময়কর, ও আতঙ্কজনক বোধ হইল। কুক্কুরগুলি ছায়া-মূর্ত্তির প্রদর্শিত সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে বারংবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইতে লাগিল; আর ঐ স্থানের মাটী আঁচড়িয়া আঁচড়িয়া, শুঁকিতে শুঁকিতে, কখনও ক্রোধে ও ভয়ে গর্জ্জন, কখনও বা বিলাপের স্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়-যুক্ত প্রাণিগুলির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া, এবং ঐ স্থানের মাটীও একটু শিথিল ভাবা-পন্ন লক্ষ্য করিয়া, অনেকেই ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। গাঁতি ও কোদালি সংগৃহীত হইল। তাঁহারা কুক্কুর-প্রদর্শিত স্থান খনন করিলেন। খনন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদিগেরও চক্ষু স্থির হইল,—মাথা ঘুরিয়া গেল। দেখিলেন,—যুবক রাল্‌ফ এস্‌সিটনের মৃতদেহ ঐ স্থানে নিহিত রহি-য়াছে,—দেহের নানা স্থানে গভীর অস্ত্রক্ষত,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন, কর্দ্দমাক্ত ও শোণিতসিক্ত। অমায়িক এস্‌সিটন ঐ স্থানে এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছেন, এই ভয়ঙ্কর শোকাবহ সত্য এক্ষণ সর্ব্বাংশেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িল।

মৃগয়িকের দল হার্ডউইক হলে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই এই ভীষণ সংবাদ চারি দিকে প্রচারিত হইল। সংবাদ হার্ডউইক হলেও পহুঁছিল। মুর-তনয়া লেডী হার্ডউইক শ্রুতিমাত্রই বজ্রাহতের ন্যায় চমকিত হই-লেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার অবস্থা একান্ত শোচনীয় ও ভীতিজনক হইয়া উঠিল। তিনি বিকট রবে চীৎকার করিয়া ক্ষিপ্তার ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে বারে-ন্দার দিকে দৌড়াইলেন, এবং সেখানে সিঁড়ির নিকটবর্ত্তী গেলারীতে দাঁড়াইয়া, অজস্র অর্থশূন্য প্রলাপ উক্তি করিতে লাগি-লেন। এই প্রলাপ উক্তি যাহারা মনোযোগ করিয়া শুনিল, তাহারা সমস্তই জানিতে পাইল। রাল্‌ফ এস্‌সিটন কেন,—কাহার প্ররোচনায়, কাহাকর্ত্তৃক কি ভাবে নিহত হই-য়াছেন, প্রলাপেই তাহা প্রকাশিত হইল। উন্মাদ-গ্রস্ত বিধবা রমণী যাহাকে সম্মুখে পাই-লেন, তাঁহার কাছেই আত্মকৃত সমস্ত অনু-ষ্ঠান বিবরিয়া কহিতে লাগিলেন। কখনও

বা মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া, একটা প্রস্তর ফলকের কাছে মাথা নোয়াইয়া, তাঁহার সেই ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়কে নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে রহিলেন। ইহাতে লোকের মনে আবার নূতন সন্দেহের উদ্রেক হইল। ঐ প্রস্তরফলক অপসারিত হইলে, দৃষ্ট হইল যে, উহার নিম্ন দেশে একটা ন্যক্কারজনক কব্বর। সেই কব্বরে ইটালীয় ভৃত্যদ্বয়ের গলিতশব বিষ-প্রয়োগে সবুজ বর্ণ হইয়া রহিয়াছে। লেডী হার্ডউইকের প্রলাপরোদনে উহাদিগের হত্যাকাহিনীও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এই হইতে হার্ডউইক হলের সুখ-সমৃদ্ধি ও গৌরব চিরদিনের তরে অস্তমিত হইল। ভয়ে, দুঃখে, ঘৃণায় ও ভাবনায় সকলেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হার্ডউইক হলের শোচনীয় কাহিনী, অধ্যায়-ধর্ম্মের ইতিহাসে, একটি আশ্চর্য্য অধ্যায় রূপে গ্রথিত হইয়া রহিল।

প্রদাহি সুখ আর প্রশান্ত সুখ।

সুখ কখনও পোড়ায় কি? হাঁ, সুখেও পোড়া আছে,—সুখও মনুষ্যকে, উহার অবস্থা-বিশেষে, পোড়াইয়া থাকে। যে প্রকারের সুখ, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, মনুষ্যের প্রাণটাকে, পোড়াইয়া পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করে, তাহারই নাম প্রদাহি সুখ। প্রদাহি সুখে পোড়ার ভাগই বেশী। কবি কহিয়াছেন,—

"অজানন্ দাহার্ত্তিং
বিশতি শলভো দীপ-দহনং।"

জ্বলন্ত দীপ-শিখা রূপের প্রখর জ্বালায় প্রতিভাত হইতেছে। পতঙ্গের প্রাণে ইহা সহিতেছে না। পতঙ্গ, উহার ক্ষুদ্র প্রাণের জ্বলিত আকুলতায়, সে জ্বালাময় রূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, এবং চক্ষের পলক ফিরিতে না ফিরিতে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে।

মানুষের প্রাণটাও কিয়দংশে ঐ পতঙ্গেরই প্রতিকৃতি নয় কি? মনুষ্য যখন, মুহূর্ত্তস্থায়ি সুখ-লালসায় আত্মবিস্মৃত হইয়া, যেন একটা আগুনে যাইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়ে; এবং আত্ম-প্রকৃতির সমস্ত উচ্চভাব ও উচ্চতর বৃত্তির স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বঞ্চিত হইয়া, সম্মুখস্থ বিপত্তিকেই সুখের সুশোভন মূর্ত্তি-জ্ঞানে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করে, বিচারশূন্য পতঙ্গের সহিত তখন তাহার খুব বেশী প্রভেদ ও পার্থক্য থাকে কি?

রূপের তৃষ্ণায়ই জ্বালা আছে, আর কোন প্রকার সুখে জ্বালা নাই, এমনও নহে। জ্বালা না থাকিলে, মানুষ অনেক স্থলে এবং অনেক সময়ে, অর্থ বিত্ত, পদ প্রভুত্ব এবং যশ ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সুখ-সামগ্রীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায়ও জ্বলিয়া উঠে কেন? আর এ সকল বস্তুর দর্শন ও স্পর্শন, ঘ্রাণ-গ্রহণ অথবা নাম

শ্রবণেই উন্মাদিত হইয়া, উড়িয়া যাইয়া আপনার প্রাণ ও মন এবং মনুষ্যোচিত সম্মান পর্য্যন্ত আহুতি দেয় কি জন্য?

বস্তুতঃ, এ সংসারে সুখী অনেক, সুখও অনেক প্রকার। কেহ, অহোরাত্র পরিশ্রমের পর, আপনার কষ্টার্জ্জিত অর্থে, দুটি অনাথ শিশুর অন্ন যোগাইয়া, প্রাণে একটু সুখ-শান্তি অনুভব করিতেছে; কেহ বা, অনাথ বালক, অনাথা বিধবা, এবং অসহায় প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া আনিয়া, অভিমানের সন্মুক্ষণে ক্ষণকাল যার-পর-নাই সুখী হইতেছে। কেহ, পরের সম্মানরক্ষার্থ, আপনার পৌরুষী প্রতিভার মান ও প্রতিপত্তি অম্লানবদনে বিসর্জ্জন দিতেছে; কেহ আবার, মনের আক্রোশে, নিরীহ লোকের সম্মানের উপর অসুরের মত আক্রমণ করিয়া, উল্লাসে ও আমোদের উচ্ছ্বাসে, অট্টহাস্য হাসিতেছে। বিভীষণ-গৃহিণী বিমল-চরিত্রানুরাগিনী সরমা অশোক-বনে সীতার সেবাপরিচর্য্যা করিতেন, সুখের বাসনায়; আর বীর-বিক্রম ও বিচার-বিচক্ষণ রাবণও, চন্দ্রমঃশালিনী বসন্তযামিনীর মধ্য-ভাগে, আপনার সুখশয্যা ত্যাগ করিয়া, সীতার রূপ দেখিবার জন্য, অশোকবনে ছুটিয়া যাইত, সুখেরই উৎকট লালসায়।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্য মাত্রই সুখস্পৃহার অধীন। দাতা সুখেরই জন্য দান করিতেছে, গৃহীতাও সুখেরই জন্য হাত পাতিয়া দান লইতেছে। রাজরাজেশ্বরী, রাজপ্রাসাদের উচ্চতম আসনে আসীন হইয়া, সুখের জন্য মাথায় মুকুট পরিতেছেন;—রাজপথের কাঙ্গালিনীও, তাহার পর্ণকুটীরে বসিয়া, সুখেরই কামনায় পাতা-লতার দ্বারা ডোঙ্গা বানাইতেছে। 'সখের ইয়ার' সুখ-পিপাসার দুর্ণিবার জ্বালায়, 'ঢাল ঢাল, আরও ঢাল' বলিয়া দ্রববহ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে; এবং যেন সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্ববিধ রূপ রস ও বিলাস-বস্তুকে একই শ্বাসে ও একই গ্রাসে উদরস্থ করিয়া, আপনার দুষ্পূর বাসনার পরিতৃপ্তির জন্য, পাগলের মত লালায়িত হইতেছে। আর সর্ব্বজন-হিতৈষী ঋষি, আধুনিক তত্ত্বগুরু জ্ঞানগম্ভীর অগস্ত কোমটির ন্যায়, অত্যল্প দুগ্ধ মাত্র পানে তৃপ্ত হইয়া, সুখ-স্ফূর্ত্তিরই অজ্ঞাত অনুশাসনে, দীন-দুঃখীর দুঃখ-মোচন-চিন্তায় ডুবিয়া রহিতেছেন; অথবা আপনার ভোজ্য অন্নের এক ভাগ অন্যকে দিয়া, দুইয়ে মিলিয়া, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার রস-স্বাদে সংসারের সকল ভাবনা ভুলিয়া যাইতেছেন।

কিন্তু যদিও জীবনের স্বাভাবিক স্ফুরণে মানুষ্যমাত্রই সুখের ভিখারী, তথাপি ইহা স্পষ্টতঃই পরিলক্ষিত হইতেছে যে, সুখের প্রকৃতি ও পরিণতি এক প্রকার নহে। সূর্য্যের উত্তাপ ও সলিলের সুখ-স্পর্শ যেমন তরুলতাকে বাড়াইয়া থাকে, সেইরূপ কোন প্রকার সুখ, আত্মায় কেমন এক শক্তি সঞ্চারণ করিয়া, মনুষ্যকে রীতিমত বাড়ায়। পক্ষান্তরে, কোন প্রকারের সুখ স্বভাবতঃই মনুষ্যকে মনুষ্যত্বের পর্য্যায়ে প্রতিনিয়ত কিছু কিছু করিয়া কমায়। কোন সুখ, সুবাসিত উদ্যান-সমীর অথবা সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার

ন্যায়, প্রাণে শীতল অনুভূত হয়, এবং উহার স্মৃতিও চিরকাল মনুষ্যকে শান্তি দান করে;—কোন প্রকারের সুখ আবার উহার প্রথম সমাগমেই, প্রাণে কেমন একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা জমায়, এবং জীবনের শেষসময়পর্য্যন্ত স্মৃতির সুকোমল তন্তুতে একটা অনির্ব্বাণ অগ্নিফুলিঙ্গের মত একবারে লাগিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্‌টা প্রদাহি আর কোন্‌টা প্রশান্ত;—কোন্ শ্রেণির সুখ জীবনী শক্তির শোষক ও নাশক, আর কোন্ প্রকারের সুখ সর্ব্বতোভাবে উহার পরিপোষক, তাহা উদাহরণ যোগে বিবরিয়া ও অক্ষরে অক্ষরে বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি?

পাঠক অবশ্যই অগ্নিদগ্ধ তরু দেখিয়াছন। তরুর একার্দ্ধ পুড়িয়া গিয়াছে; আর এক অর্দ্ধ, জীবনের অতি সামান্য সঞ্চার থাকিলেও প্রতিদিনই তাহা একটু একটু করিয়া শুকাইয়া যাইতেছে। এ দৃশ্য বড় শোকাবহ। কিন্তু, আমার চক্ষে, ইহা হইতেও অধিকতর শোকাবহ, সুখ-দগ্ধ মনুষ্যের মুখশ্রী। উহাতে এখনও সৌন্দর্য্যের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন আছে; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে শোভা নাই। সৌন্দর্য্য যেন পুড়িয়া গিয়াছে। শক্তিরও সামান্য একটু পরিচয় আছে। কিন্তু সে শক্তিও শ্মশানকাষ্ঠের ন্যায় দগ্ধাবশেষ। দেখিলেই চিত্ত দুঃখে জর্জ্জরিত হয়, এবং "হায় এই কি সুখের শেষ পরিণাম" এই প্রকার চিন্তায় একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বাহির হইতে থাকে।

মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা এ তত্ত্ব ভালরূপে বুঝিয়াছেন, এবং উল্লিখিত উভয়বিধ সুখের প্রকৃতিগত পার্থক্য অনুভব করিতে পারিয়া, অভ্যাসের দ্বারা মনের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, প্রদাহি সুখের সংস্পর্শকেও তাঁহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া শান্তির জন্য লালায়িত রহেন।

শান্তির অর্থ সুখ-শূন্যতা নহে। জ্ঞানীরা যাহাকে সাত্বিক জীবন অথবা আত্মপ্রসাদ বলিয়া সর্ব্বদা অনুধ্যান করেন, তাহারই এক নাম শান্তি, আর এক নাম প্রশান্ত সুখ। উহাতে সকল প্রকার সুখ-বাসনারই স্বভাবনিয়মিত স্ফূর্ত্তি, তৃপ্তি ও সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু বাসনাবিশেষের অস্বাভাবিক আকুলতা নাই। উহাতে সততই নির্ম্মল আনন্দ এবং সময় বিশেষে নিরাবিল আমোদের মৃদু-মধুর লহরী আছে; কিন্তু কোন সময়েই লেলিহান আকাঙ্ক্ষার লক লক জিহ্বাপ্রসার ও অগ্নিময় ঝটিকা নাই। যাঁহারা এইরূপ প্রশান্ত সুখে প্রাণে নিরন্তর শীতল রহেন, তাঁহারা বৃক্ষের ন্যায় ধীর স্থির, শান্ত সহিষ্ণু, সর্ব্বজনের আশ্রয়, সর্ব্বমঙ্গলালয় অশ্বত্থ সকলের সম্পর্কেই নির্ভয়,—কলকণ্ঠ বিহঙ্গের ন্যায় মধুর-ভাষী এবং জীবনের সমস্ত অবস্থায়ই আত্মতৃপ্ত ও আনন্দপ্রফুল্ল। বোধ হয় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ কহিয়াছেন,——

প্রশান্তাত্মা বিগতভী র্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ,
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "বিজয়িনীকাব্যম্। শ্রীশ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার-ভট্টাচার্য্য-বিরচিতম্।" এই বিজয়িনী কাব্য বিজয়-কীর্ত্তি-ভূষণা বিমল-চরিতাভরণা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিত। ইহা দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত, সুখ-শ্রুত-সুললিত সংস্কৃতকবিতায় বিচরিত, এবং আলঙ্কারিকদিগের ব্যবস্থানুসারে, প্রায় সকল অংশেই মহাকাব্য বলিয়া আদর পাইবার উপযুক্ত। আমরা ইহার অনেক স্থানে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রচনার চমৎকারিত্ব দর্শনে, প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছি; এবং বঙ্গদেশে এখনও এইরূপ সংস্কৃত কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে জানিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিয়াছি। আমাদিগের রাজপুরুষেরা গুণানুরাগী বলিয়া পরিচিত, এবং সদ্‌গুণের পুরস্কার করিবার জন্য ইচ্ছান্বিত। এমন অবস্থায়, বিজয়িনী কাব্যের রচয়িতা, কবিবর বিদ্যাভূষণ মহাশয় কেন আজি পর্য্যন্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে অলঙ্কৃত হন নাই, ইহা বিচিত্র। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভিক্টোরিয়া নামের সংস্কৃত অনুবাদে বিজয়িনী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদিগের এইরূপ বোধ হয় যে, বিজয়িনী স্থলে বিজয়া বলিলেই কানে বেশী মিঠা লাগিত। আমরা এ গ্রন্থের সহস্র শ্লোকের মধ্যে একটি মাত্র শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত করিব।

চিরস্থিরং বাক্যপথাদতীতং
গদ্যৈশ্চ পদ্যৈশ্চ তথাপি গীতম্।
ব্রহ্মেদমানন্দরসানুবিদ্ধং
প্রপদ্যতে জ্ঞানঘনং প্রসিদ্ধম্॥

প্রাচীন ঋষিরা পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মকে "অবাঙ্মনসোগোচরং" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যিনি বাক্য ও মন উভয়েরই অগোচর,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—তাঁহাকে এ স্থলে শুধু "বাক্যপথাদতীতং" বলিলে ভঙ্গিক্রমে মনঃপথের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না কি? দ্বিতীয় কথা, যাঁহার এক নাম আনন্দ, আর এক নাম রস,—পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যাঁহার সম্পর্কে "আনন্দরূপমমৃতং"—এবং "রসো বৈ সঃ" প্রভৃতি মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া হৃদয়ের গভীর আনন্দ জ্ঞাপন করিতে যত্নপর হইয়াছেন, তাঁহাকে "আনন্দরসানুবিদ্ধং" বলিয়া আনন্দ ও রস উভয় হইতেই পৃথক্ পদার্থ রূপে চিন্তা করিতে যাই কেন? সমালোচকের চক্ষু লইয়া অনুসন্ধান করিলে, এখানে সেখানে, এইরূপ দুই একটি শব্দ কিংবা পদপ্রয়োগ সম্বন্ধে ক্ষণকাল একটু আমোদ করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ আমোদও গ্রন্থকারের গৌরববর্দ্ধক।

"২। সঙ্গিনী। ৩।—রঙ্গিনী। শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ বিরচিত।" মনুষ্য বহুক্ষণ, বিষয়সংসারের কর্কশ কোলাহলে ক্লিষ্ট হইয়া, অকস্মাৎ বালিকার কোমল কণ্ঠে ঝিঁঝিট কিংবা খাম্বাজের মধুর 'আওয়াজ' অথবা

ত্রিতন্ত্রীর কোমল ঝঙ্কার শুনিতে পাইলে, প্রাণে যেমন মোহিত ও শীতল সুখে সুসিক্ত হয়, আমরাও সঙ্গিনী ও রঙ্গিনীর কবিতা পড়িয়া সেই রূপ মোহিত ও সুখ-সুধাভিষিক্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ, এই উভয় গ্রন্থই উৎকৃষ্ট কাব্য, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আভরণ বলিয়া আদর পাইবার যোগ্য। যে সকল কচি হাতের কবিতা ইদানীং নব্যবঙ্গের নূতন কবিত্ব বলিয়া আদৃত হইতেছে, তন্নিচয়ের অধিকাংশই এক সাধারণ দোষে দূষিত। সে দোষের নাম অসরলতা। কবিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চ গ্রামে উঠিয়া নানাবিধ উচ্চ প্রসঙ্গে কথা কহে। কিন্তু কি কহিল কেহ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পায় না। কবিতা, নানা সুরে, নানাপ্রকার গীত গায়। কিন্তু গীতের রাগ-রাগিণী শ্রুতিসুখ-সম্পাদিনী হইলেও, পদগুলি দূরশ্রুত শব্দের ন্যায় প্রায়ই অবোধ্য রহিয়া যায়। ইংরেজীতে ইহাকে Rhapsody বলে ; বাঙ্গালায় সেই রূপ নদীকেই রাবসাদি নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেন না উহাতে রব অর্থাৎ শব্দের ভাগই বেশী, এবং সে শব্দবাহুল্য অনেক সময়ে, অবসাদের উৎপাদক। সঙ্গিনী আর রঙ্গিনীর কোন কবিতাই, রাব-সাদিনী অর্থাৎ অবোধ্য শব্দের অপূর্ব্ব বন্যামালা নহে। এই দুই খানি পুস্তকে প্রায় এক শত খণ্ড কবিতা আছে। সমস্ত কবিতাই শব্দে মধুরা, অর্থে সরলা, ভাবে চিত্তহারিণী, রসে হৃদয়স্পর্শিনী। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, কবিহৃদয়া সুরমার সুনির্ম্মল যশ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হউক ; তদীয় কর-ধৃত ত্রিতন্ত্রী, খণ্ড কবিতার ক্ষণিক বিলম্পতেই তৃপ্ত না রহিয়া, মহাকাব্যের মহাসংগীতে সিদ্ধি লাভ করুক।

৪। "অনাথবালক। গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীচন্দ্রশেখর কর প্রণীত।"—বাঙ্গালায় উপন্যাস বলিলে ইদানীং সাধারণতঃ যাহা বুঝায় এখানি তাহা নহে। ইহাতে কিম্ভূত কিমাকার প্রেমের ইতিহাস নাই ; আছে সুখ-দুঃখময় গার্হস্থ্য জীবনের একটি সুন্দর কাহিনী, আর সে কাহিনীতে শিখিবার অনেক ভাল কথা। ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান এক ভাগই গার্হস্থ্য উপন্যাস। বাঙ্গালায় গার্হস্থ্য উপন্যাস বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। বাবু চন্দ্রশেখর সে অভাবপূরণে যত্নবান্ ; ইহা সুখের বিষয়। তাঁহার লেখা সরল, বর্ণনা স্বভাবের অনুগামিনী, বিষয়বিন্যাস সর্ব্বতোভাবে সু-নীতির পরিপোষক। আমরা তাঁহার অনাথবালক পড়িয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। এই পুস্তকে ভ্রাতৃস্নেহ ও উদারতার একটি অপূর্ব্ব চিত্র আছে। উহা এক সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্র-পরিলক্ষিত প্রকৃত পারিবারিক চিত্র ছিল। এখন সে চিত্র, সংসারক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া, জাতীয়-স্মৃতির সন্মুখস্থ সাহিত্যের পটে স্থান পাইয়াছে। যদি ইহা পুনরায় সাহিত্য হইতে সংসারের কর্ম্মজীবনে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে দেশের সুখ ও শান্তি দশ গুণ বাড়িবে। পুস্তকে অক্রোধী ও নির্দ্দোষী প্রভৃতি দুই চারিটি শব্দে মুদ্রাকর প্রমাদ পরিলক্ষিত হইল। ভরসা করি এ সকল ক্ষুদ্র দোষ ভবিষ্যতে থাকিবে না।

ধ্যান, জ্ঞান, আর প্রাণ।

ঘনীভূত জলের নাম বরফ, ঘনীভূত চিন্তার নাম ধ্যান। সুতরাং ধ্যানের সহিত জ্ঞানের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহার জ্ঞান নাই, তাহার ধ্যানও নাই ; তাহার দ্বারা কোন বস্তুরই ধ্যান হওয়া সম্ভব নহে। অপিচ, যে ব্যক্তি, মুহূর্ত্তকালও ধ্যানে মনঃ-সন্নিবেশ করিতে সমর্থ হয় না, সে কোন দিনও কোন বিষয়েই জ্ঞানের ঊর্দ্ধতন স্তরে আরোহণ করিতে পারে না। ভারতীয় জ্ঞানীরা চিন্তার যে অবস্থাকে ধ্যান বলিতেন, ইয়ুরোপীয় নব্য বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকেই ইদানীং Concentration of Thought নামে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদিগের মতে Concentration of Thought অর্থাৎ ধ্যানশক্তিই মনুষ্যের প্রধান সম্পদ।

বক ও বিড়াল, এবং তাদৃশ স্বভাব-সম্পন্ন নিম্ন শ্রেণিস্থ মনুষ্যও সময়ে সময়ে 'ধ্যান-স্তিমিত-লোচন' বৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, প্রাণিতত্ত্ববিদ অথবা জ্ঞানিপণ্ডিতেরা উহাদিগের ঐরূপ অবস্থাকে প্রকৃতির অনায়ত্ত অভ্যাস বলেন, ধ্যানের আভাস বলিয়াও কল্পনা করিতে সাহস পান না। প্রকৃত ধ্যানের প্রথম সোপান জ্ঞান, দ্বিতীয় সোপান জ্ঞানজনিত সংকল্প এবং শেষফলও জ্ঞানের উজ্জলতর বিকাশ। ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানপিপাসু মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন প্রকার জীব ধ্যানের অধিকারী নহে।

ফলতঃ, যাঁহার জ্ঞান যত গাঢ়, তাঁহার ধ্যান তত গভীর, এবং যিনি ধ্যানে যত উচ্চ-গ্রাম-রূঢ়, তিনি জ্ঞানে তত উন্নত। যাহার আত্মায় কোন বিষয়েই জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই, সে কখনও ধ্যানে উপবিষ্ট হয় না,—ধ্যানের আবশ্যকতাও অনুভব করে না। সে খায় দায়, আমোদ অথবা বিসংবাদ করিয়া বেড়ায়, এবং ঐ এক প্রকার উদ্দেশ্য-শূন্য জীবের মত, তন্মুহূর্ত্তের প্রণোদনায়ই, অকর্ম্মকে কর্ম্মবোধে, হৈ চৈ করিয়া দিন কাটায়। যখন তাহার এই অন্তঃসারশূন্য অবস্থা দূর হয়, এবং জীবনের গতি ও পরিণতি বিষয়ে বিবিধ চিন্তা, শাদা মেঘে সৌদামিনীর ক্ষণিক বিকাশের মত, তাহার চিত্ত-ক্ষেত্রে উকি ঝুকি দিতে আরম্ভ করে, তখন সে, অনেক সময়ে, অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায়ও ধ্যানস্থ রহে। এই পৃথিবীতে কার ইচ্ছায় কেন আসিলাম,—আসিয়া কি করিলাম, এবং পরিশেষেই বা কার কাছে কোথায় যাইব, এই প্রকার চিন্তা তখন মাঝে মাঝেই তাহার হৃদয় ও মনকে সংসারের সুখ-মোহ-মত্ততা হইতে আর এক দিকে আকর্ষণ করে ; এবং তাহার আত্মা, এক এক

সময়, যেন অকস্মাৎ, জগৎপ্রাণ পরমাত্মার প্রাণস্পর্শি অনুভূতিতে আকুল হইয়া, আপনাতে আপনি চমকিয়া উঠে।

মনুষ্যের মন ও বুদ্ধি যখন জ্ঞানের দিকে আর একটু বেশী অগ্রসর হয়, তখন আর সে ধ্যানের অভ্যাস না করিয়া থাকিতে পারে না। তখন সে জ্ঞান-বৃদ্ধ গুরু অথবা জ্ঞান-প্রদ গ্রন্থের আশ্রয় লয়; এবং আর কোন উচ্চ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, শুধু আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই, সে আপনা হইতে উদ্যোগী হইয়া, ধ্যানের নিভৃত প্রকোষ্ঠে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। কিন্তু মনুষ্য ধ্যান করিবে কার, অথবা ধ্যান করিবে কিসের?

যাঁহারা ধ্যানশক্তির অলৌকিক সাধনার দ্বারা জগৎতত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন অথবা মনুষ্য-জগতের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, যদিও এই নিখিল জগতের সমস্ত সত্যই ধ্যানের বিষয়ীভূত, তথাপি প্রধানতঃ ধ্যানের এক বস্তু ধর্ম্ম, আর এক বস্তু ধর্ম্মময় অনন্তদেবের অনন্তরূপ। আরাধ্য দেবতার কোন না কোনরূপ মূর্ত্তি চিন্তা ভারতীয় পৌরাণিকদিগেরই বিশেষ প্রিয়। তাঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, ঐ প্রকার মূর্ত্তিচিন্তায় মনোনিবেশ দ্বারাই মন ক্রমে চিন্তাক্ষম হইয়া চিন্তার চরমলক্ষ্য স্বরূপ নিরঞ্জন সত্যের সন্নিহিত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে।—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-গিরি-নিভং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং"—ইত্যাদিক ধ্যানের কথা, বিজ্ঞানের চক্ষে এক দিকে অবোধ্য হইলেও, উল্লিখিত কারণে, পৌরাণিক হিন্দু-মাত্রেরই প্রাণের কথা।

বৌদ্ধদিগের মতে ধ্যানের বস্তু ধর্ম্ম,—অর্থাৎ প্রীতিনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, চিত্তশুদ্ধি এবং মহত্ত্ব, মাধুর্য্য ও নম্রতা প্রভৃতি ধর্ম্মের বিবিধ ভাব। বোধিসত্ত্ব শাক্যসিংহ, সুদীর্ঘ কাল এই সকল সত্য ও সত্যনিহিত শুদ্ধ ভাবের ধ্যান দ্বারা, জ্ঞান-বলে বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

আধুনিক তাত্ত্বিকদিগের মধ্যে অগষ্ট কোম্‌টির অনুবর্ত্তীরাও এইরূপ ধ্যানে অনুরাগী। তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির সমষ্টি-স্বরূপ মনঃকল্পিত বিরাট পুরুষ, এবং তদীয় সেবার উপযোগি কৃতজ্ঞতা ও পরার্থজীবিতা প্রভৃতি বিবিধ প্রীতিমধুর ভাবের ধ্যান করিতে ভালবাসেন। কোম্‌টি স্বয়ং প্রতি দিন ত্রিসন্ধ্যা এই প্রকার ধ্যান করিতেন, এবং কোন কোন দিন, ধ্যানের সময় অশ্রু-জলে অভিষিক্ত হইতেন।

কিন্তু ধ্যানের আসনে উপবিষ্ট হইলেই মনুষ্য দেখিতে পায় যে, উহা শুধুই জ্ঞান-সাপেক্ষ নহে। উহার সহিত এক দিকে যেমন জ্ঞানের সম্পর্ক, আর এক দিকে সেই রূপ প্রাণের সম্পর্ক। বরং প্রাণের সম্পর্কই প্রথমতঃ কিছুকাল অধিকতর দৃঢ়। যে যাহা প্রকৃত ভালবাসে,—যাহার প্রাণটা, মনোবুদ্ধির অন্তরালে ও প্রাণের অন্তস্তলে, নিরন্তর যাহা চায়, তাহার চিন্তা ও কল্পনা, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, তাহাই সতত ধ্যান করিয়া থাকে; এবং তাহার

স্মৃতি ও মতিও তাহাই নিরন্তর তাহার মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেখায়। সে যখন নিতান্ত নির্ম্মল কামনায় নয়ন মুদিয়া জগন্ময় জগদীশ্বরের কোন বিশেষভাবাত্মক নাম জপ করিতে উপবিষ্ট হয়, তাহার চিত্ত তখন চীন, জাপান ও জামেকা প্রভৃতি দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়,—জিহ্বা আরাধ্য-দেবের পরিবর্ত্তে অন্য কোন নাম উচ্চারণ ও কর-ধৃত মালা হঠাৎ আর্থিক ক্ষতিলাভের হিসাব গণনা করে,—এবং মানস-চক্ষু রমণীর চোরা চাহনি, রাজপুরুষের কুটিল-কঠোর দৃষ্টি, রম্য অট্টালিকা, শাল, বনাত ও সোনার চেইন প্রভৃতি বস্তু দর্শন করিয়া লজ্জায় জড়সড় হয়। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ইচ্ছার অনুরূপ ধ্যান করা সহজ কথা নহে।

আমি এ কথার উদাহরণে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব। ভারতের নাম ইদানীং বঙ্গে একটু আঁধারে পড়িয়াছে। তাঁহার অপরাধ আছে, তাই তাঁহার সামাজিক দণ্ড হইয়াছে। কিন্তু ভারত প্রকৃত কবি। ভারতচন্দ্রের ভাব-বিহ্বলা নায়িকা, অভিলষিত বরলাভের জন্য আপনার ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে বসিল, কিন্তু ধ্যান ফলিল না। তাহার ভক্তি ও শক্তি, যত্ন ও প্রয়াস সকলই বিফল হইল। সে দেখিল তাহার কিছুতেই কিছু হইতেছে না,—কেন না, সে

"পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর,
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ,
দেবীরে করিতে করে বরে সমর্পণ।
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে,
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে।
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ,
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন।"

ধ্যানের এইরূপ বিড়ম্বনা পরিহাস-রসিকতার কাব্যচিত্রেই নিবদ্ধ নহে। যাঁহারা অকপটভাবে আত্মপরীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং আত্মচিত্তপরীক্ষার সঙ্গে মানবচিত্ত-রূপ সুবিশাল গ্রন্থের কিছু কিছু পাঠ করিয়া সত্য সংগ্রহ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সকলেই এস্থলে ভারতচন্দ্রকে হৃদয়রহস্যজ্ঞ ভাবুক বলিয়া সম্মান করিতে প্রস্তুত হইবেন। তবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য কথা যে, এ চিত্র চিত্তসংযম অথবা চিন্তাশক্তিপ্রয়োগের অতি নিকৃষ্ট চিত্র। মনুষ্য, অল্পকাল অভ্যাস করিলেই, এইরূপ বিড়ম্বিত অবস্থার ঊর্দ্ধে উঠিয়া, ধ্যান-যোগে কিঞ্চিৎ সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু ধ্যানের যে অবস্থা সাধারণতঃ মনুষ্যশক্তির অনধিগম্য—মনুষ্যের মধ্যে ব্যাস বশিষ্ঠ বাল্মীকিও ধ্যানের যে ধামকে দুর্নিরীক্ষ্য দুর্ল্লভ পদার্থ জ্ঞানে দূরে থাকিয়া দর্শন করিয়াছেন, কাব্যে তাহারও জগদ্দুর্লভ চিত্র আছে। পাঠক যদি কবিত্বের সেই অলৌকিক চিত্র দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি কল্পনার সাহায্যে ক্ষণ-কাল হিমাদ্রিশিখরে বিচরণ করুন।

দেবতাদিগের প্রয়োজনে হিমাদ্রির উচ্চ-তম শিখরস্থ উদাস বনে, অকাল বসন্ত,—

এবং বসন্তের আকস্মিক স্ফুরণে, বন-ভূমির সমস্ত স্থানে, প্রকৃতির মদনোৎসব। অশোক অকালে হাসিয়াছে,—আম্রমুকুল অনঙ্গের আয়ুধ-পত্রের ন্যায় অপরূপ দৃষ্ট হইতেছে,এবং সে মুকুলাসক্ত দ্বিরেফমালা মদনেরই অন্যবিধ নামমুদ্রার ন্যায় শোভা পাইতেছে। নির্গন্ধ কর্ণিকার ও নিবিড়-লোহিত পলাস-কুসুম, বনকুসুমের মধ্যে নিম্নজাতীয় হইলেও, রূপের বৈচিত্র্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভ্রমর-ভর-নিপীড়িত তিলক-ফুল বনস্থলীর বদনে কজ্জল-রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছে। পিয়াল-মঞ্জরীর রজঃ-কণা মৃগদিগের প্রমোদ-প্রফুল্ল চকিত নয়নে দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। চারিদিকে বৃক্ষ্যচ্যুত পত্রনিচয়ের মনোহারি মর্ম্মর শব্দ,—বসন্তসমীর-সম্মোহিত মদোদ্ধত মৃগযূথের আস্ফালন,—চ্যুত-মুকুল-রসোল্লাসিত পুংস্কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনি, এবং সর্ব্ববিধ প্রাণীর প্রেমানন্দ। ইহার মধ্যস্থলে নমেরু-শাখাসংসক্ত লতামণ্ডপের মধ্যস্থিত দেবদারুবেদীর উপরে, শার্দ্দুল চর্ম্মের সুকোমল আস্তরণে, ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর।

(৪৫)

বীরাসনে ধীরমূর্ত্তি-স্থির পূর্ব্বকায়,
আনমিত স্কন্ধ, দেহ আয়ত সরল,
করযুগ ঊর্দ্ধ-তল-ভাবে স্থাপনায়,
শোভে অঙ্কমাঝে যেন প্রফুল্ল কমল।

(৪৬)

ভুজঙ্গমে ঊর্দ্ধমুখে বদ্ধ জটাচয়,
দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র কর্ণে লম্বমান,
কণ্ঠপ্রভা সনে মিশি নীল অতিশয়,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন তাঁর পরিধান।

(৪৭)

স্তিমিত নয়ন, তারা উগ্র আভাযুত
ভ্রূসঞ্চার-শূন্য নেত্র, ভয়াবহ দ্যুতি,
সুনিবিড় পক্ষ্মমালা স্পন্দন-রহিত,
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে বদ্ধলক্ষ্য দৃষ্টি অধোজ্যোতি।

(৪৮)

বৃষ্টিহীন দৃষ্টিক্ষোভ বারিদ যেমন,
কিংবা সে জলধি,যায় ঢেউ না খেলায়,
শোভে, রোধি অন্তশ্চর প্রাণ-সমীরণ
নিবাত নিষ্কম্প শান্ত দীপ শিখা প্রায়।

(৪৯)

লভি পথ, ললাটস্থ নয়ন বিবরে,
জ্যোতির প্ররোহ ছোটে ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে,
শিরঃস্থ বালেন্দু-শোভা প্রভায় আবরে,
মৃদু সে বালেন্দুভাতি বিশতন্তু হ'তে।

(৫০)

নিবারি মনের নবদ্বার-সঞ্চরণ,
ধ্যান-শক্তি বশে হৃদে স্থাপিয়ে সে মনে,
চিন্তে যেই অনক্ষরে ক্ষেত্রবিদ গণ,
আত্মার মাঝারে হর হেরিছে সে ধনে।

(৪০)

অপ্সরা গাইছে গীত, পশে না তা কানে,
শঙ্কর সমাধিরত ধ্যান-নিমগন,
আত্মা যাঁর বশীভূত, তপোভঙ্গে তাঁর
বিঘ্নাদি সমর্থ নাহি হয় কদাচন।

(৪১)

সুবর্ণখচিত বেত্র বাম-কর-তলে
দাঁড়াইয়া আছে নন্দী লতাগৃহদ্বারে,
ইঙ্গিতে আদেশি যেন একটি অঙ্গুলে।
দমিয়া রাখিছে তথা প্রমথ-নিকরে।

(৪২)

নাহি নড়ে বৃক্ষে পত্র, না গুঞ্জরে অলি,
নীরব বিহঙ্গ, মৃগ নিশ্চল-চরণ
চিত্রে আলিখিত-প্রায় শোভে বনস্থলী
নিঃস্তব্ধ মূরতি ! হায় এমনই শাসন।*

* পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়ম্
ঋজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫
ভুজঙ্গমোন্নদ্ধজটাকলাপং
কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলাং
কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈ-
র্ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈ-
র্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধোময়ূখৈঃ ॥ ৪৭
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্-
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধা-
ন্নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈ-
র্জ্যোতিঃপ্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্য্যাং
বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯
মনোনবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি
হৃদিব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।

ধ্যানের এ চিত্র, চিত্তে একবার অঙ্কিত হইলে, মনুষ্য আর কখনও ইহা বিস্মৃত হইতে পারে না। ইহা দেব-চিত্র বটে; কিন্তু দেব-চিত্র হইলেও অধ্যাত্মশক্তির আদর্শচিত্র। যদিও পৃথিবীর সকল দেশেই উচ্চশ্রেণীর মনস্বিপুরুষেরা আত্মায় এইরূপ অলোক-সাধারণ ধ্যান-শক্তি লাভের জন্য যত্ন করিয়াছেন, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয় ঋষিতাপসদিগের মধ্যেই পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যানের প্রথা একটু বেশী প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে, যিনি যখন আত্মার

যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তম্-
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্ ॥ ৫০
শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্
হরঃ প্রসংখ্যানপরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং নহি জাতু বিঘ্নাঃ
সমাধিভেদপ্রভবা ভবন্তি। ৪০
লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলীসংজ্ঞয়ৈব
মাচাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১
নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে ॥ ৪২

এই কএকটি কবিতার উপরিধৃত অনুবাদ বান্ধবের সহকারি সম্পাদক শ্রীমান্ বাবু উমেশচন্দ্র বসু প্রণীত বঙ্গানুবাদিত কুমার-সম্ভবের তৃতীয় সর্গ হইতে গৃহীত হইল।

উন্নতি অথবা জগতের কল্যাণকামনায় দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছেন,তিনিই তখন বিষয়সংসারের কল-কল কোলাহল হইতে দূরে যাইয়া দীর্ঘকাল ধ্যানের আনন্দে আত্মবিস্মৃত রহিয়াছেন। ধ্যানের সে সকল কথা পুরাণে ও পুরাতন ইতিকথায়* যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উপন্যাসের ভাগই একটু বেশী দৃষ্ট হয়। কিন্তু যেমন আসল না থাকিলে, তাহার নকল হয় না,—খাটী জিনিষ না থাকিলে, তাহার মেকী চলে না, সেইরূপ কোন দেশেই কোন প্রকার শক্তি কিংবা সাধনার প্রকৃত বস্তু কিছু না থাকিলে, তৎসম্পর্কে কতকগুলি অলীক উপন্যাস রচিত হইতে পারে না।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতির বহুবর্ষব্যাপি ধ্যানের কাহিনী অনেক অংশে অলীক হইলেও একবারে অলীক নহে। রাজ-ভোগত্যাগী সুখবিরাগী সিদ্ধার্থদেবের সুদুশ্চর ধ্যানের বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক সত্য। তিনি বিহারপ্রদেশে যে বৃক্ষটির মূলে বসিয়া ধ্যানে রত রহিতেন, তাহা অদ্যাপি জীবিত আছে এবং অদ্যাপি শত সহস্র সাধুসজ্জন, সেখানে যাইয়া, তাঁহার মহাযোগ-মগ্ন হৃদয় ও মনের কতকটা ভাব পরিগ্রহের জন্য যত্ন পাইতেছে। ভারতবর্ষের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখনও নানা স্থানে দুই একটি ধ্যান-বল-সম্পন্ন ধর্ম্মাবতার পুরুষ মনুষ্যের নয়ন-গোচর হইয়া থাকেন। ইয়ুরোপীয় পরিব্রাজক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিয়াছেন,—কেহ কেহ তাঁহাদিগের দুই একটি উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এ সকল মহাত্মারা ধ্যানে বড়,—জ্ঞানে বড়, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহারা অধিকতর বড়। তাঁহাদিগের উদার, আনন্দময়, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও সর্ব্বমঙ্গল্য প্রাণে। তাঁহারা আগে প্রাণটারে বশে আনিয়াছেন,—তাই ধ্যান করিতে পারিয়াছেন,—ধ্যানের প্রসাদাৎ অলৌকিক জ্ঞানলাভে মনুষ্যত্বের উপরে উঠিয়াছেন। যার প্রাণটা সতত পিপাসায় আকুল, তাহার পক্ষে ধ্যানের প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র।

অল্প দিন হইল জর্ম্মণীর একটি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য,সিংহল হইয়া সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐরূপ পরিভ্রমণকালে তাঁহার সহিত কাশ্মীর প্রদেশে, কোন একটি নিভৃত শৈলনিবাসে, কুম্রস্বামী নামক একটি মহামতি যতির সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে। জর্ম্মণ পণ্ডিত, স্বামিমহাশয়ের সন্নিহিত হইয়া, তাঁহার নিকট আপনার উদ্দেশ্য এ আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। স্বামী তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বাছা, আমি তোমার পরিভ্রমণ-সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত আছি; এবং তুমি যে দিন যে পথে পর্য্যটন করিয়াছ,—যেখানে বিশ্রাম

* Anecdote শব্দের বাঙ্গালা অনুবাদে, ইতিবৃত্ত ও ইতিহাস্ শব্দের অনুকরণে, এ স্থলে ইতিকথা শব্দ ব্যবহৃত হইল। ইতিকথা শব্দও আধুনিক নহে।

করিয়া,যাহা ভাবিয়াছ,সমস্তই আমি প্রত্যক্ষ-চক্ষে দেখিয়াছি। তোমরা ইয়ুরোপের পণ্ডিত, আপনাকেই আপনার কর্ত্তা বলিয়া ান; এবং জগতে যাহা কিছু ঘটে, তাহাই কস্মিক, এই এক মোটা কথা জান। তুমি কস্মাৎ জন্মিয়াছ,অকস্মাৎ বিদ্যা শিক্ষা করিছ, অকস্মাৎ এ দেশে আমার কাছে আসিছ, এবং অকস্মাৎ এক দিন মরিয়া যাইতেছ, এই তোমাদিগের জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। মনুষ্য কতকটা স্বাধীন হইলেও তাহার পার্থিব-জীবনের প্রত্যেক বিক্ষেপ বিধাতৃশক্তি দ্বারা নিয়মিত, এবং যাহারা ধ্যানযোগে জানিতে শিখিয়াছেন, তাহাদিগের পরিজ্ঞাত।" ইহা বলিয়া কুম্র-স্বামী সমাগত পণ্ডিতের ভ্রমণবিষয়ক সমস্ত কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বহুবিধ মনের কথাও ক্রমে বিবরিয়া বলিতে লাগিলেন।* পণ্ডিত কি প্রকারে শতদ্রু পার হইয়াছিলেন, এবং শতদ্রুর পর-পারে পঁহুছিয়া, শৈল-পথে কোথায় কি অভিলাষে অবস্থান করিয়াছিলেন, কুম্র তাহাও সবিস্তারে কহিলেন। তাঁহার কি সাত শত শিষ্য অথবা চেলা আছে, এবং সেই শিষ্যেরাই কি তাঁহার কাছে আসিয়া সমস্ত কথা রিপোর্ট করিয়াছে? এত শিষ্য থাকা সম্ভব হইলেও, এক জন বিদেশী পণ্ডিত, বিশেষ আড়ম্বর বিনা আপনার পথে আপনি একাকী চলিয়া আসিতেছেন, শিষ্যদিগের পক্ষে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা কি? আর শিষ্যেরা তাঁহার মনের কথাই বা জানিবে কি প্রকারে?

পণ্ডিত সমস্ত কথা কানে শুনিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, ভয়ে ও ভক্তিতে অবসন্ন হইলেন; এবং সে সংসার-ত্যাগী শান্ত-শীতল সাধু পুরুষের অমায়িক প্রীতিতে আত্মায় এক অনন্নুভূত-পূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিয়া আপনা হইতে মাথা নোয়াইলেন। পণ্ডিত তখন বুঝিলেন যে, মনুষ্য প্রকৃতই ধ্যানবলে পৃথিবীতে থাকা কালেও দেবত্ব লাভ করিতে পারে, এবং একই প্রাণে বহু সহস্র প্রাণের সন্তর্পণ ও সুখ-শান্তি-সম্পাদনে সমর্থ হয়। পণ্ডিতের ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইল যে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধুনাতন বৈজ্ঞানিকেরা মনুষ্যপ্রকৃতির যে শক্তিকে Psychometric sight অথবা অন্তঃপ্রণিহিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামে এত প্রকারে ব্যাখ্যান করিতেছেন, আর যাহার সবিশেষ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য এত যত্ন পাইতেছেন,'তিমিরাচ্ছন্ন' ভারতবর্ষে তাহা চির-পরিজ্ঞাত পুরাতন সত্য, এবং তাহারই আর এক নাম ধ্যানদৃষ্টি।

* "And to my amazement Coomra described, step by step, the journey I had made, the localities where I had camped, although I had not followed the route usually taken by travellers, and even the character of my musings, challenging me to ask him anything I pleased in this direction,and answering with an unhesitating accuracy and precision which fairly bewildered me."

Heinrich Hensoldt, Ph. D.

আমার স্বপ্ন।

(ক্ষুদ্র গল্প)

আগামী সপ্তাহে আমার এম্ এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দুই প্রহরের পর, আমাদের কলিকাতার বাটীতে একাকী শয়ন করিয়া, টেম্পেষ্ট (Tempest) পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন মিরাণ্ডার বিবাহ উৎসব উপলক্ষে, সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে, সমুদ্র-তরঙ্গ-রাশির মধ্যে বিরাট আয়োজন হইতেছে। চারি দিকে বহু লোকের উচ্চ চীৎকার সমুদ্র-গর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া, অপূর্ব্ব কোলাহল উত্থিত করিয়াছে। একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী বহুদূরব্যাপী অঙ্গনে বিবাহের আসর সজ্জিত হইয়াছে। অতি বৃহৎ নানা বর্ণের সুন্দর চাঁদনীতে ঝাড় লণ্ঠনের সঙ্গে বেলফুলের মালা দুলিতেছে। তাহার নীচে মহামূল্য গালিচার উপর বড় বড় তাকিয়া শোভা পাইতেছে। আর বিবাহ আসরের মাঝ খানে, একাকী উচ্চ গদির উপর সর্ব্বাপেক্ষা বড় তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া ক্যালিবান্ (Caliban) পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। আজ ক্যালিবানের বড় বাহার। আজ সে কালা পেড়ে ধুতি পরিয়া, বেনারসী চাদর কাঁধের উপর ঝুলাইয়া, শোলার হ্যাট মাথায় দিয়া, হাস্যমুখে চুরট টানিতেছে; এমন সময়ে যেন আসরের বাহিরে এক খানা ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী ঝন্ ঝন্ শব্দে আসিয়া দাঁড়াইল। দর্জ্জিপাড়ার মহিম ঘটক গাড়ী হইতে নামিয়া, নামাবলি কাঁধে লইয়া, লম্বা টীকি হইতে দুই হাতে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে, আসরে আসিয়া দাঁড়াইল ও ক্যালিবান্‌কে বলিল,—"নমস্কার মহাশয়।" ক্যালিবান্ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ইংরেজী ধরণে মৃদু-মধুর হাস্য করিয়া ঘটকের সঙ্গে Shake hand (সেক্‌হ্যাণ্ড) করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "Hallo! Good morning Mr. Mohim Chander." (হাল্লো গুড্ মর্নিং মেষ্টার মহিম্ চাণ্ডার।)

মহিম ঘটক থত মত খাইয়া বসিয়া পড়িল। ক্যালিবান্ তাহার সেই শোলার হ্যাটের ভিতর হইতে একটা 'ম্যানিল্লা সিগার' ও দেশলাইএর বাক্স বাহির করিয়া, ঘটককে খাতির করিয়া বলিল, "মহাশয় অবশ্য চুরট খে'য়ে থাকেন।"

মহিম ঘটক আরও থত মত খাইয়া বলিল, "রাম রাম! মাপ করুন, মহাশয়! এখন কন্যাকর্ত্তা কোথায় বলুন দেখি?"

আমি যেন এই সব দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইহা ত বড় আশ্চর্য্য! পটলডাঙ্গার ছ্যাক্‌ড়া গাড়ী দর্জিপাড়ার মহিম ঘটককে লইয়া সমুদ্র পার হইল কি প্রকারে! আর ক্যালিবান্‌ই বা হঠাৎ এমন সভ্য, এমন Civilized gentleman, কেমন করিয়া হইল? অবশেষে মনকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় কি না হয়?

সে যাহা হউক ক্যালিবান্ মহিম ঘটককে বলিল, "Beg your pardon sir মাপ করুন মহাশয়। আপনি আমাকে কি বল্‌ছিলেন?"

ঘটক বলিল, "আজ্ঞে আমি বল্‌ছিলেম, কন্যাকর্ত্তা মহাশয় কোথায়?" ক্যালিবান্ বলিল,—"কন্যাকর্ত্তা আবার কে? অবশ্য আমিই কন্যাকর্ত্তা।"

ঘটক কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "আজ্ঞে ঠাকুরের কথা বল্‌চি।"—

"Oh! that old fool! ও সেই বুড় ক্রবক,—তিনি ত আজ অধিক মাত্রায় আফিম খেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় প'ড়ে আছেন। Receive (রিসিভ্) করার ভার আমিই accept (এক্‌সেপ্ট) ক'রেছি। Oh! excuse me! (ও এক্সকিউজ্ মি) আপনাকে এখনও কেহ তামাক দিয়ে যায় নি? ওরে এঁড়ে তামাক দিয়ে যা।"

এরিয়েল (Ariel) উচ্চ হইতে নামিয়া আসিয়া, আকাশের এক কোণ হইতে মুখ বাড়াইয়া ক্যালিবানের মুখের দিকে চাহিয়া, দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিল ও তাহার গলা টিপিয়া বলিল,—"তুই যে কাঠের বোঝা ফে'লে রে'খে আসরের উপর পা ছড়িয়ে ব'সেছিস্? উঠ্ ব'ল্‌চি সয়তান।"

আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে আমার হাত টানিয়া বলিল,—"ওঠ্ বল্‌চি সয়তান! দিনের বেলা আর কত ঘুমুবি?" আমি উঠিয়া বসিলাম ও চক্ষু মুছিয়া দেখিলাম, আমার পার্শ্বে বিছানার উপর বসিয়া আমাদের নিতাই ঠাকুর দাদা হাসিতেছেন। আমি বলিলাম, "এ দুপুর রোদে নিতাই দাদা কোথা থেকে?" নিতাই দাদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এখনও না'ত বউ হয়নি, তবুও তোমার দিনের বেলায় এত ঘুম? না'ত বউ ঘরে এলে বুঝি, ভায়ার দিন রাত জ্ঞান থাক্‌বে না। ওরে নোসে! এখনও তোর তামাক সাজা হ'ল না। তিন ঘণ্টা হ'ল, তামাক খাওয়া হয়নি, পেট যে ফুলে উঠ্‌ল। তবে সতীশ ভায়া! নূতন খবর কি বল। তোমাদের কল্‌কাতার ছ্যাক্‌ড়া গাড়ীর মহিমা ত এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। শ্যালদহর ষ্টেশন থেকে এই পটলডাঙ্গা পর্য্যন্ত আস্‌তে প্রায় দেড় ঘণ্টা লেগে গেল।"

"তবে এখনও খাওয়া দাওয়া হয়নি দেখ্‌চি।"

নিতাই দাদা হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার নূতন ঠান্‌দিদি কি আর খাওয়া দাওয়া না হ'লে আস্‌তে দেয়। স্নান আহারের পর সাড়ে দশটার গাড়ীতে উঠেছিলেম।"

নিতাই দাদার বৃদ্ধ চাকর নসীরাম, কল্‌কে হাতে লইয়া ফুঁ দিতে দিতে ও মধ্যে মধ্যে কল্‌কের নীচের দিক হইতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধূম পান করিতে করিতে আসিয়া নিতাই দাদার হুঁকার উপর ক'ল্‌কে বসাইয়া দিয়া বলিল,—"এই লাও দাদা ঠাউর। মুই তো তোমাকে রেলগাড়ির মধ্যিতে ব'সে সাত বার তামাক খেওয়ে ছেলাম। অ্যারির

মধ্যি আবার প্যাট্‌টা ফুলে উঠ্‌লো।” নিতাই দাদা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া, একাগ্র-চিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন।

(২)

কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে মোহনপুর নামে এক খানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে আমার মা'র মামা নিত্যানন্দ বসুর পৈতৃক বসত বাটী। মোহনপুর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আরও কএকটি গ্রামে তাঁহার কিছু জমিদারী আছে। শৈশবকালের অভ্যাসবশতঃ আমি আজি পর্য্যন্ত তাঁহাকে 'নিতাই দাদা' বলিয়া ডাকিতাম। অপর সকলের নিকট তিনি মোহনপুরের এক জন মহাশয় নামে পরিচিত। তাঁহার বয়স প্রায় সাতান্ন বৎসর। আমার নিতাই দাদা “পুত্রপিণ্ডের প্রয়োজন” ও “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা” শাস্ত্রের এই আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া, দুই বার বিবাহ করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যাযুগলের পরলোক প্রাপ্তির পর, সম্প্রতি আবার, দুই বৎসর হইল, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বশতঃ তৃতীয় বার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, এখনও তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হওয়ার কোন প্রকার নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। সে যাহা হউক, তিনি আমার মাকে তাঁহার একমাত্র কন্যার মত ভাল বাসিতেন, ও সেই সঙ্গে আমিও, মা'র এক মাত্র পুত্র, নিতাই দাদার বড়ই আদরের পাত্র হইয়াছিলাম।

তিনি প্রায়ই আমাদের কলিকাতার বাটীতে আমাকে দেখিতে আসিতেন। কিন্তু এই দুই বৎসর (অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের বিবাহ হওয়া অবধি) বড় একটা তাঁহার দেখা পাইতাম না। এই দুই বৎসরের মধ্যে কেবল একবার আসিয়া, একদিন মাত্র আমাদের বাটীতে থাকিয়া, চুলের কলপ ও এক-জন বিলাতী দাঁত বিক্রেতার দোকান হইতে কতকগুলি কৃত্রিম দাঁত খরিদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া আসল কথাটা বলি।—নিতাই দাদা যে কেবল আমার নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় তাহা নহে। তিনি আমার প্রাণের বন্ধু। আমি জানি, এ কথা শুনিয়া আমার সুসভ্য পাঠক হাসিবেন ও আমার সুশিক্ষিতা পাঠিকাগণ আমার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করিবেন। আমি এ সভ্য যুগের উন্নতচেতা, বিংশ শতাব্দীর সভ্যালোকে সুশিক্ষিত, মিল ও কোম্‌তের মহামন্ত্রে দীক্ষিত, নূতন বঙ্গদেশের নবীন যুবক, আর আমার নিতাই দাদা কুসংস্কারাবৃত, জ্ঞানালোকবিরহিত, সন্ধ্যা আহ্নিক-ব্রতধারী সেকে'লে মূর্খ, সুতরাং তাহার সঙ্গে আমার প্রাণের মিলন! ইহা অনেকেই অস্বাভাবিক মনে করিবেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু প্রকৃত কথা না বলিলে চলিবে কেন? আমার সমবয়সী অথবা সহপাঠী বন্ধু যুবকগণের মধ্যে আর কেহই নিতাই দাদার মত আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রাণের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে আমার নিজের মনের কথা বলিতাম। তাঁহার সঙ্গে

ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া দু'জনে নির্জ্জনে বসিয়া, উভয়ের মন প্রাণ উভয়ের সঙ্গে বিনিময় করিয়া আমি যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম, সেরূপ আনন্দ আর কখনও কাহারও নিকট পাই নাই।

নিতাই দাদা তামাক ছিলুমটি ভস্মাবশেষ করিয়া, নসীরামকে আর একবার তামাক দিতে আদেশ করিলেন। নসীরাম হাস্যসহকারে, নিতাই দাদাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—“বলি, ও নাত জামাই! কল্‌কেটার দিকে একবার চে'য়ে দেখ দেখি, যেমন এনেছিলাম তেমনই আগুন এখনও গন্‌গন্ কর্‌তে লেগেছে। অ্যারির মধ্যিই আবার পেটটা ফু'লে উঠ্‌লো না কি?”

নসীরাম যে প্রকারে নিতাই দাদার সঙ্গে কথা কহিত, তাহা শুনিলে, সে নিতাই দাদার চাকর কি মনিব, সে বিষয়ে হঠাৎ লোকের মনে সন্দেহ হইত। কিন্তু, ইহার নিগূঢ় কারণ অনেকেই জানিত না। নিতাই দাদা যখন তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া আমার নূতন ঠান্‌দিদিকে গৃহে আনেন, তখন ঠান্‌দিদির বাপের বাড়ীর পুরাতন চাকর নসীরামও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেই জন্য, নিতাই দাদার নিকট বৃদ্ধ নসীরামের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। নসীরাম কল্‌কে হাতে লইয়া আবার তামাক সাজিতে গেল, নিতাই দাদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—“তবে সতীশ দাদা আমি যে তোমার নূতন ঠান্‌দিদিকে একলা ফে'লে রে'খে এই দুপুর বেলার রো'দে কেন এখানে এ'সেছি, তার কিছু জান কি?”

“আমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই, তাই।” “তবে তুমি এখনও কিছু জান না দেখ্‌চি। তা এখন থাক্ সন্ধ্যার পর দু'জনে নির্জ্জনে ব'সে সে সব কথা হবে। ওহে নসীরাম। আফিমের কৌটাটি আর একবার দাও দেখি? আজ মোতাতটা আসলেই ব'মল না কেন, ব'ল্‌তে পার?”

(৩)

রাত্রিকালে আহারাদির পর আমার শয়নগৃহে আমার বিছানার পার্শ্বে নিতাই দাদার রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হইল। বলা বাহুল্য, নসীরাম মুহুর্মুহু তামাক যোগাইতে লাগিল, আর নিতাই দাদা অবলীলাক্রমে, সেই কল্‌কের পর কল্‌কে ভরা তামাক রাশি ভস্মাবশেষ করিতে লাগিলেন। নসীরামের হাতের অবসর নাই, তার সঙ্গে নিতাই দাদার ওষ্ঠাধরের কামাই নাই, রসনারও বিরাম নাই। বোধ হয়, নিতাই দাদার আফিমের নেশাটা বেস যমিয়াছিল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নূতন ঠান্‌দিদির সম্বন্ধে নানা রকম সরস কথা শুনাইতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন “সে যা হো'ক ভায়া! আসল কথাটা এতক্ষণ ভু'লে গিয়েছিলেম। কি জন্য এ হেন বসন্ত কালের এমন চাঁদনী রাত্রিতে তোমার নূতন ঠান্‌দিদিকে একলা ফে'লে এখানে তোমার সঙ্গে রা'ত কাটাতে এ'লেম, সে কথাটা ভায়া! কই এখনও ত তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না?”

“আপনি আমার নূতন ঠান্‌দিদির যে সরস

কাহিনী ব'ল্‌তে আরম্ভ করেছিলেন, আমার কি আর এতক্ষণ অন্য কোন কথা মনে ছিল? তা, এখন বলুন কথাটা কি?"

নিতাই দাদা বলিলেন,—"সরস্বতীর চিঠি কত দিন পাও নাই?" সরস্বতী আমার মা।

আমি বলিলাম,—"অনেক দিন পাই নাই। পরীক্ষার জন্য আমি বড় ব্যস্ত ছিলেম। সেইজন্য আমিও তাঁকে অনেকদিন থে'কে চিঠি লিখ্‌ত পারি নাই। পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলেই আমি কাশী থে'কে তাঁকে এখানে সঙ্গে নিয়ে আ'স্‌ব।

"সে ত এখানে তোমার সঙ্গে আস্‌বে না।"

"কেন?

"সে যে ঘর বাড়ী সংসার-ধর্ম্ম ছে'ড়ে, তোমাকে একলা ফেলে, কাশীতে গিয়ে, কেন সেখানে এত দিন র'য়েছে, তা কি জান?"

"তিনি ত তীর্থ ক'র্‌তে কাশীতে গিয়েছিলেন।"

"না, তা নয়; প্রকৃত কথাটা তুমি এখনও বু'ঝ্‌তে পার নাই, এই আশ্চর্য্য।"

"প্রকৃত কথাটা কি তাই বলুন না।"

"সে তোমাকে বিবাহ দিবার জন্য কত বার তোমাকে জেদ ক'রেছিল, মনে আছে ত? তুমি সে বিষয়ে তাকে কি ব'লেছিলে?"

"আমি ত তাঁকে বরাবর ব'লে এ'সেছি যে, আমার বিবাহ ক'র্‌বার ইচ্ছে নাই।"

"কেন এমন কথা ব'লেছিলে?"

"আমার মতে বিবাহ করার চে'য়ে, বিবাহ না করাই ভাল।"

নিতাই দাদার মুখে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন,—"আহা! কি কথাটাই বল্লে; প্রাণটার মধ্যে যেন বরফ ঢে'লে দিলে। ইংরেজী লেখা পড়া শিখ্‌লে যে,এমন বাঁদর হয়, আমি আগে তা জা'ন্‌তেম না। সে যা হোক্, স্পষ্ট কথাটা তোমাকে বলি, শোন। পরশু তোমার মা'র কাছ থে'কে আমার নিকট একখানি চিঠি এ'সেছে। চিঠি খানা আমি সঙ্গে নিয়ে এ'সেছি। যদি দে'খ্‌তে চাও ত তোমাকে দেখাই। তাতে সে আমাকে লিখিছে যে, যদি তুমি বিবাহ কর, তা হ'লে সে দেশে ফিরে আস্‌বে। নহিলে এজন্মে আর তোমার মুখ দর্শন ক'র্‌বে না। আমি একটি সুন্দরী মে'য়ে তোমার জন্য ঠিক ক'রে রে'খেছি। তোমার মাও সে কথা জানে। সে লিখিছে যে, এই বৈশাখ মাসে তোমার বিবাহ দিতে হবে। মেয়েটির বাপের বাড়ী আমাদের গ্রাম থে'কে অতি নিকট। তার বাপ এই কলিকাতায় সওদাগরী আফিসে চাকরী করেন। মেয়েটি তোমার নূতন ঠান্‌দিদির মাসতুতো বোন্। তোমার পরীক্ষা শেষ হবা মাত্রই তাকে দেখ্‌তে যেতে হবে!" নিতাই দাদা হাসিয়া বলিলেন "আর যদি কোর্টশিপ কর্‌তে চাও, তা হ'লে তারও বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি!" "আচ্ছা! আপনি যা বল্‌বেন তাই না হয় দেখা যাবে! সে জন্য অত তাড়াতাড়ি কেন?"

"না দাদা? এবার বড় শক্ত লোকের পাল্‌লায় পড়েছ! আর এ কথাও বলে

রাখি,—মেয়েটিকে একবার দেখ্‌লে আর ভুল্‌তে পার্‌বে না! হাঁ! আর একটি মজার কথা বলি শোন! কেহ কেহ বলে মেয়েটির বাপের যেন একটু পাগলের ছিট আছে। তিনি বলেন, তাঁর মেয়ে যেমন নিখুঁত সুন্দরী, ঠিক তারই মত সুন্দর ছেলে না পেলে,তার বিয়ে দিবেন না। দেশ বিদেশে খুঁজে কোথাও তাঁর ছেলে পছন্দ হ'ল না। এদিকে মেয়েটিও ক্রমে বিবাহের বয়স ছাড়্‌য়ে উঠ্‌ল। দেশের লোক তাঁর কত নিন্দা ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তাঁকে জাতিচ্যুত ক'র্‌বে ব'লে, ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুন্‌লেন না! কিছু দিন হ'ল, তিনি কলিকাতায় কোথায় তোমাকে দেখেছিলেন। তুমি বোধ হয়, তা জান্‌তে পারনি! মেয়েটিও তাঁর সঙ্গে ছিল। সেও নাকি তোমাকে দেখেছে! সেই অবধি তাঁর জেদ হ'য়েছে যে, তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিবেন। তিনি আমাকে ধ'রেচেন, যে কোন্ রকমেই হউক, এই কাজটা ক'রে দিতে হবে। আমিও দেখ্‌লেম, অমন ডাগর আর অমন নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে আর পাওয়া যাবে না। তাই তোমার মাকে চিঠি লিখেছিলাম। তার তো খুব ইচ্ছা! এখন ভায়া! তুমি রাজি হইলেই হয়। তোমার ঠান্‌দিদি তো বলেন যে, আজ হয় তো কাল নয়!"

আমি মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, বিবাহ করিব না। সেই জন্য নিতাই দাদার কথাটা চাপা দিয়া,অন্য কথা উত্থাপন করিব মনে করিলাম। আমি জানিতাম, নূতন ঠান্‌দিদির কথা তুলিলে তিনি অন্য সব কথা ভুলিয়া যান। আমি বলিলাম "দাদা! আমার নূতন ঠান্‌দিদি দেখ্‌তে কি রকম?"

নিতাই দাদা বলিলেন "হাঁ! বেশ কথা মনে ক'রে দিয়েছ! তোমার ঠান্‌দিদির তোমাকে দেখবার বড়ই ইচ্ছা। সে আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লে দিয়েছে, পরীক্ষা শেষ হইলেই এই দোলের সময় একবার তাকে দেখা দিতে হবে।"

"আমারও তাঁকে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছা হয়। তা বলুন না, তিনি দেখ্‌তে কি রকম।"

"সে আর তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব? আরব্য উপন্যাসের পরীর কথা প'ড়েছ তো ভায়া? এক কথায় ব'লে দিই, তোমার ঠান্‌দিদি ঠিক সেই রকম একটি পরী! তাই বলি শীঘ্র একবার তাকে দেখে চক্ষু সার্থক কর।"

আমি হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া, উপহাস্য করিয়া বলিলাম,—"দাদা! আমার মনে ভয় হয়, কোন্ দিন তোমার পরী উড়ে না যায়।" নিতাই দাদা হাস্য করিয়া বলিলেন,—"ওহে ভায়া! এ সব ডানা কাটা পরীকে কি প্রকারে বশে রাখ্‌তে হয়,আমি তার অনেক মন্ত্র জানি। আগে তোমার বিয়ে হোক, তার পর তোমাকে সে সব মন্ত্র শিখায়ে দিব। সে যাহোক, এই দোলের সময়, তোমার ঠান্‌দিদির নূতন বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। সে সময়ে যদি তুমি না যাও, আমাকে তার শতমুখীর চোটে অস্থির হ'তে হবে। তার সমস্তই গুণ, দোষের মধ্যে

ভায়া! মেজাজটা একটু কড়া। তাকি জান ভাই”—

আমি আমার নিতাই ঠাকুর দাদার মুখে ঠান্‌দিদির রূপ গুণের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে, তাঁহার পরীর মত সরস অঙ্গভঙ্গী, মধুর হাসি, মোহন কটাক্ষ, কল্পনা-চক্ষে দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

(৪)

সেই রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন নিতাই দাদার সঙ্গে বায়ু সেবনে বাহির হইয়াছি। হঠাৎ আমরা দুজনে যেন এক নির্জন উপবনে আসিলাম। বসন্ত সমাগমে যেন সেই নির্জ্জন উপবন মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। চারি দিকে নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়াছে, নানাবিধ সৌরভ ছুটিতেছে। তরুলতা ঊষার মৃদু সমীরণে নানা রঙ্গে নাচিতেছে। শব্দের মধ্যে, সেই জনশূন্য উপবন মথিত করিয়া অসংখ্য বিহঙ্গ এক সঙ্গে, উচ্চতানে যেন কাহাকে ডাকিতেছে। এমন সুন্দর স্থান আমি যেন পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। আমি যেন নিতাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “এ আবার কোন্ দেশ?” নিতাই দাদা বলিলেন “এ পরীদের প্রমোদ-কানন। এই কাননের মাঝখানে চল, আরও কত নূতন জিনিস পাবে!” আমি নিতাই দাদার সঙ্গে আরও অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, উপবনের মধ্য দেশে স্বচ্ছসলিলা, মৃদুভাষিণী, ক্ষুদ্র নদীর উপকূলে একটি নূতন ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের ভিতরে রাধাশ্যামের পাষাণময়ী যুগল মূর্ত্তি। নিতাই দাদা বলিলেন “ঐ যে মন্দির দেখ্‌চ, এইখানে পরীদের ফুল-দোল হয়। ঐ দেখ, কত ফুল, কত আবির কুঙ্কুম ছড়ান রয়েছে। আর ঐ মন্দিরের ভিতরে চেয়ে দেখ।” আমি মন্দিরের ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম। একি পরী, না মানুষী? পরীর মত রূপ, কিন্তু মানুষীর মত পরিচ্ছদ। পরীর মত শ্রবণদ্বয়স্পর্শি, কৃষ্ণতার নয়নযুগল, পরীর মত কামধনুর ন্যায় বঙ্কিম কটাক্ষ, পরীর মত লাল অধরে মন-ভুলান হাসি, পরীর মত যেন বাতাসের চেয়ে লঘু, উড়ু উড়ু ক্ষুদ্র তনু, পরীর মত পুঞ্জীকৃত, দৃঢ় বন্ধনে সম্মিলিত, কালো মেঘ রাশির ন্যায় দীর্ঘ বেণী।

কিন্তু মানুষীর ন্যায়, বাঙ্গালী যুবতীর ন্যায়, বাসন্তী রঙ্গের ধুতি পরা, নাকে মুক্তার লোলক, হাতে সোনার বালা, আল্‌তা মাখান পায়ে রূপার মল। আমি সবিস্ময়ে নিতাই দাদার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “এ পরী, না মানুষী?”

যেন নিতাই দাদা হাসিয়া বলিলেন “এতক্ষণে এও বুঝ্‌তে পার্‌লে না? পরী না হ’লে কি বাতাসে উড়ে যায়? তুমি এমনি অরসিক, ঐ দেখ, পরী তোমাকে দেখে উড়ে গেল।”

আমি সেই মন্দিরের ভিতর আবার চাহিয়া দেখিলাম, মন্দির শূন্য। সত্য সত্যই কি পরী উড়িয়া গেল? কোথায়, কোন্ দিকে গেল? আমি সম্মুখে, উভয় পার্শ্বে পশ্চাতে, আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। পরীকে আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি যেন কাতর ভাবে নিতাই দাদাকে বলিলাম “দাদা! তুমিতো পরী বশ কর্‌বার মন্ত্র জান, একবার সেই মন্ত্র প’ড়ে পরীকে এখানে ফিরায়ে আন।” নিতাই দাদা। বলিলেন “আকাশের পরী কি ইচ্ছা কর্‌লেই মানুষকে ধরা দেয়? আর শুধু শুধু ওকে ফিরিয়ে এনেই বা কি হবে? যদি তুমি ঐ পরীটিকে বিয়ে কর, তা হ’লে ওকে এখানে ফিরিয়ে এনে, তোমার সঙ্গে বিয়ে দিই!” আমি যেন আনন্দে জিজ্ঞাসা করিলাম “পরীর সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয়?”

“তা হবে না কেন? এই তোমার নূতন ঠান্ দিদিও তো পরী, আমি তাকে বিয়ে কর্‌লেম কেমন করে? “তবে আমি অবশ্য বিয়ে কর্‌ব।”

নিতাই দাদা আমার গা ঠেলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন “তবে এই কথাই ঠিক রই’ল ভায়া।” আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি ঠিক র’ল, নিতাই দাদা?” “এই মাত্র যে বল্‌লে, অবশ্য বিয়ে কর্‌ব।”

আমি নিতাই দাদাকে স্বপ্নের কথা কিছু না বলিয়া, মনে মনে বলিলাম “যদি তাকে পাই তা হলে নিশ্চয় বিয়ে কর্‌ব। নতুবা এ জীবনে বিবাহ কর্‌ব না।” প্রকাশ্যে তাঁহাকে বলিলাম “আচ্ছা! তাই হবে।”নিতাই দাদা বলিলেন,“তবে আজ আমি এই ছয়টার গাড়ীতে বাড়ী যাই। নসীরামকে এখানে রেখে আস্‌চি। পরীক্ষা শেষ হলেই তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে মোহনপুরে আস্‌বে। এর মধ্যে আমি তোমার বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করে রাখ্‌ব। আর তুমি স্বচক্ষে নাত বউকে দেখে পছন্দ কর্‌লে, বিয়ের দিন ঠিক ক’রে তোমার মাকে চিঠি লিখ্‌ব।” ছয়টার গাড়ীতে নিতাই দাদা আবার নূতন ঠান্ দিদির নিকট চলিয়া গেলেন। আমার পরীক্ষা শেষ হইল। আমি নিতাই দাদার নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহাই করিলাম। পরীক্ষা শেষ হইবার পর দিনই, প্রভাতের ট্রেণে নসীরামকে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলাম।

অল্পক্ষণ পরেই পাঁচ ছয়টা ষ্টেশন পরে, রেল গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে চলিলাম। নসীরাম কাপড়ের গাঁটরি ও আমার ব্যাগ পিঠের উপর বাঁধিয়া, একটা ছোট হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে, আমার পশ্চাতে চলিল। আমি সময় কাটাইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, বৃদ্ধ নসীরামের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম,—“আমার নিতাই দাদা খুব রসিক লোক, কি বল নসীরাম?”

নসীরাম হাসিয়া বলিল,—“হাজার হোক্, মোর লাতজামাই। রসিক দেখেই তো মোরা মোদের লাতনীর সঙ্গে ওনার বেয়া দেলাম। তা নইলে কি মোরা অমন লব কাত্যায়নি কে বিষ-গঙ্গার মাঝে ঢ্যাক্‌নে ফ্যালে দেতাম।”

“আমার নিতাই দাদার সঙ্গে তোমার নাত জামাই সম্পর্কটা কেমন করে হ’ল, তা বুঝ্‌তে পার্‌চি না।”

"হা মোর অদেষ্টো! অ্যা কথাডাও তুমি অ্যাখ্যানেও জান না দাদা ঠাউর। তবে শোন! তোমার নিতাই দাদার দাদা শ্বশুর লবক্যাষ্টো বাবু আর মুই, অ্যাক মার প্যাটের যোমজ ভাই বল্‌লিই হয়। মোরে অ্যাক দণ্ড না দেখ্‌লি তিনি পৃথিমী ডাকে ওমাবস্যের রেতের মতন দ্যাখেন। মুই নিজির হাতে তানাকে শরবোত না করে দিলে, চেনির পানা তানার ত্যাতো লাগে। মুই নেরকোল গাছে উঠে ডাব নারকোল না পাড়লে ডাবের জল তানায় লোণা লাগে। ঘুমুবার আগে মুই তানার পা দুটো মুগুর মারা করে দেবে না দেলে, তিনি রাত্রিকালে ভূত প্যারেতের স্বপোন দেখেন। তাঁর লাতনীও যে মোর লাতনীও সে। আর তাঁর লাতজামাই, মোরও লাতজামাই। সে হোক, অ্যাখন মোর আর অ্যাক লাতনীর সঙ্গে তোমার বেয়াডা হয়ে গেলেই মোর মনডা খুসী হয়।"

"তা তুমি কি নিতাই দাদার কাছেই এখন থাক?" "তোমার নিতাই দাদা যখন মোর লাতনীকে ঘর করতি সঙ্গে নিয়ে আসলেন, লবক্যাষ্টো বাবু মোরে বল্‌লেন, তোমার লাতনী অ্যাকলা থাকলি কান্নাকাটা কর্‌বে, তুমি দিন কতক লাতনীর সঙ্গে থেকে নাতজামাইয়ের স্যাবা কর। সেই অবধি মুই দশ দিন বা লাতনীর কাছে থাকিলাম, আর দশ দিন বা লবক্যাষ্টো বাবুর কাছে চলে গ্যালাম।"

"তোমার নাতজামাইয়ের গ্রাম, এখান থেকে কত দূর?" নসীরাম বলিল "এই যে মোরা তানার বাড়ীর উঠোনে এসে দেঁড়ায়চি বল্‌লেই হয়। ঐ যে সামনে বাগানডা দ্যাখ্‌চো, আর ঐ যে বাগানডার মধ্যে খানে নতুন মন্দিরডা দ্যাখচো,—ওকি? অমন কোরে যোমকে উঠে দেঁড়য়ে রইলে যে? রাত্রির কালে এই বাগানডায় ভূত প্যাতনীর ভয় আছে, কিন্তু দিনির ব্যালায় আবার কিসির ভয়?"

আমি চমকিয়া সেইখানে দাঁড়াইলাম। সে দিন স্বপ্নে যেমন দেখিয়াছিলাম, সম্মুখে ঠিক সেইরূপ বসন্ত সমীরণ-সেবিত, পবনান্দোলিত কুসুল-লতা-পরিবৃত, কোকিল দলের কুহরবে নিনাদিত, সুন্দর, সুরম্য, উপবন। আর অদূরে উপবনের মধ্য দেশে ঠিক স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উপকূলবর্তী শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র মন্দির। নসীরাম বলিতে লাগিল "কিসির ভয়। মুই আগে যাচ্চি, তুমি পিছনে চল।" আমি নসীরামের সঙ্গে সেই উপবন মধ্যে অগ্রসর হইয়া, ক্রমে সেই মন্দিরের নিকটে আসিলাম। মন্দিরের অভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিলাম। একি! একটি রমণী মূর্ত্তি! আমি আবার চমকিয়া সেইখানে দাঁড়াইলাম। আবার মন্দিরের অভ্যন্তরে সেই নারী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে দিন স্বপ্নে যাহাকে দেখিয়া, পরী কি মানুষী ঠিক করিতে না পারিয়া, সবিস্ময়ে নিতাই দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "এ পরী না মানুষী?" এতো সেই মনোমোহিনী মূর্ত্তি। যে

মূর্ত্তি নিদ্রার ঘোর অচেতন অবস্থায় দেখিয়া অবধি এক নিমিষের জন্য ভুলিতে পারি নাই, প্রতিমুহূর্ত্তে যেন জাগ্রৎ অবস্থায় সেই পরীর হাত ধরিয়া, সপুলকে, স্বপ্নলোকে বিচরণ করিয়াছি, আজ সেই আমার স্বপ্নের পরী, সেই কল্পনা-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরীর জীবন্ত মূর্ত্তি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! আমার পরী যেন বিস্মিত নেত্রে, পূর্ণায়তন কটাক্ষে, একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল! সে চাহনিতে যেন কত কালের, কত যুগ যুগান্তরের প্রেম! কত দিনের বিরহের পর যেন আজ কত সুখের মিলন! তাহার সেই বিম্বাধরে একটু মৃদু হাসি দেখা দিল! সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, পিছনে সরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল! আমার মনে হইল, আমার মত সেও কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছে? আমার মত সেও কি আমার হাত ধরিয়া, স্বপ্নলোকে, কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিয়াছে?

হায়! যাহারা আত্মাকে জড় দেহের অংশমাত্র মনে করে, তাহারা কি মূর্খ! আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নসীরাম আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে কি বলিতেছিল, বুঝিতে পারিলাম না। সে আমার হাতে ধরিয়া আবার হাসিয়া বলিল "বলি মোর লাতনীকে দেখে যে অ্যাকেবারে আড়ষ্ট হ'য়ে পড়্‌লে? ও মন্দিরডার মধ্যে আর উঁকি মেরে কারে খোঁজ্‌চ? স্যা তো তোমাকে দেখ্‌তি পেয়ে পেল্‌য়ে গিয়েছে।" আমি আবার মন্দিরের অভ্যন্তরে, চারিদিকে, চাহিয়া দেখিলাম। আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না! আমি নসীরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম "নসীরাম! তুমি কি জান, ইনি কে?"

নসীরাম হাসিয়া বলিল "অ্যাত যে দেখা দেখি, চোকো চোকি হল, তবুও চিন্‌তি পারলে না? অ্যাইতো মোর স্যাই লব কাত্যায়নী লাতনী! নাত জামাইয়ের বাড়ীতে চল, আবার ওনাকে দ্যাখ্‌বে অ্যাখন!"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম! কি সর্ব্বনাশ! ইনি আমার নূতন ঠান্‌দিদি! আমার নিতাই দাদার স্ত্রী? হায়! আবার হৃদয় মধ্যে সেই অকস্মাৎ প্রদীপ্ত, পুলকময় আশার দীপ সহসা নিবিয়া গেল। কে যেন অকস্মাৎ আমাকে পদাঘাতে স্বর্গ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল! আমি যেন ঘোর অন্ধকার মধ্যে, ধীরে ধীরে নসীরামের সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। নসীরাম কত কথা বলিতে লাগিল, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দেখিলাম সম্মুখে একটি উদ্যান-পরিবৃত দ্বিতল অট্টালিকার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, আমার নিতাই দাদা। নিতাই দাদা আমাকে দেখিতে পাইয়া, সহাস্য মুখে দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়াণিক প্রকাশ। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"When these dim lights of being close,
and gates of Heaven are nigh at hand,—
জীবনের-ক্ষীণ আলো জ্বলে নিবু নিবু,
উদ্ঘাটিত—সন্নিহিত স্বর্গের দুয়ার ;—

বহুদিন হয় বুঝিয়াছি যে, "পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান"। § কিন্তু যে অর্থে শ্মশানকে দর্শনীয় স্থান বলিয়া বর্ণন করা হয়, শ্মশানযাত্রীর শেষ শয্যা সে অর্থে অধিকতর সম্মানার্হ। শ্মশানে আশার শেষ। সেখানে শিখিবার কথা অশেষ থাকিলেও দেখিবার বস্তু বড় কম। কিন্তু যিনি সংসারযাত্রা সমাপন করিয়া প্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহার শিয়রে কিংবা শয্যার পার্শ্বে বসিয়া পবিত্র ও প্রশান্ত হৃদয়ে তাকাইয়া থাকিলে, মনুষ্য অনেক সময়ে, অনেক অজ্ঞাত সত্য অনুভব, অথবা আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন করিয়া, মানব-জীবনের মর্ম্মরহস্য বুঝিবার সুযোগ পায়।

যে মনুষ্য এক সময়ে আপনার প্রত্যেক পদ-ক্ষেপে এই পৃথিবীকে কম্পিত করিত,—যাহার দৃষ্টিমাত্রেও সহস্র হৃদয় ভয়ে জড়সড় রহিত, আজি সে দুধের শিশু হইতেও অধিকতর দুর্ব্বল। যে অন্যদীয় ন্যায্য স্বত্বের সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিটুকুও বিনা যুদ্ধে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য প্রস্তুত নহে, সে আজি সূচীটিও সঙ্গে না লইয়া শূন্যহস্তে চলিয়া যাইতেছে। যাহার আকাঙ্ক্ষা, সেকন্দর সাহের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার মত, সাগরাম্বরা অব-

* যে সকল সত্য অথবা দৃশ্য, সংসার হইতে মনুষ্যের মহাপ্রয়াণ সময়ে, তদীয় প্রয়াণ-স্থানে, অথবা প্রীতিবদ্ধ সুহৃৎস্বজনের নিকট স্থানান্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাই এই প্রবন্ধে, নামান্তরের অভাবে এবং সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে, প্রয়াণিক-প্রকাশ নামে অভিহিত হইল। ইহা ইংরেজীতে সাধারণতঃ "Incidents of the death-chamber or Revealments of Psychic truths at the time of man's departure from the earth-sphere" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

§ পাঠকের ইচ্ছা হইলে, তিনি প্রবন্ধলেখক-প্রণীত নিভৃতচিন্তার ঐহিক অমরতা নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পারেন।

নীর সমস্ত প্রধান রাজ্য আয়ত্ত করিয়াও অতৃপ্ত ছিল, আজি সে একাকী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার জীবনের স্রোতে একবার একটু আশার ক্ষুদ্র লহরী অল্প অল্প খেলিতেছে ; আবার সে আশা, দেখিতে না দেখিতেই, দূরে সরিয়া পড়িতেছে। চারি দিকে আত্মীয় স্বজন। কিন্তু সকলেই উৎকণ্ঠায় অধীর, আসন্ন বিপত্তির অপরিহার্য্য চিন্তায় অবসন্ন।

বস্তুতঃ, মনুষ্যজীবনরূপ মহানাটকের শেষ অঙ্ক যখন অভিনীত হইতে থাকে,—জীবনের দীপ-শিখা, কিছুক্ষণ নিবু নিবু জ্বলিয়া, শেষে যখন একবারে নিবিয়া যাইবার মত হয়, তখন অন্ধকার ঘরে আলোক-রেখার আকস্মিক প্রকাশের মত, কাহারও চক্ষে অকস্মাৎ অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রয়াণসময়ে প্রকাশিত অধ্যাত্ম সত্য অথবা অধ্যাত্ম দৃশ্য দর্শন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথে কিরূপ সহায়তা করে, তাহা জ্ঞানালিপ্সু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। আমাদিগের ভরসা আছে, বঙ্গীয় পাঠকবর্গ, প্রয়াণিক-প্রকাশের কয়েকটি প্রমাণসিদ্ধ প্রকৃত বৃত্তান্ত আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলে, যেমন বিস্মিত, তেমনই উপকৃত হইবেন।

আমেরিকার অন্তর্গত শিকাগো নগরে সারা নামিকা পণ্ডিতাগ্রগণ্যা পুর-মহিলার নিবাস। সারা আণ্ডারউডের স্বামী বি এফ আণ্ডারউড (B. F. Underwood) বিখ্যাত পণ্ডিত, এবং শিকাগো নগরের এক জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী। কিন্তু, বোধহয়, শ্রীমতী সারা (Sara) পাণ্ডিত্যাংশে স্বামী হইতেও একটুকু উচ্চপদবীরূঢ়। যাঁহারা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত, সারা ও তদীয় স্বামীর নাম তাঁহাদিগের কাহারও নিকটই অপরিজ্ঞাত নহে। ফলকথা, স্বামী স্ত্রী দুই জনেই যেমন সুপণ্ডিত, তেমনই সুশীল, সত্যবাদী ও সাধুবৃত্ত বলিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

এত গুণ সত্ত্বেও, সারা এবং তাঁহার স্বামী, জীবনের এক প্রধান ভাগ, পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, যে চলিয়া গেল, তাহার সকলই চুকিয়া গেল। জীবনের জল-বিন্দু অতল ও অপার জীবন-সাগরে মিশিয়া গেল। দেহের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক স্ফূর্ত্তি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা, এবং জীবনের সমস্ত বৃত্তিই বিলয় পাইল। পৃথিবীর অসংখ্য বৈজ্ঞানিকই এক সময়ে এই রূপ অবিশ্বাসী ছিলেন। শিকাগোর উল্লিখিত বিজ্ঞান-ভক্ত বিজ্ঞ দম্পতিও তাঁহাদিগেরই মত অবিশ্বাসী। অবিশ্বাস আর জ্ঞানের অভিমান অনেক স্থলেই একে অন্যের নিত্যসঙ্গী।

এইরূপ অবিশ্বাসের অন্ধকারসময়ে, এক দিন সারা তাঁহার একটি মুমূর্ষু আত্মীয়ার প্রয়াণ-শয্যায় উপবিষ্টা। যিনি চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার সহিত সারার বড় বেশী ভালবাসার সম্পর্ক। তিনি বয়সে বৃদ্ধা। সারাও বর্ষীয়সী। রাত্রী গভীর। মুমূর্ষুর আর বড় বেশী সময় বাকী নাই। বাড়ীর সকলে একে একে জাগ-পহরার কার্য্য করিয়াছে। এইক্ষণ সেই কার্য্যের ভার সারার প্রতি ন্যস্ত।

সারা, গম্ভীর-হৃদয়ে, একাকিনী উপবিষ্টা রহিয়া, মুমূর্ষুর তৎকালীন পরিম্লানমুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আমাদিগের এ দেশে, এমন সময়ে, প্রয়াণ-গৃহে বড়ই একটা ভয়ঙ্কর হল-হলা উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ আসিতেছে,—কেহ যাইতেছে,—কেহ পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে,—কেহ চীৎকার না করিয়া নীরবে নয়নজলে ভাসিতেছে; আর যাহারা কতকটা নিঃসম্পর্কিত, অথবা নির্ভয় বলিয়া পরিচিত, তাহারা মুমূর্ষুকে ধরাধরি করিয়া বাহির করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাড়া দিতেছে। সুতরাং ঘরের মধ্যে ও বাহিরে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল। পাশ্চাত্য প্রথা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে, এই রূপ মহামুহূর্ত্তে, প্রয়াণ-গৃহের আশে পাশেও কেহ মুখ ফুটিয়া কথাটি কহিতে সাহস পায় না; এবং দুই একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা ধর্ম্মনিষ্ঠ ধীর ব্যক্তি ভিন্ন, কেহই মুমূর্ষুর সন্নিধানে অবস্থিত রহে না।

সারা আণ্ডারউড একা অবস্থিত আছেন, আর বসিয়া ভাবিতেছেন,—"হা এই কি আমার এই জীবন-সঙ্গিনী আত্মীয়ার আনন্দময় পুণ্যজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত? যাঁহাকে এত জানিতাম, এত ভালবাসিতাম, তাঁহার সকলই কি একবারে ফুরাইয়া যাইবে? আকাশের চন্দ্র থাকিবে, সূর্য্য থাকিবে, অসংখ্য নক্ষত্র থাকিবে,—উদ্যানের ফুল, ফল, লতা, পাতা, কীট পতঙ্গ, সকলই থাকিবে; কেবল থাকিবেন না আমার এই জ্ঞানোজ্জ্বলা, গভীর-হৃদয়া, ধর্ম্মশীলা আত্মীয়া? তবে তিনি এত কাল কাহার উপাসনায় জীবনের বহু সুখে জলাঞ্জলি দিলেন? কাহার দিকে চাহিয়া কঠোর কর্ত্তব্যব্রত উদ্‌যাপন করিলেন?"

ভাবিতে ভাবিতে সারার হৃদয়ে ভয়াবহ বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল। বিষাদের একটুকু বিশেষ কারণ ছিল। যিনি চলিয়া যাইতেছেন, তিনি চিরজীবনই পরলোকের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি পোষণ করিয়াছেন, এবং সেই বিশ্বাসের নির্ভরে অনেক সময়ে অকাতর-প্রাণে ও অম্লানবদনে কষ্ট-দুঃখের বোঝা বহিয়াছেন। সারা ভাবিতেছেন,—"হায়! ইহাঁর সেই অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তি আজি অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে! কিছুই আর থাকিবে না, সকলই ফুরাইতেছে! এখানে এমন কেহ আছেন কি, যিনি এ বিষয়ে আমাকে একটুকু জ্ঞান দান করিতে পারেন। আমি যদি দৃঢ়রূপে জানিতে পাইতাম যে, মৃত্যুর পরও মনুষ্য-জীবনের কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমার মনে এ দুঃখ থাকিত না"

সারা যে সময়ে এই রূপ ভাবিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে, ধীরে—ধীরে—ধীরে, যেন তাঁহার প্রার্থনারই প্রত্যুত্তরে, মুমূর্ষুর মুখের উপরে, উপাধানের এক হাত ঊর্দ্ধে, এক খানি অতি সুন্দর, স্নিগ্ধ-মনোহর পীতাভ শ্বেত আলোক ছড়াইয়া পড়িল। প্রয়াণ-গৃহের চারি ধার কতকটা আঁধার ছিল। সুতরাং, ঐ অকস্মাৎ প্রকাশিত অপরূপ আলো সহজেই সারার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আলোর মধ্য-স্থলে, ক্ষণ পরেই, একখানি মুখচ্ছবি পরিস্ফুট হইল। মুখখানি সজীববৎ। মুখলগ্ন চক্ষু দুটি মধুর-হাস্যময়। মুখখানি এমনই শান্তি-প্রদ সস্নেহ দৃষ্টিতে সারার দিকে চাহিল যে, সারার চিত্তে অণুমাত্রও ভয়ের সঞ্চার হইল না। * এই ভাবে কতক ক্ষণ তাকাইয়া মুখখানি অদৃশ্য হইল।

সারা ভাবিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই ধাঁধা দেখিয়াছেন, অথবা উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় বুদ্ধির স্থিরতা হারাইয়াছেন। তিনি আর একটি আত্মীয়কে মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাখিয়া, আত্মস্থৈর্য্য সম্পাদনের অভিলাষে, মুহূর্ত্তের তরে বাহিরে গেলেন; এবং সেখানে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং আকাশের নক্ষত্রমালা নিরীক্ষণ দ্বারা মনে একটুকু সুস্থির হইয়া, পুনরায় গৃহে যাইয়া আপনার আসনে বসিলেন। তখন আবার আপনাকে আপনি মনে মনে জিজ্ঞাস করিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা ধাঁধা নয় ত? যদি এ দৃশ্য প্রকৃতই সত্য বস্তু হয়, তাহা হইলে উহা আমার সমক্ষে আবার প্রকাশিত হইবে কি?"

ভগবান্ অনন্তদেবের অচিন্তিনীয় ইচ্ছায়, সেই অপরিচিত অথচ অত্যধিক পরিচিত-রূপ স্নেহময় মুখখানি আবার তেমনই হসিত-নয়নে প্রকাশিত হইয়া, সারার দিকে কিছু-ক্ষণ তাকাইয়া রহিল।* সারার নিরাশ-শুষ্ক নির্ম্মল প্রাণে ভক্তির অমৃতসিন্ধু তখন কিরূপ প্রবলবেগে উথলিয়া উঠিল, তাহা হৃদয়বান্ মনুষ্য মাত্রই অনুভব করিতে পারেন।

সারা, ইহার পর, আপনার স্মৃতির কক্ষ খুঁজিয়া, এবং বাড়ীর সকলের সহিত আলাপ ও আলোচনা করিয়া, বুঝিতে পাইলেন যে, তিনি মুমূর্ষুর শিয়রে যে মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া ছিলেন, তাহা পূত-চরিতা

*"Then from the center of this, immediately over the hidden face, appeared an apparently living face with smiling eyes which looked directly into mine, gazing at me with a look so full of comforting assurance that I could scarcely feel frightened."

* "When I was sure of myself, I returned and took my place again alone. Then I asked that, if that appearance were real and not an hallucination, would it be made once more manifest to me; and again the phenomenon was repeated, and the kind, smiling face looked up at me—a face new to me yet wondrously familiar." সারা আণ্ডারউডের এই স্বাক্ষ্য সর্ব্বপ্রথম আমেরিকার এরিনা (Arena) নামক মাসিক সন্দর্ভে প্রকাশিত, এবং ঐ সূত্রে বহু পত্রিকায় উদ্ধৃত ও সমালোচিত হয়। উহা তাহার পর তৎপ্রণীত অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে Psychic Ex-perience নামে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের ষ্টেড্ (Stead) প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরাও সারা আণ্ডারউডের উচ্চশ্রেণীস্থ পাণ্ডিত্য ও পরীক্ষণ-পটুতার উপর নির্ভর করিয়া উল্লিখিত বৃত্তান্তের সমর্থন করিয়াছেন।

মুমূর্ষূরই স্বর্গগত পিতৃদেবের মুখচ্ছবি। সে মুখ একবার নহে, ক্রমে দুইবার দেখিয়াছেন; এবং দুইবারই, দীর্ঘস্থায়ি সময়, তাকাইয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছেন। অপিচ, সে মুখের আকারে ও প্রকারে এবং সজীব-নয়নের সুখশান্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিসঞ্চারে, যেন মনের সমস্ত কথারই উত্তর পাইয়াছেন। এমন অবস্থায় সত্যপ্রিয় সাধুর মনে সংশয়ের আর স্থল থাকে কোথায়?

অধ্যাত্মজ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের মহাপ্রয়াণ সময়ে, তাহার পরলোকগত আত্মীয়স্বজনেরা, তাহাকে আদর করিবার জন্য, দেবপুরুষদিগের সঙ্গে সমাগত হইয়া থাকেন;—আর যিনি প্রীতিস্নেহের সাদর-সম্ভাষণে ও নানাপ্রকার উপকারসাধনে বহু প্রাণ শীতল করিয়াছেন, এবং পবিত্র ও পরার্থ জীবন যাপনের দ্বারা দেবধামের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ সময়েই তাঁহাকে অশেষ-বিশেষে সম্মান ও সন্তর্পণ করেন। সারা আণ্ডারউডের সাক্ষ্যে সে কথারই কতকটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমাগত আত্মিকদিগের মধ্যে একজনই স্নেহের আকর্ষণে সারাকে দর্শন দান করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে আরও কত স্বর্গগত নরনারী মুমূর্ষূর মঙ্গলার্থ উপস্থিত ছিলেন, তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে? যাঁহাদিগের Psychic sight অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি অধিকতর প্রখর, তাঁহারা সকলকেই স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকেন।

জুমিয়া জাতি।

চট্টগ্রামের পূর্ব্বোত্তর প্রান্ত,—"কুশলিয়া মুড়া" হইতে যে একটি অবিচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালা অনন্ত পাদপশ্রেণী অঙ্কে করিয়া সুদূরবর্ত্তি পার্ব্বত্য প্রদেশ, দক্ষিণলুশাই পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি অসভ্যজাতি বাস করে। তাহারা চাকমা, কুকি, লুশাই, জুমিয়া প্রভৃতি নামে অভিহিত। আদিম পাহাড়ী লোক হইলেও এখন চাকমাদিগের সে জাতীয় ভাব নাই। তাহারা বাঙ্গালীর সংসর্গে অর্দ্ধ বাঙ্গালী সাজিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশধরেরা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া ইংরেজী চালে চলিতেছেন। এখন তাঁহারা গৃহের আসবাবগুলি পর্য্যন্ত অতি যত্নের সহিত বিদেশ হইতে সংগৃহীত করিতেছেন। কিন্তু কুকি, লুশাই, জুমিয়া বলিলে এখনও নিখুঁত পাহাড়ী লোক বুঝায়। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে আহার বিহারে কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য থাকিলেও, প্রায় সর্ব্ববিষয়েই জুমিয়াদিগের বিশেষ পার্থক্য ও বৈষম্য দৃষ্ট হয়। এই নিমিত্ত অদ্য আমরা তাহাদের বিষয় কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। তাহারা কুকি, লুশাইদিগের ন্যায় পশুভাবাপন্ন নহে। তাহাদিগের প্রকৃতিতে নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।

তাহারা নর-কপাল দ্বারা গৃহের শোভাবর্দ্ধন ও নর-শোণিতে উপাস্য দেবতার অঙ্গ রঞ্জিত করিতে জানে না। জুমিয়া জাতি হত্যার নামে শিহরিয়া উঠে। অহিংসাই তাহাদের জাতীয় ধর্ম্ম এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা আশৈশব কালের শিক্ষা। ফলতঃ জুমিয়ারা নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক। কোন বিষয়ে তাহাদের কপটতার পরিচয় নাই। প্রকৃতি, আদিম অবস্থায়, যেরূপ সাজে সজ্জিত করিয়া তাহাদিগকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এখন পর্য্যন্ত তাহারা সেই সীমা অতিক্রম করিয়া, এক পদও অগ্রসর হয় নাই। কপট সভ্যতার বাহ্য আবরণকে তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। বিনয়ের প্রতিকৃতি জুমিয়া রমণীদিগকে দেখিলে, বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমতী সরলতা নিরন্তর তাহাদের লাবণ্য মাখা মুখমণ্ডলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা নারীজন-সুলভ ছল চাতুরীর ভাণ জানে না। নয়নে কুটিল কটাক্ষ-বিক্ষেপ নাই। কিছু জিজ্ঞাসা কর, পদ্মপলাশনেত্রদ্বয়, সর্ব্বাবয়বে তোমার মুখের উপর বিন্যস্ত করিবে; এবং অনিমিষলোচনে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে। অতিথি অভ্যাগতের প্রতি তাহাদের আদর অভ্যর্থনাও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাহারা সানন্দচিত্তে সকলের প্রতি সমান ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকে। মুখে বিরাগের চিহ্নমাত্রও নাই। অধরে সর্ব্বক্ষণ অমিয় মাখা মধুর হাসি। আবার যুবতী সমাজ পরিত্যাগ করিয়া যুবক সমাজে প্রবিষ্ট হও, দেখিবে, যেন সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়া অতি সন্তর্পণে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং অর্দ্ধপথে পদস্খলন হেতু যেন সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া না যায়, তন্নিমিত্ত অদূরে থাকিয়া অভিভাবকগণ সাবধানতা বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেছে।

অন্দর মহলের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া থাকিলে, মনে নানাবিধ কুভাবের সঞ্চার হইয়া, চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে, এই ভয় অপনোদন মানসে জুমিয়া রমণীগণ সর্ব্বক্ষণ স্বামীর সান্নিধ্যে থাকিয়া নানা কার্য্যে তাহাদের সহায়তা করে। যখন জুমিয়ারা দারুণ বৈশাখী রৌদ্র মস্তকে করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবরে জোম কাটিতে আরম্ভ করে, তখন সোহাগের খনি জায়া পার্শ্বে থাকিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে থাকে। তাহারা কর্ত্তিত জোম স্বামী হস্ত হইতে লইয়া গুচ্ছ বান্ধিয়া স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখে এবং মধ্যে মধ্যে নানাবিধ কৌতুকজনক কথার অবতারণা করিয়া শ্রমক্লিষ্ট ভর্ত্তার শ্রান্তি দূর করিবার চেষ্টা করে। সংসারের দারুণ দুঃখের মধ্যে যে জাতির এ হেন শান্তিপ্রদায়িনী, মধুরভাষিণী ভার্য্যা, তাহাদিগকেও আমরা অসভ্য, বর্ব্বর ও জঙ্গলি বলিয়া উপহাস করি! ইহা আমাদের পক্ষে একটু ধৃষ্টতা নয় কি?

জুমিয়া জাতির মধ্যে বহু বিবাহ Poly-Gamy প্রথা প্রচলিত নাই। এক স্বামী আজীবন এক স্ত্রীতে রত থাকিয়া নির্ব্বিবাদে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যায়। তাহাদের বিশ্বাস,—দেবসম্মুখে যে যোড়-বন্ধন হয়,

তাহা উচ্ছেদ করা মানুষের ধর্ম্ম নহে। এই হেতুই ব্যভিচার বা কোনরূপ পাশববৃত্তির পরিচালন প্রভৃতি কদর্য্য কার্য্য গুলি জুমিয়া পল্লীতে প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। জুমিয়া জাতির মধ্যে দাম্পত্যপ্রেমও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যে যুবক বিবাহের পূর্ব্বে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বেড়িয়া বেড়াইয়াছে, পরিণয় কার্য্য-সম্পাদিত হইবার অব্যবহিত পরে, তাহার আর সেই ভাব থাকে না। প্রণয়িনীর প্রেমালিঙ্গনে স্থির ও ধীর ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং এই পবিত্র সম্মিলনের গুণে কঠোর সংসারকেও চিরদিনের তরে কোমলতাময় করিয়া রাখে। দেখিলে নয়নে প্রীতি জন্মে ও প্রতীতি হয়, যেন দুই মূর্ত্তিতে এক আত্মা সমভাবে বিরাজ করিতেছে। তখন ইচ্ছা হয়, এই চির অশান্তিময় দাসত্ব জীবন একবার জুমিয়া জীবনের সঙ্গে বিনিময় করিয়া,—

"শুয়ে ওই ধরাতলে
লয়ে প্রিয়া বক্ষঃস্থলে
লভি স্বর্গসুখ; ওই
জুমিয়া জীবন"।

জুমিয়ারা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চশিখরে বাসস্থান নির্ব্বাচন করে। যে স্থান হইতে প্রকৃতির চারুচিত্র সম্যকরূপে পরিলক্ষিত এবং বালার্কের কিরণ-স্পর্শে, যে স্থান সর্ব্বাগ্রে সম্পূত হয়, তাহারা মনে করে, সেইস্থান সর্ব্বদা নিরাময়। এরূপ স্থানে বহুসংখ্যক জুমিয়া দল বাঁধিয়া একত্র বাস করে। তাহারা যে স্থানে বাস করে, তাহার সাধারণ নাম জুমিয়াপাড়া। তাহাদের এক এক পাড়াতে এক এক জন দলপতি থাকে। তাহারাই সমাজের নেতা। তাহাদের নাম "রোয়াঝা"। পল্লীমধ্যে সকলকে এই রোয়াঝার আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু তাহারাও যদি সমাজবিগর্হিত কোন কার্য্য করে, প্রচলিত প্রথা অনুসারে, এই উচ্চ পদস্থ রোয়াঝাদিগকেও অম্লানবদনে সামাজিক দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। দণ্ড আর বেশী কিছু নহে; পুনঃ পংক্তিতে উঠিবার নিমিত্ত পংক্তি-পাবন সমাজ তাহাদের নিকট এক বৃহৎ ভোজ দাবি করিয়া থাকে।

জোম মহলে ভূমির খাজানা নাই। গবর্ণমেণ্ট জুমিয়াদিগের কাছে কেবল 'যোড়ার' খাজনাই পাইয়া থাকেন। যতদিন পর্য্যন্ত জুমিয়ারা অবিবাহিত অবস্থায় থাকে, কোন রাজকর তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিবাহের পর যুগল মূর্ত্তিতে দেখা দিলে, রাজা তখন তাহাদিগহইতে কর আদায় করিয়া লন। আবার স্ত্রী কি স্বামী বিয়োগের পর, যোড়-বন্ধন ছিন্ন হইলে, তাহারা এই কর হইতে অব্যাহতি পায়। জুমিয়া দিগের জোম করার নিয়ম লাঙ্গলের চাষ হইতে স্বতন্ত্র। তাহারা যে স্থানে জোম করে, অগ্রে সে স্থানের জঙ্গল কাটিয়া পোড়াইয়া উহা পরিষ্কার করিয়া লয়। বর্ষারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে তাহাতে, বহুসংখ্যক অনতিবৃহৎ গর্ত্ত করিয়া রাখে। প্রথম বৃষ্টির পর মৃত্তিকা যখন কিঞ্চিৎ শীতল হয়, তখন তাহাতে নানা শস্যের বীজ বপন

করে। যেইটি যে সময় ফলে, সেইটি সেই সময়ে কাটিয়া লয়। এরূপ কৃষি করার নামই জোম করা এবং ইহা হইতেই তাহাদের নাম জুমিয়া হইয়াছে। কিন্তু এরূপ জোম করা দ্বারা ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই নিমিত্ত সরকার বাহাদুর এখন জোম করায় প্রশ্রয় না দিয়া, লাঙ্গলের চাষেরই উপদেশ দিয়া থাকেন।

হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি জুমিয়াদিগের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। কিন্তু তাহারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ। মহর্ষি গৌতম তাহাদের উপাস্য দেবতা। এই প্রদেশের মগসমাজে তিনি [illegible] নামে পরিচিত। তাঁহার সাধারণ নাম মহামুনি। এই নাম হইতে তাঁহার অধিষ্ঠিত স্থানের নামও মহামুনি হইয়াছে। চট্টগ্রাম সদর ষ্টেশন হইতে, জল পথে ছয় ক্রোশ উত্তরাভিমুখে গমন করিলে, মহামুনিতে উপনীত হওয়া যায়। দেবমন্দির এক অনুচ্চ পাদশৈলোপরি নির্ম্মিত। অভ্যন্তরস্থ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং যোগাসনে উপবিষ্ট। এই আসীন অবস্থায়ও তাঁহার মস্তক, মন্দিরের চূড়া স্পর্শ করিয়াছে। মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণভূমি অতি বিস্তৃত। ইহার এক পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ নাগকেশর ফুলের গাছ। নাগকেশর ফুলরাজি জুমিয়া রমণীদিগের কবরী-শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্তই যেন পর্য্যাপ্তরূপে ফুটিয়া রহিয়াছে। অদূরে আর একটি অনুচ্চ শৈলমালা। পদচিহ্ন অঙ্কিত একটি ক্ষুদ্র বর্ত্ম উহার ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহাই পার্ব্বত্য প্রদেশ,—চন্দ্রঘোণা যাইবার অন্যতর স্থল-পথ। প্রাগুক্ত মহামুনি মন্দিরের সান্নিধ্যে আরও দুইটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ইহার একটির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কোঁড়াতারা; আর একটিতে চাঁইন্দামুনি অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাঁরাও যথোচিত পূজা সম্মান পাইয়া থাকেন। বৃহৎ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর আটা। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় সম্মুখের দ্বার দিয়া। মন্দির ও প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানটি মন্দির প্রদক্ষিণের নিমিত্ত রাখা হইয়াছে। মন্দির প্রদক্ষিণ করিবারও একটি শৃঙ্খলা আছে। এক দলের যাত্রী কখনও অন্য দলের সঙ্গে যোগ দিবে না। কারণ, তাহা ব্যভিচার। এই প্রদক্ষিণের দৃশ্যটিও দেখিবার বস্তু। নায়ক নায়িকার অনুরাগ-সঞ্জাত স্মিতকটাক্ষ, আবেগময় করতালি, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত স্তুতিগান, তালে তালে পাদ-বিক্ষেপ, সকলই সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক।

চৈত্র সংক্রান্তির সময়, এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। সেই সময় বহু দূর হইতে, বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়ী লোকের সংখ্যাই অধিক। এই স্থানের লোকে বিষুবসংক্রান্তির পূর্ব্বদিবসকে ফুল বিযু বলে। ঐ দিবসের রজনী জুমিয়া জাতির একটি বিশেষ পর্ব্ব রাত্রি। সূর্য্যাস্ত হইতে পুনঃ উদয়কাল পর্য্যন্ত, গৃহে, প্রাঙ্গণে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বস্থানে কেবল জুমিয়াদিগের আনন্দোৎসবের কোলাহল। প্রেমবিমুগ্ধ যুবক ভাবী প্রণয়িনীর মোহিনী মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে।

সেই স্থানে উভয়ের প্রথম শুভদৃষ্টির কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়া যায়। দেব-সম্মুখে জীবনের চির-সঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্ব্বাচন করিতে পারিলে ভাবী জীবন মঙ্গলময় হইবে, এই বিশ্বাসের অনুবলে তাহারা বৎসরান্তে এ স্থানে আসিয়া বিবাহের সূচনা করে।

বন জঙ্গলে বাস, অশন বসনের পারিপাট্য নাই, ভোগ-বিলাসের উপকরণ নাই, বংশমঞ্চে শয়ন ও উপবেশন, এ হেন হীনাবস্থায় থাকিয়াও, জুমিয়া রমণীরা কখন ফুলের লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। পাহাড়ের যে অঙ্গে একটি কুসুমিত ফুলগাছ দেখিবে, পল্লীর সমস্ত যুবতীবৃন্দ সেই স্থানে সমবেত হইবে। যখন তাহারা ফুলের সাজে সজ্জিত হয়, তখন এই পুষ্পাভরণা রমণীরা বাস্তবিকই সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। প্রকৃতির অঙ্কপ্রতিপালিতা প্রকৃতিপ্রদত্ত বনফুলে সজ্জিতা হেমবরণী জুমিয়া যুবতীরা কবরী হইতে অর্দ্ধ অনাবৃত উন্নত বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত, যে অঙ্গে যেটি ভাল সাজে, বনকুসুমদ্বারা ভূষিত করে। এবং এইরূপে ফুল সাজে সজ্জিত হইয়া যখন তাহারা শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিতে থাকে, তখন দূর হইতে দেখিলে, সচল দেবীপ্রতিমা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এহেন ফুল্ল চন্দ্রমুখের কলঙ্ক রেখা,—নত-নাসিকা।

পাঠক! শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, দেশীয় বরুয়াজাতি ভিন্ন, কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে বাল্যবিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই। অপরিণত বয়সে, এবং পরস্পরের অসম্মতিতেও পূর্ব্বসাক্ষাৎ ভিন্ন, তাহারা কখনও বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। যুবক যুবতীর পতি পত্নী নির্ব্বাচনের পূর্ণক্ষমতা জন্মিলে এবং আলাপ পরিচয়দ্বারা উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটিলে, বিষয়টি অভিভাবকদিগের কর্ণগোচর হয়। এইরূপ বিবাহ-প্রস্তাব যদি বয়োবৃদ্ধ অভিভাবকদিগের অনভিমত হয়, দম্পতি-যুগল তাহাদের অজ্ঞাতসারে বনকান্তারে যাইয়া বিবাহের অবশিষ্ট আনুষ্ঠানিক কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া লয়। পরে অভিভাবকদিগের ক্রোধানল প্রশমিত হইলে, তাহারা পুনঃ গৃহে ফিরিয়া আসে। তখন নিতান্ত শত্রুকন্যা হইলেও, তাহারা কখনও অনাদৃত বা অশ্রদ্ধাভাজন হয় না। পিতা মাতার সম্মতিতে যে বিবাহ হয়, সেই বিবাহের সকল উদ্যোগ তাহাদিগকেই করিতে হয়। বিবাহযাত্রীদিগের মধ্যে ফুলের টোপর মাথায় বরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, অপেক্ষাকৃত ন্যূনবয়স্কা বালিকার দল, তৎপশ্চাৎ যুবতীবৃন্দ, সর্ব্ব পশ্চাৎ আত্মীয়স্বজনদিগকে লইয়া পিতা খুল্লতাত প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধেরা যাইবে। যাত্রীদল কন্যার পিতৃভবনে উপনীত হইলে, স্বয়ম্বরা যুবতী কন্যা মঞ্চতল পর্য্যন্ত নামিয়া আসে, এবং চারি চক্ষুর সম্মিলন হইবা মাত্র, পত্নী সাদরে পতির কর ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া যায়। এই গৃহে তাহারা পক্ষকাল পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের সহবাসে থাকিয়া বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করিয়া লয়। এই কাল মধ্যে যদি একের অসম্মতিতে অন্য জন মঞ্চ ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসে, বিবাহ-বন্ধন

চিরকালের তরে ছিন্ন হইয়া যায়। এবং মুখে বিবাদের কালিমা মাখিয়া নব-পরিণীত দম্পতি ক্ষোভে দুঃখে চলিয়া যায়।

এস্থলে মঘজাতির আর একটি সংস্কারের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিলে, বোধ হয়, সহৃদয় পাঠক-বৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে না। সেইটি তাহাদের বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলের সংস্কার। জাতীয় ভাষায় এই সংস্কারকে মৈসাং বলে। ইহা হিন্দুদের কোন সংস্কারের অনুরূপ না হইলেও, তাঁহাদের চূড়াকরণ ও দীক্ষার সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। মৈসাংয়ের অর্থ গুরু-গৃহে যাইয়া সংযতচিত্ত হওয়া। ইহার প্রথম কার্য্য শিরমুণ্ডন, পরে কর্ণভেদ। গুরুসন্নিধানে যাইবার সময়, পবিত্র ভাবে, স্নাত হইয়া, কোপীন পরিয়া যাইতে হয়। এই বেশে তাহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখায়। অজাতশ্মশ্রু বালকগণ;—এখনও যৌবন চিহ্ন ভাল করিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে না, এহেন বয়সে সংসারের সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কাঙ্গালের বেশে নবীন যোগী সাজিয়া, গুরুর অনুবর্ত্তী হইতেছে। অঞ্চলের ধন, স্নেহের মণি তনয়ের বৈরাগ্য বেশ দেখিয়া, মাতা দীননয়নে কাতরকণ্ঠে বলিতেছেন, 'বাবা! ফিরিয়া আসিবে কি'? বালক একবার জননীর প্রতি তাকাইল, এবং মৃদুস্বরে বলিল,—'জানি না।' গুরু সম্মুখে বসিবার নিয়ম জানু পাতিয়া নত শিরে। জীবনের মধ্যে এই সময়ই তাহাদের প্রথম ও শেষ মস্তক প্রক্ষালন ও কেশচ্ছেদন। কিন্তু যাহারা রাউলী হয়, তাহাদের আজীবন মুণ্ডিত মস্তক ও পরিধানে গৈরিক বসন। অগ্নি স্পর্শ করিবার বিধি না থাকাতে তাহাদিগকে পরান্নভোজী হইতে হয়। শৈশব হইতে যে বালক গুরু-গৃহে থাকিয়া, বৈরাগ্য দীক্ষার অনুবলে সংসারের নশ্বরতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়, এবং বাসনাবিবর্জ্জিত হইয়া, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহারা গুরুদত্ত ছত্র ও শিরস্ত্রাণ গ্রহণ করিয়া মঠে প্রবেশ এবং রাউলী বা ধর্ম্মযাজকের আসন গ্রহণ করে। এই রাউলী দিগের অন্যতর নাম ঠাকুর। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যেমন হিন্দু সমাজে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাউলীরাও সেইরূপ বা ততোধিক সম্মানার্হ। কিন্তু বর্ণভেদ অনুসারে যেরূপ ব্রাহ্মণ, সেইরূপ জাতীয় বিভাগানুসারে রাউলী নহে। কঠোর সাধনা ও কৌমার-ব্রত উদ্‌যাপনদ্বারা যাহার চিত্তের শুদ্ধিলাভ হয়, নিতান্ত নিকৃষ্ট বর্ণ হইলেও, সেই উন্নত রাউলী শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা প্রলোভনময় জগতের ভোগলিপ্সা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে অসমর্থ, তাহারা রাউলী জীবন পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়। এই অবনতি দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে "লোথক" অর্থাৎ পতিত বলিয়া উপহাস করে।

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

সাগরের প্রতি নদী।

তোমারি উদ্দেশে ভ্রমি বহু দেশ,
ত্যজিয়া সাধের জনমভূমি,
বহু আশা মনে, তাই এত শ্রমে
বহু দূর হ'তে এসেছি আমি।
ছিনু আমি যবে শৈলবিহারিণী
চঞ্চলা বালিকা, সম কুরঙ্গিনী
এদিক ওদিকে যেতাম ছুটিয়া,
পরিতাম কেশে কুসুম লুটিয়া,
প্রকৃতি-পালিত বনচর যত,
আদরে আমায় চুমিয়াছে কত,
তখনো জাগেনি মনের মাঝে,
তোমার মতন, প্রাণ-বিমোহন
হৃদয়-দেবতা দূরেতে রাজে।
ছিনু আমি ভোর শৈশব-স্বপনে,
আকাঙ্ক্ষা, বাসনা জাগিত না প্রাণে,
ভাবিতাম মনে বন মাতা-স্নেহ
জগতে অতুল পর্ব্বত-গেহ,
একটি পাখীর ক্ষণিক উচ্ছ্বাস,
একটি ফুলের সুরভি নিঃশ্বাস,
প্রকৃতির বন্য শিশুর খেলা,
ঢালিত পরাণে কি সুখ বিমল
জীবনের সেই প্রভাত বেলা!
সে নীরব পুরে এলে ঊষা রাণী
দোলাইয়া স্বর্ণ অঞ্চল খানি,
কানন বল্লরী কত না যতনে,
অঞ্জলি পুরিয়া কুসুম রতনে
আনি দিত তাঁর চরণ কমলে,
গাইয়া উঠিত বিহঙ্গম দলে,
শুনি সেই গান, অধীর পরাণ
করিতাম আমি মৃদু মৃদু গান,
শৈশবের মোর সে গান শুনিয়া
দিগ্‌বধূ গণ উঠিত হাসিয়া,
হাসি ঊষা খুলি কৌটার সিন্দূর
মেখে দিত গালে, স্নেহে ভরপুর
কি সুখে হয়েছে জীবন গত,
আজো সেই গান, আজো সেই স্থান,
মনে পড়ে দূর স্বপ্নের মত!
আসিত যখন পূর্ণিমা যামিনী,
রজতের ধারা গগন-প্লাবিনী
পড়িত ভূতলে, মুগ্ধ দশ দিক্,
দিনমান ভ্রমে কুহরিত পিক্,
আমি কত না সজ্জায় সজ্জিত হইয়া
কৌমুদীর মালা গলায় পরিয়া
হাসিতাম কত সুখের হাসি,
কাননে কাননে জ্যোৎস্না-প্লাবনে
উছলি উঠিত রূপের রাশি!
একদিন আমি শ্রাবণ-প্রভাতে
বিস্ময়ে বিভলা, নারিনু বুঝিতে—
কাহার আহ্বানে সুপ্ত অনুরাগ
যৌবন-নিকুঞ্জে হইল সজাগ,

কোথা হ'তে এল বাঁশরীর সুর,
কে দিল পাঠায়ে সুগন্ধ প্রচুর,
সেই দিন হ'ল, নূতন জীবন,
সেই দিন যেন জীবন-কানন,
নব বসন্তের নব পদার্পণে,
সাজিয়া উঠিল কুসুম-ভূষণে
শৈশব-সঙ্গিনী, শৈশবের খেলা,
কে দিল ভুলায়ে সে প্রভাত বেলা,
অজ্ঞাত সুখের কল্পিত লালসা,
মনে দিল বল, হৃদয়ে ভরসা,
ভাবিনু তখন আপন মনে
সুখের পিপাসা শ্রাবণ প্রভাতে
কে আজ জাগাল আমার প্রাণে।
দেহেতে হইল কি যে নববল,
অধীর হৃদয় যৌবন-চঞ্চল
বুঝিনু তখন হইবে না স্থির,
না দেখিয়া সীমা এই পৃথিবীর,
ছিনু আমি আগে ক্ষুদ্র নিঝরিণী,
তখনি হইনু মত্ত তরঙ্গিণী,
ছাড়ি শৈল গৃহ ধাইনু অবনী
ভ্রমিয়া দেখিতে জগত-তলে,
জন্মশোধ সেই জন্মভূমি হ'তে
বিদায় লইনু নয়ন জলে।
ভ্রমি কত দেশ, কত জন পদ,
কত অরণ্যানী শোভার আস্পদ,
সুন্দর নগরী, গিরি পদ তল,
কুসুম-উদ্যান, ক্ষেত্র সমতল,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
যুগ যুগান্তর পথে কাটাইয়া,
আসিয়াছি আজ তোমার কাছে,
লও স্নেহে তুমি হে জীবন-স্বামি,
এ তুচ্ছ প্রাণের যা কিছু আছ।
আমি ক্ষুদ্র, তুমি অনন্ত মহান্,
তুমিই তোমার উপমার স্থান,
তুমি জলনিধি, আমি নিঝরিণী,
রত্নাকর, এই উপল বাহিনী
কি দিবে তোমারে? দেহ পদ ছায়া,
কি উদার প্রাণ কি সুন্দর কায়া!
জন্মের তপস্যা হইবে সফল,
আমিও হইব ঐ নীল জল!
আপনা বিকাব, আপনা হারাব,
আপনা বলিতে কিছু না রাখিব,
রহিব না আমি আপনার আর,
তোমাতে মিশিয়া হব একাকার,
হে মহান্ সিন্ধো আরাধ্য আমার,
যুগ যুগান্তর তপস্যা-ফলে
আজি পুণ্য দিনে, আপনা মিশায়ে,
অতনু হইব সুনীল জলে!

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

স্বামী না ত কি ?

দুই সখীর কথা।

নবন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরযুবালার দ্বিতীয় পত্র।

রসারোড, কলিকাতা।

প্রাণাধিকা সরস্বতী,

ভাই সুভা, আমি তোমার তৃতীয় পত্রের অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। পত্রে যাহা লিখিবে,তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছি। আমি তোমার প্রখরবুদ্ধি ও প্রতিভা লইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান খণ্ড না পড়িয়া থাকিলেও, অনুমান করিতে শিখিয়াছি। তাই, আর অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল না। আমি তোমার প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পড়িয়াই বাড়ীতে পাঁচ জনের কাছে কতকটা হারি মানিতে বাধ্য হইয়াছি। তার উপর আবার তৃতীয় ? না ভাই, তোমাকে একটুকু অপেক্ষা করিতে হইবে।

তোমার লেখনী ত লেখনী নহে, উহা সহস্রধারার পাহাড়িয়া ঝর্ণা। তোমার জিহ্বায় যেমন ভাগীরথীর প্রবল তরঙ্গ, লেখনীতেও সেইরূপ পাহাড়িয়া নদীর কল কল স্রোত। এত গুণ না থাকিলে কি ব্যক্তিবিশেষের প্রাণটা তোমার পদতলে লুণ্ঠিত রহিতে ভালবাসিত ? না, সে প্রথম বয়সের আর পাঁচ প্রকার উচ্ছৃঙ্খল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, শুধু মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই, তোমার প্রেমের শৃঙ্খল গলায় পরিত ? ভাই, আমি অনেক দিনের পর, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আমার ঢেঁকী বুদ্ধির যোগ্য একটা মোটা রসিকতার কথা লিখিলাম। তুমি যদি ইহার প্রত্যুত্তরে আমার উপরে তোমার কবিতা বৃষ্টি করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। আমি কোন দিনও তোমার সহিত তর্ক করিয়া সুবিধা পাই নাই। এখন ত আরও পাইব না। এখন তুমি বহুপণ্ডিতের আদরে ও অভ্যর্থনায় সরস্বতী সাজিয়াছ,—করে সরস্বতীর মত বীণা ধারণ করিয়া কথায় কথায় রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কার দিতে শিখিয়াছ। এখন কি আর তোমার সহিত আমার মত কাষ্ঠ-মস্তিষ্কার তর্ক সাজে।

তবে তর্ক করি কেন ? তর্ক করি প্রাণের জ্বালায়। আমার চিত্তে, সামাজিক জীবনের কতকগুলি বিষয়ে, কএকটা সংস্কার বড়ই দৃঢ়বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যখন তোমার কথায়ও সে সকল জ্বালাময়সংস্কার সম্যক্ উন্মূলিত হইতেছে না, তখন আর কাহার কথায় ভাই আমার প্রাণটা শীতল হইবে ? তুমি ত জান তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ। আমি এ কথা

তোমাকে সহস্রবার বলিয়াছি। বোধ হয়, জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত, শত সহস্র প্রকারে ইহার পুনরুক্তি করিলেও কথাটা আমার কাছে পুরাণ হইবে না। আমি যখন চক্ষু বুজিয়া জগতের বিবিধ তত্ত্বচিন্তায় আত্মবিস্মৃত হই, তখন দেখিতে পাই, আমার প্রাণটার এ পাশে, ও পাশে,—উহার ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে, আমার প্রাণাধিকা সুভাষিণী। তখন আমি ভাবিতে থাকি, হা এ আমার কি হইল ? আমি কি সত্য সত্যই তবে আর একটা সুভাষিণী হইতে চলিলাম ? কিন্তু ভাই, এইরূপ একপ্রাণতা অথবা একাত্মতার মধ্যেও যে তোমাতে আমাতে একটু পার্থক্য রহিয়া যাইতেছে, ইহা কি প্রকৃতই দুঃখের বিষয় নহে ? তুমিও ত এ দুঃখ অনুভব করিয়াছ, এবং বোধ হয় এমনই কিছু কহিয়া হৃদয়ের পরিতাপ জানাইয়াছ। আমাদিগের এ মতদ্বৈধের কি কোন একটা মধ্যভূমি অথবা মীমাংসাস্থল নাই ?

এই দুঃখের কথায়ও প্রসঙ্গতঃ তোমাকে একটি হাসির কথা না জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না। সে কথা তোমার সখীপতির সহৃদয়তা ও শিক্ষিত-বুদ্ধির বৈচিত্র্য। আমি তোমার কাছে লিখিয়াছিলাম যে, রমণীর স্বত্বাধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে আমার যে মত, মনোরও সেই মত। এখন দেখিতেছি, মনোর মতটা পাড়াগেঁয়ে ক্ষুদ্র নদীর পারাণি নৌকার ন্যায়। উহা একবার যায় তোমার কাছে, আর একবার আইসে আমার কাছে। পরেশ আর হৃদয়ও এই জন্য মনোকে পরিহাস করিয়া নানা কথা বলে। বুড়োদের মধ্যে বাবু দুর্গামোহন দাসও তাহাকে পরিহাস করিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু সে পর্ব্বতের মত অচল,—পরিহাসে সে মুহূর্ত্তের তরেও স্পৃষ্ট কিংবা বিচলিত হয় না।

ভাল, তুমি দুর্গামোহন বাবুকে বিশেষরূপে জান কি ? তিনি ত সময়ে সময়ে কাশী যাইয়া থাকেন। তুমি যদি তাঁহাকে না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে প্রকৃতই আত্মপর-ভেদ-শূন্য উদারহৃদয় সাধুপুরুষ দেখ নাই। এইরূপ দয়াধর্ম্মশীল, উন্নতচরিত্র ও অক্রোধ মনুষ্য পৃথিবীতে একান্ত দুর্ল্লভ। এ দেশে পরোপকার ব্রতের আদর্শপুরুষ পূজাস্পদ বিদ্যাসাগর-মহাশয়, আর তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য সদাশয় দুর্গামোহন। দুর্গামোহন বাবু হাইকোর্টের সম্পর্কে আমার কাকার বন্ধু,এবং সেই সূত্রেই তাঁহার সহিত আমাদিগের এত ঘনিষ্ঠতা। আমরা রসাষ্ট্রীটে আসিয়া উপনিবিষ্ট হওয়ার পর হইতে তিনিই আমাদিগের প্রধান মুরুব্বি। তিনি দুই বেলাই আমাদিগের খবর লইয়া থাকেন, এবং তোমার পত্র গুলি বড়ই আগ্রহের সহিত পাঠ করেন। এদেশে যাঁহারা অবলাবান্ধব অথবা "Advocate of Woman's Rights" বলিয়া সম্মান পাইবার যোগ্য,বাবু দুর্গামোহন তাঁহাদিগের অগ্রগণ্য। দুর্গামোহন বাবু আমাদিগের মনোকে সেকেলে সদর-আলা শ্রীনাথ তর্কপঞ্চাননের তুলনাস্থল বলিয়া বর্ণনা করেন। তর্কপঞ্চানন * যেমন

* বহুদিন হয়, বরিশালে শ্রীনাথ তর্কবাগীশ নামক এক জন শান্ত শিষ্ট সদর-আলা সর্ব্ব-

ছিলেন অগাধ পণ্ডিত, তেমন ছিলেন অমায়িক মধুরভাষী। তিনি সকলকেই দুটি প্রিয়কথা কহিতে ভাল বাসিতেন ; এবং তাঁহার এজলাসে যখন যে উকীল বক্তৃতা করিতেন, তিনি নাকি তাহারই দিকে তখন গড়াইয়া পড়িতেন। মনোও যে ভাই ক্রমে তামার মতের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে, ইহা আর এক প্রকারে আমার বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। আমি ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, পুরুষ অক্স্‌ফোর্ড পড়িয়া এম এ হইলেও রমণীকে তাহার মনের পুতুল মনে করিবার কারণ নাই।

তুমি তোমার পত্রে রমণী প্রকৃতির সংসারদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য এমং রমণীজীবনের ক্রমোন্নতি বিষয়ে অশেষ কথা লিখিয়াছ ;—যাহা লিখ নাই, তাহারও কতকটা আভাস দিয়াছ। আমি কোন্ কথার উত্তর দিব ? তুমি স্বভাবকবি,—সৌন্দর্য্যের উপাসক। তুমি রমণীর রূপ এবং রমণীর চিত্ত ও চরিত্রের অপরূপ কমনীয়তার দিকে চাহিয়া, —যেন আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া, উদ্দীপনার তরঙ্গে ভাসিয়াছ ;—এবং রমণী এক দিন না এক দিন, রমণীয়তার স্বাভাবিক আধিপত্যেই সংসারে পূজা পাইবে, এই কথাটিই নানা প্রকার মধুর ভাষায় বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছ। আমিও বলি, তথাস্তু,—তাহাই হউক ;—তোমার প্রাণের আশা পরিপূর্ণ হইয়া এই পৃথিবীকে স্বর্গশোভা ও স্বর্গসম্পদ প্রদান করুক।

কিন্তু ভাই, তুমি সামান্য একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমার আশার সাফল্য সমাজের দুই দিকে অথবা দুই অঙ্গে দুইটি গুরুতর পরিবর্ত্ত-সাপেক্ষ। তোমার কথা অনুসারে প্রথম চাই, কুল-রমণীর রমণীয়তা লাভ ;—তার পর, কিংবা তার সঙ্গে সঙ্গে চাই পুরুষ-জাতির পৌরুষিক উন্নতি, অর্থাৎ পুরুষ-সমুচিত বীর-চরিত্রের বিকাশ। তুমি নিজেই ত লিখিয়াছ,——

"বীর বিনে আর, কার কণ্ঠহার
হইবে কুলের নারী ?"

আমি অবশ্যই এতটুকু বুঝি যে, তোমার সুমার্জ্জিত-বুদ্ধিচিন্তিত বীরত্ব শুধুই বাহুবলের বীরত্ব নহে। তুমি চিত্তের বল ও চরিত্রবলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বীরত্ব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছ ; এবং মিল, কোম্‌টি, চ্যানিঙ্‌ ও পার্‌কার্‌ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগকে তুমি মহাবীরের আসন দিতে প্রস্তুত আছ। কেন না, তাঁহারা প্রত্যেকেই মনুষ্যসমাজে দুর্ব্বলের বল, দুঃখীর সুহৃৎ, দুর্ব্বলের শক্তি ও সর্ব্বজনীন-স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া পূজা পাইয়া গিয়াছেন ;—আর কুল-রমণীর ন্যায্য

স্বত্ব এবং ন্যায়সম্মত শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব বিষয়ে আলোচনা করিয়া, নয়নজলে ভাসিয়াছেন। কিন্তু ভাই সুভা,—আমার প্রাণাধিকা, তুমি কার কাছে কি কথা কহিতেছ ? আমাদিগের এই বঙ্গদেশ কিংবা ভারতভূমি কি মিল, কোম্‌টি, এবং চ্যানিঙ্‌ ও পার্‌কারের জন্মভূমি ? যে দেশের পুরুষ, অতি সামান্য,—অতি নগণ্য একটুকু স্বার্থের জন্যও, পৃথিবীর সকলের কাছে পদলেহনে সম্মত হইয়া, ঘরে আসিয়াই আপনার ভীরুস্বভাবা স্ত্রীর কাছে ভল্লুকের মত গর্জ্জন করিতে ভালবাসে, সেই দেশ কি কোম্‌টির দেশ, না চ্যানিঙের দেশ ? যে দেশের উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপ্রতিভান্বিত লেখকেরাও পুর-মহিলাকে পাশব-লালসার সামগ্রী ভিন্ন আর কোন প্রকারে ভাবিতে পারিল না,—ভাবিতে শিখিল না, এবং ভাষার চিত্রে ভুলিয়াও একবার পবিত্র ভাবে ও সম্মাননার বর্ণে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইল না, সেই দেশ কি পুরুষোচিত বীরের দেশ ?

তুমি তোমার পত্রে পুনঃ পুনঃই ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যত্ন পাইয়াছ ; আমিও তোমাকে ঐ দুই দেশের কথা একটুকু বেশী ভক্তির সহিত চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তুমি একবার ঐ দুই সুসভ্য-সমুন্নত সমৃদ্ধ দেশের সুশিক্ষিত ও সমুন্নত রমণীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-চিত্র মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, আমাদিগের এ দেশের সমাজ ও পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর ; এবং রমণী কোথায় হৃদয় ও মনের সৌন্দর্য্যে অধিকতর ফুটিতে পাইয়াছে, এবং স্বামিত্বের সর্ব্বগ্রাসি-প্রভুত্ব-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মনুষ্যত্বের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখ।

আমার কথা ভাই মোটা কথা। মানিলাম,—একবার নহে,—একশত বার নহে,—একলক্ষ বার মানিয়া লইলাম যে,—স্বামিত্ব আর প্রেমের স্বত্ব এক কথা, এবং সে স্বত্ব মনুষ্যকে মনুষ্যের দেহ-প্রাণ ও মনের উপরও আধিপত্য প্রদান করে। কিন্তু প্রেম যখন প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে স্বভাবতঃই পরস্পর-সেবা আর পরস্পর-পূজা, তখন প্রেমের স্বত্ব ও প্রেমের আধিপত্য শুধুই এক জনের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে কেন ? আর প্রেমের বিকাশেই যখন মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ, তখন উহা সেই মনুষ্যত্বের পথেই বা কণ্টকস্বরূপ হইবে কি জন্য ? স্বামীও মনুষ্য, স্ত্রীও মনুষ্য। স্বামিস্ত্রীর সামাজিক অথবা প্রেম-ধর্ম্মময় সুখ-সম্বন্ধ যত-কেন Mysterious অর্থাৎ প্রাকৃত-তত্ত্বের নিগূঢ়মর্ম্মাত্মক ও পবিত্র হউক না, স্বামীর আগে হইতে হইবে প্রকৃত মনুষ্য, তার পর হইতে হইবে স্বামী ; এবং স্ত্রীরও আগে হইতে হইবে প্রকৃত মনুষ্য, তার পর হইতে হইবে স্ত্রী। যেখানে স্বামিত্ব কিংবা স্ত্রীত্ব সেই মনুষ্যত্বেরই সর্ব্বপ্রকার স্বত্ববিঘাতক,—মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে ঘোরতর বিঘ্নজনক, সেখানে স্বামিস্ত্রী-সম্পর্কের আর মহিমা থাকে কোথায় ?

জন প্রিয়তার জন্য সুপরিচিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই তর্কবাগীশ মহাশয়ই ভ্রমক্রমে তর্কপঞ্চানন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তর্কবাগীশ কাহাকেও একটি কটু কথা কহিতে পারিতেন না। এই হেতু বরিশালের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, এবং তাঁহার বিচারপ্রণালীর বিবিধ ত্রুটিও বিস্মৃত হইয়া যাইত। জ্ঞানানন্দ।

তুমি সীতা আর সাবিত্রীর কথা কহিতে ভালবাস। আমিও তাঁহাদিগের অনুপম চরিত্র চিন্তা করিতে ভালবাসি, এবং তাঁহাদিগের নাম-উচ্চারণ-সময়ে উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া থাকি। সীতা আর সাবিত্রী উভয়েই রমণীকুলে দেবতা, এবং প্রেমময়-পবিত্রতা-সম্বন্ধে আদর্শচরিতা। তাঁহাদিগের কথা পৃথক্, এবং তোমার স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা সীতা আর সাবিত্রীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দাম্পত্য-জীবনের যে সকল বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও পৃথক্। তুমি এ সকল অলৌকিক জ্যোতিঃশালি আদর্শচিত্র পরিত্যাগ করিয়া নিত্যপ্রত্যক্ষ লৌকিক-জীবনের প্রকৃত চিত্র লইয়া আলোচনা করিলেই, তোমার প্রতিভাময়ী বুদ্ধি আমার প্রাণটায় প্রবেশ করিবার পথ পাইবে। ভাই, তুমিই ত বলিয়া থাক যে, "বৃক্ষ তোমার নাম কি? না, ফলেই তার পরিচয়।" তুমি যদি, মানবজীবন-রূপ মহাকাননে প্রবেশ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সমাজবৃক্ষের নিকট ফলের কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই আমার আর এ আলোচনায় দুঃখ থাকে না।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায়ও নানারূপ সমাজবৃক্ষ ফুলে ফলে শোভা পাইতেছে; এবং আমাদিগের এ দেশেও নানারূপ সমাজ-বৃক্ষ ফুলের সৌরভে ও ফলের গৌরবে মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ফুল লইয়া আমাদিগের কথা নহে, কথা হইতেছে এই ক্ষণ শুধুই ফল লইয়া। এ সকল বৃক্ষে বৃক্ষে ফলের কিরূপ বিভিন্নতা, তাহা একটুকু মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলে ভাল হয় না কি?

যাঁহারা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় দাম্পত্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া স্বামী বলিয়া পরিচয় লাভ করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ স্ত্রীর সুহৃৎ, সখা, এবং শিক্ষা, সম্মান ও সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়। তাঁহাদিগের "প্রেমের স্বত্ব এবং মমতার আধিপত্য" নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলজনক। তাঁহারা আপনারা যেমন বড় পণ্ডিত, তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীরাও সেইরূপ পাণ্ডিত্যের উচ্চ আসনে সমাসীনা। আজি ঐ দুই দেশে বহুসহস্র বিবাহিতা রমণী বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্রী বলিয়া দেশের পূজা পাইতেছেন,—অনেকে আপনার লেখনীর প্রসাদাৎ বৎসরে লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জনের দ্বারা অসংখ্য দীন-দুঃখীর জীবনরক্ষার উপায় করিয়া দিতেছেন; এবং অন্যূন সহস্রাধিক রমণী, সভাস্থলে দণ্ডায়মানা হইয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ গূঢ়রহস্য বিষয়ে গ্লাড্‌ষ্টোন প্রভৃতির ন্যায় বক্তৃতা করিয়া পণ্ডিতদিগেরও বিস্ময় জন্মাইতেছেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা, আমাদিগের এ দেশে, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া "প্রেমের স্বত্ব ও মমতার আধিপত্যে" স্বামী সাজিতেছেন, তাঁহারা হয় ত স্ত্রীকে হাড়ে মাংসে জ্বালাইয়া ও অশেষ-প্রকারে নিপীড়ন করিয়া, অবশেষে আত্মহত্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য করিতেছেন; না হয় ত তাহাকে ফুলের সাজে ফুলরাণী সাজাইয়া—নারীজীবনের নিম্নতম স্তরে নামাইয়া লইয়া, অথবা নীচাদপিনীচ নিকৃষ্টতম অবস্থায় পঁহুচাইয়া, নিভৃতে বসিয়া রূপ দেখিতেছেন। এ কথা সর্ব্বব্যাপক সত্য না হইলেও, প্রায় ঘরে ঘরেই ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি না;—এবং এই বহিঃশান্তিময়ী বঙ্গভূমি অবলার আর্ত্তনাদ, অভিসম্পাত, নীরব অশ্রু অথবা নিত্যসম্ভাবিত অধঃপাতে ক্রমেই নিরয়-গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছে কি না, সে বিষয়ে বিচারের ভার তোমার হস্তে।

ভাই জগদীশ্বরের সৃষ্টি সকল দেশেই সমান। সেই সূর্য্য, সেই চন্দ্র, সেই রক্ত, সেই মাংস,—সেই বুদ্ধি, সেই মেধা,—সেই তৃষ্ণা, সেই ক্ষুধা; কোন অংশেও কোন পার্থক্য নাই। এমন অবস্থায়, আমাদিগের দেশে, তোমার সরস-শব্দ-বর্ণিত "প্রেমের স্বত্ব" পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদের ন্যায় নিনাদিত থাকা সত্ত্বেও, একটি পুরসুন্দরীও ইয়ুরোপীয় পুরসুন্দরীদিগের সমকক্ষ হয় না কেন? ইয়ুরোপে নারীর জন্ম হইয়াছে, আকাশের নক্ষত্রতত্ত্ব নিরূপণ ও মানবসমাজের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করিতে; আর আমাদিগের জন্ম হইয়াছে দাসীবৃত্তি দ্বারা দিন যাপন অথবা পরের পদ-লেহন করিতে! এ ব্যবস্থা কার? জগদীশ্বরের না মনুষ্যের? ইয়ুরোপীয় নারী, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হইয়া, এবং শত সহস্র চক্ষুকে আপনার দুটি চক্ষুর দ্বারা শাসিত করিয়া, সংসারের সকল স্থলেই, স্বকীয় বুদ্ধি ও মহত্ত্বের সমুজ্জ্বল চিহ্ন ও নাম-মুদ্রা মুদ্রিত রাখিয়া যাইতে পারেন;—আর আমরা স্বামীর আজ্ঞা বিনা সহোদর সদৃশ ব্যক্তির সহিতও কথাটি কহিতে সাহস পাই না, অথবা সমর্থ হই না! আমাদিগের ললাটে এ লিপি কে লিখিয়াছেন? মনুষ্য, না মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা?

পুর-সুন্দরীরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সরোদ্ধার করিয়া নয়নে অঞ্জন পরুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তাহারা, যে নয়নে অঞ্জন পরিয়া দর্পণে দশ বার আপনার মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছে, সেই সুন্দর নয়নে একবারও কি এই অনন্ত জগদ্‌গ্রন্থের একটি অধ্যায় পাঠ করিবে না? বিজ্ঞান তাহাদিগকেও সহস্র জিহ্বায় আমন্ত্রণ করিতেছে। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা, সখীর ন্যায় হাত বাড়াইয়া, তাহাদিগকেও মনুষ্যত্বের অধিকারে শিক্ষা দিতে চাহিতেছে। তাহারা কি একবারও উহার সাদরসম্ভাষণ কান পাতিয়া শুনিবে না?—একবারও, বিজ্ঞানের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, এই চন্দ্রতারাময়ী প্রকৃতি অথবা ঐ অপার সমুদ্র ও ঊর্দ্ধশীর্ষ পর্ব্বতের শোভা সম্পদ্ পরীক্ষা করিবে না?

ভাই, তুমি অবশ্যই বুঝিতেছ, আমি এখানে তোমাকে কিংবা আমাকে লক্ষ্য করিতেছি না। তোমার ও আমার দিন একপ্রকার কাটিয়া যাইবে। আমি যদি আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণে শুধু আপনার সুখেই তৃপ্ত থাকিতে পারিতাম,—অথবা তৃপ্তিলাভ করিতে জানিতাম, তাহা হইলে ভারত-রমণীর হীনদশা-চিন্তনে, আমার দুনয়নে মাঝে মাঝে অশ্রু ঝরিত না। আমি তাই তোমার ও আমার কথা বিস্মৃত হইয়া এ দেশের পুরনারী মাত্রকেই এখানে লক্ষ্য করিতেছি,—

এবং ছোট ও বড় সকলকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে,—আমরা কোন দিনও কি মনুষ্য-সমাজে মনুষ্যের মত দাঁড়াইতে,—মনুষ্যলভ্য স্বভাবিক স্বত্ব ও সম্পদ ভোগ করিতে অধিকারিণী হইব না? আমরা, স্বামীর প্রেমে, কিংবা সংসারের ধর্ম্মে, তোমারই বর্ণিত জগন্মোহিনী অথবা জগজ্জননীর ব্রতধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, জীবনের কোন অবস্থায়ও কি আপনি আপনার অধীশ্বরী হইতে পাইব না?

তুমিই ত বোধ হয় বলিয়াছ,—যত দূর স্মরণ পড়ে, তোমার মুখেই ত বোধ হয় শুনিয়াছি যে, পতিপরায়ণা পুর-নারীর পক্ষে পাঁচটি কার্য্য প্রধান। তোমার শ্লোকটি এই মুহূর্ত্তে আমার মুখে সরিতেছে না। কিন্তু কথাগুলি আমার মনে গাঁথা আছে। পুর-নারী যদি নারীসমাজে পুণ্যবতী বলিয়া সম্মানের আসন লাভ করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী ও স্বচ্ছবস্তুর মত হৃদয়ে স্বচ্ছ হইবে;—স্বামীর হিত-কার্য্যে সখীর ন্যায় সুবুদ্ধি দিবে;—সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিবে, এবং গৃহের যত কিছু করণীয় কর্ম্ম থাকে, তাহা দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করিবে। জগদীশ্বর যদি পুরুষের জন্যই এই জগৎ-সংসার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ব্যবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু সংসার যখন স্বামিস্ত্রী দুইয়েরই সমান সম্পত্তি, তখন এই রূপ একচ'খো ব্যবস্থা টিকিবে কি ভাই?

কথা কয়টার তাৎপর্য্য ক্রমে ধরিয়া ধরিয়া অর্থ পরিগ্রহে যত্ন কর। যে নারী গৃহস্থের গৃহিণী হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই গৃহস্থালির সমস্ত কার্য্যে সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ হইতে হইবে। ইহাতে কাহারও-ই আপত্তি হইতে পারে না। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায় দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাও ভাল কথা। মনে রাখিও, পক্ষপাতশূন্য (!) ব্যবস্থাদাতা এখানে প্রিয়কার্য্য বলেন নাই, হিতকার্য্য বলিয়াছেন। প্রিয়কার্য্য আর হিতকার্য্য এক কথা নহে। প্রিয়কার্য্য অতি সহজ, হিতকার্য্য কঠিন। স্বাস্থ্যরক্ষা, সুনিয়মিত জীবনযাপন ও সাংসারিকতার হিতকার্য্যে স্বামীর সঙ্গিনী অথবা সুহৃৎ হওয়া আমাদিগের এই বঙ্গদেশে শিক্ষিতা ও সদ্বংশজাত-সদাশয়া রমণীর পক্ষে সকল গৃহেই সম্ভবপর কি না, সে অতি কঠিন সমস্যা। তথাপি কথাটা ভাল।

তার পরের কথা স্বচ্ছতা অথবা সরলতা। স্বচ্ছতা শব্দের আর কি অর্থ হইতে পারে, তাহা জানি না। আমার বিবেচনায় সরলতাই উহার প্রকৃত অর্থ; এবং কিবা স্ত্রীলোক কিবা পুরুষ, কিবা দাম্পত্যজীবন, কিবা সাংসারিক ধর্ম্মের অন্য কোন প্রকার জীবন, জীবনের সকল অবস্থায়,—সকলের সম্পর্কেই, মনুষ্যের সরল হওয়া সুবিহিত। স্বামীর প্রীতিসুখ-প্রার্থিনী এ সকল গুণে গুণবতী হউক, এবং আরও বহুবিধ গুণের দ্বারা স্বামীর চিত্তরঞ্জন অথবা সুখ-শান্তি সম্পাদন করুক, কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না;—বরং পৃথিবীর সকলেই তাহাতে সায় দিবে, এবং সহানুভূতি দেখাইয়া প্রশংসা করিবে। কিন্তু বিধাতা যাহাকে একটা পৃথক্

অস্তিত্ব ও পৃথক্ মনুষ্যত্ব দানে পৃথক্ "এক জন" রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, সে কেমন করিয়া ছায়ার ন্যায় আর এক জনের অনুগামিনী হইবে;—এবং হৃদয় শত দুঃখে জর্জ্জরিত, শত দুর্ভাবনায় দগ্ধ হইতে রহিলেও, সর্ব্ব অঙ্গে আভরণ-ধারণের দ্বারা, একটি আমোদের পুতুল অথবা সোনার শজারু সাজিয়া, সততই হাসি মুখে প্রহৃষ্টতা দেখাইবে। এ চিত্র কি প্রাকৃত, না অপ্রাকৃত; এবং নারী-জীবনের কর্ত্তব্যরেখা বিষয়ে এই রূপ নির্দ্দেশ সমাজের উপকারজনক, না অপকারজনক?

ভাই, সেই আনুগত্যই প্রকৃত আনুগত্য, যাহা ভয়ের দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া শুধুই প্রীতি ও ভক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকে; এবং সেই প্রীতি ও সেই ভক্তিই প্রকৃত প্রীতি ও প্রকৃত ভক্তি, যাহা প্রাণে কোন প্রকারের ক্লেশ না জন্মাইয়া প্রাণনিহিত সমস্ত শক্তিকেই সতত উন্নতির দিকে আকর্ষণ করে।

তুমি ত ভাই, এ দেশের বহু লোককেই বিশেষরূপে জান,—বহু পরিবারেরই সংবাদ রাখ। উপরিলিখিত অস্বাভাবিক আনুগত্য অথবা স্বামিভক্তির ব্যবস্থা আমাদিগের এই জীবনারাধ্য জন্মভূমির কত জলন্ত প্রতিভাকে থাবা দিয়া নিবাইয়া ফেলাইয়াছে,—কত শিক্ষাভিলাষিণী দেবস্বভাবা রমণীকে পিশাচের সেবাদাসী রূপে পরিণত করিয়া, মনুষ্যজীবনের সকল আশা নষ্ট করিয়াছে, তাহা কি তোমার মত জ্ঞানোজ্জ্বলা সরস্বতীরও চক্ষে পড়িবে না? স্বামী তাহার স্বভাবের কদর্য্যতায় গাছের বানর, বনের শূকর এবং গৃহস্থাশ্রমের ছাগ ও কুক্কুর অপেক্ষাও ধিক্কৃত জীবন যাপন করিবে;—আর স্ত্রী তাদৃশ পশুর কাছেও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী, এছরাজের ন্যায় মধুরভাষিণী ও মন্দিরার ন্যায় মৃদু-মৃদু-নাদিনী হইয়া, মুখে আধো ঘোমটা টানিয়া, মৃদু-মধুর কথা কহিবে; এবং আপনার ইহকাল-পরকাল ও পুরোবর্ত্তি অনন্তকালের অনন্ত-জীবন-সংক্রান্ত সমস্ত আশা তাহার "শ্রীশ্রীচরণকমলে" প্রেম-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ উপহার দিবে!

আর সে স্বামী কিরূপে স্বীকৃত? স্ত্রী যাহাকে কোন দিনও চিনিত না, জানিত না,—যাহার অস্তিত্বেরও কোন সংবাদ রাখিত না,—বিবাহের বর-মাল্য-দানের পূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও যাহার কোন সংবাদ রাখিত না, সেই ত সেই স্বামী, এবং তাহারই ত ছায়ারূপিণা হওয়ার কথা! সে যদি মদ্যপায়ী, তাহা হইলে তাহার প্রেমসঙ্গিনী ছায়াময়ীও মদ্যপায়িনী হউক; এবং সে যদি বিকট একটা জানওয়ার, অথবা নিত্যজীবনে অতি নীচ নিকৃষ্ট জন্তুর উপমাস্থল হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীও ঠিক তাহারই অনুরূপ হইয়া নারীজীবনের সার্থকতা করুক!

না ভাই, এ ব্যবস্থায় আমি কাহারও সাথী নহি; এবং যদিও বিবাহ করিয়াছি,—বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছি, তথাপি যে স্থলে স্বামিগ্রহণ অথবা বিবাহের অর্থ আত্মার অস্তিত্বত্যাগ অথবা মনুষ্যত্ববিসর্জ্জন, সে স্থলে তর্ক ও যুক্তির কোনরূপ প্ররোচক কথায়ই

আমি এরূপ বিবাহ-বিড়ম্বনার পক্ষপাতিনী হইতে সম্মত নহি। আমি ইয়ুরোপ ও আমেরিকার কোন ধার ধারি না। ইংরেজী ও ফরাশি প্রভৃতি ভাষার প্রসাদাৎ ইয়ুরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞানে অতি সামান্য প্রবেশপথ পাইয়াছি বলিয়া কাহারও কাছে দাসখত লিখিয়া দি নাই। কিন্তু ঐ দুই দেশ, এ অংশে, অর্থাৎ রমণী-জীবনের উচ্চতর বিকাশে, আমার চক্ষে প্রকৃতই স্বর্গস্বরূপ। ঐ সকল স্থলে প্রেমের স্বত্ব ও মমতার আধিপত্য আর এক পদার্থ।

ভাই সুভা, আমি আজি আর বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না। যাহা লিখিলাম, তাহাই আজিকার জন্য যথেষ্ট। লিখিবার সময় পুনঃ পুনঃই প্রাণটা যেন পুড়িয়া গেল, এবং চক্ষে জল ঝরিল। তুমি আমার প্রাণাধিকা। তোমায় মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, তুমি আমার কোন কথা পরিহাসের ভাষায় উড়াইয়া না দিয়া আমার কাছে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা লিখিবে; এবং তোমার সমস্ত কথা এক পত্রে না ফুরাইলে, বরং দুই পত্র লিখিবে। তুমি বহু বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছ, অতএব তোমার বহু দায়িতা। "Of him much shall be required, to whom much have been given"—জগদীশ্বর যাহাকে যত বেশী দিয়াছেন, তাহার নিকট তত বেশী চাহিবেন। ভারতবর্ষের না হউক, অন্ততঃ বঙ্গদেশের বহুলক্ষ রমণী তোমার মুখ-প্রেক্ষিণী হইয়া আছে। তুমি, তাহাদিগের দিকে চাহিয়া, একবার মুখ ফুটিয়া তোমার প্রাণের কথা কহিলেই, আমার প্রাণটা জুড়াইবে।

দাদা মহাশয় আর দিদীমাকে আমার শত সহস্র প্রণাম এবং ললিতকে সস্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। তুমি মনোর নিকট পত্র লিখ না, এইজন্য সে বড় দুঃখিত। আমরা যখন আবার কাশী যাইব, তখন কি তুমি তাহাকে দেখা দিবে না,—তাহার সহিত কথা কহিবে না? এই বুঝি সই তোমার ও আমার একপ্রাণতা? আমি বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছি বলিয়া দেবালয়ে ভোগ দিয়াছ, এবং সধবারে বস্ত্র দান করিয়াছ; আর যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে এতই পর মনে করিতেছ ও দূরে রাখিতেছ। না ভাই, তুমি এইরূপ করিলে আমি অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া তোমাকে সন্তাপিত করিব! আমি কি কোন দিনও ললিতের সহিত কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইয়াছি? তুমি মনোর "মত ও বিশ্বাস" রূপ খিচুড়ির একটু পরিচয় চাহিয়াছ। সে খিচুড়ির কথা আর এক দিন লিখিব। ললিত শিক্ষার পথে ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, এ সংবাদে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। সুখী হইয়াছি, কিন্তু বিস্মিত হই নাই। এমন চন্দনলতার সুশীতল সংস্পর্শে সকলেই সুরভি হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় তোমার ও আমার হৃদয়ের আশা পূর্ণ হউক; এবং দাদা আর দিদীমার হৃদয় ললিতের যশঃসৌরভে সতত প্রফুল্ল রহুক।

তোমার চিরজীবন-সঙ্গিনী,
চিরপ্রীতিপ্রার্থিনী,
সরযূ।

ছায়া-দর্শন।

দশম অধ্যায়।

উপক্রম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকায় একটি বড় কবি, Lyric of the Golden age অর্থাৎ স্বর্ণযুগের সুখ-সঙ্গীত নামে একখানি অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়া, সমগ্র সুসভ্য জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কবির নাম টমাস্ লেক হারিস্ (Thomas L. Haris)। তাঁহার দুই একটি কথা সত্যপ্রিয় পাঠক মাত্রেরই সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"Facts are the basis of philosophy ;
Philosophy the harmoney of facts
Seen in their right relation."

হারিসের কথা কবিতায় গাঁথা হইয়া থাকিলেও, উহার অর্থ বড় গভীর। এই পংক্তিত্রয়ের তাৎপর্য্যার্থ এই ;—বৃত্তান্তই জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান পরস্পর-সম্বদ্ধ বৃত্তান্ত-নিচয়ের সামঞ্জস্য মাত্র। বস্তুতঃ বিজ্ঞান কি?—না কতকগুলি সযত্ন-সংগৃহীত ও সুপরীক্ষিত বৃত্তান্তের সারোদ্ধার সত্য। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সকলেই এই তত্ত্বসূত্রের সমর্থন করিয়াছেন, এবং এই চিরপরিজ্ঞাত সাধারণ সূত্র অবলম্বন করিয়া, বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইতে যত্ন পাইয়াছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ উইলিয়ম টম্সন (Sir William Thomson) বৃটিশ এসোশিয়েসন (British Association) নামক বৈজ্ঞানিকসভার ১৮৭১ খৃষ্টাব্দীয় অধিবেশনে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে,—

"Science is bound by the everlasting law of honour to face fearlessly every problem which can fairly be presented to it ;"

সার্ উইলিয়ম টম্সন্ স্কটলণ্ডের বিশ্রুতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। তিনি যেরূপ উচ্চ শ্রেণির লোক, তাঁহার উক্তিও সেই রূপ উচ্চভাবযুক্ত। তাঁহার কথার এই মর্ম্ম যে,—এ জগতে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার বৃত্তান্তসঙ্কলন এবং সেই বৃত্তান্তসমূহের অর্থপ্রকটন বিজ্ঞানশাস্ত্রের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। বিজ্ঞান যদি বৃত্তান্তের সম্মুখীন হইতে ভয় পায়, অথবা বৃত্তান্তকে এড়াইয়া যায়, তাহা হইলে উহা বিজ্ঞান নহে।

আমরা পাঠককে অধ্যাত্মতত্ত্বের কতকগুলি প্রামাণিক বৃত্তান্ত ক্রমান্বয়ে উপহার দিয়া আসিতেছি। আজি এই অধ্যায়েও দুইটি পরীক্ষিত বৃত্তান্ত উপহার দিলাম। এই সকল বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্ত মিলাইয়া, তাহার সারার্থ উদ্ধার করা পাঠকের আত্মকর্ত্তব্য।

পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, যে প্রকার ঘটনাচয়ের বৃত্তান্ত সমূহ ছায়াদর্শনে বিবৃত হইতেছে, ভারতবর্ষেও তাদৃক্ ঘটনা অহরহ সংঘটিত হইয়া থাকে। সে সকল ঘটনা বান্ধবে প্রকাশিত হইতেছে না কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বহু কথায়ই বলিবার আছে। আমরা এইক্ষণ দুইটি মাত্র কথা বলিব।

প্রথম কথা বৃত্তান্তের সত্যতা। ছায়াদর্শনের সত্য পৃথিবীর কোন বিশেষ দেশে নিবদ্ধ নহে। পরলোক-গত সূক্ষ্মশরীরীরা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেমন, সময়ে সময়ে, নিয়ম-বিশেষের অধীনতায়, মনুষ্যকে দর্শন দান করেন; আমাদিগের এ দেশেও তাঁহারা, অবস্থাবিশেষে, মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে, এরূপ আকস্মিক-দর্শনের তত্ত্বপরীক্ষা, সত্যনির্ণয় ও বৃত্তান্ত-সংগ্রহের জন্য, প্রতিবৎসর বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া থাকে,—বহুসংখ্য বিচক্ষণ পণ্ডিত অন্য প্রকারের নানা কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়াও শুধু এই তত্ত্ব লইয়া নিরন্তর পরিশ্রম করেন; এবং এক জনে যাহা সংগ্রহ করেন, দশ জনে তাহার আলোচনা করিয়া দৃষ্টি অথবা শ্রুতির ভ্রম পরিহার করিতে যত্নপর হন। আমাদিগের এ দেশে ইহার কিছুই হয় না। এ দেশের বিজ্ঞলোকেরা আত্মার পারলৌকিক অস্তিত্ব ও পুরোবর্ত্তি অনন্তজীবনের তত্ত্বসংগ্রহের জন্য, প্রায় জীবনের একটি বৎসরও ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন না। ইহার এই ফল, যে সকল ঘটনা এ দেশে সংঘটিত হয়, তাহা লইয়া পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনার অভাবে, তাহার কিছুই লিপিবদ্ধ হয় না; এবং বিশিষ্ট প্রমাণের অপ্রচুরতায়, সে সকল কথার উপর নিঃসংশয় নির্ভর করা যায় না।

এ দেশেও বিদ্যুৎ আছে, অন্য দেশেও বিদ্যুৎ আছে। আমরা বিদ্যুদ্ দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাকাইয়া থাকি, অথবা কবিতা লিখি; অন্যেরা বিদ্যুতের শক্তি লইয়া ক্রীড়া করেন, এবং বিদ্যুতের সমস্ত বৈভবকে ভগবানের বিশেষ দান জ্ঞানে মানুষের নিত্য ব্যবহারে আনয়ন করিতে যত্ন পাইয়া থাকেন। যে কথা জল অগ্নি ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে, ঠিক সেই কথাই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিবিধ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় কথা বৃত্তান্তসংগ্রহে বিঘ্ন। লোকান্তরিত আত্মার দর্শন সম্পর্কে এ দেশের অধিকাংশ লোকই ভয়ে আকুল, এবং ভয়ের দরুণ তত্ত্বপরীক্ষায় অসমর্থ। এই প্রবন্ধ রচনার সময়ে একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমাদিগকে বলিলেন যে, একদিন তাঁহার গ্রামস্থ বাসভবনে তদীয় স্বর্গগত পিতৃদেব ছায়া-মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন। মূর্ত্তি আসনে উপবিষ্ট, জপে নিবিষ্ট ও স্তিমিত-নেত্র। যিনি দেখিতে পাইলেন, তিনি ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিলেন; তার পর, একটা চীৎকার দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যেখানে জপ-তপঃ-পরায়ণ সজ্জনের মূর্ত্তি-দর্শনেও মনুষ্যের মূর্চ্ছা হয়, সেখানে সকলতি-প্রাপ্ত আত্মিকেরা প্রকৃতই 'পার্য্যমানে' দর্শন

দান করেন না; এবং যদি কখনও দৈবাৎ দৃষ্টিপথের পথিক হন, তথাপি যে দেখে, সে ভয়ের অধীরতা হেতু, বৃত্তান্তের অঙ্গে, কিছুই সংকলন করিতে পারে না। এ দেশে, অনেকে, অনেক স্থলে, আত্মিক-মূর্ত্তির তত্ত্বপরীক্ষায়, বাধা-বিঘ্ন-সম্বন্ধে এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও, বিবিধ পরিস্ফুট প্রকাশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা, পারলৌকিক জীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। জগদীশ্বরের কৃপা হইলে, আমরা সে সকল কাহিনী যথাকালে প্রকাশ করিব।

আজি যে দুটি কাহিনী নিম্নে উপহৃত হইতেছে, তাহার প্রথমটির সত্যতার জন্য রিভিউ অব্ রিভিউ (Review of Review) নামক বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব মনুষ্যসমাজের নিকট দায়ী। দ্বিতীয় কাহিনীটির জন্য বৈজ্ঞানিক-বরেণ্য * ডক্টর গ্রেগরি এবং আরও বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দায়িতা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই উভয় কাহিনীই সত্যমূলক; এবং পাঠক যদি একটির সহিত আর একটিরে মিলাইয়া পড়েন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, উভয়ই আত্মিকদিগের শক্তিসংক্রান্ত পার্থক্যের পরিচায়ক। প্রথম কাহিনীর দুটি মূর্ত্তিই কথা কহিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মুখের কথা মুখেই রহিয়াছে, মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট বাহির হয় নাই। দ্বিতীয় কাহিনীর আত্মিকপুরুষ, পৃথিবীর মানুষের মত কথা কহিয়াছেন, এবং সে কথা যাঁহারা কানে শুনিয়াছেন, তাঁহারা কথা অনুসারে কার্য্য করিয়া, তাহার যথার্থতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। এক জনের সহিত আর এক জনের শক্তি-প্রয়োগে এইরূপ তারতম্য অথবা প্রভেদ ঘটে কেন? অধ্যাত্ম-তত্ত্বের এ সকল কথা, কিছু দিন পরে, পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

* Letters on Animal Magnetism by Dr. W. Gregory.

আত্মিক-কাহিনী।

(১)

গ্লষ্টার (Gloucester) ইংলণ্ডের একটি শায়র কিংবা বিভাগ। ইহার প্রধান নগর গ্লষ্টার সেভারণ-নদীর তটে অবস্থিত। গ্লষ্টার নগরের কোন দ্বিতল গৃহে একটি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত পুরমহিলা বাস করেন। শরৎকাল। একদিন বেলা অপরাহ্ণ ছয়টার সময়, মহিলা শারদীয় সান্ধ্যসমীরে কিয়ৎক্ষণ বাটীর উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনও চা প্রস্তুত হয় নাই। তিনি, চা প্রস্তুত হওয়ার প্রতীক্ষায়, দোতলার এক কোঠায় যাইয়া একখানি ইজি-চ্যারে উপবেশন করিলেন। শুধু শুধু বসিয়া থাকা বিরক্তিজনক। অতএব তিনি থেকারে কৃত "ভ্যানিটিফেয়ার" ("Vanity Fair") নামক পুস্তকখানি হাতে লইয়া, উহার এখানে সেখানে কিছু কিছু পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"ভ্যানেটি ফেয়ারের" কোন কোন অংশ তাঁহার নিকট বড়ই ভাল লাগিত। তিনি সেই সেই অংশ চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐরূপ চিহ্নিত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান, এই অবকাশে, একবার পড়িয়া লইবার অভি-

লাযে, তিনি এক দুই করিয়া পুস্তকের পাতা উলটাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ে,হঠাৎ তাঁহার প্রাণের মধ্যে কিপ্রকার যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব, অস্বাভাবিক ও অপ্রকাশিতব্য অনুভূতির সঞ্চার হইল। তাঁহার বোধ হইল, যেন তঁহার বুকের উপর পাথরের চাপ,—যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার মনে লইল, কে যেন তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দেহপ্রাণের সমস্ত শক্তি ও সারপদার্থ কিরূপ অলৌকিক আকর্ষণে বাহিরে টানিয়া লইতেছে।

তাঁহার পশ্চাদ্‌দেশে প্রকৃতই কেহ দাঁড়াইয়া আছে কি? তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহা দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু তাঁহার দেখা হইল না। তাঁহার শরীর তখন আর তাঁহার ইচ্ছার অধীন নহে,—তাঁহার মুখ ফিরিল না। হাত উঠাইতে চাহিলেন, হাতও উঠিল না। একটু নড়িতে চড়িতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। মনে একটু ভয় ও ভয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত ভাবনার উদয় হইল। ভাবিলেন,—"এ আমার কি হইল,—মূর্চ্ছা হইবে না ত?—না সন্ন্যাস রোগে আমাকে আক্রমণ করিতেছে?—ইহা ত আকস্মিক বাতব্যাধি কিংবা মৃত্যুর লক্ষণ নহে?"—কিন্তু এ ভাবনা স্থায়ি হইতে পারিল না; আপনা হইতেই অমনি আবার সিদ্ধান্ত করিলেন,—"না, তা নয়,—তাহা হইলে, আমার শরীর এতদূর অসাড় ও শক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও মন এই পরিমাণ সজীবতা লাভ করিতেছে কেন?"

তাঁহার জ্ঞান হইল যেন, তাঁহার শরীরটা আর তাঁহার নহে। উহা এইক্ষণ কোন শক্তিশালী বহিঃস্থ কর্ত্তার করে একটা নির্জ্জীব ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়াছে। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার দেহের অভ্যন্তর হইতে স্নায়বীয় শক্তির সমস্ত প্রবাহ, সবলে বহিরাকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার সম্মুখের দিকে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে, ক্রমে যাইয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে। তিনি নিশ্চল ও নিস্পন্দ ভাবে, সেই কেন্দ্রের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিও যেন অন্যের অধীন। উহা তাঁহার স্বাভাবিক চাহনি অপেক্ষা অধিকতর তীব্র ও অন্তঃস্পর্শি।

এই স্থির দৃষ্টির লক্ষ্য স্থানটি প্রথমতঃ শূন্য ছিল। দেখিতে দেখিতে সে শূন্যতা পূর্ণ হইতে লাগিল। যেন শ্বেতাভ কুজ্ঝটিকার আলোক-রেণু-সমূহ, কোথা হইতে ধীরে ধীরে সেই স্থানে ছুটিয়া আসিয়া, বিম্বের আকারে সঞ্চিত হইল। ক্রমে ঐ বিম্ব বিস্তৃত ও দীর্ঘায়তন হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেকে সেই দীর্ঘাকৃতি আলোক-বাষ্প হইতে মানুষের একখানি জীবন্ত মুখ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। অবশিষ্ট আলোক-রেণু-নিচয়ও অতি দ্রুতবেগে উহার হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়া গেল। এক্ষণ আর সে বিকীর্ণ আলোক নাই,—সে কুয়াসা নাই, পূর্ণাবয়ব মনুষ্যমূর্ত্তি মহিলার স্থির লক্ষ্যের বিষয়ীভূত!

ইহা কি দৃষ্টিভ্রম?—না অধ্যাত্ম-লোক-নিবাসী বিচিত্রশক্তিমান্ সূক্ষ্মশরীরীর আক-

স্মিক আবির্ভাব? মহিলা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন তাঁহার সম্মুখে যে সুস্পষ্ট সজীব মনুষ্যমূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিতেছেন, তাহা আর কখনও দেখেন নাই। উহার কোন প্রতিকৃতিও কোন স্থানে কখনও তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। তিনি ঐ ছায়ামূর্ত্তিটিকে খুব ভাল করিয়া দেখিলেন। উহার বর্ণ একটুকু মলিন। বয়স পরিণত। মস্তক সুগঠিত, কিন্তু কেশশূন্য। ললাট উন্নত। মুখমণ্ডল ধবল-শ্মশ্রু-মণ্ডিত। দেহের আয়তন ক্ষীণ। মুখচ্ছবি প্রশান্ত ও গম্ভীর, অথচ উহাতে অতিমাত্র ঔৎসুক্যের ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। উহার হাত দুখানি তাঁহার পরিচিত কোন মানুষের হাতের মত নহে, অথচ ভাবব্যঞ্জক। হাত দুখানি আঙুলের দিকে দীর্ঘ,—আঙুলের উপরে, কর-তলভাগে অল্পপরিসর। হাতের শিরাগুলি মাংসপেশীর মত স্থূল ও স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, এবং তখনকার সেই ক্ষিপ্তবৎ কর-সঞ্চালনে ঐগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। ছায়ামূর্ত্তি গভীর কণ্ঠে ও আকুল প্রাণে, কাকুতি ও মিনতির ভাবে, মহিলার নিকট যেন কি মনোগত প্রার্থনা জানাইতেছে।

এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বিচিত্র মূর্ত্তি অমন ব্যগ্রতার সহিত, কি কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত, মহিলা যে-কোন-রূপ ক্লেশস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। তিনি বহু-চেষ্টায়ও সেই গভীর কণ্ঠের একটি কথা বুঝিতে পারিলেন না। আপনিও কথা কহিতে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহার জড়িত-জিহ্বায় কথা সরিল না। তিনি অবশেষে বহু প্রয়াসের পরে,—"উচ্চৈঃস্বরে বলুন"—এই দুইটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন।

ইহার পর, ছায়ামূর্ত্তির মুখভঙ্গিতে প্রাণের ঔৎসুক্য ও আকুলতা অধিকতর স্পষ্টরূপে ফুটিয়া পড়িল। কণ্ঠের শব্দ যেন অধিকতর জোরের সহিত উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু হায়! তথাপি মহিলা সেই শব্দস্রোতের একটি বর্ণও পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন,—ইহা কি তবে তাঁহারই শ্রুতিশক্তির অপটুতা! ক্ষণকাল এই বৃথাপ্রয়াসের পরে, ছায়ামূর্ত্তি যেন বিশেষ বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ সেই প্রস্ফুট মনুষ্যমূর্ত্তি ক্রমে কুয়াসাচ্ছন্নের ন্যায় অস্পষ্ট হইয়া আসিল। পরে, উহা শ্বেতবর্ণ বিম্বাকৃতি আলোক-মণ্ডলে পরিণত হইল। অবশেষে, সেই আলোকবিম্ব একবারে শূন্যে মিশিয়া গেল।

উল্লিখিত পুরুষ-মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বেই, সেই স্থানে, আর একটি স্ত্রীমূর্ত্তির অপরিস্ফুট মুখচ্ছবি প্রতিভাত হইয়াছিল। এই মুখেও সেই সতেজ সম্ভাষণ-চেষ্টা। স্বর, পূর্ব্বকার গভীর-কণ্ঠস্বরের তুলনায়, বহু পরিমাণে মৃদু বলিয়া অনুভূত, অথচ পূর্ব্ববৎ অশ্রুত। যিনি ঘরে উপবিষ্ট রহিয়া দেখিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠের শব্দ, তখন পর্য্যন্তও কণ্ঠলগ্ন, এবং মাংসপেশিসমূহ তখনও পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় অসাড় ও নিশ্চল। তিনি সেই বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক

মোহে পূর্ব্বের মত অভিভূত ও আচ্ছন্ন। কিন্তু এই দ্বিতীয় মূর্ত্তির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার শারীর-শক্তিনিচয় আপনিই আবার ফিরিয়া আসিল। তিনি পুনরায় অঙ্গসঞ্চালনে সমর্থ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

মহিলা, এই আশ্চর্য্য ও আতঙ্কজনক সচেতন মোহ হইতে অব্যাহতি পাইয়াই, তাঁহার এই আকস্মিক আবিষ্ট অবস্থার মূল-অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, না তাঁহার আকৃতিতে কোনরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, আগে তাহাই আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন,—তাঁহার মুখখানি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তিনি স্পঞ্জ (Sponge) দিয়া ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন; এবং যার-পর-নাই উত্তেজিত ভাবে ক্ষণকাল কোঠার মধ্যে দ্রুতবেগে পাদ-চারণা করিলেন। ছায়ামূর্ত্তির এই অপূর্ব্ব আবির্ভাবে কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয় নাই সত্য; কিন্তু তাঁহার স্মৃতিতে ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তি উৎকট অনুভূতির কথাটা স্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি একবার ভাবিলেন,—"যাহা দেখিলাম তাহা ভ্রম, না প্রকৃত?—না কখনও ভ্রম নহে।"—আবার ভাবিলেন,—"আমি সহসা ঐ অচিন্তনীয় প্রণালীতে ঘুমাইয়া পড়ি নাই ত? না,—নিশ্চিতই ইহা নিদ্রার আবেশ কিংবা স্বপ্ন নহে। মনটা প্রকৃতিস্থ ছিল কি?—ছিল বলিয়াই ত বিশ্বাস।"

মহিলা মনে মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন করিয়া আপনা আপনিই তাহার মীমাংসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে উদিত হইল—"ভাল, এই দৃশ্য যদি ধাঁধা না হয়, যদি ইহার মূলে প্রকৃতই কোন সত্য নিহিত থাকে, তাহা হইলে, আবার ঠিক পূর্ব্বকার মত উপবিষ্ট রহিলে, এই আশ্চর্য্য দৃশ্যের পুনরাবির্ভাব না হইবে কেন?"

দৈবপ্রজ্ঞার মত এই কথাটি মনে উদিত হওয়া মাত্র, তিনি আবার সেই ভাবে, সেই আসনে, তেমনি প্রশান্ত মনে, উপবেশন করিলেন। এক খানি পুস্তক খুলিয়া, আবারও তেমনি ধীর, স্থির ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত রহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে এক-টুকুও কালবিলম্ব ঘটিল না। পূর্ব্ববৎ এক অজ্ঞাত শক্তি অমনি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলের উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। আবার তাঁহার মাংসপেশী শক্তিহীন ও মনঃশক্তি বিচিত্ররূপ আবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার দৈহিক তেজোরাশিও যেন পূর্ব্ববৎ বহিরাকৃষ্ট হইয়া সম্মুখ-ভাগে কেন্দ্রীভূত হইল।

এবারকার আবেশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধীর ও স্থির ভাবে ক্রিয়া করিল। তাঁহার নিঃশঙ্ক মনও এবার অধিকতর শান্ত অবস্থায় প্রত্যেক ঘটনা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল। সেই মহিমান্বিত পুরুষ-মূর্ত্তির আবির্ভাব আবার তেমনই ভাবে ঘটিল। মূর্ত্তি তেমনই উৎসুক নয়নে, একতান দৃষ্টিতে, মহিলার পানে তাকাইয়া রহিল। সেই গভীর-কণ্ঠ-ধ্বনি-সহকারে হাত দুখানিও আবার তেমনই ভাবে সঞ্চালিত হইল। কথার তেমনই স্রোত

বহিল। কিন্তু মহিলা এবারও পূর্ব্ববৎ একটি অক্ষরও পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না।

যখন এই পুরুষ-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করিল, তখন পূর্ব্বকার মত আবার সেই স্ত্রীমূর্ত্তির একখানি অপরিস্ফুট মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। এ মুখে এবারও মৃদুতর স্বরে পূর্ব্বের ন্যায় শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। মহিলার মনে লইল, এবার বুঝি বা উহার কথা তিনি বুঝিতে পাইবেন। তিনি শুনিবার নিমিত্ত, বিশেষ আগ্রহের সহিত যত্ন করিলেন। শুনিলেন "ভূমি" (Land) ও "আমেরিকা" (America) শুধু এই দুইটি শব্দ। কিন্তু ইহা দ্বারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। দুটি মূর্ত্তিরই নিশ্চয় বহু কথা বলিবার ছিল; কিন্তু কাহারও মুখে কথা ফুটিল না।

প্রথম-দর্শন-সময়ে, মহিলা সম্পূর্ণ জাগরিত ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন; দ্বিতীয় বারে শুধু জাগরিত নহে, বিশেষ সাবধানতার সহিতই উপবিষ্ট রহিয়াছিলেন; তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিতে ভ্রম হওয়া অনুমিত হয় না। কারণ, তিনি চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, এবং কানে যাহা শুনিয়াছিলেন; আর শরীরেও যাহা অনুভব করিতে পাইয়াছিলেন, তাহা তখনই আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। মনুষ্যের চক্ষের সম্মুখে ছায়া-মূর্ত্তির এইরূপ ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-বিলয়ের প্রণালী-বৈচিত্র্যেই এই কাহিনীর বিশেষত্ব।*

(২)

বেল্‌জিয়ম ইউরোপের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য,—ফ্রান্স-দেশের উত্তরপূর্ব্ব কোণে সাগর-তট-পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেল্‌জিয়ম, ফ্লেণ্ডার্‌স্ নামক আপন অঙ্গের এক অংশ ছিন্ন করিয়া, ফ্রান্সের গ্রাসে আহুতি দিয়াছে। ফ্রান্সের এই ফ্লেণ্ডার্‌স্ প্রদেশে, রাজনৈতিক ঘটনা ক্রমে, ইংলণ্ডের রাজতনয় ডিউক অব্ ইয়র্কের সৈন্যদল, এক সময়ে, শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। এই সৈন্যদলে স্কট্‌লণ্ডের জনৈক সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত যুবা সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে তাঁবুতে থাকিতেন, সেই তাঁবুতে আরও দুইটি সৈনিক ভদ্রযুবা ছিলেন। এক কার্য্যে ব্রতী, একই পট-গৃহে অবস্থান; এই সূত্রে তিন জনের মধ্যে, ক্রমে বেশ একটু সৌহার্দ্দের সঞ্চার হইল। কিছু দিন পরে, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে, ইঁহাদিগের একজন, সামরিক-প্রয়োজনে, স্থানান্তরে প্রেরিত হইলেন। তাঁবুতে স্কট্‌লণ্ডের ঐ সম্ভ্রান্ত যুবক ও তাঁহার অপর সঙ্গীটি মাত্র রহিলেন। দুই জনের খাট্‌লির অদূরে তৃতীয় যুবার খাট্‌লিটি খালি পড়িয়া রহিল। এই ভাবে, দুই চারি দিন কাটিয়া গেল।

দুই চারি দিনের পর, একদা অকস্মাৎ, যে দৃশ্য সেই তাঁবুতে দৃষ্টি ও শ্রুতির বিষয়ীভূত হইল, তাহার কথা লইয়াই এই কাহিনী। গভীর রাত্রি। প্রকৃতি নীরব ও নিস্তব্ধ।

* খৃষ্টীয় পুর-মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে, ধর্ম্মযাজক অথবা কুল-পুরোহিত মহাশয়ের অসন্তোষ-ভয়ে এ সকল তত্ত্বের অনুসন্ধানসম্পর্কে, আপনার নাম প্রকাশ করেন না। কিন্তু যাঁহার কথা লিখিত হইল, তিনি ষ্টেড সাহেবের বিশ্বাসভাজন।

ভিন্ন ভিন্ন নামে, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তেরটি খণ্ড-কবিতা গ্রথিত হইয়াছে। ইহার প্রথম কবিতার নাম আরতি, এবং শেষ কবিতার নাম গৌরাঙ্গ। আরম্ভ ও উপসংহারে, রসে ও উচ্ছ্বাসে, বড়ই সুন্দর সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। কিন্তু, বিপত্নীক ও সমালোচনার সমালোচন প্রভৃতি কবিতা, অন্যপ্রকারে সুখ-পাঠ্য হইলেও, আরতিতে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহা বিচার্য্য। আয়ুর্ব্বেদে যেমন 'বিরুদ্ধ-মিশ্রণ' স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টজনক, যাহা রসে ও ভাবের বিকাশে পরস্পর-বিরুদ্ধ, কাব্য-সাহিত্যে তাহার অনুপযুক্ত মিশ্রণও আনন্দ-স্ফূর্ত্তি অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টির বিঘাতক।

আরতি একটি উপাদেয় কুসুমস্তবকের মত;—সুন্দর, সুরভি, এবং স্থানে স্থানে সুখ-শীতল। ইহাতে গুণের ভাগই বেশী; আর সে সকল গুণও বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু গ্রন্থকার নূতন যুবা; শক্তির নূতন উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল,—এবং বোধ হয়, এইহেতুই—শব্দের শুদ্ধি ও সুপ্রযুজ্যতাবিষয়ে, সময়ে সময়ে, একটু অসাবধান। ইহার নিদর্শন,—সীমানা—নিশানা—দুহিতাবৎসল—দ্বীপজ্বালা ও তমাচ্ছন্ন প্রভৃতি শব্দ। সাহিত্য যাঁহাদিগের জীবনব্রত, এবং সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ যাঁহাদিগের সতত আরাধ্য, তাঁহারা উহার দেহ ও প্রাণ দুই দিকেই সমান দৃষ্টি রাখিলে, দেশের মঙ্গল—দশের শিক্ষা ও সুখ।

এই গ্রন্থের মধ্যভাগে, গ্রথিত-মালার মধ্যমণির ন্যায়, ভীষ্ম নামে একটি কবিতা আছে। বাঙ্গালায় এইরূপ চারুবিকশিত কবিতা সর্ব্বদাই পাঠকের চক্ষে পড়ে না। ফলতঃ কবিতাটি শব্দে যেমন সুখশ্রুত ভাবেও তেমনই মধুর। কিন্তু যে সকল চরিত্র মহাকবির মোহন তুলিতে চিত্রিত হইয়া, জাতীয় হৃদয়ের একটা প্রধান ভাগ যুড়িয়া বসিয়া আছে, সে সকল চরিত্রকে নূতন বর্ণে চিত্র করিতে যাওয়া, কিরূপ দুষ্কর কার্য্য, প্রমথনাথ অবশ্যই তাহা বুঝিতে পাইয়াছেন। বীর-গুরু ভীষ্ম, যেমন ভারতীয় হৃদয়ে, তেমনই ভারতীয় সাহিত্যে, একটা পর্ব্বতপুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান। ব্যাসের কথা দূরে থাকুক, ব্যাসের পরবর্ত্তি সময়ের অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল কবিতাও, ভীষ্মের নাম-মাত্র-উচ্চারণে, কিরূপ অলোক-সাধারণ উদ্দীপনার আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য, আমরা এস্থলে ভারবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

যস্মিন্ননৈশ্বর্য্যকৃতব্যলীকঃ
পরাভবম্প্রাপ্তইবান্তকোপি,
ধুন্বন্ধনুঃ কস্য রণে ন কুর্য্যা
ন্মনোভয়ৈকপ্রবণং স ভীষ্মঃ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আরতির শেষ কবিতার নাম গৌরাঙ্গ। উহাতে গৌর-চরিত্রের জগন্মোহিনী কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও ভক্তি, ও করুণা প্রভৃতি রস উহার অনেক স্থলে অনাবিল-তরঙ্গে উচ্ছলিত। উহা একখানি পৃথক্ কাব্যরূপে মুদ্রিত হইলে, সর্ব্বশ্রেণিস্থ পাঠকের প্রীতিকর হইত। আমরা আরতি পড়িয়া হৃদয়ে গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, সুকবি প্রমথনাথ, মাতৃভাষার আরতিতে, কবিকীর্ত্তির উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করুন;—এবং মনুষ্যপ্রকৃতির প্রকৃত উৎকর্ষবর্দ্ধক কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, জাতীয় সাহিত্যের অন্যাবধ পুষ্টিসাধনেও যত্নশীল রহিয়া, যশঃশ্রীতে বিভূষিত হউন।

[প্রথম খণ্ড।] মাঘ, ১৩০৯। [১২শ সংখ্যা।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

(পুনঃপ্রচারিত।)

ফাল্গুন হইতে মাঘে বর্ষ-গণনা।

১২

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। বুদ্ধদেবের বিবিধ নাম।	... ..	৫২৯
২। গারোজাতির বিবরণ।	শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (মহারাজ সুসঙ্গ)	৫৪২
৩। আমার স্বপ্ন।	শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ...	৫৪৬
৪। কবির বিলাপ।	... ...	৫৫৪
৫। কিশোর-গৌরাঙ্গ।	... ...	৫৫৫
৬। ছায়াদর্শন।	... ...	৫৫৯
৭। অফুরন্ত কথা।	... ...	৫৭০
৮। সংক্ষিপ্ত সমালোচন।	... ...	৫৭৪

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে
শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা; ডাকমাশুল ছয় আনা।

একবার পড়িয়া দেখুন।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস গুপ্ত প্রণীত প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত, বান্ধব ও নব্যভারত পত্রিকায় বিশেষ সমালোচিত—

মণি ও মুক্তা (খণ্ড কাব্য) ৸০ আনা। বিলাপ ।০ আনা।

কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে ও ঢাকায় বান্ধব-কুটীরে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীহরিহরনন্দী।
প্রিণ্টার।

বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

	মূল্য	ডাকমাশুল	মোট
বার্ষিক	৩৲	।৶০	৩।৶০
ষাণ্মাসিক	২৲	৶০	২৶০

পশ্চাদ্দেয়।

বার্ষিক	৪৷৷০	।৶০	৪৸৶০
ষাণ্মাসিক	৩৲	৶০	৩৶০

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

৪। লেখকদিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা বান্ধবে প্রকাশার্থ প্রবন্ধাদি যাহা প্রেরণ করেন, তাহা যেন প্রত্যেক ফর্দ্দের দুই পৃষ্ঠায় না লিখিয়া, দয়া করিয়া এক পৃষ্ঠার পরে এক পৃষ্ঠা সাদা রাখিয়া লিখেন। ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কাহারও প্রবন্ধ কিংবা কবিতা বান্ধবে প্রকাশিত না হইলে, আমরা কাপি ফেরত পাঠাইতে পারিব না।

ঢাকা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩০৮ সন ৩০শে চৈত্র।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

১ম খণ্ড।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে
শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১৩০৯, ৩০শে মাঘ।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা; ডাকমাশুল ছয় আনা।

বান্ধব।

প্রথম খণ্ড।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা।	১
কিশোরগৌরাঙ্গ।	৫, ৭৩, ১০৭, ১৪৫, ২১৫, ২৫৭, ৩৯৯, ৪৩৩, ৫৫৫
বিজ্ঞান-গায়ত্রী (পদ্য) শ্রীভুবনমোহন দাসগুপ্ত।	৩১
ছায়া-দর্শন।	৩৫, ৮৮, ১৩২, ১৮৬, ২৩৪, ২৯৪, ৩৫২, ৪১৪, ৪৫৮, ৫১৯, ৫৫৯
শ্রীহর্ষ। (শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ)	৪৬, ৭৫
স্বামী না ত কি? (দুই সখীর কথা) শ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ	৪৯, ১২২, ১৬২, ২৮১, ৩২১, ৫১০
শঙ্কা ও বংশানুক্রমিকতা। (শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম এ বি এল্)	৬১
কেন দেখিলাম।	৬৬
নির্ম্মল উৎকর্ষ ও নেড়া হরিদাস।	৭৭
সংক্ষিপ্ত সমালোচন।	৯৫, ১১৪, ১৯৬, ২৪৯, ৩০২, ৩৫৭, ৪২৭, ৪৭৯, ৫২৭, ৫৭৪
আরাধনাতত্ত্ব (অথবা কৃষ্ণোক্ত কর্ম্মযোগ।)	৯৭
আর্য্য-হিন্দু সমাজের সূচনা। (শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায়)	১০৩, ১৯২
মেঃ ডব্লিউ ব্রেণ্যাণ্ড কৃত হিন্দু জ্যোতিষ। (শ্রীরাজকুমার সেন এম, এ)	১১৬, ১৫৫, ৩১৬
সলিল-শয্যায় (পদ্য) শ্রীনীহাররঞ্জন বন্দোপাধ্যায় বি, এ।	১৫৩
নন্দন-কুসুম। (পদ্য) শ্রীযুতা "ঠাকুর মা"	১৬০
পূর্ব্ব-স্মৃতি (পদ্য) শ্রীশ্রীশচন্দ্র দত্ত।	১৭৮
তার পর—তার পর। (শ্রীমৎকল্যাণভট্ট শর্ম্মণঃ)	১৮০
সাহিত্য-সেবা।	২০১
রাণাকুম্ভ। (শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ)	২০৯, ২৭৭, ৩০৭
সমীরণ (পদ্য) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।	২২৯
হলায়ুধ। (শ্রীঅনুকূলচন্দ্র কাব্যতীর্থ)	২৩০
সংস্কৃত ভাষাচর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, বি এ।	২৭৩
তিনটি গীতি-কবিতা।	৩০৫

দ্বীপ-সৃষ্টি। (শ্রীতারকচন্দ্র দাসগুপ্ত) ৩৩৩
মা—না মহাশক্তি ? ৩৩৮
আশীর্ব্বাদ। ৩৬১
হীরার আংটী। (শ্রীননিলাল বন্দোপাধ্যায়) ৩৬৭
গারোজাতির বিবরণ। মহারাজ বাহাদুর—সুসঙ্গ। ৩৭৮, ৪৫১, ৫৪২
বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় বিপত্তি। শ্রী ঃ— ৩৮২
মধুমক্ষিকার গৃহস্থালী। (শ্রীকেদারনাথ মজুমদার) ৩৮৮
শিশুপাল বধ। (শ্রীনবীনচন্দ্র দাস) ৩৯৫
পুরীর রথ আর পুরীর পথ। ৪০৮
প্রবেশিকা (পদ্য) শ্রীশশঙ্কমোহন সেন। ৪১৩
ব্রহ্মদেশের কাহিনী। (শ্রীতারকচন্দ্র দাসগুপ্ত) ৪৪৩
শৈল-সঙ্গীত (পদ্য) শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন। ৪৫৪
প্রদাহি সুখ আর প্রশান্ত সুখ। ৪৭৬
ধ্যান, জ্ঞান আর প্রাণ। ৪৮১
আমার স্বপ্ন। (শ্রীননিলাল বন্দোপাধ্যায়) ৪৮৮, ৫৪৬
প্রয়াণিক প্রকাশ। ৪৯৮
জুমিয়া জাতি। (শ্রীতারকচন্দ্র দাসগুপ্ত) ৫০২
সাগরের প্রতি নদী (পদ্য) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ। ৫০৮
বুদ্ধদেবের বিবিধ নাম। ৫২৯
কবির বিলাপ। ৫৫৪
অফুরন্ত কথা। ৫৭০

বুদ্ধদেবের বিবিধ নাম।

আকাশের ঐ সূর্য্য অথবা ঐ চন্দ্র যেমন, মনুষ্যের ভাষায়, অসংখ্য নামে অভিহিত হইয়াছে; যাঁহারা মনুষ্যজগতে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর দীপ্তি অথবা চন্দ্রের ন্যায় প্রশান্ত জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া, মানবজীবনের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাও ভক্ত, ভাবুক এবং জ্ঞানী কিংবা কবির ভাষায়, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। তাদৃশ দ্যুতিমান্ দেব-পুরুষদিগের মধ্যে ভারত-ভাস্কর বুদ্ধদেব, আজও এসিয়া ও ইয়ুরোপের অসংখ্য ভাষায়, কিরূপে—কতপ্রকার নামে—মনুষ্যহৃদয়ের প্রীতি-চন্দন-সিক্ত পূজার অঞ্জলি পাইতেছেন, তাহার আলোচনা করিলে, পাঠক অবশ্যই হৃদয়ে একটু প্রীতি লাভ করিবেন।

রাম, কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ যেমন জন্মস্থান-সম্পর্কে অযোধ্যানাথ, মথুরানাথ ও নবদ্বীপ-চন্দ্র প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুদ্ধদেব তদীয় জন্মস্থান-সম্পর্কে তেমন কোনপ্রকার নাম প্রাপ্ত হন নাই। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবস্তু নগর তুষার-মণ্ডিত হিমালয় পর্ব্বতের উৎসঙ্গদেশে,—নেপালরাজ্যের দক্ষিণাংশে,—পর্ব্বত-প্রবাহিনী রোহিণী নাম্নী নদী। ঐ নদীর তটে "নগর খাস" নামে একটি স্থান আছে। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা ঐ স্থানকেই বুদ্ধদেবের জন্মস্থান এবং ইতিহাস-কীর্ত্তিত কপিলবস্তুর বর্ত্তমান অবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু কপিলবস্তু তাদৃশ মহাবস্তুর উৎপত্তিস্থল হইলেও, উহার নাম তাঁহার কোন নামের সহিত গ্রথিত হয় নাই।

বুদ্ধদেবের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী; এবং ভার্য্যার নাম গোপা অথবা যশোধরা। যদিও আভিধানিকেরা, পিতা ও মাতার নাম-ক্রমে, শৌদ্ধোদনি ও মায়াদেবীসুত এই দুইটি নাম সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এই দুই নাম বৌদ্ধসাহিত্যে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, পিতা মাতা অথবা ভার্য্যার নামে নামপ্রচার না হইয়া থাকিলেও, বংশের নামে বুদ্ধদেবের বহু নাম হইয়াছে। যে ইক্ষ্বাকুবংশ অযোধ্যার ইতিহাস ও অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের অতুল ইতিবৃত্ত-প্রসঙ্গে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তাহারই এক ধারার নাম শাক্যকুল। শাক্যকুলে জন্মহেতু বুদ্ধদেব সর্ব্বত্রই সাধারণতঃ শাক্যমুনি অথবা শাক্যসিংহ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

শাক্যকুলের উৎপত্তিবিষয়ক কাহিনী এক অপূর্ব্ব উপন্যাস। ইক্ষ্বাকুবংশের এক নরপতি—রাজা দশরথ যেমন, রূপসী ভার্য্যা কৈকেয়ীর কলাময় ঐন্দ্রজালিক মোহে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, বর-দান অথবা প্রতিজ্ঞা-পালনচ্ছলে, রাম-হেন-পুত্রের জন্য বনবাসের

ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন; দশরথের বহুকাল পরে,ইক্ষ্বাকুবংশের আর এক নরপতি —রাজা সুজাতও সেইরূপ, তদীয় বিলাস-সঙ্গিনী রূপাভিমানিনী জেন্তী নাম্নী রমণীর কৌশলময় বাক্যে, বাগুরাবদ্ধ হইয়া, আপনার পাঁচটি পুত্রকে একসঙ্গে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দশরথ-পুত্র রাম গিয়াছিলেন অযোধ্যার দক্ষিণে। সুজাত-পুত্র ওপুর ও তদীয় অনুজবর্গ চলিয়া গিয়াছিলেন অযোধ্যার উত্তর দিকে,—হিমাদ্রির অভিমুখে। রাম বনবাসী হইয়াছিলেন জটা-বাকল পরিয়া, এবং আপনার অপ্রতিম ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল লইয়া। সুজাত-পুত্র ওপুর প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা বনবাসী হইয়াছিলেন, অশ্ব হস্তী, রথ রথী এবং অসংখ্য সমৃদ্ধ প্রজাকে সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া। যাইতে যাইতে, তাঁহারা পর্ব্বতপ্রান্ত-বিলাসিনী রোহিণী *নদীর তটে, কপিল নামক এক তেজঃপুঞ্জ মুনির † তপোবন-সন্নিকটে, একটা সুরম্য ও সুবৃহৎ শাক-বনে ‡ নগরপত্তন করেন, এবং কালক্রমে সেই স্থানে শাক্য-কুল নামে সুপরিচিত হইয়া রাজত্ব করিতে রহেন।

আশ্রয়-দাতা, কপিলবস্তু নামক নগর-প্রতিষ্ঠাতা কপিল গৌতম বংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যক্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদিগের মনে ঘোরতর সংশয়। অতি সামান্য একটুকু আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে, সাংখ্যদর্শনের সহিত বৌদ্ধদর্শনের অনেক বিষয়েই মত-গত সাদৃশ্য আছে। ইহাতে এমনও মনে লইতে পারে যে, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান পূর্ব্বে অন্য কোন নামে পরিচিত ছিল; যখন তাঁহার জ্ঞানাত্মক উপদেশ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল, তখন কপিলের সহিত তাঁহার মত-সাম্যহেতু, সেই অপরিচিত স্থানই কপিলবস্তু নামে কীর্ত্তিত হইল। কপিলাশ্রমের নিকট আর এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার নাম অসিত। বৌদ্ধ ইতিহাসের বহু গ্রন্থেই এইরূপ বর্ণনা আছে যে, অসিত মুনি শিশু-বুদ্ধকে দর্শন করিতে আসিয়া, তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া, মনের আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই অসিত নামেও সেইরূপ সন্দেহ। যিনি, "অসিতো দেবলো ব্যাসঃ" ইত্যাদিক শ্লোকে গীতায় উল্লিখিত হইয়াছেন, এই অসিত কি সেই অসিত? বস্তুতঃ এই সকল নামের তথ্যলাভ ঐতিহাসিকদিগের আনন্দজনক হইলেও, অনায়াস-সাধ্য নহে।

‡ এখন যাহা শেগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারই পুরাতন নাম শাক-বৃক্ষ। এতৎ প্রসঙ্গে অমরকোষের বিখ্যাত টীকাকার রঘুনাথ

* অধুনাতন ইংরেজী নাম কোহানা Rhys Davids.

† ভারতবর্ষে কপিল নামে অনেক মুনি ছিলেন। কপিল নামক মুনিদিগের মধ্যে সাংখ্য-তত্ত্ব-প্রচার-কর্ত্তা স্বনামধন্য মহামুনি কপিল, ভগবানের অন্যতম অবতার বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পিতার নাম কর্দ্দম, মাতার নাম দেবহূতি। তাঁহারই কথা শ্রীমদ্ভগবৎ-গীতায় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। যথা,—"গন্ধর্ব্বানাং চিত্ররাথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।"

সগর-বংশ-ধ্বংসকারী রসাতলস্থ কপিল এই কপিল কি না, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুজাত-পুত্রদিগের

শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তি * আর এক প্রকারেও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু উৎপত্তি অথবা ব্যুৎপত্তি যাহাই কেন হউক না, শাক্যসিংহ অথবা শাক্যমুনি এই দুই নাম চিরকালই সংসারে কীর্ত্তিত হইবে; এবং ইক্ষ্বাকুবংশের শাক্যকুলও, এই দুই নামের মহিমায়, ঐতিহাসিকদিগের আলোচ্য হইয়া রহিবে। ইক্ষ্বাকুবংশের আদিপুরুষ সূর্য্য অথবা অর্ক, এই সূত্রে অর্কবন্ধু নামও বুদ্ধদেবের নামাবলীতে গ্রথিত থাকা দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ নাম পৃথিবীতে প্রচলিত হয় নাই।

চক্রবর্ত্তী লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"ইক্ষ্বাকু-কুল-সম্ভবাঃ কেচন রাজপুত্রাঃ পিত্রা বনে বাসায়োপদিষ্টাস্তে বনে কপিলমুনেরাশ্রমে শাকনামবৃক্ষেষু কৃতবসতয়ো গৌতমশিষ্যাঃ বভূবুঃ।" পুনশ্চ রঘুনাথধৃত সুন্দরানন্দ চরিতে,—

"শাকবৃক্ষপ্রতিচ্ছন্নং বাসং যস্মাৎ প্রচক্রিরে।
তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে ভুবি শাক্যা ইতি শ্রুতাঃ।

* এইরূপ একটা কথা আছে যে, উল্লিখিত কপিলাশ্রিত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের যখন বহু সন্তান জন্মিল, তখন তাঁহাদিগের বিবাহ লইয়া একটা প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। প্রশ্ন এই, তাঁহাদিগের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ শক্য কি অশক্য। মুনি বলিলেন,—"বিবাহঃ শক্যঃ।" এই ব্যবস্থানুমোদিত শক্যবিবাহে যাঁহাদিগের জন্ম হইল, তাঁহাদিগের নাম হইল শাক্য। বলা বাহুল্য যে, শাক্য শব্দের এই ব্যুৎপত্তি সাধারণ বুদ্ধিতে গৃহীত হইবে না।

শাক্যমুনি নামের ন্যায় গৌতম-বুদ্ধ অথবা গৌতম-মুনিও বুদ্ধদেবের আর এক প্রসিদ্ধ নাম। আভিধানিকেরা বলেন বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব-পুরুষেরা গুরু-গোত্র-সম্পর্কে গৌতম † বলিয়া পরিচিত, এবং সেই সূত্রেই বুদ্ধদেবের এক নাম গৌতম। শাক্যদিগের কুল-গুরু কপিল কি সূত্রে গৌতম-সন্তান বলিয়া পরিচিত, আমরা সে কথার মূল অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু পরিষ্কার মীমাংসা করিতে পারি নাই।

বুদ্ধদেব তদীয় জাত-কর্ম্ম ও নামকরণ সময়ে সর্ব্বার্থসিদ্ধ ‡ ও সিদ্ধার্থ নামে অভিহিত হন,—এবং তার পর,—অর্থাৎ সংসার-ত্যাগ ও সুদীর্ঘকাল-ব্যাপি সুদুশ্চর তপস্যা দ্বারা জীবের গতি ও জীবনের পরিণতিবিষয়ে বোধ লাভ হেতু, বুদ্ধ, সংবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব § ও মহাবোধি প্রভৃতি বোধাত্মক নামে বিখ্যাতি

† "গৌতমস্তু গৌতম-বংশোৎপন্নঃ কপিল এব" ইতি রঘুনাথ টীকায়াং।

‡ বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেবের জন্মসময়ে কপিলবস্তুর রাজ-নিবাসে সর্ব্ব-প্রকার রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। তাই পিতা শুদ্ধোদন প্রভৃতি সকলে মিলিয়া, আদর করিয়া, নবজাত শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন সর্ব্বার্থসিদ্ধ। সিদ্ধার্থ নাম ঐ নামেরই রূপান্তর। যথা,—

পুত্রজন্মনি সর্ব্বার্থসিদ্ধিং শুদ্ধোদনাদয়ঃ
দৃষ্ট্বা সর্ব্বার্থসিদ্ধোঽয়মিতি নামাস্য চক্রিরে।

§ বহুজ্ঞ পণ্ডিত পল কেরাসের মতে বুদ্ধ শব্দের অর্থ চৈতন্যপ্রাপ্ত অথবা আলোক-প্রাপ্ত "The Awakened One,"—"The

লাভ করেন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামের বেশী ব্যবহার নাই, সিদ্ধার্থ নামের কতকটা ব্যবহার আছে। তাঁহার আরও কতকগুলি নাম আছে। সেগুলি সর্ব্বাংশে অবতারত্বপ্রকাশক। ভারতবাসীরা যে সময় হইতে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার অথবা বিশ্বময় ব্রহ্মের প্রকট বিগ্রহ রূপে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি শব্দও তাঁহার নাম-স্তবকে স্থান পাইল; এবং আভিধানিকেরা নিজ নিজ মতি ও বুদ্ধি অনুসারে নানাবিধ নূতন নাম সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আভিধানিকদিগের মধ্যে অমরসিংহই সর্ব্বাংশে সমধিক প্রামাণিক। বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ প্রামাণ্যের আরও কারণ আছে। সে কারণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ। বিজ্ঞলোকেরা বলেন, অমরসিংহ রীতিমত বৌদ্ধ ছিলেন। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা জানি না। কিন্তু অমর যে বৌদ্ধধর্ম্মে ও বুদ্ধচরিত্রে প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন, * তাহার আর সংশয় নাই। অমর, স্বরচিত অভিধানে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব-নাম-নির্দ্দেশেরও পূর্ব্বে, বুদ্ধদেবের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তদীয় পঞ্চবিংশতি নামের মধ্যে সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্বজ্ঞ নাম ব্যবহার দ্বারা প্রকারতঃ আপনার বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা—অমরকোষের স্বর্গবর্গে,—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ,
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ।
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ,
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিশ্চ যঃ
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ,
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ

লক্ষ্য করিয়াছেন। যথা স্বর্গবর্গের আরম্ভে,—

"যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘা গুণাঃ,
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায়চ।"

টীকাকারেরা এই শ্লোকের তিন চারি প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিমাত্রই প্রতীত হয় যে, বৌদ্ধ অর্থই সহজ ও স্বাভাবিক। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, যিনি অভিধানকার অমরসিংহ, তিনিই শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যপ্রণীত কাতন্ত্রসূত্রের বিখ্যাত বৃত্তিকর্ত্তা দুর্গসিংহ। দুর্গসিংহও, কোন পৌরাণিক নাম প্রয়োগ না করিয়া, স্বরচিত বৃত্তিগ্রন্থের সূচনায়, প্রণাম-শ্লোকে ভঙ্গিক্রমে বলিয়াছেন,—

"দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং শার্ব্ববর্ম্মিকম্"

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে উপরিধৃত উভয় শ্লোকেই ঐ এক জ্ঞানাত্মক সর্ব্বজ্ঞ শব্দ কিরূপ সুকৌশলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Enlightened One;" আর বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ আলোকপথের পথিক অর্থাৎ যিনি কালে আলোক পাইবেন,—"he whose essence is becoming enlightenment." Vide The Gospel of Buddha. By Paul Carus.

* এ দেশের গ্রন্থকারেরা গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে ইষ্টদেবকে প্রণাম করেন। অমরসিংহ স্বরচিত প্রণাম-শ্লোকে নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবকে

এই পঞ্চবিংশতি নামের মধ্যে মুনি ও মুনীন্দ্র নামের অর্থবিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। বুদ্ধ, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ, শৌদ্ধোদনি, মায়াদেবীসুত, গৌতম ও অর্কবন্ধু এই সাতটি নাম পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুগত ও সমন্তভদ্র এই দুইটি নাম বুদ্ধদেবের * ধর্ম্মজীবন ও দয়ার পরিচায়ক। যিনি যোগ-ধর্ম্মে নির্ব্বাণ ও সর্ব্বজনীন-কল্যাণ-সাধনায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তির মধুরাক্ষরা ভাষা সুগত ও সমন্তভদ্র বলিতে কুণ্ঠিত হইবে কেন? সর্ব্বজ্ঞ নামও ভক্তিরই পুষ্পাঞ্জলি বটে। কিন্তু ভক্তি যেখানে শতবার প্রণত হইয়াও বুদ্ধদেবকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বেশ্বর বলিতে প্রস্তুত নহে, সেখানে উহা তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পূজার অঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবে কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়।

ভগবান্ নামের † এখন আর তেমন মহিমা নাই। উহা এক দিন ছিল ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের জ্ঞাপক; এখন হইয়াছে সামান্যতঃ ভক্তিবাচক। ঋষি, যোগী সাধক ও সাধু মহাত্মার মধ্যেও অনেকে যখন ভারতীয় সাহিত্যে ভগবান্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তখন বুদ্ধদেবের ভগবদ্বিশেষণ বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে।

মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন এই তিনটি নাম মহামতি বুদ্ধদেবের চরাচর-ব্যাপ্ত, পৃথ্বীবিখ্যাত চারিত্রমহিমার পরিজ্ঞাপক। পাঠক ইহা জানেন যে, কবিতা মনুষ্যপ্রকৃতির যে বৃত্তি অথবা যে শক্তিকে কন্দর্প ও কুসুমায়ুধ বলিয়া বর্ণনা করে, সেই বৃত্তি অথবা সেই শক্তিরই আর এক নাম মার। ইহার এই অর্থ যে, কন্দর্পের কুসুমময় পাশ আর মৃত্যুর গ্রাস এক কথা। বুদ্ধদেব, রূপে রমণীমনোহর ও ভোগবিলাসের বিবিধ-সম্পদে রাজ্যেশ্বর হইয়াও, যৌবনের প্রথম-উচ্ছ্বাস-সময়েই গোপা-হেন গুণগৌরবিণী বনিতার ‡ প্রণয়-বন্ধন ছেদন করিয়া, সংসারত্যাগী হইয়া-

* সুগত শব্দের অর্থ স্বর্গগত অথবা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত; এবং সমন্তভদ্র শব্দের অর্থ সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক। পণ্ডিতবর পল কেরাসের টীকায় সুগত শব্দে—"The Happy One" অর্থাৎ চরম-সুখ-প্রাপ্ত বুঝান হইয়াছে।

† সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যযুক্তকেই ভগবান্ বলে। কিন্তু বৌদ্ধরা বুদ্ধদেব সম্পর্কে এই শব্দের আর এক প্রকার উৎকর্ষবাচক অর্থ করিয়াছেন। তথাহি,—

"গুণৈরতুল্যৈর্নিখিলৈঃ সমাগমাৎ
অশেষদোষাপগমাচ্চ নো গুরুঃ,
সমগ্রমাহাত্ম্যবিভূষিতো যতঃ
প্রকীর্ত্ত্যতেঽস্মাদ্ভগবানসাবিতি।"

বুদ্ধদেব যে ভাবে ভগবান্ বলিয়া অভিহিত, সেই ভাবে লোকনাথ—The Lord of the World বলিয়াও পূজিত হইয়াছেন। এই লোকনাথ নাম ভারতীয় গ্রন্থপত্রে বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, জানি না।

‡ কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, গোপা ব্যতীত বুদ্ধদেবের আরও এক সহস্র স্ত্রী ছিল। যাঁহারা বুদ্ধদেবের

ছিলেন; এবং আপনার শান্ত-শীতল শুদ্ধ-চরিত্রের অমল বিভায় লোক-জগতে সকলেরই হৃদয়ে বিস্ময়ভক্তির অটল আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সকলের নিকটই মারজিৎ—লোকজিৎ ও জিন। *

তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ অর্থাৎ অবনীতে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ কিংবা অবতার বলিয়া পূজা করিতেও মনুষ্যের প্রাণ কুণ্ঠিত হইতে পারে না। বুদ্ধদেব কোন দিনও মনুষ্যকে ভক্তির পথে শিক্ষা কিংবা দীক্ষা দান করেন নাই, এবং তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যদিগের মধ্যেও কেহ কোন দিন ভক্তির আবেশ ও উল্লাসে নয়নজলে ভাসেন নাই। বৌদ্ধেরা দীর্ঘকাল ধ্যানে নিবিষ্ট রহিয়া ধর্ম্ম-চিন্তার উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়াছেন,—জ্ঞান-যোগে গভীরতম ধর্ম্মতত্ত্বের সন্নিহিত হইতে যত্ন পাইয়াছেন, এবং তাদৃশ নির্ব্বিষ নির্ব্বিকার ধর্ম্মজীবনের নীরব গাম্ভীর্য্যে অন্যদীয় হৃদয়কে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কোন স্থানে, কোন সময়েও ভগবান্ অনন্তদেবের কোন নাম উচ্চারণ করিয়া আনন্দপ্রফুল্ল কিংবা ঊর্দ্ধনেত্র হন নাই। ইহাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত অভাব; এবং এই জন্যই ইহা ভক্তিবিহ্বলা ভারতভূমিতে বেশী দিন তিষ্ঠিয়া রহিতে পারে নাই ও ভক্তিপিপাসু জ্ঞানিদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রাণে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই।

কিন্তু এই অভাবও এক সময়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অসামান্য প্রতাপ ও প্রভাবে পরিণত হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষে এমনও এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন ভক্তির নাম শুনিলেই মনুষ্য ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, এবং ভক্ত ও ভক্তির সমস্ত চিহ্ন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাউক বলিয়া হৃদয়ের জ্বালায় গর্জ্জন করিত। ভক্তির এইরূপ দুঃসহ বিকৃতি ও বিড়ম্বনা পৃথিবীর সকল দেশেই সংঘটিত হইয়াছে; এবং যাঁহারা বম্বের মহারাজ-গুরুর মত ভক্তিযাজকদিগের মহাপাপ-কাহিনীর † কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভক্তি এখনও, ব্যাঘ্র কিংবা ভল্লুকীর ন্যায়, এখানে সেখানে,

মাহাত্ম্যবর্দ্ধনের জন্য তাঁহার এক সহস্র ভার্য্যা কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই পূর্ব্বতন ভক্ত পৌরাণিকেরা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্দ্ধনের জন্য বহু সহস্র রমণীকে তাঁহার ভোগ্যা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

* যিনি তপস্যার দ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়াছেন, তাঁহার নাম জিন। জৈনদিগের শেষ জিনের নাম মহাবীর-বর্দ্ধমান।

† মহারাজ-গুরুদিগের বীভৎস চরিত্র লইয়া বম্বে-প্রদেশে এক সময়ে ভয়ঙ্কর আন্দোলন এবং প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এতদ্ঘটিত সমস্ত বিবরণ এক-খানি ইংরেজী পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তক খানির নাম,—The Maharaja Libel case.

মনুষ্যের ইহকাল ও পরকাল একই গ্রাসে উদরস্থ করিতেছে।

ভগবানের কর্ম্মবিধানে, ভারতীয় ভক্তির এইপ্রকার লোক-ভয়ঙ্কর বিপাক ও বিড়ম্বনার দিনে, অনাবিল-ধর্ম্মময় বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়,—এবং তদীয় ধীর-গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তির প্রত্যেক পদ-ক্রমেই অন্তর্ব্বহিঃপরিশুদ্ধ পবিত্র ধর্ম্মের জয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, জগতে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার জীবনের প্রকৃত পরিণাম; এবং ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্ম প্রভৃতি নামই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপযুক্ত নাম। যাঁহারা একমনে ও একপ্রাণে ঈশ্বরের উপাসক, এবং বোধের চরম-পরিণতি বিষয়ে অন্যপথের উপদেশক, তাঁহারা তাঁহাকে, শব্দের মৌলিক অর্থে, বুদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মালোকপ্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে আত্মায় শঙ্কিত হইতে পারেন। কিন্তু, যিনি "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ," এই অনিয়মধুর সত্য-প্রচার-দ্বারা পাদ-লগ্ন কীট-পতঙ্গের প্রতিও প্রাণের ভালবাসা ও দয়াধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, এই পৃথিবীর কেহই তাঁহাকে ধর্ম্ম বলিয়া অন্তরে ধ্যান করিতে অনিচ্ছুক হইবে না।

বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে অদ্যাপি ধর্ম্মের পূজা নামে একটি শ্রদ্ধাজনক ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহা যে প্রকারতঃ ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেবেরই পূজা, ইহা চিন্তা করিলে মনুষ্য-প্রকৃতির উপর একটু বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মে। কেন না, এই ব্রতচর্য্যার দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, মনুষ্য সুখ-লালসা, স্বার্থপরতা এবং ক্রোধাদি বৃত্তির উত্তেজনায় যত কেন জঘন্য পথ অবলম্বন না করুক, তদীয় জাতীয়প্রকৃতির অন্তস্তল-বাহিনী ফল্গু-গঙ্গা ধর্ম্মেরই অনুসারিণী,—ধর্ম্মজনিত-শান্তি-স্বরূপ অনন্ত সাগরের দিকে অভিসারিণী।

বুদ্ধদেব বিনায়ক ও শাস্তা নামেও বর্ণিত হইয়াছেন। এই দুই নাম, উপরিলিখিত ধর্ম্ম নামের অঙ্গীভূত না হইলেও, অতি সন্নিহিত। কারণ যিনি স্বয়ং ধর্ম্মময়, তিনিই ধর্ম্মবিষয়ে মনুষ্যের নায়ক ও শাসক হইবার যোগ্য। নতুবা, তাঁহার ধর্ম্মকথা মনুষ্যের হৃদয়ে গাঁথা রহিবে কেন?

ষড়ভিজ্ঞ নামটি শুধুই জ্ঞানজ্ঞাপক, এবং তপঃ-সাধন-লব্ধ ছয় প্রকার জ্ঞান-শক্তির পরিচায়ক। পুরাতন ঋষিরা দিব্য দৃষ্টি, দিব্য শ্রুতি, পর-চিত্ত-জ্ঞান, পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতি, আত্মস্বরূপ-জ্ঞান এবং বহিশ্চক্ষুর অলক্ষিত অন্তরীক্ষ জগতের তত্ত্বজ্ঞানকে ষড়্বিধ সম্পদ অথবা জ্ঞানশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বৌদ্ধদিগের এরূপ বিশ্বাস যে, মহাত্মা শাক্যসিংহ অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা লৌকিক দেহেই এই ছয় প্রকার অলৌকিক শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

এ কথা কোন অংশেও অসম্ভব নহে। কারণ পুরাতনেরা যাহাকে দিব্যদৃষ্টি বলেন, তাহারই অধুনাতন বৈজ্ঞানিক নাম Clairvoyance অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিবার শক্তি। পুরাতনেরা যাহাকে দিব্যশ্রুতি বলেন, তাহার অধুনাতন বৈজ্ঞানিক নাম Clair-audience, অর্থাৎ যে সকল কথা চর্ম্মময়

কর্ণের বিষয়ীভূত নহে, তাহার শ্রবণ-শক্তি। পুরাতন-ঋষি-বর্ণিত পর-চিত্ত-জ্ঞান নামক অলৌকিক শক্তির বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নাম Power of thought-reading অর্থাৎ পরের মনের কথা পাঠ করিবার ক্ষমতা। অতীত-স্মৃতি, আত্মজ্ঞান এবং আকাশিক-তত্ত্বজ্ঞানও ঐরূপ অধ্যাত্মশক্তিরই প্রকার-ভেদ।

যদিও এই ছয় প্রকার শক্তি সাধারণতঃ একাধারে বিদ্যমান থাকা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ইহা অশেষ পরীক্ষাদ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, উল্লিখিত প্রত্যেক শক্তিই মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক সম্পদ, এবং সাধন-বিশেষের দ্বারা অল্প কিংবা অধিক পরিমাণে বিকশিত হইবার যোগ্য। ইউরোপ ও আমেরিকায় এক প্রকার লোক আছেন, তাঁহাদিগকে দিব্যদ্রষ্টা ও দিব্যশ্রোতা বলে। তাঁহারা যখন বাহিরের চক্ষু কর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হন, তখন দেশ-দেশান্তরের অপ্রত্যক্ষ দৃশ্যনিচয়কে প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন; এবং মনুষ্য দশসহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও যে সকল কথা কহে, তাহা তাঁহারা ঘরে বসিয়া স্পষ্ট শুনিতে পান। *

আর এক প্রকারের লোক আছেন, তাঁহাদিগকে Thought-reader অর্থাৎ চিত্ত-পাঠক বলে। এক জন লোক সম্মুখীন হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন, কিন্তু চিত্তপাঠক তাঁহার মুখের কথা না শুনিয়াও মনের সমস্ত কথা অবগত হইতেছেন। চিত্তপাঠকেরা দূরে থাকিয়াও অন্যদীয় চিত্তের সমস্ত কথা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, এবং আনুপূর্ব্বিক বলিয়া দিতে পারেন। মানবপ্রকৃতির এ সকল বিশেষ-রহস্য বঙ্গীয় যুবক-যুবতীর মধ্যে অনেকের নিকট নিতান্ত বিস্ময়াবহ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু যাহা বিস্ময়াবহ, তাহাই যে অবিশ্বাস্য, এমন কোন সূত্র নাই। এ দেশের অনেক সদাশয়া বৃদ্ধা ভিক্টোরিয়ার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের এই অবিশ্বাস মনুষ্যের বিশ্বাস ও ভক্তির উপর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে কি?

ফলতঃ, যাঁহারা না জানিয়া ও না শুনিয়া,—এবং জানিবার ও শুনিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত না হইয়া, শুধুই অজ্ঞতা অথবা অভিমানের অন্ধতায় অবিশ্বাসী, তাঁহাদিগের অবিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা বিদ্যাতত্ত্ববিজ্ঞানের বিবিধ-তত্ত্ব লইয়া শিক্ষার্থীর ন্যায় পরিশ্রম

* এ বিষয়ে ইংরেজীতে অসংখ্য গ্রন্থ আছে; এবং সম্ভবতঃ অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। যাঁহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা নিম্নলিখিত চারি খানি গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি। (১) Notes and Studies in the Philosophy of Animal Magnetism By John Ashburner, M. D. Member of the Royal Irish Academy. (২) Reichenbach's Dynamics. (৩) Science of the Soul. By Loren Albert Sherman. (৪) How to Thought-Read By James Coates, Ph. D, F. A. S.

করিয়াছেন, তাঁহারা * জানেন যে দিব্য-দর্শনাদি শক্তি ছোট ও বড় সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যেরই অধিগম্য বস্তু, এবং অতএবই বুদ্ধদেবের মত অসাধারণ মনস্বি-তাপসের পক্ষে অনায়াস-লভ্য। তবে এই এক কথা, শুধু এ সকল শক্তির অস্তিত্ব, দেবত্ব-স্থাপনের অনুকূল প্রমাণ হইলেও, অনন্তশক্তিময় ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নহে।

বুদ্ধদেবের দশ-বল নাম কিঞ্চিদংশে জ্ঞান-বলের জ্ঞাপক, কিঞ্চিদংশে চরিত্র-বলের প্রখ্যাপক। বুদ্ধি, ক্ষমা, ধৈর্য্য, ধ্যান, জ্ঞান, কৃপা, শীল, উপেক্ষা, সামর্থ্য ও দান—এই দশটি শক্তি, দশ বল নামে, কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা বুদ্ধদেবের উপাসক, তাঁহারা, তাঁহাতে এই দশটি শক্তিরই ক্রীড়া দেখিতেন বলিয়া, তাঁহাকে দশ-বল নামে পূজা করিতেন।

অদ্বয়বাদী † এই নাম বুদ্ধদেবের মত ও সিদ্ধান্তের সহিত সংসৃষ্ট। বেদান্তের অদ্বৈত-

* রিভিউ অব্ রিভিউ নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক প্রসিদ্ধনামা (W. T. Stead) ষ্টেড,—ডারউইনের সহযোগী ডক্টর ওয়ালেস,—সার্ উইলিয়ম ক্রুক্স্ এবং সুধী-জন-বরেণ্য গ্লেণ্ডেনিং (A. Glendenning) প্রভৃতি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞপণ্ডিত এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই উপরিলিখিত বিবিধ কথার সাক্ষী। তাঁহারা প্রত্যেকে, এতৎ প্রসঙ্গে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, যাহা চক্ষে দেখিয়াছেন ও তৎসম্পর্কে যে প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার সার সঙ্কলন করিলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়। সার্ উইলিয়ম ক্রুক্স্ বৃটিস এসোসিয়েশন নামক বৈজ্ঞানিক-সভায় সভাপতিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া, বলিয়াছেন যে, দূরস্থ আত্মীয়জনের সহিত মানসিক আলাপ অর্থাৎ টেলিপেথি (Telepathy) সংক্রান্ত তত্ত্ববৃত্তান্তও যাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হন নাই, তাঁহারা বিজ্ঞান-মন্দিরের বহিঃস্থ ব্যক্তি। আমরা এ সকল আশ্চর্য্য অথচ স্বভাব-সিদ্ধ ক্ষমতার অস্তিত্ব বিষয়ে, ভারতবর্ষ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ না করিয়া, কি জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের দোহাই দিতেছি, সে দুঃখের কথা বিজ্ঞ লোককে বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক।

† পল কেরাসের মতে বুদ্ধদেবের অদ্বয়বাদ পরিষ্কার ব্রহ্মবাদ না হইলেও, প্রায় ঐরূপ তত্ত্ব। "While Buddhists do not believe that God is an individual being like ourselves, they recognise that the Christian God-idea contains an important truth, which, however, is more perfectly expressed in Buddhism." বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও বহুদেশদর্শী আর্থার লিলি (Arthur Lillie, Member of the Royal Asiatic Society.) স্বপ্রণীত বুদ্ধ-চরিত-বিষয়ক গ্রন্থে আর একটুকু অগ্রসর হইয়া, বুদ্ধদেব ও প্রাথমিক বৌদ্ধদিগকে ঈশ্বরবাদী বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন। রিঝ্ ডেভিড্স্ (Dr. Rhys Davids) সিংহলীয় গ্রন্থপত্রের উপর বেশী

বাদ এবং বুদ্ধের অদ্বয়বাদে দ্রষ্টব্যে ঘোরতর পার্থক্য থাকিলেও, সে পার্থক্য, আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায়, মূলে খুব বেশী নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব স্বয়ং যখন এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই, এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যেরাও যখন এই মুখ্য কথার মীমাংসায় আজও একই পথের পথিক হইতে পারিতেছেন না, তখন আমরা, এই প্রসিদ্ধ নামের প্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, নূতন একটা অর্থ সৃষ্টির জন্য, অনর্থক পরিশ্রম করিতে যাই কেন? তথাপি এই এক কথা হৃদয় খুলিয়া বলিতে পারি যে, বেদ-বেদান্ত ও বিশ্ববিজ্ঞান যেমন এই বিশ্বসংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছে, অদ্বয়বাদি-বুদ্ধশিষ্যেরা যে তাহা পারিতেছেন না, ইহা সকলের পক্ষেই নিতান্ত দুঃখের বিষয়। ধর্ম্মের এক দিক্ এই অনন্তজগতের প্রাণস্বরূপ অনন্তদেব জগদীশ্বর, আর এক দিক্ অশেষ-সুখ-দুঃখ-পরীক্ষাময়ী সংসার-ভূমি। মনুষ্য এই দুই দিকে সমান দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইলেই, ধর্ম্ম ইহলোকে অমৃততুল্য এবং লোকান্তরে দিব্যধামের সোপান-স্বরূপ হইয়া থাকে। বুদ্ধদেবকে যখন তাঁহার পূর্ব্বতন প্রজ্ঞাবান্ ভক্তেরা স্পষ্টাক্ষরে অদ্বয়বাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তাঁহার দুই দিক্‌ই যে সমান ছিল না, তাহা কে সাহস করিয়া বলিবে?

আমরা এ স্থলে বুদ্ধদেবের আর দুটিমাত্র * নাম-সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই নামদ্বয়ের একটি অভিধান-উক্ত, আর একটি অভিধানে অনুক্ত। আগে অনুক্ত নামেরই কথা কহিব। অনুক্ত নাম "অমিতাভ"। যাঁহার বুদ্ধি, জ্ঞান-শক্তি অথবা চারিত্রবলের আভা অমিত, অর্থাৎ পরিমাণ-রহিত, তিনিই "অমিতাভ" (Infinite Light) বলিয়া কথিত হইয়াছেন। †

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, এই অমিতাভ শব্দের প্রত্যেক অক্ষরই সংস্কৃত-মূলক,

নির্ভর করিয়া প্রাথমিক ও পরবর্ত্তী সমস্ত বৌদ্ধকেই নিরীশ্বর অথবা অজ্ঞমানী জড়বাদী (Agnostic Materialist) নির্দ্দেশ করিতে শঙ্কিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত আর্থার লিলির প্রদর্শিত প্রমাণ অনুসারে একবারে অমূলক। ভক্তিভাজন ত্রিপুর-স্বামীও আর্থার লিলিরই পক্ষসমর্থন করেন। তিনি তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধদিগের সহিত বহুকাল একত্র বাস করিয়াছেন। তাঁহার মতে, তাহারা সকলেই জড়-সর্ব্বস্ব-বিরোধী অধ্যাত্মবাদী, এবং আদিবুদ্ধ নামে পূজিত ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাসী।

* শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি অভিধানে বুদ্ধদেবের আরও কতকগুলি নাম আছে। যথা বক্রী, বাগাশনি, দশপারমিতাধর। কিন্তু সে সকল নামের অধিকাংশই অবোধ্য ও প্রচলিত।

† তিব্বতীয় লামা-গুরুদিগের মতে মৈত্রেয়, ধ্যানিবুদ্ধ, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর ও অমিতাভ এই পাঁচ নামে বুদ্ধদেবের পাঁচটি ভাব

অথচ সংস্কৃত-ভাবিণী ভারতভূমির একখানি অভিধানেও ইহার উল্লেখ নাই। ইহা বিচিত্র নহে কি? সংস্কৃত অভিধানে অমিত শব্দের যোগে অমিতাশন অমিতৌজস্ ও অমিতবীর্য্য প্রভৃতি কএকটি শব্দ আছে। কিন্তু সে সকল শব্দ শিব ও বিষ্ণুর নাম, * বুদ্ধদেবের নাম নহে। বুদ্ধদেবের অমিতাভ নাম, তিব্বত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে সমধিক প্রচলিত। সংপ্রতি বাঙ্গালা ভাষায়, বিখ্যাতকবি শ্রীমান্ নবীনচন্দ্রের লেখনী হইতে অমিতাভ নামে একখানি অমৃতময় কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ভরসা আছে, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে কবির হৃদয়ারাধ্য নামটিও, ধীরে ধীরে, বাঙ্গালির জাতীয়হৃদয়ে লিখিত হইবে। নবীন,

অথবা পাঁচ অবতার বৌদ্ধের উপাস্য। এই সকল নামের নিগূঢ় অর্থ লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক ও অবতারতত্ত্বের অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এই পাঁচ নামের মধ্যে অমিতাভ নামই, বৌদ্ধসংঘের বাহিরে, স্বদেশে ও বিদেশে কতকটা পরিজ্ঞাত।

* অমিতমশ্নাতি সংহার-সময়ে ইতি সর্ব্বভক্ষকে পরমেশ্বর। সুতরাং অমিতাশন শব্দের অর্থ কাল অথবা কাল-রূপী শিব; অমিতৌজা ও অমিত-বিক্রম শব্দদ্বয়ের অর্থ নারায়ণ। পণ্ডিতবর নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত বিশ্বকোষ অভিধানে অমিতাভ শব্দও ধৃত হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ,—সাবর্ণি-মন্বন্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির এবং রৈবত-মন্বন্তরের প্রথম শ্রেণির দেবতা।"

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রসঙ্গে, নামের ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন,—

"অস্ত গেল পূর্ণচন্দ্র মিতাভ নশ্বর,
অস্ত গেলা আলোকিয়া অশীতি বৎসর
পূর্ণচন্দ্র অমিতাভ ধর্ম্মজগতের।"

অভিধানোক্ত দ্বিতীয় নাম, "তথাগত"। এসিয়া ও ইউরোপের বৌদ্ধসাহিত্যে এই নামেরই বেশী প্রচলন ও বিশেষ মহিমা। কিন্তু এই নামের প্রকৃত অর্থ কি? এই নাম দুইটি শব্দে গঠিত। প্রথম শব্দ তথা, দ্বিতীয় শব্দ গত অথবা আগত। তথা শব্দের সাধারণ অর্থ 'সেই প্রকার'। এই অর্থ ধরিয়া আভিধানিকদিগের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, যে প্রকার চরম-গতি-লাভ হইলে সংসারে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, বুদ্ধদেব সেই প্রকারে গত হইয়াছেন, অতএব তাঁহার নাম "তথাগত"। † কেহ বলিয়াছেন যে, যে প্রকারে

† "যথা গতাস্তে মুনয়ঃ শিবাং গতিং
তথা গতঃ সোঽপি ততস্তথাগতঃ।"

অর্থাৎ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এবং বাল্মীকি ও ব্যাস প্রভৃতি মুনি-ঋষিরা, যে প্রকারে, জীবনের অবসানে, যেরূপ মঙ্গলময়ী গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিও সেইপ্রকারে, সেই শিব-গতি প্রাপ্ত হইয়া, তথাগত নাম লাভ করিয়াছেন। তথাগত শব্দের এই অর্থ অনুসারে শঙ্কর, রামানুজ এবং আরও অসংখ্য সাধু-সুজন এই বিশেষণ-লাভের যোগ্য। সুতরাং এই অর্থ কোন অংশেও বৌদ্ধদিগের প্রীতিকর হইবার নহে।

—যেখানে গমন করিলে, জীবের দুঃখ দূর হয়, যিনি কৃপাতন্ত্রতা হেতু, সেই প্রকারে, সেখানে গমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম তথাগত। * কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা, "তথাগত" শব্দকে অধিকাংশ স্থলেই, "সেই প্রকারে আগত অর্থাৎ জীব-ত্রাণের জন্য জগতে সমাগত" এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই শব্দটিকে পূর্ণত্ববোধক অথবা পরমত্ববাচক মনে করিয়া অশেষ-বিশেষে ইহার মহিমা বাড়াইয়াছেন। যাঁহারা বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, শাক্যবুদ্ধের 'তথাগত' নাম তাঁহাদিগের বিশেষ স্মর্ত্তব্য।

এই নামগুলির আনুপূর্ব্বিক আলোচনার দ্বারা পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, বুদ্ধদেবের জন্ম, কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ইতিহাস, এবং জীবনের বিকাশ মানবজাতির চিন্তার সমুদ্রে এক প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছিল; এবং সে তরঙ্গ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হইয়া, সংসারে একটা অপূর্ব্ব সুখ-শান্তিময় পরিবর্ত্ত ঘটাইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণ হয় কি? এ কথা একবার বলিয়াছি, আবারও বলিব,—প্রমাণ হয়, —ধর্ম্ম সত্য,—কর্ম্ম সত্য; এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ-জনিত অনন্ত উন্নতি এবং নির্ব্বাণ-ধামে শেষ-গতিও মানবজীবনের মহা-সত্য। নতুবা বুদ্ধদেবের একটা জীবন শত-সহস্র-কোটি মনুষ্য-জীবনের উপর এইরূপ অসম্ভাবিত আধিপত্য করিতে সমর্থ হইবে কেন? আর যে ভারতবর্ষ, তাঁহার ধর্ম্মের সার-নিষ্কর্ষকে শতপ্রকারে শুষিয়া আনিয়া, এবং আপনার অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে পুষিয়া লইয়াও, তাঁহাকে স্বরূপতঃ স্বীকার করে নাই, সেই ভারতবর্ষের প্রাণ অথবা প্রাণস্বরূপা সংস্কৃতভাষা এত বিভিন্ন নামে তাঁহার বিবিধ-ভাব ও শক্তিসম্পদের পূজা করিবে কি জন্য?

কিন্তু বুদ্ধদেবকে সর্ব্বশ্রেণিস্থ ভারতবাসীই সম্যক্ চিনিতে পারিয়াছিল কি? যে দেশের অসংখ্য বন-উপবন, ছায়াশীতল বৃক্ষতল,—গ্রাম ও নগর,—নগর-প্রান্ত-বাহিনী নদী,—নদীর প্রস্রবণ-শোভিনী পার্ব্বত্যভূমি,—প্রান্তর, পুষ্পবাটিকা, প্রাসাদ ও প্রশান্ত-নিকেতন, দেশ-দেশান্তরবাসী সাধু-সজ্জন ও সন্ন্যাসীর চক্ষে, তাদৃশ পবিত্রজ্যোতির্ম্ময় পর্ব্বত-পুরুষের পদ-রজঃ-স্পর্শ-সম্পর্কে পুণ্যময় মহাতীর্থ হইয়া রহিয়াছে, সেই দেশের সকল প্রকার অধিবাসীরাই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল কি? বোধ হয়—না। যদি বুঝিতে ও চিনিতে পারিত,—যদি ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিত, তাহা হইলে, কেহ কেহ, এমন জনেরও

* "যথা যথা যস্য হিতং বিধেয়ং
তথা তথা সোঽপি গতঃ কৃপালুঃ।"

অর্থাৎ যেখানে যে ভাবে যাইয়া উপস্থিত হইলে, লোকের মঙ্গল হয়, তিনি সেখানে সেই ভাবেই যাইয়া উপস্থিত হইতেন। এ বর্ণনা দয়া-ধর্ম্মময় বুদ্ধদেবের পুণ্যজীবনের উপযোগিনী। সুতরাং তথাগত শব্দ, এই অর্থে, অন্যত্র প্রযুজ্য হইলেও, উহা তাঁহারই উপযুক্ত বিশেষণ।

নামের উপর পিশাচের মত গালি বর্ষণ করিয়া, আপনাদিগের নির্ঘৃণ-নিকৃষ্টতার পরিচয় দিত না। বুদ্ধ-প্রসঙ্গে বাল্মীকীয় রামায়ণের এখানে সেখানে দুই চারিটি পংক্তি আছে। আমরা এস্থলে শুধু দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব। বাল্মীকীয় অযোধ্যাকাণ্ডের এক স্থলে আছে,—

"যথাহি চৌরঃ স তথাহি বৌদ্ধঃ,
তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, চোরও যেমন, বৌদ্ধও তেমন। যাঁহাকে বৌদ্ধেরা "তথাগত" বলিয়া পূজা করে, তাঁহাকে তোমরা চোরের উপাস্য নাস্তিক বলিয়া জানিয়া রাখিও।

এ পাপ-লেখা যে পূত-স্বভাব বাল্মীকির লেখনীপ্রসূত নহে, ইহার প্রমাণ দিতে যাওয়া মূর্খতামাত্র। কারণ, যাঁহারা বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে একাধারে অলৌকিক-কবিত্ব ও অমল-দেবত্ব লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি বাল্মীকি। যে বাল্মীকি পাশব-তৃষাকৃষ্ট বক-মিথুনের প্রাণঘাতী, নিষ্ঠুর-প্রকৃতি নিষাদকেও একটি কটু কথা বলিতে না পারিয়া, মনের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বাল্মীকি কি সর্ব্বজন-পূজ্য বুদ্ধদেব অথবা বৌদ্ধচরিত্রকে কদর্থিত করিয়া আপনার জগদ্দুর্ল্লভ কবি-কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতে পারেন?

বস্তুতঃ, এ লেখা বাল্মীকির নহে। বুদ্ধদেব বাল্মীকির সময়ে অভ্যুদিত হন নাই; এবং বৌদ্ধানুকল্প মুনি-ঋষিরা বাল্মীকির সময়ে বিদ্যমান থাকিলেও, বাল্মীকির পীযূষবর্ষিণী ভাষা তাঁহাদিগকেও গালি দেয় নাই। মানব-সমাজের যে সকল অধশ্চর ও অন্ধকারপ্রিয় ব্যক্তিরা, মানব-গুরু মহাপুরুষদিগকে গালি দিয়া, নিজ নিজ জিহ্বার কণ্ডূয়ন-নিবৃত্তি করিয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই তাহাদিগের কাহারও না কাহারও কলুষিত বুদ্ধির বিজৃম্ভণ। এরূপ নীচাশয় লেখকের তুলনায় বঙ্গের কবি জয়দেবকে দেবতা বলিলে দোষ হইবে কি? জয়দেব নিশ্চয়ই বুদ্ধচরিত্রের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। জয়দেব তাঁহার ভারত-বিখ্যাত দশাবতার-গীতে দেবতার কণ্ঠে গাইয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতং
কেশব-ধৃত-বুদ্ধশরীর জয়জগদীশ হরে।"

আমরা, জয়দেবের ভাবানুবৃত্তি করিতে না পারিলেও, তাঁহার ভক্তিসিক্ত লেখনীর উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রস্তুত আছি। যদি ভারত-সন্তান মাত্রই, তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, বুদ্ধদেবের বিবিধ-তত্ত্ব-সূচিত প্রাতঃস্মরণীয় নাম ভক্তির সহিত স্মরণ, মনন ও উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে, দেশের চারিত্রবল ও সামাজিক সুখ-সম্পত্তি দশ হাত উপরে উঠিবে;—এবং বৌদ্ধধর্ম্মের দয়াস্নিগ্ধ পবিত্রতা, হিন্দুধর্ম্মের প্রাণাত্মিকা প্রেম-ভক্তির গঙ্গায় মিশ্রিত হইয়া, ভারতে এক অপূর্ব্ব ও অমৃতময় শান্তির স্রোতে প্রবাহিত হইবে।

গারোজাতির বিবরণ। *

(৯) শিল্প ও কারুকার্য্য।

গারোগণ বংশ ও বেত্রদ্বারা অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে গুলি ব্যবহারোপযোগি ও সুদৃশ্য। তন্মধ্যে বেত্রনির্ম্মিত চাটাই এবং বেত্র ও বংশনির্ম্মিত ঝুড়ি (জুঙ্গা) এবং বেত্রের ঢাল ও কুলা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহারা এক প্রকার বস্ত্র ও থলে' প্রস্তুত করে। বস্ত্র-বয়ন-সূত্র পূর্ব্বে নিজেরাই প্রস্তুত করিত; এখন তাহা ক্রয় করিয়া লয়। বস্ত্রগুলি স্ত্রীলোকেরাই বয়ন করিয়া থাকে। যে বালিকা বস্ত্র বয়ন করিতে না পারে, তাহার বিবাহ হয় না। এটি একটি সুনিয়ম বটে। ইহাদের গৃহগুলিও কাষ্ঠময় কারুকার্য্যে সুশোভিত থাকে। যদিও এই কারুকার্য্য তেমন সুদৃশ্য নহে, তথাপি ইহাদের সভ্যতার নিম্নাবস্থা বিবেচনা করিলে, প্রশংসার্হ। কেহ কেহ লৌহের ডিগ্রি (এক প্রকার অস্ত্র বিশেষ) এবং বর্ষা (Spear) প্রস্তুত করিতে পারে। কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যের মধ্যে কুন্দা নৌকা বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহা এক একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ খুদিয়া প্রস্তুত করা হয় এবং কোনও কোনও নৌকাতে প্রায় এত শত মণ জিনিষ ধরে। ইহারা নৌকা পরিচালন জন্য বৈঠা (ক্ষেপণী) কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বৃহৎ আয়তনের এক এক খানি নৌকা দেড় শত বা দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহারা এক প্রকার মৃণ্ময় পাত্রও প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং তাহা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া লয়। শিল্প ও কারুকার্য্য প্রসঙ্গে আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই।

১০। ভাষা।

গারোদের শ্রেণী ও ভাষা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—

১। হাবেং ২। আতং ৩। নিগাম ও ৪। মান্দে। প্রত্যেক শ্রেণীর ভাষাতে, শব্দের মধ্যে কিছু কিছু ইতর বিশেষ আছে। কিন্তু "মান্দে" ভাষা সকল শ্রেণীরই বোধগম্য। ইহাকে কতকটা (Continental) বলিয়া অভিহিত করা যায়। দুই একটি দৃষ্টান্তদ্বারা ভাষার পার্থক্য বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা যাইতেছে।——

	পিতা	মাতা
১।	হাবেং—আপ্‌কা,	আমা
২।	আতং—'আওয়া'	জৌ
৩।	নিগাম—আপ্‌পা,	গম্‌মাও
৪।	মান্দে—আপ্‌কা,	আম্‌মা

গারোদের কথিত ভাষায় একটু ওজস্বিতা আছে; এবং প্রায় শব্দই অনুস্বার যুক্ত ও হসন্ত। পশু পক্ষীর নাম অনেক স্থলেই অনুকার-শব্দজাত। জাতিবাচক একটি শব্দ যোগ করিয়া লইয়া বিশেষ বিশেষ নাম কথিত হইয়া থাকে;—যথা,—"দো সেক্," "দোবক," "দো গেপ্।" এই শব্দগুলিতে "দো" শব্দটি "পক্ষী" বাচক। ইহাদের ভাষায় শব্দ সংখ্যা অতি অল্প এবং কোনও লিখিত বর্ণমালা নাই। অধুনা বাঙ্গালা অক্ষরই লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে। কোনও কোনও শব্দ সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ;—যথা,—তিন্তিড়ী, (তেঁতুল) মাক্‌রা (বানর)। এটি সংস্কৃত মর্কট শব্দের প্রায় অনুরূপ। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হয় না যে, গারোগণ আর্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। শব্দের সাদৃশ্য দেখিয়া দুই তিন জাতি মানবের মধ্যে একজাতীয়তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যে ভ্রান্তিমূলক, ইহা প্রতিপন্ন করাই উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের উদ্দেশ্য। ইহারা এককালীন বিংশতির অধিক গণনা করিতে পারে না। আমরা যেমন দুই ও বহু দ্রব্যের মধ্যে একের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ "তর ও তম" প্রত্যয় যোগ করিয়া থাকি, গারোগণও তেমন ঐ উদ্দেশ্যে "নাম্মা," "নাম্বিয়া" ও "থুয়া," এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাষা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধের বিস্তৃতি আশঙ্কায় তাহাতে বিরত হইলাম। খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যাজকগণ গারোভাষার প্রথম শিক্ষার উপযোগি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পঠন পাঠনের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

১১। ধর্ম্ম।

গারোগণকে জড়োপাসক বলা যায়। ইহারা প্রায়ই রোগ উপশম এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপাত নিবারণের জন্য অভীষ্ট দেবতাকে আহ্বান করিয়া, ছাগ শূকর ইত্যাদি পশু বধ করিয়া পূজোপহার দিয়া থাকে। ইহাকে প্রচলিত ভাষায় "বিধান দেওয়া" বলে। কোনও দেব দেবীর প্রাত্যহিক উপাসনাপদ্ধতি নাই। অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দৈব উৎপাতেও বিধান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, ভয় হেতু, অমানুষিক কোনও অদৃশ্য শক্তির শরণাগত হওয়ার ভাবই, ইহাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সভ্যাসভ্য অনেক মানবেরই প্রাথমিক ধর্ম্মের মূলভিত্তি একই প্রকার। ক্রমোন্নতি সহকারে মানুষ, প্রকৃতি

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে মুদ্রিত "গারোজাতির বিবরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে কএকটি মুদ্রাকর-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। পাঠক নিম্নলিখিতরূপে সেই ভ্রম কটি সংশোধন করিয়া লইবেন।—৮ম ও ৯ম সংখ্যা বান্ধবের ৩৭৮ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ১৩শ পংক্তিতে 'বোনাই' শব্দের পরবর্ত্তী 'হাসি' শব্দের স্থলে হইবে,—হদি। ৩৮০ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ১২শ পংক্তির 'গেলা' হইবে,—গেনা। ১০ম সংখ্যা বান্ধবের ৪৫২ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ৫ম পংক্তির 'টাট্ট' হইবে,—টাট্টি; ঐ পৃষ্ঠার, ঐ স্তম্ভের ১০ম পংক্তির 'চুঙ্গাটি' হইবে,—জুঙ্গাটি; এবং ঐ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১০ম পংক্তির "মাতৃজ্ঞাতিতে" স্থলে হইবে মাতৃশ্রেণীতে। লেখক।

হইতে প্রকৃতির ঈশ্বরে উপনীত হয়। বহুত্বের মধ্যে একত্ব নির্দ্ধারণই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য। বেদে উক্ত হইয়াছে "একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" গারোগণ কোনও প্রকাশ্য পথে বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত নানাবিধ অসম্ভব মূর্ত্তি অথবা অন্য কোনও প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিধান দিয়া থাকে। ইহাদের পাপ পুণ্যে বিশ্বাস আছে। কেহ অপরাধী অথবা পাপী বলিয়া ধার্য্য হইলে, তাহার পাপ আছে কি না, নির্ণয় করার জন্য, অনেক প্রকার অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিম্নে কএকটি বিস্ময়জনক পদ্ধতি বিবৃত করা যাইতেছে। পরস্বাপহরণ মিথ্যাকথন, পারদারিকতা প্রভৃতিকে ইহারা পাপকার্য্য বলিয়াই মনে করে।

(ক) প্রথমতঃ একটি মৃণ্ময় পাত্রে জল রাখিয়া তাহা অগ্নি যোগে উত্তপ্ত করা হয়। তৎপরে একটি কঙ্কটাও তাহাতে নিক্ষিপ্ত ও সুসিদ্ধ হইলে, অপরাধীকে বলা হয় যে, ডিম্বটি উত্তোলন কর। তৎপর অপরাধী ব্যক্তি জলে হাত দিবে, যদি তাহাতে হাত পুড়িয়া যায় এবং ফোস্কা পড়ে, তবে সে নিশ্চয়ই অপরাধী, —তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা কতকটা (Ordial by fire) অগ্নিপরীক্ষা প্রথার অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের অগ্নিপরীক্ষা কি প্রকার ছিল বলিতে পারি না।

(খ) যে স্থানে ব্যাঘ্র বিচরণ করে, তথায় একটি ছাগ ও একটি গো বাঁধিয়া রাখা হয়; এবং লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া একটি লোক তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। যদি অপরাধীর পাপ থাকে, তবে ব্যাঘ্র নিশ্চয়ই ছাগ অথবা গো বধ করিবে। ইহা অপেক্ষা পাপের প্রকৃষ্ট পরীক্ষা আর কি হইতে পারে? সে যাহা হউক, ব্যাঘ্র গো কি ছাগ বধ করিলে, অপরাধীকে পাপী বলিয়া স্থির করার পক্ষে আর কোনই অন্তরায় থাকে না।

(গ) পাপের অপর একটি পরীক্ষা,—এক খণ্ড লৌহ অগ্নিতে পোড়াইয়া রক্তবর্ণ করা। পাপ থাকিলে লৌহ রক্তবর্ণ হইবে, নতুবা নহে। গারোদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। অতঃপর অপরাধীর হস্তে সাতটি কাঁটাল পাতা রাখিয়া উত্তপ্ত লৌহ তদুপরি চালিত করা হয়। যদি পাপ থাকে, তবে তাহা দগ্ধ হইবে, নতুবা নহে। এবম্বিধ আরও অনেক পরীক্ষা দ্বারা পাপ পুণ্যের প্রমাণ গ্রহণ করা, গারোদের পদ্ধতি। পাপ পুণ্যের পরীক্ষা কোথাও প্রত্যক্ষভাবে অগ্নি; আর কোথাও অপ্রত্যক্ষ এবং ভীষণ ধর্ম্মবহ্নি। কিন্তু উভয়ই অগ্নিপরীক্ষা। এই অগ্নিপরীক্ষায় ইহ সংসারে যে উত্তীর্ণ হইল, সেই নিষ্পাপ। তিনি সুসভ্য অনন্তজ্ঞানী মহাপুরুষই হউন, অথবা সে বন্য বর্ব্বর অসভ্য গারোই হউক, এই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তি যে প্রকৃতই নিষ্কলঙ্ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা যেমন তামা, তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল প্রভৃতি হস্তে নিয়া শপথ করি; গারোগণও তদ্রূপ ব্যাঘ্রের নখ, অস্থি অথবা দন্ত এবং মৃত্তিকা হস্তে নিয়া শপথ করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র ইহাদের নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। মৃত ব্যাঘ্র ইহারা কখনও স্পর্শ করে না।

১২। বর্ত্তমান শিক্ষা ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন।

অধুনা অনেক গারোবালকগণ বাঙ্গালা লিখা পড়া শিক্ষা করিতেছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণই এই শিক্ষার প্রবর্ত্তক। কতিপয় সংখ্যক বালিকাও শিক্ষালাভ করিতেছে। কেহ কেহ অল্প অল্প ইংরেজীও পড়িতে শিখিয়াছে। কেহ কেহ উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারী এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাও দিতেছে। এবম্বিধ শিক্ষার ফলে, তাহারা বেশ ভূষা পরিবর্ত্তিত করিতেছে, এবং ক্রমে সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হইতেছে। পক্ষান্তরে, বিলাসিতাবৃদ্ধিহেতু কৃষিকার্য্যাদিতে অবহেলা প্রদর্শন করিতেছে। এই অবহেলার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। ক্রমোন্নতিই জাগতিক নিয়ম, গারোদের পক্ষে তাহার অন্যথা হইবে কেন? ইহা পূর্ব্বেও অনেক বলা হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি আকস্মিক পরিবর্ত্তন, ইহাদের পক্ষে যেন কোন কোন অংশে, অনিষ্টজনক হইতেছে বলিয়াই মনে লয়। এই মত ভ্রান্তিমূলক কি না, বিজ্ঞ পাঠকবর্গই তাহার বিচার করিবেন। গারোদিগের অনেকেই তাহাদের পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধুনা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্চভাব ইহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে কি না, সন্দেহ। তবে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী গারোগণ সভ্যোচিত বেশ ভূষা ধারণ করিতেছে ও অনেকে মদ্যপান হইতে বিরত হইয়াছে এবং রবিবার দিন কার্য্য না করা অভ্যাস করিয়াছে। অনেকে "যীশু ত্রাণকর্ত্তা" এই উক্তি যখন তখন করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, কেন মহাত্মা যীশু ত্রাণকর্ত্তা তাহা অনেকেই বলিতে পারে না; এবং হয়ত বুঝিতেও সমর্থ হয় না। আপাতদৃষ্টিতে খৃষ্টান গারোগণকে একটু উন্নত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহাদের মানসিক অবস্থা কত দূর উন্নত হইয়াছে, বলা দুরূহ। মিসনারীগণ বাইবেলগ্রন্থ গারো ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের উদ্যম ও কার্য্যপটুতা প্রসংশনীয় এবং অনুকরণীয় বটে। দুঃখের বিষয়, অনেক সময়, আমরা তাঁহাদের সদ্‌গুণের অনুসরণ না করিয়া, কেবল বাহ্যিক হাব ভাব বেশ ভূষার অযথা অনুকরণে, ময়ূর-পুচ্ছধারী দাঁড়কাকের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি। ইহা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক এবং ইহার অপনোদন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। নতুবা আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ যেমন সম্প্রতি গারোগণকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া,তাহাদিগকে সভ্যতার পথে অগ্রসর করাইতেছেন, ইতিপূর্ব্বে নবদ্বীপের গোস্বামী সম্প্রদায়ও অসভ্য হাজঙ্গ ও মণিপুরিগণকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া,তাহাদের উন্নতির পথ পরিসর করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহাদের উদ্যম ও চেষ্টাও প্রশংসনীয়। গারোদের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই কেন, জানি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি এ,
(মহারাজা সুসঙ্গ)

আমার স্বপ্ন।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

(৫)

নিতাই দাদা আমাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া, বহু সমাদরে, তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। আমি সে দিন, তাঁহার বাটীতে, যে যত্ন ও সমাদর লাভ করিলাম, এ জন্মে আর কখনও কাহারও নিকট সেরূপ পাই নাই; আর কখনও কাহারও নিকট পাইব না। কিন্তু বলিতে লজ্জা করে, তাঁহার সে অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্ন আমার নিকট বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"আজ যে মুখখানা বড় মলিন দেখ্‌চি! ছেলে-মানুষ, কোথাও যাওয়া আসার অভ্যাস নাই। এতদূর এসে, পথশ্রমে কত কষ্ট হয়েছে! তা এখন একবার বাড়ীর ভিতর যাও, তোমার ঠান্‌দিদীর সঙ্গে দেখা ক'রে এস। সে কতক্ষণ থেকে তোমার জন্য চা তৈয়ার ক'রে রেখে, তোমার অপেক্ষায় দাঁড়য়ে রয়েছে। কিন্তু ভায়া, আজ কাল এই দোলের সময়টায়, একটু সাবধানে দেখা সাক্ষাৎ ক'রও। আর যাঁদের তোমাকে দেখ্‌তে আসবার কথা ছিল, আমি তাঁদের নিকট সংবাদ পাঠায়ে দিয়ে, কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আস্‌ব। তুমি ততক্ষণ তোমার নূতন ঠান্‌দিদীর সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ পরিচয় কর।"

আবার সহসা কে যেন প্রচণ্ড বলে আমার হৃদয়ে আঘাত করিল! কিন্তু, তখনই একবার আমার মনে আশার সঞ্চার হইল। হয়তো নসীরামের কথা সত্য নহে। হয়তো সে বিদ্রূপ করিয়া, আমার সেই স্বপ্নদৃষ্টা পরীকে তাহার নাত্তিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। আর নিতাই দাদার স্ত্রীই বা আজ প্রভাতে একাকিনী সে উপবন মধ্যে, সে মন্দিরে, কি করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে দেখিলে তো সব সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। আমার সে সাধের, স্বপ্নের পরী আমারই থাকিবে! আমি নিতাই দাদাকে বলিলাম,—"তবে আমি ঠান্‌দিদীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি!"

আমি বাটীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম, একটি বৃদ্ধা চাকরাণী পাখা হাতে লইয়া, একখানা আসনের সম্মুখবর্ত্তি গরম চা ও স্তূপাকার ফল, মূল ও মিষ্টান্নরাশির সম্মুখে বসিয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার ঠান্‌দিদী কোথায়?"

উত্তর হইল,—"তিনি এখনি আস্‌বেন!"

আমি অনন্যমনে সেই গরম চা ও সেই উপাদেয় বিবিধ খাদ্য সামগ্রীর অধিকাংশ নিঃশেষ করিয়া, ঠান্‌দিদীর দর্শনলাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কে সহসা

দ্রুতপদে, ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে, আমার পশ্চাতে আসিয়া, আমার মুখে ও চোকে আবির ফেলিয়া দিল। ওকি?—ওকি ঠান্‌দিদী! আক্রমণকারীকে দেখিবার জন্য চক্ষু উন্মীলন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই দেখিতে পারিলাম না। কেবল নারীকণ্ঠের মধুর হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া, চক্ষু মুছিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম! কি দেখিলাম! কিঞ্চিৎ দূরে, প্রাঙ্গণ মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া, আবার সেই রমণী,—আমার সেই স্বপ্নের পরী! বঙ্কিমনয়নে, ব্রীড়াসঙ্কুচিতকটাক্ষে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া, ঈষৎ মৃদু হাসি বিম্বাধরে বিকীর্ণ করিয়া, অলক্তরঞ্জিত-বামচরণ অপর পাখানা হইতে ঈষৎ অগ্রে রাখিয়া, আরক্তিমগণ্ডদেশ ললিত অঙ্গুলিদ্বয়ে ঈষৎ আবৃত করিয়া, আলুলায়িত কুন্তলরাশি বসন মধ্য হইতে ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! সে আবার মৃদু-হাস্য করিয়া, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল। তবে নসীরাম যাহা বলিয়াছিল,—সত্য,—ভীষণ, কঠোর, নিষ্ঠুর সত্য! আমার স্বপ্নের নারী, সাধের পরী, আমার নহে! নিতাই দাদার বিবাহিতা স্ত্রী! —আমার ঠান্‌দিদী!

আমি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আর কোনও দিকে না চাহিয়া, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম, নিতাই দাদা সেখানে নাই। আমি একটা তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিদ্রা কোথায়?—আমি ভাবিতে লাগিলাম—কি কুক্ষণে, সে দিন নিতাই দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল! কি কুক্ষণে সেই মোহময় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম! এখন কি করিব? কোথায় যাইব? এখানে থাকিলে, আবার তো নিতাই দাদার স্ত্রীর সম্মুখে যাইতে হইবে! তখন আমার দশা কি হইবে? আর তিনিইবা আমাকে দেখিয়া এবার কি করিবেন? তাহার সঙ্গে দুই বারের, এই দুই মুহূর্ত্তের সাক্ষাতে, বুঝিয়াছি, তিনিও তো আমার মত, আমার সঙ্গে, স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন। তবে কি তিনি কুলটা রমণী? পরপুরুষে অনুরক্তা? পরীজাতি এমনই অবিশ্বাসিনী! ইহা জানিয়া শুনিয়াও লোকে কেন বিবাহ করে? হায়! ধিক্ আমাকে! কাহার কুহকে মজিলাম!

আমার গরীয়সী গুরুজন পত্নীকে স্বপ্নেও প্রেমচক্ষে দেখিলাম। আবার এখনও,—সে পাপ-স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াও, সে মদিরাময়ী কল্পনার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম না! আমার মত পাপিষ্ঠ কি এ জগতে কেহ আছে? আমি উন্মত্তের মত শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উন্মত্তের মত লক্ষ্যশূন্য ভাবে, দ্রুতপদ-সঞ্চারে, ঘরের বাহিরে আসিলাম। একজন ভৃত্য ভূ-শয্যায় শয়ন করিয়া নাসিকাধ্বনি সহকারে নিদ্রা যাইতেছিল। সে আমাকে দেখিতে পাইল না। আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। আবার সেই নির্জন উপবনে

সেই মন্দির সমীপে আসিলাম। হায়! আজ প্রভাতে যে সুরম্য উপবনটিকে সবিস্ময়ে, সপুলকে, প্রকৃতই পরীর প্রমোদ-ভবন মনে করিয়াছিলাম, এখন সহসা তাহাই পিচাশ-নিবাসের ন্যায় ভয়াবহ অনুভূত হইল! আমি যেন সভয়ে, আরও দ্রুতপদে চলিলাম। রেল-ওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কলিকাতার গাড়ী কখন যাইবে? উত্তর পাইলাম, কলিকাতার গাড়ী এইমাত্র চলিয়া গিয়াছে, আবার রাত্রি দুই প্রহরের সময় যাইবে। আমি কলিকাতার অভিমুখে অপর ষ্টেশনের দিকে পদব্রজে চলিলাম।

(৬)

কলিকাতার বাটীতে আসিয়া আমাদের পুরাতন গোমস্তা মাধব চক্রবর্ত্তীকে বাটীর চাবি দিয়া বলিলাম,—"আমার এখন পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমি কাশীতে মার কাছে যাব।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"এত দূরে যাবে, একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।" আমি বলিলাম,—"কোন দরকার নাই। আমি একলা যাব।"

পরদিন, হাবড়া ষ্টেশনে আসিয়া, টিকেট কিনিয়া প্রভাতের ট্রেণে উঠিলাম। প্রকাণ্ড-বপু, ভীষণকায়, বিজাতীয় হিংস্র পশুর ন্যায় রেলগাড়ী সরোষে, সদর্পে, তীব্ররবে, আস্ফালন করিয়া, যেন কোন দূরদেশবাসী, দুর্দ্ধর্ষ অরাতিদলের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য, প্রবলবেগে ছুটিল! তরুলতা, নদনদী, আকাশ ও ভূতল, যেন সে ভীষণ নিনাদে, সে ঘোর চীৎকারে, সহসা চেতনা লাভ করিয়া, সভয়ে, সবেগে, পশ্চাতে পলাইতে লাগিল! আমি একখানা খালি গাড়ীর এক কোণে বসিয়া, রুমালে মুখ ঢাকিয়া, ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম।—যাঁর কাছে যাইতেছি। তিনি তো আগেই,—আমাকে দেখিয়াই, আমার বিবাহের কথা বলিবেন। যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার আদেশ মতে, নিতাই দাদার কথা না শুনিয়া তাঁহাকে বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ করিতে সম্মতি না দিয়া, হঠাৎ কেন চলিয়া আসিলাম, তখন তাঁহাকে কি উত্তর দিব? সুপ্তাবস্থার যে সুখ-স্বপ্ন, অচিরাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় জীবন্ত সত্য হইল, আবার তখনই দেখিতে দেখিতে কাল-স্বপ্নে পরিণত হইয়া গেল, তাহা তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? স্বপ্ন যে সত্য হয়, আমি পূর্ব্বে কখনও বিশ্বাস করি নাই। কত বার ম্যাডেম্ ব্লেভেট্স্কি, মিস্ বিস্যাণ্ট প্রভৃতি স্বর্গীয় প্রতিভাশালিনী রমণীগণকে, কুসংস্কারাপন্না নারী বলিয়া উপহাস করিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িল! আপনাকে আত্মাভিমানী মূর্খ বলিয়া কত ধিক্কার দিলাম। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অমর, অবিনশ্বর মানবাত্মার প্রতি অবিশ্বাস, প্রভাত-তপনের উজ্জ্বল আলোক স্পর্শে কুজ্ঝটিকার ন্যায়, অন্তর্হিত হইল। আবার অসহ্য অনুতাপানলে হৃদয় প্রধূমিত হইতে লাগিল। নিতাই দাদার উপর অকারণ মনে কত ক্রোধ হইতে লাগিল। তাঁহার উপর শৈশবাবধি যে অকৃত্রিম ভালবাসা ও ভক্তি ছিল, তিনি যে আমাকে চির দিন

প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, আজ যেন তাহা একবারে ভুলিয়া গেলাম।—তাঁহার সঙ্গে প্রাণের মিলন, হৃদয়ের বন্ধন হঠাৎ যেন ছিঁড়িয়া গেল! মনে মনে তাঁহাকে মূর্খ ও কাপুরুষ—বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলাম। এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি কোন্ সাধে, কোন্ সাহসে, এই অলোকসামান্যা সুন্দরী বালিকাকে বিবাহ করিলেন? তিনি যদি ইহার পতি না হইতেন, হায়! কি লজ্জার কথা, আমি কি পাপিষ্ঠ!—তিনি মূর্খ হউন, কাপুরুষ হউন, আমার তো গুরুজন! আর তাঁহার ভার্য্যা, সেই বালিকা, আমার গরীয়সী গুরুপত্নী! যদি আমি মনুষ্যদেহে পশু না হইতাম, তাহা হইলে, এত ক্ষণে তাঁহাকে ভুলিতে পারিতাম! তাঁহাকে কি ভুলিতে পারিব না? এ পাপ-হৃদয় হইতে, চিরজীবনের মত, তাঁহার ছায়া কি মুছিয়া ফেলিতে পারিব না? আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আবার ভাবিতে লাগিলাম। আবার সেই তন্বী ললনার সানুরাগ সলজ্জ দৃষ্টি, সেই মধুর অঙ্গভঙ্গী বারবার হৃদয় মধ্যে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। আমি করযোড়ে, পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য ঊর্দ্ধে চাহিলাম। কিন্তু এ অপবিত্র প্রাণ লইয়া, সে পবিত্র নিকেতনে যাইতে সাহস হইল না। আমি হতাশ হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে রেলগাড়ী বহুদূরে পৌঁছিল। বুঝিতে পারিলাম, কাশী অধিক দূরে নহে। আবার মনে ভয় হইতে লাগিল, মা নিশ্চয়ই বিবাহের কথা বলিবেন। তাঁহাকে কি উত্তর দিব? আমার মনের ভাব তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

পর দিন, প্রভাতে, দিন রাত্রির অনশনে, অনিদ্রায়, কম্পিতদেহে, স্খলিতচরণে আমাদের কাশীর বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। —কাতরস্বরে, শুষ্ককণ্ঠে ডাকিলাম,—"মা!" মা ঘরের ভিতর হইতে দৌড়িয়া বাহিরে আসিলেন। আমি দৌড়িয়া মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। "কি অসুখ হয়েছে?" বলিয়া মা সজল নয়নে আমাকে কোলে লইয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি মার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বহু দিন পূর্ব্বে, শৈশবে এক দিন আমাদের বাটীর এক জন দুষ্ট চাকর, সন্ধ্যার পর, অন্ধকারে বায়ুভরে দোদুল্যমান বৃক্ষ শাখা দেখাইয়া, 'ঐ ভূত হাত বেড়াইয়া ধরিতে আসিতেছে' বলিয়া, আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল; সেই দিন আমি, আজিকার মত, এমনই করিয়া, সভয়ে দৌড়িয়া গিয়া মার কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলাম! তার পর আর এক দিন,—আমার সাত বৎসর বয়সের সময়, যখন আমার কনিষ্ঠা ভগিনী কমলের, পাঁচ বৎসর বয়সে, মৃত্যু হইয়াছিল; আমি রাত্রি কালে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। প্রভাতে উঠিয়া যখন সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—কমল কোথায়, পাছে আমি তার জন্য কাঁদি, এই ভয়ে সকলে আমাকে বলিয়াছিল, সে মামার বাড়ী গিয়াছে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে। তার-পর এক দিন আমার সমবয়স্কগণের নিকট যখন শুনিলাম,

কমল এ পৃথিবীতে আর নাই, সে মরিয়া গিয়াছে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে দৌড়িয়া গিয়া,—"মা! কমল আর ফিরে আস্‌বে না!" বলিয়া মার গলা ধরিয়া, তাহার অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া, আজিকার মত এমনই করিয়া কাঁদিয়াছিলাম!

মা বারংবার আমার শিরশ্চুম্বন করিয়া, সরোদনে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"কি হয়েছে? কেন কাঁদ্‌ছ? কি অসুখ হ'য়েছে! আমি অনেক ক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া, অনেক-ক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া, মাকে অনেক ক্ষণ কাঁদাইয়া, অনেক ক্ষণ পরে বলিলাম,—"মা! আমি বিবাহ কর্‌ব না। তোমার পায়ে পড়ি, মা! আর আমাকে কখন বিবাহ কর্‌তে বলিও না।"

(৭)

মা আমাকে সস্নেহে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি আর কখনও আমাকে বিবাহ করিতে বলিবেন না। কিন্তু,কিছু দিন পরেই, জানিতে পারিলাম যে, তিনি আমাকে কেবল প্রবোধ দিবার জন্য এরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনের ভাব অন্যরূপ। তিনি আমার সম্মুখে বিবাহের কথা কখনও উত্থাপন করিতেন না সত্য, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশিগণের নিকট, —তাঁহার পরিচিতা স্ত্রীলোকগণের নিকট, আমার বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেন। এক দিন গেজেটে দেখিলাম, আমি এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। আমি মার নিকট গিয়া তাঁহাকে এই সুখের সংবাদ জানাইলাম। তিনি শুনিয়া অনেক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম, সেই আনন্দাশ্রুর সঙ্গে, তাঁহার চক্ষে বিষাদ-বাষ্প দেখা দিল। এত দিন পরে, তিনি আজ আমাকে স্পষ্টই বলিলেন,—"আজ এই সুখের দিনে, যদি আমার ঘরের লক্ষ্মী এসে ঘর আলো কর্‌ত, তাহ'লে আজ আমার মনে কত সুখ হ'ত? সে যা হোক, আমি যে তোমাকে কতবার বলেছিলেম যে, মামাকে চিঠি লিখ। তা তুমি এখনও লিখ নাই কেন, আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। তুমি তাঁর বাড়ী গিয়ে, তাঁকে না ব'লে, হঠাৎ পালিয়ে এলে, এতে তাঁর মনে কত কষ্ট হয়েছে, একবার মনে ভেবে দেখ দিকি! মামার তো কথাই নাই, মামী যে কত দুঃখ করে পত্র লিখেছেন, একবার পড়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, কি অন্যায় কাজটাই করে'ছ!"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। মা বলিতে লাগিলেন, "সে যা হোক, আজ মামাকে এক খানি চিঠি লিখ। তুমি পাশ হয়েছ শুনে, আর তোমার হাতের চিঠি পেয়ে, তিনি কত সুখী হবেন!" আমি বলিলাম,—"মা! তুমি যে সে দিন বলেছিলে, নিতাই দাদা তোমাকে লিখেছেন যে, এ জন্মে তিনি আর আমার মুখ দর্শন কর্‌বেন না।" "তোমার অন্যায় ব্যবহারে, তাঁর মনে বড় কষ্ট হয়েছিল, তাই তিনি মনের দুঃখে এ রকম কথা লিখেছিলেন। তুমি ক্ষমা চেয়ে তাঁকে পত্র লিখ্‌লে, আর কি তাঁর মনে রাগ থাক্‌বে? তিনিতো মহাদেব! তুমি কি জান না, তিনি তোমাকে কত ভাল বাসেন? তুমি এমন বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হয়ে, তাঁর মনে কষ্ট দিবে, এই কি তোমার উচিত?"

আমি কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলাম দেখিয়া, মা আবার বলিতে লাগিলেন, "এত দিন পরে, তাঁকে চিঠি লিখ্‌তে তোমার লজ্জা করে, তা আমি বুঝ্‌তে পারি। যদি তাই হয়, মামী আমাকে যা লিখেছেন তাই কর।"

আমি এতক্ষণ নত মুখে মায়ের কথা শুনিতেছিলাম, হঠাৎ মুখ তুলিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার মামী আবার কি লিখেচেন?"

"তবে তাঁর চিঠিখানা এনে দিই, প'ড়ে দেখ! তিনি কত দুঃখ ক'রে, কত কথা লিখেচেন, আর তোমাকে কত ভাল পরামর্শ দিয়েচেন।" "চিঠিতো তুমি পড়েছ! তোমার মামী কি পরামর্শ দিয়েচেন, তাই বল।"

"তিনি লিখেচেন,—'তোমার মামা যে আমার নাতির উপর রাগ করেচেন, সে রাগ আর কতক্ষণ থাক্‌বে? তুমি যদি নাতিকে বুঝিয়ে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার, আমি মধ্যস্থ হ'য়ে, দুজনের মিটমাট করে দিব। আমি আমার মনে কত সাধ ছিল যে, নাতিকে ভাল করে দেখ্‌ব, আর তার সঙ্গে দু'চার দিন, আমোদ আহ্লাদ কর্‌ব, তার কিছুই হ'ল না! এবার একবার যদি তাকে পাঠিয়ে দাও, আমি তাকে বেঁধে রাখ্‌ব। দেখ্‌ব, এবার কেমন করে পালায়।' তা এ সবতো ভাল কথাই লিখেচেন। আর একবার তুমি মোহনপুরে যাও। আর আমিও তো অনেক দিন থেকে দেশ ছেড়ে, সব ফেলে ছড়িয়ে চ'লে এসেছি, তা চল, আমিও না হয়, তোমার সঙ্গে যাই।" আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। লজ্জা, ঘৃণা ও ক্ষোভ, এক সঙ্গে আমার হৃদয় অধিকার করিল। নিতাই দাদার উপর আবার রাগ হইল। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অপ্সরী ভাবিয়া, এ রাক্ষসীকে কেন বিবাহ করিলেন? রাক্ষসীর যে অপ্সরীর মত রূপ, কিন্তু প্রেতিনীর মত প্রাণ, তাহা তো তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন না। আমি জানি, আমি পাপাত্মা, পশুর অপেক্ষা অধম, আমি এখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিলাম না। কিন্তু সে, আমার নিতাই দাদার পরিণীতা স্ত্রী হইয়া, লজ্জা ও ঘৃণায় জলাঞ্জলি দিয়া, নিজে আবার আমাকে ডাকিয়াছে। সে নিজের হাতে লিখিয়াছে, আমার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য, আমাকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া মা আবার বলিলেন,—"চুপ্ করে রইলে যে? তবে এতে আর অমত করিও না। একটা ভাল দিন দেখে চল, আমরা দেশে যাই। তারপর যেমন হয়, পরে দেখা যাবে।"

আবার আমার হৃৎপিণ্ড কম্পিত হইতে লাগিল। আমার মনে হইল, আবার মার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া, একবার উচ্চ রবে ক্রন্দন করিয়া, তাঁহাকে মনের কথা সমস্ত খুলিয়া বলি। অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলাম, এবং হৃদয়টাকে একটু আয়ত্ত করিয়া

বলিলাম,—"কাল আমি এ কথার উত্তর দিব।" পর দিন মার কাছে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম,—"আমি এখানে একটি চাকরির যোগাড় করেছি। এখানকার কালেজে একটি প্রোফেসারি খালি আছে। আপাততঃ একশ টাকা মাহিনা পাব। শীঘ্র আবার মাহিনা বাড়্‌বে। এখন তবে আমাদের এই খানেই থাকা হ'ল!"

মা যেন হতাশ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেশে কি আর তোমার চাকরি যুট্‌বে না? এখন দেশে চল, তারপর যা হয় দেখা যাবে।" "না মা! তুমি বুঝ্‌তে পার না। এমন সুবিধার চাকরি আর পাওয়া যাবে না।"

"তবে মামাকে একখানি চিঠি লিখ যে, আমরা ছুটির সময় দেশে যাব।" আমি বলিলাম,—"চিঠি-পত্র লেখা আমা হ'তে হবে না। তুমিই তাঁকে যা হয়, লিখে দাও। নয়ত তা না হয়, মা! তুমি দিন কতেকের জন্য দেশে যাও, আমি এখানে থাকি।" আমি মার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। বুঝিলাম, তাঁহার বড় রাগ হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর আজি পর্য্যন্ত, তিনি কখনও আমার উপর রাগ করেন নাই। তিনি সরোষে সাশ্রুনয়নে বলিলেন,—"তোর যা ইচ্ছা হয় কর্। আজ থেকে আমি আর তোর কোনও কথায় থাক্‌ব না।"

মা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আমি বিষণ্ণমুখে বাটীর বাহিরে আসিলাম।

(৮)

যেমন জাহ্নবী বক্ষে অনলরাশি ফেলিয়া দিলে, সেই পবিত্র বারিধারা একবার মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া, তখনই সেই আগুন নিবাইয়া দিয়া, আবার শীতল তরঙ্গ ভঙ্গে ধাবিত হয়, যেমন প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উত্তপ্ত কিরণ মধ্যেও শীতল বায়ু সস্নেহে জীব-দেহ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়, তেমনই আমার উপর মায়ের যে রাগ হইয়াছিল, ক্ষণমাত্র পরেই, তাহা তাঁর সেই পবিত্র স্নেহময় অন্তর মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। তাঁর হৃদয়ের সেই অসীম ভালবাসা আমার এত অপরাধেও, আগে যেমন ছিল, আবার তেমনই হইয়া রহিল। তিনি সন্ধ্যার পর, নিজে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এত রাত হয়েছে,এখনও খেতে আস্‌চিস না কেন?" আমি খাইতে বসিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"তা যদি ভাল চাকরি হয়ে থাকে, তা হঠাৎ ছেড়ে যাওয়া যে ঠিক নয়, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি। আমি মামাকে ও মামীকে বেশ করে বুঝিয়ে চিঠি লিখ্‌ব।"

আমি আপাততঃ কিছু দিনের জন্য নিষ্কৃতি পাইলাম। মা নিজেই তাঁহার মামা ও মামীকে চিঠি লিখিতেন, আর তাঁহাদের চিঠি তাঁহারই কাছে আসিত, এবং তিনিই উহার উত্তর দিতেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসর পূর্ব্বে যে কালস্বপ্ন সত্য হইয়াছিল, আজিও এত দিনের পরে,—এত চেষ্টার পরে, তাহা কখনও ভুলিতে পারিলাম না। মা আমাকে প্রায়

প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করিতেন,—"তোর শরীর দিন দিন কেন শুকিয়ে যাচ্চে, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না। নিশ্চয়ই কোন একটা অসুখ আছে। যদি এখানকার জল হাওয়া ভাল না হয়, তবে এখানে আর থেকে কাজ নাই।" তিনি আমাকে না বলিয়া কত ঠাকুর দেবতার পূজা মানিতেন। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়া, আমার শরীর ভাল হইলে, ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইয়া আসিতেন। গোপনে কত ডাক্তার বৈদ্যের নিকট আমার কি অসুখ হইয়াছে, দেখিবার জন্য, লোক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে কত অনুরোধ করিতেন। আমি কখন কখনও সে সংবাদ জানিতে পারিতাম। আমার বন্ধুগণও প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—"এখানে এসে অবধি তোমার শরীর দিনদিন খারাপ হচ্ছে, এর কারণ কি?" সে যাহা হউক, এই এক বৎসর পরে, আমি আবার একটা নূতন বিপদে পড়িলাম। একদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—মা একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হয়েছে, মা! কাঁদ্‌চ কেন?" তিনি বলিলেন,—"আজ মামীর কাছ থেকে কি চিঠি এসেছে, দেখ! আজ এখনই আমাদিগকে দেশে যেতে হবে!"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! কি জানি, এত দিন পরে, কুহকিনী আবার কি কুহকজাল বিস্তার করিয়াছেন! আমি কম্পিত করে, চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলাম। তিনি মাকে লিখিয়াছেন, "তোমার মামার বড় অসুখ। তিনি, তিন দিন অবধি, অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। সতীশকে পত্র পাঠ আসিতে বলিবে। তুমিও তাহার সঙ্গে আসিবে।" মা বলিলেন—তবে আর দেরি করে কাজ নাই। এখনই, এই সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হ'তে হবে।" আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—"এ চিঠির খবর কত দূর সত্য, তাতো আগে জানা আবশ্যক!" মা ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তুই নিশ্চয় পাগল হয়েচিস্! তোর প্রাণে কি আর মায়া মমতা কিছুই নেই?"

আমি বলিলাম,—"রাগ কর্‌চ কেন মা? এ চিঠিখানিতে যে তারিখ লেখা রয়েছে, সে আজ চার দিনের কথা। এ চার দিনে, নিতাই দাদা কেমন আছেন, আগে তার খবর লওয়া দরকার! হয়তো এত দিনে তিনি আরোগ্য লাভ করেচেন। আমি টেলিগ্রাফ ক'রে এখনই খবর আনাচ্ছি।"

"টেলিগ্রাফে খবর আস্‌তে কতদিন লাগ্‌বে, ততদিন কি আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌ব?"

"দু টাকার টেলিগ্রাফ দিলে, আর তার সঙ্গে জবাবের জন্য আরও দুটি টাকা দিলে, এখনই, দু এক ঘণ্টার মধ্যে খবর পাব।"

"তবে এখনই বাড়ুয্যে মশায়কে টেলিগ্রাফ কর। কিন্তু জবাব আস্‌তে দেরি হলে, আমি এখানে আর থাক্‌ব না।" আমি জানিতাম, কৃষ্ণধন বাড়ুয্যে নিতাই দাদার প্রতিবেশী ও তাঁহার বন্ধু।

আমি তাঁহার নামে টেলিগ্রাফ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। বৈঠকখানায় বসিয়া তারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। মা বারবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—তারের জবাব আসিয়াছে কি না? দুই ঘণ্টা পরে, আবার আসিয়া যখন শুনিলেন, তখনও কোন জবাব আসে নাই, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"তবে বুঝি আমার মামা নাই! দুই ঘণ্টাতো অনেক ক্ষণ হয়ে গিয়েছে,এখনও তো তারের জবাব এল না।"

আমি অনেক কষ্টে, অনেক রকম কথায়, মাকে প্রবোধ দিয়া সে রাত্রি কাটাইলাম। প্রাতে বাড়ুয্যে মহাশয়ের টেলিগ্রাফ আসিল। তাহাতে লেখা ছিল,—নিতাই দাদার জ্বর হইয়াছিল, আজ পথ্য করিয়াছেন। আমি আবার কিছু দিনের জন্য নিষ্কৃতি লাভ করিলাম। কিন্তু মনে বড় আশঙ্কা রহিল। কেননা গ্রীষ্মের সময়, কালেজ বন্ধ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। এবার ছুটীর সময়, মা নিশ্চয়ই আমাকে দেশে যাইতে বলিবেন। অনেক ভাবিয়া একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম। আমাদের প্রতিবেশী ও ডাক্তার ললিত বাবুকে বলিলাম,—এই গ্রীষ্মের সময়, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য, একবার 'নাইনিতাল' পাহাড়ে গিয়ে, দুমাস থাক্‌লে, আমার স্বাস্থ্যের একটু উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?"

ললিত বাবু বলিলেন,—"এর চেয়ে আর স্বাস্থ্যের উপকার কিসে হ'তে পারে? অনেকদিন এখানে রয়েছ, একবার স্থান পরিবর্ত্তন ক'র্‌লে, বিশেষতঃ এই গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ে গেলে, বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা।"

আমি বলিলাম, "তবে আপনি মাকে এ কথাটা একবার ব'ল্‌বেন।"

"ডাক্তার বলিলেন,—"নিশ্চয়ই বল'ব। আর যাতে তিনি কালেজ বন্ধ হওয়া মাত্রই তোমাকে পাহাড়ে যেতে বলেন, তাও ক'রব। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" (ক্রমশঃ)

কবির বিলাপ।

ইতর-তাপ-শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর, তানি সহে চতুরাণন,
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

ভাবানুবাদ।

যত দুখ আছে বিধি, দাও তাহা সহিব;
মরমে পুড়িব, তবু মুখে তা না কহিব;
অরসিকে রসালাপ এ যে এক যাতনা,
আমার ললাটে বিধি লি'খ না হে, লি'খ না।

এ কবিতায় রসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রসের অর্থ কি? রস বলিলে, রূপের কথা, আর কুটিল কটাক্ষের কথা ছাড়া, এ জগতে আর কিছু কি বুঝায় না? ভক্তি প্রীতি, বিস্মিতি এবং বীর ও করুণ প্রভৃতি আর কোন ভাবেই কি কখনও রসের ঢেউ খেলায় না,—রসিক ও রসিকার রস-পিপাসু হৃদয়ের উপযোগিনী রস-স্ফূর্ত্তি হয় না?

কিশোর-গৌরাঙ্গ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"গজমতি হার যেন গাঁথিল সুতায়,
নয়নে বহয়ে জল বিশাল হিয়ায়।"

গৌরাঙ্গ এইক্ষণ দ্বাদশ বৎসরের বালক, অথচ এই বয়সেই, নবদ্বীপের ঘরে ঘরে তাঁহার নাম, এবং ছোট ও বড় সমস্ত টোলে তাঁহার বুদ্ধি, মেধা ও বিদ্যোন্মত্ততার আলোচনা। তিনি যখন, গঙ্গাস্নানের পর বাড়ীতে আসিয়া তুলসীর মূলে জল-সেচন অথবা বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চনা করিতেন, তখন জগন্নাথমিশ্র, কোন কোন দিন, আড়ে থাকিয়া, তাঁহার রূপ দেখিতেন; এবং তিনি শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় ধীরে ধীরে কিরূপ ফুটিয়া উঠিতেছেন, তাহা চিন্তা করিয়া আনন্দে বিভোর রহিতেন।—

"দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
হরষিতে রাত্রি দিন কিছু না জানয়॥"

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও, কেমন একটা আগুনের তাপ মিশ্রঠাকুরের অন্তরে অনুভূত হইত। বিশ্বরূপের বিয়োগ-দুঃখ, তাঁহার হৃদয়ে, অহোরাত্রই একটা লুক্কায়িত বহ্নি-শিখার মত, ধিকি ধিকি জ্বলিত; এবং পাছে বিশ্বম্ভরও তাঁহাকে পরিশেষে বিশ্বরূপের ন্যায় ফাঁকি দেয়, এই চিন্তা, সময়ে সময়ে, তাঁহার প্রাণের মধ্যে, অতি দুঃসহ দাহ জন্মাইত। তাঁহার প্রাণাধিক বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গ, নির্জ্জনে বসিয়া, অধ্যয়ন করিতেন; তিনিও নির্জ্জনে বসিয়া, তদীয় মঙ্গলকামনায়, নারায়ণের পাদপদ্মে নিরন্তর তুলসী দিতেন। তাঁহার অন্তরে তখন একমাত্র প্রার্থনা, এবং সেই প্রার্থনা, গৌরাঙ্গের গার্হস্থ্য সুখ। হায়! আমরা কত সময়েই, না জানিয়া অথবা নিয়তির গতি ও তত্ত্ব না বুঝিয়া, কত প্রকার প্রার্থনা করিয়া থাকি; এবং আমাদিগের প্রার্থনা কোন অংশেও সিদ্ধ হইতেছে না দেখিয়া, দয়াময় ভগবান্‌কে নির্দ্দয় মনে করি। মিশ্রঠাকুরের প্রাণোত্থিত গভীর প্রার্থনা সিদ্ধ হইবার যোগ্য ছিল কি? তিনি নয়নজলে ভাসিতেন, আর তদ্গত চিত্তে প্রার্থনা করিতেন;—

"সবে এক বর কৃষ্ণ মাগি তোর ঠাই।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাই।"

কিন্তু, মিশ্র মহাশয়ের প্রার্থনা পূর্ণ না হইলেও, ঐ প্রার্থনাই তাঁহার অন্তরে একটা অননুভূতপূর্ব্ব শক্তি দান করিত; এবং পতি-

দুঃখ-কাতরা শচীর সান্ত্বনা বাক্যও, তাঁহার হৃদয়ে কখনও বিচিত্র শান্তি জন্মাইত। তবে শচী কি জগন্নাথ হইতে অধিকতর জ্ঞান-বল-সম্পন্ন, এবং শোক-দুঃখ ও দুর্ভাবনা-সম্পর্কে সমধিক সুস্থির ছিলেন? তাহা নহে। শচীর বল অবলার বল। সে বলের নাম ভালবাসা। যিনি নিঃস্বার্থ হৃদয়ে ভালবাসেন, এ সংসারে তাঁহার বল সকল বিষয়েই দেবতার বল। শচী একদিকে পতিপরায়ণা সতী, আর এক-দিকে পুত্র-পাগলিনী মাতা। তাঁহার একই প্রাণ, যেন যমুনা ও গঙ্গার ন্যায়, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, ভালবাসার দুইটি প্রবাহে প্রবাহিত হইত; এবং পতি ও পুত্র উভয়েরই হৃদয়ের উপর প্রবল শক্তিতে কার্য্য করিয়া, তাঁহার আত্মহৃদয়েও বিশ্বাস ও দৃঢ়তা জন্মাইত। তিনি গৌরাঙ্গকে যেমন পিতার দুঃখ বুঝাইয়া সময়ে সময়ে শাসন করিতেন, মিশ্র-পুরন্দরকেও সেইরূপ নানা প্রকার প্রবোধ-বাক্যে সাহস দিয়া সুস্থির রাখিতে যত্ন পাইতেন। মিশ্রঠাকুরের সামান্য দুঃখও শচীর প্রাণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত। তিনি, বিরলে তাঁহার কাছে বসিয়া, বুঝাইয়া বলিতেন;—"তুমি বৃথা দুঃখ করিয়া কষ্ট পাইও না। দেখ না, ইহার মতি গতি কেমন হইয়া উঠিতেছে? তোমার এই বালক তিলার্দ্ধও পুঁথি ছাড়িয়া রহিতে পারে না। ইহার চিত্তে অন্য কোন ভাবের উদয় অসম্ভব।" শচী এইরূপে বুঝাইতেন, জগন্নাথও শচীর কথায় শীতল হইতেন; এবং দুই জনে, এক-প্রাণে, সেই অগতির-গতি-স্বরূপ 'অবোধ' পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, অন্তরের দুঃখ দুর্ভাবনা ভুলিয়া যাইতেন।—

"পুঁথি ছাড়ি নিমাই না জানে কোন কর্ম্ম,
বিদ্যারস তাঁহার হয়েছে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
এই মত পরম উদার দুই জন,
নানা কথা কহে পুত্র স্নেহের কারণ।"

এই ভাবে বৎসরেক কাটিয়া গেল, এবং বিধাতার ইচ্ছায় জগন্নাথের কাল ফুরাইয়া আসিল। জগন্নাথ মিশ্রের বয়স তখন তিষট্টি কি চৌষট্টি বৎসরের অধিক নহে। এই বয়সের লোকেরা, সে সময়ে, বঙ্গদেশে বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। বস্তুতঃ, পুরাতন বঙ্গের অধিকাংশ লোকই তখন স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক নিয়ম-পালনে, আশী কি নব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বলিষ্ঠ লোকের ন্যায়, চলিয়া ফিরিয়া কর্ম্ম করিতে সমর্থ রহিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য জগন্নাথ অকাল-বৃদ্ধ। বৃক্ষ যেমন, কোটরস্থ বহ্নিদ্বারা পোড়া পোড়া হইয়া, হঠাৎ এক সময়ে সামান্য বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে; মিশ্রপুরন্দরও, তাঁহার চির-জীবন-কাল, হৃদয়স্থ শোকে জর্জ্জরিত রহিয়া, পরিশেষে আকস্মিক রোগে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হঠাৎ বড় কঠিন জ্বর হইল। জ্বর বিকার পাইল। শচী, জগন্নাথের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গ তখন বালক হইলেও প্রগাঢ় বুদ্ধিমান্। তাঁহার উল্লাস-তরল অধীর-প্রকৃতি, বিপদের গন্ধ পাইয়াই, বার্দ্ধক্যের গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিল। তিনি তাঁহার

মাতাকে নানা প্রকারে সাহস ও ভরসা দিলেন, এবং তাঁহার পিতার যাহাতে সদ্গতি হয়, তাহা ভাবিয়াই আকুল হইলেন। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের অনেক আত্মীয় ছিলেন। সে সকলেই তাঁহার বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন। গৌরাঙ্গ যখন সমাগত আত্মীয়দিগের বাক্যে ও ব্যবহারে বুঝিতে পাইলেন যে,"কাল প্রত্যাসন্ন", তখন মায়ের দিকে চাহিয়া,অতি কাতর-স্বরে কহিলেন;—"মা, আর বিলম্ব নাই। চল, ইঁহাকে লইয়া, জাহ্নবীর তটে যাইয়া, এ সময়ে সকলে মিলিয়া কৃষ্ণ নাম শুনাই। আমরা কাঁদিবার সময় অনেক পাইব মা, এইক্ষণ কাঁদিবার সময় নহে। যাহাতে আমার পিতার সদ্গতি হয়, মা তুমি এইক্ষণ সেই কার্য্যেই মনোযোগী হও।"

জগন্নাথ ক্ষণ-পরেই জাহ্নবীর তীরে আনীত হইলেন,এবং চরম-সময়ের চালন-ক্লেশে মুহূর্ত্ত-কাল অচেতন থাকিলেও, পুনরায় চক্ষু মেলিয়া সকলের দিকে চাহিলেন। চারিদিকে নবদ্বীপের অসংখ্য নরনারী ও আত্মীয়-স্বজন, —চরণোপান্তে কোটি হৃদয়ের আরাধনার, করুণ-মূর্ত্তি গৌর-রতন।

গৌরাঙ্গ সময় বুঝিয়া সম্মুখে আসিয়া বসিলেন; এবং জগন্নাথ ধীরে ধীরে,—যেন বড় কষ্টে, দৃষ্টি স্থির করিয়া, গৌরাঙ্গের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। তাঁহার সে সময়ের সেই অনির্ব্বচনীয়-স্নেহপূর্ণ, কারুণ্য-স্নিগ্ধ কাতর-দৃষ্টি গৌরাঙ্গের সহ্য হইল না। গৌরাঙ্গের প্রাণ-ভরা ভালবাসার অতল সমুদ্র উন্মাদ-তরঙ্গে উথলিয়া উঠিল। তিনি এতক্ষণ কোন প্রকারে সুস্থির ছিলেন। কিন্তু পিতার সেই কাতর দৃষ্টিতে, যেন একবারে আত্মহারা হইয়া, পাগলের মত কাঁদিতে লাগিলেন; এবং কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কহিলেন,—"বাবা তুমি আমায় ছাড়িয়া কোথায় চলিলে। আমি আর ত কখনও, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বাবা বলিয়া তোমায় ডাকিতে পাইব না। আমার ঘর আজি হইতে শূন্য এবং সংসার আমার জন্য অন্ধকার হইল। আমি আর ত তোমার ঐ চরণ দুখানি চক্ষে দেখিব না। আর ত আমায় কেহ, হাতে ধরিয়া, আদর করিয়া, লেখাপড়ায় শিক্ষা দিবে না।" যথা চৈতন্যমঙ্গলে,—

"আমারে ছাড়িয়া বাবা কোথা যাও তুমি,
বাবা বলি আর ডাক নাহি দিব আমি।
আজি হ'তে শূন্য ঘর হইল আমার,
আর না দেখিব দুটি চরণ তোমার।
আজি দশ দিক্ শূন্য আঁধিয়ার ঘরে,
না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ করে।"

জীব যখন, জড় জগতের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া, পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায়, ঊর্দ্ধগামী হয়, তখন তাহার কণ্ঠে প্রায়শঃ কথা সরে না। কিন্তু তনুত্যাগের সেই মহা-মুহূর্ত্তেও, তাপস-চরিত্র জগন্নাথের বাক্য-স্ফূর্ত্তি ছিল। জগন্নাথ মিশ্র রাম নাম বড় ভালবাসিতেন। কথায় কথায় রাম নাম উচ্চারণ করিতেন। বাড়ীতে রঘুনাথ বিগ্রহ ছিল, সে বিগ্রহের পাদপদ্মে প্রতিদিন পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। তিনি যখন অনুভব করিতে পাই-

লেন যে, আর বাকী নাই, তখন গৌরাঙ্গের দিকে চাহিয়া, অতি গদ-গদ স্বরে বলিলেন,—"বাবা, আমার অনেক কথা বলিবার ছিল। বলিতে পারিলাম না। আমার অন্তরের কথা অন্তরেই রহিল। আমি তোমাকে কার হাতে সঁপিয়া যাইব? আমি জন্মাবধি চিরকাল রঘুনাথের সেবা করিয়াছি। তোমাকে রঘুনাথের পাদপদ্মে সঁপিয়া গেলাম। বাবা, তুমি পাছে কোন কালেও আমায় বিস্মৃত হও।"

"গদ-গদ স্বরে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
কহিতে নারিনু মোর যে ছিল অন্তর॥
রঘুনাথ চরণে সঁপিনু আমি তোমা।
তুমি যেন কোন কালে না পাসর আমা॥"

(চৈতন্য মঙ্গল)

জগন্নাথের মুখে আর কথা ফুটিল না। এই তাঁহার দুঃখময় হৃদয়ের শেষ কথা,—দুঃখ-দগ্ধ জীবনের শেষ দৃশ্য। দেখিতে দেখিতেই সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাজলে নামাইল; এবং তাঁহার গলায় তুলসীর মালা তুলিয়া দিয়া, চতুর্দ্দিকে সকলে হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

"ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরণ।
গঙ্গাজলে নামাইলা সকল ব্রাহ্মণ॥
গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চতুর্দ্দিকে বন্ধুগণ লয় হরিনাম॥
চতুর্দ্দিকে হয় হরিগুণ-সংকীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন॥"

পতিপ্রাণা শচী এতক্ষণ জীবন্মৃতের ন্যায় কাছে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যখন চৈতন্য জন্মিল,—যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার শৈশবের সখা,—সুখ-দুঃখের সাথী, জীবনের অবলম্ব, জীবিকার আশ্রয়, জীবিতেশ্বর পতি, তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া, চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার বুদ্ধির স্থৈর্য্য ক্ষণকালের তরে বিলুপ্ত হইল। গঙ্গার তটে দেশ-দেশান্তরের সহস্র লোক। শচীর তাহা জ্ঞান নাই। শচী তখন, তাঁহার স্বর্গ-গত পতির পা দুখানি বুকে তুলিয়া লইয়া, উন্মাদিনীর মত আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতি করুণকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—

"তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইও না হে,—আমায় ছাড়িয়া যাইও না। আমায় তুমি সঙ্গে লইয়া যাও। আমি এত কাল কায়মনঃপ্রাণে—শয়নে-জাগরণে, তোমার সেবা করিয়াছি। তুমি কি এখন আমায় অন্ধকারে ফেলাইয়া একা চলিয়া যাইবে? আমি আজি দশদিক্ শূন্য এবং সংসার আঁধার দেখিতেছি। আমি অনাথা, কিরূপে তোমার এই অনাথ শিশুকে আবরিয়া রাখিব? তোমার সোনার পুতুল নিমাই সংসারে কোন দিনও কষ্ট পায় নাই। আমি এখন, আমার এই অসহায় অবস্থায়, কিরূপে উহাকে সুখে পালন করিব? হা নাথ! তুমি কি সময় পাইয়া সকল কথাই পাসরিয়া গেলে?"

"বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ আরোহণে,
ধরণী বিদরে সেই শচীর ক্রন্দনে।"

শচীর সেই হৃদয়স্পর্শি বিলাপ ও পরিতাপে সেখানে সকলেরই চক্ষে দর-দর ধারা বহিল; এবং পিতৃবৎসল গৌরাঙ্গের পুষ্পিত

চক্ষু দুটি হইতে অজস্র অশ্রু-ধারা, প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার সোনার অঙ্গে শোক-মলিন সৌন্দর্য্যের এক অপূর্ব্ব আভা ফলাইল।

"মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ,
কান্দয়ে শচীর সুত অঝর নয়ন।
গজ-মতি-হার যেন গাঁথিল সুতায়,
নয়নে বহয়ে জল বিশাল হিয়ায়।"

বালক গৌরাঙ্গ আজি হইতে বৃদ্ধ। কেন না, তিনি পিতৃহীন। আর, বার্দ্ধক্যের শেষসীমায় উপস্থিত না হইয়াও, আজি হইতে শচী যার-পর-নাই বৃদ্ধা। কেন না তিনি অনাথা। আজি হইতে গৌরাঙ্গের সম্বল শচী, শচীর সম্বল গৌরাঙ্গ। শচী গৌরাঙ্গের দিকে চাহিয়া বুঝিলেন যে, এ বালককে প্রাণে বাঁচাইতে হইলে, তাঁহার পক্ষে, বুকে পাষাণ বাঁধিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক। গৌরাঙ্গও শচীর দিকে চাহিয়া ইহা বুঝিতে পাইলেন যে, তিনি আপনি সুস্থির হইয়া, শত প্রকার সন্তর্পণ না করিলে, তাঁহার শোকাতুরা মাতাকে রক্ষা করা কঠিন। মাতা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া, অবস্থা-সমুচিত আয়োজনে, মিশ্র পুরন্দরের আদ্যকৃত্য সম্পাদন করিলেন; এবং শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনেরা সকলেই, শ্রাদ্ধীয় কার্য্যের শাস্ত্রসম্মত ও ভক্তিপ্রণোদিত সাত্ত্বিকতায় গৌরাঙ্গের গভীর পিতৃভক্তি দর্শনে, হৃদয়ে একান্ত প্রীত হইলেন।

"আপনে সুধীর প্রভু সব সম্বরিয়া,
কাল-যথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া।
তবে বেদ-বিধি মতে যে ছিল উচিত,
করিল বাপের কর্ম্ম কটুম্ববেষ্টিত।
পিতৃ-ভকত প্রভু পিতৃযজ্ঞ কৈল,
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণ পূজিল।"

লোকে পিতৃতর্পণ করে গঙ্গাজলে, স্নেহ গদ-গদ গৌরাঙ্গ তাঁহার পিতৃতর্পণ করিলেন, কতকটা গঙ্গাজলে, আর কতকটা তাঁহার অবিরাম-বাহি অশ্রুজলে। শান্ত-শিষ্ট, শুদ্ধ-স্বভাব জগন্নাথ মিশ্রের স্বর্গোন্মুখ প্রাণ, গৌরাঙ্গের ঐ অমৃতময় অশ্রু-তর্পণে, যেরূপ সুখসন্তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, এ জগতে, জীবের ভাগ্যে, সকল স্থানে তাহা সংঘটিত হয় কি?

ছায়া-দর্শন।

একাদশ অধ্যায়।

উপক্রম।

কবির উক্তি, অনেক সময়েই, বৈদিক ঋষির সূক্তের মত। উহার প্রত্যেক অক্ষরই যেন মহাসত্যে অনুপ্রাণিত। আমরা এই স্থলে বিখ্যাত কবি হুয়িটিয়রের লেখা হইতে চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব। এই পংক্তি চতুষ্টয়ের প্রত্যেক অক্ষরেই প্রকৃত অনুপ্রাণনার পরিচয় আছে কিনা, পাঠক আপনিই

তাহা বিচার করিবেন। যন্ গ্রিন্‌লিফ্ হুয়িটিয়র (John Greenleaf Whittier) কহিতেছেন,—

"No truth from Heaven
descends upon our sphere,
Without the greeting of
the sceptic's sneer ;
Denied and mocked at,
till its blessings fall,
Common as dew
and sunshine over all".—

যাঁহারা বিশেষ একটুকু অনুরাগের সহিত বৈজ্ঞানিক অথবা অধ্যাত্ম সত্যের ইতিবৃত্ত লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক-বাক্যে বলিবেন যে, হুয়িটিয়র, ঠিক যেন তাঁহাদিগেরই প্রাণের কথার অনুবাদ করিয়া, কবিতা লিখিয়াছেন। হুয়িটিয়রের কথার এই ভাবার্থ,—সত্য যখন স্বর্গধাম হইতে সংসারে অবতীর্ণ হয়, তখন সংশয়-মূঢ় অবিশ্বাসীর শ্লেষ-পরিহাসেই উহা সর্ব্বপ্রথম অভ্যর্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু, প্রথমতঃ কিছুকাল, এই প্রকারে অস্বীকৃত ও উপহসিত হইলেও, পরিশেষে উহা, শিশির-বিন্দু অথবা সূর্য্য-রশ্মির ন্যায়, সর্ব্ব-জন-লভ্য শুভাশীর্ব্বাদরূপে, সকল স্থানে অনুভূত হয়।

জগতের সকল সত্যই যখন অন্তঃসারশূন্য অবিশ্বাসীর নিকট কিছুকাল উপেক্ষিত রহে, তখন ছায়াদর্শনের নিত্যস্মরণীয় সত্যও যে, এখানে সেখানে, দুই একটি বিজ্ঞম্মন্য যুবজনের নিকট, অল্প কিছু কাল, সাধারণ কথার মত উপেক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু, এ উপেক্ষা ক্ষণস্থায়ি আত্মবঞ্চনা মাত্র। কারণ, মনুষ্যের উপাস্য অন্যান্য সত্য এক প্রকার বস্তু ; ছায়াদর্শন-নিহিত গভীর সত্য সর্ব্বাংশেই আর একপ্রকার বস্তু, এবং আপনার স্বাভাবিক প্রভাবে অনতিক্রমনীয়।

অথেলো অথবা হামলেট্ নামক নাটক শেক্ষপীর * না বেকন লিখিয়াছেন, ইহা না জানিলেও মানুষের কিছু আসে যায় না। মারকোনির বৈতারিক বিদ্যুদ্‌বার্ত্তা (Marconi's Wireless Telegraphy) স্বপ্ন-কথা না সত্যমূলক, ইহা এ দেশের অসংখ্য লোক এখনও অবগত হইতে পারেন নাই ; —এবং যাঁহারা অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগেরও হৃদয়-মনের গতির সহিত উহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে, পরলোক-গত নর-নারীরা, মনুষ্যকে ছায়া-মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়া, মানব-জীবনের কঠোর পরীক্ষা ও ক্রমোন্নতি বিষয়ে, যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতেছেন, সে সত্যের সহিত সংসারের ছোট ও বড়, শিশু ও বৃদ্ধ, সকলেই সমান রূপে সম্পৃক্ত ; এবং যে আজি, বুদ্ধির বিপাকে পড়িয়া, উপেক্ষা করিতেছে, উহা তাহারও অবশ্যজ্ঞাতব্য। কেন না, তাঁহাদিগের সমস্ত

* শেক্ষপীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিষয়ে সাহিত্য-জগতে কএক বৎসর অবধি কিরূপ বিচার-মল্লতা ও বাগ্‌যুদ্ধের বিচিত্র অভিনয় হইতেছে, তাহা আমাদিগের পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে অবগত আছেন।

কথাই মনুষ্যের সুখ ও দুঃখ, উন্নতি ও অবনতি এবং ঐহিক ও পারত্রিক শান্তির সহিত বহুসূত্রে গাঁথা ; এবং সুতরাং সকলপ্রকার মনুষ্যেরই চিত্ত-পরিবর্ত্তক ও চিরজীবনের গতি-নিয়ামক কথা।

পাঠক, ছায়ামূর্ত্তির উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন কি ? তাঁহারা শত-সহস্র-সৈনিক-রক্ষিত সিংহাসনারূঢ় রাজ-রাজেশ্বরকে কহিতেছেন,—"বাছা, তোমার এ দিন থাকিবে না। তুমি সাবধান হও, এবং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন-কার্য্যে প্রীতি ও ধর্ম্মের আশ্রয় লও। নতুবা, তোমাকে কঠোর পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে।" তাঁহারা মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত, রাজ-দ্বারের দ্বার-রক্ষক-কর্ত্তৃক পদাঘাতে উপেক্ষিত, কুষ্ঠগ্রস্ত ভিখারীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন,—"বাছা তোমারও এ দিন থাকিবে না, তুমিও সাবধান হও। তুমি যদি, এই দুঃসহ দুঃখকষ্টের মধ্যেও, হৃদয়ে প্রীতি ও জীবনে বিশুদ্ধনীতি রক্ষা করিয়া, কোন প্রকারে, পৃথিবীর এই কএকটি দিন অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে, তুমি তোমার এই কঠোর পরীক্ষার প্রতিদানে ও পরিণামে, ঐ রাজ-রাজেশ্বরের ময়ূর-সিংহাসন হইতেও মহত্তর আসন পাইবে ; এবং দুঃখের পর দেব-দুর্ল্লভ সুখ-স্বাদে অধিকারী হইয়া, দয়াময় অনন্তদেবকে ধন্যবাদ দিবে।" তাঁহারা বণিক্‌কে সম্ভাষণ করিয়া কহেন,—"তুমি বাণিজ্যে সাধুবৃত্তি অবলম্বন কর। নতুবা, লোভ ও লাভের পরিণাম বহু-কাল-স্থায়ি জ্বালাময় ক্ষোভ।" তাঁহারা সাহিত্যিককে সম্ভাষণ করিয়া বলেন,—"তুমিও সমাজ-হিত-জনক, সমুন্নতির পথ-প্রদর্শক, সুপবিত্র সাহিত্য সৃষ্টি কর। নতুবা, তোমার এই ক্ষণিক যশ ও ক্ষণিক উল্লাশের শেষ ফল দীর্ঘ-কাল-স্থায়ি অন্তর্দ্দাহ।" তাঁহারা ধর্ম্মাচার্য্যকে উপদেশ করেন যে,—"তোমার ঐ তিলক ও ত্রিপুণ্ড্রক, এবং ত্রিসন্ধ্যাস্নান ও ত্রিকোটি-তীর্থ-দর্শনে,—বিনা চারিত্র-শোধনে, কখনও কোন ফল হইবে না,—ফল হইবে সদ্‌বৃত্ত-সাধু-জীবনে,—সকলের উপকার-সম্পাদনে, এবং অভিমান-শূন্য ভক্তির অনুষ্ঠানে।" তাঁহারা জ্ঞানাচার্য্যকে উপদেশ করেন যে,—"তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সুসজ্জিত গ্রন্থ-রাশি তোমাকে তরাইবে না ; তরাইবে তোমার নিত্যজীবনের নির্ম্মল আচরণে এবং আত্ম-পর-নির্ব্বিশেষে সকলেরই শুভানুধ্যানে।" এমন সুগভীর, সুমঙ্গল্য ও সর্ব্ব-সুখাবহ সনাতন তত্ত্ব যখন পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তখন কি উহা আর মনুষ্যের নিকট বেসী দিন কল্পনার উচ্ছ্বাস অথবা কৃত্রিম উপন্যাসের মত অনাদৃত থাকিতে পারে ?

বস্তুতঃ, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা, যে ভাবে, এবং যেরূপ উৎসাহ ও অক্লান্ত আগ্রহের সহিত, এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; তাহাতে ভরসা করা যায় যে, পারলৌকিক-জীবনের সর্ব্বপ্রকার সারোদ্ধার বৃত্তান্ত, অতি অল্প কালের মধ্যেই, সকলশ্রেণিস্থ লোকের সুপ-

রিজ্ঞাত বিষয় হইবে; এবং মনুষ্য, তাহার পার্থিব-জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপেই, পারলৌকিক জীবনের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া, যার-পর-নাই নম্র, ন্যায়বান্ ভক্তি-পরায়ণ, পবিত্র, প্রীতিপূর্ণ ও মধুর-চরিত্র হইতে যত্নপর রহিবে।

আমরা আজি পাঠককে দুইটি আত্মিক কাহিনী উপহার দিতে যাইতেছি। এই উভয় কাহিনীর আশ্চর্য্য ঘটনাই মনুষ্যহৃদয়ে কিরূপ মঙ্গলজনক পরিবর্ত্ত ঘটাইয়াছিল, তাহা পাঠক শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পাইবেন। এইরূপ কএকটি প্রামাণিক কাহিনী পাঠ করিয়া ফরাশি দেশের বিশ্রুত-নামা বৈজ্ঞানিক, ডক্টর চার্লস্ রিচেট (Dr. Charles Richet) আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"It is the first time the future life has been scientifically studied; and to deny the facts herein related, is to condemn science to inertia, and to substitute routine for progress."

অর্থাৎ, মনুষ্যের পর-কাল-সংক্রান্ত জীবন-বৃত্তান্ত এই প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচিত হইতেছে। এ সকল বৃত্তান্তকে অস্বীকার করা, আর বিজ্ঞানকে অচল করিয়া রাখা, অথবা উন্নতির পরিবর্ত্তে বাঁধা গতের ব্যবস্থা করা, এক কথা।

যদি ইয়ুরোপ ও আমেরিকার জড়বাদি-বৈজ্ঞানিকদিগেরই এ তত্ত্বের আলোক-লাভে এত আনন্দ, তাহা হইলে, যাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষেরা, অধ্যাত্ম-জীবনের বিশেষ জ্ঞান-প্রচারের দ্বারা, পৃথিবীতে বহুকাল গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,—যাঁহাদিগের মধ্যে, অদ্যাপি অনেকে, গুরুপরম্পরাগত নিয়মের অনুবর্ত্তনে, প্রতিদিন পরলোক-গত পিতা ও পিতামহ প্রভৃতির প্রীণন, তর্পণ ও পূজা না করিয়া জল-গ্রহণ করেন না; এবং গৃহ-সঞ্চার, ও পুত্র-কন্যার উৎসব-আচার প্রভৃতি কোন কার্য্যেই স্বর্গবাসী স্বজনদিগকে স্মরণ ও অর্চ্চন না করিয়া, অন্তরে শান্তি পান না, সেই ভারতবাসী হিন্দু-সন্তানের পক্ষে, পুরুষাণুক্রমিক পুরাতত্ত্ব জ্ঞানের অধুনাতন বৈজ্ঞানিক সমর্থন,—পৈতৃক সত্যসম্পদের সর্ব্বদেশ-ব্যাপি পুনরুজ্জীবন, কিরূপ প্রাণ-প্রীতিকর ও জাতীয়-গৌরবের পরিচায়ক, তাহা স্বজাতি-বৎসল সুবোধ ব্যক্তিকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

আত্মিক-কাহিনী।

(১)

তেল্লিচারী একটি সামুদ্রিক বন্দর। উহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মালাবার-উপকূলে অবস্থিত; এবং যাঁহারা পরিভ্রমণ-প্রিয়, তাঁহাদিগের অনেকের নিকট সুপরিচিত। তেল্লিচারীতে এক দল ইংরেজ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। কর্ণেল নাথাম উইলসন (Colonel Natham Wilson) উহার সেনানায়ক। কর্ণেল উইলসন্ শুধু সৈন্যচালনায় ও অস্ত্র-প্রয়োগেই নিপুণ বীরপুরুষ নহেন;—তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, দৃঢ়সঙ্কল্প ও অকপট-চরিত্র সামাজিক। কিন্তু, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস

করিতেন না,—পরলোক মানিতেন না,—এবং নিত্যপ্রত্যক্ষ জড়বস্তু ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে সম্মত হইতেন না।

সৈনিক-পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে সুপণ্ডিত। কর্ণেল উইলসন্, পণ্ডিত-পদবীরূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও, প্রায় সর্ব্বত্রই, প্রাধান্যের আসন পাইতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনি, তাঁহার প্রৌঢ়-জীবনে, নাস্তিক্যবাদের গ্রন্থপত্র লইয়াই অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন, এবং অধীন ও আশ্রিতবর্গকেও ঐ অবিশ্বাসের অন্ধকারে আকর্ষণ করিতে ভালবাসিতেন।

কিন্তু, কর্ণেল উইলসনের আশ্বাস ও বিশ্বাস যাহাই হউক, তিনি তাঁহার চরিত্রের উচ্চতা ও উদার নির্ম্মলতায়, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন; এবং সত্যপ্রিয়তা ও পরোপকার-শীলতা প্রভৃতি আরও নানা গুণে, বহুলোকের হৃদয়ের উপর প্রকৃত আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তেল্লিচারির সন্নিহিত সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন, এবং মন্‌সিয়র ডুবোয়া (Monsieur Dubois) নামক এক জন প্রগাঢ় ভক্তিমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক, এইরূপ ভয়ঙ্কর মত-ভেদ সত্ত্বেও, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন।

ডুবোয়া ধার্ম্মিক, সুপণ্ডিত ও সহৃদয়মশালী ধর্ম্মপ্রচারক। এই আত্ম-পর-ভেদ-শূন্য, আনন্দ-মগ্ন ফরাশি ধর্ম্মযাজকের বহুবিষয়িণী অভিজ্ঞতা ও চিত্তহারিণী মধুর কথায় সকলেই সন্তুষ্ট থাকিত; এবং উইলসনের অবকাশ-কাল সাধারণতঃ তাঁহার সহিত সদালাপে অতিবাহিত হইত। কর্ণেল উইলসন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতি একটু বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হইলেন; এবং কালে উভয়ে, প্রগাঢ়-প্রীতিবদ্ধ সুহৃজ্জনের ন্যায়, পরস্পরের সুখ-দুঃখ-সংক্রান্ত কথা লইয়াও আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, উইলসন তাঁহার নাস্তিকতা কাহারও নিকট গোপন করিতেন না। ডুবোয়া, অনেক সময়ই, উইলসনের সহিত একত্র অবস্থান করিতেন; এবং উইলসনের নাস্তিকতা দূর করিবার নিমিত্ত, যথাশক্তি যত্ন পাইতেন। উভয়ের মধ্যে, প্রতিনিয়তই, পরকাল, ঈশ্বর ও ধর্ম্মসম্বন্ধে, নির্ম্মুক্তচিত্তে, বিচার, বিতর্ক ও আলোচনা হইত; কিন্তু দৃঢ়চিত্ত উইলসনের নাস্তিকতা, ঐ প্রকার তর্কবিতর্কে, আরও যেন দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়া, ডুবোয়ার সরল ও ভাব-বিহ্বল প্রাণে শঙ্কা জন্মাইত। বলা বাহুল্য, ইহাতে পরলোক-প্রত্যাসী ধার্ম্মিক ডুবোয়া চিত্তে বড় ক্লিষ্ট রহিতেন।

ইহার কিছু দিন পরে, ডুবোয়া সহসা কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়া পরিলেন। ডুবোয়াকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন। তেল্লিচারী-প্রবাসী ইউরোপীয় সম্প্রদায় ডুবোয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত রহিলেন। কিন্তু, ডুবোয়ার সর্ব্বপ্রধান সুহৃৎ কর্ণেল উইলসন, চিত্তে যার-পর-নাই আকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়াও, তাঁহাকে তথাবিধ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে, ভেলোর (Vellore) অঞ্চলে, সৈন্যদলের

মধ্যে, বিদ্রোহের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়াছিল। কর্ণেল উইলসন, তাঁহার সৈন্যদল সহ, সেই দিকে আহূত হইয়াছেন। তিনি সবেগে সৈন্যচালনা করিয়া, ভেলোরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন; এবং সেখানে পঁহুচিয়া, নগর-সম্মুখবর্ত্তি প্রান্তর মধ্যে, শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

গ্রীষ্মকাল। জ্যোৎস্নী রাত্রি। মান্দ্রাজের গ্রীষ্ম। তাহাতে আজি প্রকৃতি নিস্তব্ধ। গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। কর্ণেল উইলসন, স্থান ও সময়ের উপযোগি সূক্ষ্মাম্বর পরিধান করিয়াছেন; এবং ফিন্‌ফিনে সার্ট গায়ে দিয়া ও ঢোলা ইজার পরিয়া, আপনার পট-মণ্ডপে, অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়, একটা কাউচের উপর বিশ্রাম করিতেছেন। রাত্রি প্রহরেক পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উইলসনের নিদ্রা হয় নাই। নিদ্রার পূর্ব্বসূচনায় নয়নদ্বয়ও অলসিত হইয়া আইসে নাই। নিদ্রা হওয়া দূরে থাকুক, উইলসন তখন পর্য্যন্ত নিদ্রার কল্পনাকেও মনে ঠাঁই দিতে পারেন নাই। তিনি,পট-গৃহের দ্বারের দিকে চাহিয়া, কল্যকার কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন; এবং কিরূপে অবাধ্য সৈনিকদিগকে বশে আনিবেন, তাহাই ভাবিয়া একটুকু উদ্বেজিত আছেন। হঠাৎ ধীরে ধীরে, তাঁহার সন্নিহিত দ্বারের পর্দ্দা উদ্ঘাটিত হইল; এবং ফরাশি ধর্ম্মযাজক ডুবোয়া, সেই দ্বারের এদিকে আসিয়া, দণ্ডায়মান হইলেন।

উইলসন একান্ত বিস্মিত ভাবে চমকিয়া উঠিলেন,—এবং ডুবোয়া কি উদ্দেশ্যে,—অকস্মাৎ বিনা সংবাদে, ওখানে আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে না পাইয়া, একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সেই মূর্ত্তি, তেমনই ভাবে, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং উইলসনের দিকে স্থির চক্ষে তাকাইয়া, কি যেন ভাবিতেছে। মুখমণ্ডল পাণ্ডুর ও ঈষৎ বিবর্ণ, অথচ নয়ন ঔৎসুক্য ও আগ্রহে পরিপূর্ণ। কি যেন কহিবার নিমিত্ত, অধর একটু একটু স্ফুরিত হইতেছে, অথচ মুখে কোন কথা ফুটিতেছে না!

আত্ম-বিস্মৃত উইলসন, "কি ভাই! ডুবোয়া, ওখানে কেন",—এই বলিয়া, নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন। কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। পর্দ্দাটি অল্পে অল্পে পড়িয়া গেল; মূর্ত্তি পর্দ্দার অন্তরালে অল্পে অল্পে অদৃশ্য হইল। সৈন্যের ছাউনি। সে ছাউনি রণক্ষেত্রে,—বিদ্রোহ-ভয়ান্বিত দুর্গম স্থানে। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী। মক্ষিকাটিরও প্রবেশের পথ নাই। এই অবস্থায়, ডুবোয়া, কি রূপে—বিনা অনুমতিতে, ওখানে আসিলেন? আর অত রাত্রিতে, অমন লুক্কায়িত ভাবে, আসিলেনই বা কেন? এইরূপ নানা-চিন্তা একসঙ্গে উইলসনের মনে জাগিল। তিনি কাউচ্ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং শ্লিপার পায়ে দিয়া, পট-গৃহের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে যাইয়া দেখিলেন,—সেই মূর্ত্তি, ঠিক্ সেই ভাবেই, তাঁহার সম্মুখে নিশ্চল দণ্ডায়মান। আকাশে ধবল জ্যোৎস্না। চারি দিক্ নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধ যামিনীর দ্বিতীয় প্রহরে, ভেলোরের সেই ভয়াবহ প্রান্তরে, দেহবদ্ধ ও দেহান্তর-প্রাপ্ত

দুই বন্ধু পরস্পরের সম্মুখীন। অন্য কোন লোক ভয়ে সরিয়া পড়িত। কিন্তু বীর-প্রকৃতি উইলসন ভীতিশূন্য লৌহস্তম্ভ। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ডুবোয়াই, তাঁহার কাছে, অদূরে দাড়াইয়া আছেন; অথচ ডুবোয়া একটি কথাও না কহিয়া, কি যেন চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু যেই উইলসন ধীর-পদ-বিক্ষেপে ঐ মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন, মূর্ত্তিও অমনই, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে, পিছনে হটিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। উইলসন, কিছু দূর, এই ভাবে, ছায়ামূর্ত্তির অনুসরণ করিলেন। যখন উহা অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, নির্ভয় উইলসনও তখন, মুহূর্ত্তের তরে, অন্তরে শিহরিয়া উঠিলেন।

কর্ণেল উইলসন দীর্ঘশ্বাস ফেলাইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইল যে, তাঁহার বন্ধুর তনুত্যাগ হইয়াছে। কিন্তু সে ধারণার অর্থ কি? তবে কি জীবাত্মা জড়-দেহের অতিরিক্ত বস্তু, এবং পারলৌকিক জীবন প্রকৃত সত্য? উইলসন, সময়টা ঠিক করিয়া লিখিয়া রাখিবার জন্য, একটি সহযোগী সৈনিক-কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন,—এবং কি দেখিলাম এই এক কথাই ভাবিয়া ভাবিয়া, রাত্রিটা কোন প্রকারে কাটাইলেন।

পরদিন তেল্লিচারী হইতে পত্র লইয়া লোক আসিল। উইলসন পত্র পাঠে অবগত হইলেন যে, ধর্ম্মজীবন ডুবোয়ার দেহান্তর-প্রাপ্তি হইয়াছে, এবং পত্রে যে সময়-নির্দ্দেশ ছিল, ঠিক সেই সময়েই, শিবিরে ছায়ামূর্ত্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে। শিবিরের সকলেই এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিল, শুনিয়া বিস্মিত হইল; এবং ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা, কর্ণেল উইলসনের স্মৃতি-পটে, চিরজীবনের তরে, উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া রহিল।

কর্ণেল উইলসন, যথাসময়ে, ভারতীয় সৈনিক বিভাগের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, বিলাতে চলিয়া গেলেন। বিলাতে ষ্ট্রাথ্‌ডেন (Strathden) নগরে, লণ্ডনের অতিবড়-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-পণ্ডিত, ডক্‌টর আশ্‌বার্‌নারের (Dr. Ashburner) সহিত কর্ণেল উইলসনের আলাপ ও পরিচয় হয়। উইলসন ডক্‌টর আশ্‌বার্‌ণারকে তদীয় পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ সম্মান করিতেন, আশ্‌বার্‌ণারও কর্ণেল উইলসনকে, সত্যনিষ্ঠা, চরিত্রগত দৃঢ়তা ও প্রখরবুদ্ধিমত্তার জন্য শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কর্ণেল উইলসন, তদীয় জীবনের বিবিধ গুরুতর কথাপ্রসঙ্গে, এই কাহিনীর আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত ডক্‌টর আশ্‌বার্‌ণারের নিকট বর্ণনা করেন; এবং আশ্‌বার্‌ণার ইহাকে দেহমুক্ত আত্মার অস্তিত্ব-সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ-জ্ঞানে গ্রন্থবদ্ধ করিয়া যান। এইরূপ ঘটনা অনেকেরই চক্ষে পড়ে। কিন্তু দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে অল্প লোক উইল্‌সনের মত পরীক্ষা-পটু ও প্রামাণিক; এবং তাহা অপেক্ষাও অল্পতর লোক আশ্‌বার্‌ণারের মত তত্ত্বসমালোচক।

(২)

ইংলণ্ডের অন্তর্গত সমারসেট (Somerset) শায়রে ডাল্‌ভার্টন (Dulverton) নগর। মেজর জর্জ্জ সিডেনহাম (Major George Sydenham) ডাল্‌ভার্টন নগরে বাস করেন। কাপ্তান উইলিয়ম ডাইক (Captain William Dyke) সিডেনহামের প্রিয়তম বন্ধু। তিনিও ঐ সমারসেটেরই সম্ভ্রান্ত অধিবাসী।

সিডেনহাম ও ডাইক, উভয়েই শাদা প্রাণের লোক, অথচ কতকটা উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও উদ্ধত। তাঁহারা, যখন যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই তখন করিতেন; এবং একবার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, অতি অকর্ত্তব্য হইলেও, তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। কাহারও অকাট্যযুক্তি, অতি প্রামাণিক উক্তি, এবং শত অনুরোধ ও উপরোধেও তাঁহাদিগের কার্য্যের গতি পরিবর্ত্তিত হইত না। তাঁহারা রীতিমত অনীশ্বরবাদী নাস্তিক নহেন। কিন্তু, তাঁহাদিগের আস্তিক্য অন্ধকারেরই আর এক পটল। কেন না, তাঁহারা উভয়েই পরলোকে অবিশ্বাসী।

ধর্ম্ম কি, আর অধর্ম্মই বা কি, এই তত্ত্ব লইয়া তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যেও, অনেক সময়, বাদানুবাদ চলিত। ঘটনাক্রমে, একদিন তাঁহারা, আত্মার অবিনশ্বরত্ব-সম্পর্কে, পরস্পর নানাপ্রকার তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, এ বিষয়ে কেহই কোনরূপ স্থির-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে, শারীরিক শক্তির নামান্তর-স্বরূপ আত্মারও বিলয় ঘটে, দুজনেই মনে মনে, এইপ্রকার একটা অস্ফুট ভাব পুষিয়া রাখিলেন। অথচ, এই সময়ে, একে অন্যের নিকট অতি কঠোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রহিলেন যে,—তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার আগে বিয়োগ হইবে, তিনি,—পারিলে,—বিয়োগের পর, তৃতীয় দিবসে, সিডেনহামের ডাল্‌ভার্টনস্থিত নিদাঘ-নিবাসে, অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পারলৌকিক অস্তিত্ব এবং পাপ-পুণ্যের পরিণাম অথবা দণ্ড-পুরস্কার সম্বন্ধে, প্রকৃততত্ত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া যাইবেন।

আগে সিডেনহামের কাল পূর্ণ হইল। সিডেন্‌হাম, কএক দিন রোগযন্ত্রনা ভোগ করিয়া, পার্থিব তনু হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। কাপ্তান ডাইক, প্রিয়তম সুহৃদ্‌কে সমাধির অন্ধকারে অশ্রুজলে বিদায় দিয়া আসিয়া, পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে, মৃত্যুর পরবর্ত্তি তৃতীয় দিবসের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

অদ্য সেই তৃতীয় দিবস। সিডেনহামের গৃহে একটি শিশু পীড়িত। কাপ্তান ডাইকের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (Cousin) একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। তিনি ঐ শিশুর চিকিৎসা করিতেছেন। অদ্য, সেই আত্মীয় ডাক্তারের সঙ্গে, কাপ্তান ডাইকও মেজর সিডেনহামের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাপ্তান ডাইক কেন যে ঐ দিন অপরাহ্ণে সিডেনহামের গৃহে রাত্রি বাস করিতে আসিলেন, ডাক্তার ডাইক তাহার

প্রকৃত রহস্য অবগত নহেন। সিডেনহামের গৃহে, উভয়ের জন্য, একই শয়নকক্ষে, পৃথক্ দুইটি শয্যা নির্দ্দিষ্ট হইল।

রাত্রি যখন গভীর হইয়া আসিল, তখন কাপ্তান ডাইক, দুটি মোটা বাতি জ্বালাইয়া আনিবার জন্য, ভৃত্যের প্রতি আদেশ করিলেন। ডাক্তার, এই বিচিত্র আদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অত বড় বাতি দিয়া কি হইবে? কাপ্তান ডাইক, মেজর সিডেনহামের সহিত তাঁহার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, ডাক্তারকে তাহা সবিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন। ইহাও কহিলেন, অদ্য সেই তৃতীয় দিবস; এতএব তিনি, আজিকার রাত্রির কিয়দংশ, সিডেনহামের নিদাঘ-নিবাসে, তাঁহার প্রতিশ্রুত-সাক্ষাৎকারের উদ্দেশে, অতিবাহিত করিবেন।

ডাক্তার প্রথমতঃ একটু হাসিলেন; তার পর, এই অবৈধ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার নিমিত্ত কাপ্তান ডাইককে দৃঢ়তার সহিত অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার বলিলেন,—"পর-লোকগত আত্মা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, কিংবা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা স্বভাববিরুদ্ধ ও অসঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ, দর্শনপ্রার্থীকে একা পাইয়া, এই সুযোগে, কোন মন্দ আত্মা (Evil spirit) মন্দ ব্যবহার করিলে, তখন উপায় কি? তৃতীয়তঃ, এইভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের কার্য্যপ্রণালীর পরীক্ষা করিতে যাওয়াও ক্ষুদ্রপ্রাণ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত ধৃষ্টতা; সুতরাং যার-পর-নাই পাতকের কর্ম্ম।"

কাপ্তান উত্তর করিলেন,—"ভাই, তুমি যাহা বলিলে, সম্ভবতঃ, এ সমস্তই সত্য। কিন্তু আমি আমার বন্ধুর সহিত, বিশ্বস্তপ্রাণে, যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, ফল যাহাই ঘটুক, আমি কিছুতেই তাহার অন্যথা করিতে পারিব না। আমি আমার বাক্য-রক্ষা বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মৃত্যুর পর, তৃতীয় দিবসে, তাঁহার নিদাঘ-নিবাসে যাইয়া অপেক্ষা করিব; অতএব সেখানে যাইবই যাইব। কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবার নহে। তুমি, যদি ভাই, দয়া করিয়া, আমার সঙ্গে যাও, এবং সেখানে এই আশ্চর্য্য সাক্ষাৎকারের প্রত্যাশায় আমার সঙ্গে অবস্থান কর, ভাল কথা। তোমার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ রহিব। আর না যাও, আমি একাকীই যাইব। যাইব এ কথা দৃঢ়-নিশ্চিত।"

কাপ্তান ডাইক, তাঁহার ওয়াচটি খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। ঘড়িতে যখন সাড়ে এগারটা হইল, তখন তিনি, ঐ বাতি দুটা দুই হাতে লইয়া, নিদাঘ-নিবাসের প্রবেশ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত, একাকী ঐ প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে, একবার এদিক্, একবার ওদিক্, এইরূপ করিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইলেন; এবং অবশেষে ক্লান্ত, শ্রান্ত ও হতাশ হইয়া, শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা হইল না। অলৌকিক ত কিছুই চক্ষে দেখি-

লেন না; আশ্চর্য্য কোন শব্দও কানে শুনিতে পাইলেন না।

পরলোকে সন্দিহান কাপ্তান ডাইকের চিত্ত অধিকতর সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। বন্ধু তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, ইহার অর্থ কি? তিনি অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাই অর্থ করিলেন,—হয় ত পরলোকের কথা একবারে মিথ্যা, দেহের সঙ্গেই আত্মার বিলয় ও মানুষের মহাপ্রলয়;—আর না হয় ত, পারলৌকিক-বিধান-অনুসারে, তাঁহার বন্ধু এই শ্রেণীর প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ। ইহার পর, কাপ্তান ডাইক, এ প্রসঙ্গে, মনে মনেও, আর কোন রূপ বিচার বিতর্ক কিংবা আলোচনা করিলেন না। তাঁহার কাছে সেই প্রতিশ্রুত-রাত্রির নৈরাশ্যেই পরলৌকিক-তত্ত্ব-সংক্রান্ত সকল কথার শেষ-নিষ্পত্তি হইল।

এই ঘটনার পর, ছয় সপ্তাহ অতীত হইয়া গিয়াছে। কাপ্তান ডাইক তাঁহার একটি পুত্রকে প্রসিদ্ধ ইটন-কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত ইটনে আসিয়াছেন। ইটন (Eton) নগর বাকিংহাম সায়রে টেমস্ নদীর বাম তটে অবস্থিত। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেই ডাক্তার আত্মীয়টিও ইটনে আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা সেণ্ট ক্রিষ্টফার নামক (St. Christophir's inn) অতিথিশালার দুই কামরায় দুজনে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা, যে প্রয়োজনে ইটনে আসিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলেই, উভয়ে ইটন হইতে চলিয়া যাইবেন। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। কাপ্তান ডাইক এখনও অতিথিশালার এক কক্ষ মধ্যে নিদ্রা যাইতেছেন। অতিথিশালার ঘর পর্দ্দা প্রভৃতি দ্বারা চারিদিকে তেমন আটা সাটা রূপে আবৃত নহে। প্রভাতের আলো, জানালা ও কপাটের ফাঁক দিয়া, ঘরের ভিতরে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে। একটু-বেলা হইয়াছে, তথাপি কাপ্তান ডাইকের ঘুম ভাঙ্গিতেছে না।

সহসা কে আসিয়া ডাইকের মশারির আবরণ উন্মোচন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। অমনিই ডাইকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—স্বর্গগত বন্ধু মেজর সিডেনহাম, সেই পার্থিব মূর্ত্তিতে, সেই পরিচিত-পরিচ্ছদে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান।

কাপ্তান ডাইক চমকিয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। ভাবিলেন,—এ "স্বপ্ন নয় ত?—অথবা আধো ঘুমের ঘোরে, একটা অলীক দৃশ্য দেখিতেছি না ত"। ইহা ভাবিয়া দুই হাতে চক্ষু রগড়াইতে লাগিলেন।

ছায়ামূর্ত্তি, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পাইয়া, তদীয় প্রীতিস্নেহের পরিচিত কণ্ঠে, স্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তম, এ স্বপ্ন নহে,—অলীক কল্পনাও নহে, চাহিয়া দেখ, আমি প্রকৃতই তোমার সেই বন্ধু মেজর সিডেনহাম। আমি সেই প্রতিশ্রুত দিনে তোমাকে দেখা দিতে পারি নাই। আজিও, অতি অল্প সময়ের জন্য, তোমাকে একটি

মাত্র কথা কহিয়া যাইবার নিমিত্ত, আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি।"

কাপ্তান ডাইক অধিকতর বিস্মিত হইলেন, এবং এক-তান-দৃষ্টিতে ছায়ামূর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই অঙ্গভঙ্গি এবং সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু মুখচ্ছবি একটু ম্লান ও ক্লিষ্ট। ডাইক কহিলেন,—"তুমি সেই প্রতিশ্রুত তৃতীয় দিবসে নিদাঘ-নিবাসে দেখা দিলে না ভাই কেন?"

ছায়ামূর্ত্তি কহিল,—"পারি নাই। তাই আসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞারক্ষার প্রয়োজনে, নিদাঘ-নিবাসে যাইবা অপেক্ষা করিয়াছিলে, তাহা আমি জানি। আমি তোমার সংবাদ পাইয়াছি; কিন্তু দর্শন-দানে সমর্থ হই নাই। কেন হই নাই, তাহা আজি তোমাকে বলিব না; বলিলেও বুঝাইতে পারিব না। সময়ে যখন আমরা একত্র হইব, তখন আপনিই তুমি তাহা বুঝিতে পাইবে। সে কথা এখন থাকুক; এখন আমি তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, তুমি তাহাই বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়া রাখ।"

ইহার পরে, ছায়ামূর্ত্তি অধিকতর গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল,—"পরলোক সত্য, এই আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ বিষয়ে আর ঘুণাক্ষরেও সংশয় করিও না। ঈশ্বরও সত্য। সে ঈশ্বরের বিধিব্যবস্থা অমোঘ ও অলঙ্ঘ্য! তাঁহার ন্যায়পরতার এক তিলও ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কর্ম্মফল অপরিহার্য্য। তাই বলি ভাই,—সাবধান, সাবধান। যদি এখনও জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া, সমস্ত বিষয়ে, সাবধান না হও, তাহা হইলে, বস্তুতঃ পরিণামে কষ্টের সীমা থাকিবে না।"

ইহা কহিয়াই ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। কাপ্তান ডাইক, ভয়ে ও বিস্ময়ে,—কম্পিত-হৃদয়ে,—শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার প্রাণের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ একটা ভয়াবহ বিপ্লব উপস্থিত হইল। তিনি, বহুক্ষণ, ঐরূপ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিয়া, অবশেষে ক্লিষ্টদেহে ও অবসন্নপ্রাণে শয়ন-কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং প্রিয় সহচর ডাক্তারের সহিত তাঁহার কোঠায় যাইয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

ডাক্তার, কাপ্তান ডাইকের আকৃতি দেখিয়া, ভীত ও বিস্মিত। দেখিলেন, মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু দুটি বসিয়া পড়িয়াছে,—দৃষ্টি উদাস। তিনি ব্যগ্রভাবে এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাপ্তান ডাইকও প্রভাতের ঐ বিস্ময়কর ঘটনা সবিস্তর বর্ণনা করিয়া কহিলেন। ডাইক যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষ্য দিলেন, তাহাতে ডাক্তারের চিত্তেও অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এই হইতে কাপ্তান ডাইক আর এক মানুষ হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার সে ঔদ্ধত্য নাই, সে চাঞ্চল্য নাই; তিনি এখন যার-পর-নাই নম্র ও বিনীত। তাঁহার জীবনের সে উচ্ছৃঙ্খল গতিও আর নাই,—তিনি সর্ব্বতোভাবেই স্থির, ধীর, শান্ত ও সুজন। তিনি এখন আর আত্ম-

সুখের সন্ধানে, পরের সুখ-শান্তি চরণে দলন করিতে পারেন না। তাঁহার নয়নে এখন পরের দুঃখে অশ্রু ঝরে, প্রাণে পরের পোড়ায় বেদনা লাগে।

এই ঘটনার পরে কাপ্তান ডাইক কেবল দুইটি বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তে ও চরিত্রে দুই বৎসরেই এমন অভাবনীয় ও আনন্দজনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, দূরস্থ ব্যক্তিরাও তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল।

অফুরন্ত কথা।

এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মের কথা, রাজনীতি, সমাজ-নীতি, এবং আশা ও উৎসাহের কথা,—বস্তুতঃ মনুষ্য-কল্পনার সকল কথাই কালে ফুরায়। ফুরায় না কেবল ভালবাসার কথা। উহা অক্ষয় ফোয়ারার মত, —অনন্ত—অফুরন্ত। উহার আরম্ভ আছে, শেষ নাই। উহার মৃদু-কল-নাদি মধুর-প্রবাহে কোন কালেও বিরাম নাই।

ভিরোনার কপোলত-প্রাসাদে, গবাক্ষ-সান্নিধ্যে জুলিয়া; আর গবাক্ষের নিম্নে, কুসুম-কাননে রোমিয়ো। রোমিয়ো ও জুলিয়ায়, নবোদ্গত ভালবাসায়, এই প্রথম প্রাণের আলাপ। রাত্রির প্রথম ভাগ হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত, দুই জনে মৃদু মৃদু কতই কি কথা হইতেছে; কিন্তু কথা ফুরাইতেছে না। জুলিয়া, এক এক বার, গুরু-জন-গঞ্জনা-ভয়ে, গবাক্ষ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে; আবার অমনিই, দ্রুত-পদে ফিরিয়া আসিয়া, কথার যেটুকু বাকী রহিয়াছে, তাহাই যেন কহিবার জন্য, রোমিয়োকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। কিন্তু, সেই অফুরন্ত কথার কোন্ টুকু বাকী রহিয়াছে, তাহাও মনে পরিতেছে না, কথাও ফুরাইতে যাইতেছে না।

"জুলিয়া। কেন ডাকিলেম?
মনেত পড়ে না কিছু!
রোমিয়ো। প্রিয়ে, যত ক্ষণে
পড়ে মনে, আমি হেথা থাকি তত ক্ষণ।
জুলিয়া। তা হ'লে ত, কিছুতেই
মনে তা হবে না,
তোমাকে পেলেই কাছে সব যাই ভু'লে।
রোমিয়ো। ভালই ত, ভোল যত, তত
আরো কাছে
থাকিতে পাইব আমি।
জুলিয়া। ও মা! এ কি ভোর না কি!"

রোমিয়ো আর জুলিয়া উদাহরণ অথবা উপলক্ষ মাত্র। মানব-হৃদয়ের মর্ম্মদর্শী, দার্শনিক-মহাকবি, বড়ই প্রীতিস্নেহের সহিত, এই দুইয়ের চিত্ত ও চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন; আমরাও তাই, প্রীতিস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহাদিগেরই দুটি কথা এখানে

তুলিয়া দিলাম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, এ জগতে, আজও অনন্ত কোটি রোমিয়ো ও জুলিয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া,—আদর ও সোহাগে আবদার করিয়া, এবং আপনার প্রাণের কথা কহিবার জন্য আকুল হইয়া, প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে, দিন-পাত করিতেছে; এবং যেখানে জুলিয়ার ফুটন্ত প্রাণ রোমিয়ো-প্রাণের প্রেম-সূর্য্যকে প্রকৃতির রমণীয়তা গুণে টানিয়া লইতেছে, সেখানেই ঐ অফুরন্ত কথার আবেগময় নাটকের কোন না কোনরূপ অভিনয় হইতেছে।

কিন্তু কথা ফুরায় না কেন? ফুরায় না ভালবাসার স্বাভাবিক সম্পদে। যেখানে প্রাণে যত ভালবাসা, সেখানেই আপনার প্রাণের নানা কথা কহিয়া পরের প্রাণ শীতল করিবার জন্য কেমন এক প্রকার প্রত্যাবর্ত্তিত পিপাসা। প্রাণ যুড়াইবে তার, পিপাসার নিবৃত্তি হইবে আমার। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই,—ভালবাসার মূলতত্ত্ব মহত্ত্ব ও আত্মদান। উহা যদি আপনার প্রাণটাকে, অনন্তকাল জুড়িয়া, তিল তিল করিয়া, দান করে, তথাপি সে প্রাণের শক্তি নিঃশেষ হয় না; সুতরাং, উহার দান অথবা দিবার ইচ্ছা সমাপ্তিতে পঁহুচে না। যেখানে দান কোন কালেও ফুরায় না, সেখানে প্রাণ নীরব থাকিবে কিরূপে? আমি অনেক সময়ে শিশুর দিকে চাহিয়া থাকি,—এবং শিশু কথা কহিতে ভালরূপ শিক্ষিত না হইয়াও, মায়ের গলাটি ধরিয়া, আখুটি করিয়া, উহার আধো আধো মধুর কথায়, কত কথাই কহিতে চাহিতেছে,তাহা নয়ন ভরিয়া দেখি। কি অপরূপ দৃশ্য! উহার প্রাণটা এখনও ফোটে নাই,—ফুটিবার অবকাশ পায় নাই। কিন্তু সেই অফুটন্ত প্রাণেই কত না আশা,—আর উহার অবিরাম-প্রবাহিত অফুরন্ত কথায় কতই না ভালবাসা!

লোকে বলে, যাঁহারা ধীর, স্থির গম্ভীর-প্রকৃতি, তাঁহারা বেশী কথা কহেন না। এ কথা আমি বুঝি না। কতকটা বুঝিলেও এ কথা আমি একবারেই মানি না। উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-প্রবর্ত্তক পুরুষদিগের মধ্যে সকলেই আমেরিকার পার্‌কার্‌কে যার-পর-নাই ধীর, স্থির ও গম্ভীর-প্রকৃতি বলিয়া পূজা করেন; আর তিনি, তাঁহার জীবনের অতি ভয়ঙ্কর কঠোর পরীক্ষায়ও, পর্ব্বতের মত নীরব ও নিষ্পন্দ রহিয়া, দুঃস্থ-দুঃখিত মনুষ্য-সম্প্রদায়ের উপকারার্থ, কত লাঞ্ছনা সহিয়াছেন, এবং কতই কি করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া, আজিও অনেকে অশ্রুপ্লুত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পার্‌কার্‌কে বিশেষরূপে জানিতেন, তাঁহারা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার নিভৃত-নিবাসে, প্রীতি প্রফুল্লতার অকৃত্রিম উল্লাসে, সততই ঐ জুলিয়া অথবা জননীর কণ্ঠ-লগ্ন শিশুর ন্যায় অবস্থিত রহিতেন; এবং যে তাঁহার কাছে যাইত, তাহাকেই দুটি মিঠা কথা কহিতে ভালবাসিতেন। কোন সময়ে এবং কাহারও কাছেই তাঁহার কথা ফুরাইত না। তিনি তাঁহার সুপরিচিত সুহৃৎস্বজন, পোষ্য-পরিজন এবং সেবক ও

সেবিকাদিগকে যেমন শত কথায় সন্তর্পণ করিতেন; সেইরূপ আবার, তাঁহার মর্ম্মঘাতী শত্রুবর্গকেও সম্মুখে পাইলে, তাহাদিগের উপর তাঁহার আনন্দময় ভালবাসার অফুরন্ত ফোয়ারা খুলিয়া দিতেন। তিনি তখন তাঁহার পদ, প্রতিষ্ঠা ও পৃথ্বীবিশ্রুত পাণ্ডিত্যের সকল কথাই একবারে ভুলিয়া যাইতেন; এবং একটা মনুষ্যের প্রাণ তাঁহার প্রাণের সন্নিহিত হইয়াছে, শুধু এই একটি কথা মনে রাখিয়া, আপনার প্রাণটা তাহার প্রাণের মধ্যে ঢালিয়া দিবার জন্য, কেমন-এক-প্রকার অলোক-সাধারণ অনির্ব্বচনীয় ভাবে ডগ মগ হইতেন।

যাঁহারা, বক, বিড়াল, অথবা বিচারবিজ্ঞ জলৌকার নিকট শিষ্টাচারের রীতি-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া, এ সংসারে, অতি সাবধানে ও অতি ধীর-পদ-বিক্ষেপণে, যাতায়াত করেন, এবং মুখে একটি কথা কহিবার পূর্ব্বে, মনে এক শত বার তাহার সমীচীনতা ও স্বগৌরব-সম্পৃক্ত উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকট পার্‌কারের উল্লিখিত অবলা-জন-সমুচিত অথবা শিশু-স্বভাব-মুখরিত মন-ভুলানো মুগ্ধনীতি ভাল না লাগিতে পারে। কিন্তু আমার চক্ষে পার্‌কারের শত-সহস্র-প্রাণ-স্পর্শি দানোন্মুখ প্রাণটাই মনুষ্যপ্রাণের প্রকৃত আদর্শ। আমার ইচ্ছা হয়, আমিও পার্‌কারের মত, শত্রু-মিত্র সকলকেই প্রাণের সহিত ভালবাসি; এবং আমার একটা প্রাণকে সহস্র প্রাণে বিলাইয়া দিয়া,—আমার উদ্বেল প্রাণের অফুরন্ত কথা সকলকেই কিছু কিছু কহিয়া, অহোরাত্র এই নিখিল-জগন্ময়-প্রেম-সাগরের তরঙ্গে ভাসি।

আমি মানুষ, তুমিও মানুষ। তুমি আমার শত্রু হইবে কেন? আমি মানুষ, তুমিও মানুষ। তোমাতে আমাতে ছোট-বড়-পার্থক্য থাকিবে কিসে? আজি তুমি, না বুঝিয়া, আমাকে বিদ্বেষ করিতেছ; এবং আমিও না বুঝিয়া, অথবা সাংসারিক স্বার্থের ক্ষণিক মোহে অন্ধ হইয়া, তোমার প্রতিকূলতা করিতেছি। কিন্তু যেখানে পরার্থেই মনুষ্যের প্রকৃষ্ট স্বার্থ, এবং পরস্পর-স্বার্থেই নিত্যস্থায়ি পরমার্থ, তুমি আর আমি উভয়েই, নিয়তির অনুলঙ্ঘনীয় শাসনে, সেই অনন্ত-সুখ-শান্তিময় পরম-ধামের দিকে অগ্রসর হইতেছি। এমন অবস্থায়, আমরা বৃথা কেন, মনগড়া পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া, মুহূর্ত্ত-কাল একে অন্যকে পর মনে করিব; এবং এইরূপ পরস্পর-ভেদ-জ্ঞানের দ্বারা, উন্নতির পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, কিছু দিনের তরে পিছনে পড়িব।

মনে কর, তুমি রুষের রাজরাজেশ্বর, অথবা শুদ্ধসত্ত্ব শুকদেব ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পবিত্র পুরুষ; আর মনে কর, আমি রাজপথের কাঙ্গাল, অথবা দুরিত-দুর্গন্ধ-ক্লিষ্ট দীন-হীন পাপিষ্ঠ। ইহাতেই বা তোমাতে আমাতে পৃথিবীর ভ্রান্তিজনিত দূরতা জন্মিবে কেন? যখন জগতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র একমুখে উপদেশ করিতেছে,—জগতের সমস্ত ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষেরা একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন

যে, তোমাকে আর আমাকে এক দিন যাইয়া, এক স্থানে, একই আনন্দ-নিকেতনে মিলিতে হইবে; এবং তোমার প্রাণ আর আমার প্রাণ, সর্ব্বতোভাবে একপ্রাণ হইয়া, অনন্ত-প্রেমময় জগৎপ্রাণের অমৃত-ক্রোড়ে স্থান পাইবে, তখন আজি, ক্ষণকালের তরে, তোমার ঐ রাজসম্পদ অথবা দেবসম্পদ, আমার উপকারক না হইয়া, উৎপীড়ক কিংবা অপকারক হইবে কি জন্য? কৃষ্ণ কহিয়াছেন,——

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

অর্থাৎ,—যাঁহার আত্মা যোগ-ধর্ম্মে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, তিনি সকলকেই সমানজ্ঞানে প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন; অপিচ, আপনার প্রাণটাকে সকলের প্রাণে, এবং সকলের প্রাণকে আপনার প্রাণে, অবস্থিত দেখিয়া, সর্ব্বপ্রকার ভেদ-জ্ঞান ভুলিয়া যান। কৃষ্ণপ্রেমে অনুপ্রাণিত অমল-চিত্ত প্রহ্লাদ কহিয়াছেন,—

অসার-সংসার-বিবর্ত্তনেষু
মা যাতু তোষং প্রসভং ব্রবীমি;
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য। (বিষ্ণুপুরাণ)

ইহার এই ভাবার্থ,—ভাই, এই অসার সংসারের অনন্ত বিবর্ত্তনে, কোন প্রকার জীবনেই, সুখ ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না। যদি প্রকৃত সুখ-শান্তি লাভ করিয়া জীবনে কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সকলকেই আপনার সমান বলিয়া জান, এবং সকলের প্রাণ শীতল করিয়া, সেই সুখে আপনি শীতল হও। কেন না, এই সমত্ব-জ্ঞান আর প্রীতি ও স্নেহের কর্ম্মনিষ্ঠ অনুষ্ঠানেই অচ্যুতের আরাধনা। প্রহ্লাদের বহুকাল পরে, শিশুচিত্ত শঙ্করাচার্য্যও সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া কহিয়াছেন,—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈক্যো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানম্
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্।" (মোহমুদ্গর)

অর্থাৎ,—তুমি আর আমি এবং অন্য সকলেই সেই এক অনন্তদেব বিষ্ণুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,—সেই পরমানন্দ-বিগ্রহস্বরূপ বিশ্বব্যাপী মহাবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। তিনি আমাদিগের সকলেরই প্রাণের মধ্যে সমান-প্রতিষ্ঠিত। অতএব তুমি বৃথা কেন অসহিষ্ণু হইয়া আমাতে কুপিত হইতেছ? তুমি সকলের আত্মাকেই আপনার আত্মায় প্রত্যক্ষ কর; আর সর্ব্বজীবে ভেদ-জ্ঞান বিসর্জ্জন করিয়া চিত্তে চরিতার্থ হও।

তবে, এস ভাই মনুষ্য,—এস প্রাণ-প্রিয়,—এস প্রিয়তম, এস প্রার্থিত-দুর্ল্লভ-স্বজন আমার,—এস, সকলেই এস,—এস আমরা একে অন্যকে ভালবাসিয়া এ মানব-জীবন সার্থক করি; এবং একে অন্যকে আপন আপন প্রাণের অফুরন্ত কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াই। যদি এমন দেব ভোগ্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম ও অনন্ত প্রেমের অধিকারী হইয়াছি; এবং সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, এবং মানে

ও অপমানে, সকলেই ধীরে ধীরে সেই অনন্তধামের দিকে যাইতেছি, তবে বৃথা কেন, অন্তঃশূন্য অহংকারের ধাঁধায় পড়িয়া,—বৃথা কেন, নিজ নিজ অবস্তবং গুণ-গৌরবের অন্ধকূপে, নীরব-গাম্ভীর্য্যে নিরুদ্ধ রহিয়া, প্রাণের কথা প্রাণে চাপিয়া রাখি ? আমার এ তাপিত প্রাণের অফুরন্ত কথা তুমি না শুনলে, তোমার প্রাণই [illegible] হইবে কিসে ? আর আমিই বা শান্তি পাইব কোথায় ? তোমার অনেক কথা কহিবার আছে, আমায় তাহা প্রাণ খুলিয়া কও ; আমারও অনেক কথা বলিবার আছে, তুমি তাহা তৃষিত-কর্ণে শ্রবণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা জুড়াও। যদি আমাকে তুমি কোন প্রকারেই আপনার জন বলিয়া অনুভব করিতে না পারিলে,—আমার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া প্রাণের কথা কহিতে ইচ্ছুক না হইলে, তবে নিশ্চয়ই তুমি আপনাকে আপনি বঞ্চনা করিলে ; এবং সর্ব্বময়-প্রেম-নিকেতনের সমধিক বাহিরে—বহু দূরে,—বিষ-ব্যাল-পরিবেষ্টিত বিভীষিকার আঁধারে, একা পড়িয়া রহিলে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "কনক-কুসুম। শ্রীবিভাবতী সেন কর্ত্তৃক প্রণীত।" যে সকল কবিতাকে এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা গীতি-কবিতা বলেন, তাহারই আর এক নাম খণ্ড কবিতা। আকাশের তারা, অনাথার দীর্ঘশ্বাস, অকাল-বসন্ত, বাসন্তী জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্নাশীতল বন-ভূমি, অথবা জ্যোৎস্না-সন্তাপিত বিরহ-বিধুরার হৃদয়-জ্বালা,—বিবাহের উৎসব ও সমাধির শেষ বিদায়, এ সমস্তই খণ্ড কবিতার বিষয়। কনক-কুসুম উল্লিখিতরূপ উনষষ্টিটি খণ্ড কবিতার এক অভিনব স্তবক। ইহার কোন কোন কবিতা কুসুম-নামের যোগ্য, এবং তাদৃশ কোন কোন কুসুমে কনক-কান্তিরও আভা আছে। কিন্তু, ইহার সকল কবিতারই কুসুম-কান্তি ফলিত হইয়াছে, এমন কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। বঙ্গীয় কুল-কামিনীদিগের মধ্যে, যাঁহারা, ইদানীং, সরস্বতীর বীণা করে ধারণ করিয়া, সমাজের চিত্ত-বিনোদনে যত্নবতী, বিভাবতীও, শিক্ষার পথে পরিশ্রম করিলে, কালে তাঁহাদিগের মধ্যে আদরের আসন পাইবেন।

২। "হৃদয়-গাথা (কবিতাবলী) শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত প্রণীত।" ইহাও খণ্ড কবিতার আর একটি সুন্দর স্তবক। ইহার কোন কবিতায়—"অজ্ঞেয় অনন্ত তুমি"—এইরূপ গভীর শব্দ-সংযোগে জগন্নিধান অনন্তদেবের আরাধনা, কোন কবিতায় আবার—"ওলো সখি, বল দেখি, সুধাই তোমারে,"—এইরূপ মধুরাক্ষরা মেয়েলী কথায়, মধু-মাখা প্রেমের মৃদুল মূর্চ্ছনা। কবি গভীর ও

মধুর, এবং শান্ত ও সুখোল্লাস-তরল, সকল প্রকার রচনায়ই সমান শিক্ষিত। কিন্তু তাঁহার লেখনী গভীর অপেক্ষা মধুরে,—শান্ত অপেক্ষা সুখোল্লাসেই অধিকতর স্ফূর্ত্তিমতী। আমরা ভরসা করি, এই হৃদয়-গাথাই তাঁহার আনন্দ-সিক্ত উদ্বেল হৃদয়ের শেষ কথা নহে।

৩। "বাণী। শ্রীরজনীকান্ত সেন প্রণীত।" 'বাণী,' আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, এক-আধারে, ত্রিবিধ কবিতার তিনটি দর্শনীয় স্তবক। ইহার সূচনায়—"গভীর ওঁঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে, কাঁপিত দূর বিমান ;—ইহার সমাপ্তিতে—"বেহায়া বেহাই" আর "বৈয়াকরণ-দম্পতির বিরহ।" পুরাতন উদ্ভট-কবি, বৈয়াকরণ-রবি বিশ্রুতি-নামা পাণিনির "শ্বশুরস্বশ্রোনামতদ্ধিতে" এই প্রসিদ্ধ সূত্র ধরিয়া, তদীয় বিচার-শূন্যতা বিষয়ে বিলাপ করিয়া, বলিয়াছেন,—

বিশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে
শ্বানং যুবানং মঘবানমেব।

আমরা, বিলাপ না করিয়া, বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, উল্লিখিতরূপ বিরুদ্ধ-মিশ্রণের জন্য ব্যাকরণে যে প্রকার প্রয়োজন থাকে, কাব্যেও সেই প্রকার প্রয়োজন থাকে কি ? এইরূপ বিরুদ্ধ-মিশ্রণ যাঁহাদিগের নিকট কোন অংশেও বিসদৃশ জ্ঞান না হয়, এই ক্ষুদ্র কাব্য, খণ্ডে খণ্ডে, তাঁহাদিগের একান্ত প্রীতিকর ও হৃদয়হারি বোধ হইবে। যদিও ইহাতে হৃদয় অপেক্ষা মনঃশক্তিরই অধিকতর ক্রীড়া, এবং সুতরাং সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ভাগ অপেক্ষা সমালোচকের সুক্ষ্ম-দৃষ্টির ভাগই একটুকু বেশী, তথাপি, ইহার স্থানে স্থানে, কবিতা রসোচ্ছ্বাসে উচ্ছলা ও আনন্দময়ী।

৪। "কুল-কন্যার দ্বিরাগমন। শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।" এখানি খণ্ড কাব্য নহে। ইহার আগা গোড়া [illegible] কথা, এবং সমস্ত কথাই [illegible] আমরা [illegible] [illegible] বংস[illegible] প্রদর্শক। তাঁহার এই দ্বিরাগমনকবিতা বঙ্গীয় কুল-কন্যামাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য এবং বালিকা-বিদ্যালয়-সমূহে আদর পাইবার যোগ্য।

৫। "বঙ্গেশ্বর।—৬। রামপাল।—শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি এল প্রণীত।" বঙ্গেশ্বর আর রামপাল দুইখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস। কিন্তু সে ক্ষুদ্রতা শুধুই কলেবরের ক্ষীণতায়। কেন না, এই উভয় পুস্তকই ঔপন্যাসিক-সৌন্দর্য্যে আনন্দপ্রদ। রচনা যেমন সরল, তেমন তরল, এবং কোন কোন স্থলে, ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত, বিনা বাতা-সেও তরঙ্গচঞ্চল। আমরা কাহিনীর বিশ্লেষ করিয়া সমালোচনা করিতে অসমর্থ। কারণ, স্থানে কুলায় না। কিন্তু, ইহা আমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারি যে, যাঁহারা বাঙ্গালার ইতিহাস ভালবাসেন, তাঁহারা বঙ্গেশ্বর ও রামপাল পড়িয়া সুখী হইবেন ; আর যাঁহাদিগের ইতিহাস লইয়া পরিশ্রম করিবার অবকাশ নাই, তাঁহারাও এই উভয় উপন্যাসেই বঙ্গীয় ইতিহাসের অনেক ভাল কথা শিখিবার সুযোগ পাইবেন। ইতিহাসের কাঠামের উপর উপন্যাসের প্রতিমা-গঠন একটুকু কঠিন কার্য্য। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র সে কঠিন কার্য্যেও কারুনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়-নিহিত মহত্ত্ব, মাধুর্য্য ও উদারতার উচ্চ আদর্শ, তদীয় লেখার কোন

ও অপমানে,
অনন্তধামের দিকে যাইতে...
কেন, অন্তঃশূন্য অহংকারের ধাঁধায় পড়িয়া,—
বৃথা কেন, নিজ নিজ অবস্তবং গুণ-গৌরবের
অন্ধকূপে, নীরব-গাম্ভীর্য্যে নিরুদ্ধ রহিয়া,
প্রাণের কথা প্রাণে চাপিয়া রাখি? আমার
এ তাপিত প্রাণের অফুরন্ত কথা তুমি না
শুনিলে, তৈ...
কিসে ... য্য
কো...
আ...

...ক বিশাল ও
রেই আপনা...,
না পারিলে,—,
প্রাণের কথঙ্গ-
নিশ্চয়ই ...ত

স্থানে, অস্ফুট আভাসিত,—কোন কোন ...ানে পরিস্ফুট বর্ণে চিত্রিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ... 'রাজসিংহ' যেমন পরি-... ...রিতে পারেন। কারণ, এই উভয় কাহি-নীতেই বলিবার অনেক কথা বাকী রহি-য়াছে; এবং আরও বহু চিত্র-নিবেশের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। গ্রন্থকার সুনিপুণ চিত্র-শিল্পী, ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ। তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থে অভাব রাখিয়া তৃপ্ত রহিবেন কেন?

৬। "প্লাঞ্চেট-তত্ত্ব। প্রথমখণ্ড। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত।" প্লাঞ্চেট সাধারণ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি সাধারণ যন্ত্র। কিন্তু, যাঁহারা প্লাঞ্চেট-তত্ত্ব নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পাইবেন যে, অতি সাধারণ হইলেও, উহার সহিত অসাধারণ অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। বাবু দীনবন্ধু মিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু। তিনি, দুই তিনটি বন্ধুর সাহায্যে, প্লাঞ্চেটের শক্তি-প্রয়োগে, যে সকল অমূল্য উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্মৃতিপটে লিখিয়া রাখিবার বস্তু। গ্রন্থের মূল্য দুই আনা। ইহা ঢাকার সন্নিহিত নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে প্রাপ্তব্য। এইরূপ একখানি উপদেশপূর্ণ পুস্তক, ইংরেজীতে সংকলিত হইয়া, এত অল্প মূল্যে, ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইলে, ইহার দশসহস্র কাপি একই দিনে লোকের হাতে হাতে উঠিয়া যাইত। দীনবন্ধু বাবু ভাষার বিশুদ্ধি বিষয়ে ভবিষ্যতে একটু সাবধান হইলে, গ্রন্থের মূল্য অনেক বাড়িবে।

৭। "অমৃতরেণু।—৮। অবকাশ (প্রথমখণ্ড।)—৯। পদ্যপ্রসূন।—১০। সতীত্ব।—১১। শান্তি।—শ্রীবরদাকান্ত ... প্রণীত।"—এই পাঁচখানি ক্ষুদ্র পুস্তক সুকুমার-মতি বালক বালিকা ও শিক্ষানুরাগিণী কুলকামিনীদিগের ব্যবহারে আসিতে পারে। অমৃতরেণুর আরম্ভ ও উপসংহারে দুইটি হরিসঙ্গীত;—মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের সুবিখ্যাত মোহমুদ্গর শ্লোক। অবকাশের প্রথম প্রবন্ধের নাম "বেলা যে যায়"। এই প্রথম প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কয়েক পংক্তিতে পুনঃ পুনঃই 'ভীষণ' শব্দের প্রয়োগ। ইহা আমাদিগের ভাল লাগিল না। যথা,—"ভীষণ গ্রীষ্ম," "ভীষণ গরম," "ভীষণ রৌদ্র," "ভীষণ আবর্ত্তময়ী পদ্মা" ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রভৃতি বহু ভাষার প্রসাদাৎ শব্দ-সম্পদে ভাগ্যবতী। বাঙ্গালা, ভয়ের কথা বুঝাইবার জন্য, বারংবারই ঐ এক "ভীষণ" শব্দ লইয়া উপস্থিত হইবে কেন? গ্রন্থকার পরিষ্কৃত বুঝাইতে "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন" লিখিয়া থাকেন। এ দোষ তাঁহার নহে। এ দোষ বাঙ্গালির কপালের। বঙ্গদেশের অনেক সুপরিচিত লেখকও, পরিচ্ছন্ন শব্দকে neat and clean অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বরদা বাবুর গদ্যের তুলনায় পদ্য অধিকতর প্রীতিকর। পদ্যপ্রসূনের সমস্ত কবিতাই সুনীতির পথপ্রদর্শক। সতীত্ব ও শান্তি এই দুই পুস্তকে অনেক স্মরণীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

...প্রাপ্তব্য
...ধ্যায়।
...কুটীর।